অনুসন্ধান।

৩য় বর্ষ

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

শ্রাবণ ১২৯৬ — আষাঢ় ১২৯৭

তৃতীয় বর্ষ।

তৃতীয় বর্ষের লেখকগণ।

প্রাণ কবি শ্রীযুক্ত রসিকলাল রায়; শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, বি, এ, বি, এল; শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ; 'তান্তিয়া ভীল' প্রভৃতি প্রণেতা শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত দীনেশচরণ সেন বি, এ; শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল; 'বেদব্যাস'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায়; শিল্প-পুষ্পাঞ্জলির ভূত-পূর্ব্ব-সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দেব; কর্ণধার-সম্পাদক শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত; শ্রীযুক্ত শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বি, এ; শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ শর্ম্মা; শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মজুমদার; শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী; 'কল্পনা'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত অবতারচন্দ্র লাহা; শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী; শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার; শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত; শ্রীযুক্ত রাধানাথ মিত্র; শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত চারু-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত চুনী-লাল গুপ্ত; শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বসু; শ্রীব্রজলাল সামন্ত; শ্রীযুক্ত রসিকলাল দে ও সম্পাদক প্রভৃতি।

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।
অনুসন্ধান-সমিতির কার্য্যাধ্যক্ষ,
৮নং টেমার্স লেন, ঠন্ঠনিয়া, কলিকাতা।

অনুসন্ধান।

তৃতীয় বর্ষ।

সূচীপত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
অতৃপ্তি	২১৪
অনুকরণ	২৫৫
অদ্ভুত হত্যা	১৭, ৪০, ৫৭, ৮১
অপরূপ	৬৭
অপূর্ব্ব নারী	৫২৬
অপূর্ব্ব পুরস্কার	৩৪৭
অবসান	১৪১
অভাগিনী	২৭০
অমরনাথ	৩১৯, ৩৩৭
আত্ম-উপদেশ	৪৬৯
আমার গোয়েন্দাগিরির চূড়ান্ত	১৪৯
আমার হাসি	২৫
আন্দুলবেড়িয়ার আর এক কীর্ত্তি	২৫৮
ঈশ-আবাহন	২৪১
ঈশ্বর সাকার কি না	৩৮১
উৎকল ভ্রমণ	৩৬৬
এস না	৬৮
কাঁদিব না কেন ?	২৭২
কান্না	২৬২
কুমার নিত্যরঞ্জন বাহাদুর	৩৫৬
কেমনে হইব পার	৫১
কর্ত্তব্যনির্ণয়	১৪
কর্ম্ম	৩১৭
কর্ম্ম না কর্ম্মভোগ	৩৫৪
কর্ম্মফল	৫১
কলিকাতার দ্বিপ্রহরের জুয়াচুরী	৬
খোস্ খবর	৮৮
গাত্রদাহে প্রলাপ	৭০
গিরিবালা	২৭৫
গোরার অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ড	১৯১
গোল বাধিয়াছে	৯৪
ঘর-বিভীষণ	১১
চতুর চোর	৪১১

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
চুট্‌কি বিজ্ঞান	২৩৭
চোরে চতুরে	১০২
চোরের উপর বাটপাড়ি	৭৬
চোরের চক্ষুদান	৪৬২
চোরের ব্রাহ্মণ ভক্তি	৫০৩
চোরের মেসো হওয়া	৪৯৩
ছায়া (সমালোচনা)	৪৪২
জগজ্জননী	১
জুয়াচুরীর একশেষ	২৪৩
জুয়াচোর ধীরেন্দ্রনাথ পাল	১৯৮
জুয়াচোরের গরু-বেচা	৩৭৪
জুয়াচোরের মেয়ের বিয়ে	৩৫১
জুয়ারীর ফাঁদে	২৯৭
টোট্‌কা-টুটকি ঔষধাদি	১৬
ঠগী-কাহিনী	২৭, ৪৩, ১০৭, ১৭৩, ৩২৬, ৩৪৪, ৪৮১, ৪৯৭
তবে শরীরের মাঝে আমি কোন্ জন	৪৪৭
তান্তিয়া ভীল	১৫৭
তারাচাঁদ	৪১৩, ৪২৮, ৪৭৩
তোমায়-আমায়	২৬২
দস্যু-দলপতি ঝুন্দা	৩৭৬, ৩৯৫
দস্যুবীর গোবর্দ্ধন দিকৃপতি	৩২৯
দুইখানি ছবি	৬১, ১১৩, ১২৫, ১৫২
দুর্গোৎসব	৯৭
নবীন বাবুর চণ্ডী-ব্যাখ্যা	৩৯১
নমঃশূদ্র-জাতি	৩৬, ৭৯
নানা কথা	২২
নাট্যচিত্র	৬৫, ৮৪, ১৩০
নারী	২৪৬
নির্গুণ ব্রহ্মরূপ কৃষ্ণের মাহাত্ম্য	১৯৩
নূতনতর জুয়াচুরী	২৯২
নূতনতর জুয়াচুরি-ফন্দি	২৫৭
পরিতাপীর ক্রন্দন	৪১৫

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
পাপীর প্রার্থনা	২১৭
পুণ্যবানের পরীক্ষা	৪৬৯
পুলিসের অসীম কীর্ত্তি	৯০
পূজার পঞ্চরঙ্গ	১১৫
প্রকৃতির পূজা	৭৩
প্রতারণা-প্রবঞ্চনা	২১, ৪৩, ৬৯, ৯৩, ১১৭, ১৪১, ১৬৬, ১৭৯, ১৯৮, ২২৫, ২৫৭, ২৮৭, ৩০৭, ৩৩১, ৩৫৭, ৩৭৮, ৩৯৯, ৪২০, ৪৪৪, ৪৬৬, ৪৮৯, ৫১১, ৫৩৫
প্রার্থনা	২৬৫, ৩৬১
প্রেম-ধর্ম্ম	৪৮৫
ফুলরেণু	১৫, ৫৩২
বক্রেশ্বর তীর্থ	২০৯
বনের ফুল	৩৩১
বসন্তকুমার (সমালোচনা)	১৬৩
বহুরূপী	৮০
বাটপাড়ের উপর ধড়িবাজ	৩১৪
বাল-বিধবার কথা	৩৯
বিজয়া-গীতি	১২১
বিজ্ঞাপনের বিড়ম্বনা	২০৫
বিধির নির্ব্বন্ধ	২১৭
বীণাপাণি-আবাহন	২৫
বিস্তি-খেলা	১৪১
বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস	৪২৩, ৪৪৮
বিশ্বব্যাপী সমুত্থান বা নবযুগাবর্ত্তন	৫১৭
বিশ্বাস	১৩৭
বিশ্বাসঘাতকের ষড়যন্ত্র	৪০৩, ৪৩৬
বিশ্বাসে মিলায় হরি তর্কে বহুদূর	৫০১
বিষয়-বিকারের চিকিৎসা	২৮৯
ভট্‌চাযের তীর্থ-দর্শন	৩৬১, ৩৮৫
ভক্ত-মহিমা	৩৮৫
ভক্তি-পরীক্ষা	১৪৫
ভক্তের কথা	৪০৩
ভক্তের গান	৩১৪, ৩৩৭, ৪৯৩
ভক্তের পূজা-পদ্ধতি	১৬৯
ভগ্নহৃদয়ের আক্ষেপ	৪১০
ভয়ানক খুন	৩৬৯, ৪১৬, ৪৩৯, ৪৭৭
ভয়ানক জুয়াচুরী-ফন্দি	৪৫৭
ভারতে ধর্ম্মের আধুনিক অবস্থা ও ভাবী ফল	১৪১
ভারতবর্ষের জাতীয় দুর্ব্বলতার কারণ	২৬৫
ভালবাসা-জলাঞ্জলি	৩৯
মতামত	১৯, ৯১, ১৩৯, ১৬৫, ১৮৯, ৩৩৩, ৩৫৮, ৩৯৭, ৪৫৯, ৪৮৭

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
মথুরামোহন	৫০৬, ৫২১
মফঃস্বলের বিবরণী	২৩, ৯৫, ১১৯, ১৪৩, ১৯০
মল্ল-রাজ-বংশ	৩৮৯
মাদক-সেবন	৪০৭, ৪৩৩, ৪৫৩
মানব জাতির প্রকৃত উন্নতি কি	১০৫
মানস-সরোবর	১২২
মানুষের ভগবান হওয়া	২১০
মাহেশ	২৪৯
মুছিতে বলো-না সখা এই অশ্রুধার	২২২
মুসে ম-ট্‌ক্কা	৯
যুগলরূপ	৫৩৪
রঙ-তামাসা	৪৯০
রত্ন-গৃহের জুয়াচুরী-কাণ্ড	২০২, ২১০, ২৫৯ ২৮১, ৩০২, ৪৬৬
রাজ-পৌত্র ভিক্টর	২৩৯
রায়শেখর বা কবিশেখর	১১২
রেশমের চাস	২৫৪
লিবরপুলে জাতীয় সমিতির কথা	১৮৮
শারদোৎসবে উচ্ছ্বাস	৯৮
শক্তি-পূজা	৯৯
শশাঙ্ক-শেখর	১৩২. ১৫৪, ১৭৬, ১৯৪ ২৮০
শুধু যাবে নাএ প্রাণ	২০৮
শৈশব-স্মৃতি	৮৭
সতী-কাহিনী	৩৪
সংবাদ	২৪, ৪৮, ৭১, ৯৬, ১২০, ১৪৩, ১৬৭, ১৯২, ২১৬, ২৪০, ২৬৪, ২৮৮, ৩১২, ৩৩৬, ৩৫৯, ৩৮০, ৪০১, ৪২২, ৪০৫, ৪৬৮, ৫১৬, ৫৩১,
সংসার সমরে ভীষণ	১৬৯
সংসারের অনিত্যতা	৪২৩
সম্পাদকের শ্রাদ্ধ	৪৭
সাধক-সঙ্গীত	৪০৪
সাধন	২
সাহিত্য ও ধর্ম্ম	৪৩১
সিপাহী-যুদ্ধে ইংরাজ-সেনার অপূর্ব্ব দৌত্য	৫৬৪
সে	৬৮
সর্ব্বমাঙ্গল্যে বিশ্বাস	৭৩
স্ত্রীলোকের লজ্জা	৫১২
স্বপ্নছায়া	৫৩২
হর-পার্ব্বতী-স্তব	৫১৭
হিন্দু-সমাজ	২২৩
হৃদয়	১১০

অনুসন্ধান।

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

৩য় খণ্ড।] ১৫ই শ্রাবণ, ১২৯৬ সাল। [১ম সংখ্যা।

জগজ্জননী!

"ন মন্ত্রং নো যন্ত্রং তদপি চ ন জানে স্তুতিকথাঃ,
ন জানে মুদ্রাস্তে তদপি চ ন জানে বিলপনম্।
ন জানে ত্বদ্ভক্তিং চ ন ভজনশক্তিং গিরিসুতে,
পরং জানে মাতস্ত্বদনুসরণং ক্লেশহরণম্॥"

জননি! আপনার পূজার মন্ত্রও জানি না, কৌশলও জানি না; আপনার স্তবের বাক্যাবলিও জ্ঞাত নহি, মুদ্রাবিধিও অপরিজ্ঞাত; হৃদয়ে ভক্তিও নাই, ভজনা করিবার সামর্থ্যও অল্প; তবে কেবল এইমাত্র জানি যে, আপনার আশ্রয়ই সকল ক্লেশ দূর করে। আর, জানি জননি, 'কুপুত্রো জায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি।' তাই ভরসা, আশ্রয় পাইব—অকৃতি অধম যদিও, তথাপি 'গুণরহিতপুত্রেহধিকদয়া' নির্গুণ পুত্রেই জননীর স্নেহাধিক্য অধিক, এই সাহস! নতুবা কি পুণ্য—কি সামর্থ্য যে, ক্রমে বুদ্বুদকণা—তদ্বৎ উঠিয়াই বিলীন না হইয়া—বিস্তৃতায়তন ধারণ করিতে সক্ষম হইত? সকলই কৃপা আপনার—সকলই মহিমা আপনার! অক্ষম—অধম হইয়াছিলাম, বুঝি বা তাই আজ সার্থক!

যাইহোক, এখনও আর কিছুই বুঝি না বা আর কিছুই চাহি না। চাহি কেবল—ভরসা কেবল, আপনার সেই শ্রীচরণ; আশ্রয়-মাত্র—সাহসমাত্র। আর, সময়ে সময়ে দেখিতে সাধ, কেবল আপনার সেই 'দুর্গা দুর্গতিনাশিনী' মূর্ত্তি। সে মূর্ত্তি নহিলে—শঙ্কটে আপনি না সহায় হইলে, অক্ষম অধমের আর দাঁড়াইবার সামর্থ্য কি!

আপনি সর্ব্ব-স্বরূপিণী—আপনি সর্ব্বব্যাপিনী। কিন্তু আপনার সে মহীয়সী শক্তির পরিচয়, অধম আমরা, পাইব কোথায়? আমরা মাত্র জানি, আপনার নাম 'দুর্গা দুর্গতিহরা'—আপনি 'সর্ব্বমঙ্গলা'। অধম অকৃতি সন্তান আমরা, আমরা আপনাকে তাই সেই ভাবে মাত্র জানি। সেই ভাবে—সেই স্নেহেই আজীবন আপনি আমাদের ভরসা দেন, সকল সময়ই আমাদের সেইমাত্র কামনা। কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বেও আমরা সেই আকাঙ্ক্ষাতেই প্রণোদিত হইয়া, আপনার স্মরণ লইতেছি,—

"সর্ব্ব-মঙ্গলা-মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে
শরণ্যে ত্রম্বকে গৌরি নারায়ণি নমস্তুতে।"

সাধন।

বিশ্বজনীন প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া, সংসার-সাগরের ঊর্ম্মিমালা কি ভীষণবেগে প্রবাহিত হইতেছে!—লহরী-লীলায় অনন্ত প্রাণিরাশি ভাসাইয়া লইয়া, কি ভৈরব রবে নাচিতে নাচিতে, পশ্চাতে অনন্ত রাখিয়া, অনন্তের দিকে প্রবাহিত হইতেছে! কত কত জীব তাহার দুর্দ্দমনীয় বেগ সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া কত কত বার সলিল-গর্ভে নিমগ্ন হইতেছে; কত সহস্র সহস্র প্রাণী তাহার স্রোতের প্রতিকূলে বৃথা সন্তরণ করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া অতলস্পর্শ গভীরতার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে; তাহার ইয়ত্তা নাই। সমুদ্র চলিতেছে—কোটী কোটী প্রাণী ভাসাইয়া লইয়া প্রবল বেগে চলিতেছে। তাহার বিরাম নাই, অবসাদ নাই, শ্রান্তি নাই। প্রাণিগণ কখনও তরঙ্গ-বেগে পর্ব্বত-প্রমাণ উচ্চতায় আরোহণ করিতেছে; কখনও পরক্ষণেই অতলস্পর্শ গহ্বরে নিমগ্ন হইতেছে; আবার কখনও বা ভাসিতে ভাসিতে, আবর্ত্ত-বেগে ঘুরিতে ঘুরিতে, সলিলরাশির অন্তস্তলে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। জীবগণ এইরূপে অসহনীয় দুঃখ অনুভব করিয়াও, একেবারে আত্ম-হারা হইয়া, আবার সেই স্রোতে গা-ঢালিয়া দিতেছে। হায় হায়! তাহারা কতদূর মোহাচ্ছন্ন!

ঐ যে একখানা ক্ষুদ্র তরী আরোহণ করিয়া চারিদিকে ভাসিয়া বেড়াইতেছেন, উনি কে? সূর্য্যকিরণ-প্রতিঘাতী রূপের চ্ছটায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া, আবেনীসম্বদ্ধ বিশাল চিকুর-দামে পৃষ্ঠদেশ সমাবৃত রাখিয়া, অলক্ত-রঞ্জিত কুসুমশোভিত চরণ দু'খানি দোলাইয়া দোলাইয়া, চারিদিকে ভাসিয়া বেড়াইতেছেন; উনি কে? উনি মূর্ত্তিমতী করুণারূপিণী জগজ্জননী। জগদম্বা সন্তানগণের দুঃখে কাতরা হইয়া, তাহাদের অভাব মোচন করিবার জন্য, তাহাদের সহিত ভাসিয়া বেড়াইতেছেন। কল্পতরু-স্বরূপা জননীর নিকট যে যখন যাহা চাহিতেছে, তখনই তাহাকে তাহাই দিতেছেন। রাজ-রাজেশ্বরীর রাজত্বে অবিচার নাই, অন্যায় নাই, পক্ষপাত নাই। দেবগণ হইতে সামান্য কীটানু-কীট পর্য্যন্ত যথা-সময়ে যথেষ্টরূপে আহারাদি পাইয়া তাঁহার অসীম সংসারে প্রতিপালিত হইতেছে। যখন যাহার যেরূপ অভাব হইতেছে, তখনই সে তাহাই পাইতেছে। কিন্তু নির্ব্বোধ জীব আপন দোষে আপনিই দুঃখ-জালে নিবদ্ধ হইতেছে। মোহাচ্ছন্ন মানব; ধনমানাদি ক্রীড়া-কন্দুক লইয়া চির-ক্রীড়ায় আসক্ত। তাই, নিরন্তর দুঃখ অনুভব করিয়াও, আবার সেই দুঃখ-সাগরে গা-ঢালিয়া দিতেছে; তাই, একবারও দেখিতে পাইতেছে না যে, জগদম্বা ঐ 'সাধন' নামক ক্ষুদ্র নৌকাখানি লইয়া তাহারই উদ্ধারের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। অভাগা মানুষ নিজের দোষেই নিজে মজিতেছে। তবে অন্যের দোষ দেয় কেন?

ঈশ্বর-লাভের উপায়কে 'সাধন' বলে। যাঁহার যতদূর সাধনের বল, তিনি ততদূর ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী; ততদূর তাঁহার সহিত ঈশ্বরের ঘনিষ্টতা; ততদূর ঈশ্বরের সহিত তাঁহার মাখা-মাখি-ভাব। ঈশ্বরই সাধকের একমাত্র আদর্শ; সাধকের জীবন-যাত্রার একমাত্র ধ্রুবতারা। সাধক সেই একমাত্র আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া আত্মাকে গঠিত করিয়া থাকেন। কি প্রকারে বিষয়-সংসর্গ হইতে ইন্দ্রিয়-সকলকে নিয়ন্ত্রিত করিবেন; কি প্রকারে ঈশ্বরের ন্যায় সুখ-দুঃখ, নিন্দা-স্তুতি, সফলতা-বিফলতা, ধূলি-চন্দনে সমান জ্ঞান জন্মিবে; কি প্রকারে ঈশ্বরের ন্যায় সত্ত্ব-গুণ-দ্বারা, রজঃ ও তমঃ-গুণকে বশীভূত করিয়া, সর্ব্বদা চিত্তকে ভক্তি, স্নেহ, দয়া ও ক্ষমাদি গুণ-দ্বারা নিরন্তর স্নিগ্ধ রাখিতে হইবে; ইহাই সাধকের সাধনা। এইরূপে সাধক যতই আদর্শের নিকটবর্ত্তী হইবেন, ততই তাঁহার হৃদয়ে সেই দিব্য পুরুষের দিব্য জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইবে; ততই মেঘমালা-নির্ম্মুক্ত হইয়া তাঁহার আত্ম-সুধাকর সুধাক্ষরণ করিতে থাকিবে; ততই জীবাত্মার মলিনতা ঘুচিয়া যাইয়া পরমাত্মার ন্যায় হইতে থাকিবে। পরিশেষে, জীবাত্মা অভেদ্যরূপে পরমাত্মায় মিলিত হইয়া যাইবে—ক্ষুদ্র জলবিন্দু মহাসাগরের অনন্ত সলিলরাশির মধ্যে মিশ্রিত হইয়া যাইবে। তখন আর কামনা থাকিবে না; কাম্য থাকিবে না; অভিমান, ভীতি, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ কিছুই থাকিবে না। তখন, কেবলই আনন্দ, কেবলই সুধা, কেবলই শান্তি। আর, তখনই জীব শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাবাপন্ন হইয়া মোক্ষলাভ করিয়া থাকে।

সাধন বড়ই কষ্ট-সাধ্য। সাধকের দেহ, মন ও আত্মাকে সর্ব্বদা পবিত্র রাখিতে হইবে; রূপ-রসাদির সংস্পর্শ হইতে, পাপচিন্তার সংসর্গ হইতে, সম্পূর্ণ স্বাধীন রাখিয়া নিয়ত ঐশী-শক্তির অনুধ্যান করিতে হইবে। যেমন জলৌকা একটী তৃণের উপর দণ্ডায়মান হইয়া আর একটী তৃণ ধারণ করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে শুণ্ড সঞ্চালন করে, অথবা যেমন একটী লতা বর্দ্ধিত হইয়া অগ্রভাগ-দ্বারা কোন একটী আশ্রয় গ্রহণ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ আমাদের বিষয়-ভোগের স্পৃহা-সকলও, মস্তিষ্ক হইতে প্রবাহিত হইয়া, শরীরস্থ ইন্দ্রিয়-গণের দ্বারে নিয়তই আগ্রহ-সহকারে অপেক্ষা করিতেছে—ভোগ্য বস্তু সম্মুখে পাইলেই তাহা গ্রহণ করিতে উৎসুক হইয়া রহিয়াছে। এই ইন্দ্রিয়গণের চরিতার্থতা হইতেই আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতেই সর্ব্বপ্রকার পাপ উৎপন্ন হয়; ও জীব মোহজালে জড়িত হইয়া থাকে। মানসিক, বাচনিক ও কায়িক এই সকলপ্রকার পাপই চিত্তকে কলুষিত করিয়া আত্মাকে ঈশ্বর হইতে দূরে লইয়া ফেলে। অতএব সাধকের চিত্তকে প্রথমেই ভোগ-শক্তি হইতে দূরে রাখিতে হইবে।

এই ভোগ-লালসা নিবারণের জন্য হিন্দু-ধর্ম্মে প্রধানতঃ তিনটী প্রক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা,—জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, ও কর্ম্মযোগ। জ্ঞান-যোগীরা নানা প্রলোভনপূর্ণ সংসার হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া, নির্জ্জন স্থানে বাস করিয়া কঠোর যোগাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া থাকেন; ও হৃদয়ে সত্ত্ব-স্বরূপ ঈশ্বরের সত্ত্বা অনুভব করিয়া চরিতার্থতা লাভ করিয়া থাকেন। ভক্তগণ স্বভাবতঃ ভগবৎ-প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া, এই সংসারের সকল পদার্থতেই ভগবানের সত্ত্বা—ভগবানের কার্য্যপ্রণালী অনুভব করিয়া, তাঁহাতেই মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়া, বিষয়-ভোগে নিস্পৃহ হইয়া থাকেন। কর্ম্মযোগীগণ এ সংসারে থাকিয়া যাহা কিছু করেন, সকলই ভগবান্ কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়াই করিতেছেন—তাঁহাদের কোন কার্য্যেই কোন দায়িত্ব নাই, তাঁহাদের কর্ত্তব্য, তাই তাঁহারা করিয়া থাকেন,—এইরূপে মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইয়া থাকেন; এবং সর্ব্ববিষয়ে আসক্তি-শূন্য হইয়া ভগবানের প্রতি আত্মনির্ভর স্থাপন করেন। জ্ঞান-মার্গে পুরাতন আর্য্যঋষিগণ দৃষ্টান্ত-স্থল। ভক্তি-মার্গে ধ্রুব, প্রহ্লাদ ও নারদ। কর্ম্ম-মার্গে রাজর্ষি জনক ও মহাত্মা অর্জ্জুন জগৎবিখ্যাত।

এই মুখ্যতম তিনটী পথ আবার মিশ্র-যোগাদি রূপে নানা শাখা-প্রশাখায় বিস্তীর্ণ হইয়া হিন্দু-ধর্ম্মকে এক প্রকাণ্ড বৃক্ষরূপে পরিণত করিয়াছে। এই মহাবৃক্ষ সকল প্রকার জীবকেই ইহার সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় প্রদান করিতেছে—হিন্দু-ধর্ম্মের অসাধারণ উদারতা ও সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্নতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। লোকের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি, ভিন্ন ভিন্ন অভিরুচি ও ভিন্ন ভিন্ন কামনা। তাই হিন্দুধর্ম্মেও সাত্ত্বিক, রাজসিক, ও তামসিক এই তিনপ্রকার উপাসনা বিহিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি মিথ্যাচারী তস্কর, তাহার কখনও সাত্ত্বিক প্রকৃতি

ও সাত্ত্বিক কামনা জন্মিতে পারে না—সে কখনও মোক্ষ-কামনায় উপাসনা করিতে পারে না। তাই হিন্দুধর্ম্মে তামস উপাসনার সৃষ্টি হইয়াছে—চোরকেও তাহার হৃদয়ের সহিত কামনা করিয়া উপাসনা করিবার স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবহিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি নমে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥"

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! অতি দুরাত্মা লোকও যদি অনন্যচেতা হইয়া আমার উপাসনা করিতে থাকে, তবে সেও সাধু বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কারণ, তখন সে সম্যক্ জ্ঞানবান্ হয়। প্রকৃতরূপে আমার উপাসনা করিতে পারিলে, শীঘ্রই দুরাত্মতা নিবৃত্তি হইয়া ধর্ম্মাত্মা হয়; এবং ক্রমেই শান্তিলাভ করিয়া থাকে। কৌন্তেয়! তুমি নিশ্চয়ই জানিবে, আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হইতে পারে না।

আবার ঈশ্বরকে যাঁহার যে ভাবে ইচ্ছা, সেই ভাবেই তিনি উপাসনা করিতে পারেন। কেহ বা পিতৃভাবে, কেহ বা মাতৃভাবে, কেহ বা বন্ধুভাবে ইত্যাদি যাঁহার যেরূপ অভিলাষ, তিনি সেই ভাবেই ভগবানের প্রতি অনুরক্ত হইতে পারেন। সেইজন্য শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায়-বিভাগ। কিন্তু সকল ধর্ম্মেই ও সকল সম্প্রদায়েই ভগবানকে অকপটভাবে ও সরলতার সহিত উপাসনা করিতে হইবে। তিনি কাব্য-কবিত্বের পক্ষপাতী নহেন। তাঁহাকে মৌখিক 'ভক্তি-বারি' ও 'প্রেম-সুধা' দিয়া পূজা করিলে তাহা কখনও গ্রহণ করেন না। আবার তাঁহাকে এক সময় পিতৃভাবে, একসময়ে মাতৃভাবে, আর এক সময়ে বন্ধুভাবে দেখিলে প্রকৃত অনুরাগও জন্মিতে পারে না। সাধককে তাঁহার ইচ্ছানুসারে সর্ব্বদা একই ভাবে তাঁহাকে দেখিতে হইবে। চিরদিন সেই একই ভাব হৃদয়-কন্দরে পোষণ করিয়া—সেই একই মূর্ত্তি হৃদয়-মন্দিরে স্থাপন করিয়া, সেই একই ভাবে তাঁহার অনুরাগী হইতে হইবে। লৌকিক পিতা-মাতা ভাই-বন্ধুর প্রতি যেরূপ অসঙ্কোচ ও সরল ব্যবহার করিতে হয়, তাঁহার সঙ্গেও ঠিক সেইরূপ করিতে হইবে। যেমন লৌকিক পিতাকে কখনও 'মা' বলি না, অথবা মাতাকেও কখনও 'বাবা' বলি না; যিনি মা, তিনি চিরদিনই যেমন 'মা'; অথবা যিনি 'বাবা', তিনি চিরদিনই যেমন 'বাবা'; সেইরূপ চিরদিন ভগবানকে সেই একই ভাবে স্নেহ করিতে হইবে। সেই জন্যই পরমভক্ত মহাত্মা রামপ্রসাদ ও সাধক-চূড়ামণি কমলাকান্ত চিরদিনই মাতৃভাবে ভালবাসিয়াছিলেন। তাহা তৎ-তৎপ্রণীত সঙ্গীতেই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু যখন এইরূপ করিতে করিতে আত্মজ্ঞান জন্মে, যখন আত্মপর-জ্ঞান রহিত হয়, যখন 'আমিত্ব' 'তুমিত্ব' জ্ঞান অন্তর্হিত হয়, তখন সকল ভাবই এক, এবং এক ভাবই সকল হইয়া যায়। তখন কোনও প্রভেদই থাকে না।

মোক্ষলাভ একজন্মের ফল নহে। জীব, কতবার জন্মলাভ করিয়া, কত কোটী কোটী যোনি পরিভ্রমণ করিয়া, মনুষ্য জন্ম-লাভ করিতে পারে; এবং মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়াও, কত জন্ম পরে গন্তব্য স্থানে নীত হইতে পারে তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। তবে যখন যে জন্ম লাভ করা যায়, তখন তাহার সদ্ব্যবহার করিলে ক্রমেই উন্নতি লাভ করা যাইতে পারে। অতএব দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া যাহাতে ঈশ্বরের দিকে ক্রমে অগ্রসর হইতে পারা যায়, তাহাই মানবের একান্ত কর্ত্তব্য। একমাত্র ঈশ্বরানুরাগ ব্যতীত জীবের উদ্ধারের অন্য উপায় নাই। একথা স্বতঃসিদ্ধ ও সর্ব্ববাদী-সম্মত। জগতের সকল ধর্ম্মেই ইহা একবাক্যে স্বীকার করিতেছে; সকল সম্প্রদায়েই ইহার অনুশাসন পরিলক্ষিত হইতেছে।

মনুষ্যের মনুষ্যত্ব একমাত্র ঈশ্বর লইয়া। যিনি যতদূর ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী, যিনি যতদূর তাঁহাতে অনুরাগী, তিনিই ততদূর মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছেন, তিনি ততদূর সভ্যতা লাভ করিয়াছেন। ঈশ্বরানুরাগই মনুষ্যত্ব ও সভ্যতার পরিচায়ক।

বাল্যকাল হইতেই প্রীতিসঞ্চার হইলে, জীবনের সফলতা অনেক পরিমাণে আশাপ্রদ। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ লোকই এবিষয়ে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। বালকের কোমল চিত্তে ভগবৎ-প্রেম অঙ্কুরিত হইলে তাহা হইতে নিশ্চয়ই সুফল ফলিবে। ভাই স্বর্গীয় মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস বলিয়াছেন,—"বালকের মন ষোল আনা নিজের নিকটে থাকে; ক্রমে বিবাহ হইলে আট আনা স্ত্রীর প্রতি যায়, সন্তানে চারি আনা কাড়িয়া লয়, বাকি চারি আনা অহঙ্কার অর্থাৎ মান-সম্ভ্রম-বেশভূষায় কাড়িয়া লয়। অতএব বাল্যকালে যাহার ঈশ্বরে মতি হয়, সে সহজেই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে, সন্দেহ নাই।"

আজ ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের, কি শোচনীয় অবস্থা! সাধন, সিদ্ধি, এ সব কথা আজকাল কেবল পুস্তক-গত হইয়া পড়িয়াছে। যে সাধনের বলে একদিন আর্য্যগণ জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন; যে সাধনের বলে এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম মনুষ্য একদিন অনন্ত-জগতের আধারকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন; যে সাধনের বলে শত শত ভারতবাসী অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; আজ কিনা বর্ত্তমান হিন্দু-সন্তানগণ তাহাতেই সর্ব্বাপেক্ষা অনাদর, ঔদাস্য ও অলসতা প্রকাশ করিয়া থাকেন! কি পরিতাপের বিষয়! হা অদৃষ্ট! এখন সেই সকল জ্বলন্ত তারা নিবিয়া গিয়াছে—চিরকালের জন্য অস্তাচলে গমন করিয়াছে। আজ ভারতবাসীর অর্থোপার্জ্জন হইয়াছে, মোক্ষ; অর্থকরী বিদ্যা হইয়াছে, তাহার সাধন। আজ সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া মোহ, বিলাসিতা এবং অলসতা বিরাজ করিতেছে। হিন্দুর অমূল্য ধন সাধন আজ 'সেকেলে লোকের' হাতে পড়িয়া, জল-ফুলের ক্রীড়া-বিশেষে পরিণত হইয়াছে। অধিকন্তু, শিক্ষিত-দলের অবস্থা আরও শোচনীয়। আজ হিন্দুর শিক্ষালয় ঘোর রাজস ও তামস শিক্ষার আলয় হইয়াছে। তাই আসুরিক হইতেছে, হিন্দুর রীতি-নীতি; আসুরিক হইতেছে, তাহার চিন্তা-শক্তি আসুরিক আহার, আসুরিক পরিচ্ছদ, আসুরিক তাহার আদর্শ। ইহার ফলে হিন্দুসন্তান ঈশ্বর হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িতেছেন। এইরূপ শিক্ষালাভ করিয়া হিন্দুসন্তানগণ (কেহ বা কার্য্যতঃ, কেহ বা বাক্যতঃ ও কার্য্যতঃ) নাস্তিকতার মধ্যে দীক্ষিত হইতেছেন। এখন অধিকাংশ ব্যক্তিই সকল ধর্ম্মের সারসংগ্রহ করিতে যাইয়া—অসাধারণ উদারতার পরিচয় দিতে যাইয়া, নিজে উদ্দেশ্যহীন, মতিহীন ও গতিহীন হইয়া পড়িতেছেন।

তাই বলি ভাই আর্য্যসন্তান! একবার ভাবিয়া দেখ, তোমার জীবনের উদ্দেশ্য কি? একবার ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখ, তুমি কোথা হইতে পতিত হইয়াছ; একবার পশ্চাতে চাহিয়া দেখ, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ; একবার সম্মুখে চাহিয়া দেখ, তোমায় আবার যাইতে হইতেছে, কোথায়! তুমি পৃথিবীর নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইতেছ, নানা ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইতেছ; তোমার যশঃপ্রভা দিগ্‌দিগান্তে উদ্ভাসিত হইতেছে; সে ভাল কথা। কিন্তু তাহাতেই কি তোমার যথেষ্ট হইল? তোমার সর্ব্বাগ্রে কি দেখা উচিত নয় যে, তুমি কতদূর ঈশ্বর-সমীপে অগ্রসর হইলে! তুমি হিন্দুসন্তান। হিন্দু ধন চান না, মান চান না, যশঃ-খ্যাতি, গৌরব ইহার কিছুই চান না। হিন্দু যদি নির্ধন দরিদ্র হইয়াও, উদরান্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াও, তাঁহার প্রাণের

প্রাণ—হৃদয়ের ধন—প্রাণবল্লভের সাক্ষাৎ পান, তাহা হইলেই তিনি আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। আর, তাই বুঝি, পুরাতন ঋষিগণ রাজৈশ্বর্য্য তৃণবৎ ত্যাগ করিয়া বনবাসে জীবন যাপন করিতেন; তাই বুঝি, বিশ্ববিজয়ী সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণের মন্ত্রদাতা হইয়াও বশিষ্ঠদেব তৃণকুটীরে বাস করিয়া শাকান্ন-ভক্ষণে জীবন-যাপন করিয়াছিলেন! তাই বলি ভাই! তোমার উন্নতি-অবনতি, সুশিক্ষা-কুশিক্ষা ঈশ্বর লইয়া। কিন্তু হিন্দুজাতির উন্নতি বিজ্ঞান-শিক্ষায় হইবে না; ভাষাশিক্ষায় হইবে না। যদি কোন দিন হিন্দুসন্তান আবার ঈশ্বর-পরায়ণ হইতে পারে—যদি কোন দিন হিন্দু-সন্তান তাহার সমস্ত জ্ঞান, শক্তি একমাত্র ঈশ্বর সমর্পণ করিতে পারে, তবেই বুঝিব, সেই দিন হিন্দুর প্রকৃত উন্নতি হইবে। সেদিন আবার হিন্দুসন্তান একপ্রাণে সমস্বরে মিলিত হইয়া প্রার্থনা করিবে,—

"যা প্রীতি রবিবেকানাং বিষয়েষনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥"

হে দয়াময়! বিবেক-জ্ঞানশূন্য সংসারী লোকের স্ত্রীপুত্রাদি ধনাদির উপর যেরূপ অপরিসীম অনুরাগ, তোমাকে অনুস্মরণ করিতে আমাদের চিত্তে সেইরূপ প্রীতি দৃঢ়-সংবদ্ধ হউক। হে প্রাণবল্লভ! আমরা ধন চাই না; মান চাই না; বিষয়বৈভব কিছুই চাই না; চাই কেবল, যেন তোমার চরণ দু'খানিতে আমাদের চিত্ত নিরন্তর অনুরক্ত হয়। যে দিন সকল হিন্দুসন্তান এইরূপ অকপটে সরলান্তঃকরণে প্রার্থনা করিবে, সেই দিন আবার ভারতে হিন্দুজাতির চরম উন্নতি সাধিত হইবে; সেই দিন আবার হিন্দুজাতি পূর্ব্ব-পুরুষগণের গৌরব-লাভে সমর্থ হইবে। কিন্তু তাহা কি সম্ভব? সকলই দয়াময়ের ইচ্ছা।

কলিকাতার

দ্বিপ্রহরের জুয়াচুরী।

১। ভিক্ষুকের টাকা-গাঁথান।

বেলা দশটা বাজিয়া গিয়াছে। গৃহস্থ-বাটীর কর্ত্তা ও অন্যান্য পুরুষ-পরিবার স্ব স্ব কার্য্যস্থানে গমন করিয়াছেন; বালকেরাও বিদ্যালয়ে গিয়াছে। এমন সময়ে বাটীতে এক-জন ভিক্ষুক আসিয়া উপস্থিত। ভিক্ষুকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, কথাবার্ত্তা, মলিন বেশ ইত্যাদি দেখিলে ও শুনিলে সকলেরই মনে স্বতঃই দয়ার উদ্রেক হইয়া থাকে। ভিতর বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুক ধীরে ধীরে কাতর স্বরে ভিক্ষা প্রার্থনা করিল। গৃহস্থ-গৃহিণী মুষ্টি ভিক্ষা আনিয়া ভিক্ষার্থীর ভিক্ষা-পাত্রে দিয়া, পুনরাবৃত্ত হইতেছেন; এমন সময়ে দীনকণ্ঠে ধীরস্বরে অনুগ্রহোত্তেজক বাক্যে দরিদ্র বলিল,—"মা ঠাকুরুণ! যদি দয়া ক'রে শোনেন, ত একটা কথা বলি।" মা ঠাকুরাণী বলিলেন, —"কি?" ভিখারী আবার বলিল,—"গিন্নি মা! আমাকে আপ্‌নি যেমন ভাল বাসেন্, এমন আর কেউ নয়। (এস্থলে বলা বাহুল্য, এই ব্যক্তি ইতি-পূর্ব্বে আরো দুই একবার আসিয়াছিল)। আজ আপনার কাছে এমন কিছু চাই না; পয়সা-কড়িও ভিক্ষা চাই না। তবে জিজ্ঞাসা করি কি, আপনাদের টাকা ভাঙ্গাইবার দরকার আছে?" গিন্নি উত্তর করিলেন,—"কেন? তোর তাতে দর-কার কি?" উত্তরে ভিক্ষুক বলিল,—"মা! বল্‌বো কি, আজ পরমেশ্বর আমার উপর বড় সদয় হয়েছেন; এই বেলার মধ্যে জন কতক বাবু আমাকে দেখে কতকগুলি পয়সা দিয়েছেন। কিন্তু আমি সে দিন ব্যায়ারাম থেকে উঠেছি ব'লে সেই পয়সার ভার নিয়ে ঘুর্‌তে পাচ্ছি না। যদি দয়া ক'রে পয়সাগুলি নিয়ে আমাকে একটা টাকা দেন, তবে আর কষ্ট সইতে হয় না।" গৃহকর্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কত পয়সা আছে?" হর্ষ-গদ্‌গদ্‌স্বরে ভিক্ষার্থী বলিল,—"আজ্ঞে মা, আমি গুণ্‌তে জানি না; এই পয়সা-গুলি নেন, আমাকে একটা টাকা দেন।"

গৃহিণী ভাবিলেন,—সেই ত টাকা ভাঙ্গা-ইতে হয়, না হয় এই ভিখিরির কাছ্ থেকেই ভাঙ্গান হ'ল! ও একই কথা! ভাবিয়াই বলি-লেন,—"কৈ দে, কত পয়সা আছে, দেখি!" বলা বাহুল্য, ভিক্ষুকের কল্পিত কাতর বাক্যে গৃহি-ণীর মন টলিয়াছিল; তিনি বিশ্বাস করিয়া-ছিলেন, গরিব বুঝি, বা গুণিতে জানেই না। যাইহোক, ভিক্ষুক অঞ্চল হইতে কতকগুলি পয়সা গৃহিণীর হস্তে দিল; তিনি সম্মুখস্থ গৃহের রোয়াকে ফেলিয়া তাহা গণনা করিতে লাগিলেন। গণনা শেষ হইলে বলিলেন,—"এতে এক টাকার ওপরও পাঁচ পয়সা বেশী আছে। এই পাঁচ পয়সা তুমি নেও। আমি টাকা দিচ্চি।" এই বলিয়া ভিক্ষুকের হস্তে পাঁচ পয়সা ফিরাইয়া দিতে গেলেন। ভিক্ষুক অতি কৃতজ্ঞ, কোমল স্বরে বলিল,—"মা ঠাকুরুণ! আমি গুণ্‌তে জানি না। আমি আর পয়সা ফিরাইয়া চাই না, আপনি যা আছে সবই নিন। আমাকে একটী টাকা দেন।" গৃহকর্ত্রী বলিলেন—" আমি জেনে শুনে অন্যায় ক'রে পয়সা বেশী নিব না। পয়সা ফিরিয়া না নেও, আমি কিছুই নিতে চাই না।" ভিক্ষুক অগত্যা পয়সা ফিরাইয়া লইল। মা ঠাকুরাণী আসিয়া তাহার হস্তে একটী টাকা দিয়া বলিলেন,—"দেখিয়া লও।" ভিখারী বলিল,—"আপনাদের টাকা আর কি দেখ্‌বো; ও ভাল আছে।" গিন্নি বলিলেন,—"না, না, সে কথা ভাল নয়; তুমি টাকা বাজাইয়া নেও।" ভিক্ষুক বলিল,—"না মা, আমার এত অবিশ্বাস নাই।" গৃহিণী পীড়াপীড়ি করিয়া টাকা দেখিয়া লইতে বলিলেন। ইত্যবসরে ভিক্ষুকের হস্ত হইতে হঠাৎ টাকাটী ভূমিতে পড়িয়া গেল। গৃহিণী এইবার বলিলেন,—"এই

বারে ভুঁয়ে ফেলে বাজাও।" ভূমিতে পড়িবার সময়েই টাকার বাজ্‌না ভাল নয়, ভিখারী বুঝিতে পারিল; বলিল,—"মা ঠাকুরুণ! টাকার আওয়াজটা কেমন লাগ্‌চে!" এই বলিয়া ভূমির উপর টাকার আবার শব্দ করিল। টাকাটী যে ভাঙ্গা সকলেই বুঝিলেন। ইতিপূর্ব্বে অঙ্গনের উপর মধ্যস্থলে গৃহিণীর বয়স্থা বধূ ও কন্যা এবং গুটি কয়েক বালিকা আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কন্যা বলিল,—"আমাদের ত কখনও ভাঙ্গা কমি টাকা আসে না! বাবা কোম্পানির আফিসে কর্ম্ম করেন; সেখানে ভাঙ্গা টাকা হয় না।" ভিক্ষুক বলিল,—"কি জানি মা! এটা যেন ভাঙ্গা বোধ হয়। যা হয়, করুন। আমি আর কি বোল্‌বো!" কন্যা বলিল,—"ঐ টাকা নিতে হয়, নেও; ও টাকা ফিরিয়া নেব না।" গৃহিণী বলিলেন,—"আহা! গরিব লোক, লোক্‌সান সইবে কেন? দে, একটা ভাল টাকা এনে দে।" কন্যা বলিল, "আমি কখনই তা দেব না।" কন্যা-মাতার এই বিবাদ দেখিয়া ভিক্ষুক বলিল,—"মা! এত গোলে দরকার নেই; আমার পয়সাগুলি ফেরত দেন; আমি টাকা চাই না।" কন্যার সহিত বচসা করিয়া, পরে গৃহিণী অগত্যা পয়সাই ফিরাইয়া দিলেন। কন্যা ভিক্ষুকের নিকট গিয়া বলিল,—"দেখি, তোর কাছে ভাল টাকা আছে! কাপড় ঝাড়্, থলে ঝাড়্।" ভিক্ষুক কাঁদিতে২ কাপড় ঝাড়িল। ভিক্ষার ঝুলি ছিল না, অলাবু পাত্রের তণ্ডুল উল্টাইয়া দেখাইল, কিন্তু টাকা পাওয়া গেল না। সকলেই অবাক্। কন্যা ক্রুদ্ধ; কিন্তু উপায় কিছুই নাই। ভিক্ষুক চলিয়া গেল। গৃহিণী কন্যাকে ডাকিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন; এবং বলিতে লাগিলেন, যেন কর্ত্তা এ কথা জানিতে না পারেন। পাঠক মহাশয়! বলুন দেখি, এ জুয়াচুরির মূল কোথায়? বলিয়া রাখি, গৃহিণী ভিখারীর হস্তে যে টাকা দিয়াছিলেন, তাহা কিন্তু খাঁটি।

২। বহুরূপী সন্ন্যাসী।

জ্যৈষ্ঠমাস,বেলা দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। মস্তকের উপর মধ্যাহ্ন-সূর্য্য অগ্নিবৃষ্টি করিতেছেন; প্রতপ্ত বায়ু অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ অঙ্গে ঢালিয়া দিতেছে; পথের বালুকা পথিকের পদে অগ্নিশলাকা বিদ্ধ করিতেছে। এই ত্রিতাপের ভয়ে এসময়ে সহরের বিলাসী-লোক প্রায় সকলেই, আপন গৃহের বাহির হন না; নিতান্ত প্রয়োজন ভিন্ন এমন জ্বলন্ত অগ্নিময় সময়ে কেহই পথের পথিক হইতে ইচ্ছা করেন না। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাকে এমন ভয়ানক সময়ে কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে কোন বিশেষ বন্ধুর বাটীতে গমন করিতে হইতেছে। দুই তিনটী গলি অতিক্রম করিলাম; জন-মানব দৃষ্টিপথে পতিত হইল না। বন্ধু যে গলিতে বাস করেন, তাহাতে প্রবেশ করিয়া কিঞ্চিৎ পরেই দেখিলাম, একটী গৈরিক বসন-পরিহিত, আবক্ষ-লম্বিত শ্মশ্রু-গুম্ফ ও শির-পরিবেষ্টিত দীর্ঘ জটা শোভিত, ভস্ম-বিলেপিত অঙ্গ একটী সন্ন্যাসী সেই সুদারুণ রৌদ্র উপেক্ষা করিয়া, একহস্তে এক কাষ্ঠদণ্ড ও অপর হস্তে লৌহের চিম্‌টা ধারণ করিয়া, সেই পথিপার্শ্বস্থ এক বাটী হইতে বহির্গত হইয়া তৎসংলগ্ন অপর বাটীতে প্রবেশ করিল। সেই বাটীর সমক্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম,সন্ন্যাসী হস্তস্থ কাষ্ঠখণ্ড ভূমির উপর স্থাপন করিয়া, তদ্দ্বারা উচ্চ কাষ্ঠাসনের কার্য্য করাইয়া লইতেছে; এবং হিন্দীভাষায় অনুজ্ঞাস্বরে গৃহস্বামিনীর নিকট ভিক্ষা-প্রার্থনা করিতেছে। বাটীর ভিতরের একটী স্ত্রীলোক বলিতেছেন যে, তাঁহাদের আহারাদি হইয়া গিয়াছে, এসময় ভিক্ষা দিতে পারিবেন না। বাড়ীখানি দেখিলে সামান্য গরিব গৃহস্থের বলিয়া জ্ঞান হয়। গরিব স্ত্রীলোকের কথা সন্ন্যাসী গ্রাহ্য না করিয়াই বলিতেছে,—"দে মায়ি! কুচ্ ভিখ্ দে; একঠো পয়সা দে; গরিব ব্রাহ্মণ ভুখা হৈঁ; তেরা পুণ্ হোগা।" কৌতূহল-সত্বেও আমি রৌদ্রের জ্বালায় সে স্থানে ক্ষণমাত্রও তিষ্ঠিতে পারিলাম না। একেবারে বন্ধুর বাটীতে গেলাম।

যখন আমি বন্ধুর বাটীতে উপস্থিত হইলাম, বহির্বাটীর একটি গৃহে বন্ধু তখন একাকী নিদ্রিত আছেন। আমি ধীরে ধীরে একটী দ্বার উন্মোচন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম; কিন্তু আমার পদশব্দে বন্ধু তৎক্ষণাৎ জাগরিত হইলেন। চক্ষু উন্মীলন করিয়াই আমাকে সম্মুখে দেখিলেন; বলিলেন,—"এস ভাই! এই এতক্ষণ তোমার জন্য অপেক্ষা করিয়াই একাকী শয়ন করিবামাত্র এই দারুণ গ্রীষ্মে একটুমাত্র নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছিল। এস ভাই, এই বিছানার উপর বসো।" আমি বন্ধুর কুশল সংবাদ লইলাম। বন্ধুও আমার যথাযথ উত্তর দিয়া ও অপর দুই একটী কথা কহিয়া আমাকে বলিলেন,—"ভাই, একটু অপেক্ষা কর; আমি একবার বাহির হইতে আসি।" বন্ধু একখানি টীকা ধরাইয়া রাখিয়া, বাহিরে গেলেন। আমি একাকী বসিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে তালবৃন্ত বীজন দ্বারা শ্রম-শান্তি করিতে লাগিলাম।

বন্ধু গৃহ হইতে বাহির হইবার পরই শুনিলাম, তিনি যেন কাহারও সহিত কি কথা কহিতেছেন। হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে—"পাহারাওয়ালা," "পাহারাওয়ালা"—এই শব্দ দুইবার শুনিতে পাইলাম; এবং এই স্বর আমার বন্ধুর বলিয়া জানিলাম। তখন শশব্যস্তে বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, আমার বন্ধুর বামহস্তে রাশীকৃত কেশ-গুচ্ছ; এবং তিনি দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ত্বৎ-পদ-লুণ্ঠিত কোন ব্যক্তিকে উত্তোলন করিতেছেন। ঘটনা দেখিয়া আমি কিছুই অবধারণ করিতে পারিলাম না; স্তম্ভিত হওয়াতে মুখ হইতে কোন বাক্যও সরিল না। এমন সময়ে সেই চরণ-পতিত, তৈলাভাবে শুষ্ক খড়িময়-গাত্র ব্যক্তির কুক্ষিদেশ হইতে একটী ঘটী ভূমিতে পড়িয়া গেল। বন্ধু তাহার

হস্ত ধরিয়া তুলিলেন। সামান্য একখণ্ড গৈরিক বর্ণের বস্ত্র-পরিহিত সেই ব্যক্তি, বাঙ্গালা ভাষায় যত কাতরতা প্রকাশ করিতে পারে, করিতেছে; আর বলিতেছে,—"মহাশয়! মাপ করুন।" আমি বিস্মিত হইয়া ঘটনা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বন্ধুর পার্শ্বে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি? ব্যাপারখানা কি?"

অমনি আমার বন্ধুকে ছাড়িয়া সেই ব্যক্তি আমার পা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল; বলিল,—"মহাশয়! মাপ করুন। আমি সামান্য ভিখারী; আমায় ছাড়িয়া দেন।" আমি বলিলাম,—"কি হইয়াছে? তুমি এত কাতরতা প্রকাশ করিতেছ কেন? আমি বলিতেছি, তোমার কোন ভয় নাই; পা ছাড়। কি হইয়াছে, বল।" বন্ধু আমার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—"ভাই! একবার ধর তো! উহাকে ছাড়িও না। ও জুয়াচোর, ঠক, প্রবঞ্চক। উহাকে পুলিসে দিতে হইবে।" এই বলিয়া হস্তস্থিত কেশগুচ্ছ পার্শ্বস্থ রোয়াকে রাখিয়া বাহিরে প্রস্রাব করিতে গেলেন। সেই ব্যক্তি অতি কাতরতা-সহকারে আমায় বলিল,—"মহাশয়! ভিক্ষা করিয়া আমি খাই। আমি বহুরূপী সাজিয়া ভিক্ষা করি। ঐ বাবু আমার কৃত্রিম গোঁপ-দাড়ি কাড়িয়া লইয়াছেন। অনুগ্রহ ক'রে আমাকে ফিরাইয়া দিন।" বন্ধু ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন,—"বেটা সন্ন্যাসী সেজে এই দুপুর রোদে ভিক্ষা ক'র্ত্তে বেরিয়েছে। বেটার চুরির মতলব আর কি! এতক্ষণ হিন্দী কথায় কেমন বিশ্বাস জন্মাইতেছিল। তামাসা ক'রে যেমন দাড়ি ধরিয়া টানিয়াছি, আর বেটার ভণ্ডামি সব বেরিয়ে গেছে। অমনি ব্যাটা বাঙ্গালী ভিক্ষুক হয়েছে। ঐ দেখ, পরচুল, দাড়ী ও জটা রয়েছে। বেটাকে এবার ছেড়ে দিলাম। কিন্তু বেটা! যদি এ মুখো আবার হও, তবে জেলে দিব।" এই বলিয়া তিনি তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। সে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

তখন, পূর্ব্ব-দৃষ্ট সন্ন্যাসীর কথা আমার মনে পড়িল। বন্ধুকে তাহা বলিতে লাগিলাম। এমন সময়ে, একটী গরিব স্ত্রীলোক আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল,—"একজন সন্ন্যাসী এখানে এসেছিল? সে আমার ঘটী চুরি করিয়া আনিয়াছে।" কথা শুনিয়াই, সন্ন্যাসীর কুক্ষি হইতে ঘটী পড়ার কথা মনে হইল; আমরা দৌড়িয়া গিয়া পথে তাহার অনুসন্ধান করিলাম। কিন্তু, সন্ন্যাসী ততক্ষণ সহর ছাড়াইয়া গিয়াছিল।

মুসে মণ্টুক্লা।

গত বৎসর আমরা ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ গণিতবিদ্ ভাস্করাচার্য্যের জীবনী-সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা উপহার দিয়াছি। এবার ফরাসী দেশীয় প্রসিদ্ধ গণিতবিদ্ মুসে মণ্টুক্লার (Mr. Montucla) জীবনী-সম্বন্ধে দুই একটি কথা পাঠকবর্গকে উপহার দিব।

ইহাঁর সম্পূর্ণ নাম জন ষ্টিফেন মণ্টুক্লা। ইতি খ্রী ১৭২৫ অব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর লিয়ন্‌স নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা পোদ্দারি কাজ করিতেন; এবং পুত্রকেও সেই কার্য্য শিক্ষা দেওয়াই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। সেইজন্য ইহাঁকে অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। ইহাঁরও অঙ্কশাস্ত্রে অত্যধিক আসক্তি ছিল। লিয়ন্সের জেসুটদিগের কালেজে ইনি গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা ও অঙ্কশাস্ত্র বিশেষরূপে অধ্যয়ন করেন; এবং নিজের চেষ্টায় ইতালীয়, জর্ম্মন, ডচ্ ও ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করেন। এই সকল ভাষায় ইহাঁর এরূপ বুৎপত্তি ছিল যে, ইনি ঐ সকল ভাষায় সুন্দররূপে লিখিতে ও কথা কহিতে পারিতেন।

ষোড়শবর্ষ বয়সের সময় ইহাঁর পিতৃবিয়োগ

হয়। তৎপরে পিতামহীর তত্ত্বাবধানে ইহাঁর লেখা-পড়া চলিয়াছিল; কিন্তু তিনিও আর চারি বৎসর পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। যাহা হউক, তাহাতেও ইহাঁর বিদ্যা-শিক্ষার চেষ্টার হ্রাস হয় নাই। ইনি লিয়ন্সে পাঠ সমাপ্ত করিয়া, টুলোতে আইন শিক্ষা করিতে গমন করেন।

তথা হইতে ইনি পারিস্ নগরে গিয়া তথাকার পুস্তকালয় প্রভৃতিতে পরিভ্রমণ করিয়া আপনার জ্ঞান বর্দ্ধিত করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় দিদিরো (Diderot), দালেম্বার্ট (Dolembert), ব্লন্ডেল (Blondel) প্রভৃতির সহিত ইহাঁর পরিচয় হয়। তাঁহাদের অনেকেই ইহাঁর সহিত বন্ধুতা করেন।

এই সময়ে অঙ্ক ও দর্শন-শাস্ত্র আলোচনায় ইহাঁর অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হইত। অবসর-সময়ে, ইনি মুসে ওজানম (Mr. Ozanam) প্রণীত 'ম্যাথেম্যাটিক্যাল রিক্রিয়েসন্স্' নামক গ্রন্থের এক সংস্করণ করেন। ঐ সংস্করণ ওজানমের গ্রন্থ হইতে স্বতন্ত্র বলিলেও অন্যায় হয় না।

এইস্থলে মুসে ওজানমের কিঞ্চিৎ পরিচয় অপ্রাসঙ্গিক হইবেন। জেমস্ ওজানম, য়িহুদি-বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। খ্রী ১৬৪০ অব্দে বলিনুঁ (Boligneux) নামক স্থানে ইহাঁর জন্ম হয়। ইনি ইহাঁর পিতার কনিষ্ঠ সন্তান। পিতার ইচ্ছা ছিল, ইহাঁকে পাদরির কার্য্য শিক্ষা দেন। তদনুসারে ইনি চারি বৎসর কাল তদনুরূপ শিক্ষা লাভ করেন। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর, ইনি অঙ্ক-শাস্ত্রালোচনাতেই জীবন ক্ষেপণ করিয়াছিলেন। কোন শিক্ষকের সাহায্য না লইয়াই ইনি অঙ্কশাস্ত্রে এরূপ বুৎপন্ন হইয়াছিলেন যে, পঞ্চদশবর্ষ বয়ক্রম-কালে, ইনি একখানি অঙ্কশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ণ করিয়াছিলেন। অতি অল্প বয়সেই ইহাঁকে জীবিকার্জ্জনের জন্য লিয়ন্সে গিয়া, অঙ্কশাস্ত্র-শিক্ষাদান কার্য্যে ব্রতী হইতে হইয়াছিল। এই কার্য্যে ইনি বিশেষ যশ লাভ করেন। ইনি অতি দয়ালু-স্বভাব ছিলেন। সেই দয়াই ইহাঁর উন্নতির প্রধান সহায় হয়। ইহাঁর ছাত্র-দিগের মধ্যে দুইজন বিদেশী ছিল। তাহারা পারিসে গমন-সময়ে অর্থাভাব-বশতঃ বড়ই বিপদে পড়ে। ইনি তাহাদিগকে ৫০ পিষ্টোল ধার দিয়াছিলেন। ঐ দুই ব্যক্তি পারিসে উপনীত হইয়া, তত্রস্থ চান্সেলারের পিতা মুসে ডুগুসোকে ইহাঁর এই দয়ার কথা এবং ইহাঁর অঙ্কশাস্ত্র প্রণয়ণের কথা বিশেষ করিয়া বর্ণন করেন। তাহাতে মুসে ডুগুসো ইহাঁকে পারিসে আনাইয়া অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক-রূপে নিযুক্ত করেন। ইনি অনেক উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু দ্যূত-ক্রীড়াদিতে আসক্তি থাকায় প্রথমাবস্থায় কিছুই সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। কিছুকাল পরে বিবাহ করিয়া ইহাঁর চরিত্র শোধিত হয়। সেই সময়ে ইনি অঙ্কশাস্ত্র বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার মধ্যে Treatise of Lines of the first Order and of the Construction of Equations নামক গ্রন্থ ১৬৮৭ অব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। তার পর, খ্রী ১৬৯০ অব্দে সুবৃহৎ Mathematical Dictionary, ১৬৯৩ অব্দে পঞ্চ খণ্ডে সম্পূর্ণ The course of Mathematics, এবং খ্রী ১৬৯৪ অব্দে দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ Mathematical and Philosopical recreations নামক বিখ্যাত গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। ঐ গ্রন্থই আদর্শ করিয়া মুসে মণ্টুক্লা চারিখণ্ডে সম্পূর্ণ Recreations in Mathematics and Natural philosophy গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। ওজানমের ১২টি সন্তান হয়। উহার অধিকাংশই অল্প বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। খ্রী ১৭০৭ অব্দে পত্নীর মৃত্যু হওয়াতে, ইনি শেষ অবস্থায় বড়ই অসুখে জীবন যাপন করেন। ১৭১৭ অব্দের ৩রা এপ্রেল ইহাঁর মৃত্যু হয়।

ওজানমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি মণ্টুক্লার হস্তে নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। সহৃদয় মণ্টুক্লা না বলিয়া দিলে, তাঁহার গ্রন্থ যে ওজানমের গ্রন্থের সংস্করণ তাহা বুঝিবার সাধ্য নাই। আমাদের দেশের গ্রন্থকার হইলে, মণ্টুক্লার হস্তে ওজানমের অস্তিত্বও লোপ পাইত। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া, ওজানমের নাম রক্ষা করিয়া গিয়াছেন—বরং প্রথম প্রথম এই গ্রন্থে নিজ-নামও দেন নাই। ঐ গ্রন্থের দুই একটি স্থান আমরা ইংরাজী অনুবাদ হইতে সঙ্কলিত করিয়া বারান্তরে দিতে চেষ্টা করিব।

মণ্টুক্লার অধিকাংশ গ্রন্থই বিনা নামে প্রকাশিত হয়। তাঁহার গ্রন্থগুলির মধ্যে History of Researches relating to the Qwadrature of the circle গ্রন্থই সর্ব্ব-প্রধান। উহা খ্রী ১৭৫৪ অব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। খ্রী ১৭৫৮ অব্দে তৎপ্রণীত History of Mathematics নামক সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ প্রকাশ কালে তাঁহার ৩৩ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম ছিল। ইহাতেই তাঁহার নাম দিগন্ত ব্যাপিত হয়। নানবিধ কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় ঐ গ্রন্থ নিঃশেষিত হইলেও বহুদিন তিনি উহার পুনঃ-সংস্করণ করিতে পারেন নাই।

সুবিদিত ফরাসী বিদ্রোহ-সময়ে তাঁহার কর্ম্ম ও ধন নষ্ট হয়। সেই সময়ে তিনি অন্য কর্ম্মাভাবে ঐ গ্রন্থ পুনসংস্কৃত করিয়া দ্বিগুণ আকারে প্রকাশিত করেন। খ্রী ১৭৫৫ অব্দে তাঁহাকে বার্লিন একাডেমির মেম্বর করা হয়। খ্রী ১৭৬১ অব্দে মেরিয়া ফ্রান্সে রোমণ্ডের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

খ্রী ১৭৬৩ অব্দে তিনি কেয়িনি প্রদেশের উপনিবাসের সেক্রেটার ও এঞ্জিনমার রয়েল হইয়া তথায় গমন করেন। সেই স্থানে গমন ও তথায় অবস্থান-সময়ে তিনি অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেন।

মণ্টুক্লা অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন প্রসিদ্ধ গণিতশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। ১৭৯৯ অব্দের ১৮ই ডিসেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মনও খুব উন্নত ছিল। ফল কথা, মনুষ্যের যে সকল সদ্‌গুণ থাকা উচিত, তাহার অধিকাংশই তাঁহাতে বর্ত্তমান ছিল।

আমরা এই স্থানেই তাঁহার জীবনী সমাপ্ত করিলাম। বারান্তরে তাঁহার Recreations নামক গ্রন্থ হইতে গুটিকতক 'গণিত-রহস্য' দিবার ইচ্ছা রহিল।

ঘর-বিভীষণ।

প্রথম দৃশ্য।

"আপনি তবে প্রস্তুত আছেন!"

"তা বটে; কিন্তু—"

"কিন্তু অবার কি; আপনার বিষয় সম্পূর্ণ বিবেচনা হ'বে!"

"তা'র নিদর্শন কি!"

"জানেন, আমরা ব্রিটিশ-জাতি। আমাদের পেটে একখান, মুখে একখান নাই। আপনি আমাদের সহিত ব্যবহার করেন নাই, তাই সঙ্কোচিত হচ্ছেন। কিন্তু দেখিলে, আপনার সকল ভ্রম দূর হইবে।"

"আচ্ছা, কি স্থির হইয়াছে? রাজ্য হইতে রাজার উচ্ছেদ করিতে পারিলে, আমাকেই তো রাজ-সিংহাসনে স্থাপিত করা হইবে? সেই অলোক-সামান্যা রাজমহিষীকে, আমাকেই তো দেওয়া হইবে? না, আপনাদের অন্য কোন অভিসন্ধি আছে?"

"ছি—বলেন কি! আমরা কাফের নহি। আমাদের যে কথা, সেই কাজ! যাহা বলিয়াছি, তাহার কি আর ব্যত্যয় হয়! আপনি নিশ্চিতই ইংরাজের মিত্র-রাজা-রূপে, রাজমহিষী পর্য্যন্তও লাভ করিয়া, সুখে কাল কাটাইতে পারিবেন। এখন তো আপনি রাজার চাকর-

মাত্র। কিন্তু অতঃপর আপনিই নিশ্চিত সর্ব্বেসর্ব্বা হইবেন।"

কুনাই-রাজ্যের একটী সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া, রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়, একজন ইংরাজ-প্রতিনিধির সহিত কুনাই-রাজ-মন্ত্রীর এইরূপ কথা-বার্ত্তা হইতেছে। মন্ত্রী মহাশয়ের ইচ্ছা, কৌশলে ইংরাজকে উপলক্ষ-মাত্র করিয়া, তিনি রাজ্য ও রাজমহিষীকে হস্তগত করেন। তাই আজ সেই কথার শেষ মীমাংসার জন্য, তাঁহার বাটীতে ইংরাজ-প্রতিনিধিকে নিভৃতে আনয়ণ করিয়াছেন। কুনাই-রাজ যদিও তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় দেখেন; অপুত্রক বৃদ্ধ রাজা যদিও আর দিনকতক পরে রাজ্যভার সমস্ত তাঁহাকেই অর্পণ করিয়া অন্তিমে কাশীবাসী হইবেন, স্থির করিয়াছেন; তথাপি মন্ত্রীর আর বিলম্ব সহিতেছে না। বিশেষ, রাজমহিষীর লাভ-লালসায়! রাজমহিষী পরমা সুন্দরী—তাঁহার রূপরাশি দিগ্‌বিভাসিত। উচ্ছৃঙ্খল মন্ত্রী এখন কেবল সেই জননী-সদৃশা মহারাণীর কল্পনাতেই উন্মত্ত। রাজা কাশীবাসী হইলে, যদিও রাজ্য পাইবার আশ্বাস তাঁহার আছে; কিন্তু রাণীকে পাওয়া বড়ই দুরুহ। বিশেষ, রাজ্য পাওয়া —সেও দেরিতে! 'যাই, যাই' করিয়া রাজার যাইতে বিলম্ব হইতে পারে! তদ্ভিন্ন, রাজমহিষীকেই বা কি প্রকারে অঙ্কশায়িণী করিবেন? অন্য সব হওয়াও সম্ভব; কিন্তু তাহা কি প্রকারে হয়! রাজমহিষী তাহাহইলে, নিশ্চিতই যে রাজার সঙ্গিনী হইবেন, তাহার আর সংশয় কি? সুতরাং কিছুদিন ধরিয়া ক্রমাগত সাত পাঁচ ভাবিয়া, অবশেষে মন্ত্রী এই এক নূতন উপায় স্থির করিয়াছেন। ইংরাজকে উপলক্ষ-মাত্র দাঁড় করাইয়া, নৃপতিকে প্রথমতঃ হত্যা করা, তাঁহার বাসনা। তারপর, ইংরাজ যেন তাঁহাকেই তৎপদে অভিষিক্ত, ও রাজমহিষীকে তাঁহারই হস্তে অর্পণ করিতেছেন, এই কথা সাধারণ বুঝে, এইরূপই ষড়যন্ত্র। সেই লালসাতেই আজ এইরূপ ক বার্ত্তা চলিতেছে।

যাহাহোক, ক্রমে কথা-বার্ত্তা স্থির হইল মন্ত্রী স্থির করিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা, আ সেইরূপই বন্দোবস্ত করিতেছি। কেহই আ নাদের বিপক্ষে অস্ত্র ধরিবে না। সৈন্য-সাম রাজ্যের সকলই আমার হাতে—আমি সক কেই বারণ করিয়া দিতেছি। যদি প্রস্ত থাকেন, তবে আপনারা অনায়াসে আজ রাত্রে আসিয়া, যেরূপে হউক, রাজ্য প্রথমতঃ অধি কার করুন। তা'র পর, আমার বিষয় বিবে চনা করিবেন।"

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দেখিতে দেখিতে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কার্য্যেও তাহাই ঘটিল। হঠাৎ আসিয়া ইংরাজ-সৈন্য নগরে প্রবেশ করিয়া রাজধানী আক্রমণ করিল। রাজা নিদ্রিত ছিলেন—বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানিতে পারিলেন না; তাঁহার এত সৈন্য-সামন্ত—মন্ত্রীর-চক্রে, কার্য্যকালে সকলেই সরিয়া দাঁড়াইল। তখন ধীরে ধীরে মন্ত্রীর সঙ্গে কএকজন সৈন্য রাজার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল। রাজা যে কক্ষে শয়ন করিয়াছিলেন, সৈন্যগণ ক্রমে যাই সেইস্থানে উপনীত হইল। রাজরাণী সময় পার্শ্বস্থ অপর একটী ঘরে নিদ্রিত ছিলেন। সৈন্যগণের পদশব্দে রাজার হঠা নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল; তিনি ভীতিবিহ্বলে চমকি হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা কে?"

সে উত্তর কিন্তু আর পাইলেন না। হতভাগ্য মন্ত্রীর আদেশে, তৎক্ষণাৎ রাজার গলদেশে তরবারির আঘাত পড়িল। তি যেরূপ নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে আবার তাহারই আশ্রয় লইতে হইল। তি বুঝিলেন না বা জানিলেন না যে, কি অপরা বা কি পাপে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল। বিশ্বাস ঘাতক যেরূপে তাঁহার সর্ব্বনাশ করি

তাহা আসন্ন-কালেও তিনি অনুভব করিতে পারিলেন না।

ইহার পরেই, মন্ত্রীর সেই চির-আকাঙ্ক্ষিত রাজরাণী-লাভে লালসা জন্মিল। তিনি তাড়াতাড়ি স্বয়ংই, সোৎসাহে অপর কক্ষে প্রবেশ করিতে ছুটিলেন। ভাবিলেন, বুঝি বা তাঁহার এতদিনের আশা মিটিল।

এতক্ষণের নিস্তব্ধ কোলাহলে রাণীরও নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছিল। কি জানি, মনে কি আশঙ্কা করিয়া, গৃহ হইতে তিনি স্বামীর নিকট আসিতেছিলেন। এমন সময় পাপিষ্ঠ মন্ত্রী তাঁহাকে আক্রমণ করিতে হস্ত প্রসারণ করিলেন; বলিলেন;—"রাণি—রাণি! এখন তুমি আমারই। রাজাকে মারিয়াছি; আইস তুমি, এখন আমার রাণী হইবে। এস—এস—কোল জুড়াই।"

রাণী তখন সকলেই বুঝিলেন। কোলাহলের কারণ তখন আর তাঁহার জানিতে বাকী রহিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর সম্মুখীন হইতে হইতেই, দূর হইতে তিনি দেখিলেন,—তাঁহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে—স্বামী জীবিত নাই। দেখিয়া, তাঁহার বক্ষ ফাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে হতভাগ্য মন্ত্রী আবার তাঁহাকে আক্রমণ করিতে গেলেন।

সুতরাং, অভাগিনী অনন্যোপায় হইয়া, উপরের বারান্দার দিকে ছুটিলেন। মন্ত্রী ও তাঁহার অনুচরগণ, যতই তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন, ততই তিনি আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু আর রক্ষা হয় না—দুর্বৃত্ত তাঁহাকে ধরে ধরে! এই দেখিয়া, মহারাণী শেষে প্রাণের আশায় হতাশ হইলেন। "ছুঁয়ো না—ছুঁয়ো না" বলিতে বলিতে, বারান্দা হইতে তিনি লম্ফ প্রদান করিলেন। তখন, হতভাগ্য মন্ত্রী হতাশ হইয়া তাহা দেখিলেন মাত্র; কিন্তু আর কিছুই করিতে পারিলেন না। নিম্নে পুণ্যতোয়া ভাগীরথী প্রবাহিত হইতেছিলেন। মহারাণী লম্ফ প্রদান করিলেই, তিনি যেন সেই ক্রোড়ে স্থান দিলেন। হতভাগ্যগণ আর দেখিতে বা জানিতে পারিল না যে, রাণীর কি হইল। জল-স্রোতে তাঁহার জীবন-স্রোতে মিশিয়া গেল। কুনাই যেন একেবারে ভস্মস্তূপে পরিণত হইল।

তৃতীয় দৃশ্য।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই, ইংরাজ-সেনাপতি আসিয়া সেই রাজবর্ত্মে উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই, গম্ভীর স্বরে তিনি আদেশ করিলেন,—"বাঁধ রাজ-মন্ত্রীকে।"

"সে কি? বলেন কি!"—উত্তরে মন্ত্রী এইরূপ বিস্ময়-ভাব প্রকাশ করিলেও, তখন কিন্তু তাহা আর শুনে কে? সেনাপতির আদেশে তাঁহাকে অতঃপর বাঁধিয়া, ইংরাজ-শিবির-অভিমুখে লইয়া যাওয়া হইল। তদ্ভিন্ন, রাজ-সম্বন্ধীয় আরও যে সকল লোকজন ছিল, তাহাদের সকলকেও ঐরূপে আবদ্ধ করা হইল। অধিকন্তু যদি বা কেহ কোনরূপ উচ্চবাচ্য করিতে গেলেন, তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহার মস্তক-চ্ছেদনের আদেশ হইল।

শিবিরে পৌঁছিয়া, মন্ত্রী আবার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—"সেনাপতি মহাশয়, আমার প্রতি এরূপ নির্য্যাতন কেন? আমা হইতেই আপনাদের সব। তবে আমার এ প্রহার কেন? আমার বিষয় আপনাদের কি কিছুই মনে নাই?"

উত্তরে ইংরাজ-সেনাপতি বলিলেন,—"মনে আছে বটে! জানি বটে, তুমি বিশ্বাসঘাতক—তুমি প্রবঞ্চক। মনে বেশই আছে যে, যিনি তোমাকে পুত্রস্বরূপ পালন করিয়াছিলেন; যাঁহার অন্নে তুমি আজিও জীবিত; তাঁহারই রক্তপান করিতে তুমি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হও নাই। যিনি তোমার পিতৃস্বরূপ, তাঁহার হত্যার কারণ তুমি; যিনি তোমার জননীস্বরূপা, তাঁহার প্রতি, বল দেখি, তুমি কি কদা-

চারই না করিয়াছ ? যে দুবৃত্ত, যে নরাধম পিতা-মাতার সহিতও, এতদূর বিশ্বাস-ঘাতকের মত ব্যবহার করিতে পারে ; তুমিই বল দেখি, তাহাকে আমরাই বা কোন্ প্রাণে বিশ্বাস করিব ? ধিক্ তোমায়, যে, তুমি আবারও ঐ কথা মুখে আনিতেছ। তোমায় বিশ্বাস কি যে, তুমি আমাদিগকেও এইরূপে বিপদস্থ করিবার প্রয়াস পাইবে না! তোমায় রাজ্যধন দেওয়া তো দূরের কথা, তোমার প্রতি আমাদের এতদূর ঘৃণা হইয়াছে যে, তোমায় দেখিলেও যেন পাপ হয়। তুমি কি-ই না করিয়াছ, ভাব দেখি! ধিক!—ধিক তোমাকে! তোমার পাপময় জীবন, সেই জন্যই, যত শীঘ্র লোপ পায়, তাই এখন আমাদের বাসনা। তোমার পরিণামে জগৎকে আমাদের দেখাইতে বাসনা যে, বিশ্বাসঘাতকের এই-ই পরিণাম!"

এই বলিয়া সেনাপতি নীরব হইলেন ; এবং তাহার পরই মন্ত্রীকে বাঁধিয়া, সেদিনের মত কারাগারে প্রেরণ করা হইল।

কর্ত্তব্য-নির্ণয়।

কত পাতক করিয়াছি। প্রকৃতি বিকৃত হইয়া গিয়াছে। প্রবৃত্তি উচ্ছৃঙ্খল। উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি যাহা বলিয়াছে, তাহাই করিয়াছি। কখনও সদসৎ বিচার করি নাই। পাপ-পুণ্য কখনও চিন্তা করি নাই—প্রবৃত্তি যে পথ দেখাইয়াছে, সেই পথেই গিয়াছি। কখনও প্রবৃত্তি দমন করিবার প্রয়াস পাই নাই। কেহ উপদেশ দিলে, তাঁহার অবমাননা করিয়াছি। এখন, আর কি এই পূর্ণ বিকৃত প্রকৃতি সংস্কৃত করিবার উপায় আছে! অনুতাপে হৃদয় পূর্ণ। আমার মত দুঃখী কে ? আর কি আমার সদ্গতি হইতে পারে ?

তাপই পাপ। অনুতাপ পাপ সূচনা করে। অনেক সময় অনুতাপের বহিশ্চিহ্ন অশ্রুজল। দুঃখেই চক্ষে জল আইসে।

দুঃখ দ্বিবিধ ; শারীরিক ও মানসিক। পাঁচ ঘা বেত লাগাইলে একটি বালক কাঁদিবে। কিন্তু তোমাকে একটি কথা জোর করিয়া বলে এমন সাধ্য কাহারও নাই। তোমার শত সহস্র দাসদাসী ; তোমার প্রতাপে লোক সদা সশঙ্কিত। অভাব কি বস্তু, তুমি জান না। তথাপি তোমার চক্ষে জল ? কেহ ত কোথাও নাই ; তুমি সুসজ্জিত গৃহে, দুগ্ধফেনসন্নিভ শয্যায় শয়ন করিয়া, একদৃষ্টে কাহাকে লক্ষ্য করিতেছ! তোমায় কি কেহ আঘাত করিতেছে ? এত কাঁদিতেছ কেন ? কে তোমায় তিরস্কার করিতেছে ?

যাহার তিরস্কারে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয় ; যাহার আঘাত প্রবল বেত্রাঘাত হইতেও কোটিগুণে যন্ত্রণাদায়ক ; মনেই যে আঘাতের চিহ্ন দৃষ্ট হয়—শরীরে যাহার আঘাত হয় না ; যে পদার্থ মানব-প্রকৃতির অন্তস্তলে বসিয়া তোমায় কাঁদাইয়া থাকে ; মানবপ্রকৃতির সে অংশটুকু কি ? তাহার এতাদৃশ ক্ষমতা-সত্বেও, প্রবৃত্তি কিরূপে প্রবল হয়, কিরূপে তাহার আজ্ঞা অবহেলা করে ?

মা যেমন বয়োপ্রাপ্ত সন্তানকে সুখের উপদেশ দেন ; বলেন,—ও পথে যাইওনা, তোমার অনিষ্ট হইবে,—অথচ কখনও বল প্রকাশ করেন না ; সেইরূপ আমাদের জননীস্বরূপা মানব-প্রকৃতি-মধ্যগতা এই সদ্বৃত্তি আমাদিগকে নিয়ত উপদেশ দিতেছে ; নিয়ত সাবধান করিয়া দিতেছে। আমরা কিন্তু তাহা শুনিয়াও শুনি না ; উন্মত্ত হইয়া, পয়োমুখ বিষকুম্ভ-সদৃশ প্রবৃত্তিকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করি। যখন নানা প্রকারে প্রতারিত হইয়া পয়োমুখ বন্ধুর প্রকৃত স্বভাব জানিতে পারি, তখন আমাদের পূর্ব্ব বন্ধুর কথা মনে পড়ে। তিনি মাতার ন্যায় স্নেহময়ী। কাঁদিতে কাঁদিতে যখন ফিরিয়া দাঁড়াই, তখনও তাঁহার কথা শুনিতে পাই।

এই অবস্থায় অনুতাপ! যদি প্রথম হইতে কান পাতিয়া শুনিতাম, তবে আমার এ দুঃখ —এ অশ্রুজল কেন আসিত ?

মানবজাতির অবিশ্রান্ত অশ্রুজল, অবিশ্রান্ত অনুতাপ-সূচনা করিতেছে। দুঃখ বা অনুতাপ পাপের ফল। মানব-প্রকৃতি-গত বিবাদ হইতে এই দুঃখ, এই পাপ সমুদ্ভূত। এই সদসৎ প্রবৃত্তির বিবাদের মূল কি, ইহা অনুসন্ধান না করিলে বিবাদ-দমনের পন্থা স্থির হইবে না।

এই দুই প্রকার বৃত্তির স্বরূপ ও সম্বন্ধ নির্ণয় করিলে, আমরা প্রকৃতিগত বিবাদের মূল নির্ণয় করিতে সমর্থ হইব। মূল নির্ণয় করিলে বুঝিতে পারিব, কি উপায়ে মনুষ্য এই বিবাদের মূলোচ্ছেদ করিতে সমর্থ হইবে।

যাঁহার হৃদয়ের এই বিবাদ অন্তর্হৃত হইয়াছে, তিনিই পূর্ণ মনুষ্য। তিনিই ত্রিতাপাতিত।

পূর্ণ মনুষ্য আছে কি না, জানি না। কিন্তু এই পূর্ণতার পথে মনুষ্য গমন করে, ইহাই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য।

গণিত-শাস্ত্রে বলে,—বৃত্ত-মধ্যগত বহুভুজ ক্ষেত্রের ভুজ-সংখ্যা যতই বৃদ্ধি করা যায়, ততই তাহার ক্ষেত্রফল বৃত্ত-ক্ষেত্র-ফলের সমান হইয়া থাকে। যদি অনন্ত পর্য্যন্তও ভুজ-সংখ্যা বর্দ্ধিত করা যায়, তবেও উভয় ক্ষেত্রফল সমান হইবে।

এখানে অনন্ত পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত কথার অর্থ কি! অর্থাৎ যদি এতদূর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা যায় যে, যাহার অধিক বৃদ্ধি করা মানবের সাধ্যাতীত (মনুষ্য অপেক্ষা উন্নত জীব সমর্থ হইলেও হইতে পারেন) তাহাই মানবের পক্ষে অনন্ত।

সেইরূপ যাঁহার হৃদয়ে যত অধিক পরিমাণে প্রকৃতি-গত বিবাদ অন্তর্হৃত হইয়াছে, তিনিই সেই পরিমাণে পাপের, দুঃখের ও অনুতাপের হস্ত হইতে নিস্কৃতি-লাভ করিয়াছেন। উপস্থিত সমাজের পক্ষে বলা যায়, যাঁহার যে কর্ম্ম আছে, তিনি অতি শীঘ্র সেই কর্ত্তব্য করিয়া, যে সময় অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতে নিজের উন্নতি করিবেন। তিনিই তত অধিক পরিমাণে পূর্ণত্বে আসিয়াছেন। যদি কাহারও অন্তঃকরণে এই বিবাদ সম্পূর্ণরূপে তিরোভূত হয়, তিনিই পূর্ণ মনুষ্য।

পাপ-বিনাশের উপায় দুইটী ;—(১) নৈতিক জীবন—ইহাতে আংশিক পাপ-ক্ষয় ; (২) ধর্ম্ম-জীবন—এখানে সম্পূর্ণ পাপ-ক্ষয় হয়।

কিরূপে এই দুই জীবন প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমরা তাহার নির্ণয়ে পরে প্রয়াস পাইব। আর, কএকটী কথায় সূচনার উপসংহার করিব।

ফুলরেণু।

বয়ঃসন্ধি।

কেন আসি, কেন বসি,
কেন বা লুকাই!
ঘরেও থাকিতে নারি, গৃহকাজ নাহি পারি,
কেন স্থির নই ?
কখনো এলায়ে বেনী, দেখাই ধরিয়া ফণি,
কভু করি আলুলিত কেশ।
আঁটিয়া বসন পরি, কভু বা অঞ্চল ধরি,
কি যে করি নাহি পাই লেশ।
কভু বা মন্থর গতি, কভু দ্রুত গতি অতি,
কখনও বা থমকি দাঁড়াই ;
কারে বা দেখাই খেলা, কার সাথে করি খেলা,
কেবা দেখে, কারে বা দেখাই!
লুকাইলে স্থির নই, নিকটেও স্থির নই,
আসা-যাওয়া করি বারে বার ;
না দেখে থাকিতে নারি, দেখিতেও নাহি পারি,
যেন কত ভয় করি কার।
দেখিতে বাসনা হয়, চক্ষে চক্ষু নাহি রয়,
ফিরাইয়া চাহি আর ধার ;

যাহারে দেখিতে চাই, তারে না দেখাতে চাই,
তবু চক্ষে ভাসে সে আমার।
গোপনে দাঁড়ায়ে থাকি, নয়ন ভরিয়া দেখি,
কি যে দেখি, কহিতে না পারি ;
যারে দেখি, সে দেখিলে, আর নাহি মুখ তুলে,
দেখি তারে—রহিতে না পারি !
সদা সশঙ্কিত হই, মন দেখে—নাহি চাই,
কেন এত, ভয় কারে করি !
খুটি-নাটি কাজ নিয়া, থাকি-আসি দাঁড়াইয়া,
সেখানে শতেক ছলা করি।
এক কাজ শতবার, করি কেন বার বার,
কোনরূপে থাকি' সেইখানে ;
দেখিলে নয়ন তুলি, কেন বা হই বিকুলি,
নাহি পারি দাঁড়াতে সেখানে।
বালক ডাকিয়া এনে, কথা কই তার সনে,
ডেকে ডেকে শুনাই তাহারে ;
সম্মুখে দাঁড়ায়ে থাকি, অন্যদিকে ফিরে দেখি,
যেন আমি নাহি দেখি তারে।
মনে করি কতবার, ওখানে যাবনা আর ;
এক দিন নাহি যদি যাই,
পরদিন রোধিবারে, নাহি পারি একেবারে,
ভাসিয়া দাঁড়াই সেই ঠাঁই।
আমি বালা মতিহীনা, সংসার-পথে নবীনা,
ভালমন্দ নাহি বুঝে হিয়া ;
মা! তোমরা কি দেখেছ, সংসারে আমার মত!
তবে দেও পথ দেখাইয়া।

বিনাপাণি-আবাহন।

(গীত।)

ঝিঁঝিট—একতালা।

কোথা গো মা, বীণাপাণি,
শ্বেত শতদল-বাসিনি বাণি !
মধুর-হাসিনি, মধুরভাষিণি,
চিত-বিহারিণি কবিতা-রাণি।
দুস্তর অপার সিন্ধু, নাহি মা আশার ইন্দু ;
কাতরে করুণা-বিন্দু, বরষ অভয়-দানি।
অপার বাসনা-মনে, ভ্রমিয়া কল্পনা-বনে ;
ভক্তি-ফুল্ল-ফুলদলে, পূজিব পদ দু'খানি।
বসিয়া হৃদয়াসনে, বর দে গো বরাননে ;
ভক্তের এ চির-আশা, পূরা মা, চারুবয়ানি

টোট্‌কা-টুটকি ঔষধাদি।

শূল রোগের মহৌষধ।—শুঁঠ-চূর্ণ ৫ ভরি, বিটলবণ ২॥০ ভরি, সোহাগা ১।০ ভরি, মুলতানী হিং ॥৵০ আনা। এই কএকটি দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া, প্রথমতঃ সজিনাগাছের ছালের রস দিয়া হিং মাড়িতে হয় ; তৎপরে বিটলবণ মিশাইয়া মাড়িতে হয়। তৎপরে সোহাগার খৈ করিয়া, উহাতে মিশাইয়া মাড়িতে হয় ; তৎপরে শুঁঠচূর্ণ মিশাইয়া মাড়িতে হয়। এইরূপে ৫৪টি বড়ী করিয়া লও। সজিনার রস, আবশ্যক মত, অর্থাৎ যত দিলে বড়ি বাঁধা যায়। এইরূপে বড়ি করিয়া প্রাতে একটি ও সন্ধ্যায় একটি, এই হিসাবে ২৭ দিন খাইয়া, জলে মুখ ধুইতে হয়। পথ্য—পুরাতন তণ্ডুল, ঘৃতপক্ক ব্যঞ্জন, দুগ্ধ, মৎস্য—ঘৃতে পাক করিয়া। নিষিদ্ধ—শাক, অম্ল, মিষ্ট, তৈল, কাঁচা ঘৃত, ডাল, ময়দা, পিষ্টক, ভাজা দ্রব্য, মাদক, নূতন তণ্ডুল। ঔষধ সেবনের কয়দিন পথ্যের নিয়ম থাকা দরকার। প্রায় ২৫।৩০ বৎসর হইতে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই ঔষধটি সংগ্রহ করিয়া, বিস্তর লোককে আরোগ্য করিয়াছেন।

ঘায়ের অশ্চের্য্য মলম।—সাবান ও পুরাতন ঘৃত প্রত্যেকে সমান মাত্রা ; ফুল ধুনা ও শ্বেত মোম পূর্ব্বোক্ত দুইটীর দ্বিগুণ মাত্রা।—এই কয় দ্রব্য মৃত্তিকাপাত্রে গলাইলে, যখন অল্প অল্প ধূমোদ্গম হইতে থাকিবে তখন, জাল হইতে উহা নামাইয়া, ধোলাই মোটা কাপড়ের একপৃষ্ঠে মাখাইয়া শুখাইয়া রাখিতে হইবে। পরে ক্ষতের পরিমাণানুরূপ ঐ পটী কাটিয়া ঈষৎ অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া তাহার উপর বসাইয়া দিবে। এই মলমে অতি অল্প কাল মধ্যেই বিস্তৃত বিস্তৃত ক্ষত ও নালী শুষ্ক হইয়া যায়। কিন্তু পারাজনিত ক্ষতে ইহা ব্যবহার নিষেধ।

দাদের মলম।—সোহাগার খৈ ৷৷০ তোলা, গন্ধক ৷৷০ তোলা, ধূনা ৷৷০ তোলা, একত্রে মিশ্রিত করিয়া তার্পিন দ্বারা গুলিয়া দাদে লাগাইবে।

টাকের ঔষধ।—নির্জ্জলা আদার রস মালিস করিলে টাক আরোগ্য হয়।

ধাতুপীড়ার (গণোরিয়ার) ঔষধ।—দধির মাত ৸০ ছটাক, ফটকিরি ।০ আনি, তুঁতে ।০ আনি, মিশ্রিত করিয়া পিচকারী দিলে ধাতুর পীড়া আরোগ্য হয়। ২।৩ দিন পিচকারী দিলেই জ্বালা ও পুঁজরক্ত পড়া আরোগ্য হয়।

জলৌকা-দংশনে রক্ত-নিবারণের উপায়।—বলপূর্ব্বক জোঁক ছাড়াইও না। জোঁক লাগিলে তাহার মুখে লবণ, ক্ষার কিম্বা হুকার জল দিলে তৎক্ষণাৎ কামড় ছাড়িয়া পড়িয়া যায়। যদি ক্ষত স্থান হইতে রক্ত পড়ে, তবে ক্ষত স্থানে তুলা টিপিয়া দিবে; এবং তাহাতেও রক্ত বন্ধ না হইলে, গঁদের আঠার গুঁড়া তথায় লাগাইয়া দিবে।

জলাতঙ্ক পীড়ার ঔষধ—শ্বেত আকন্দ, অভাবে সাধারণ আকন্দের এক পোয়া রস, এক পোয়া দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীকে প্রত্যহ পান করিতে দিতে হইবে। যত দিন রোগীর শরীরে রোগবিষ থাকিবে, ততদিন উক্ত মাত্রায় সেবনে রোগী কিছুমাত্র কষ্ট অনুভব করিবে না ; যখন বিষ ধ্বংস হইবে, তখন এক ফোঁটাও সেবনে সমূহ কষ্ট জন্মিবে। জলাতঙ্ক-লক্ষণ উপস্থিত হইবার আশঙ্কা জন্মিবামাত্র, ইহা সেবনেও বিশেষ উপকার হইবে। তবে দংশনের ২১ দিবস মধ্যে সেবন করাইতে পারিলে ভাল হয়। ঔষধটী সামান্য, কিন্তু রোগটী অতি ভয়ঙ্কর। ইহাতেই কিন্তু অনেক রোগী আরোগ্য হইয়াছেন, জানা যায়। এরূপ ভয়ঙ্কর রোগ যদি এরূপ সামান্য ঔষধে আরোগ্য করিতে পারা যায়, তবে বিশেষ আনন্দের কথা।

অদ্ভুত হত্যা।

অপূর্ব্ব অনুসন্ধান।

শুক্ল পূর্ণিমার রাত্রি। নভোমণ্ডল নিশাকর-করে সজ্জীভূত হইয়া যেন হাস্য করিতেছে। খদ্যোৎগণ ম্লানমুখে বৃক্ষ-ছায়ার আশ্রয় লইতেছে ; কুমুদিনী আজ প্রাণপতিকে পাইয়া মনের আনন্দে নৃত্য করিতেছে। সকলই নিস্তব্ধ ও নীরব। মাঝে মাঝে পবনদেব কেবল গভীরা যামিনী-বক্ষে, বিরামজনক মৃদু মৃদু শোঁ শোঁ শব্দে বিচরণ করিতেছেন। এই গভীর রজনীর বিরাম ভঙ্গ করিয়া একটী লোক, কি জানি কিসের একটী মোট মাথায় করিয়া, গঙ্গার ধার দিয়া চলিয়া যাইতেছে। সে এরূপ ভাবে চলিয়াছে যে, তাহাকে দেখিলেই বোধ হয়, সে যেন পেটের জ্বালায় এত অধিক রাত্রিতেও, মোট বহিতেছে। আহা! হয় ত তাহার সন্তানাদি এখনও এক-মুষ্টি আহারের জন্য বসিয়া রোদন করিতেছে!

যাইহোক, কিয়দ্দূর চলিয়া, মুটে কিন্তু ক্রমে গঙ্গা-বক্ষে, সিঁড়ির ধাপে ধাপে নামিয়া, জলের দিকে নামিতে লাগিল। এই সময় আরও দেখা গেল, একটী ভদ্রলোক, যেন ঐ মুটের পশ্চাৎ পশ্চাৎই, আসিতেছিলেন। এবং আরো একটী লোক, গঙ্গার ধারের রাস্তা দিয়া, কি জানি কোথায় যাইতেছিলেন। গঙ্গাতীরে মুটে অবতরণ করিতেছে ; এমন সময় ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তি মুটের পশ্চাদাগত সেই প্রথম ভদ্রলোকটিকে দেখিয়া, কি জানি কি ভাবিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়, ঐ বস্তায় কি

আপনার কোন দ্রব্য আছে! এত রাত্রে আপনি একাকী ঐ মুটের সঙ্গে কি লইয়া গঙ্গার ধারে আসিয়াছেন?" এই কথা শুনিয়া সেই প্রথম বাবুটি কহিলেন,—"মহাশয়, আমি পুলিশের লোক। ঐ মুটের উপর সন্দেহ হওয়ায়, আমি উহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছি। উহাকে তো এই সহরে কখনও দেখি নাই। আমি এই জেলায় আজ বার বৎসর দারোগাগিরি কর্ম্ম করিতেছি। আমার অপরিচিত লোক এই জেলায় অতি অল্প—নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমি তো একে এখানে কখনও দেখি নাই। তাহা ছাড়া, কি জানি কেন, ইহাকে ছদ্মবেশী বলিয়াই আমার মনে লইতেছে।" এই বলিয়া, তখন তাঁহারা উভয়েই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, গুপ্তভাবে ঐ মুটের অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

এই রূপে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে আসিতে, ক্রমে মুটেকে জলের অতি নিকটে নামিতে দেখিয়া, দারোগার সঙ্গী সেই দ্বিতীয় ব্যক্তিটী চীৎকার করিয়া কহিলেন,—"ওহে এত রাত্রে কিসের মোট লইয়া গঙ্গার ঘাটে নামিতেছ?" এই কথা উচ্চারিত হইবামাত্রই, মুটে কিন্তু বস্তা ফেলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল। দারোগা মহাশয়ও তখন,—"সব মাটি করিলে!"—বলিয়া মুটের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিলেন। নিজের বিপদ বুঝিতে পারিয়া, তীর হইতে মুটে ক্রমে গঙ্গার জলে লাফাইয়া পড়িল। অগত্যা, দারোগা মহাশয় নিরুপায় হইয়া, বিকলচিত্তে কিছুক্ষণ সেইস্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন; স্তম্ভিত হইয়া দেখিলেন, মুটে আর জলের উপর উঠিল না।

তখন মনে মনে স্থির করিলেন, নিশ্চয়ই ঐ মুটে ডুবিয়া মরিয়াছে। কারণ, বড় বড় ডুবুরিরাও ঐ স্রোতের মধ্যে কখনও ডুবিয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং মুটে নিশ্চয় মরিয়া গিয়াছে এই স্থির করিয়া, যেখানে বস্তা পড়িয়া ছিল সেই স্থানে আসিয়া, তিনি উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, তখনও তাঁহার সঙ্গী সেই অপর ভদ্রলোকটী সেই স্থানেই উদ্বিগ্ন-চিত্তে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিয়া দারোগা মহাশয় কহিলেন,—"মহাশয়, আমার আজকার সমস্ত পরিশ্রম আপনার এক কথায় পণ্ড হইল! এত রাত্রে কখনও মুটেতে কি মাল লইয়া যায়? এ নিশ্চয় চোর না হয় খুনে। তা' না হইলে, অপরের কথায় মাথার বস্তা ফেলিয়া জলে ঝাঁপ দিবে কেন? আমি পূর্ব্বেই সন্দেহ করিয়া নিঃশব্দে উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিলাম; আপনি কোন কথা না কহিলে, আমি 'বামাল' সহিত একবারে উহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিতাম। যাইহোক, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে; এখন দেখা যাউক, এই বস্তার মধ্যে কি আছে।"

এই বলিয়া দারোগা মহাশয় বস্তা খুলিতে আরম্ভ করিলেন; এবং তাঁহাকে বস্তা খুলিতে দেখিয়া, তাঁহার সঙ্গের বাবুটিরও কৌতূহল দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। তখন তিনি তাড়াতাড়ি আপনার পকেট হইতে একখানি ছোট ছুরি বাহির করিয়া দিলেন। ক্রমে বস্তার সেলাই কাটিতে কাটিতে, একটী স্ত্রীলোকের দুইখানি পা দেখিতে পাওয়া গেল। পা দুখানি দেখিয়াই, সঙ্গী বাবুটি চীৎকার করিয়া কহিলেন,—"দারোগা মহাশয়, ও লোকটা নিশ্চয়ই খুনে হায়-হায়! আমার বুদ্ধির দোষে আজ একটা ভয়ানক বদমায়েশ আপনার হস্তান্তর হইল।

তখন, দারোগা সমস্ত মৃত দেহটী বাহির করিয়া দেখিলেন যে স্ত্রীলোকটীর আর সমস্ত অবয়বই বর্ত্তমান, কেবল মস্তকটী নাই কে যেন কাঁচি দিয়া সমস্ত গলাটি পরিস্কার করিয়া কাটিয়াছে। আরও আশ্চর্য্য, শরীরের কোন স্থানে এক বিন্দু রক্তেরও চিহ্ন নাই। এরূপ দেখিয়া, তাঁহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। এবং পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিলেন যে,—"এ নিশ্চয়ই পাকা হাতের খুন। পাছে কেহ চিনিতে পারে, এইজন্যই, স্ত্রীলোকটীর মস্তক দেহ হইতে অন্তর করিয়া রাখা হইয়াছে। আরও, জলে ফেলিলে যাহাতে পরে ভাসিয়া না উঠে, এই জন্যই, মৃতদেহের হাতে ও পায়ে সীসার তাল বাঁধিয়া ভারি করা হইয়াছে। স্ত্রীলোকটীকে দেখিলে মুসলমানী বলিয়া বোধ হয়। তাহা না হইলে, হাতে ও পায়ে মেদি পাতার ছোপ থাকিত না। এ দেশের হিন্দুতে হাতে বা পায়ে মেদি পাতার ছোপ দেয় না। স্ত্রীলোকটীর বয়সও অল্প; বোধ হয়, ১৫।১৬ বৎসরের অধিক হইবে না। এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী স্ত্রীলোক কি হিন্দু, কি মুসলমান কোন জাতিতেই এদেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। দেখিলে, বোধ হয়, এ কোন বিদেশীয় বড় ঘরের মেয়ে। আরও, ইহাকে যে, কোন দস্যুতে হত্যা করিয়াছে, এমনও বোধ হয় না। তাহা হইলে, ইহার দেহের সমস্ত হীরা, মুক্তাদি অলঙ্কার অপহৃত হইত। তবে বোধ হয়, কোন প্রণয়ী—প্রণয়ে নিরাশ হইয়া—ইহাকে প্রাণে মারিয়াছে। আরও, নিশ্চয়ই সে প্রণয় স্বামী-স্ত্রীর প্রণয় নহে। হতভাগিনী অপর পুরুষের সহিত প্রণয় করিয়া, সম্ভবতঃ কোন শঠ কর্ত্তৃক এইরূপে অকালে বিনষ্ট হইয়াছে।"

এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াই, দারোগা মহাশয় বলিতে লাগিলেন,—"মহাশয়, আমি অনেক কাল দারোগাগিরি করিতেছি; অনেক খুনে ও বদমাইস ধরিয়া সুখ্যাতি-লাভ করিয়াছি। আমার নামও রামেশ্বর খাঁ! কিন্তু দেখা যাক, এবার পরমেশ্বর আমার ভাগ্যে কি করেন! যেমন করিয়া পারি, এ খুনের অনুসন্ধান আমাকেই করিতে হইবে।"—এই বলিয়া, তৎক্ষণেই তাঁহার সঙ্গীকে কহিলেন,—"মহাশয়, আপনি ভদ্র-লোক। আপনাকে আর পুলিশ-হাঙ্গামায় লিপ্ত করিব না। তবে আপনি এক কার্য্য করুন; কোন চৌকীদারকে দেখিতে পাইলে আপনি শীঘ্র এইদিকে পাঠাইয়া দিবেন। বলিবেন,—ঘাটের ধারে কিসের গোল হইতেছে, তোমরা শীঘ্র ঐ দিকে যাও। তাহা হইলেই, তৎক্ষণাৎ তাহারা এই দিকে আসিবে। আর এক কথা, আপনি আজিকার ঘটনার বিন্দুমাত্রও কাহাকে প্রকাশ করিবেন না। প্রকাশ করিলে, আমাকে বাধ্য হইয়া, অন্ততঃ আপনার এখানে উপস্থিত থাকার কথাও, পুলিশে প্রকাশ করিতে হইবে।"

উত্তরে বাবুটী বলিলেন,—"না, মহাশয়, আমাকে আর এসঙ্গে জড়াইবেন না।"—এই বলিয়া সত্বর একজন চৌকিদার পাঠাইবার জন্য তিনি চলিয়া গেলেন।

মতামত।

পুস্তক-সম্বন্ধে।

রাধামতি।—শ্রীসারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এখানি একখানি প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠায় পূর্ণ সামাজিক উপন্যাস। উপন্যাসেরা বষয়টি,—সংক্ষেপতঃ একজন লম্পট যুবক কৌশল-প্রলোভনে একটী স্ত্রীলোককে বিপথে লইয়া গিয়া নষ্ট করে; এবং শেষে, সে সরিয়া পড়িলে, স্ত্রীলোকটীকে বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করিতে হয় ও তিনি নানা কষ্টে পড়েন। ফলতঃ গ্রন্থে উপদেশ আছে; সমাজের অধঃপতন নিবারণের সদিচ্ছাও যে গ্রন্থকারের হৃদয়ে সম্পূর্ণরূপে জাগরুক, তাহাও সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, লেখার তেমন বাঁধুনী নাই; ঘটনার সেরূপ বৈচিত্র নাই; গ্রন্থকার চরিত্র অঙ্কনেও তেমন পূর্ণ-সফলতা প্রাপ্ত হন নাই। মনোমধ্যে তাঁহার সুন্দর ভাবটি আসিয়াছিল বটে; তিনি চেষ্টাও পাইয়াছিলেন সত্য; কিন্তু

১৫ই শ্রাবণ, ১২৯৬। অনুসন্ধান। ১৯

শেষ রাখিতে পারেন নাই—যেন বড়ই তাড়াতাড়িতে তাঁহাকে গ্রন্থ শেষ করিতে হইয়াছে। বিশেষতঃ বর্ণনার আধিক্যে ও ঘটনার অল্পতায়, পুস্তকখানি পড়িয়া শেষ করিতে, বড়ই বিরক্তি-বোধ হয়। আরও, পুস্তকের এক আদ স্থলে অশ্লীলতার বড়ই প্রশ্রয় দেওয়ায়, আমারা আরও ক্ষুব্ধ হইলাম। যাই-হোক, খুঁজিয়া-পাতিয়া যতই নিন্দা বাহির করি না কেন, কিন্তু এ কথা সকলেই স্বীকার করিতে হইবে যে, মোটের উপর লেখকের লিখিবার ক্ষমতাটুকু বেশ ছিল;এবং তিনি ধীর—স্থিরভাবে লিখিলে, উহা বড়ই উপাদেয় হইত।

গৃহস্থ-সুহৃদ।—বাবু হৃদয়নাথ মজুমদার-প্রণীত। মূল্য ৵০ আনা। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে সংক্ষেপতঃ সুবাসিত তৈল, নানাবিধ সাবান, নানাবিধ সখের বিলাতী জিনিষ, কতকগুলি ঔষধ এবং কএকটী বৈজ্ঞানিক ক্রীড়ার বিষয় লিখিত আছে। সুতরাং বলা বাহুল্য, পুস্তকখানি সকলেরই প্রয়োজনীয় বটে। যদিও আমরা বিষয়গুলি সকল পরীক্ষা করি নাই, তথাপি পুস্তকখানি যে দরকারে লাগিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

দশভূজা।— শ্রীনিশিকান্ত বিশ্বাস প্রণীত। দুর্গোৎসব-উপলক্ষে লিখিত। লেখা বালকের বলিয়া বোধ হইল।

রঙ্গভূমি সম্বন্ধে।

বীণা-রঙ্গভূমি।

কবিবর রাজকৃষ্ণ বাবুর নূতন নাটক 'মিরাবাই' উক্ত রঙ্গালয়ে আজকাল বড়ই দক্ষতার সহিত অভিনীত হইতেছে। নাটকের কতকগুলি গান—বিশেষতঃ তানসানের গীত—বড়ই মনোমুগ্ধকর; অথচ ভাল-লয়-সংযুক্ত। আজ-কালকার থিয়েটারের বাজারে এরূপ গা- প্রায়ই হয় না। বস্তুতঃ ইহা বড় অল্প প্রশংসার কথা নহে। অধিকন্তু, এবারের দৃশ্য-সৌন্দর্য্য আরও মনোহর। কোথায় গান হইতেছে, অথচ বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া-যোগে সেই গান দর্শকের কানের কাছে কে যেন আসিয়া গাহিয়া যাইতেছে,—এই যে সুন্দর কৌশলটি, এটি বাঙ্গালার থিয়েটারে সম্পূর্ণ নূতন। এ দৃশ্যে সকল দর্শককেই মোহিত হইতে হয়। তদ্ভিন্ন জ্যোতির্ম্ময় বালকের আবির্ভাব ও শেষ-দৃশ্যের পট-পরিবর্ত্তন-প্রণালীটিও উল্লেখ-যোগ্য। ফলতঃ 'মিরাবাই' দেখিবার জিনিস বটে!

এমারেল্ড থিয়েটার।

বড়ই দুঃখের সহিত আমরা নিম্নের এই পত্রখানি প্রকাশ করিতেছি। এমারেল্ডে অভিনয়ই ভাল হইতেছে না, জানিতাম; কিন্তু তাহার উপর আবার অত্যাচারের কথা শুনিয়া বড়ই ব্যথা পাইতে হয়। পত্রপ্রেরকের কথাগুলির যদি প্রকৃত প্রতিবাদ না হয় ও উহা সর্ব্বতঃ সত্য হয়, তবে আমরা আরও মর্ম্মাহত হইব; বুঝিব, এমারেল্ডের এই-ই বুঝি বা শেষ দশা। 'বিষ নাই কুলাপানা চক্র' এ উপমা কি এমারেল্ড গৌরবান্বিত হইবেন! যাইহোক, আমরা তাঁহাদিগকে বন্ধুভাবে এখনও এ সকল বিষয়ের তদন্ত লইতে অনুরোধ করি।

"শ্রীযুক্ত—অনুসন্ধান-সম্পাদক সমীপেষু।

মহাশয়,—কএক পক্ষ হইতে 'এমারেল্ড থিয়েটারের' অভিনয়-সমালোচনা করিয়া আপনারা প্রকৃত লোকের কল্যান-সাধন করিতেছেন। ঘরের পয়সা খরচ করিয়া আমোদ-উপভোগ করিতে গিয়া, অভিনয় ভাল না হওয়ায়, সাধারণে বঞ্চিত না হন,—এই আপনাদের সদুদ্দেশ্য, এজন্য আপনাদিগকে অন্তরে ধন্যবাদ দিতেছি। বিশেষ, আপনারা যাহা বলিয়াছেন রঙ্গালয়েরও, প্রকৃতই হিত-কামনায়। অভিনয় সুচারু হইলে তাঁহাদের ও দর্শকের উভয়েরই তুষ্টি, একথা কে না বলিবেন? যাইহোক, মহাশয়, অভিনয়-সম্বন্ধে আপনারা তো অনেক কথা বলিয়া থাকেন! কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে, একটি বিষয়ের দিকে আপনাদের কাহারও লক্ষ্য নাই। অথচ সে বিষয়টি বড়ই গুরু—দর্শক ও থিয়েটারওয়ালা সকলেরই প্রয়োজনীয়। সে বিষয়টি,—থিয়েটারে দর্শকদিগের প্রতি অত্যাচার; বিশেষতঃ আমাদের মত গরিব লোকের প্রতি—আট আনার অধিক দিয়া যাঁহারা টিকিট কিনিতে পারেন না। বলিতে কি, সম্পাদক মহাশয়, 'এমারেল্ড থিয়েটারে' আজকাল আমাদিগকে যেন শেয়াল-কুকুরের অপেক্ষাও ঘৃণিত-রূপে অপমানিত করা হইতেছে। ইতিমধ্যে আমরা ক-একটী বন্ধুতে একদিন 'সরোজা' ও 'বঙ্কেশ্বর' দেখিতে যাই। অভিনয় আদৌ ভাল না হওয়ায় আমাদের পার্শ্বস্থ একটী লোক, কি এক সুন্দর বিদ্রূপোক্তি করেন; এবং উক্তিটী বড়ই সময়োচিত হওয়ায়, অন্যান্য অনেকেই তাহার পোষকতা করেন। কাজেই এমারেল্ডের 'ওয়ালর্ড-রিনাউণ্ড' অভিনেতাদের তাহা সহ্য হইল না! তাঁহারা তৎক্ষণাৎ পালে পালে লম্ফ-ঝম্ফ করিয়া, কেহ কেহ বেত্র-হস্তে, আমাদিগের দিকে অগ্রসর হইলেন। এই মারেন তো এই মারেন! এমারেল্ড বড় লোকের থিয়েটার—তাঁহার অধীনে অনেক গুণ্ডা-বোম্বেটে থাকিতে পারে; সম্ভবতঃ এই আশঙ্কায়, দর্শকগণকে তখন কাজেই নীরব হইতে হইল। থিয়েটারের ধ্বজাধারীগণ তখন, আমাদের মাথার উপর দিয়া—কাহাকেও বা পায়ে দলিয়া, লম্ফে-ঝম্ফে আবার ফিরিয়া গেলেন। ইহার উপর গালাগালি-অভ্যর্থনা তো আছেই! সম্পাদক মহাশয়, এখন ভাবুন দেখি, ঘরের পয়সা খরচ করিয়া, আমাদের একি বিড়ম্বনা! আমরা গরিব লোক—একরূপ দিন আনি, দিন খাই, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; সামান্য যৎকিঞ্চিৎ যা মাহিনা পাই, তাহাতে পেটে খাইতেই ভালরূপ কুলায় না। এহেন কষ্ট-উপার্জ্জিত পয়সা হইতে—পুত্রপরিবারদিগকে একরূপ পেটে মারিয়াই বলিতে হয়—আমরা কালে-ভদ্রে কখনও থিয়েটারে সখ মিটাইতে যাই। কিন্তু মহাশয়, এতদিনে, এমারেল্ডের কল্যাণে আমাদের সে সখ মিটিল—আমরা আক্কেল পাইলাম!)

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা!

পূজার বাজার আগতপ্রায়! এসময় নানা লোভ-পূর্ণ উপহারের বিজ্ঞাপন, নানারূপ নকল তৈল-এসেন্সের চটক, নানারূপ পুস্তক-পত্রিকাদির মূল্য-হ্রাসের লোভানী হইবে। সুতরাং এসময় সাধারণ ক্রেতাগণ সাবধান হইয়া কার্য্য করেন, এই বাসনা।

'শান্তি'-পত্রের অধিকাংশ বিজ্ঞাপনেই প্রতারণার গন্ধ অনুভূত হয়। বিশেষ, কয়েকজন বিজ্ঞাপনদাতা—যাহারা আদালতে পর্য্যন্ত 'প্রবঞ্চক' বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহারাও—'শান্তির' আশ্রয়ে আবার বড়ই লোককে ঠকাইবার উপযোগী বোল-বোলাও-পূর্ণ বিজ্ঞাপন ঝাড়িতেছে। ঐ সকল বিজ্ঞাপনদাতাদের মধ্যে প্রধানতঃ, শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মিত্র, ১৩নং মুন্সি দিদার বক্সের লেন, তালতলা, কলিকাতা-ঠিকানার 'সিদ্ধি-কবজের' বিজ্ঞাপনই অধিক সন্দেহ-জনক। তদ্ভিন্ন, 'সন্ন্যাসীর গুপ্ত-ভাণ্ডার,' 'চাঁদের হাটের উপহার' এ সকল বিজ্ঞাপনেরও ভড়ং বড়ই। এইরূপ মধ্যে মধ্যে 'শান্তিতে' আরও নানা বিজ্ঞাপন বাহির হয়, যাহা সম্পূর্ণই ভড়ং-পূর্ণ; অথচ লোক যাহাতে ঠকেন।

অনেক নামজাদা প্রতারক

আর কাগজে বিজ্ঞাপন না দিয়া, নিভৃতে মফঃস্বলে হ্যাণ্ডবিল বিলাইয়া বা মফঃস্বলের লোকদিগকে নানারূপের পত্রাদি লিখিয়া তাঁহাদিগকে ঠকাইতে চেষ্টা পাইতেছে। বাগ-বাজারের স্বনামখ্যাত 'আদারিণী'-আপিস হইতে 'সুখ-সম্ভোগ-রত্নাকরের'; 'শ্রীশরচ্চন্দ্র রায়, রাজবাটীর দেওয়ান, অনন্তপুর' এই ঠিকানা দিয়া, অথচ কলিকাতার বটতলায় বসিয়া 'নলিনীপ্রতিমার'; সাহেবী ও মুসলমানী নামে হ্যাণ্ডবিল প্রকাশ করিয়া কেমিক্যাল সোণার গহনা ও আংটী প্রভৃতির;—এইরূপ নানা বিজ্ঞাপনে, আজকাল অনেককেই মুগ্ধ করিতেছে।

এজেন্সি-আপিসের বিজ্ঞাপন

দেখিলেই, আজকাল এইরূপ এক ধারণা হয় যে, তাহা একটী নিঃস্বম্বল ও বেকার লোকের

জীবিকার পন্থা-মাত্র। আর, এইজন্যই, অনেক 'এজেন্সি আপিসে টাকা পাঠাইয়া, আজকাল অনেকেই ঠকিতেছেন, সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। অধিকাংশ এজেন্সির বিজ্ঞাপনদাতাগণেরই না আছে, চালচুলা—না আছে, মূলধন। মফঃস্বল হইতে লোকে অর্ডার ও তদনুযায়ী কতক টাকা পাঠাইলে, কাজেই তাহারা সে অর্ডার সরবরাহ করিতে পারে না; এবং অধিকন্তু অগ্রিম যে কয়টি টাকা পায়, তাহাই 'উদরায় নমঃ' করিয়া বসে। এইজন্য, আজ কাল এজেন্সি-আপিসের উপর দিন দিন লোকের বড়ই বীতরাগ বর্দ্ধিত হইতেছে। যাইহোক, আমরাও বলি, এজেন্সির বিজ্ঞাপন-সম্বন্ধে সাধারণে প্রধানতঃই সতর্ক থাকুন। বিশেষ না জানিয়া, কেহ যেন কোথাও আর টাকা না পাঠান।

নানা কথা।

হিতে বিপরীত ঘটিয়াছে। ডাক-বিভাগ ভ্যালুপেয়েবেল প্রথার সংস্কার করিতে গিয়া, একে আর করিয়া বসিয়াছেন। এখন বোধ হইতেছে, পূর্ব্বে যা' ছিল, সেই বরং ভাল ছিল।—নতুবা এ যেন 'শিব গড়িতে গিয়া বাঁদর' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশেষতঃ রেজেষ্টরী-না-করা ভ্যালুপেয়েবেল বুক-প্যাকেট-সম্বন্ধে। ভ্যালু-ডাক-যোগে নানা চুরি-জুয়াচুরী হয়; এক জিনিসের স্থলে অন্য জিনিস পাঠাইয়া প্রতারকগণ সাধারণকে বঞ্চনা করে;—আমাদের দুরদৃষ্ট, তাই আমরা প্রধানতঃ তাহাই নিবারণের জন্য, আন্দোলন করিয়াছিলাম। কিন্তু এখনকার নূতন নিয়মে আমরা দেখিতেছি, তাহার কিছুই করা হয় নাই; কেবল হইয়াছে,—প্যাকেট পাঠাইলে টাকা দিয়া গৃহীতা তাহা লউন আর নাই লউন, প্রেরককে কিন্তু ভাবী টাকা আসার আশায়, 'মনি-অর্ডার-ফি' নামধেয় কিঞ্চি গচ্ছা আগাম ডাকম্বরে জমা দিতে হইবে অর্থাৎ গৃহীতা প্যাকেট ফেরত দিলেও—প্রে ককে শুধু প্যাকেটের ডাকমাশুল নহে—টা আসার খরচা ও পুস্তকের লোকসানী সবই স করিতে হইবে।

* * *

যদিও কলার পাতে সহি করার ম প্রেরককে Certified that this book-pack et is sent in execution of a *bonafid* order, এইরূপ একটুকু ইংরাজী বোলে নীচেই সহি করিয়া প্যাকেট পাঠাইতে হয় কিন্তু সে, সেই সহি-মাত্র। ক্রেতা জানিস চাহিল, বা বিক্রেতা কি পাঠাইলেন তাহা সেই পূর্ব্ববৎই দেখা হইয়া থাকে সুতরাং বুঝুন সকলে, কি সংস্কার হইয়াছে মোট কথা, টাকা আসুক আর নাই আসুক ডাকবিভাগ সেই আসার খরচাটী কিন্তু 'অগ্রিম লাভ করিয়া বসিতেছেন! বড় মন্দ সংস্কার নহে

* * *

যাইহোক, এ ব্যবস্থায় ব্যবসায়ীর যে কি অনিষ্ট হইতেছে, তাহা বলা যায় না। সকল দিকে ব্যবসায়ীকেই লোকসান সহিতে হইতে একি কথা? জিনিস নষ্ট, ডাকব্যয়, অধিকন্তু টাকা-আসার খরচা—একি অন্যায়! ফলতঃ ডাকবিভাগ এখনও নিয়মের পরিবর্ত্তন করুন এই অনুরোধ। আমাদের বাসনা, ডাকবিভাগ সত্বর যেন ঐ অতিরিক্ত অনর্থক অপব্যয়স্বরূপ —মনিঅর্ডার খরচা অগ্রিম লওয়ার প্রথাটা উঠাইয়া দেন; এবং সে সম্বন্ধে পূর্ব্বের নিয়মই ভাল ছিল। তবে অর্ডারের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের বিষয়, যদি কিছু পাকাপাকি করিতে পারেন, তাহা করুন। নতুবা এ নাম-মাত্র পরিবর্ত্তনের কোন ফল নাই।

মফঃস্বলের বিবরণী।

কুমারখালি, জেলা নদীয়া।

সম্প্রতি এঅঞ্চলের জেলিয়ারা সকলে একজোট হইয়া, জেলিনীদিগকে আর হাটবাজারে বা মাছ ধরিতে যাইতে দিবে না, এরূপ চেষ্টা পাইতেছে। কুমারখালি থানার অধীন আজুদিয়া, কঠগজরা, মহিষবাথান, মেঘনা, রঘুনন্দনপুর প্রভৃতি গ্রামে অন্যূন ২৫০।৩০০ ঘর জেলিয়া বাস করে। তন্মধ্যের কএকজন জেলিয়া মাতব্বর-স্বরূপ দাঁড়াইয়া, জেলিনীদিগকে পরদা-নশীন রাখিতে, মতলব আঁটিয়াছে। এজন্য এঅঞ্চলে বড়ই হুলস্থূল বাধিয়াছে। নিয়ম পালন করিতে গিয়া, অনেক স্ত্রীলোককে অন্নকষ্ট পাইতে হইতেছে।

ডায়মণ্ডহারবার, ২৪ পরগণা।

দুর্ভিক্ষের প্রকোপ দিন দিনই বাড়িতেছে। অনেক পরিবারকে অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন কাটাইতে হইতেছে। এমন কি, সংবাদ পাওয়া যায় যে, পেটের জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া ইতিমধ্যে একটী বৃদ্ধা জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। আরও অনেকে রুগ্ন, শয্যাশায়ী ও হীনবল হইয়া পড়িতেছে; অনেক গৃহে হাহাকার উঠিয়াছে। চুরি-ডাকাতি সমানে চলিতেছে।

মেদিনীপুর।

অত্রত্য বিড়িয়ামার মাহী পল্লীর কুলি-ডিপোর ম্যানেজার একজন কুলি-রমণীকে অন্যায়রূপে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আসামী গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের তজ্জন্য ২০৲ টাকা মাত্র জরিমানা হইয়াছে।

ত্রিহুত।

দুর্ভিক্ষের প্রতাপ বড়ই। লোকে উদর পুরিয়া খাইতে পাইতেছে না। মধ্যে দ্বারভাঙ্গার রাজার অধিকৃত 'পাঁচমহল্লা' পল্লীতে বড়ই অন্নকষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু রাজ-সরকার হইতে প্রায় লক্ষাধিক টাকা এপর্য্যন্ত ব্যয় করিয়া তাহার অনেক শান্তি হইয়াছে। রাজা বাহাদুর ৬।৭ হাজার টাকার অন্নদান করিয়াছেন; এবং বাকী টাকায় নানা স্থানে পুষ্করিণী খনন করিয়া দিতেছেন।

বর্দ্ধমান।

পাউণ্ডের অত্যাচার লইয়া আন্দোলন হওয়ায়, সম্প্রতি স্থানীয় বোর্ড খোঁয়ারের ইজারাদারদিগের প্রতি কতকগুলি নিয়ম জারি করিয়াছেন। পাউণ্ডে পশ্বাদিকে ভাল করিয়া আহার ও স্থান দেওয়া; পশ্বাদি আনিয়া দেওয়ার জন্য কাহাকেও ঘুষ না দেওয়া; নিয়মাবলী সাধারণকে পরিজ্ঞাত করান; এবং নিয়মের অতিরিক্ত চার্জ্জ না করা; প্রভৃতি কএকটি আদেশ অতঃপর প্রচারিত হইয়াছে। আর, তাহার অন্যথা করিলে, ইজারাদারদিগকে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করা হইবে, তাহাও বলা হইয়াছে। এখন, সকলে অত্যাচারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখুন, এই বাসনা।

সাঁতরাগাছি, হাওড়া।

বারওয়ারী পূজার ধুম আজকাল থামিয়াছে। আজকাল আবার দলাদলির যোগাড় চলিতেছে। বেকার লোকদের একটা না একটা কাজ তো চাই!

তারকেশ্বর, হুগলী।

মহান্তের কেলেঙ্কারীর কথা লইয়া আজকাল চারিদিকেই হুলস্থূল পড়িয়াছে। সকল কাগজেই ঐ কথা লইয়া আন্দোলন হইতেছে। তজ্জন্য মহান্ত সংবাদপত্রের নামে নালিশ করিতেছেন বলিয়াও, এক হৈ-চৈ উঠিয়াছে। কিন্তু, ঘরের খবর বড় সেরূপ দেখিতেছি না। মহান্তের পারিষদবর্গের মনে মনে মকর্দ্দমাটি বাধাইয়া দিবার কল্পনা থাকিলেও, 'কেঁচো খুঁড়িতে খুঁড়িতে পাছে সাপ বাহির হয়,—সম্ভবতঃ এই আশঙ্কায়, মহান্ত কিন্তু তাহাতে রাজী হইতেছেন না। এইজন্য, তাঁহার নবীন ম্যানেজার হরকালী বাবুর সহিতও নাকি মনোমালিন্য ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে।

সংবাদ।

—মিসরে আবার বড়ই গোল বাধিয়াছে। মিসরের দরবেশগণ বাদেল নুজমী নামক একজনকে অধিনায়ক পাইয়া, আবার ক্ষেপিয়াছে। ব্রিটিশ পক্ষ হইতে প্রথমে ভয় প্রদর্শন করা হয়; কিন্তু তাহাতে তাহারা উত্তর দিয়াছে,—সেদিন মিসরে গর্ডন ও হিক্সের কি দশা হইয়াছে, কোনরূপ উচ্চ বাচ্য করিবার পূর্ব্বে, ইংরাজ যেন একবার তাহা স্থির-চিত্তে ভাবিয়া দেখেন। ফলতঃ তাহারা বড়ই এক দল বাঁধিয়াছে; এবং সে শঙ্কায় এপক্ষেও যোগাড়-যন্ত্র হইতেছে। শীঘ্রই তুমুল যুদ্ধ বাধিবে। মধ্যে দুই একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধও হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহারা পশ্চাৎপদ নহে।

একব্যক্তি লিখিয়াছেন,—পূর্ব্ব শনিবার শিয়ালদহ হইতে বাড়ী ফিরিবার সময়, রাস্তায় একজন ভদ্রবেশী মুসলমানের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। তিনি যে দিকে যাইবেন, সেও সেইদিকেই যাইবে, বলে। সুতরাং উভয়ে সচ্ছন্দে কথাবার্ত্তা কহিতে-কহিতেই চলেন। ইতিমধ্যে মুসলমানটি রাস্তার ধারেই তাহার কোন এক বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার ভান করে; ও মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহাকে তন্নিকটে দাঁড়াইতে বলে। এ স্থানটী মুসলমান পাড়া লেন। যাইহোক, তিনি দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় ৩।৪ জন লোক হঠাৎ আসিয়া তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিল; বলিল,—'সঙ্গে কি আছে দে। নতুবা খুন করিব।' তিনি তো অবাক! যাইহোক, ১৫ টি টাকা তাঁহার সঙ্গে ছিল। পরে তাহারা তাহা কাড়িয়াই অন্তর্ধ্যান হইল। তিনি তো হতভম্ব!' সম্প্রতি দিন-দুপুরে কলিকাতা-সহরে এই কাণ্ড ঘটিয়াছে।

—জনরব যে, আগামী বৎসর হইতে আমাদের বড় লাট শৈলবাসে পাঁচ মাস মাত্র কাটাইতে পারিবেন; এই মর্ম্মে ভারতবর্ষের ষ্টেট-সেক্রেটরী মহাশয় এক ডেস্পাচ্ ভারত-গবর্ণমেণ্টকে পাঠাইয়াছেন।

—১লা সেপ্টেম্বর হইতে বর্দ্ধমান-বিভাগের প্রজারা জমীদারের খাজনা মণিঅর্ডার করিয়া পাঠাইতে পারিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। সাধারণ নিয়মাবলী ডাকঘর-সমূহে প্রাপ্য। ইহাতে ফল পাইলে, এই ব্যবস্থা অন্যান্য জেলা-সমূহেও প্রবর্ত্তিত হইবে।

—সম্প্রতি মহারাজা দলীপ সিংহ ভিয়ানা নগর হইতে ভারতবাসীদিগের প্রতি একখানি পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ইউরোপের প্রায় সমস্ত জাতিই তাঁহার পক্ষ সমর্থনে সম্মত আছেন; যাহাতে ইংরাজ ভারতবর্ষ হইতে দূরীভূত হয়, সে বিষয়ে সহায়তা করিতে ইউরোপের জাতি-মাত্রেই প্রস্তুত আছেন। কিন্তু ইংরাজের সহিত সংগ্রাম বহুল অর্থ-সাপেক্ষ; যুদ্ধের আয়োজন করিতে হইলে ভূরি ভূরি অর্থ ব্যয়িত হইবে। তজ্জন্য তিনি প্রত্যেক ভারতবাসীকেই, এক-একটি পয়সা করিয়াও সাহায্য করিতে বলিয়াছেন। আমরা দেখিতেছি, যথার্থই দলীপের চিত্ত-বিভ্রম ঘটিয়াছে।

—মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ দে সংস্কৃত ভাষায় উত্তীর্ণ হইয়া পাঁচ হাজার টাকা পারিতোষিক পাইয়াছেন।

—সিঙ্গাপুরে এখনও যুবতীবিক্রয় হয়। দিনের বা রাত্রির তরে নহে; বরাবরের তরেও। যবদ্বীপ চীনদেশের যুবতীরাই দামে বিক্রীত হইয়া থাকে। এ দেশে যুবতী-বিক্রয়ের নিয়ম নাই; কিন্তু ইজারা ও পত্ত দিবার নিয়ম আছে। এখানেই কি এ নূতন!

—দক্ষিণ আমেরিকার চিলী প্রদেশে দেখিতে লোকের জীবন বড়ই দীর্ঘ হয়। দেশে ২৫ লক্ষ লো তাহার ৫০০ জনের বয়স এক শত অতিক্রম করিয়াছে

—হার্কোট নামে একটী সাহেব পাখাটানা চা সঙ্গে এমন এক তাড়িত-ঘণ্টার সংযোগ করিয়া দিয়া যে, বেহারা বেচারীর একবারও একটু হাত নরম ব বার যো নাই! টানে নরম পড়িলেই, ঘণ্টা অমনি ঠ করিবে; আর, সাহেব উঠিয়া বেহারার বুকে বুটের ল মারিবেন। জেলের ঘানীতে কয়েদী যদি এ থামে, অমনই একটা প্রকাণ্ড মুগুর আসিয়া তাহা সবেগে আঘাত করে। ইংরাজ বিজ্ঞানের অবতার!

—উত্তর আর্কটের ত্রিপতি নামক স্থানে এক মহান্ত আছেন। মহান্ত ঠাকুর চাকরকে দিয়া এ পুরোহিতের উপর পাদুকা চালাইয়াছিলেন। তজ্জ মহান্তকে ১০০৲ টাকা জরিমানা দিয়া কাছারীর সম আটক থাকিতে হইয়াছিল। চাকরটীর ৬ সপ্তাহ হইয়াছে। মহান্ত-কলঙ্ক চারিদিকেই যে!

—নওগাঁর ফৌজদারী আদালতে লক্ষ্মণ মণ্ডল না এক আসামীর ১৪ দিন ফাটক এবং ২৫ টাকা অর্থ হয়। আসামী আপীল করিয়া জামিনে মুক্ত হও আদেশ প্রাপ্ত হয়। খালাসী পরোয়ানা নওগাঁ পা হইল। কিন্তু আসামী তথায় নাই, বোয়ালিয়া গে আছে;—এইরূপ কৈফিয়ৎ আসিলে, ঐ পরোয়ানা তত্রত্য জেলে পাঠান হয়। কিন্তু সেখানেও আ পৌঁছে নাই! অবশেষে মেয়াদ অতীত হওয়ার আসামী জামিনে মুক্ত হইয়াছে। ধন্য আইন!

—রংপুরে কাপড়ের কল বসিবার আয়োজন হ তেছে। কতিপয় উদ্যোগী বাঙ্গালীর দ্বারা উক্ত স্থাপিত হইবে; এবং তাঁহাদের সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধা উহা চলিবে। এক্ষণে উহা কার্য্যে পরিণত হইলে আ সাতিশয় সুখী হইব। ফাঁকা বক্তৃতা না করিয়া, বঙ্গবাসীদের এরূপ মতিই হয়, তাহা হইলে দে অনেক মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা।

—ফ্রান্স দেশে একপ্রকার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইতে যাহার সাহায্যে, একস্থানে বক্তৃতা হইলে অন্যদূর হইতে সে বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারিবে; এ তৎসঙ্গে সঙ্গে বক্তার অঙ্গ-ভঙ্গি-প্রতিমূর্ত্তিও উঠিবে। কোন সময় ইচ্ছা, এই যন্ত্র হইতে সমস্ত বক্তৃতা মনু কণ্ঠের ন্যায় নিস্থত হইবে; ও সে বক্তৃতার সময়, যে যেরূপ মুখভঙ্গি করিবেন, তাহার প্রতিচ্ছবি তথা বাহির হইবে। এই যন্ত্রে প্রতি মুহূর্ত্তে ১০ খানি উঠিবে। ইহা দ্বারা, একস্থানে বক্তৃতাদি হইলে, দে বিদেশের লোক সে বক্তৃতা-স্থল, বক্তৃতার কথা সমস্ত কাণ্ড দেখিতে ও শুনিতে পাইবেন।

অনুসন্ধান।

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

৩য় খণ্ড।] ৩১এ শ্রাবণ, ১২৯৬ সাল। [২য় সংখ্যা।

বীণা-পাণি-আবাহন।

(ললিত—আড়াঠেকা।)

"ওই কে অমর-বালা দাঁড়ায়ে উদয়াচলে,
ঘুমন্ত প্রকৃতি-পানে চেয়ে আছে কুতূহলে,
চরণ-কমলে লেখা,
আধ আধ রবি-রেখা,
সর্ব্বাঙ্গে গোলাপ-আভা, সীমন্তে শুকতারা জ্বলে।
যোগে যেন পায় স্ফূর্ত্তি, সদয়া করুণা-মূর্ত্তি,
বিতরেন হাসি-হাসি, শান্তি-সুধা ভূমণ্ডলে।
হয় হয় প্রায় ভোর,
ভাঙ্গ ভাঙ্গ ঘুম-ঘোর,
সুস্বপ্ন-রূপিণী উনি, ঊষা-রাণী সবে বলে।
বিরল তিমির-জাল, শুভ্র অভ্র লালে লাল,
মগন তারকারাজি গগনের নীল জলে।
তরুণ কিরণাননা,
জাগে সব দিগঙ্গনা,
জাগেন পৃথিবী দেবী সুমঙ্গল কোলাহলে।
এস মা ঊষার সনে
বীণা-পাণি চন্দ্রাননে,
রাঙ্গা চরণ দু'খানি রাখ হৃদয়-কমলে।"

আমার হাসি।

যে দিকেই চাহিয়া দেখি না কেন, সেই দিকেই দেখিতে পাই, লোকগুলা কাঁদিয়া অস্থির! শিশুতেই কাঁদে—বৃদ্ধতেও কাঁদে! এ দেখি আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই কাঁদিয়া অস্থির! দিনের মধ্যে একবারও কাহারও চোখের জল শুকায় না! কেনরে বাপু! এ জগতে কি কেবল কাঁদিবার বিষয়ই আছে; হাসিবার কি কিছুই নাই? তোমরাও যা লইয়া আছ, আমিও তো তাই লইয়া আছি; তবে আমি সকল বিষয়েই হাসি, আর তোমরা কাঁদ কেন? তোমরা যা দেখিয়া কাঁদিয়া অস্থির হও, আমি তাই-ই দেখি হাসিয়া আকুল হই। তোমাদের প্রাণে অশ্রুর উৎস চির-প্রবাহিত, আর আমার মনে হাসির তরঙ্গ খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। তোমরা যা দেখ, তাতেই শোকের ব্যাপার দেখিতে পাও; আর আমি তা' থেকেই 'হাসির রাশী কুড়িয়ে বেড়াই।'

আচ্ছা, তোমরা কাঁদ কিসে?—এমন বাসন্তী নিশীথে, পূর্ণচন্দ্রালোক-ধৌত তরঙ্গায়িত গঙ্গার উপকূলে, পুষ্পগন্ধহারী মলয়চারী সমী-

TIGHT BINDING

রণের সেবা ভোগ করিয়াও, তোমরা কাঁদ কেন? এমন বাতাসে, এমন শোভায়, এমন মধুরতায় তোমাদের সন্তপ্ত প্রাণে কি শান্তি আসে না?—সে শান্তিতে কি হৃদয়ে একটু অনির্ব্বচনীয় সুখের আস্বাদ পাও না?—সে সুখটুকুতেও কি একটু ঈষৎ হাসি আসে না! এমন নীলিমামণ্ডিত আকাশতল যখন নীবিড় জলদজালে ঢাকা পড়ে—তল্‌তলে ঢল্‌ঢলে ধূমলবর্ণে জগৎ ভরিয়া যায়—সেই দিগন্তপূরিত কাদম্বিনীরাশির কোলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মসীকৃষ্ণ চাতক খেলা করিতে থাকে; তখন সেই খেলা—প্রকৃতির সেই গম্ভীর ভাব—সেই সাদায়-কালোয় মিশামিশির শোভা দেখিয়াও কি প্রাণে একটু সুখ উঠে না?—সে সুখে কি তোমাদের ওষ্ঠাধর ঈষৎ কুঞ্চিতও হয় না! যখন শীতে চারিদিক তুষারে ভরিয়া যায়—আমার হাত পা আমার থাকে না—যে অগ্নি-রৌদ্রকে দুইদিন পূর্ব্বে বিষ বলিয়া ত্যাগ করিয়াছি, তাহাকেই পরম বন্ধু বলিয়া বুকে তুলিয়া লইতে হয়; এ রহস্য দেখিয়াও কি তোমরা হাসিতে পার না? ঋতু-পরিবর্ত্তনের মত জগতে জীবন্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার আর কি কিছু আছে? এ দেখিয়াও যখন তোমরা কাঁদিয়া আকুল হও; তখন বুঝিলাম, তোমাদের নিতান্তই প্রাণ নাই। আবার যখন দেখি,—এই জীবসংঘ-শব্দময়ী মেদিনীর মধ্যে একটী দূর সঙ্গীতধ্বনি—একটী অস্ফুট বংশীধ্বনি আসিয়া প্রাণে বাজে—প্রাণের উপাস্থত ভাবগুলি ধুইয়া দিয়া অমৃত ঢালিয়া দেয়, তখন আমি হাসি রাখিতে পারি না? কিন্তু তোমরা তাতেই কাঁদিয়া ভাসাইয়া দাও—তোমাদের কাহারও মরমের তার ছিঁড়িয়া যায়—কাহারও আধখানা প্রাণই উদাস করিয়া দেয়—কাহারও মনে বা দূর স্বপনের স্মৃতি জাগাইয়া হৃদয়-মন্দির চুরমার করিয়া ফেলে! এই রকমে সকল বিষয়েই তোমাদের কান্না,—আর আমার হাসি!

হাসিব না কেন?—এজগতে শোকে ঘটনা—দুঃখের ব্যাপার কি আছে যে, তাই লইয়া বিলাপে মত্ত থাকিব—হাসিতে পাই না? জগতের ব্যাপার সবই আশ্চর্য্য—সবই ভৌতিক—সবই তামাসাপূর্ণ! তামাসার ব্যাপার দেখিয়া, লোকে হাসিয়া থাকে না তো কি তবে তোমরা যে কাঁদ কেন, তা বুঝিলাম না।

এ জগতে হাসিবার কত ব্যাপার আছে দেখিবে? যখন দেখি,—বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যাহাকে জীবনের সার বলিয়া ভাবিতেছি যাহার সুখ দেখিলে হৃদয় উছলিয়া উঠে যাহার মুখে হাসি দেখিলে আপনাকেই ভুলিয়া যাইতে হয়; পরমুহূর্ত্তে তাহাকেই শ্মশানে রাখিয়া আসিতে হইবে বুঝিতে পারিয়া, আমার হাসি আসে। ইহার অধিক কি আর কি আশ্চর্য্য আছে? এ আশ্চর্য্য ভ্রম—এ অপূর্ব্ব ঘটনায় কাহার না হাসি আসে? অথচ দেখি ইহাতেই তোমরা কাঁদ! যখন দেখি,—একজ কোটীশ্বর হইয়া সামান্য সামান্য বাল-ক্রীড়নক নয়ন-তৃপ্তিকর বস্তুতে শতসহস্র মুদ্রা ব্যয় করি তেছে, আর তাহারই পার্শ্বে একজন মুষ্টিমে অন্নের জন্য ধুলায় পড়িয়া ছটফট্ করিতেছে তখন সে দৃশ্যে আমার হাসির উৎস খুলি যায়—ভাবি, এদুইটী বিপরীত ব্যাপারের এক অবস্থান কি আশ্চর্য্য রকমের! এ তামা দেখিতে—দুইটী প্রধান মূর্খের একত্র অভিন দেখিতে, কে না হাসিয়া থাকিতে পারে যখন দেখি, একজন নববিধবা কন্যা লই অশ্রুপূর্ণলোচনে জামাতার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া আয়োজন করিতেছে; আর একজন তাহার পার্শ্বে কন্যার বিবাহের জন্য আহ্লাদে আট খানা হইয়া নিজের সর্ব্বস্ব খোয়াইয়াও জাম তার মনস্তুষ্টির উপায় করিতেছে; তখন কি আ হাসি চাপিয়া রাখা যায়? ভাবি একি!—এর কৌতুককর তামাসা আর কত দেখিব? যখ দেখি,—একজন বিদ্বান, বুদ্ধিমান, কর্ম্মক্ষম লো অন্নকষ্টে আত্মহারা হইয়া আত্মনাশে উদ্যত হইয়াছে; আর একজন নিরক্ষর অপটু লোক নির্ব্বিঘ্নে দশটাকা উপার্জ্জন করিয়া স্ত্রীপুত্র-পরিবার প্রতিপালন করিতেছে; তখন এ রঙ্গ দেখিয়া হাসি কি থামাইয়া রাখা যায়? আবার যখন দেখি,—প্রণয়ীযুগলের মধ্যে একজন অন্যের জন্য জীবন ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু অপর জন স্বচ্ছন্দে গোপনে আর একজনের প্রণয়াসক্ত; তখন মনে আপনা-আপনিই কি হাসি আসে না! তার পর, যে বিষয়টার জন্য তোমরা সকলেই কাঁদিয়া আকুল হও, আমার সেইটাতেই বেশী হাসি পায়। তোমরা কেহই নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট নও; প্রত্যেকেই ভাব, "আমার অপেক্ষা হীনাবস্থ জগতে আর কেহ নাই।" প্রত্যেকেই নিজের অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য কতই হাঁকু পাঁকু কর; পরস্পরের প্রতি কতই হিংসা-দ্বেষ প্রকাশ কর। এসব দেখিয়াও কি আমি না হাসিয়া থাকিতে পারি? পৃথিবীতে তোমাদের কান্না, আর আমার হাসি সমান হইয়া পড়িয়াছে।

আচ্ছা, বল দেখি, তোমরা এগুলি দেখিয়া হাস না কেন? ইহাতে কাঁদিবার কি আছে? তোমরা কাঁদ—ঘটনাগুলির প্রতিবিধান করিতে। কিন্তু বল দেখি, এ বৈপরীত্য-সংঘটন কি তোমাদের ইচ্ছামতে হইয়া থাকে যে, তোমরা কাঁদিয়া একের ছবি—একের পরিণাম অন্যকে দেখাইয়া প্রতিবিধান করিবে?

দেখ, অনেক দিন তোমাদের কান্নার কথা ভাবিয়াছি; কিন্তু বুঝিতে পারি নাই যে, মানুষ এত বুদ্ধিমান হইয়াও—এত বুঝিয়াও একথাটী বুঝিতে পারে না যে, যাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দুর্ব্বার পাতাটীও কাঁপে না, তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কীটানুকীট মানুষ—আমি চেষ্টা করিয়া কি করিব? কাজেই আমার হাসি আসে—হাসিতে হাসিতে আমি অবসন্ন হইয়া পড়ি! হায়! তবু তোমরা একবিন্দু হাস না—কেবল কাঁদিয়াই মরিতেছ!

হায় মানব! কবে তোমায় হাসিতে দেখিব কবে দেখিব, তোমা হইতে অশ্রুর উৎস দূর হইয়া হাসির লহরী উঠিয়াছে; কবে দেখিব তুমি বুঝিতে পারিয়া আমার সঙ্গে গাহিতেছ,—

"আচ্ছা এক রঙ্গভূমি এসংসার।
ইহাতে দেখ্‌ছি যত চমৎকার॥
আজ রাজা-জমীদার, কাল ভিক্ষাপাত্র সার;
এখন আনন্দ-উৎসব-রঙ্গ, পরে হাহাকার।
আবার এই কান্না, এই হাসি;
তবু এত অহঙ্কার!"

ঠগী-কাহিনী।

(ঠগীর নিজের মুখে শুনিয়া।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"———ঝর ঝর ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা — তিতিয়া বসনে;
যথা তরু, তীক্ষ্ণ শর সরস শরীরে
বাজিলে, কাঁদে নীরবে ———"

"মহাশয়, আপনি আমার নিকট যে সকল বিষয় অবগত হইতে চাহিতেছেন, তাহা আমি অবশ্যই বলিব। অনেক দিন হইল, আমি আমার যৌবনাবস্থা অতিবাহিত করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইয়াছি। যৌবনে যে সকল চিন্তা ও হতাশ্বাস আসিয়া মধ্যে মধ্যে মনকে আলোড়িত করিত, অনেক দিবস হইল, হৃদয় হইতে তাহা একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে। আমি মনে মনে যদিও জানিতে পারিতেছি যে, এই সোনার সংসারের মায়া অল্প দিবসের মধ্যেই কাটাইতে হইবে, আমার পূর্ণ সাধের ঘট শীঘ্রই পদাঘাতে চূর্ণ হইয়া যাইবে; তথাপি, বৃদ্ধ-ব্যক্তিমাত্রেরই স্বাভাবিক গুণের বশবর্ত্ত

হইয়া, জীবনের অতিশয় মায়া করিয়া থাকি। মৃত্যুর ভয়ঙ্করী ছায়াকে সততই ভীত চক্ষে দৃষ্টি করিয়া থাকি। যে বৃদ্ধের জীবনে এত সাধ—বাঁচিতে এত ইচ্ছা; রাশি রাশি খুন করিয়াও যে অদ্য আপনার কৃপায় সকলের মুখ দেখিতে পাইতেছে; সে কোন্ লজ্জায় আপনার এই সামান্য কথা না রাখিবে? কে তাহার জীবনের অতীত কাহিনী না বলিবে?"—এই বলিয়া বৃদ্ধ নীরব হইল।

"তোমার উপর দয়া করিয়া আমি তোমার জীবনদান করিয়াছি—ইহা যদি তোমার মনে থাকে; তবে তাহা হৃদয় হইতে একেবারে দূর কর। দেখ আমির আলি! (ইহাই বৃদ্ধের নাম) দয়া যে কাহাকে বলে, তাহা আমরা জানি না; দয়া আমাদিগের হৃদয়ে স্থান পায় না। তুমি রাশি রাশি খুন করিয়াছ; নানাবিধ দুষ্কর্ম্মের একশেষ করিয়াছ; তথাপি তুমি এখনও নিষ্কণ্টকে বসিয়া আছ—তোমার একটীমাত্র কেশও উৎপাটিত হয় নাই; একথা সত্য। কিন্তু তুমি কি জান যে, কেন তোমার এরূপ অবস্থা হইয়াছে? কেনই বা তুমি পিশাচ অপেক্ষাও নিন্দনীয় কার্য্য-সকল সম্পাদন করিয়া এখনও স্বচ্ছন্দে এ জগতে বিহার করিতেছ? যদি তুমি তোমার দলের সমস্ত লোককে ধরাইয়া না দিতে; যদি তুমি তোমার ভয়ঙ্কর পাপের সমস্ত কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করিয়া অন্যান্য সকলের বিপক্ষে প্রকৃত কথা বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান না করিতে; তাহা হইলে তোমার অনুচরবর্গের ন্যায় তোমার অস্তিত্বও অদ্য লোপ পাইত। আর, তুমি কেবল প্রকৃত কথা সকল বলিয়াছ বলিয়াই যে, এ যাত্রা পরিত্রাণ পাইয়াছ, তাহাও নহে; তোমার সাক্ষ্যের গুণে অন্য কতকগুলি দোষী ব্যক্তির মধ্যে, কেহ চির-নির্ব্বাসিত হইয়াছে, কেহ বা ইহ-জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে বলিয়াই, তুমি তোমার জীবনদান পাইয়াছ। আমি তোমার অনেক কথা অবগত হইয়াছি। কিন্তু তোমার জীবনের সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিবার ইচ্ছা আমার প্রবলবতী হইয়াছে বলিয়াই, তোমাকে এই অনুরোধ করিতেছি। যদি আমার বাসনাকে পরিতৃপ্ত কর, তাহা হইলেই আমি অতিশয় সুখী হইব।"—এই বলিয়া অন্য ব্যক্তিও নীরব হইলেন।

তখন আমির আলি পুনরায় কহিতে লাগিল —"মহাশয়, আমি আপনার অনুরোধ অবশ্যই রক্ষা করিব। আমি শৈশবকাল হইতে আরম্ভ করিয়া আমার জীবনের বৃত্তান্ত যতদূর পারি, বলিতেছি; আপনি শ্রবণ করুণ; বা যদি কিছু লিখিয়া লইতে চাহেন, তাহাও লউন।

"আমি কাহার সন্তান, তাহা জানি না। আমার পিতা-মাতা কে, বা আমার জন্মস্থান কোথায়, তাহাও আমি অবগত নহি। শৈশবকালের অবস্থা আমার যতদূর মনে আছে, তাহাতে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, একটী মধ্যমবয়স্কা গৌরাঙ্গী স্ত্রীলোক আমার মা; এবং একজন দীর্ঘ, বলিষ্ঠ ও শ্যামবর্ণ পুরুষ আমার পিতা ছিলেন। তাঁহাদিগের নাম কি, বা তাঁহারা কোন্ জাতীয় ছিলেন, তাহা আমি বলিতে পারি না। আমার পিতামাতা বড়-লোক ছিলেন কি না, তাহা জানি না; কিন্তু তাঁহারা যে নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন, তাহাও নহে। আমার বয়স যখন নিতান্ত অল্প, এবং যে সময়ের কথা আমার অল্প অল্প মনে আছে; তাহাতে আমি এই মাত্র বলিতে পারি যে, আমার সহিত একটী স্ত্রীলোক ও একটী পুরুষ সর্ব্বদা থাকিত। বোধ হয় তাহারা আমার পরিচর্য্যাতেই নিযুক্ত ছিল। আমি সর্ব্বদা সুবর্ণ ও রৌপ্য-নির্ম্মিত অলঙ্কারে ভূষিত থাকিতাম। আরও মনে হয়, তখন যেন, আমার একটী ছোট ভগ্নী আমার সহিত সর্ব্বদা থাকিত; এবং আমি তাহাকে বড়ই ভাল বাসিতাম। যেরূপ অবস্থায় আমি দিন যাপন করিতাম, হঠাৎ এক দিন কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তন দেখিলাম। দেখিলাম, খাবার

কতকগুলি দ্রব্যাদি একত্রিত করিয়া বাক্স প্রভৃতিতে বন্ধ হইতেছে; কাপড়-বিছানা প্রভৃতি একস্থানে সংগ্রহ-পূর্ব্বক বাঁধা-ছাঁদা হইতেছে। এই সকল দেখিয়া তখন কিছু বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু পরক্ষণেই আমরা সকলে সেই স্থান হইতে বহির্গত হইলাম। আমি ও আমার মাতা একখানি শিবিকায় আরোহণ করিলাম; পিতা তাঁহার একটী প্রকাণ্ড ঘোড়ায় উঠিলেন। ভারবাহীগণ ঐ সকল দ্রব্যাদি লইয়া চলিল; চাকরগণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লাঠি-হস্তে আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল; চাকরাণীগণও আমাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিল না। কেবল আমার সেই প্রাণের ভগ্নী আমাদের সহিত আসিল না; সে বাড়ীর অন্যান্য লোকদিগের সঙ্গে থাকিল। আমরা চলিতে লাগিলাম। কিন্তু তখনও আমি বুঝিলাম না যে, আমরা কোথা হইতে আসিতেছি; কোথায় যাইব; এবং কেনই বা যাইতেছি। স্থানে স্থানে বিশ্রাম করিতে করিতে, স্থানে স্থানে রাত্রি যাপন করিতে করিতে, আমরা চলিতে লাগিলাম। পরে এইরূপে তিন দিবস আমরা চলিলাম; ক্রমে চতুর্থ দিবস আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই দিবসও নিয়মিত গমনের পর, আমরা এক স্থানে আসিয়া উপনীত হইলাম; সেই স্থানের বাজারে আমাদিগের বাসস্থান নিরূপিত হইল। চাকর-চাকরাণীগণ আহারাদির যোগাড় করিতে লাগিল। মাতা একখানি ঘরের ভিতর শয়ন করিয়া রহিলেন; পিতা কি জানি কি নিমিত্ত বাহির হইয়া গেলেন। এই সময়, আমাদিগের বাসার সম্মুখে কতকগুলি বালক খেলা করিতেছিল। আমি এই সুযোগ দেখিয়া, আর থাকিতে পারিলাম না; চাকর-চাকরাণী প্রভৃতি সকলের অজ্ঞাতে, আমিও সেই স্থানে গমন করিয়া তাহাদিগের সহিত খেলা করিতে লাগিলাম।

"আমরা যে স্থানে খেলা করিতেছিলাম, সেই স্থানে হঠাৎ একটী লোককে দেখিতে পাইলাম। তিনি আমার সহিত বেশ মিষ্ট মিষ্ট স্বরে কথা কহিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার কথায় ভুলিয়া গেলাম। তখন তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া নিকটবর্ত্তী একটী দোকান হইতে কতকগুলি মিঠাই খরিদ করিয়া আমার হাতে দিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। আমি মিঠাই লইয়া যেমন আসিতেছি, অমনি সেই বালকগণ ঐ মিঠাই আমার হস্ত হইতে জোর করিয়া কাড়িয়া লইবার মানসে আমার উপর আক্রমণ করিল। আমিও প্রাণপণে উহাদিগকে বাধা দিতে লাগিলাম। কিন্তু সেই হুড়াহুড়িতে মিঠাইগুলি সেই স্থানে পড়িয়া গেল। ঐ বালকগণের মধ্যে একটী অধিক বয়স্ক বালক তখন আমার গলা হইতে সোনার হার ছড়াটি কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল; আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম। আমার চীৎকার শুনিয়া আমার সেই মিঠাই-দাতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং বালকগণকে দূরে তাড়াইয়া দিয়া আমাকে লইয়া আমাদিগের বাসায় গেলেন। তাঁহারই অনুগ্রহে আমি এ বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইলাম। তিনি তখন চাকর-চাকরাণীগণকে ভৎর্সনা করিয়া, যাহাতে আমি আর কখনও একাকী বাহিরে যাইতে না পারি, তাহা বলিলেন। আমার মাতা ঘরের ভিতর হইতে সমস্ত কথা শুনিতে পাইলেন। কিন্তু অপরিচিত ব্যক্তির নিকট তিনি বাহির হইতে পারেন না; কাজেই পরিচারিকা দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন যে—"অদ্য আপনি যেরূপ বন্ধুর কার্য্য করিয়া আমাদিগকে বিশেষ উপকৃত করিলেন, তাহার প্রত্যুপকার করা আমাদিগের সাধ্য নাই; কিন্তু তথাপি যদি এই বালকের পিতা এখন বাসায় থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি যে আপনার নিকট কতদূর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেন, তাহা আমি বলিতে পারি না। তিনিও বোধ হয় ২।৩ ঘণ্টার মধ্যেই প্রত্যাগমন করিবেন। যদি

আপনি আর একবার আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাহা হইলে আমরা যে কতদূর সুখী হইব,তাহা বলিতে পারি না।" আগন্তুকও পুনরায় আসিব বলিয়া, তখন প্রস্থান করিলেন। ইহার অল্পক্ষণ পরেই আমার পিতা প্রত্যাগমন করিলেন; মাতার নিকট হইতে তিনি সমস্ত কথা শুনিলেন। শুনিয়া, আমাকে ডাকাইলেন; এবং আমি তাঁহার সম্মুখে আসিলে তিনি আমার কার্য্যের উপযুক্ত সাজা প্রদান করিলেন। আমি সেই দিবস আমার পিতার নিকট হইতে যেরূপ প্রহার খাইয়াছিলাম, তাহা এখন পর্য্যন্তও আমার মনে জাগরুক আছে। সামান্য বিষয়ের নিমিত্ত কখন যে কি আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা স্থির করা সহজ নহে।

"সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সেই আগন্তুক ব্যক্তি তাঁহার আর একজন বন্ধুর সহিত আমাদিগের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পিতার সহিত তাঁহার অনেক কথাবার্ত্তা হইল। কথাবর্ত্তায় 'ঠগ' এই কথাটি আমি বুঝিতে পারিলাম; এবং আরও বুঝিলাম যে, তাঁহারা ইন্দোরের মহারাজার সেনানী; কোন কার্য্য-উপলক্ষে দূরদেশে গমন করিয়াছিলেন, এবং এখন ইন্দোরে প্রত্যাগমন করিতেছেন। কিন্তু এই স্থানে দস্যুদিগের অতিশয় ভয়—এই নিমিত্ত তাঁহারা গ্রামের বাহিরে রাত্রি-যাপন-মানসে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছেন। পর দিবস প্রাতঃকালে এই স্থান হইতে গমন করিবেন। আমার পিতা এই কথা শুনিয়া এবং আমরা যে পথে যাইব তাঁহারাও সেই পথে যাইবেন জানিয়া, তাঁহাদিগের সহিত একত্রে গমন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহারাও সম্মত হইলেন। পিতার মনেও বিশেষ সাহস হইল, মহারাজের সিপাহিদিগের সহিত গমন করিলে পথে দস্যুগণ আর কিছুই করিতে পারিবে না। আমিও ঐ আগন্তুক ব্যক্তির উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। তিনি আমাকে তাঁহার অস্ত্র-শস্ত্র প্রদান করিলেন; আমি তাহা লইয়া ক্ষণকাল ক্রীড়া করিলাম; এবং পর দিবস তিনি আমাকে তাঁহার ঘোড়ায় চড়িতে দিবেন, বলিলেন। আমি ঐ আগন্তুকের উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম সত্য; কিন্তু তাঁহার সঙ্গের অপর এক ব্যক্তির কুৎসিত আকৃতিতে আমি তাহার উপর বিরক্ত হইলাম; তাহার কথা আমার ভাল লাগিল না। তাহাকে যেন আমি বিষ চক্ষে দেখিলাম।

"পর দিবস প্রাতঃকালে আমরা সকলে বহির্গত হইলাম। গ্রামের বহির্ভাগে আম্র-বৃক্ষ-কুঞ্জের ভিতর সেই সেনানীগণের শিবির সন্নিবেশ ছিল; আমরা তথায় গিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিলাম। তখন, তাঁহাদিগের অন্যান্য সৈন্যগণের সহিত সকলে একত্রে, সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া ইন্দোর-অভিমুখে যাত্রা করিলাম। এইরূপে ক্রমে আমরা দুই দিবস গমন করিলাম। আমার সেই উপকারী বন্ধুটী তখন তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূরণ করিলেন; তিনি আমাকে তাঁহার ঘোড়ার উপর চড়াইলেন। অতঃপর আমি প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা তাঁহার ঘোড়ার উপর তাঁহার সম্মুখে বসিয়াই, গমন করিতে লাগিলাম। তবে যখন রৌদ্রের তেজ প্রখর হইত,সেই সময় কেবল আমি আমার মাতার সহিত শিবিকার ভিতরে থাকিতাম।

"এইরূপে তৃতীয় দিবস প্রাতঃকালে, যখন আমি আমার সেই উপকারী বন্ধুর সহিত তাঁহার ঘোড়ায় চড়িয়া গমন করিতেছিলাম; সেই সময় আমার পিতাও তাঁহার ঘোড়ায় চড়িয়া আমাদিগের ঘোড়ার পাশে পাশে গমন করিতেছিলেন। সেই সময় আমার সেই বন্ধুটী পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—'মহাশয়, আপনি আপনার অনুচরবর্গকে সঙ্গে করিয়া আর কেন লইয়া যাইতেছেন! উহাদিগকে এখন ফিরাইয়া দিতে পারেন। কারণ,আমি ও আমার অনুচরবর্গই এখন আপনাদিগকে অনায়াসেই ইন্দোরে পৌঁছিয়া দিতে পারিব। আমরা গত দুই দিবস পর্য্যন্ত যে সকল জঙ্গলের ভিতর দিয়া আসিয়াছি, সেই সকল স্থান দস্যু ও ঠগে পরিপূর্ণ। যখন আমরা নিরাপদে সেই সকল স্থান পরিত্যাগ করিয়াছি, তখন আমাদিগের আর ভাবনা নাই। এখন আমরা নিরাপদে পৌঁছিতে পারিব। আপনি এখন আপনাদিগের অনুচরবর্গকে বিদায় করিয়া দিতে পারেন।'

"বন্ধুর এই কথা শুনিয়া পিতা সম্মত হইলেন; এবং বলিলেন,—'ইহারা আমাদিগের সহিত যখন ৫০।৬০ ক্রোশ আসিয়াছে, আর আমরা যখন দস্যুদিগের স্থান পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছি, তখন ইহাদিগকে আর অধিক কষ্ট দেওয়া অনাবশ্যক। এখন ইহাদিগের এই স্থান হইতে ফিরিয়া যাওয়াই উচিত।'—এই বলিয়া পিতা তাঁহার অন্যান্য অনুচরবর্গকে বিদায় দিলেন। তাহারাও সন্তুষ্ট হৃদয়ে সেই স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল। তাহারা আমাদিগের নিকট লইতে বিদায় লইবার কালীন, আমার খেলিবার সঙ্গীগণকে মনে পড়িল। আমার মনের কথা তাহাদিগকে দিয়া বলিয়া দিলাম। সেই সময়ে আমার আর একটী কথা মনে আসিল; আমার প্রাণের ভগ্নীর নিমিত্ত মন কাঁদিল। আমার হস্ত হইতে আমার অঙ্গুরি খুলিয়া তাহাদিগের একজনের হস্তে প্রদান করিয়া বলিয়া দিলাম,—'ইহা আমার প্রাণের ভগ্নীকে দিও; এবং বলিও, তাহার স্নেহের ভ্রাতার স্মরণ-চিহ্ন-স্বরূপ এই অঙ্গুরি যেন সে তাহার অঙ্গুলে পরিধান করে।' পরে তাহারা সকলে আমাদিগকে সেই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল।

"মহাশয়, বলিতে এখন হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, শরীর শিহরিয়া উঠিতেছে, প্রাণ আকুল হইতেছে যে, ঐ অঙ্গুরি আমার হস্তে পুনরায় কিরূপে আসিয়াছিল! আমি কিরূপ অবস্থায় ঐ অঙ্গুরি পুনরায় দেখিয়াছিলাম!"

এই কথা বলিতে বলিতে আমির আলি একেবারে অধৈর্য্য হইয়া পড়িল; তাহার শরীর শিহরিয়া উঠিল; মন অস্থির হইল; চক্ষু দিয়া জলধারা ঝরিতে লাগিল। আমির আলি ক্ষণকালের নিমিত্ত নিস্তব্ধ রহিয়া, পরিশেষে আবার বলিতে আরম্ভ করিল,—"মহাশয়, আমার অতীত কাহিনী সকল স্মরণ করিতে করিতে হঠাৎ যেন নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; এক স্রোত সরিতে না সরিতে যেমন রাশি রাশি স্রোত আসিয়া তাহার উপর পড়ে, সেইরূপ আমার এক কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে রাশি রাশি অতীত ঘটনা আসিয়া একেবারে হৃদয় অধিকার করিতেছে। কোনটী অগ্রে বলিব, কোনটী বা পশ্চাৎ বলিব, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। কাজেই মন আলোড়িত হইয়া আসিতেছে; শরীর কাঁপিতেছে; মুখ শুখাইয়া যাইতেছে।"—এই বলিয়া আমির আলি একটু জল পান করিল; এবং ক্ষণকালের নিমিত্ত কি ভাবিল। দুই একবার চক্ষু-জল মুছিল; ও পরিশেষে পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল।

"সেই দিন সন্ধ্যার সময় আমাদিগের সেই বন্ধু আমার পিতার নিকট আগমন করিলেন; ও বলিলেন,—'এই স্থান হইতে ইন্দোর আর অধিক দূর নাই। আমরা কল্যই সেই স্থানে পৌঁছিতে পারিব। বিশেষ, এই স্থান হইতে ইন্দোরে গমন করিবার দুইটী পথ আছে; তাহার একটী পথ অতি সহজ। আমরা সেই পথ দিয়াই গমন করিব। আর আমরা মনস্থ করিয়াছি যে, যেমন আকাশ-পটে চন্দ্রদেব উদয় হইবেন, সেই সময়েই আমরা এই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিব। তাহা হইলে আমাদিগের বিশেষ কোন কষ্টই হইবে না; অথচ সকাল সকাল গিয়া সেই স্থানে উপনীত হইতে পারিব। কিন্তু শিবিকা-বাহকদিগকে অতিশয় ক্লান্ত বোধ হইতেছে। তবে তাহা

দিগকে কিছু অতিরিক্ত পারিতোষিকের প্রলোভন দেখাইলেই তাহারা সহজেই গমন করিবে।' এই কথা শুনিয়া আমার বৃদ্ধ পিতা সম্মত হইলেন; রাত্রের সেই চন্দ্রালোক সময়েই সেই স্থান পরিত্যাগ করা স্থির করিলেন; এবং কহিলেন,—'আমার নিকট প্রচুর অর্থ আছে। আমি অনায়াসেই শিবিকা-বাহকদিগকে উত্তমরূপে পারিতোষিক দিতে পারিব। নিরূপিত সময়ে আমরা সকলে গাত্রোত্থান করিয়া সেই স্থান হইতে যাত্রা করিলাম। যদিও অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল, তথাপি চন্দ্রালোক হইতে আমরা একেবারে বঞ্চিত ছিলাম না। সেই সামান্য আলোকের সাহায্যে আমরা চলিতে লাগিলাম। আমি আমার মাতার সহিত শিবিকার ভিতর থাকিলাম; পিতা ও আমাদিগের বন্ধু প্রভৃতি সকলে অশ্বারোহণে গমন করিতে লাগিলেন। আমরা কয়েক ক্রোশ গমন করিতে না করিতে, শিবিকা-বাহকগণ শিবিকা এক স্থানে নামাইল; ও বলিতে লাগিল,—'দিন না হইলে আমরা আর কোন প্রকারেই যাইতে পারিব না। একে ভালরূপ রাস্তা দেখিতে পাইতেছি না, তাহাতে আবার কর্দ্দমে আমাদিগের পা পিছলিয়া যাইতেছে।' এই কথা শুনিয়া পিতা অতিশয় রাগান্বিত হইলেন; উহাদিগকে যথেষ্ট ভৎর্সনা করিলেন। কাজেই উহারা পুনরায় শিবিকা লইয়া চলিল।

"এখন আর বৃষ্টি পড়িতেছে না; চন্দ্রদেবও তাঁহার আলোক কিছু পরিষ্কাররূপে প্রদান করিতেছেন। এই সময় আমি শিবিকার ভিতর আর থাকিতে অসম্মত হইলাম; আমার সেই বন্ধুর ঘোড়ায় উঠিয়া তাঁহার সহিত গমন করিতে চাহিলাম। কিন্তু অন্য দিবস তিনি যেরূপ আগ্রহ ও যত্নের সহিত আমাকে তাঁহার ঘোড়ার উপর উঠাইয়া লইতেন, আজ তাঁহাকে সেরূপ বোধ হইল না। তিনি প্রথমে অসম্মত হইলেন। কিন্তু আমি কোন প্রকারে না ছাড়ায়, পরিশেষে তিনি আমাকে তাঁহার ঘোড়ার উপর উঠাইয়া লইয়া চলিতে লাগিলেন। এই সময়ে পিতা দেখিলেন যে, যে সকল সিপাহি আমাদিগের সহিত আগমন করিতেছিল, তাহারা কেহই আমাদিগের সঙ্গে নাই। ইহার কারণ ক্রমে আমাদিগের সেই বন্ধুর নিকট হইতে এইরূপ জানিতে পারা গেল যে, আমরা যেরূপ আস্তে আস্তে চলিতেছি, তাহাতে সকলে একত্রে যাওয়া নিতান্ত অসম্ভব; তাহারা অগ্রে গমন করিয়াছে। আরও বুঝা গেল যে, যেন আমরা একটু দ্রুত গমন করিলেই তাহাদিগের সহিত মিলিতে পারি।

"আমরা সকলে গমন করিতে লাগিলাম। ক্রমে একটী নদীর গর্ভে আসিয়া পতিত হইলাম। ঐ নদী একটী ভয়ানক নিবিড় জঙ্গলের ভিতর দিয়া প্রবাহিত। ঐ স্থানে আগমন করিলে, আমার বন্ধু ঘোড়া হইতে অবতরণ করিলেন; এবং কহিলেন,—'তুমি আস্তে আস্তে ঘোড়া লইয়া চল; আমি একটু জল পান করিয়া আসিতেছি।' আমি আমার সাধ্যমত ঐ ঘোড়া লইয়া আস্তে আস্তে চলিতে লাগিলাম। এইরূপে প্রায় শত হস্ত যাইতে না যাইতে, আমার পশ্চাৎ ভাগ হইতে এক প্রকার ভয়ানক শব্দ উত্থিত হইল। ঐ শব্দে আমার মনে বড় ভয় হইল; শরীর শিহরিয়া উঠিল। আমি পশ্চাৎভাগে দৃষ্টি করিবার নিমিত্ত যেমন ফিরিতে গেলাম, অমনি আমি ঘোড়া হইতে সেই স্থানে পড়িয়া গেলাম। একখানি প্রস্তরে আমার কপাল কাটিয়া রক্ত ধারা ঝরিতে লাগিল। মহাশয় দেখুন, সেই ক্ষত-চিহ্ন অদ্যাবধি ও আমার কপালে এই বিদ্যমান রহিয়াছে।

"অতি অল্প সময় মধ্যেই আমি উঠিলাম। উঠিয়াই যাহা দেখিলাম, যত দিন বাঁচিব, তাহা আর ভুলিব না। দেখিলাম, যে সকল সিপাহি

অনুপস্থিত ছিল, এখন তাহারা সকলে একত্রিত হইয়া আমার মাতার শিবিকা লুটপাট করিতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম। আমার চীৎকার শুনিয়া আমাদিগের বন্ধুর সমভিব্যাহারী পূর্ব্ব-পরিচিত সেই কুৎসিৎ ব্যক্তি আমার দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিল; এবং কহিল,—'হতভাগ্য, আমরা তোকে ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়া, তুই এখনও আছিস।'—এই বলিয়া এক খানা রুমাল দ্বারা আমার গলা বেষ্টন করিল; আমার শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল। এই সময়ে আমার বন্ধু আমার দিকে দৌড়িয়া আসিলেন: আমাকে মারিতে তাহাকে নিষেধ করিলেন; জোর করিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিলেন। তখন উভয়ের মধ্যে ভয়ানক বিরোধ উপস্থিত হইল; উভয়েই আপন-আপন তরবারি নিষ্কাসিত করিলেন। ইহার পর যে আর কি হইল, তাহা বলিতে পারি না। আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম।

"পরে যখন আমি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তখন কি দেখিলাম? হায়! এখন সেই দৃশ্য মনে করিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে; কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিতেছে। তখন দেখিলাম, সেই নদী-তীরে সৈকত-শয্যায় কে শুইয়া আছে; যেখানে-সেখানে কাহাদিগের শব গড়াগড়ি যাইতেছে!! হায়! সে সব আর কেহই নহে; আমার সেই স্নেহময়ী জননী, আর আমাদিগের দাসদাসী শিবিকা-বাহক প্রভৃতি সকলেই অঘোর নিদ্রায় অভিভূত! এই দৃশ্য দেখিয়া আমার মনে যে কি হইল, তাহা এখন বলিতে পারি না। সেই দিন একবার প্রাণ ভরিয়া, মা মা বলিয়া জন্মের মত ডাকিলাম; দৌড়িয়া গিয়া তাঁহার বক্ষের উপর পড়িলাম; তাঁহার গলা ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে মা মা বলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। কিন্তু মা আমার আর শুনিলেন না; তাঁহার মুখ দিয়া একটী কথাও নির্গত হইল না। তাঁহার মুখের দিকে একবার তাকাইলাম; তাঁহার সে মুখশ্রী নাই, সে চক্ষু নাই; সকলই বিকৃত হইয়া গিয়াছে। এই দৃশ্য দেখিয়া আমার মনে যে কি ভাবের উদয় হইল, তাহা বলিতে পারি না। আমি একেবারে অজ্ঞান হইয়া সেই স্থানেই মাতৃ-বক্ষে পড়িয়া রহিলাম। মহাশয়, এ অনেক দিনের ঘটনা! কিন্তু আমার মাতার সেই মুখশ্রী যেন এখনও আমার সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে; ইহা যেন কল্যকার ঘটনা বলিয়া বোধ হইতেছে।

"এই সকল ঘটনার অবস্থা আমি অনেক দিন পরে একজন বৃদ্ধ ঠগের মুখে আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়াছি। সময়-মত যতদূর পারি, বলিব।

"যখন পুনরায় আমার সংজ্ঞালাভ হইল, তখন দেখিলাম, আমি আমাদিগের সেই বন্ধুর সহিত গমন করিতেছি। তিনি কখনও আমাকে স্কন্ধে, কখনও বা হস্তে ধরিয়া অশ্বারোহণে চলিতেছেন। ভয়ানক নিবিড় জঙ্গলের ভিতর দিয়া যাইতেছেন। এই সময় আমার গলায় এরূপ বেদনা হইয়াছে যে, আমার আর গলা নাড়িবার ক্ষমতা নাই; চক্ষু যেন বহির্গত হইয়া যাইতেছে, বোধ হইতেছে। সেই ভয়ানক দৃশ্য আবার যখন আমার মনে আসিতেছে, আমি পুনরায় অজ্ঞান হইতেছি। এইরূপে ক্রমে আমরা এক স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই স্থানে একটী বৃক্ষমূলে এক খানি কাপড় বিছাইয়া আমাকে শোয়াইলেন। তখন দেখিলাম, সূর্য্যদেব উদয় হইয়াছেন; আর সেই বন্ধু আমার নিকট বসিয়া আছেন। আমি তাঁহাকে দেখিয়া অতিশয় রাগান্বিত হইলাম; তিনি এই ভয়ানক ঘটনার সমস্ত বিষয় উত্তমরূপ অবগত আছেন বিবেচনা করিয়া, তাঁহাকে শত শত কটু-কাটব্য প্রয়োগ করিলাম। এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে আমাকেও হত্যা

করিয়া সেই যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত বার বার অনুরোধ করিলাম। কিন্তু তিনি কিছুতেই কর্ণপাত করিলেন না। তবে সেই কুৎসিৎ ব্যক্তি, যাহার নাম আমি সেই সময় গণেশ বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলাম, আমার কথা শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করিল; এবং কহিল,—'ইসমাইল! তুমি কি স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ যে, এই বালকের প্রাণ-সংহার করিতে তোমার মন এত বিগলিত হইতেছে! তুমি না পার, আমি এখনই ইহাকে সমন-সদনে প্রেরণ করিতেছি।' এই বলিয়া ক্রুদ্ধভাবে গণেশ একখানি রোমাল-হস্তে আমার নিকট আগমন করিল।

"ইসমাইল পুনরায় তাহাকে বাধা দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করিলেন; এবং আমাকে সেই স্থান হইতে অন্য আর একটী বৃক্ষের নীচে লইয়া গিয়া অপর ৮।১০ ব্যক্তির নিকট আমাকে সমর্পণ করিয়া, তিনি সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। সেই সময় আমার গলার বেদনা এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে, আমি আর কোন প্রকারেই কথা কহিতে পারিলাম না। ক্রমে আমি সেই স্থানেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। পরে যখন আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, দেখিলাম, ইসমাইল আমার নিকট বসিয়া আছেন। তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—'পুত্র, আমি এই ব্যাপারের কিছুই অবগত নহি; আমার দ্বারা এই ভয়ানক কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই। তুমি পিতা-মাতা হারাইয়াছ সত্য; কিন্তু জানিও, অদ্য হইতে তুমি আমারই পুত্র।'

"তিনি আমার গলায় উত্তমরূপে তৈল দ্বারা মালিস করিয়া কতকগুলি পাতা জড়াইয়া বাঁধিয়া দিলেন। ইহাতে আমার ক্রমে সুস্থ বোধ হইতে লাগিল। সেই সময়ে আমাকে একটু দুগ্ধ পান করিতে দিলেন, ও আমি তাহা পান করিলাম। পরে সন্ধ্যার সময় আমাকে একটু সরবত পান করিতে দিলেন; এবং উহা পান করিবা-মাত্রই আমি নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। বোধ হয়, উহাতে অহিফে বা ঐরূপ অন্য কোন মাদক-দ্রব্য মিশ্রিত ছিল। তাহার পর দিবস আমার নিদ্রা ভ হইল। যখন আমার নিদ্রা ভঙ্গ হই তখন দেখিলাম, আমি ইসমাইলের সহি অশ্বপৃষ্ঠে গমন করিতেছি। সেই সম আমার একটু সুস্থ বোধ হইতে লাগিল গণেশকে আর দেখিতে পাইলাম না।

"ইসমাইল ও তাঁহার কেবল সাত মাত্র সঙ্গী অতঃপর আমাকে লইয়া গম করিতে লাগিলেন। ক্রমে আমরা সক একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে যাইয়া উপনীত হ লাম। এই গ্রামেই ইসমাইলের বাসস্থান ইসমাইল তাঁহার সুশ্রী যুবতী পত্নীর নিক আমাকে লইয়া গেলেন; তাঁহার কে আত্মীয়-পুত্র বলিয়া আমার পরিচয় দিলেন এবং ইহাও বলিলেন যে, অনেক দিন হই তিনি আমাকে পোষ্যপুত্র লইয়াছিলেন তাঁহার পত্নীরও আর পুত্রাদি না থাকায়, তি আমাকে তাঁহার আপন পুত্রের ন্যায় প্রতি পালন করিতে লাগিলেন। আমিও ক্রমে ক্র আপন পিতা-মাতাকে ভুলিয়া, ইসমাইল তাঁহার পত্নীকেই পিতা-মাতা জ্ঞান করি লাগিলাম।"

সতী-কাহিনী।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত খান্দার-প গণার মধ্যে 'মদনমোহন-চক' নামক একটী ক্ষু পল্লীগ্রাম আছে। বর্ত্তমান সময়ে এই স্থা কতকগুলি কৃষকের বসতি; আর ২।৫ ঘর মধ্য শ্রেণী ব্রাহ্মণের বাস আছে। এইস্থা 'সতীর হাট' নামক একটী বৃহৎ হাট, আ 'সতীসরোবর' নামে একটী পুষ্করিণী আছে সেই পুণ্য সরসী-তটে সতীর সমাধি-মন্দি

আছে। এখানে প্রত্যেক সপ্তাহে দুইদিন হাট হইয়া থাকে। হাটের দিনে অনেক স্ত্রীলোক ফুলের মালা গাঁথিয়া সেই সতী-সমাধিতে অর্পণ করে। পতির মঙ্গল-কামনায় এবং পতি-সোহাগিনী হইবার মানসে, স্ত্রী-লোকেরা সেই সমাধি-মন্দিরে পূজা করিয়া থাকে। ফলতঃ এই সমাধি-মন্দির অতি পবিত্র, দেবস্থান-তুল্য সম্মানিত। অনেক কুলবালা স্বহস্তে মন্দির মার্জ্জন করেন; আর পুষ্প-চন্দনে সেই মন্দির সুশোভিত রাখেন।

এই 'সতীর হাট' পুরাতন জগন্নাথ-রাস্তার অতি নিকটবর্ত্তী। সতী-সমাধি সম্বন্ধে এ প্রদেশে এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে:—কোন সময়ে বঙ্গদেশীয় একজন ব্রাহ্মণ সস্ত্রীক জগন্নাথ দেব দর্শন-জন্য পুরী গমন করিতে ছিলেন। ইনি বঙ্গের কোন্ জেলায় কোন্ গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবিষয় কোন ব্যক্তি অবগত নহেন। ব্রাহ্মণ এইস্থানে আগমন করিয়া অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন; এবং তাঁহার সাধ্বী সহধর্ম্মিণী পতির সহিত এইখানে এক বৃক্ষমূলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সহযাত্রীগণ কিন্তু বিপন্ন ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। জগন্নাথ-রাস্তায় এইরূপ রীতি অদ্যাপিও প্রচলিত আছে। দৈবাৎ কোন ব্যক্তি যদি পীড়িত হইয়া পড়েন, সঙ্গীগণ সেই হতভাগ্যের প্রতি প্রায় দৃষ্টিপাত না করিয়াই চলিয়া যায়। ইহার প্রধান কারণ এই যে,—এই রাস্তার অধিকাংশই বিজন প্রান্তর; নিকটে লোকালয় নাই; অবস্থানের সুবিধা নাই; ভাল পান্থনিবাস নাই; পীড়িত হইলে চিকিৎসাদির সুব্যবস্থা করিবার কোন উপায় নাই। অধিকাংশ যাত্রী প্রগাঢ় ধর্ম্ম-বিশ্বাসে ৺জগন্নাথ দেব দর্শন-জন্য বাটী হইতে জীবনের আশা পরিত্যাগেই এপথে আইসে। এইক্ষণ জগন্নাথ-পথ অনেক নিরাপদ হইয়াছে; কিন্তু পূর্ব্বে পদে পদে বিপদাশঙ্কা ছিল। দস্যু, তস্কর, হিংস্র জন্তুতে এই রাস্তা পরিপূর্ণ থাকিত। যাত্রীগণ সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন-বাধার প্রতিই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া চলিয়া যাইত। তবে নিতান্ত আত্মীয় লোক সঙ্গে থাকিলে, অগত্যা পীড়িতের সহিত অবস্থিতি করিতে বাধ্য হয়।

পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পতিব্রতা পত্নী স্বামীর জীবনাশা পরিত্যাগ করিলেন। নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসী কৃষকগণও ক্রমশঃ ব্রাহ্মণের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া, বহুলোকে সম্মিলিত হইল। এদিকে ব্রাহ্মণের জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইল; বিপ্র-পত্নী নিতান্তই বিপন্না হইয়া পড়িলেন। তিনি কৃষকগণকে বলিলেন,—"আমার পুত্র-কন্যা আত্মীয়-স্বজন এখানে কেহই নাই; এই-ক্ষণ তোমরা আমার সন্তান, আত্মীয়, বন্ধু। জগৎ-বন্ধুর চাঁদমুখ দেখিয়া জীবন পবিত্র করিব, সেই আশায় এত দুঃসহ দুঃখ-ক্লেশ তুচ্ছ করিয়া, গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলাম। কিন্তু অদৃষ্টে সে সুখ কোথায়? যে হতভাগ্য ভারত-যুদ্ধে অর্জ্জুনের রথে ভগবানকে দর্শন করে নাই, দীন-দয়াময় হরি কি তাহাকে দর্শন দেন! আমাদের ভাগ্যে যাহা ছিল, তাহা তো ঘটিয়াছে। এইক্ষণ তোমাদিগকে আমার বিশেষ অনুরোধ, এই চিতা প্রস্তুত করিয়া দেও; আমি স্বামীর অনুমৃতা হইয়া জীবন পবিত্র করিব।" ব্রাহ্মণ-কন্যার এই বিলাপোক্তি শ্রবণ করিয়া সেই অশিক্ষিত কৃষকদিগের মনে দয়ার উদ্রেক হইল। তাহারা বলিল,—"মা! আমরা চিতা-প্রস্তুতের দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া দিতেছি; আপনি ব্রাহ্মণ ঠাকুরের দেহ সৎকার করিয়া, গৃহে গমন করুন। আমরা আপনার পুত্র; আমরা বাটীতে রাখিয়া আসিব।" ব্রাহ্মণী বলিলেন,—"পতিই আমার ধর্ম্ম, মোক্ষ; পতিই আমার দেবতা। আমি পতি-পদ বক্ষে ধারণ করিয়া পাপ জীবন-ভার পরিত্যাগ করিব।"

পূর্ব্বকালে আমাদিগের দেশে সহমরণ-প্রথা যদিও প্রচলিত ছিল, কিন্তু তাহা উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। এই সকল উৎকলের সীমান্ত-স্থানে, বিশেষতঃ নিকৃষ্ট জাতির মধ্যে, এই প্রথা কখনই প্রচলিত ছিল না। কিরূপে সতীরমণী পতির অনুগমন করে, এদেশবাসী নিকৃষ্ট জাতি-সকল তাহা কখনও দেখে নাই। সেই পুণ্যদা তিথি—যে দিবস সতী-সীমন্তিনী বিপ্র-পত্নী পতির অনুগমন করিলেন—সেই দিবস, দেশের আবালবৃদ্ধবণিতা সহস্র সহস্র নরনারী এই পুণ্য সরোবর-তীরে সমবেত হইল। বিপ্র-পত্নী সহাস্য মুখে পতির জ্বলন্ত চিতায় দেহ সমর্পণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে হুতাশন সেই পূজনীয়া দম্পতির দেহ ভস্মীভূত করিল। চতুর্দ্দিকে হরি-ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল কম্পিত হইতে লাগিল। সে দিন এখানে কি এক অভূতপূর্ব্ব মহোৎসব উপস্থিত হইল!

ক্রমে চিতানল নির্ব্বাণ হইলে, সকল লোকে স্বহস্তে সেই পবিত্র চিতায় জল প্রদান করিয়া আপনাদিগের জীবন পবিত্র করিল। সহস্র সহস্র লোক স্বহস্তে পুষ্প-মাল্য রচনা করিয়া সেই সমাধি-ক্ষেত্রে অর্পণ করিল। সেই পবিত্র দিনে বহুজন-সমাগমে এই স্থানে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছিল। তদবধি এই পুণ্য সরোবর-তীরে শত সহস্র লোক সমবেত হইতে আরম্ভ হইল। সেই কারণ, এই হাটের 'সতীর হাট' নামকরণ হইল।

দিনের পর দিন, মাসের পরে মাস, বৎসরের পরে বৎসর, শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে। এইরূপে কত কালই গত হইয়াছে। কিন্তু সেই পুণ্যবতী মাননীয়া সতীর নাম অদ্যাপিও এদেশ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। অদ্যাপিও এদেশের লোক দেবতা-জ্ঞানেই সেই সতী-শিরোমণির স্মরণ করিয়া থাকে। সেই সমাধি-মন্দির পুষ্পমাল্য-চন্দনে সুসজ্জিত করিয়া থাকে। অনেক কুলবালা সেই সতীকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে। এইরূপে একটী বঙ্গীয়া সাধ্বীরমণী এপ্রদেশে দেবতার ন্যায় পূজিতা হইতেছেন! এবিষয় স্মরণ হইলেও, মনে পবিত্র ভক্তি ও প্রীতির উদয় হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইনি কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাঁর জীবনের সেরূপ অবশিষ্ট কোন অংশই জানিবার কোন উপায় নাই।

আমাদিগের দেশের পূর্ব্বতন আর্য্য-নারীদিগের অদ্ভুত ত্যাগ-স্বীকার ও পতি-ভক্তির দৃষ্টান্ত শ্রবণ করিলে, মন ভক্তিরসে পরিপ্লুত হয়। এইক্ষণ সেই সকল বৃত্তান্ত অদ্ভুত উপন্যাসের ন্যায় আমরা শ্রবণ করিয়া থাকি। সমস্ত ভারতের কথা ছাড়িয়া দিলেও, বঙ্গের প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে কিম্বা প্রত্যেক পল্লীতে পল্লীতে অনুসন্ধান কর; তাহাতেও এপ্রদেশে সতী সাধ্বী পতিব্রতা রমণীদিগের যেরূপ আশ্চর্য্য বিবরণ শুনিতে পাইবে, সে সকল বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিলেও, বর্ত্তমান কালে অনেক উপকার হইবার সম্ভাবনা।

নমঃশূদ্র জাতি।

(প্রাপ্ত)

নিজ ব্যবসায়াদি দ্বারা অপরিচিত জাতির পরিচয় করাই মন্বাদি শাস্ত্রের অভিপ্রায়। এমতে দেখা যাইতেছে যে, নমঃশূদ্র জাতির মধ্যে কোন স্থানে কোন সময়েই চণ্ডাল-জাতির ব্যবহার নাই। কস্মিন্ কালেও যে ছিল, তাহারও কোন নির্ভর-যোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। নমঃশূদ্র জাতির নিত্যনৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ-কর্ম্মাদি এবং উপনয়ন ভিন্ন, যাবতীয় সংস্কার-কর্ম্ম ব্রাহ্মণের ন্যায়; এবং শ্রোত্রিয় (আচর্ণি) ব্রাহ্মণেরাও ইহাদিগের কর্ণে মন্ত্র দান করিয়া দীক্ষিত করিতেছেন। অতএব, এই সকল কার্য্য দ্বারা নিঃসন্দেহে স্থিরীকৃত হইতেছে যে, নমঃশূদ্র জাতি কোন মতেই শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভোৎপন্ন চণ্ডাল জাতি নহে।

কোন মহাত্মা লিখিয়াছেন,—"মনুর সময় হইতে ইহাদের (নমঃশূদ্রদের) তাৎকালিক ব্যবহার অপেক্ষা বর্ত্তমান ব্যবহার কোন অংশে উৎকৃষ্টতা লাভ করিয়া থাকিলেও, কেবল এই কারণে, ইহারা চণ্ডালত্ব হইতে মুক্ত হইয়া ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতিত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না। মনুর সময়ে যে জাতির যে ব্যবসা স্থির ছিল, এইক্ষণে মূল চারিটী জাতির মধ্যেই সেই সব ব্যবহারের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সুতরাং কেবল ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া, এক্ষণে কোন উৎকৃষ্ট জাতির নিকৃষ্ট জাতিতে অবনতি, এবং কোন নিকৃষ্ট জাতির উৎকৃষ্ট জাতিতে উন্নতি, সূচিত হইতে পারে না।" তিনি কোন কোন সম্প্রদায়ের নামোল্লেখ পূর্ব্বক আরও লিখিয়াছেন যে,—"তাহারা ইহাদের জল খায় না এবং ইহাদের কোন কর্ম্মও করে না। অতএব ইহারা চণ্ডাল।" ফলতঃ এই সকল কথাও যে সঙ্গত নহে, তাহাও আমরা বলিতে চাহি না। তবে আর্য্য পাঠক মহাশয়গণ নিম্নস্থ কয়েক পঁক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ বিবেচনা করিয়া দেখুন। যথা;—

"অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনস্তথা।
দানপ্রতিগ্রহশ্চৈব ষট্‌কর্ম্মাণ্যগ্রজন্মনঃ।"—মনু।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহণ এই ছয় কর্ম্ম করিবেন। এই বচনটীর দ্বারা মনুর সময়ে ব্রাহ্মণের তাৎকালিক ব্যবহার অবগত হওয়া গেল। এইক্ষণ যদিও ব্রাহ্মণগণ এই ছয় কর্ম্ম ব্যতিরেকে আরও ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসা করিয়া থাকেন, তথাপি ঐ ছয়টি কর্ম্ম তাঁহাদের মধ্যে প্রধানরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এইরূপ অন্যান্য জাতির মধ্যেও মনুর সময়ের ব্যবসায় যে বর্ত্তমান আছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। তবে কেমন করিয়া মূল চারিটী জাতির মধ্যেই মনুর সময়ের ব্যবসায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে? বাস্তবিক মনুর সময়ে যে জাতির যে ব্যবসায় ছিল, এখনও প্রত্যেক জাতির মধ্যে সেই সেই ব্যবসায় অল্প বা অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কেহই (কোন জাতিই) পৈতৃক ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে পারে না বলিয়াই, ভগবান্ মনু নিজ-কর্ম্ম দ্বারা জাতি-স্থির করিবার কথা পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। কোন বিশেষ কারণে দুই একটী ব্যক্তির উন্নতি কি অবনতি হইতে পারে, কিন্তু তজ্জাতীয় সমস্ত লোকের হইতে পারে না। ক্ষত্রিয়-সন্তান বিশ্বামিত্র তপোবলে ব্রাহ্মণ হন, এবং বামদেব মুনি অভিশাপে চণ্ডাল হন; কিন্তু সেই সেই জাতীয় অপর সকলেই অপরিবর্ত্তিত থাকেন। ফলতঃ এযাবৎ এমন একটী জাতিও দেখা যায় নাই যে, যে জাতির মনুর সময়ের ব্যবসায় সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তবে কি কেবলই নমঃশূদ্র জাতির ব্যবসায়ই পরিবর্ত্তিত হইল? ইহা কোন মতেই হইতে পারে না। নিজ কর্ম্ম দ্বারাই অপরিচিত জাতির পরিচয়-করণের প্রবল উপায়; তাহার অনেক প্রমাণ ও উদাহরণ পাওয়া যায়। বেদাদিতে কিছু উৎপত্তি কাল হইতে ব্রাহ্মণের বংশাবলী লিখিত নাই! তবে কেবল ব্যবসায়ের ঐক্য-হেতুই তো আমরা আধুনিক ব্রাহ্মণদিগকে সেই ব্রহ্মার মুখজাত ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি! অতএব, নমঃশূদ্র জাতির জল কেহ খাউক বা না খাউক, অথবা কেহ কেহ উহাদের কর্ম্ম করুক বা না করুক; যখন উহাদের মধ্যে চণ্ডালের কোন ব্যবসায় দৃষ্টি হইতেছে না—বরঞ্চ উৎকৃষ্ট কার্য্যাবলী দেখা যাইতেছে; তখন উহাদিগকে কিরূপে চণ্ডাল বলা যায়! অনাচর্ণি কোন জাতির

জলই তো কেহ খায় না! তবে তাহাতেই কি সে জাতি চণ্ডাল হইবে? যাহা হউক, মন্বাদি শাস্ত্রের অভিপ্রায়-মত স্থিরীকৃত হইল, নমঃশূদ্র জাতি শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত চণ্ডাল জাতি নহে।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, ব্রাহ্মণ-সন্তানই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া নমঃশূদ্র জাতি হইয়াছে কি না! পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে,—

"যমদগ্নিভরদ্বাজবিশ্বামিত্রাত্রিগৌতমাঃ।
বশিষ্ঠকশ্যপাগস্ত্য মুনয়ো গোত্রকারিণঃ।
এতেষাং যান্যপত্যানি তানি
গোত্রানি মন্যতে॥"

উদ্বাহ-তত্ত্বোদ্ধৃতস্মৃতিবচনং।

অর্থাৎ যমদগ্নি, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, অত্রি, গৌতম, বশিষ্ঠ, কশ্যপ ও অগস্ত্য প্রভৃতি মুনিগণ গোত্রকারী; এবং তাঁহাদের সন্তানেরা স্ব স্ব আদি-পুরুষের নামীয় গোত্রধারী। এবিষয়ে বিখ্যাত স্মার্ত্ত মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন যে,—"বংশপরম্পরা-প্রসিদ্ধ আদি-পুরুষ ব্রাহ্মণগণের নাম গোত্র।" ফলিতার্থে যমদগ্ন্যাদি ব্রাহ্মণগণ গোত্ররূপ হইয়াছেন। অর্থাৎ যমদগ্নির সন্তানগণ যমদগ্নিগোত্র, ভরদ্বাজের সন্তানেরা ভরদ্বাজ; এবং কশ্যপের সন্তানেরা কাশ্যপ গোত্র, ইত্যাদি।

নমঃশূদ্র জাতি মাত্রেরই কাশ্যপ গোত্র। অতএব নমঃশূদ্র জাতি যে কশ্যপ ঋষির সন্তান, ইহা প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণে উপপন্ন হইল। নমঃশূদ্র জাতির জল অচল নহে; বিশেষতঃ সকল নমঃশূদ্রের এক-গোত্র বিধায় পুরোহিতের গোত্রানুসারে ইহাদের গোত্র হইতে পারিল না।

নমঃশূদ্র জাতির মাতা ব্রাহ্মণী বলিয়া পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে। এখন ইহাদের পিতাও ব্রাহ্মণ বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। যদি পিতা পূর্ব্বে স্থির করা হইত, তাহাতেও দোষ হইত না। যাহা হউক, এখন দেখিতে হইতে যে, ব্রাহ্মণ ভিন্ন কোন্ জাতির পিতা-মা ব্রাহ্মণ! কেন না, নমঃশূদ্র জাতি অবশ্যই জাতি হইতে পারে।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে,—

"ব্রাহ্মণ্যামৃষিবীর্য্যেণ ঋতোঃ প্রথমবাসরে।
কুৎসিতশ্চোদরে জাতঃ কূদরস্তে কীর্ত্তিতঃ।
তদশৌচং বিপ্রতুল্যং পতিতো ঋতুদোষতঃ
সদ্য কোটক সংসর্গাদধমো জগতীতলে॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ

অর্থাৎ ব্রাহ্মণীর গর্ভে মুনিবীর্য্যে ঋতুর প্র দিনে কূদর নামক জাতি জন্মে। কুৎসিৎ উ অর্থাৎ ঋতুর প্রথম দিনে জন্ম গ্রহণ করিয়া বলিয়া, ইহাদের কূদর নাম হইয়াছে। ব্রা ণের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে ইহাদের বলিয়া ইহাদের অশৌচ ব্রাহ্মণের তুল্য কিন্তু ইহারা ঋতুদোষে সদ্যপতিত ঘরামী-সংসর্গ-হেতু অধম হইয়া জগতে করিতেছে।

'ঋষি' শব্দে ধর্ম্মোদ্দেশে সংসারত্যাগী কোন জাতীয় ব্যক্তি হইতে পারে। এখানে যখন ঋতুদোষে পতিত দেখা যাইতে তখন অবশ্যই ঐ ঋষি ব্রাহ্মণ হইবেন। যেহে ব্রাহ্মণ স্বামী না হইলে, ঋতুদোষ না দেখিলে জারজ-দোষে পতিত হইত। কূদর জাতি ব্রা ণও নহে; যেহেতু ব্রাহ্মণ হইলে "তদশৌ বিপ্রতুল্যং" এই বাক্য থাকিত না।

এখন দেখা আবশ্যক যে, কূদর জা ব্যবসায় কি এবং তাহার সহিত নমঃশূদ্র জা ব্যবসায়ের ঐক্য আছে কি না! ভগবান কহিয়াছেন,—

"উভাভ্যামপ্যজীবংস্তু কথংস্যাদিতি চেদ্ভবেৎ
কৃষিগোরক্ষমাস্থায় জীবেদ্ বৈশ্যস্য জীবিকাম

অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ যদি নিজ-ব্যবসায় এ ক্ষত্রিয়বৃত্তি এই উভয় প্রকার কার্য্য দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে না পারেন, বৈশ্যবৃত্তি-মতে কৃষি ও গো-রক্ষা-দ্বারাও জীবিকা-নির্ব্বাহ করিবেন।

কূদর জাতি ব্রাহ্মণ-সন্তান। কিন্তু পতিত ও ব্রাহ্মণের ব্যবসায় বর্জ্জিত হওয়ায়, ভয়ানক আপদে পড়িল। কাজেই তখন ব্রাহ্মণের আপৎকালীন বৃত্তি কৃষি ও গো-রক্ষা প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছিল। ইহাই অনুমান-প্রমাণে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে। যখন ঘরামী কার্য্যই উক্ত হইয়াছে, তখন কৃষিকার্য্যই যে কূদর জাতির আদি-ব্যবসায়, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না।

নমঃশূদ্র জাতি কশ্যপ ঋষির সন্তান বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। আর, কূদর জাতিও ব্রাহ্মণ ঋষির সন্তান। অতএব ঐ ঋষিও কশ্যপ হওয়া অসম্ভব নহে। প্রায় কোন জাতিরই উৎপত্তি-কালীন পিতামাতার ও উৎপন্ন সন্তানের নাম শাস্ত্রে লেখা থাকে না। "যেমন ব্রাহ্মণের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে অম্বষ্ঠ জাতির উৎপত্তি হয়।" পিতামাতা ও উৎপন্ন সন্তানের জাতিমাত্র উল্লিখিত হইয়াছে; কিন্তু নাম লিখিত হয় নাই। অতএব কূদর জাতির কশ্যপ পিতার নাম স্পষ্ট না থাকাতেও কোন দোষ হইতেছে না। কূদরের ব্যবসায় কৃষি; নমঃশূদ্রের ব্যবসাও কৃষি। অতএব কূদর জাতির নিজ-কর্ম্মাদির সহিত নমঃশূদ্র জাতির ব্যবসায়ের সম্যক ঐক্য হইতেছে বলিয়া, নমঃশূদ্র জাতির শাস্ত্রীয় নামই যে 'কূদর' তাহা প্রতিপন্ন হইল। তবে নমস্যের অর্থাৎ ব্রাহ্মণের সন্তান শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এই অর্থ বুঝাইবার জন্য, নমঃশূদ্র নাম হইয়াছে; এবং কোন কোন স্থানে নমস্যের (ব্রাহ্মণের) সুত (পুত্র) এই অর্থ বুঝাইবার জন্যও, নমঃশূদ্র নামে বিখ্যাত আছে।

(ক্রমশঃ)

বাল-বিধবার কথা।

১

সবাই ক'রেছে কত আশা,
আমি কি করিব!
সবাই বুঝেছে ভালবাসা,
আমি কি বুঝিব!

২

এই আসে-আসে ক'রে বাঁচে বিরহিণী,
—কে আসিবে মোর!
দ্বিপ্রহর অন্ধকার বরষা-রজনী,
ঘন-ঘটা ঘোর।
কে আসিবে মোর!

৩

পুত্র-শোকাতুরা মাতা মুছে অশ্রুজল,
অন্য পুত্রে করিয়া চুম্বন।
দুঃখীর কামনা দিনে না হ'লে সফল,
দ্যাখে রাতে সে সুখ-স্বপন।

৪

আমার স্বপন নাই, স্মৃতি নাই, আশা নাই,
কিছু নাই হায়!
সুখ নাই, দুঃখ নাই, হাসি নাই, অশ্রু নাই,
কিছু নাই হায়!
সুধু—দিন চ'লে যায়,
শ্রান্ত পদ-ক্ষেপে, যেন ক্লান্ত পায় পায়।

ভালবাসা-জলাঞ্জলি!

ভালবেসে পেতে হয় এত ঘোর যাতনা!
এত ঘোর লাঞ্ছনা, ও! এত মনো-বেদনা!
জানিলে কি যাদুমনি,
বারাতেম পা দু'খানি,
প্রণয় পঙ্কিল ফাঁদে হারাতে এ জীবন!
পরশেতে বিনিময় হয়না যা' কখন।
দেখিতে জীবন আছে;
কিন্তু তাহা পলায়েছে

সেই দিন—যবে দেখা চখে চখে হয়েছে ;
রয়েছে পিঞ্জর পরি. পাখী উড়ে গিয়েছে।
পবিত্রতা বিরাজিত,
স্বর্গীয় সুধা-পূরিত ;
শান্তি,শান্তি,শান্তিময়—শান্তি খেলা খেলিত ;
শান্তিময় হাসি ছিল—শান্তি হাসি হাসিত !
কোথা শান্তি গেল চলে,
ভালবাসা বাসা বলে ;
একেবারে চলে গেল—আর নাহি ফিরিল !
অশান্তি ঘেরিল এসে ; সেই বাস করিল।
শান্তিদেবী একা নয়,
একা কি কখন হয় !
প্রিয় সখী পবিত্রতা পিছু পিছু তার।
ছায়াখানি চলে গেল, করে অন্ধকার !
করে ঘোর অন্ধকার
পিঞ্জর এ অভাগার,
কালো-ঘেরা একেবারে হৃদয়ের দ্বার ;
খোলা কি অর্গল-বদ্ধ বুঝে উঠা ভার !
পবিত্রতা গেল চলে,
যথা শান্তি, যাই বলে ;
বিনয় মিনতি করে ডাকিলাম কত ;
ফিরিল না, চলে গেল হয়ে অবনত।
বুঝিলেম সব বৃথা ;
ফিরিবে না কেহ হেথা !
ছাড়ি গেল, অভাগায় জীবনের তরে।
'জলাঞ্জলি-ভালবাসা' আর বলে কারে !
অশান্তি ঘেরিল এসে ;
দেখিলাম বসে বসে,
উষ্ণবায়ু ক্রমে ক্রমে প্রবাহিত হ'ল ;
ভালবাসা দূরে থাক্, অঙ্গ জ্বলে গেল।
অশান্তির অনুচর
গদা কেউ দণ্ডধর
দেখা দিল, আরম্ভিল কর্ত্তব্য সাধন ;
পোড়া দেহে আর কত যায়রে সহন !
সহ্য কত হয় আর,
সহা যায় কত আর ;
ভালবাসা বলে হায়, কান্দা হল সার !
কি করে জীবন ; মন্ত্র, ভালবাসা যার।
আয় তোরা সবে মিলি,
ভালবাসা-জলাঞ্জলি
করি প্রেম-সিন্ধুনিরে, জীবনের তরে ;
ক্রন্দনের রোল কেন রাখি ঘরে ঘরে !

* * *

অদ্ভুত হত্যা।

সন্দেহে।

রাত্রি অবসান-প্রায়। পক্ষীগণ আপন বাসস্থান হইতে বহির্গত হইবার ইচ্ছা মনের ঔৎসুক্যে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে কিন্তু বাহির হইবার ক্ষমতা নাই। কা এখনও অন্ধকারে পৃথিবীকে ঢাকিয়া রাখিয়া প্রহরীগণ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ক্লান্ত হ এখন একটু বিশ্রামের চেষ্টায় ব্যস্ত হ য়াছে। গ্রাম্য ফাঁড়িতে একটী পুরাতন ল অর্দ্ধ-ভগ্নাবস্থায় মিটমিট করিয়া জ্বলিতে বোধ হইতেছে, সেটী যেন সমস্ত জাগিয়া পাহারা দিয়া, এখন ক্রমে ক্র চক্ষু নিমিলিত করিবার চেষ্টায় আছে। চারিজন চৌকিদারও কার্য্যের প্রায় হইল দেখিয়া, ফাঁড়িতে ফিরিয়া আ তামাক সেবন করিতে লাগিল। এমন স একজন ভদ্রলোক ফাঁড়িতে উপস্থিত হ বলিলেন,—"ওহে, ঘাটের দিকে গোলযোগ ; আর, তোমরা এখানে নি হইয়া বিশ্রাম করিতেছ ! শীঘ্র তোমা জন-দুই লোককে ঐ দিকে পাঠাই দেও।"—এই কয়টি কথা বলিয়াই, লো চলিয়া গেলেন।

ফাঁড়ির সর্দ্দার এই কথা শুনিয়া ব লেন,—"কই, আমরা তো কিছুই জানি পারি নাই ! যাহাহউক, দেখা যাক্, কি

গোলযোগ !"—এই বলিতে বলিতে তিনি ফাঁড়ির বাহিরে আসিলেন। এবং লোকটীকে, আর দেখিতে না পাইয়া, এক জন চৌকীদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই যে লোকটি এসেছিল, সে গেল কোথা !" চৌকিদার বলিল,—"সে লোকটী আপনাকে গোলযোগের সংবাদ দিয়াই প্রস্থান করিয়াছে।" এই কথা শুনিয়া সর্দ্দার বলিলেন,—"শীঘ্র একজন সে লোকটার সন্ধান লও। লোকটী কে, কোথায় বা গেল ; এবং তাড়াতাড়ি আসিয়া সংবাদ দিয়া, কেনই বা প্রস্থান করিল ?"—এই বলিয়াই, তিনি কএকজন চৌকিদার সহ, সেই ঘাটের দিকে অগ্রসর হইলেন।

ঘাটের নিকটে আসিতে আসিতে বলিতে লাগিলেন,—"কই, কোন গোলযোগ তো শুনা যাইতেছে না ! তবে কি লোকটী আমাদিগকে মিছামিছি কষ্ট দিল !"—এই বলিতে বলিতে ঘাটে উপস্থিত হইয়াই, তাঁহারা দেখিলেন, দারোগা মহাশয় একটী বস্তার নিকট আলো ধরিয়া বসিয়া আছেন। দেখিয়াই, জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়, এখানে ব'সে কেন ?" দারোগা মহাশয় উত্তর করিলেন,—"এক ব্যক্তি এই বস্তায় করিয়া একটী খুনি-লাশ লইয়া যাইবার কালীন, আমা-কর্ত্তৃক বাধা পাইয়া, এই বস্তা ফেলিয়া গঙ্গার জলে ঝাঁপ দিয়াছে। কিন্তু আর ভাসিয়া উঠে নাই। পরমেশ্বর জানেন, সে মরিয়াছে কি বাঁচিয়াছে ! যাহাহউক, যে লোকটী তোমাদের ডাকিয়া দিল, সে লোকটী গেল কোথায় ?" সর্দ্দার উত্তর করিলেন, চলিয়া গিয়াছে। আপনি কি তাহাকে চেনেন্ !" দারোগা বলিলেন,—"না ; কিন্তু তাহার সন্ধান লইতে হইবে।" সর্দ্দার বলিল,—"কি জানি কেন, আমার মনেও সে লোকটীর উপর সন্দেহ হওয়ায়, আপনার বলিবার অগ্রেই, আমি তাহার সমস্ত সন্ধান জানিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছি। এবং যে লোককে নিযুক্ত করিয়াছি, সেও একজন খুব পাকা গোয়েন্দা। আমাদের সেই কাবুলী 'সের খাঁ' সকল প্রকার বেশভূষায় বিশেষ মজবুত। সে নিশ্চয়ই ইহার সমস্ত সন্ধান করিতে পারিবে।" এই কথার শেষ হইতে না হইতেই, দারোগা বলিলেন,—"তবে আর এখানে বিলম্বে কায নাই ; এই লাশ-সমেত বস্তা লইয়া থানায় চল।" দারোগা এই কথা বলিয়াই, চলিয়া গেলেন। সর্দ্দারও তাঁহার উপরওয়ালার হুকুমমত কার্য্য করিতে তৎপর হইলেন।

অনুসরণে।

পরদিন। বেলা দ্বিপ্রহর। সূর্য্যদেব খরতর দৃষ্টিতে চারিদিক দর্শন করিতেছেন। এই সময়ে, রৌদ্রের উত্তাপে ক্লান্ত হইয়া, একজন কৃষক, দুইটি গরু ও একখানি লাঙ্গল কাঁধে করিয়া, এক গৃহস্থের বাটীর দরজায় উপস্থিত হইল। এবং—"এবাড়ীতে কে আছো গো ! আমায় একটু জল দিয়ে প্রাণে বাঁচাও।"—এই বলিয়া গৃহস্বামীকে ডাকিতে লাগিল। তাহাতে একটী ভদ্রলোক বাটীর ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে গা ?" কৃষক উত্তর দিল,—"ম'শায় গো, আমি চাষী লোক। মাঠ থেকে বাড়ী যেতে যেতে তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্চে। তাই আপনাদের দ্বারে উপস্থিত হয়েছি। এখন, দয়া ক'রে একটু জল দিলে, আমি প্রাণে বাঁচি।"

এই কথা শুনিয়া বাটীর লোকটী জল ও একটু গুড় লইয়া উপস্থিত হইলেন। কৃষক জলপান করিয়া, ঠাণ্ডা হইয়াই জিজ্ঞাসা করিল,—"আচ্ছা ম'শায়, এবাড়িটী কার ?" ভদ্রলোকটী উত্তর করিলেন,—আজ দুই তিন দিন হইল, এবাড়িটী আমরা ভাড়া লইয়াছি। জানি না, এবাড়িটী কার ! তবে আমাদের কর্ত্তা এবাড়ির অধিকারীর নাম জানেন।" কৃষক জিজ্ঞাসা করিল,—"কর্ত্তার নাম কি ? আপনাদের বাড়ি

কোথায়!" ভদ্রলোকটী উত্তর করিলেন,—"কর্ত্তার নাম সুরনাথ চট্টোপাধ্যায়; নিবাস, হুগলী।" কৃষক জিজ্ঞাসা করিল,—"তিনি কি জন্যে এবাড়ী ভাড়া নিয়েচেন!" ভদ্রলোকটী উত্তর করিলেন,—"তিনি পীড়িত হইয়া অত্যন্ত কাহিল হইয়াছেন। তাই এদেশে হাওয়া খাইতে আসিয়াছেন। কোন কার্য্য-উপলক্ষে এখানে আসা হয় নাই।" এইরূপ কথা হইতে হইতেই, সুরনাথ বাবুও সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কৃষক আবার জিজ্ঞাসা করিল,—"আচ্ছা, যিনি আমাদের দিকে আসিতেছেন, উনি কে?" ভদ্র লোকটী উত্তর করিলেন,—"উনিই এই বাড়ির কর্ত্তা।"

কর্ত্তাটী দেখিতে মন্দ নহেন। বর্ণ ফিট গৌর। চেহারা দোহারা; কিন্তু মোটা নহে। চোক দু'টি টানা ও বড় বড়। কিন্তু নাকটী চেপটা ও ঠোঁট দু'খানি একটু পুরু পুরু। গালে একটী তিল আছে। ঘাড় বেঁটেও নয়, লম্বাও নয়; মাপিক-সই। কিন্তু দাড়ির চুল বুক অবধি আসিয়া পড়িয়াছে। গায়ে একটী পিরান; পরনে একখানি বিলাতি পেড়ে-ধুতি; ও পায়ে কট্‌কি চটি জুতা। বয়স, চলন-সই। কর্ত্তাটি আসিয়াই, কৃষককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছ?" কৃষক উত্তর দিল,—"ম'শায়, আমি জল খেতে এয়েছি। আর, গরু দুটো একটু ঠাণ্ডা হয়, এজন্যই আপনার এখানে ব'সে আছি।" সুরনাথ বাবু বলিলেন,—"তোমাদের কিসের গল্প হইতেছে!" কৃষক বলিল,—"এই আপনাদের বাড়ী কোথা, কি করেন, এই সব কথা হচ্ছিল।" কর্ত্তা সে কথার আর কোন উত্তর না দিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমাদের এখানকার জল-হাওয়া কি রকম? ভাল, কি মন্দ?" কৃষক উত্তর দিল,—"এখানকার জল ও হাওয়া দুই-ই ভাল।" এই কয়টী কথা কহিয়াই, কর্ত্তা বাটীর ভিতরের দিকে অগ্রসর হইলে কৃষকও পূর্ব্বের সেই লোকটীর সহিত আ কথা আরম্ভ করিয়া কহিল,—"ম'শায় শু ছেন, কাল শেষরাত্রে একটা লোক ব যেতে ধরা পড়েছে!" এই কথা শু সুরনাথ বাবু বাড়ির ভিতরে আর না ফিরিয়া আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন,— একটি লোক বস্তায় করিয়া লইয়া যাইতেছি একটা মাথাকাটা মানুষ ধরা পড়েছে।" কথা শুনিয়া সুরনাথ বাবুর মুখ পাংশুবর্ণ হ গেল। কৃষকও তাহা বিশেষরূপে ল করিল।

স্থির করিয়া।

সুরনাথ বাবু আর বেশী কোন কথা বলিয়াই, দ্রুতবেগে বাটীর মধ্যে চলি গেলেন। কৃষকও ভদ্রলোকটিকে আ জিজ্ঞাসা করিল,—"ম'শায়! কর্ত্তা খুনি লো কথা শুনে, কিছু কি ত্যক্ত হলেন? খুনে ধরা পড়েনি বলে, আর কোন ক শুন্‌লেন না!" তদুত্তরে সেই ভদ্রলোকটি ব লেন,—"না; তা বোধ হয় না। বাবু শেষ রাত্রে বেড়াইতে গিয়া শীঘ্র বাড়ী ফি আসিয়াছিলেন; এবং সেই অবধি কে একপ্রকার বিমর্ষ হইয়া রহিয়াছেন। তা তেই তোমার সহিত বড় বেশি কথা কহি না। রাগ করেন নাই; সে বিষয় নিশ্চিত জানিও।" কৃষক জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা ম'শায়, কর্ত্তা আজ শেষ রা বেড়াতে গিয়েছিলেন কেন?" লোকটী ব লেন,—"আমরা এবাটীতে আসিয়া অ কর্ত্তা প্রত্যহ খুব ভোরে ভোরে বেড়াই যান; এবং রৌদ্র উঠিলেই, বাড়ি ফি আসেন। কিন্তু আজ বোধ হয়, রাত্রি ঠিক করিতে না পারিয়াই, অধিক রাত্রে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তাই অতি অল্পক্ষণ পরেই আজ বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তবে আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সেই অবধিই ঐরূপ কেমন একরকম বিমর্ষ ভাবে রহিয়াছেন।"

কৃষক কহিল,—"বিমর্ষের কারণ জিজ্ঞাসা কল্লেন্ না কেন? আর, কেনই বা অত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলেন?" ভদ্রলোকটি বলিলেন,—"সে বিষয় কি আর তোমায় বলে দিতে হবে? আমরা বাড়ি-শুদ্ধ সকলেই ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি। কিন্তু তিনি বলেন,—'কোন কথা আমায় জিজ্ঞাসা করিও না।' আবার, যখন বাড়ি আসিলেন, তখন দেখা গেল, কাপড়ের স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া গিয়াছে; এবং গা, হাত, পা, সব যেন আঁচড়ের দাগে পরিপূর্ণ। আর, বোধ হয়, তা'তেই, কাপড়ে অল্প অল্প রক্তের দাগও লাগিয়াছে? যাহা হউক, আমি ও বাড়ির অপর সকলেও, কর্ত্তার ভাবভঙ্গি তো কিছুই বুঝিতে পারিলাম না!"—এই বলিয়া, ভদ্রলোকটি নীরব হইলেন। কৃষকও তখন মনে মনে বিবেচনা করিল,—"আর যায় কোথায়?"

এই স্থির করিয়া সে প্রকাশ্যে বলিল,—"ম'শায়, আপনারা বড়-লোক। আপনাদের কথা আমরা বুঝিব কি! যাইহোক ম'শায়, আপনাদের এখানে জল খেয়ে ও বসে, আমি ঠাণ্ডা হইচি। এখন, বাড়ি চল্লাম।" এই বলিয়া, কৃষক সুরনাথ বাবুর বাটি হইতে বাহির হইল। কিছু দূর অগ্রসর হইয়াই, শিশ্ দিতে লাগিল। ক্রমে সেই শিশ্ শুনিয়া, আর একজন কৃষক, কি জানি কোথা হইতে, আসিয়া উপস্থিত হইল; এবং পূর্ব্বোক্ত কৃষককে অভিবাদন করিয়া, সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়াই আমাদের প্রথমোক্ত কৃষক বলিল,—"সের খাঁ! যে চাষীর বাড়ি

হইতে এই লাঙ্গল ও গরু দুইটি তুমি লইয়া আসিয়াছিলে, তাহাকে কিছু পুরস্কারের সহিত এগুলি ফেরত দিয়া আইস। পরে, যে ঘাটে কাল খুনি লাশ ফেলিয়া পলাইয়াছিল, আজ সন্ধ্যাকালে আমার সহিত সেই ঘাটে আবার দেখা করিবে। দেখ, যেন কোন মতে অন্যথা না হয়।" সের খাঁ উত্তর করিল,—"সেকি দারোগা মহাশয়! আপনার কথায় অন্যথা করিয়াছি, এমন একদিনও কি দেখাইতে পারেন? আপনি কখনও আমার উপর মিছে সন্দেহ করিবেন না।"—এই বলিয়া সের খাঁ লাঙ্গল ও গরু দুইটি লইয়া যেন মাঠ হইতেই আসিতেছে এইরূপ ভাবে, প্রস্থান করিল। দারোগা মহাশয়ও আপনার গন্তব্য-স্থানে গমন করিলেন।

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

'সুধাসিন্ধুর' ভয়ানক নকল।

ঔষধের সহিত আর মনুষ্যের জীবনের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। সুতরাং ঔষধে কোনরূপ প্রতারণা থাকিলে মনুষ্যের জীবনহানির সম্ভাবনা। আমরা এতাবৎকাল যে কোন ব্যবসায়ে যে কোনরূপ প্রতারণা দেখিয়াছি, নির্ভিকহৃদয়ে তাহাই 'অনুসন্ধানের' পাঠকগণের নিকট তৎক্ষণাৎ প্রকাশ করিয়াছি। তবে সে সকল প্রতারণার সহিত প্রতারিত ব্যক্তির অর্থের সহিতই অধিক সম্বন্ধ ছিল; কিন্তু আজ যে প্রতারণার বিষয় আমরা পাঠকগণসমীপে প্রকাশ করিব, তাহার সহিত প্রতারিত ব্যক্তির কেবল অর্থের সম্বন্ধ নহে—জীবন লইয়াও টানাটানি। সুতরাং বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর।

সন ১২৮৫ সালে ডাক্তার প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় "সুধাসিন্ধু" নামক একটি ম্যালেরিয়া-জ্বরনাশক ঔষধ আবিষ্কার করেন। এই

ঔষধ ৮ আউন্স ও ৪ আউন্স শিশিতে করিয়া বিক্রয় করা হয়। ইহার পূর্ব্বে ৮ আউন্স ও ৪ আউন্স শিশিতে কোনরূপ ম্যালেরিয়ানাশক প্যাটেণ্ট ঔষধ বিক্রয় হয় নাই। দুইতিন বৎসরের মধ্যেই কিন্তু 'সুধাসিন্ধুর' উপকারিতা-গুণ প্রচার হইয়া পড়ে; ডি, গুপ্তের ঔষধের ন্যায় সুধাসিন্ধুর আদরও ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত দেশে দিন দিন বৃদ্ধি হইতে থাকে। তখন চারিদিক হইতে অমনি 'সুধাসিন্ধুর' অনুকরণ আরম্ভ হয়। দেখিতে দেখিতে 'সুধাসিন্ধুর' অনুরূপ সুধাইন্দু, সুধাবন্ধু, সুধাবিন্দু, সুধাসমুদ্র, সুধাসাগর, সুধাকল্প ইত্যাদি ইত্যাদি সুধায় সুধায় চারিদিক সুধাময় হইয়া পড়ে। এই সকল ঔষধের কেবল নামটি অনুকরণ নহে; শিশি, লেবেল, ট্রেডমার্ক প্রভৃতি সকলই 'সুধাসিন্ধুর' অনুকরণে গঠিত। এরূপ অনুকরণ যে নিন্দনীয়, তাহা কে না স্বীকার করিবেন? কিন্তু যে সকল লোক এরূপ অনুকরণ করে, তাহারা নিন্দার ভয় করে না। যখন আইনে তাহাদের কিছুই করিতে পারে না, তখন কেবল আর্থোপার্জ্জন ভিন্ন মনুষ্যত্বের প্রতি তাহারা দৃষ্টি রাখিতে বাধ্য নয়। যদি শতশত এইরূপ অনুকরণই 'সুধাসিন্ধুর'পরিণাম হইত, তাহা হইলেও আমরা আজিকার এই প্রস্তাবে হস্তার্পণ করিতাম না। কারণ, সমাজের মধ্যে সকল ব্যক্তিই ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির হইতে পারে না; অনুকরণ-প্রথাটা সকল জাতীয় নীচ অন্তঃকরণের ব্যক্তির মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু এইরূপ অনুকরণ ব্যতীত 'সুধাসিন্ধু' ঔষধে আরও ভয়ানক ভয়ানক প্রতারণা আরম্ভ হইয়াছে। সাধারণতঃ প্যাটেণ্ট ঔষধ পল্লীগ্রামবাসী গরিব অজ্ঞ লোকেই ব্যবহার করিয়া থাকেন; তাঁহাদিগকে প্রতারণা করা অতি সহজ। আমাদের সমিতি হইতে এই ঔষধের বিষয় অনুসন্ধান করিয়া যে সকল ভয়ানক প্রতারণার বিষয় আমরা জানিতে পারিয়াছি তাহাতে আমরাই স্তম্ভিত হইয়াছি। এরূ ভয়ানক প্রতারণা-ব্যাপার আমরা পূর্ব্বে কখ দেখি নাই। আমরা সর্ব্বসাধারণকে সত করিবার জন্য এইরূপ কয়েকজনের নাম এবং কিরূপে 'নকল' সুধাসিন্ধুকে তাহা 'আসল' সুধাসিন্ধু বলিয়া পল্লীগ্রামবাসী দরি লোকদিগকে ধাঁদা লাগায়, তাহাই নি প্রকাশ করিতেছি।

১ম। এস, পী, চট্টোপাধ্যায়ের 'সুধাসিন্ধু ঠিকানা বড়বাজার, ২৫ নং ময়রাহাটা ষ্ট্রীট এই মহাপুরুষ 'সুধাসিন্ধুর' অনুরূপ ট্রেডমা দিয়া, 'সুধাসিন্ধুর' ন্যায় ছোট-বড় শিশিতে 'সুধাসিন্ধু' বিক্রয় করিতেছেন। ইনি পূর্ব্বে ডাক্তার প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়ের একজন কর্ম্ম বন্ধু ছিলেন। উপযুক্ত বন্ধুরই কার্য্য বটে!

২য়। শ্রীপ্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়ের (শক্তি 'সুধাসিন্ধু।' ঠিকানা বড়বাজার, ৬৬নং বাঁশ তলা ষ্ট্রীট। প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় নাম কোন ব্যক্তি এই ঔষধের দোকান আছে কি না, তাহা আমরা এখনও সন্ধান করিতে পারি নাই। কিন্তু ইহার ভিতর হেমচন্দ্র মুখো পাধ্যায় নামক একব্যক্তি আছেন। ডি গুপ্তের অনুকরণে, যে ডি, ডি, গুপ্তের এর প্যাটেণ্ট ঔষধের দোকান যোড়াসাঁকো খোলা হইয়াছে, ইনি সেই দোকানেরই একজন কর্ম্মচারী। ইহাতে প্রিয়নাথ চট্টো পাধ্যায়ের নাম আছে; অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে 'শক্তি', আর তাহার নীচের লাইনে বড় অক্ষরে 'সুধাসিন্ধু' নাম দেওয়া হইয়াছে।

৩য়। এন, সি, বসু কোম্পানির (ভব) 'সুধাসিন্ধু।' ঠিকানা বড়বাজার, রতন সর কারের গার্ডেন ষ্ট্রীট। ইহাঁর পুরা নাম নারাণ চন্দ্র বসু। সুধাসিন্ধুর ট্রেডমার্কের ন্যায় ট্রেডমার্ক দিয়া, অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে 'ভব', আর তাহার নীচের লাইনে 'সুধাসিন্ধুর' টাইপের অনুরূপ বড় টাইপে 'সুধাসিন্ধু' দেওয়া হইয়াছে। এ ব্যক্তি পূর্ব্বে প্রিয় বাবুর নিকট একজন ১০৲ টাকা বেতনের সামান্য সরকার ছিল। উপযুক্ত ভৃত্যের উপযুক্ত প্রভুভক্তিই বটে!

৪র্থ। ডব্লিউ রুডার এণ্ড কোম্পানির (নব) 'সুধাসিন্ধু।' ঠিকানা বড়বাজার, ১০নং দয়েহাটা ষ্ট্রীট। ইনি পূর্ব্বে ১নং শিবনারায়ণ দাসের গলিতে বসিয়া শাল্‌সা ইত্যাদি বিক্রয় করিতেন। সম্প্রতি 'সুধাসিন্ধুর' দোকানের সম্মুখে আসিয়া, 'সুধাসিন্ধুর' অনুরূপ ট্রেডমার্ক ইত্যাদি দিয়া, আর অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে 'নব' ও তাহার পরের লাইনে বড় অক্ষরে 'সুধাসিন্ধু' নাম দিয়া, 'নব সুধাসিন্ধু' প্রচার করিয়াছেন।

৫ম। ডাক্তার চট্টোপাধ্যায়, নাথ এণ্ড কোংর (মুক্তি) 'সুধাসিন্ধু।' ঠিকানা বড়বাজার, ৩নং দয়েহাটা ষ্ট্রীট। নাথ মহাশয় একজন কাপড়-বিক্রেতার জামতা। শ্বশুর মহাশয়ের অনেক পাইকের 'সুধাসিন্ধু' বিক্রয় করিত। সেই সকল পাইকের হস্তগত করিয়া নাথ মহাশয় প্রথমে 'অমৃত-বিন্দু' নামে এক ঔষধ প্রচার করেন। কিন্তু 'সুধাসিন্ধুর' পার্শ্বে 'অমৃত-বিন্দু' কতদিন টিকিবে? তাই নাথ মহাশয় অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে 'মুক্তি', আর তাহার নীচের লাইনে বড় অক্ষরে 'সুধাসিন্ধু' দিয়া 'মুক্তি সুধাসিন্ধু' প্রচার করিয়াছেন। 'সুধাসিন্ধুর' ট্রেডমার্ক 'গণেশ মূর্ত্তি;' নাথ মহাশয় কিন্তু ট্রেডমার্কে 'কার্ত্তিক-গণেশ' দুই ভাইকেই টানিয়াছেন।

৬ষ্ঠ। শ্রীবিহারীলাল ভড় এণ্ড কোংর (আদি) 'সুধাসিন্ধু'। ঠিকানা বড়বাজার, ৬৩নং বাঁশতলা ষ্ট্রীট। ইনি একজন বড়বাজারের প্রসিদ্ধ কাপড়বিক্রেতা। কাপড় বিক্রয় করিতে করিতে প্রথমে 'সুধাসাগর' প্রভৃতি ১০।১২টী প্যাটেণ্ট ঔষধ আবিষ্কার করিয়া ফেলেন। কিন্তু তাহাতে কি ফল হইয়াছে, জানি না। তবে এখন, 'সুধাসিন্ধু'-আবিষ্কারের দ্বাদশ বৎসর পরে, ইনি সেই কাপড় বিক্রয় করিতে করিতেই, 'আদি সুধাসিন্ধু' আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন! ইহাতেও সেইরূপ ক্ষুদ্র অক্ষরে 'আদি', আর বড় অক্ষরে 'সুধাসিন্ধু' আছে।

৭ম। শ্রীমুকুন্দলাল দত্ত এণ্ড কোম্পানির (সার) 'সুধাসিন্ধু।' ঠিকানা বড়বাজার, ৩৩নং ময়রাহাটা ষ্ট্রীট। ইনি পূর্ব্বে 'সুধাসিন্ধুর' একজন পাইকের ছিলেন। কিন্তু পাইকিরীতে লাভ অল্পই হয়, সেই কারণ একবারে ষোল আনা লাভের আশায়, ইনি এই 'সার সুধাসিন্ধু' আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাঁর ট্রেডমার্কও সুধাসিন্ধুর অনুরূপ; ছোট অক্ষরে 'সার', আর বড় অক্ষরে 'সুধাসিন্ধু' ইত্যাদি।

৮ম। শ্রীবিহারীলাল দে এণ্ড কোংর (অমূল্য) 'সুধাসিন্ধু।' ঠিকানা বড়বাজার, ২৩নং কালাকর ষ্ট্রীট। পূর্ব্বে ইহাঁর সুতার দোকান ছিল; সে দোকান ফেল হওয়ায়, এখন এই লাভজনক ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন। 'সুধাসিন্ধুর' ট্রেডমার্ক গণেশ-মূর্ত্তি, ইনি এখন মহাদেবের কোলে তুলিয়া দিয়াছেন। আর, এক লাইনে অমূল্য কথাটি স্মল পাইকায়, এবং 'সুধাসিন্ধু' কথাটি ডবল গ্রেটে দিয়া হরগৌরী-মিলন করিয়াছেন। কিরূপ বুদ্ধির দৌড়টা একবার দেখিলেন!

৯ম। শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র পাল এণ্ড কোংর (মহা) 'সুধাসিন্ধু।' ঠিকানা বড়বাজার, ২৫ নং ময়রাহাটা ষ্ট্রীট। আমরা অনেক কষ্টে ইহাঁর লেবেল হইতে 'মহা' কথাটি খুঁজিয়া বাহির করিয়াছি। বড় অক্ষরের 'সুধাসিন্ধু' কথাটির তিন অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে ট্রেডমার্কের ডানদিকে ক্ষুদ্র অক্ষরে 'ম', আর ট্রেডমার্কের বামদিকে 'ম'র তিন অঙ্গুলি অন্তরে, ক্ষুদ্র অক্ষরে 'হা'। আমরা দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি!

১০ম। শ্রীপ্রসন্নকুমার রায় এণ্ড কোম্পানির (শিব) 'সুধাসিন্ধু।' ঠিকানা চিনাবাজার,

৪৩ নং আর্ম্মণী ষ্ট্রীট। ইহা রায় মহাশয়ের পক্ষে 'শিব' হইতে পারে; কিন্তু অনেক রোগীর পক্ষে যে 'অশিব' হইয়াছে, আমরা তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। ইহাতেও ক্ষুদ্র অক্ষরে 'শিব', আর পরের লাইনে বড় অক্ষরে 'সুধাসিন্ধু' আছে।

১১শ। শ্রীনারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর (জগৎ বিখ্যাত) 'সুধাসিন্ধু।' ঠিকানা বড়বাজার, ৮২ নং হরসেটের ফুলবাগান। চক্রবর্ত্তী মহাশয় পূর্ব্বে পাচক ব্রাহ্মণের কাজ করিতেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের ছেলের পক্ষে সে কাজটি অতি জঘন্য বলিয়া, এখন এই 'জগৎবিখ্যাত সুধাসিন্ধুর' ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন।

১২শ। ডাক্তার রামদয়াল বন্দ্যোপাধ্যায় এণ্ড কোংর (আদি) 'সুধাসিন্ধু।' ঠিকানা বড়বাজার, মল্লিক-পোস্তা। 'সুধাসিন্ধুর' অনুরূপ ট্রেডমার্ক; সেই ট্রেডমার্কের নিম্নেই লেখা আছে,—"সমুদ্রমন্থন হইতে এই আসল আদি সুধাসিন্ধু।" অবশ্য ইহার মধ্যে কেবল 'সুধাসিন্ধু' কথাটিই বড় অক্ষরে আছে। আমরা অনুসন্ধানে জানিয়াছি, ডাক্তার মহাশয় প্রথমে 'অমৃতবিন্দু', তাহার পর 'সুধাবিন্দু' আবিষ্কার করেন। কিন্তু তাহাতে অমৃত বা সুধা কিছুই না পাইয়া, এক হরিসভা ফাঁদিয়া সমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্ত হন। তাহার ফল, এই 'আদি সুধাসিন্ধু।' ডাক্তার মহাশয়ের বুজরুকীকে বলিহারী যাই!

১৩শ। ডাক্তার জে, এন্ চট্টোপাধ্যায় কৃত (উৎকৃষ্ট) 'সুধাসিন্ধু।' ঠিকানা ৪৪ নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট। পূর্ব্বে ডাক্তার মহাশয় 'সুধাসিন্ধুর' দোকানে কাক্ বিক্রয় করিতেন। কাকের বিক্রয় দেখিয়া ঔষধের কাট্‌তি বুঝিতে পারেন। লোভ-সংবরণ করিতে না পারিয়া, ডাক্তার মহাশয় শেষে এই জাল 'সুধাসিন্ধু' প্রস্তুত করেন। লোভে পাপ—পাপে মৃত্যু। ফলও হাতে হাতে পাইয়াছেন। সন ১২৯১ সালের ১৫ই ফাল্গুণ শ্রীযুক্ত বিহারীলাল ও ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের বিচারে, ইহাঁর দুই মা কঠিন পরিশ্রমের সহিত মেয়াদ ও একশ টাকা জরিমানা হয়। কিন্তু ডাক্তার মহাশয়ে ইহাতেও চৈতন্য হয় নাই!

১৪শ। শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ এণ্ড কোং 'সুধাসমুদ্র।' ঠিকানা ঘোড়াগাঁকো, ৩৭২ ন লোয়ার চিৎপুর রোড। মহেশ বাবু পূর্ব্বে এক জন বাজার-সরকার ছিলেন; সুতরাং ঔষধে বাজারের সংবাদও রাখিতেন। সেই কা 'সুধাসিন্ধুর' অনুরূপ 'সুধাসমুদ্রের' আবিষ্কা করেন। সন ১২৯৪ সালের চৈত্র মাসে ম্যাকে রিয়া-প্রপীড়িত পল্লীগ্রামবাসীদিগের প্রকা সভায়, 'সুধাসিন্ধুর' উপকারিতা-গুণ স্বীকা করিয়া, সভাপতি রাজা গোবিন্দলাল রায় বাহা হ্যামিল্টন কোম্পানির দ্বারা নির্ম্মিত, এক বহ মূল্য সুবর্ণ-মেডেল প্রিয়নাথ বাবুকে উপহা দেন। সেই মেডেলের প্রতিমূর্ত্তি এখন 'সু সিন্ধুর' লেবেলে ছাপা হইয়া থাকে। মহে বাবু ভাবিলেন, বুঝি সুবর্ণ-মেডেলের প্রতিমূ থাকিলেই ঔষধ বিক্রয় হইয়া থাকে। সে কারণ, তাঁহার 'সুধাসমুদ্রের' লেবেলেও এ হইতে ঠিক 'সুধাসিন্ধুর' লেবেলে-মুদ্রিত সুব মেডেলের প্রতিমূর্ত্তিও ছাপিয়া দিয়াছেন 'সুধাসমুদ্রে' হঠাৎ এরূপ সুবর্ণ-মেডেলে প্রতিমূর্ত্তি দিবার উদ্দেশ্য, আর কি হই পারে?

দেখিলেন, পাঠক মহাশয়গণ, কিরূপ ভয়ান কাণ্ড! দেখুন দেখি, ইহাতে কত সর্ব্বনাশে সূচনা না হইতেছে! আজ এক 'সুধাসিন্ধু কথা বলিলাম; তাও সম্পূর্ণ নহে। কি এইরূপ সর্ব্বত্রেই যে সকল প্রতারণার হইতেছে, তাহা শুনিলে আরও চমকিত হই হয়। সে সকল কথাও, আবশ্যক হই পরে প্রকাশ করিব। যাহা হউক, এখনও সক সাবধান হউন, এই আমাদের একান্ত অনুরো আরও, আমরা গবর্ণমেণ্টকেও এরূপ স নকলের প্রতিবিধান করিতে অনুরোধ করি।

সম্পাদকের শ্রাদ্ধ।

সম্পাদক-নামধারী অনেকানেক অদ্ভুত জীবের কার্য্যকলাপ অনেকে দেখিয়াছেন, সত্য; কিন্তু আজ যাহা দেখিবেন, এরূপ চিত্র বোধ হয় বিরল। এরূপ দিনকে রাত, ও রাতকে দিন করা, যেন এই-ই নূতন! এই সহরে 'শান্তি' নামক একখানি সংবাদপত্র আছে, তাহা বোধ হয়, অনেকেই জানেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে 'শান্তির' গুণগ্রামও বোধ হয় অনেকের অবিদিত নাই। যত অনর্থ—যত বটতলার দল, শান্তির ক্রোড়েই বর্দ্ধিত হইতেছে। এ সকল গুণগৌরব 'শান্তির' তো আছেই; তা'ছাড়া, আজকাল ইহার আর এক নূতন রকমের গুণ-গরিমার পরিচয় পাঠকগণ লউন।

কিছুদিন হইল, 'বসন্তকুমার' নামক একখানি পুস্তক 'শান্তি'-সম্পাদকের নিকট সমালোচনার্থ প্রেরিত হয়। এবং শান্তিতে তাহার এই সমালোচনা বাহির হয়:—

"বসন্ত-কুমার—উপন্যাস। * * *। গ্রন্থখানির ভাষা ও বর্ণনা হৃদয়গ্রাহী না হইলেও, মোটের উপর মন্দ হয় নাই।"

এইরূপ সমালোচনার পর, ঘটনাচক্রে 'শান্তি'-সম্পাদকের সহিত উক্ত পুস্তকের প্রকাশক মহাশয়ের একদিন সাক্ষাৎ হয়। তাহাতে কথায় কথায় ঐ কথা উঠিলে, সম্পাদক মহাশয় নাকি বলেন,—"পুস্তকখানি হারাইয়া গিয়াছিল। কেবল গ্রন্থকারের মাথা দেখিয়া সমালোচনা করিয়াছি। গ্রন্থকার ছেলে মানুষ; তিনি আর কত লিখিবেন! যাহা সমালোচনা করিয়াছি, সে কেবল আপনারই খাতিরে। নহিলে উহা অপেক্ষা খারাপ করিতাম।"

প্রকাশক মহাশয় তো হতভম্ব! অগত্যা অবাক হইয়া তিনি গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। এবং 'শান্তির' প্রতি ঘৃণা হওয়ায়, এযাবৎ তিনি 'শান্তিতে' যে সকল 'বিজ্ঞাপন' ও 'ক্রোড়পত্র' দিতেছিলেন, তাহা বন্ধ করিবেন, প্রকাশ হইল। বলা বাহুল্য, এইরূপে বিজ্ঞাপনাদি বন্ধ হইলে, সম্পাদকেরও সম্ভবতঃ অনেকগুলি টাকায় ঘা' পড়ে; জানি না, তাহাতে তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন কি না! যাইহোক, সম্পাদক মহাশয়ের ভাগ্যক্রমে, ইহার পরও আর একদিন তাঁহার সহিত উক্ত প্রকাশকের সাক্ষাৎ হইল। সেদিনও, ঐরূপ নানা কথাবার্ত্তা চলিল; এবং শুনিলে সকলে স্তম্ভিত হইবেন যে, সেদিনকার কথাবার্ত্তার পরই স্থির হইল যে,—"শান্তিতে আর একবারও আবার 'বসন্ত-কুমারের' সমালোচনা বাহির হইবে।"

ক্রমে ঘটিলও, তাই। দ্বিতীয়বারের শান্তিতে 'বসন্ত-কুমারের' আবার সমালোচনা বাহির হইল; লেখা হইল,—"বসন্ত-কুমার। * * * সামাজিক উপন্যাস। * * *। সুনিপুণ গ্রন্থকারের রচনা-কৌশলে চিত্রখানি বড়ই সুন্দর হইয়াছে। গ্রন্থকারের রচনা বিশুদ্ধ, ভাষা সরল, ও বর্ণনা হৃদয়-গ্রাহী। বাজে নাটক-উপন্যাস-প্লাবিত, এই বঙ্গদেশে 'বসন্ত-কুমারের' ন্যায় উপন্যাস যত প্রচারিত হয়, ততই মঙ্গল।"

অর্থাৎ পাঠকগণ স্থির-দৃষ্টে দেখুন যে, প্রথম বারের সমালোচনায়—"ভাষা ও বর্ণনা 'হৃদয়-গ্রাহী না হইলেও' মোটের উপর মন্দ নয়।" কিন্তু এবারে,—"রচনা বিশুদ্ধ, ভাষা সরল ও বর্ণনা হৃদয়গ্রাহী।" কি ভয়ঙ্কর অপলাপ—কি ভয়ানক সম্পাদকত্বের শ্রাদ্ধ!!

হা অদৃষ্ট! সামান্য অর্থ-লোভে সম্পাদক মহাশয়ের এরূপ প্রবৃত্তি কেন হইল? 'সমালোচনায়' অনেক স্থলে অনেক 'রহস্য' দেখিয়াছি; কিন্তু এরূপ 'ব্যভিচার' তো আর কখনও দেখি নাই! হায়-হায়! 'শান্তির' অদৃষ্টে কি শেষে এই ছিল! 'সম্পাদকের শ্রাদ্ধ' এই নূতন কাণ্ড 'শান্তি'হইতেই শেষে দেখিতে হইল!

শ্রী:—

সংবাদ।

—সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী একটী ব্রাহ্মণ-যুবা বিলাত যাইবার উদ্যোগ করেন। বিলাত যাইবার পূর্ব্বদিন তিনি কোন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য নৌকা করিয়া গঙ্গা-পার হইতেছিলেন! এই সময় অন্য একজন আরোহীর গায়ে তাঁহার পা ঠেকিয়াছিল। যাহার গায়ে পা ঠেকিয়াছিল, সে তখনই যুবককে 'যাচ্ছে-তাই' বলিতে লাগিল। যুবকটী কত ঘাট মানিলেন; তবুও সে শুনিল না। যুবক তখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তুমি কি জাতি?' উত্তর হইল,—'শূদ্র'। তখন যুবক বলিলেন,—'আমি ব্রাহ্মণ; শূদ্রের গায়ে পা ঠেকিয়াছে, তাহাতে দোষ কি?' অমনই মন্ত্রহত সর্পের ন্যায় সে লোকটী যুবকের পায়ে লুটাইয়া পড়িল; এবং গলায় কাপড় দিয়া ক্ষমা চাহিল। যুবক তখন অবাক্ ও স্তম্ভিত! যাইহোক, তিনি তখনই মনে করিলেন,—'আমি কি তুচ্ছ ধন-লালসায় এ অতুল সম্মান পরিত্যাগ করিব! না,—বিলাত যাইব না।' বলা বাহুল্য, ইহার পর, আর তাঁহার বিলাত যাওয়া হইল না।

—চীনদেশে কোয়াংটন প্রদেশে কুঁচুই নামক স্থানে একটী জলস্তম্ভ ফাটিয়া দেশব্যাপী জল-প্লাবন ঘটিয়াছিল। প্রায় ৬ হাজার লোক ডুবিয়া ও ভাসিয়া গিয়াছে। ২০ হাজার লোক নিরাশ্রয়।

—মাধীর দল ওয়াদেল জুমীর অধীনে উত্তর দিকে মিশরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। মিশর হইতে কর্ণেল উডহাউস সসৈন্যে ওয়াদেল জুমীর সহিত যুদ্ধ করিবার আশায় দক্ষিণ দিকে আসিতেছেন। এদিকে আবার জেনারেল গ্রীণফল ওয়াদেল জুমীর পশ্চাৎ দিক দিয়া আক্রমণ করিবার জন্য সসৈন্যে যাত্রা করিয়াছেন। ওয়াদেল জুমী দুই দিক দিয়া ইংরাজ সৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত হইবেন; সুতরাং পরাজিত হইবারই সম্ভাবনা।

—আমেরিকার নিউগ্রানেডায় একপ্রকার গাছ আবিস্কৃত হইয়াছে। ইহার রসে লিখিলে প্রথমে ঈষৎ লালবর্ণ হয়; কিন্তু ক্রমে যত শুষ্ক হইতে থাকে, ততই ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়। লেখাও ঠিক উত্তম বিলাতি কালির ন্যায় উজ্জ্বল হয়।

—বরদা-রাজ্যে "ষ্ট্যাম্প"-কর চালাইতে গিয়া উক্ত রাজ্যের প্রথম শ্রেণীর মহাজন হইতে সামান্য তরি-তরকারিওয়ালা পর্য্যন্ত ধর্ম্মঘট করিয়া রাজ্যের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ করিয়াছে। এই কর নাকি ১৯৪২ সম্বতে মহারাজের রাজ্যে অভিষেক-কালীন চালাইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল; কিন্তু তখন কোন অসুবিধা-নিবন্ধন এতদিন চাপিয়া রাখা হইয়াছিল। পরে গত ১লা আগষ্ট হইতে আবার এই ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। এখন আমেদনগর হইতে ব্যবসায়ী আনাইয়া একরূপ দোকানপাট চালান হইতেছে।

—আমেরিকার এক পত্রিকাতে প্রজাপতির অদ্ভুত ক্ষমতা প্রকাশিত হইয়াছে। হাজার হাজার প্রজাপতি একখানা রেলগাড়ির চাকা এমনি আটকাইয়া ধরিয়াছিল যে, দুই খানা ইঞ্জিন দিয়া টানিয়াও তাহা নড়া[illegible] যায় নাই। অদ্ভুত সংবাদ আর কি?

—মার্কিন-দেশে ৯০০০টি মেয়ে-ডাক্তার আছেন। [illegible] খানে বোধ হয়, পুরুষের চিকিৎসা করেন স্ত্রীলোকে আর স্ত্রীলোকের চিকিৎসা করেন, পুরুষে!

—প্রসিদ্ধ 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকার অধ্যক্ষ ও সম্পাদক রবার্ট নাইট দেউলিয়া আইনের আশ্রয় পাইয়াছেন। অর্থাৎ পাওনাদারদের হাত হইতে অব্যাহতি লইলেন কেন? ষ্টেটস্ম্যানের কি আয় নাই?

—তারের সংবাদ, নেপাল-রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী [illegible] অন্যান্য রাজ-পারিষদগণ নাকি অন্তঃপুরবাসিনীদি[illegible] হস্তে হত হইয়াছেন। বিদ্রোহের কারণও না[illegible] নারীর জন্য!

—যবদ্বীপে ধূমকেতু উঠিলে, সেখানকার লো[illegible] সুফল আশা করে। এক দেশের যাহাতে সর্ব্বনা[illegible] অপরের তাহাই পৌষ মাস আর কি?

—গবর্ণমেণ্ট এবার যে লোন লইবার চেষ্টা[illegible] চাহিয়াছেন; আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনী[illegible] কান্ত গুপ্ত মহাশয়, অন্যান্য অনেকের ন্যায়, টেণ্ডা[illegible] দিয়াছেন। অর্থাৎ তিনিও গবর্ণমেণ্টকে টাকা ধা[illegible] দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া সম্মতি চাহিয়াছেন[illegible] পুস্তক লিখিয়া বাঙ্গালীর এরূপ উদ্যম, অবশ্য[illegible] গৌরবের কথা!

—ব্রজগোপাল বশাক পিতা; শ্যামাচরণ তাঁ[illegible] গুণধর পুত্র। পুত্র পিতার বাড়ীতে থাকেন না[illegible] তাঁর 'ভোজনং যত্রতত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে।' অ[illegible] পয়সা-কড়িটার সময় এক পিতা বই আর 'পাক' নাই[illegible] কাজেই সেই সময়টাতেই, হুমকি-ধমকি দেখাই[illegible] জোর-জবরদস্তী ফলাইয়া বা অন্য নানারূপে, পিতা[illegible] সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। সম্প্রতি জুলন বড়ই অস[illegible] হওয়ায়, পিতাকে আদালতের আশ্রয় লইতে হ[illegible] পুত্রকে কিন্তু শ্রীঘরে যাইতে হইয়াছে।

—বীডন ষ্ট্রীটের 'কেশব একাডেমির' একটী ছাত্র[illegible] স্কুলের একজন শিক্ষক এরূপ প্রহার করেন [illegible] তাহাতে ছাত্রকে অজ্ঞান হইতে হয়। এবং শে[illegible] ডাক্তার আনিয়া তবে ছাত্রের সুশ্রূষা চ[illegible] ডাক্তারের মতে, ছাত্রের হিষ্টিরিয়া ছিল; কি[illegible] ছাত্র বলে,—'কখনই না।' তবে প্রহারেই হিষ্টিরি[illegible] সূচনা না হইলে বাঁচি! স্কুলের শিক্ষকের প[illegible] আজকাল এরূপ ব্যবহার বড়ই গর্হিত। মিথ্যা দো[illegible] গোপনে চেষ্টা না পাইয়া, অতঃপরও শিক্ষকগণ স[illegible] হউন, এই নিবেদন।

অনুসন্ধান।

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

৩য় খণ্ড।] ১৫ই ভাদ্র, ১২৯৬ সাল। [৩য় সংখ্যা।

কেমনে হবে পার!

(আভানা-বাহার—আড়াঠেকা।)

"কেমনে হবে পার সংসার-পারাবার,
বিনা জ্ঞান-তরণী বিবেক-কর্ণধার।
শুনরে মম মানস, স্বীয় কলুষ কলস,
কর্ম্মগুণে সদা বাঁধা কণ্ঠেতে তোমার।
ঘোরতর মায়া তম, আশা-পবন বিষম
প্রবৃত্তি-তরঙ্গ রঙ্গে উঠে বারে বার।
নানাভিমানের ধারা, বহে খরতর তা'রা,
কাম-ক্রোধ-লোভ জলচর দুর্নিবার।"

কর্ম্ম-ফল।

কর্ম্মের ফল অবশ্যই আছে। সুকর্ম্মের সুফল ও কুকর্ম্মের কুফল একদিন না একদিন দেখিতেই পাওয়া যায়। আজ যিনি ধনমদে উচ্ছৃঙ্খল—'ধরাকে সরা'-প্রায় জ্ঞান করিতেছেন; কাল তিনিই আবার দেখিতেছি, ভিক্ষা-পাত্র-হস্তে সামান্য দান-বেশে অন্যের দ্বারে অন্নের ভিখারী। আজ যিনি সকলের পূজনীয়, যাঁহাকে দেবতা-জ্ঞানে যাঁহার পাদোদক-পানে অন্যে কৃতার্থ হইতেছে; কাল দেখিতেছি, অহো তাঁহার কি দুর্দ্দশা!—যাহারা দুই দিন পূর্ব্বে তাঁহাকে পূজা করিয়াছিল, তাহারাই আবার পদাঘাতে পবিত্র করিতেছে। হায়-হায়! এ প্রহেলিকার মর্ম্ম কি?

ইহার মর্ম্ম কি কর্ম্মফল-ভোগ নহে? আমার পূজনীয় গুরুদেব এই কর্ম্মফল-সম্বন্ধে একদিন একটী বড়ই সুন্দর গল্প করেন। সে গল্পটি বড়ই শিক্ষাপ্রদ—বড়ই মনোরম। পাঠক! গুরুদেবের সে গল্পটী দেখুন, এই:—

"কোন স্থানে হরিদাস এবং রাধানাথ নামক দুইবন্ধু বাস করিতেন। এক সময়ে উভয়েরই ঈশ্বরের অস্তিত্বে পূর্ণ বিশ্বাস ছিল; 'তিনি মঙ্গলময়' বলিয়া উভয়েরই ধারণা ছিল; এবং পুণ্য-কার্য্যে উভয়েরই মতি ছিল। কিন্তু কুক্ষণে রাধানাথের কুমতি ধরিল—অসৎ সঙ্গী জুটিল—অসৎ কার্য্যে লিপ্ত হইয়া সে আপনার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রকে কলঙ্কিত করিয়া ফেলিল।

হরিদাস বন্ধুর এ প্রকার দুরবস্থা সন্দর্শনে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বন্ধুকে কত বুঝাইলেন; কত কাকুতি-মিনতি করিলেন; কত সদৃষ্টান্ত, সদুদাহরণ প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। রাধানাথ কোন ক্রমেই সৎ-

পথে পুনরাগমন করিতে সম্মত হইল না। বরং উত্তরোত্তর পাপ-পিয়াসা তৃপ্তি-সাধন-মানসে, মদিরা-সেবন ও বেশ্যালয়ে গমন করাই আপনার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া নিরূপিত করিল।

একদিন হরিদাস, নিকটস্থ কোন গ্রামে 'মহাভারত-পাঠ' শ্রবণ করিতে যাইতেছেন; এমন সময় রাধানাথ আসিয়া তাঁহার হস্ত-ধারণ করিল। হরিদাস পবিত্র মনে, পবিত্র দেহে, পুণ্যময় 'মহাভারত-পাঠ' শ্রবণ করিতে যাইতেছেন; এ সময় তাঁহাকে স্পর্শ করা যদিও একান্ত অন্যায় কার্য্য বটে, তথাপি সে কথা বুঝে কে? রাধানাথ মদিরা-সেবনে উন্মত্ত-প্রায়! বেশ্যালয়ে গমন করিবার সময়, হঠাৎ বন্ধু হরিদাসকে দেখিয়া তাহার বড়ই আনন্দ হইল। সে একেবারে দৌড়াইয়া আসিয়াই, হরিদাসের হস্তধারণ পূর্ব্বক বলিল,—"আচ্ছা, তুমি প্রতিদিনই কি মহাভারত শুনিতে চাও? মহাভারত শ্রবণে কি তোমার অক্ষয় স্বর্গ হইবে; না, ভগবান ইন্দ্রের সিংহাসন কাড়িয়া তোমায় দিবেন? ভাই, কিছুই হইবে না—কিছুই পাইবে না! অথচ আপনার সুখের জীবন কেন মিছা কাজে নষ্ট কর!"

হরিদাস।—"কেন ভাই, মহাভারত-পাঠ শ্রবণ করিলে যে মহাপুণ্য সঞ্চয় হয়, তা' কি তুমি জান না? তুমিই তো এক কালে আমায় এ বিষয়ে কত উপদেশ দিয়াছ; মহাভারত হইতে কত উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া, কত তর্কের সৎমীমাংসা করিয়াছ! তবে আজ আবার এমন কথা বলিতেছ, কেন?"

রাধানাথ।—"কেন বলিতেছি! বলিতেছি, বুঝিয়া-সুজিয়া; বলিতেছি, দায়ে পড়িয়া; বলিতেছি, এখন যথার্থ কথা বুঝিয়াছি বলিয়া; বলিতেছি, তোমায় আজ ফিরাইব বলিয়া; বলিতেছি, বেশ্যালয়ে ও মদিরায় কত সুখ আছে, তাহাই দেখাইব বলিয়া। আর কি চাও?"

হরিদাস।—"ছি! ভাই, একথা আর মুখে এনো না—তোমার বড় পাপ হবে। নিজে ধর্ম্ম-পথ পরিত্যাগ করিয়াছ—নিজের সর্ব্বনাশ করিয়াছ; কিন্তু আর একজনকে আর মজাইতে চাও কেন? যাও ভাই, তোমার যথায় ইচ্ছা প্রস্থান কর। আমায় ছাড়িয়া দাও।"

রাধানাথ।—"আচ্ছা, তুমি আমায় বুঝাও 'মহাভারত-পাঠ' শ্রবণ করিয়া তোমার কি লাভ হইবে। স্বীকার করিলাম, ইহাতে পুণ্য আছে। কিন্তু ভাই, সে পুণ্যের ফল তুমি আজ পাইবে, বলিতে পার? ভগবান তোমা তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন?"

হরিদাস।—"তিনি মঙ্গলময়। তাঁহার ইচ্ছ তাঁহার বিচার, ক্ষুদ্রবুদ্ধি জ্ঞানহীন আমি, কেম করিয়া বুঝিব? হয় তো তিনি আমায় আজ সুখী করিতে পারেন! দেখ, নিয়তি সকলের অনুগামী; কর্ম্মফল কাহারও আয়ত্বাধীন নহে অবশ্য ভগবান আমায় সুখী করিবেন।"

রাধানাথ হরিদাসের হস্ত পরিত্যাগ করি তখন কহিল,—"আচ্ছা ভাই, তুমি আজ যাও কিন্তু বেশ ক'রে বিবেচনা ক'রে দেখো,—আ সহজেই বুঝ্‌তে পার্‌বে যে, তুমি পুণ্য কা করেও মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কত বিপদে পড়্‌চে কিন্তু আবারও তবু পুণ্য কাজ কর্‌তে যাচ্চো,- ভবিষ্যৎ আশায় কেবলমাত্র ভগবানের উ নির্ভর করে আছ? থাক—ভালই। কিন্তু জেনে তা'তে তোমার কোন কাজই হচ্চে না; জীব তুমি কোন সুখই পাবে না। আর আমি, আ কত সুখে আছি, সে কথা তোমায় আর বল কি!"—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই, রাধানাথ আপন গন্তব্য-স্থানাভিমুখে প্রস্থান করিল। হ দাসও ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলে হরিদাসের বিশ্বাস ও ভক্তি অচল, অটল তিনি শুনিয়াছিলেন, মহাভারতের কথা শ্র করিলে মহাপুণ্য সঞ্চয় হয়—ঈশ্বরের অ শক্তিতে বিশ্বাস ও ভক্তি বর্দ্ধিত পাইয়া,—অ

স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। অতএব তিনি আর সে পথ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। বরং রাধানাথের কথায় তাঁহার বড় ঘৃণাই হইল।

এতদিনে, এই দুই বন্ধুর উপরে, ভগবানের সেই পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইল। হরিদাস 'মহাভারত-পাঠ' শ্রবণ করিয়া সন্ধ্যার সময় প্রত্যাগমন করিতেছেন; এমন সময় পথিমধ্যে তাঁহার পদে একটি বিল্বকণ্টক বিদ্ধ হইয়া, অজস্রধারে রক্তপাত হইতে লাগিল। তিনি অতি কষ্টে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া, সেই যন্ত্রণায় শয্যাগত হইলেন। অধিক কি, সেই উপলক্ষে ক্রমে তাঁহার জ্বর হইল; পা পাকিয়া উঠিল; প্রায় তিন মাস কাল তিনি আর শয্যা হইতে উঠিতে সক্ষম হইলেন না।

আর, রাধানাথ!—সে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতেছিল। তখন, পথিমধ্যে সে একটি হাজার টাকার তোড়া কুড়াইয়া পাইল।

তিনমাস পরে রাধানাথ এবং হরিদাস উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে, রাধানাথ হরিদাসের সেইদিনকার ঘটনা শ্রবণ করিয়া কহিল,—"দেখ ভাই, যাহা বলিয়াছিলাম, ঠিক কি না? তুমি মহাভারত-পাঠ' শুনিতে গেলে, পুণ্য হইবে বলিয়া—ভগবান তোমার ভাল করিবেন বলিয়া; কিন্তু দেখ দেখি, তুমি কি ফললাভ করিলে? আর দেখ আমি!—আমি অসৎ কার্য্য করিলাম; কিন্তু তাহার দণ্ড পাওয়া দূরে থাক, এক হাজার টাকার একটি তোড়া কুড়াইয়া পাইলাম। এ দেখিয়া এখনও তোমার ভাই, বল দেখি, পুণ্যকর্ম্ম করিতে সাধ যায়?—তুমি কর্ম্মফলের উপর বিশ্বাস কর? কিন্তু তাহাতে তোমার কি হইল, ভাব দেখি!"

বাস্তবিক এবিষয় হরিদাস অনেক ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। আজ তাঁহার হৃদয় সন্দেহ-দোলায় দোলায়মান হইল; কর্ম্ম-ফলের উপর যেন দৃঢ় বিশ্বাসের হ্রাস হইতে লাগিল; 'অধর্ম্মেরই জয়' এই ধারণায়, তাঁহারও হৃদয়ে যেন বিষাঙ্কুর রোপিত হইল। কিন্তু তথাপি সম্পূর্ণরূপে তাঁহার মতি ফিরিল না; 'ঈশ্বর মঙ্গলময়' এই কথায় যে চির-বিশ্বাস, তাহা একেবারে লোপ পাইল না। তবে মনটা কি জানি কেমন-এক-তর হইয়া দাঁড়াইল।

হরিদাস বলিলেন,—"আচ্ছা রাধানাথ! তবে কি এ সকলই মিথ্যা? শাস্ত্র-বেদাদি কি সকলই অসার? শাস্ত্রকারগণ কি সকলেই মূর্খ? সত্যই কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই? কর্ম্ম-ফল কি কাহাকেও ভোগ করিতে হয় না?"

রাধানাথ স্থির গম্ভীর প্রশান্ত বদনে উত্তর দিল,—"না, কিছুই নাই; সকলই মিথ্যা। আমি অনেক দেখিয়াছি, তবে এসকল শিক্ষা লাভ করিয়াছি?"

হরিদাস অনেকক্ষণ অনেক কথা ভাবিলেন। তথাপি ঈশ্বরের অস্তিত্বে কিন্তু অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। শেষে দুইজনে মিলিয়া ইহার মীমাংসার জন্য একজন সিদ্ধ যোগী মহাপুরুষের নিকট গমন করিলেন।

মহাপুরুষ উভয়েরই কথা-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, মৃদু হাসি হাসিয়া কহিলেন—"দেখ, তোমাদের বিবাদ আমি এখনই ভঞ্জন করিয়া দিতেছি। তোমরা দুইজনে স্নানাদি করিয়া পবিত্র দেহে আমার নিকট আইস। আমি সমস্তই বুঝাইয়া দিব।" তখন হরিদাস এবং রাধানাথ উভয়েই স্নানাদি করিয়া, পবিত্র দেহে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন।

মহাপুরুষ কহিলেন,—"তোমরা দুইজনে দুই ধারে, আমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া, চক্ষু মুদিয়া, ভগবানের নাম স্মরণ কর। তাহা হইলেই, দুই মুহূর্ত্তের জন্য তোমাদের জ্ঞান-চক্ষু উন্মিলিত হইবে। আর সেই বলে, তোমরা অনায়াসে নিজ নিজ ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান অবস্থা সন্দর্শন করিতে পারিবে।"

তখন, হরিদাস এবং রাধানাথ ভক্তির সহিত মহাপুরুষের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিলেন। এইরূপে দুই মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাঁহারা আপনাপন ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান অবস্থার ছবি সন্দর্শন করিলেন। এইরূপ দেখিয়া, পরক্ষণেই, উভয়েই কিন্তু মহাপুরুষের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন।

মহাপুরুষ হরিদাসকে তখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি দেখিলে?"

সাশ্রুনয়নে হরিদাস উত্তর দিলেন,—"দেখিলাম, যেদিন রজনীতে আমার পদে বিষ্ব-কণ্টক বিদ্ধ হয়, সেই দিন আমার মৃত্যু হইবার দিন নির্দ্ধারিত ছিল। কিন্তু 'ঈশ্বর মঙ্গলময়' এবং 'কর্ম্মফলে' আমার অচলা ভক্তি ও অনন্ত বিশ্বাস ছিল বলিয়া, সে যাত্রা আমি রক্ষা পাইয়াছি; শমনের গ্রাস হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছি। দেখিলাম, যে স্থলে আমার পদে কণ্টক-বিদ্ধ হইয়াছিল, তাহার অনতিদূরেই, ঊর্দ্ধফণা কালসর্প আমায় দংশন করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল। কিন্তু আমার কর্ম্মফলের ও পুণ্যের বড়ই জোর, তাই ললাট-লিখনও খণ্ডন হইল। কালসর্প দংশনের পরিবর্ত্তে, কণ্টক-বিদ্ধের উপর দিয়া কাটিয়া গেল। মহাপুরুষ! মুহূর্ত্তের জন্য, আমি মঙ্গলময়ের উপর অচলা বিশ্বাস হারাইয়া যে পাপ করিয়াছি, এখন বলুন—বলুন, তাহার উপায় কি হইবে?"

মহাপুরুষ এ কথার আর কোন উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার ভবিষ্যৎ কি দেখিলে?" হরিদাসের তখন নয়ন বিগলিত হইয়া প্রেমাশ্রু বহিতে লাগিল। তিনি তন্ময়-ভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া উত্তর দিলেন,—"আঃ—কি সুন্দর স্থান! ওস্থানে যদি যাইতে পারি, তবে আর এ পাপ পৃথিবীতে কে থাকিতে চায়? দেব! কবে আমার সেদিন আসিবে?"

মহাপুরুষ।—"কবে তোমার সেদিন, আসিবে, তাহা তুমি দেখিতে পাও নাই?"

হরিদাস।—"না, তা' দেখিতে পাই নাই। অন্ধকার—অন্ধকার! কেবল অন্ধকার—অনন্ত অন্ধকার। আমার সমস্ত জীবন অন্ধকার। আমি তার পর কেবল তাই দেখিয়াছি।"

মহাপুরুষ তখন রাধানাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি দেখিলে?"

রাধানাথ মহাপুরুষের পদ-প্রান্তে পড়ি এতক্ষণ অজস্রধারে অশ্রু-বর্ষণ করিতেছিল মহাপুরুষের কথায় ক্রন্দন করিতে করি উত্তর দিল,—"আমি যাহা দেখিলাম, তা বলিবার নয়। উঃ! সে যাতনা অসহ্য! সে দৃ ভয়ঙ্কর!—অতি ভয়ঙ্কর!!"

মহাপুরুষ।—"কি বল?"

রাধানাথ।—"আমি দেখিলাম, আমি য সৎপথে থাকিতাম, তাহা হইলে আমি আমা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলে, সেই দিনে বিশাল সাম্রা জ্যের অধীশ্বর হইতে পারিতাম। কিন্তু আ বিশ্বাসহীন, আমি নরাধম, আমি ঘোর পাষণ্ড তাই হেলায় রতন হারাইয়াছি। বিশাল সাম্রা জ্যের পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র হাজার টাকা তোড়া পাইয়াছি। হায় গুরো! আমার কি আর উদ্ধার নাই?"

মহাপুরুষ সে কথার আর কোন উত্তর দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা, তা'র প তোমার ভবিষ্যৎ কি দেখিলে?"

রাধানাথ প্রাণের জ্বালায় অস্থির হই উত্তর দিল,—"সে কথা একমুখে বলিতে পা না। উঃ! কি যন্ত্রণা!—কি ভীষণাকৃতি!—কি পূতিগন্ধময় স্থান! নরক—নরক—নরক!"

মহাপুরুষ তখন দুইজনকে পদপ্রান্ত হই উত্তোলন করিয়া অনেক বুঝাইলেন; অনে সদুপদেশ দিলেন। শেষে তাঁহাদের বিদা দিয়া আবার যোগে বসিলেন।"

গুরুদেবের এই গল্পটির ভিতর কি অলৌ কিক সত্য ও জ্ঞানপূর্ণ উপদেশই নিহিত আছে! এ সত্য—এ জ্ঞানের মর্ম্মোদ্ঘাট

যিনিই করিতে পারেন, এজগতে তিনিই সুখী। ভ্রান্ত জীব আমরা, তাই আমরা বুঝিয়াও বুঝি না; গুরুপদেশ শুনিয়াই, আবার তন্মুহূর্ত্তেই তাহা ভুলিয়া যাইতেছি। হা জগদীশ! আমাদের এ ভ্রান্তি কি আর অপনোদিত হইবার নহে? দয়াময় তুমি, আমাদের এ ভ্রান্তি বুঝাইয়া দেও না কেন?

ঠগী-কাহিনী।

(ঠগের নিজের মুখে শুনিয়া)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"In solitude, if the mind seeks the occupation, it readily takes up the clue to past events, however distant, and thought brings them one by one before the imagination, as vividly fresh as the occurrence of yesterday".—TAYLOR.

"আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময় আমার বয়ঃক্রম ৭ বৎসরের অধিক হয় নাই। আপনি সহজেই মনে করিতে পারেন যে, এত অল্প বয়সের কথা আজি পর্য্যন্তও আমার হৃদয়-পটে এত উজ্জ্বলরূপে চিত্রিত রহিয়াছে কেন? বহু বৎসর অতীত হইল, আমি একবার দিল্লীতে ধৃত হইয়া কারাগারে রুদ্ধ হই। কেবলমাত্র কারাগারেও নহে, উহার মধ্যে আমাকে অনেক দিন নির্জ্জন-বাসও সহ্য করিতে হয়। সেই সময়, নির্জ্জনে বসিয়া বসিয়া আমি কেবল আমার অতীত জীবন ভাবিতাম; ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে ক্রমে সমস্ত বিষয় আসিয়া আমার স্মৃতি-পথে উদিত হইত। কোন কার্য্য নাই, কাহারও সহিত সাক্ষাৎ নাই; কাজেই নির্জ্জনে বসিয়া যতই ভাবিতাম, পুরাতন কথা ততই মনে পড়িত; ততই অতীত ঘটনার চিত্র আসিয়া হৃদয় চিত্রিত করিত। কাজেই আমার সমস্ত কথা বিশেষ-রূপে মনে আছে; সমস্তই যেন কল্য ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে।

"এই কারাবাসের সময় একজন বৃদ্ধ ঠগ আমার সঙ্গী ছিল। তাহার নিকটও আমি সর্ব্বদা আমার বাল্য-কাহিনী শ্রবণ করিতাম; এবং সেইরূপ কিছু শ্রবণ করিবা-মাত্রই, আমার অস্ফুটিত চিন্তা যেন আরও প্রস্ফুটিত হইত; সমস্ত ঘটনাই স্মৃতি-পথে উপস্থিত হইত।

"আর, গণেশের কাহিনী আমার বিশেষ-রূপে মনে আছে। তাহার সেই নিষ্ঠুর ব্যবহারের অনেক দিন পরে, এক দিন গণেশ আমাকে বলিয়াছিল,—'ইসমাইল যদি তোমাকে রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে সেই সময়েই আমা-কর্ত্তৃক তুমি তোমার পিতা-মাতার অনুসরণ করিতে।'

"আমি, ইসমাইল ও তাঁহার পত্নীর দ্বারা অতিশয় যত্নের সহিত প্রতিপালিত হইতে লাগিলাম। অতি অল্প দিবসের মধ্যেই আমি আমার পিতা-মাতাকে ভুলিয়া গেলাম; ইসমাইলকেই পিতা ও তাঁহার পত্নীকেই মাতা বলিয়া জানিলাম। তাঁহাদিগের যত্নে আমি ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলাম। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার সৌন্দর্য্যও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; আমার রূপ দেখিয়া গ্রামস্থ সকলে বিশেষ মোহিত হইতে লাগিল। গ্রামস্থ লোক পাছে কোন বিষয় সন্দেহ করে, পাছে আমার মুখ হইতে কোন বিষয় বাহির হইয়া পড়ে এই ভয়ে, হয় পিতা না হয় মাতা, সর্ব্বদাই আমাকে সঙ্গে করিয়া রাখিতেন। আমি একেলা কাহারও নিকট বা কোন স্থানে যাইতে পারিতাম না।

"ঐ গ্রামের ভিতর পিতার একখানি কাপড়ের দোকান ছিল। তিনি মধ্যে মধ্যে আবার দোকান বন্ধ করিয়া হঠাৎ কোথায় চলিয়া যাইতেন। এমন কি, সময় সময় অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রত্যাগমনও করিতেন না। কিন্তু যখন আসিতেন, তখন কাপড় প্রভৃতি

নানাবিধ দ্রব্য সঙ্গে লইয়া আসিতেন। তবে তিনি যে কোথায় গমন করিতেন, তাহা আমার মাতা 'মরিয়ম' প্রভৃতিও জানিতে পারিতেন না। পিতার অনুপস্থিতি-কালে মাতা আমার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিতেন যে, আমি আমার নিজ-পিতা-মাতার নিকটও সেইরূপ ব্যবহার কখনও প্রাপ্ত হই নাই। নূতন মাতা আমাকে সর্ব্বদা ক্রোড়ে করিয়াই রাখিতেন; ক্ষণকালের নিমিত্তও আমাকে পরিত্যাগ করিতেন না। আমি সর্ব্বদা উত্তম উত্তম পরিচ্ছদে শোভিত থাকিতাম; এবং বাল-সুলভ বুদ্ধি-প্রযুক্ত যখন যাহা চাহিতাম, মাতা তখনই তাহা দিতেন।

"এইরূপে আমার বয়ঃক্রম প্রায় ১১ বৎসর হইল। সেই সময় হঠাৎ জ্বররোগে আমার সেই স্নেহময়ী মাতা 'মরিয়মের' মৃত্যু হইল। তখন আমার পিতাও আবার স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন। আমি মাতার নিমিত্ত কত কাঁদিলাম; বহুদিবস পরে আবার মাতৃ-শোক আসিয়া আমার হৃদয় অধিকার করিল। এই সময় একজন প্রতিবেশী আমাকে তাঁহার বাটীতে লইয়া গেলেন; এবং যে পর্য্যন্ত আমার পিতা প্রত্যাগমন না করিলেন, সেই পর্য্যন্ত তিনি আমাকে তাঁহার বাটীতেই রাখিয়া দিলেন। ক্রমে কিছু দিন পরে পিতা ফিরিয়া আসিলেন; এবং আমার মাতার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া একেবারে শোক-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। যখন তিনি তাঁহার সেই শূন্য ঘরে প্রবেশ করিলেন, 'মরিয়ম—মরিয়ম!' শব্দে বার বার কাঁদিতে লাগিলেন; তখনকার তাঁহার সেই মূর্ত্তি আজি-পর্য্যন্তও আমার মনে রহিয়াছে; তাহা আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। যাহাহৌক, তিনি আর কাঁদিয়া কি করিবেন! অগত্যা অবশেষে দেশাচার-অনুসারে তাঁহার সমস্ত প্রেত-কার্য্য সমাপন করিলেন; এবং পরেও, যত দিন পর্য্যন্ত আমরা সেই গ্রামে ছিলাম, ততদিন প্রতি শুক্রবারেই, তিনি নানাবিধ ফুল দ্বারা আমার মাতার 'গো... সজ্জিত করিয়া দিতেন; ও চক্ষুজলে ... গোরস্থান ভিজাইতেন।

"মাত! আপনি যে আমাদিগকে প... ত্যাগ করিয়াছিলেন, সে ভালই হইয়াছি... আপনি যে একজন প্রসিদ্ধ ঠগের পত্নী ... একজন প্রসিদ্ধ ঠগের মাতা, তাহা আ... জানিতেন না বা গ্রামস্থ কেহই অবগত ছি... না। আপনার জীবিত-কালে যদি কেহ এস... পরিচয় জানিতে পারিত, তাহা হইলে আপ... গৌরব আর কোথায় থাকিত? আপনি জা... চ্যুত হইতেন।

"মহাশয়, আমার পিতা এতদূর কৌশ... ছিলেন যে, আমার মাতাও জানিতেন না ... তিনি একজন হত্যা-ব্যবসায়ীর পত্নী। যাইহো... আমার মাতার কিন্তু কোন ক্লেশ ছিল ... পিতা তাঁহাকে প্রাণের অপেক্ষাও ভাল বা... তেন। তিনি যখন যাহা চাহিতেন, তখ... তাহা পাইতেন।

"এ ঘটনার পর আরও ৪।৫ বৎসর অ... হইয়া গেল। ইহার ভিতর, আর বিশেষ ... ঘটনা ঘটে নাই। তবে আমার পিতা এই গ্... পরিত্যাগ করিয়া 'মরণাও' নামক একটী গ্রা... যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। সেই স্... ঐ স্থান সিন্ধিয়ার অন্তর্গত ছিল। এই স... আমাকে লেখা-পড়া শিখাইবার নিমিত্ত ... জন বৃদ্ধ মৌলবীর নিকট তিনি আমা... রাখিয়া দেন; এবং প্রথমে আমি তাঁহার নি... 'পারসি' ভাষা শিখিতে আরম্ভ করি।

"আমি ক্রমে ক্রমে বড় হইতে লাগিলা... সেই সময় দেখিতাম, প্রায় সর্ব্বদাই কত... গুলি লোক আমাদিগের বাড়ীতে আসিত, ... পিতার সহিত কি পরামর্শ করিত। উহারা ... তাহা জানিবার ইচ্ছাও ক্রমে আমার বল... হইতে লাগিল। এইরূপে এক দিবস জা... লায় যে, উঁহারা সে দিন আবার আমা...

বাটীতে আগমন করিবে; দেখিলাম, তাহাদিগের নিমিত্ত নানাবিধ খাদ্য প্রস্তুত হইতেছে। এই সকল দেখিয়াও কিন্তু সন্ধ্যার সময়ই আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।

"পরে হঠাৎ যখন আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন দেখিলাম, উহারা সকলে পিতার সহিত একত্রে বসিয়া ভোজন করিতেছে; ও পরস্পরে কি কথা বলিতেছে। আমি তখন আস্তে আস্তে উঠিলাম। উহাদিগের নিকট একটী পরদা লম্বমান ছিল। উঠিয়া গিয়া, তাহার অন্তরালে উপবেশন করিলাম; ও উহাদিগের পরস্পরের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, কথার এক বর্ণও বুঝিতে পারিলাম না; সে যেন অন্য আর এক প্রকার ভাষা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। উহাদিগের আহার-আদি শেষ হইলে পিতা সেই স্থান হইতে উঠিলেন; এবং আমি যে স্থনে গুপ্তভাবে বসিয়া ছিলাম, সেই দিকে আসিলেন। তাঁহার নিকট তখন একটী বাক্স দেখা গেল। সেই বাক্সটি লইয়া তিনি সকলের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। পরে, দুই একটী কি কথা-বার্ত্তার পর, ঐ বাক্সটী সর্ব্ব-সমক্ষে খুলিলেন। আমি দেখিলাম যে, উহা কেবল সুবর্ণ ও রৌপ্য-নির্ম্মিত অলঙ্কার এবং মুক্তার মালা প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ। যাইহোক, পিতা তখন ঐ সকল অলঙ্কার বাক্স হইতে বাহির করিয়া, প্রায় সমান অংশে বিভাগ করিলেন; এবং তাহার এক এক অংশ উহাদের এক এক ব্যক্তি গ্রহণ করিল। আর, পিতার অংশ, তিনি সেই বাক্সের ভিতরই রাখিয়া দিলেন।

"এখন, তাঁহারা হিন্দুস্থানী ভাষায় আবার কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। উহা আমি উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলাম। উহাদের মধ্যেই একজন বলিল,—'ইসমাইল, আপনি আমির আলির বিষয় কি ভাবিতেছেন? তিনি আর এখন বালক নহেন! এখন তাঁহাকে যুবক বলা যাইতে পারে। এখন হয় তাঁহাকে আমাদিগের কার্য্য শিক্ষা দিয়া আমাদিগের সঙ্গী করিয়া লওয়া উচিত, না হয় অন্য কোন উপায় দেখা কর্ত্তব্য। কারণ, এরূপ অবস্থায় আমাদিগের ভিতর আর তাঁহার থাকা উচিত নহে; কি জানি, কি হইতে কি হয়!

"সে ভাবনা তোমাদিগের ভাবিতে হইবে না; আমির আলি সেরূপ ছোকরা নহে। সে আমার নিতান্ত অনুগত; আর এ জগতে তাহার আর কেহই নাই। তাহার পিতার নাম ছিল,——।'—এই বলিয়াই, পিতা আবার সেই পূর্ব্বের ভাষায় কথা আরম্ভ করিলেন। তখন তাহার আর এক বর্ণও আমি বুঝিতে পারিলাম না।

"আমার পিতার নিকট থাকিয়া যে সর্ব্বদা কাপড়-আদি বিক্রয় করিত, সেই 'হোসেন' তখন কহিল,—'ও বালকের জন্য আর ভাবনা কি! ও যেরূপ বুদ্ধিমান ও চতুর বালক, তাহাতে যদি উহাকে আমাদিগের ব্যবসায় শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহার সমান ব্যক্তি পাওয়া নিতান্ত দুর্ল্লভ হইবে। আর, আমাদের ব্যবসায় উহাকে শিক্ষা দেওয়ার পক্ষেও আমি বিশেষ কঠিন ব্যাপার বলিয়া বোধ করি না। কারণ, যদি কোন প্রকারে ও আমাদিগের সেই 'গুড়' একবার উদরস্থ করিতে পারে, তাহা হইলেই সকল গোল মিটিয়া যাইবে; ও-ও আমাদিগের মত এক-জন উপযুক্ত লোক বলিয়া পরিগণিত হইবে। কেন আপনাদের কি মনে নাই যে, আমি একটী বালককে এইরূপে আমাদিগের দলে প্রবিষ্ট করিয়া লইয়াছিলাম! তাহার সেই সিংহ-সদৃশ পরাক্রম কি আপনারা বিস্মৃত হইয়াছেন?'

"হোসেনের কথা শুনিয়াই, পিতা কহিলেন,—'তুমি যাহা কহিলে, তাহা সত্য। এই বালক যদি একবার আমাদিগের দলে প্রবেশ

করে, তাহা হইলে তাহাকে সহজে পরাজয় করা বড় সহজ ব্যাপার হইবে না। উহার মত বলিষ্ঠ এবং সাহসী বালক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ও যেরূপ 'কছলৎ' অভ্যাস করিয়াছে, তাহা অন্যের পক্ষেও বড় সহজ নহে। কিন্তু কি প্রকারে আমি উহার নিকট এই প্রস্তাব করিব? আর, প্রস্তাব করিলেই যে সহজে ও স্বীকৃত হইবে, তাহাই বা কি করিয়া বলিতে পারি!'

"আমার পিতার এই কথা শুনিয়া অন্য আর একজন আমার অপরিচিত ব্যক্তি কহিলেন,—'এই সামান্য কার্য্যের নিমিত্ত আপনারা এত ভাবিতেছেন কেন? এইরূপ বালকদিগের মনকে বিচলিত করা যেরূপ সহজ কার্য্য, সেরূপ আর কিছুই নহে। আপনি তাহার নিকট আমাদিগের কর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন, আমাদিগের ঈশ্বরের আদেশ তাহাকে বলিয়া দিউন। অধিকন্তু, এই কার্য্য যশের সহিত সমাপন করিতে পারিলে, পরিশেষে যে ইন্দ্রত্বও পাওয়া যাইতে পারে, তাহাও তাহাকে জানাইয়া দেন। আপনার জাতি-ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া, বিষয়-ধর্ম্ম যেরূপে প্রতি-পালন করিতে হইবে, এবং পারিণামে উহার যে ফল ফলিবে, তাহা যখন সে জানিতে পারিবে; তখন তাহাকে আর কিছুই বলিতে হইবে না। আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি, তখন সে আপনিই এই ধর্ম্ম সাধন করিবার নিমিত্ত মন অর্পণ করিবে, প্রাণ উৎসর্গ দিবে।'

"এই কথা শুনিয়া পিতা কহিলেন,—'তুমি যে পরামর্শ দিতেছ, ইহাই উত্তম। কারণ, পুত্র আমার রাত্রিদিনই সেই বাঁদর মোল্লার 'বাঁদরামীতে' ভুলিতেছে; অপ্রশস্য 'কোরাণের' উপদেশ সকল কণ্ঠস্থ করিতেছে; মহম্মদীয় ধর্ম্মের উপর ক্রমেই তাহার মন-সংযোগ হইতেছে। এখন, এই প্রকৃত ধর্ম্মের রাস্তা যদি তাহাকে দেখাইয়া দেওয়া হয়; আমাদের ঈশ্বরীয় বাণি-সকল যদি তাহাকে বলি দেওয়া হয়; তাহা হইলে নিশ্চয়ই, সে আ দিগের পথ অনুসরণ করিবে।'

"ক্রমে এই পরামর্শই স্থির হইয়া গেল। প্রাতে সকলে পুনরায় বহির্গত হইবেন, ই ধার্য্য হইল। অতঃপর সকলে আপন-আ স্থানে প্রস্থান করিলেন; এবং পিতাও তাঁ নিয়মিত স্থানে গিয়া শয়ন করিলেন। আমিও, আস্তে আস্তে সেই স্থান হই আপন শয্যায় গমন করিয়া, পুনরায় ঘুমাই চেষ্টা করিলাম। কিন্তু কি জানি কেন, নিদ্রা আর আসিল না।

"মহাশয়! আপনি বুঝিতে পারিতে কি, যে, সেই সময়ে আমার মনে কিরূপ চি আসিয়া উদয় হইয়াছিল? আমার পি ও অন্যান্য সকলে কোন্ ধর্ম্মোপাসক, তাঁহ কি করিয়া থাকেন,—এই সকল ভাবি ভাবিতেই, আমার মন ক্রমে অস্থির হই লাগিল। নিদ্রা একেবারে যেন চক্ষু ত্যাগ করিল। শরীর অসুস্থ বোধ হই লাগিল। জানিতে পরিলাম, ইসমাইল আ পিতা নহেন; ভাবিতে লাগিলাম,— আমার পিতা! যাইহোক, কিছুই কিন্তু মনে আসিল না। যেন অন্ধকারের ভি ছায়া দেখিতে লাগিলাম। পুনরায় ভাবিল আমার পিতা যে ধর্ম্মাবলম্বীই কেন হউন আমিও সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করিব; তাঁ সহিত একত্রে সকল কার্য্য সমাপন করি ভাবিলাম, সর্প যেমন তাহার পুরাতন পরিত্যাগ করিয়া নূতন রূপ ধারণ করে, আ আমার এই সকল পুরাতন ধর্ম্ম-কর্ম্ম পরি করিয়া পিতার নূতন ধর্ম্ম-কর্ম্মেই আপন অর্পণ করিব। এইরূপ ভাবিতে ভাবি সেই রাত্রি অতিবাহিত হইল।"

অদ্ভুত হত্যা।

বন্দীত্বে।

ঘোর অন্ধকার! কিছুই দেখা যায় না। এমন সময়ে সুরনাথ বাবু পল্লীর অপর প্রান্তের একটী বাড়ী হইতে যেমন বহির্গত হইবেন, অমনি কি জানি কে কোথা হইতে আসিয়া তাঁহার হাত ধরিল। তিনিও সবলে তাহা ছাড়াইয়া লইলেন। তখন, আবার ৩।৪ জন লোক আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া ধরিল; তিনি আর জোর করা বৃথা মনে করিয়া, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা আমায় ধরিতেছ কেন? তোমাদের অভিপ্রায়ই বা কি?" তাহাদের মধ্যের একজন বলিল,—"সুরনাথ বাবু, আমায় চিনিতে পারেন কি? আমিই সেই রামেশ্বর খাঁ—দারোগা। আপনি মনে করিয়াছিলেন যে, আপনার কার্য্য কেহই টের পাইবে না; কিন্তু আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আমাদের চোখে ধুলি প্রদান করা আপনার মত বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। তাহা না হইলে, আপনি কাল এই বাটীতে খুন করিয়া আবার আজই এখানে আসিয়াছেন কেন? বোধ হয়, নেহাত রাগের মাথায় একার্য্য করিয়াছিলেন; তাই এখন মনের দুঃখে বাড়িটে দেখিয়াও প্রাণ শীতল করিতে আসিয়াছেন। যাহা হউক, আপনি এক্ষণে আমার বন্দী। আপনাকে এখন গারদে যাইতে হইবে। আর, আমি আপনার খুনের অনেক প্রমাণও সংগ্রহ করিয়াছি। কাল রাত্রের কথা মনে হয় কি? যখন আপনি ও সেই মুটেরূপী আপনার লোক বস্তা মাথায় করিয়া আপনার অগ্রে অগ্রে যাইতেছিল, তখন আপনি আমাকে দেখিয়া ভয়ে আমার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে মুটেকে সাবধান করিয়া সরাইয়া দিয়াছিলেন; মনে পড়ে কি? তখন মনে করিয়াছিলেন, আর আপনাকে ধরে কে? কিন্তু জানেন, আমি একাজে চুল পাকাইয়াছি; আমায় ফাকি দেওয়া কিছু শক্ত কথা! যাইহোক, আপনি কাল সন্ধ্যার পর এখানে আসিয়া কতক্ষণ ছিলেন?"

সুরনাথ বাবু বলিলেন,—"এখানে আমি রোজ সন্ধ্যার পর আসিয়া থাকি; এবং কিছু-ক্ষণ গান-বাজনা শুনিয়াই চলিয়া যাই। কাল কথার-চ্ছলে বিবাদ হওয়ায়, বাটী ফিরিতে একটু অধিক রাত্রি হইয়াছিল। আমি এখানে আসিয়াছি বলিয়াই যে, আমিই উহাকে খুন করিয়াছি, ইহা কখনই যুক্তিসিদ্ধ কথা নহে। কারণ, আরও ২।৪ জন ভদ্রলোক এখানে না আসেন, এমন নহে।" দারোগা মহাশয় তাহাতে বলিলেন,—"আর বেশী কথার আবশ্যক নাই। যাহা বলিতে হয়, আপনি বিচারকের সম্মুখে তাহাই বলিবেন। আপনিই যে ইহাকে খুন করিয়াছিলেন, তাহা চাক্ষুস কেহ দেখে নাই সত্য; কিন্তু অবস্থা-ঘটিত প্রমাণে আপনাকেই দোষী বলিয়া বোধ হয়। দেখুন, কাল রাত্রে আপনি এখানে আসিয়া অনেকক্ষণ থাকিয়া যে ঝগড়া করিয়াছেন, তাহা আপনি নিজেই স্বীকার করিতেছেন। তা'র পর, অত রাত্রে আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়; এবং বাটীতে ফিরিবার কালীন আপনার কাপড়ের স্থানে স্থানে রক্তের দাগ ছিল, ও কাপড়ের স্থানে স্থানে ছেঁড়া দেখা গিয়াছে। তদ্ভিন্ন, আজ প্রাতঃকাল হইতে কেহই এবাটীর স্ত্রীলোকটীকে আর দেখিতে পাইতেছে না। অথচ কাল রাত্রের সেই মস্তক-হীন দেহ দেখিয়া, সকলেই অনুমান করিতেছেন যে, সেই দেহই এবাটীর স্ত্রীলোকের। আবার আপনাকে অদ্য চুপি চুপি এই বাটী হইতে বহির্গত হইতে দেখা গেল। আমরা জানি, খুনি যে যায়গায় খুন করে, সে পুনরায় সেই স্থানে আসিয়াই দেখে যে, কেহ তাহার অনুসন্ধান পাইল কি না!"—এই

বলিয়াই, দারোগা মহাশয় তাঁহার দল-বলের সহিত, সুরনাথ বাবুকে লইয়া গেলেন।

বিচারে।

আদালত লোকে লোকারণ্য। আদালত-গৃহটী বিশেষ বড় না হইলেও, ছোটও বলা যায় না। তাহার চতুর্দ্দিকে বড় বড় জানেলা। প্রত্যেক জানেলার নিকট এক একটি চৌকিদার প্রহরার কার্য্যে নিযুক্ত। পাছে কেহ কোন প্রকারে বিচারকের কোন অনিষ্ট, অথবা গোল করিয়া শান্তিভঙ্গ করে! গৃহের দুইটীমাত্র দরজা। একটী লোক-যাতায়াতের; ও অপরটি বিচারকের, সে দিকে আর কাহারও যাইবার অধিকার নাই। গৃহের পূর্ব্বদিকের মধ্যস্থলে বিচারকের বসিবার উচ্চ কাষ্ঠাসন; এবং তন্নিম্নে ও চতুষ্পার্শ্বে, আইন-ব্যবসায়ীদিগের বসিবার স্থান। বেলা দুই প্রহর। কিন্তু এখনও বিচারক আসিতেছেন না। সকলেই উদ্বিগ্ন; একদৃষ্টে সকলেই বিচারকের আসনের দিকে লক্ষ্য করিয়া রহিয়াছে। সকলেই জানিতে উৎসুক, আজিকার খুনি-মকর্দ্দমায় আসামীর কি হয়! কেহ বলিতেছে,—আসামীর ফাঁশি হওয়া উচিত। কেহ বলিতেছে,—রাগের মাথায় একটী কায হইয়াছে বলিয়া সাজা কিছু কি আর কম হইবে না!—বোধ হয় দ্বীপান্তর হইবে। কেহ বলিতেছে,—আগে উনিই যে খুন করিয়াছেন, তাহাই প্রমাণ হউক; পুলিশের অসাধ্য কিছুই নাই; হয় তো উহারাই খুন করিয়া একটী ভদ্রলোককে মিছামিছি বিপদে ফেলিবার চেষ্টায় আছে।

এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময়ে গোল উঠিল,—বিচারক আসিয়াছেন। সকলেই বিচারকের আসনের দিকে দেখিল,—যিনি প্রত্যহ বিচার করিতেন, তিনি আসেন নাই। তাঁহার স্থানে আর একজন বিচারক আসিয়া বসিয়াছেন। খুনি-মকর্দ্দমার বিচার একজন নূতন বিচারকের দ্বারা হওয়া যুক্তি সঙ্গত নয় বিবেচনায়, উপরিতন কর্ম্মচারী তাঁহার বদলে আর একজন পলিত কেশ বৃদ্ধ, বিচক্ষণ বিচারককে বিচারার্থ পাঠাইয়াছেন। ইহাঁকে দেখিলে একজন ঋষিতুল্য লোক বলিয়া মনে হয়। ইহাঁর গোঁপদাড়ি চুল সমস্তই পাকিয়া গিয়াছে। শরীরের মাংস কিঞ্চিৎ লোল হইলেও, এখনও বোধ হয় গায়ে যেন বিলক্ষণ জোর আছে। বর্ণ উজ্জ্বল গৌর; বয়স বোধ হয়, ৫০ হইতে ৫৫ বৎসরের মধ্যে হইবে।

বিচারকের নামও শুনা গেল, সেরেস্তাদার ইনি বহুদিবস হইতেই সুখ্যাতির সহিত বিচারাসন শোভিত করিতেছেন। ইনি বিচারাসনে বসিবামাত্র সকলেই নিস্তব্ধ হইল। চৌকিদারেরাও 'চুপ চুপ' রবে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিল।

পরে আসামীকে আনিবার হুকুম হইল। সুরনাথ বাবুর দুই হাতে হাতকড়ি। তিনি রাত্রে যেরূপ কাপড়-জামা প্রভৃতি গায়ে দিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই রহিয়াছে। অধিকন্তু, তিনি দোষী-সন্দেহে তাঁহার হাতে হাতকড়ি। তা হোক, বিচারক তখন উহা খুলিয়া দিতে বলিলেন; এবং তাঁহার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে ভাবিলেন,—"ইহাঁর চেহারা দেখিলে কোন ক্রমেই ইহাঁকে খুনী বলিয়া সন্দেহ করা যায় না বটে; কিন্তু পুলিষে যে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছে, তাহাতে কি করিব বা নির্দ্দোষী বলি! যাহা হউক, দেখা যাক, প্রমাণে কি দাঁড়ায়!"—এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি সুরনাথ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি খুন করিয়াছ?" সুরনাথ বাবু বলিলেন,—"না।" বিচারক আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে তোমাকে ইহারা খুনী বলিয়া কিজন্য গ্রেপ্তার করিল?" সুরনাথ বাবু বলিলেন,—"আমি জানি না যে, কেন

আমাকে গ্রেপ্তার করিল? আয়েসার বাটীতে গিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া, ফিরিতেছি; এমন সময়, দারোগা মহাশয় আমাকে ধরিলেন। এইমাত্র আমি জানি।"

বিচারক।—"তুমি কোন ওজর-আপত্তি করিয়াছিলে কি?"

সুরনাথ।—"পুলিষ আবার কখন্ কাহার ওজর-আপত্তি শুনে থাকে!"

বিচারক।—"যে খুন হইয়াছে, তাহাকে তুমি চেন?"

সুরনাথ।—"যাহাকে খুন হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছে; এ যদি ঠিক সেই হইত, তবে আমি নিশ্চয়ই চিনিতাম।"

বিচারক। (বিস্মিত হইয়া)—"তবে তোমার মতে খুনও জাল! ও লাসটি কি তবে তাহার নয়? আর একজনের মস্তকহীন দেহ লইয়া পুলিসের লোকেরা কি মিছামিছি তোমাকে ধরিয়াছে? তবে কি উহাদের সহিত তোমার কোনরূপ মর্ম্মান্তিক বিবাদ আছে?"

সুরনাথ।—"না, উহাঁদের সহিত আমার কিছুমাত্র বিবাদ নাই।"

বিচারক।—"তুমি লাস দেখিয়াছ?"

সুরনাথ।—"হাঁ দেখিয়াছি।"

বিচারক।—"তাহাকে চিনিতে পারিলে; না, জাল বলিয়া বোধ হইল?"

সুরনাথ।—"আমি কিছুই ঠিক করিতে পারি নাই।"

বিচারক তখন সুরনাথ বাবুকে আর কিছুই না বলিয়া, দারোগা মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ খুনি-মকর্দ্দমার তুমি কি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছ?" দারোগা মহাশয় বলিলেন,—"যে রাত্রে খুন ধরা পড়ে, সুরনাথ বাবুর সহিত সে রাত্রে স্ত্রীলোকটির বড়ই ঝগড়া হয়। তার পর, গঙ্গার ধারে মুটের সঙ্গে সঙ্গেও উনি ধরা পড়েন। অধিকন্তু, স্ত্রীলোকটির বাড়ীর সম্মুখস্থ যে মুদির সহিত আমার কথা-বার্ত্তা হয়, সেও লাসটিকে 'সোনাক্ত' করিয়াছে। আরও, ঐ বাটীর কোচম্যান সহিস প্রভৃতি সকলেই সেই বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে। আপনি দেখিতে পাইবেন, এ বিষয়ের প্রধান সাক্ষী মুদি।" বিচারক তখন সেই প্রধান সাক্ষী মুদিকে ডাকিতে কহিলেন। মুদি আসিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। বিচারক মুদিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি লাস দেখিয়াছ?"

মুদি বলিল,—"হাঁ মহাশয়, দেখিয়াছি।

বিচারক।—"কার্ লাস, তুমি চিনিতে পারিলে?"

মুদি।—"হাঁ মহাশয়! সে যে আয়েসার দেহ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

বিচারক।—"আয়েসা কে?"

মুদি।—"আয়েসা আমার দোকানের ঠিক সম্মুখের বাড়িতে বাস করিত।"

বিচারক।—"তাহার বিষয়াশয় কিরূপ; এবং তাহার আত্মীয়-স্বজন কেহ তাহার নিকট থাকিত কি না?"

মুদি।—"সে বেশ্যাবৃত্তি ও নাচ-গান করিয়া অনেক পয়সা উপার্জ্জন করিয়াছিল। তা'র অভিভাবক বা আত্মীয়-কুটম্ব কখনও কাহাকেও দেখি নাই।"

বিচারক।—"তুমি সুরনাথ বাবুকে চেন?"

মুদি।—"চিনি। ইনি প্রত্যহই সন্ধ্যার সময় আয়েসার নিকট যাইতেন।"

বিচারক।—"যে রাত্রে খুন ধরা পড়ে, সেইদিন সন্ধ্যাকালে সুরনাথ বাবুকে আয়েসার বাটী যাইতে দেখিয়াছিলে?"

মুদি।—"হাঁ মহাশয়, সে দিনও সন্ধ্যাকালে সুরনাথ বাবুকে দেখিয়াছিলাম; এবং সুরনাথ বাবু আয়েসার বাটী আসিবার ঘণ্টাখানেক পরেই, দুইজনের ঝগড়ার গলা শুনা গিয়াছিল। কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু সব গোল থেমে যায়। আর কিছুই শুনা যায় নাই।"

বিচারক।—"তুমি সুরনাথ বাবুকে ফিরিতে দেখিয়াছিলে?"

মুদি।—"না, মহাশয়! আমি তখন দোকান বন্ধ করিয়া শুইয়াছিলাম।"

বিচারক মহাশয় আর কোন কথা না কহিয়া, অতঃপর কোচম্যান-সহিসদের এজাহার লইলেন। তাহারাও ঐ সমস্ত কথাই বলিল। বেশীর ভাগ তাহাদের মুখে আরও দুই-একটী নূতন কথা এই শুনা গেল যে,—সুরনাথ বাবু যাইবার কালীন আয়েসার বাটী হইতে খুব দ্রুতবেগে বাহির হইয়াছিলেন।

তৎপরে বিচারক মহাশয় সুরনাথ বাবুর বাটীর সেই লোকটীর সাক্ষ্য লইতে লাগিলেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার নাম কি?" লোকটী বলিল,—"প্রসন্নকুমার ঘোষ।" বিচারক বলিলেন,—"তুমি কি কায-কর্ম্ম কর?" প্রসন্ন বলিল,—"আমার কায-কর্ম্ম কিছুই নাই। তবে সুরনাথ বাবুর ভগ্নীকে বিবাহ করিয়াছি। তাঁহার বাটীতেই খাই-দাই-থাকি। (জেরায়) দরকার-অদরকার পড়িলে, ফাই-ফরমাজটাও খাটিয়া থাকি।"

বিচারক।—"আচ্ছা, খুন ধরা পড়ার রাত্রে সুরনাথ বাবুকে বাটীতে থাকিতে দেখিয়াছ!"

প্রসন্ন।—"সেদিন সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে গিয়া কিছু অধিক রাত্রে বাটী আসিয়াছিলেন। কিন্তু আবার অল্পক্ষণ পরেই বাহিরে যান; ও কিছুক্ষণ পরে পুনরায় পাগলের ন্যায় বাটী ফিরিয়াছিলেন।"

বিচারক।—"যখন সুরনাথ বাবু বাটী ফিরিয়াছিলেন, তখন তাঁহার কাপড়ে কোন দাগ ছিল কি?"

প্রসন্ন।—"অল্প অল্প রক্তের ও কাদার দাগ; এবং কাপড় একটু ছিঁড়িয়া গিয়াছিল।"

বিচারক।—"তোমরা এসব দেখিয়া তাঁহাকে কোন কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে?"

প্রসন্ন।—"হাঁ, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি সে কথার কোন উত্তর না দিয়া তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে বারণ করিয়াছিলেন।"

বিচারক তখন প্রসন্নকে ছাড়িয়া, দারোগা মহাশয়ের এজেহার লইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি নিমিত্ত সুরনাথ বাবুর উপর সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিলে?" দারোগা মহাশয় উত্তর করিলেন,—"খোদাবন্দ! আমি পরশ্ব রাত্রে রোঁদে বাহির হইয়া যখন গঙ্গার ধারের রাস্তায় আসি, তখন সুরনাথ বাবু একটী মুটেকে সঙ্গে করিয়া গঙ্গার দিকে যাইতেছিলেন। অত রাত্রে কখনই ভদ্রলোক মোট লইয়া গঙ্গার দিকে যাইবে না এই মনে করিয়া, আমি তাঁহার সঙ্গ লইয়াছিলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই, সুরনাথ বাবু আমাকে দেখিতে পাইয়া, উপর চাপ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কিসের মোট মুটের মাথার দিয়া, আপনি এত রাত্রে কোথায় যাইতেছেন?' পরে যখন তিনি শুনিলেন, আমার সন্দেহ হওয়ায় আমি মুটের সঙ্গ লইয়াছি, তখন তিনি,—'ওহে কিসের মোট লইয়া গঙ্গায় নামিতেছ!'—বলিয়া, মুটেকে সাবধান করিলেন। মুটেও সুতরাং বস্তা ফেলিয়া পলাইল। আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িলাম। কিন্তু শেষে মুটে জলে লাফাইয়া পড়ি দেখিয়া বুঝিলাম, সে সামান্য মুটে নহে; একজন পাকা বদমায়েস। তা'রপর ফিরিয়া আসিয়া দেখি, সুরনাথ বাবু আপনাকে বাঁচাইবার জন্য, না পলাইয়া, সেই বস্তার পাশে দাঁড়াইয়া আছেন। পরে, আমি যখন বস্তা খুলিতে চেষ্টা করিতেছিলাম, সুরনাথ বাবু তাড়াতাড়ি পকেট হইতে ছুরি বাহির করিয়া বস্তার কাটিয়া দিলেন। অত রাত্রে তাঁহার পকেটে ছুরি থাকিবারই বা আবশ্যক কি? তখন তিনি শীঘ্র শীঘ্র আমার নিকট হইতে সরিয়া

যাইবার চেষ্টা করায়, এবং তিনি সাক্ষীর কোন প্রভেদ থাকিতে রাজি না হওয়ায়, আমার তাঁহার উপর বড়ই সন্দেহ হইল। তখন আমাদের গোয়েন্দা সের খাঁকে সমস্ত সন্ধান লইতে বলিলাম। সেও সমস্ত সন্ধান করিয়া যাহা বলিয়াছিল, সমস্তই তো প্রমাণ পাইলেন!"

বিচারক মহাশয় তখন সুরনাথ বাবুকে বলিলেন,—"সমস্তই তো শুনিলে! ইহাতেও কি তুমি বলিতে চাও যে, তুমি খুন কর নাই?" সুরনাথ বাবু বলিলেন,—"না, আমি খুন করি নাই।"

দুইখানি ছবি।

অষ্টম দৃশ্য। *

গেল কোথা!

"তাই তো, গেল কোথা!"

"কিছুই তো বুঝ্‌চিনে—আবাগী কল্লে কি?"

"হায়-হায়! বৃদ্ধ বয়সে শেষে কুলে কালী পড়্‌লো! হা অদৃষ্ট!"

"পোড়াকপালীর মনে এতটা ছিল যে, তা' আর কেমন করে জান্‌বো! যাইহোক, একবার খোঁজটা নেওয়া তো উচিত!"

"খোঁজ আমার মাথা, আর তোমার মুণ্ডু!"

যাইহোক, গৃহিণীর সহিত এইরূপ ক্ষণেক কথাবার্ত্তার পরই, অগত্যা মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে বাড়ীর বাহির হইতে হইল। অন্ততঃ গৃহিণীর তাড়নায় অব্যাহতি পাইবার ভরসায়ও, তিনি খুঁজিতে গেলেন,—চঞ্চলা গেল কোথা! কিন্তু খোঁজ আর বড় সহজে পাইবার যো কই? লোকের কাছে মুখ ফুটিয়া ও ছাই কথা বলিবেনই বা কি করিয়া? কাজেই প্রাতঃকাল হইতে তাঁহার ঘুরিতে ঘুরিতেই, বেলা ১০টা বাজিয়া গেল। অথচ কোন সন্ধানই মিলিল না।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় অবশেষে পুলিসে কোনরূপ সংবাদ দিয়াই, গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন, মনস্থ করিলেন। আর, এইরূপ স্থির করিয়াই, তিনি পুলিসের দিকেই যাইতেছেন; এমন সময় দেখিলেন, রাস্তার ধারেই তাঁহার পরম-বন্ধু চূড়ামণি মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপে বড়ই সোরগোল বাধিয়াছে। অন্য দিন সেদিকে যাইলে, চূড়ামণি মহাশয় তাঁহাকে ডাকিয়া কতই আদর-আপ্যায়িত করিতেন; অন্ততঃ তামাক না খাওয়াইয়া, যাইতেই দিতেন না। আজ কিন্তু তিনি বাড়ীর দরজা দিয়া যাইতেছেন দেখিয়াও, চূড়ামণি মহাশয় কোন কথাই কহিলেন না। অধিকন্তু, কিঞ্চিৎ যেন বিরক্তভাবে তিনি মুখ ফিরাইলেন। চূড়ামণি মহাশয়ের সঙ্গে কন্যা-সম্বন্ধে দু'একটা কথা-বার্ত্তা কহিবার ইচ্ছা থাকিলেও, গোলমাল দেখিয়া, তিনিও অগত্যা সেদিকে আর ঘেঁসিলেন না। যেমন যাইতেছিলেন, তেমনই চলিলেন।

এই সময়, একটী ষণ্ডামার্ক-প্রকৃতির যুবক, যাহাকে বরের ঘরের মাসী ও কনের ঘরের পিসী বলিলেও চলে, কিন্তু চূড়ামণি মহাশয়কে বলিয়া উঠিল,—"মুখুজ্যে বেটাই যত নষ্টের গোড়া! তলে তলে টাকা খেয়ে, ওবেটাই ষড়যন্ত্র ক'রে আপনার সংসারটা উৎসন্ন দিল! ও বেটাকে কেটে ফেল্লেও রাগটা যায় না! আহা! এমন সংসারটা বেটা ছারখার করবার উদ্যোগ কর্‌লো! হুকুম দেন না, ও বেটাকে ধরে এনে ঘা-কতক বেশ শিক্ষা দিয়ে দিই।"—এই বলিয়াই, হুকুমের অপেক্ষা আর না করিয়া, যেই চূড়ামণি মহাশয় একটু অন্য-মনস্ক হইয়াছিলেন অমনি, সেই যুবক চণ্ডীমণ্ডপ হইতে লাফাইয়া দৌড়িল। এবং, "কর কি—কর কি!"—

---

* দ্বিতীয় বর্ষের ১৮শ হইতে ২০শ সংখ্যায় পর্য্যন্ত প্রকাশিত অংশের পর।

বলিয়া অপর সকলে তাহাকে বাধা দিলেও, সে মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে ঘাড় ধরিয়া টানিয়া লইয়া আসিল; বলিতে লাগিল,—"বেটা, মেয়ে পুষে লোকের সর্ব্বনাশ করা!"

চারি দিকেই তখন,—"থাম—থাম!—কর কি!"—বলিয়া রব উঠিল। চূড়ামণি মহাশয় গিয়া যুবকের হাত চাপিয়া ধরিলেন। যুবকও, ততক্ষণ মনের ক্ষোভ মিটাইয়া,—"বেটা কোট্না—বেটা মেয়ে পুষে লোকের সর্ব্বনাশ করিস!"—বলিয়া গালি দিতে দিতে, তাঁহাকে ছাড়িয়া, পার্শ্বেই বসিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয় একে মনের উদ্বেগে ছিলেন; তাহাতে আবার একি বিপদ!—লাঞ্ছনায় অবশেষে তিনি কাঁদিয়াই ফেলিলেন। ভাবিলেন, এ অপমান অপেক্ষা মরণই ভাল। যাইহোক, ক্রমে সব গোল থামিল; অনেক চেষ্টা করিয়া চূড়ামণি মহাশয় সকলকে নিবারণ করিলেন।

সকলে থামিলে, সকলের সম্মতিক্রমে, তখন চূড়ামণি মহাশয় সুর ধরিলেন,—"মুখুজ্যে মহাশয়, আপনার সহিত আমার অনেক দিনের সম্প্রীত। তাই কি আপনি বাদ সাধিলেন? হায়-হায়! গৌর আমার একমাত্র পুত্র। আপনার কুলটা কন্যাটাকে দিয়ে শেষে আমারই সর্ব্বনাশ করিলেন? জল-পিণ্ডের স্থল একমাত্র পুত্র; শেষে তাহাকে দিয়াই আমার ইহকাল পরকাল নষ্ট করিলেন? এ বৃদ্ধ বয়সে আমার অদৃষ্টে এই-ই ছিল!"—এই বলিয়া, চূড়ামণি মহাশয়ও যেন বিশেষ দুঃখ-প্রকাশ করিলেন।

"সে কি বলেন? আমি তো আপনাদের কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না! আপনার আবার আমি কি করিলাম?"—উত্তরে এই বলিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় আপনার দুঃখের কথা বলিতে যাইতেছেন, এমন সময় সেই পার্শ্বস্থ ষণ্ডাকৃতি যুবক বাধা দিয়া আবার বলিয়া উঠিল,—"বেটা ময়না—ন্যাকা আর কি? বেটা, মেয়ের কোটনা-গিরী ক'রে একটা স ছারে-খারে দিলি; আবারও কথা! আ ভিতরের কথা কিছুই জানি না, মনে করেছি এখন তোর মেয়ে যেখানে যায়, যাক; আমাদের গৌরকে আনিয়ে দে। জানিস, আমরা এখনই তোর মুণ্ডু নেব এই বলিয়া সে আবারও যেন মুখোপ মহাশয়কে আক্রমণ করিতে উঠিল। পাধ্যায় মহাশয় তাহাতে কাতর-কণ্ঠে করিলেন,—"মহাশয়েরা, আমায় কেন পীড়ন করেন? দোহাই ঈশ্বর, আমি এ য়ের কিছুই জানি না। আমি হঠাৎ প্রাতে উঠেই——" এই পর্য্যন্ত বলিয় এমন সময় হঠাৎ সে কথার বাধা প তিন-চারিটি লোক শশব্যস্তে ছুটিতে ছু আসিয়া, চূড়ামণি মহাশয়কে সংবাদ দি "হাঁ মহাশয়, যা' মনে ক'রেছিলাম, ঠিক তাই

সকলে।—(শশব্যস্তে)—"কি, কি! খুলে বল!"

আগন্তুকগণের মধ্যের একজন আরম্ভ করিলেন,—"আমরা পৌঁছিবা 'বিনী' হাসিয়া বলিল—'এইবার ঠিক হই গৌর বাবু আমার কাছে এক আধবার ইয়া আসিতেন বলিয়া, আপনাদের সইত না। আজ কি সব সইতে এতক্ষণ তাঁরা গাড়িতে চড়েছেন।' আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম,—'সে কি তাহাতে সে বলিল,—'এই তাই-ই।' কাল রাত্রে গৌর বাবু বিনীর হইতে বাড়ী আসিবার জন্য বাহির হই খানিক পরেই আবার চঞ্চলাকে জাপ ধরিয়া লইয়া, বিনীর বাড়িতে প্রব হয়। কারণ জিজ্ঞাসিলে জানা যায়, বাহির হইয়াছিল, শ্যামার সঙ্গে; রাজবাটীতে। কিন্তু হঠাৎ শ্যামার সর্পদ মৃত্যু ঘটায়, বাড়ী আর কোন মুখেই

ফেরে? কাজেই শ্যামার কথিত স্থানে পাল্কীর সন্ধানে চলিয়াছিল; আশা, 'যখন এতদূর অগ্রসর হইয়াছি, তখন রাজার ঘরণী হইবই হইব।' আর, সেই আশায় যাইতে যাইতেই, রাস্তায় গৌরের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়—গৌর তখন বিনীর বাড়ী হইতে ফিরিতেছিল। গৌর চঞ্চলাকে চিনিত; চঞ্চলাও চিনিত না, এমন নহে। বিশেষ আপনারাও জানেন, গৌর ও তাহার ঐ বন্ধুটি (সেই ষণ্ডাকৃতি যুবককে দেখাইয়া) চঞ্চলার জন্য একবার কি কেলেঙ্কারীই না করিয়াছিল!"

"তার পর—তার পর!"

"তার পর আর কি?—'যবে বাহিরায় নদী, কে পারে রোধিতে গতি!' দু'জনেই মিলিল। গৌর লোভে ভুলাইল; তাহাকে মজাইল। নিন্দার ভয়, গঞ্জনার ভয়, অধিকন্তু বলপ্রয়োগের ভয়! চঞ্চলার চঞ্চল মন তাহাতে আর কিরূপে স্থির থাকিতে পারিবে? বিশেষ, তখন সে অবলম্বন ছাড়িলে, তাহার তাঁতি-কুল বৈষ্ণব-কুল দু'কুলই যায়!—রাজা নাও মিলিতে পারে! কাজেই সে স্বীকৃত হইল। রাত্রিটি সেখানে ছিল। ভোরের ট্রেণেই কিন্তু—"

"তবে কি আমার গৌর এখানে নাই! তবে কি তাহাকে আর পাওয়া যাইবে না?"—এই বলিয়া, কপালে হাত দিয়া, চূড়ামণি মহাশয় বসিয়া পড়িলেন। কিন্তু অপরাপর সকলে আরও তন্ন তন্ন করিয়া জানিতে চাওয়ায়, আবারও সে লোকটি বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"তা'র পর, ভোর হইলেই চম্পট! অধিক কি, আমরা ষ্টেসন-পর্য্যন্তও ছুটিয়াছিলাম। কিন্তু বলিতে কি, আমরাও গিয়া পৌঁছিলাম, আর ট্রেণ ছাড়িয়া দিল—বাঁশী বাজিল। আর, সেখান হইতেই এই দৌড়াইয়া আসিতেছি। এখন যা' উপায় করিতে হয়, করুন।"—এই বলিয়াই, আগন্তুকগণ নীরব হইলেন।

নবম দৃশ্য।

সূত্র।

একটী কক্ষে। কক্ষটি বেশ সাজান। মেজেয় অল্পোচ্চ তক্তাপোসের উপর ঢালা বিছানা-পাতা। সুন্দর সতরঞ্চ ও মাদুর প্রভৃতির উপরও, গ্রীষ্মকাল বলিয়া, 'শীতল-পাটী' মোড়া। চতুর্দ্দিকে কএকটি বড় বড় তাকিয়া। কক্ষটি দক্ষিণ-দ্বারী। উহার পূর্ব্বের দিকে একখানি টেবিলের উপর সুন্দর একখানি বৃহৎ আয়না—বাড়ীর বাবু সময়-অসময়ে তাহাতেই আপনার কান্তি-পুষ্টির পরিচয় পাইয়া থাকেন। চারিদিকের দেওয়ালেও সুন্দর সুন্দর ছবি টাঙান—তাহার কতকগুলি অয়েল পেণ্টিং, কতকগুলি বা ক্রমোঃ লিথো। মধ্যে দুইখানি সুদৃশ্য টানা-পাখা—টানিবার স্থান, পশ্চিম দিকের জানালার ছিদ্র দিয়া। গৃহে প্রবেশ করিলে, প্রথমেই একটী সুদৃশ্য 'ঘড়ি' নয়নগোচর হয়। সেটী এমন ভাবে ঠিক দরজার সম্মুখেই, ঘরের উত্তর দিকের দেওয়ালে স্থাপিত যে, দেখিলেই বোধ হয়, যেন দেখাইবার জন্যই রক্ষিত। যাইহোক, টং টং করিয়া ঘড়িতে ক্রমে ১১টা বাজিল। জমীদার বাবু ও তাঁহার বয়স্য ভাবিলেন,—"আর তো থাকা যায় না; স্নান-আহার এখনও হইল না!" এইরূপ বলিয়াই তাঁহারা উঠিতেছেন; তখন তাঁহাদেরই আকাঙ্ক্ষিত একটী বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাজেই কথাটা না কহিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য নহে বুঝিয়া, বাবুর আর তখন আহারে যাওয়া হইল না। তিনি আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিহে হরিদাস, খবর কি?"

হরিদাস উত্তর করিল,—'খবর সবই ঠিক!' দারোগা ম'শায়কে আপনি ঘরে নিয়ে গিয়ে সেই বকসিস্ দিবার পরই, তিনি যেন আর সে দারোগাই নেই। আগে ডাকাতি হওয়ার

কথা তিনি তো আমলেই আনেন-নি। কিন্তু এখন, একেবারে বেটাদের সব্বাইকেই চালান দিয়েছেন।"

বাবু তখন আহ্লাদে যেন আটখানা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা, শ্রীনাথটাকে!"

হরিদাস।—"হাঁ, সেটাকেও বই কি! সেটাকে তো বটেই; তা ছাড়া, নবীনদাস, তাহার পুত্র ও কৃষাণ প্রভৃতি তা'দের সকলকেই থানায় চালান দেওয়া হইয়াছে। বাড়ীতে এখন কান্নাহাটী পড়িয়াছে।"

বাবু।—"আচ্ছা, বেশই হয়েছে। এখন সেটার কতদূর? বেটারা যেমন আমাদের সঙ্গে লেগেছিল, তেমনই বেটাদের সপুরী একেবারে যমালয়ে পাঠা'তে হবে। আচ্ছা, তুমি হীরেকে বলে ওটা স্থির করেছ কি?"

হরিদাস।—"কতক করেছি বই কি! আজ সন্ধ্যার সময়ই সে বেটা আগুন লাগাবে বলেছে। আপনার কাছ থেকে সেই টাকা ক'টা নিয়েই, সে বেটা বড় সন্তুষ্ট! ফলতঃ আজ রাত্রেই গাঁকে গাঁ ভস্মসাৎ করা হ'বে। তজ্জন্য কোন চিন্তা নাই। কিন্তু একটা কথা এই, আপনাকেও সে সময় খানিকটে হামরাও থাকতে হবে।"

বাবু।—"আমায় আর সে সময় কেন? বেটারা আজ সবাই হাজতে পচ্‌চে।" এখন, গ্রামের মাগীরা কি আর তা'য় বাদী হতে পারে? তা বল তোমরা, আমিও থাকতে পারি! কিন্তু অনর্থক। কোন ভয়ই নেই। যাহাহউক, আজ চাই-ই। আরও যদি কিছু লাগে, তবে আমি বলে দিচ্ছি, খাতাঞ্চির কাছ থেকে নেওগে।"—এই বলিয়াই, তিনি খাতাঞ্চি মহাশয়কে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন,—"হরি যা' কিছু চায়, দিও।"

ইহার পরই বাবু উঠিয়া স্নানাহার করিতে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তাহাতেও বাধা! দেখিলেন, তাঁহার গুরুপুত্র মহাশয় হাজির—কি যেন কি বলিতে উ... যাইহোক, তাঁহাকে আর আগাম কোন... কহিতে হইল না। জমীদার বাবু নি... যেন কিছু ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া, জিজ্ঞাসা... লেন,—"কিহে ভায়া, খবর কি?—কোন... পেলে কি?"

গুরুপুত্র।—(কিছু বিমর্ষ ভাবে)—... সন্ধান! পুলিশ লইয়া টানাটানি!"

বাবু।—"পুলিশ লইয়া কি রকম?... কি কিছু পেয়েছ!"

গুরুপুত্র।—"খবর বড় ভয়ানক!... নার চঞ্চলাদেরই বাড়ীর পেছনের বাঁশ... শ্যামার মৃতদেহ হঠাৎ পাওয়া গিয়াছে।... তাহার অপ-মৃত্যুতে সন্দেহ হওয়ায়, সে... পুলিশে চালান গিয়েছে। এখন ভা... কিসে কি বাহির হয়!"

বাবু।—"তবেই তো বড় গোল!... তবে মেরে ফেলেছে, দেখ্‌চি!"

গুরুপুত্র।—"প্রায় তাই-ই! বৃদ্ধ... মুখুয্যে দাদাই বাঁধা পড়্‌বে, দেখ্‌চি!... তিনি যে এর ভেতর আছেন, তা তো... হয় না! তিনি একজন সদাশিব লোক!"

বাবু।—"তাই তো; তবে একাজ... কে? তা' যাইহোক, আচ্ছা, আমার চঞ্চল...

গুরুপুত্র।—(সজোরে দীর্ঘনিশ্বাস ফে... "আর চঞ্চলা! বেটারা লুফে নিল—লুফে... ঐ দক্ষিণে-পাড়ার চূড়োমণি বেটার-ছে... শুন্‌চি নাকি, চঞ্চলাকে নিয়ে সেই রা... কল্‌কাতায় পালিয়েছে। বিনীর বাড়ী... আমি এই খবর পেলেম।"

শশব্যস্তে তখন জমীদার বাবু বলিলে... "বটে! আচ্ছা, আমি এর বিহিত ক... শ্যামা মরেছে, তুমি ঠিক জান তো?... বেটা ভট্‌চায্‌ আমার মুখের গ্রাস কেড়ে... বাঁচে কি করে? বেটা জানে না কি আ... কল্‌কাতায় পালালেই বুঝি নিস্তার হ...

আচ্ছা, তুমি চল তো ভাই আমার সঙ্গে! আমি একবার নেড়ে-চেড়ে দেখি, কিসে কি হয়!"—এই বলিয়াই, বাবু বহির্গত হইলেন। স্নানাহার তখন আর তাঁহার হইল না। গুরুপুত্র যদিও বলিলেন,—"আহার করিয়া চলুন, যাওয়া যাক্।" কিন্তু তিনি তাহা কিছুতেই শুনিলেন না। বলিলেন,—"পোষ্টমর্টম এক্‌জামিনের আগেই আমাকে যেতে হবে! তা' না হ'লে, শ্যামার মৃত্যুর কারণ যদি অন্য কিছু স্থির হয়, তবে কখনই গৌরে বেটাকে জব্দ করতে পারবো না। সুতরাং আগেই যাওয়া দরকার।"

এই বলিয়াই, তিনি আর দেরী করিতে পারিলেন না। বেহারাদের পাল্কী তৈয়ার করিতে বলিয়াই, তাড়াতাড়ি বৈঠকখানায় গিয়া কাপড় ছাড়িয়া বাহির হইলেন। বলা বাহুল্য, সঙ্গে টাকা-কড়িও কিছু লওয়ার ক্রুটী হইল না। বাড়ীর কেহ কেহ স্নানাহার জন্য অনুরোধ করিলেও, তাহা শুনিতে অবসর পাইলেন না। তাড়াতাড়ি পুলিসের দিকেই চলিলেন।

নাট্য-চিত্র।

(বিল্বমঙ্গল ঠাকুর, পূর্ণচন্দ্র ও বিষাদ *)

(১)

উপরিলিখিত নাটক-ত্রয় একজনেরই লেখনী-প্রসূত। লেখকও বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত। আজ আমরা এই তিনখানি নাট্য-চিত্র তুলনায় সমালোচনা করিয়া, নাট্যামোদী বঙ্গীয় পাঠকবর্গকে উপহার দিব।

প্রথমতঃ।—'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' নাটকের গল্প।—বিল্বমঙ্গল একজন ধনী ব্রাহ্মণের সন্তান। যৌবনসুলভ প্রখর মনোবৃত্তির তীব্র উত্তেজনায় তিনি চিন্তামণি নাম্নী জনৈক বারবিলাসিনীর মোহিনী রূপ-আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, তাহাকে আত্ম-জীবন বিক্রয় করেন। চিন্তামণি ধ্যান-জ্ঞান; চিন্তামণিই তাঁহার সংসার-সমুদ্রে যেন ধ্রুব-তারা। চিন্তামণি ব্যতীত অন্য কোন চিন্তা তাঁহার অন্তর স্পর্শ করিতে পারিত না। পিতৃ-শ্রাদ্ধের দিন-মাত্র, নিতান্ত দায়ে পড়িয়া কোন মতে, তিনি কিছুক্ষণের জন্য বাটীতে অবস্থান করিলেন। যেমন-তেমন একরকমে শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকিয়া গেলে, অমনি আবার চিন্তামণিকে দেখিবার জন্য তাঁহার মন আকুল হইল;—যেরূপে হোক, তখনই তাহাকে দেখিতেই হইবে! মধ্যে নদী ব্যবধান। হিন্দুমতে শ্রাদ্ধ-শান্তির দিনে নদী পার হওয়া নিষেধ—শাস্ত্রবিরুদ্ধ। কিন্তু চিন্তামণি তাঁ'র জীবন-সর্ব্বস্ব! সুতরাং তাহার জন্য তিনি সকলই করিতে পারেন,—ইহা আর বেশী কথা কি! যেমন চিন্তামণির কথা মনে উদয়, অমনি তখনি তিনি ঊর্দ্ধ-শ্বাসে নদীতীরে উপনীত হইলেন। পূর্ব্ব হইতেই ঝড়-বৃষ্টির সূত্রপাত হইতেছিল, এক্ষণে ক্রমে তাহা ভীষণাকার ধারণ করিল। ঘোর অন্ধকার; কোন বস্তুই দৃষ্টিগোচর হয় না। তদুপরি মেঘ, বৃষ্টি ও বজ্রাঘাতের গভীর গর্জ্জনে দিগন্ত কাঁপিয়া উঠিল; বেগবতী নদী আরও ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিল। উত্তাল তরঙ্গমালার বেগ পর্ব্বতাকার ধারণ করিয়া গম্ভীর জল-কল্লোলের ভীম নিনাদে জীবজন্তুগণের প্রাণে গভীর আতঙ্ক আনয়ন করিল। বিল্বমঙ্গল নদীতীরে উপনীত হইয়া কিছুই অবলোকন করিতে পারিলেন না।

নদীর এক পার্শ্বে শ্মশান। সেই বিভীষিকাময় ভয়ঙ্কর স্থানের এক পার্শ্বে চিতা-কুণ্ড জ্বালিয়া এক ঈশ-প্রেমোন্মাদিনী পাগলিনী একমনে ইষ্টদেবতার আরাধনা করিতেছেন। বিল্বমঙ্গল ভীতি-বিহ্বল-চিত্তে তাঁহার নিকট নদী-পার হইবার উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। অদ্ভুত পাগলিনী 'একে আর' উত্তর দিয়া

* শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

কেবলই তাঁ'র অমানুষী ভক্তি-প্রেমের পরিচয় দিতে লাগিলেন। কোন খেয়া-ঘাটেই পারের নৌকা মিলিল না। বিল্বমঙ্গল কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলেন। পরিশেষে আর কোন উপায় না দেখিয়া সেই গভীর দুর্য্যোগে—সেই সমস্যাপূর্ণ বিপদসঙ্কুল সময়ে, প্রাণের গভীর আবেগে, উচ্চৈঃস্বরে—"চিন্তামণি, চিন্তামণি!" বলিয়া সেই উত্তাল তরঙ্গমালা-পরিপূরিত বিশাল নদী-বক্ষে ঝম্প প্রদান করিলেন।

অকৃত্রিম প্রণয়ের গভীর উদাত্তভাবে বিভোর হইলে, মানুষ অসাধ্য সাধন করিতে পারে—অভূতপূর্ব্ব কার্য্য সাধনে সক্ষম হয়। নদী-পার হইয়াই ক্রমে তিনি গন্তব্য পথে উপনীত হইলেন।

কিন্তু হা কপাল!—চিন্তামণির বাটীর সম্মুখে আসিয়া দেখেন যে, ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ, উচ্চ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে মহা দায়! কিন্তু যথার্থ প্রাণের ইচ্ছা হইলে—হৃদয়ের টান পড়িলে, মানুষের কোন্ কার্য্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়? সর্ব্ব-ইচ্ছাময় ভক্তের ইচ্ছা আপনাতেই উপলব্ধি করেন; সুতরাং বিনা-যত্নে অকস্মাৎ তাহার মনোরথ সিদ্ধ হয়। বিল্বমঙ্গল কোন উপায়ে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিলেন। চিন্তামণির সহিত সাক্ষাৎ হইল। ঘৃণিত বেশ্যা-হৃদয় স্বভাবতঃ অবিশ্বাসী—চিন্তামণি বিল্বমঙ্গলের অসাধারণ সাহসের কথা বিশ্বাস করিল না। বেশীর ভাগ তাহাকে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিতে লাগিল। অবশেষে বিল্বমঙ্গলের কথ-মত কহিল,—"আচ্ছা চল্—দেখাবি চল্, তুই কিরূপে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিলি! সেখানে তোর জন্যে কোথায় দড়ি ঝুলিয়ে রেখেছিলাম,—দেখাবি চল্!" পরে প্রাচীর সম্মুখে আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে চিন্তামনি ভীত, স্তম্ভিত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইল। সে দেখিল, রজ্জুভ্রমে বিল্বমঙ্গল এক ভীষণ অজাগর সর্প অবলম্বন করিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়াছে; এবং সে দারুণ আকর্ষণে স... জীবন নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

বিল্বমঙ্গলেরও হৃদয় চমকিয়া উ... প্রাণের মধ্যে তাড়িত-প্রবাহ ছুটিতে লা... তিনি কেবলই অনিমেষ নয়নে চিন্তাম... দর্শন করিতে লাগিলেন। চিন্তামণির ... শ্বাস এখন অনেক পরিমাণে ঘুচিল। ... কৌতুহল-বৃত্তি আরো বাড়িল। সে ... মঙ্গলের নদী-পারের আমূল ঘটনা ... দেখিতে চাহিল। উন্মাদ বিল্বমঙ্গল চি... র্পিতের ন্যায় স্থিরব্যঞ্জক গম্ভীর মূর্ত্তিতে চি... মণি-সমভিব্যাহারে তখন নদীতীরে উপ... হইলেন। চিন্তামণি বিল্বমঙ্গলের কথ... 'কাঠের ভেলা' দেখিতে চাহিল। বিল্বম... যাহার সাহায্যে নদী পার হইয়াছিলেন, ... ইয়া দিলেন,। এবার চিন্তামণি পূর্ব্বা... আরও অধিকতর বিস্ময়াবিষ্ট হইল। বি... কারণ,—সে কাঠ নয়—একটা শব-দেহ! ... প্রমিক-হৃদয়! ধন্য তোমার প্রভাব! ... বেশ্যা-হৃদয়ে এইবার বিপর্য্যয় ঘটিল। তা... স্বার্থপর মনের সঙ্কীর্ণতা—অবিশ্বাস এই... টলিল। সত্যের মহিমা বড়ই সুন্দর; ... হৃদয়ের পবিত্রতা ও জ্বলন্ত প্রতিভার প্র... সকলই সম্ভবে; সে প্রজ্জলিত আগুনে ... পাপরাশি পুড়িয়া ভস্মীভূত হয়। তবে পা... চিন্তামণিরও যে মন টলিবে, তাহার অ... বিচিত্রতা কি! সে বিল্বমঙ্গলকে কহিল,—"... আর আমার অবিশ্বাস নাই। তুমি ... উন্মাদ! তোমার ঘৃণা নাই; লজ্জা ... ভয়ও নাই। তুমি দড়ি ব'লে সাপ ধর... ব'লে পচা মড়া ধর! দেখ, আমি এ... কথা শুন্‌তে গিয়েছিলেম, আমার আজ ... কথাটি মনে পড়িল। এই মন—আমি ... —যদি আমায় না দিয়ে, হরি-পাদপদ্মে ... তোমার কায হইত।"

শুভক্ষণে—শুভ মাহেন্দ্র যোগ-স...

এ উপদেশ বিল্বমঙ্গলের প্রাণ বিদ্ধ করিল। তিনি সন্ন্যাসী হইলেন। সর্ব্বত্যাগী হইয়া, কেবলই—"হা কৃষ্ণ—হা কৃষ্ণ" রব করিতে লাগিলেন। যথা-সময়ে গুরু মিলিল। কিন্তু সংস্কার বড় মহা রোগ; সংস্কার ও স্বভাবে বড় বেশী পার্থক্য নাই। একদিন এক বাপীতটে জনৈক বণিকের সুন্দরী যুবতী স্ত্রীর মোহিনী রূপ-দর্শনে তাঁহার পূর্ব্ব সংস্কার আবার জাগিয়া উঠিল; পাপ-চক্ষু আসক্তি আনয়ন করিল। কিন্তু ভগবান যাকে একবার কৃপার চক্ষে দেখেন, তা'র আর কিছুতেই 'মার' নাই। বিল্বমঙ্গলও এ ভীষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। চক্ষুই যত অনিষ্টের মূল—এই ভাবিয়া, তিনি সে অমূল্য চক্ষে তীক্ষ্ন শলাকা বিদ্ধ করিলেন; এবং সেই অবস্থায় অহর্নিশি কৃষ্ণ-ধ্যানে নিযুক্ত রহিলেন। এদিকে চিন্তামণিও ভোগ-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া বিল্বমঙ্গলের পথ অবলম্বন করিল—সেও সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিনী হইল। নিঃস্বার্থ প্রণয়ের কি এ ক্ষমতাও নাই যে, একের জন্য অন্যের মন উদাস করিয়া দেয়? চিন্তামণি বেশ্যা, কিন্তু তাহাতে আসে-যায় কি? বৈরাগ্যের নিকট পাত্রাপাত্র বিচার নাই; সত্যের নিকট নীচ-মহানের ভেদাভেদ সম্ভবে না। অনুতাপ ত এমন জিনিস নয়!—ইহা যথার্থই যদি মানুষের অন্তঃস্থল একবার স্পর্শ করে, তবে তাহাকে দেব স্থলাভিষিক্ত-সকলের পূজ্য করিয়াই থাকে। যে বেশী পাষণ্ড, ঈশ-প্রেমে তাহার মন একবার মজিলে—তাহার পাপের যথার্থ কারণ কোন মর্ম্মস্পর্শী ঘটনায় সে একবার উপলব্ধি করিতে পারিলে, ধর্ম্ম-জগতের যত উপকার হয়, সাধারণ মধ্যবিৎ শ্রেণীর পাপীর মন হইত পাপভাব দূরীভূত হইলে সে পরিমাণে অধিক কার্য্যকারী হইতে পারে না। অনুতাপ—অনুশোচনায় বিদগ্ধ মন অগ্নি-পরীক্ষিত সুবর্ণের ন্যায় বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল হয়। অতএব ঘৃণার কার্য্যকে ঘৃণার চক্ষে দেখিও; পাপীকে সে চক্ষে দেখিও না।

অনেক বিঘ্ন, বিপত্তি ও সাধনার পর উভয়েরই আশা ফলবতী হয়। ভক্তবৎসল ভগবান্, ভক্ত বিল্বমঙ্গল ও চিন্তামণির সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া, তাঁহাদের অভীপ্সিত গন্তব্য-পথে আনয়ন করেন। যথা-সময়ে তাঁহারা গুরুর কৃপায় শান্তিময় বৃন্দাবনে প্রত্যক্ষ ভগবানকে দর্শন করেন। বহুদিন পরে আবার উভয়ের পরস্পরের সন্দর্শন ও প্রীতি-সম্ভাষণ হয়। বলা বাহুল্য, ভক্তের আদর্শ বিল্বমঙ্গল ও চিন্তামণি এখন আর ঘৃণিত লম্পট ও অস্পর্শীয়া বারবিলাসিনী নহেন—তাঁহারা এক্ষণে ভক্তবৃন্দের নমস্য ও অসৎপথাবলম্বী স্ত্রী-পুরুষদিগের আদর্শ। 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' নাটকের মূল ভিত্তি এইটুকু। তবে গ্রন্থকার আরও কয়েকটি চরিত্রের পরিস্ফুটন করিয়া ঘটনা-বৈচিত্র্য দেখাইয়াছেন। যথা-স্থানে আমরা সে চিত্র আঁকিতে চেষ্টা করিব। "ভক্তমাল" নামক বৈষ্ণব গ্রন্থ হইতে গ্রন্থকার এ গল্পটি নাটকাকারে আনিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

অপরূপ।

অপরূপ মহিমা তোমার,
অপরূপ কৌশল-চাতুরী!
বিশ্বের রহস্য অপরূপ,
কিছুই বুঝিতে নাহি পারি!
অপরূপ নিশানাথ ওই,
অপরূপ দেব দিবাকর;
দীপ্ত তেজ, সৌম্য মূর্ত্তি তব,
অনিবার করিছে প্রচার।
বিশাল ও নীল নভোস্তলে
অগণ্য তারকা-মালা রাজে।
অপরূপ গভীর সাগরে,
অপরূপ মণি-রত্ন সাজে।

অপরূপ হরিত প্রান্তরে
প্রকৃতি পাতিয়া খেলা-ঘর।
কেমন খেলিছে নানা রঙ্গে,
পাখীগণে করি সহচর।
তটিনীর কোলে অপরূপ,
উচ্ছ্বাসের উপর উচ্ছ্বাস;
তা'র মাঝে ফুটিছে কেমন,
চন্দ্রিকার বিমল সুহাস।
অপরূপ নীল সরোবরে,
শোভিছে বিকচ কমল;
অপরূপ প্রেমের আলোক,
চারিপাশে করে ঝলমল।
অপরূপ কাননের মাঝে,
তরু-শিরে শোভে ফুলচয়।
অপরূপ তোমার আদেশে,
সমীরণ ধীরে ধীরে বয়।
অপরূপ লইয়া বাহার,
হইতেছে বসন্ত-বিকাশ।
সুনিয়মে ঋতু যায়-আসে,
অপরূপ চলে বার মাস।
অপরূপ প্রকৃতির পানে,
যখনি—যখনি ফিরে দেখি;
ভুলে যাই সকলি তখন—
পুলকে পূরিত দুটী আঁখি।
সকলি তো দেখি অপরূপ,
নামটীও অপরূপ 'হরি'।
কত না মধুই আছে ওতে
দু'টী কথা সুধাময় বুলী।
পাপের এ সংসার ভুলিয়া
অপরূপ তোমার ও নামে;
মতি যেন এই ভিক্ষা চাই,
তোমার মধুর গুণ-গানে।

এস না!

হেথা এস না!
আসিলে পাইবে কত যাতনা।
দুঃখের তুফান কত,
উঠিতেছে অবিরত,
ঘুরে ঘুরে এসে জালে পড়'না।
হেথা এস না!
হেথা এস না!
পথে ওই তীক্ষ্ণ ধার কাঁটা কত দেখ না!
ফুটিলে কোমল পায়,
করিবে হু হায় হায়,
কতই পাইবে মনে বেদনা।
হেথা এস না!
হেথা এস না!
আমি ভাসি অশ্রু-নীরে তাহা তুমি দেখো না
আমি জ্বলি তাও ভালো;
সুখের প্রদীপ্ত আলো
তোমার হৃদয়ে ভাসে, যেন তাহা নিভে না
শুধুই দুঃখের ভার,
হাহাকার, অন্ধকার,
হেথা আছে শুধু নিরাশার কালিমা!
তুমি এস না।
হেথা এস না।
যথা আছ, তথা থাক; আর যেন স'রো না
অভাগা আমার কাছে,
পিশাচী-প্রেতিনী নাচে,
দেখিলে তা'দের, প্রাণ দেহে আর রবে না
হেথা এস না।

সে।

কাদম্বিনী-কোলে বিজলী যেমন,
ছুটা-ছুটী ক'রে, চঞ্চল তেমন!
ধরিতে না পারি; ধরা নাহি যায়,
হাত-বাঁধ ভাঙ্গি কোন্ দিকে ধায়!
হাসি টুক্‌টুকে মুখানি সুন্দর;
সরোবরে যেন, প্রফুল্ল কমল।
নেচে নেচে যায়, ফিরে ফিরে চায়;
চাহিলে, তখনি লুকায় কোথায়!
আঁচলেতে ঢাকা মুখানি তাহার;
দেখা যায় শুধু লাল ওষ্ঠাধর।
ছানিয়া গাছের যেন বিম্বফল,
বসায়ে দিয়াছে মুখের উপর।
দেখিতে দেখিতে, দেখিতে না পাই।
এই ধরি ধরি, আর কাছে নাই।
কেন এত লাজ, সরলা বালিকা!
জন্ম তরু-শিরে কুসুম-কলিকা।
দেখিতে না পাই, কভু আঁখি ভ'রে;
দেখিলে আমায়, লাজে যায় দূরে।
সে যে মোর সব—আমি যে তাহার।
বুঝে না এখনো, কেমন ব্যাভার!!

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

ডিঃ গুপ্ত এণ্ড কোম্পানীর আরও নকল!

গতবারে আমরা ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আবিষ্কৃত 'সুধাসিন্ধু' ঔষধের ভয়ানক নকলের বিষয় লিখিয়াছিলাম; কিন্তু এবার আবার 'ডিঃ গুপ্ত এণ্ড কোম্পানীর' ঔষধের নানা নকলের সন্ধান পাইয়া আরও স্তম্ভিত হইতে হইল। রাতকে দিন ও দিনকে রাত করা-ব্যবসায় কলিকাতায় যত মনে করিয়াছিলাম; এবার দেখিতেছি, যেন তদপেক্ষাও ঢের বেশী। লোকে জানে, প্রিয়নাথ বাবুর ম্যালেরিয়া-নাশক 'সুধাসিন্ধু', আর ম্যালেরিয়ার ঔষধ 'ডিঃ গুপ্ত'; অর্থাৎ 'সুধাসিন্ধু' এবং 'ডিঃ গুপ্ত' এই দুইটি কথাই লোকের নিকট পরিচিত। আর, তাই নকলকারগণ এই কথা দুইটিরই প্রথমতঃ যতদূর পারে, নকল আরম্ভ করিয়াছে—ট্রেডমার্ক প্রভৃতি তো পরের কথা! 'সুধাসিন্ধুর' যেমন 'সুধাসিন্ধু' কথাটি ধরিয়া, 'ডিঃ গুপ্তের' তেমনই 'ডিঃ গুপ্তটি' ধরিয়া নকলের একশেষ হইতেছে। বিঃ গুপ্ত; সিঃ গুপ্ত; জিঃ গুপ্ত; জে, গুপ্ত; কে, গুপ্ত; পিঃ গুপ্ত;—ডিঃ গুপ্তের অনুকরণের এইরূপ নানা গুপ্তে ছাইয়া ফেলিয়াছে। প্রিয়নাথ বাবুর ন্যায় তাঁহাদের দোকানেরও আসে-পাশে চারিদিকেই গুপ্তের ঢেউ। কাজেই লোকে ঔষধ কিনিতে গিয়া দিশে-হারা—আসল বলিয়া নকলে মজে। তবে প্রিয় বাবুর অপেক্ষা ডিঃ গুপ্ত কোম্পানী কিছু বাহাদুর—প্রিয় বাবু কিছু নীরিহ-প্রকৃতির লোক বলিয়া দুষ্টদের সহিত লড়িতে না পারিলেও, ডিঃ গুপ্ত কোম্পানী কিন্তু মধ্যে-মধ্যে দু'দশ জন প্রতারককে জেলেও পুরিতেছেন। কিন্তু তাহা হইলেও, 'ডিঃ গুপ্তের' বড় সুবিধা দেখিতেছে না। নকল বেশী হইবে এই আশঙ্কায় তাঁহারা এবার বিলাত হইতে একরূপ নূতন বোতল প্যাটেণ্ট করিয়া আনাইয়া সেই বোতলে ঔষধ বেচিতেছেন—সে বোতল এদেশে আর মিলে না। আরও, সে বোতল সহসা খুলিতে যাইলে, তাহার মুখ না ভাঙ্গিলে খোলা যায় না। কাজেই 'ডি গুপ্ত কোম্পানী' ভাবিয়াছেন যে, তাঁহারা এবার একটু সুস্থ হইলেন। কিন্তু সে সুবিধা তাঁহাদের কোথায়? প্রতারকগণের যে কিছুতেই পেছপাও নাই? এবার তাহারা সেই বোতল না ভাঙ্গিয়া খুলিবার এক মতলবও বাহির করিয়াছে। আমরা সংবাদ পাইতেছি, গরম জলে বোতল তাতাইয়া লইয়া ক্রেতাদিগকে তলে তলে তাহারা বোতল খুলিবার পরামর্শ দিতেছে; এবং এইরূপে বোতলটি অভগ্নাবস্থায় পাইলে, সেই বোতল আবার 'দামে' ক্রয় করিতেছে। অর্থাৎ এক-একটা বোতল চারি আনা—পাঁচ আনা দিয়াও, লইতে কুণ্ঠিত হইতেছে না। সুতরাং বুঝুন সকলে, কি ভয়ানক ব্যাপার! এক কথায় বোতল জাল—ঔষধ জাল—সবই জাল! এ জাল-জুয়াচুরী বুঝিবে কে? প্রিয় বাবুর ঔষধের

জাল তো হইতেই পারে; কারণ, তাঁহার শিশি-লেবেল সব এখান হইতেই তৈয়ারী হইতে পারে! কিন্তু ভাবুন দেখি পাঠক, এ জাল-জুয়াচুরী আরও কত ভয়ানক! আরও, আমরা সংবাদ পাই, 'সুধাসিন্ধুর' ও 'ডিঃ গুপ্তের' অনুরূপ লেবেল প্রভৃতি এখান হইতে ছাপাইয়া লইয়া গিয়া, পল্লীগ্রামে বসিয়া, অনেক প্রতারকও আপনাপন ঔষধকে 'সুধাসিন্ধু' বা 'ডিঃ গুপ্ত' বলিয়া কম দরে বেচে; এসব জুয়াচোরদিগকে ধরা আরও দায়! যাইহোক, আমরা অনুসন্ধান করিয়া শীঘ্রই তাহাদেরও নাম-ধাম-আদি প্রকাশ করিতে যত্ন লইব। সুতরাং সকলে এখনও সাবধান হউন—দেখিয়া শুনিয়া ঔষধ কিনুন, এই বাসনা। আরও, গভর্ণমেণ্ট হইতেও এসকল জুয়াচুরী-নিবারণের চেষ্টা হয়, আবারও আমাদের এই অনুরোধ।

২৫ নং ময়রাপটী ষ্ট্রীট,
বড়বাজারের এস, পি, চট্টোপাধ্যায় ওরফে সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—ইনি আবার সকলের উপর যান দেখ্‌চি! পথে —, ইহাঁর আবার চোখ্-রাঙান টুকু আছে, দেখিতেছি। গত বারে অনেকগুলি প্রতারকের কার্য্য-কাহিনীর বিষয় লিখিয়াছিলাম; আশা ছিল, তাহারা দু'-দশ জনও অন্ততঃ আমাদের নামে নালিশ করিবে। আর, তাহা হইলে মনে করিয়াছিলাম, পুলিসের সামনেও আমরা একবার দেখাইব, তাহাদের জুয়াচুরী কত ভয়ানক! কিন্তু যাহাদের সবই গলদ, তাহারা কি আর মাথা-নাড়া দিতে পারে? তাই দেখিতেছি, সকলেই চুপ-চাপ! কিন্তু ঐ এস, পি, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ই এক খেল খেলিয়াছেন! তিনি আবার আমাদিগকে শাসাইয়া এক পত্র লিখিয়াছেন,—'মানহানির নালিশ করিবেন।' কিন্তু আমরা বলি, তথাস্তু; আপনার মানের দৌড়টা এক বার দেখানই না! জাল পাতিয়া লোকের সর্ব্বনাশ করিবেন; আর, তাহা প্রকাশ করিলে এত গায়ের জ্বালা কেন? নালিশ ক না একবার দেখি! আমরা কি ডরাই তেছেন! শুভস্য শীঘ্রং।

গাত্রদাহে প্রলাপ।

'শান্তির' নামে আমরা একটু লিখিয়াছি বলিয়া, 'শান্তি'-সম্পাদক বেচারীর বড়ই দাহ ধরিয়াছে। তা বাপু, যদি কথা সহিতে পারিবে, তবে আর ভদ্রলোকের ধরিয়া, মিথ্যা কহিয়া, জুয়াচুরী করিতে নামিয়াছ কেন? 'শান্তি' তো তোমার নূতন লীলা নয়? তোমার বোম্বাইয়ের চুরীর কথা লিখিয়াছিলেন বলিয়া তু 'সঞ্জীবনীর' নামে পুলিসে নালিশ করিয়াছি শেষে আপনার ঘোঁটা কালি, আপনি হাতে মুখে মাখিয়া হোঁতা মুখ করিয়া আদালত হইয়া ফিরিয়া বাপু; আজ যেন আপনাকে ভদ্র-দিয়া উন্মাদের মত যাচ্ছে-তাই প্রলাপ তেছ; কিন্তু সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া দেও নাই বলিয়া তোমার নামে নালিস ছিল, সে কথা স্মরণ আছে কি? না, উপহার দিব বলিয়া গ্রাহকদিগের নিকট টাকা লইয়া, আজ উপহার ফাঁকি বসিয়া সে অভদ্রোচিত ব্যবহার তোমার সৎ বলিয়া বোধ হইতেছে? তা' এ ফাঁকি দেওয়াও তো তোমার নূতন লীলা তুমি যে তোমার "স্ত্রীর সহিত কথোপ পুস্তকের দাম লইয়া কত লোককে এ ফাকি দিয়াছ, তাহাও কি ভুলিয়াছ? সে কেবল আপনার মনকে প্রবোধ দিবার নতুবা তুমি যে অর্থ-লোভে 'সমালোচন লাইয়া আপনাকে অতি নীচ, অর্থের দাস পরিচয় দিয়াছ, তাহা লোকে এত ভুলিবে কেন? এখন গ্রাহকের টাকা

লিতেছ, যে উপহার চাহিবে, সে নীচ, র্থ, মনুষ্যত্ববিহীন। ধন্য বেহায়া কিন্তু মি! তা' এও তো তোমার নূতন নয়! তুমি ষ নাক-কাণ-কাটা বেহায়া! যখন প্রথমে দশের লোককে যাচ্ছে-তাই গালাগালি দিয়া মি কংগ্রেশের বিপক্ষে ইংলিশম্যানের পক্ষে াগ দেও, তখনই তো দেশের লোকে তোমার াক-কাণ কাটিয়া দিয়াছে! এখন দেখিতেছি, খন তোমার দুই নাক, দুই কাণ কাটিয়া য়া ভাল হয় নাই—তুমি বেহায়ার হদ্দ হইয়াছ। থাতেই আছে,—'যাহার এক কাণ কাটা স যায় গ্রামের বাহির দিয়া, আর যাহার কাণ কাটা সে যায় গ্রামের ভিতর দিয়া।' া' তুমি যে দু'কাণ কাটা বেহায়া! নতুবা মন আহাম্মুখ কে আছে যে, সংবাদপত্রে াপনার 'স্ত্রী পয়োধর-ভারে প্রপীড়িতা' একথা লিখিতে যায়!—শুধু আবার পয়োধর-ভারে পীড়িতা নয়, অপরে তাহাদিগকে জগত-মুখে উলঙ্গিনী করিয়াছে, তাহা প্রকাশ রিতে চায়! বাবু মনে করেন কি এরূপ রিলে পসার বাড়িবে? আমরা বলি, খুব াসার হইয়াছে; আর পসার বাড়াইতে ইবে না। তোমার স্ত্রী দুইবার তারকেশ্বরে য়াছেন, তাহার যথেষ্ট পরিচয় হই-াছে। দুইবার কেন, শতবার বলিলেও, ামাদের আর অবিশ্বাস হইবে না। আর, মি তোমার কাগজে এমন ডাঁহা ডাঁহা মিথ্যা ক করিয়া বলিতেছ? তোমার মিথ্যা কথা সংখ্য; লোকে তোমাকে বেশ জানে। তবুও তামার মিথ্যাবাদীত্বের একটা দৃষ্টান্ত দিই। মি তোমার কল্পনা-বলে 'বঙ্গবাসীর' লেখার দর্থ করিয়া, তোমাদের 'মাতা, ভগিনী ও ন্যাকে কুলটা-পদে প্রতিষ্ঠিত' কর,—সে তামারি প্রতিষ্ঠার কাজ। 'বঙ্গবাসী', কিন্তু মন কথা বলেন নাই; আমরাও, বলিতেছি কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, 'বঙ্গবাসী' কবে 'রিস ও বায়ত' সংবাদপত্রের সম্পাদক বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে গালি দিয়াছেন; তাহা বলিয়া দিতে পার কি? না এটাও তোমার কুলটা-করার কল্পনার মত? 'বঙ্গবাসী' মহান্ত মাধবগিরিকে গালি দিয়া তোমাদের মাথা হেঁট করিয়াছে, বলিয়াছ। তা, তোমাদের মাথা কি আছে যে, হেঁট হইবে! সে মাথা তো বারাশতে অনেক পূর্ব্বে হেঁট হইয়াই আছে! এক ছিল নাক-কাণ, তাহাও তো কাটা পড়িয়াছে। তবে যাহার মাথা-মুণ্ড—নাক-কাণ কিছুই নাই, তাহার আবার মাথা হেঁট কিসের? আর, মাথা থাকিলে তুমি কি এমন মাতলামি করিতে পারিতে? মাধবগিরিকে লম্পট বলায়, তোমার প্রাণে বড় বাজিয়াছে; তোমার 'হিন্দু তীর্থের মুখে কালি পড়িয়াছে।' তা' এত দুঃখ কেন? মাধবগিরিকে লম্পট বলিলে যদি কষ্ট হয়, তবে তাঁহাকে সাধারণ হিন্দুর তীর্থ-স্থান তারকেশ্বর হইতে লইয়া যাইয়া আপন ঘরে গিয়া রাখ; আর, আপনার গৃহ-তীর্থের মুখ উজ্জ্বল কর। তাহাতে হিন্দু-সাধারণের ক্লেশ যাইবে, তুমিও শান্তি পাইবে; আর তোমার 'শান্তি'ও বেশ চলিবে।

সংবাদ।

—সেদিন একটী স্ত্রীলোক ষ্টীমার-ঘাটে গিয়া, বড় ভিড়ে টিকিট কিনিতে পারেনই না। আর, তাঁহাকে তজ্জন্য উদ্বিগ্ন দেখিয়া, একটী ভদ্রবেশ বাবু অমনই জুটিয়া যান; বাবুও যেন টিকিট কিনিবেন, এই ভান করিয়া, স্ত্রীলোকটির নিকট নিজ-হস্তস্থিত একটী মুখঢাকা হাঁড়ি রাখিয়া বলেন,—"আমার এই সন্দেশের হাঁড়িটি রহিল, দেখিবেন; আমি আমার টিকিটখানি কিনিয়া আনি।" স্ত্রীলোকটীও তখন ভাবিলেন, এইবার সুবিধা হইল; তিনিও তাঁহাকে, তাঁহার টিকিটখানি কিনিবার জন্যও, পয়সা দিলেন। বাবু যেন অগত্যাই, দুইখানি টিকিটই কিনিতে গেলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, সে সেই যাওয়া পর্য্যন্তই—যেন এক হাঁড়ি সন্দেশ ফেলিয়া

সামান্য কিঞ্চিৎ পয়সা লইয়াই চম্পট! ষ্টীমার ক্রমে ছাড়িয়া দিল। কাতরা স্ত্রীলোক তখনও কিন্তু ভাবিলেন,—'যাক, বেটা বড় ঠকাতে পারে-নি!' কিন্তু পরক্ষণই চক্ষুস্থির!—হাঁড়িতে মাটির সন্দেশ!

—হাইকোর্টের সেসনে এবার তিন জন জুরী উপস্থিত হইতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহাদের ২০, টাকা করিয়া জরিমানা হইয়াছে। এক রকম লাভ বটে!

—জলের সহিত বা দুধের সহিত ধুতুরা খাওয়াইয়া অজ্ঞান করিয়া, আজকাল কলিকাতার একদল বদমাইস, লোকের নিকট হইতে টাকা-কড়ি কাড়িয়া লইতেছে। কোন খাবারের দোকান হইতে জল খাইয়া বা গোয়ালার নিকট হইতে ক্ষীর বা দুধ খাইয়া, শেষে রাস্তায় চলিতে চলিতে অজ্ঞানাবস্থায় সঙ্গের সর্ব্বস্ব হারাইয়া, অনেকেই ঠকিতেছেন! সম্প্রতি এই শ্রেণীর একজন চোর ধৃত হওয়ায়, ১০ বৎসর জেলে গিয়াছে। কলিকাতায় দেখিতেছি, পথ-চলাও তবে দায়!

—বন্দোবস্ত-মত বরের গ্রামে কন্যা লইয়া গিয়া বিবাহ দিবেন বলিয়া, চট্টগ্রামের জানাইয়া-গ্রামের এক-জন লোক সোনাপুর যাইতেছিলেন। কিন্তু কন্যার রূপে মোহিত হইয়া, পথিমধ্যে অপর একজন লোক জোর করিয়া তাঁহাদের আটকাইয়া, তাহাকে বিবাহ করিয়াছে। এখন তাই লইয়া পুলিশে ঘোঁট!

—জাল টাকা তৈয়ার করা অপরাধে ইন্দোরে এক ব্যক্তির ১৪ বৎসর মেয়াদ হইয়াছে।

—তামাক খাইলে স্ত্রীলোকেরও গোঁপ উঠে—কোন বৈজ্ঞানিক কাগজে ভায়ারা এই কথা লেখেন। সোমপ্রকাশ তাহার প্রত্যুত্তরে বলেন,—বেশ্যাদের তো তাহা হইলে গোঁপ উঠিত!

—বিলাতী মেয়েগুলো, সকল কাজেই যেন পুরুষের বাবা! জাল-জুয়াচুরী-খুনেও তাহাদের দোসর মেলা ভার! সম্প্রতি এইরূপ এক ভয়ানক রাক্ষসী বিবি ধরা পড়িয়াছে, যে, তাহার কার্য্যকাহিনী শুনিলেও চমকিত হইতে হয়। সে করিত কি, তাহার রূপে ভুলাইয়া মধ্যে-মাঝে দু'দশ জনের মন মজাইত; এবং যখন যাহার তখন তাহাকে বই যেন জানে না এই ভাব দেখাইয়া, শেষে তাহারই সর্ব্বনাশ করিয়া, আবার অন্যের ক্রোড়ে স্থান লইত। অথচ রাক্ষসীকে দোষী বলিয়া এপর্য্যন্ত কেহই সন্দেহ করিতে পারে নাই। সে এমনই কৌশলে নিজের প্রণয়ী-দিগকে সেঁকো বিষ খাওয়াইত ও সেই বিষে ক্রমে জর্জ্জরিত হইয়া তাহাদের মানবলীলা ফুরাইত যে, তাহা বড়ই অ... খাবারের সহিত বা যে কোনরূপে হউক, একবার ... বিষ প্রবেশিত করাইয়া সে নিশ্চিন্ত হইত; এবং ... পর ক্রমে তাহার ফল ফলিত; যাইহোক, ... দফার পর অভাগী এখন ধরা পড়িয়াছে। কি... কি ভাবিয়া, সে এখন আপন আত্ম-কাহিনী ... বলিতেছে। কি ভয়ানক মেয়ে বাবা!

—সিবপুরে 'ফ্রেণ্ডস্ লাইব্রেরী' নামক একটী ... লয় স্থাপিত হইয়াছে। তাহার উন্নতিকল্পে উ... গণের বেশ যত্নের সংবাদ পাওয়া যায়।

—ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতেই অন্নকষ্ট ও ... সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

—বিলাতে আজকাল আবার সংবাদ পাও... বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন উঠিয়াছে ... অনর্থ—কদাচার বিবাহের দোষেই হয় বলিয়া ... কার অনেকেও আজকাল এ প্রথা উঠাইবার জন্য ... হইয়াছেন। আমাদের দেশের ধর্ম্মধ্বজীগণ ... দেখুন একবার!

—বৎসরান্তে একবার পূজার ছুটি!—কিন্তু ... লইয়াই যত গোল! এবার আবার পেপার-কা... ট্রেজারী, ডেট আফিস প্রভৃতি গবর্ণমেণ্ট ... নাকি পূজায় আদৌ ছুটি হইবে না, এই ম... স্যারকুলার বাহির হইয়াছে। পিতৃ-মাতৃ-স্বজন... গরিবদের প্রতিই গবর্ণমেণ্টের এত বাঁধাবাঁধি ... আমরা আশা করি, গভর্ণমেণ্ট এ স্যারকুলার রদ করি...

—জে, গোল্ড্ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ... তাঁহার মুদ্রাগুলি একাদিক্রমে স্থাপন করিলে ৭... অর্থাৎ হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ হইতেও ২০... হইবে; পাঁচ পৌণ্ড নোটগুলি একাদিক্রমে ... করিলে লণ্ডন হইতে মাস্কোনগর পর্য্যন্ত পৌঁছ... তিনি পৃথিবীর প্রত্যেক লোককে এক এক শিলিং দান করিতে পারেন।

—কাবুলের আমীর নাকি সংবাদ-পত্রের বিষম ... কাবুলে একখানা সংবাদ-পত্র লইতে হইলে পাঁচ ... ট্যাক্স দিতে হয়। সাহেবদের জন্য ইংরাজী ... পত্র পাঠান হয়, অনেক ফিকির করিয়া। খবরের ... জিনিস-পত্র মুড়িয়া পাঠান হয়; সেখানকার সা... সেই কাগজ পড়েন।

অনুসন্ধান।

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

৩য় খণ্ড] ৩১এ ভাদ্র, ১২৯৬ সাল। [৪র্থ সংখ্যা।

প্রকৃতির পূজা।

(সিন্ধু ভৈরবী—যৎ)

"বিজন বনে প্রকৃতি সুন্দরী,
পূজে তোমারে আদরে শ্রীহরি।
হাস্যমুখী বনলতা সখী যত আছে ফুলমালা ধরি;
গন্ধবহ তার, বহে সুধাভার, গন্ধে আমোদিত করি।
সুদূরবাহিনী, সুরতরঙ্গিণী, তুলি আনন্দ-লহরী;
ভক্তিরসে গলি, ধায় বেগে চলি, তব পদ ধৌত করি।
তরুশাখী দেয় ফুল-উপহার, অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি;
বনদেবী-সনে, দিক্‌পালগণে, বাজায় মঙ্গল-ভেরী।
গায় সুধা-রবে পিক-বধূ সবে, নাচে ভ্রমর-ভ্রমরী,
জ্বলে দিবারাতি, চন্দ্র-সূর্য্য-ভাতি,
কিবা শোভা আহা মরি॥"

সর্ব্বমাঙ্গল্যে বিশ্বাস।

ইহলৌকিক পারলৌকিক, নৈতিক আধ্যাত্মিক, বৈষয়িক পরমাত্মিক—সকল কার্য্যেই বিশ্বাসবান্ হও। সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, হর্ষে বিষাদে—সকল অবস্থাতেই 'সর্ব্বমাঙ্গল্যে' বিশ্বাস কর; প্রত্যক্ষ ফল পাইবে। জীবনে মরণে, ভোগে রোগে, লাভে অপচয়ে—মনক্ষুণ্ণ হইও না। চিত্ত-মালিন্য ও মনোবিকার দূর করিতে পারিলে, মানুষের দেবত্ব-লাভ হয়; ইহসংসারে তাহার আর কিছুরই অভাব থাকে না। "ঈশ্বর যা করেন, সব মঙ্গলের জন্য"—এ বিশ্বাস যিনি হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, এ গভীর উদাত্ত-প্রেমে যিনি ভগবানের প্রতি আত্ম-সমর্পণ করিতে পারিয়াছেন; সত্যই তিনি সংসারে দেবতা। আজ 'অনুসন্ধানের' পাঠক-পাঠিকাদিগকে আমরা ঈদৃশ একটি দেব-চরিত্র উপহার দিব। গল্পটি আমাদের জনৈক বন্ধু-প্রমুখাৎ শ্রুত।

জনৈক নৃপতি ও তাঁহার মন্ত্রী আমাদের আলোচ্য বিষয়। বৃদ্ধ মন্ত্রী বড়ই নিষ্ঠাবান ও ঈশ্বরপরায়ণ। 'সর্ব্বমাঙ্গল্যে বিশ্বাস' তাঁহার জীবনের সাধনা ও যোগ। কুটীলগতি সংসারে থাকিয়াও তিনি এ মহাপথের পথিক; অতুল ধনৈশ্বর্য্যের মধ্যে লিপ্ত থাকিয়াও তিনি নির্লিপ্ত; বিষয়ীর সহবাসে থাকিয়াও তিনি ভোগলিপ্সারহিত। চক্ষের উপরে

দুই-তিনটি গুণধর পুত্র কালগ্রাসে পতিত হইল, গৃহীর প্রধান অবলম্বন অর্দ্ধাঙ্গিনী স্ত্রী ইহসংসার হইতে প্রস্থান করিল, পরস্বাপহারী খল ও দুর্ব্বৃত্ত প্রতিবাসীগণ সমগ্র রত্নভাণ্ডার লুটিয়া লইল,—এ সমস্ত চক্ষে দেখিয়া-শুনিয়াও, বৃদ্ধের সদা-প্রফুল্ল চিত্ত ক্ষণকালের জন্যও অপ্রসন্ন হইল না। নিদারুণ যম-যন্ত্রণায় এক মুহূর্ত্তের জন্যও শরীর কণ্টকিত—মস্তকের একগাছি কেশও কম্পিত হইল না। অচল, অটল, স্থির, প্রশান্ত ভাবে ধর্ম্ম-প্রাণ বৃদ্ধ কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। অসম্পূর্ণ বস্তুই সংসারে আপন অভাব উপলব্ধি করিয়া থাকে। সম্পূর্ণত্ব যাহাতে বিদ্যমান, সে পৃথিবীতে দান-প্রতিদানের আশা করিবে কেন? বৃদ্ধের জীবন সদা-আনন্দময়; তাঁহার পূর্ণানন্দ প্রাণ সদাই ভগবানের প্রেম-সুধাপানে বিভোর; 'সর্ব্বমাঙ্গল্যে বিশ্বাস' হৃদয়ের স্তরে স্তরে সংমিশ্রিত। মাতৃদুগ্ধের সহিত 'ঈশ্বর মঙ্গলময়' এই মহাবাক্য বৃদ্ধের হাড়ে-হাড়ে মজ্জায়-মজ্জায় গ্রথিত। ঈদৃশ অসামান্য মহান্ চরিত্র পাপ-স্পর্শে কলঙ্কিত হইবে কেন? 'ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য'—এ বিশ্বাস বৃদ্ধের অন্তরে-বাহিরে অবিরাম বিদ্যমান। কথায় কার্য্যে, আচারে ব্যবহারে, স্বভাবে লৌকিকতায়—সকল বিষয়েই বৃদ্ধ 'সর্ব্বমাঙ্গল্যে বিশ্বাস' রাখিতেন। আর, এই 'বিশ্বাস' রাখিয়াও, রাজ-মন্ত্রীর গুরুভার পালন করিতেন।

কোন কারণবশতঃ একদিন রাজার একটি অঙ্গুলি কাটিয়া যায়। তাহাতে প্রবলবেগে রুধির-ধারা বহিতে থাকে। তীক্ষ্ণ ছুরিকার অপব্যবহারে অসাবধানতা বশতঃই এইরূপ ঘটে। রাজা ইহাতে অত্যন্ত কাতর হইয়া যন্ত্রণা প্রকাশ করিতে থাকেন। অমাত্যগণ অমনি শশব্যস্তে তাহার প্রতিবিধান করিতে লাগিল। নিকটে বৃদ্ধ মন্ত্রীও দণ্ডায়মান ছিলেন; তিনি

কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র ব্যাকুলতার বা সম-বেদনা প্রকাশ করিলেন না। কন্তু, রাজার সেই অত্যন্ত যন্ত্রণার সময় কহিলেন,—"সামান্য একটা আঙুল গেছে, এতে আর অত 'ত্রাহি ত্রাহি' কচ্ছেন কেন! ঈশ্বর মঙ্গলময়, তিনি যা' ক… মঙ্গলের জন্য।"

হিতে বিপরীত হইল। রাজা এ… মনে মনে বড়ই রুষ্ট হইলেন। তিনি… লেন, প্রকারান্তরে মন্ত্রী তাঁহাকে শ্লেষ-উ… করিল; ভৃত্য হইয়া প্রভুর ভাল… সহানুভূতি প্রদর্শন করা দূরে থাক্—… ভাগে ধৃষ্টতা দেখাইল। সুতরাং এ অ… অমার্জ্জনীয়। যদিও রাজা সে ভাব মুখে… বলিলেন না, কিন্তু অন্তরে দারুণ প্রতিহি… বৃত্তি পোষণ করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন অতিবাহিত হইলে, ক্রমে… অঙ্গুলির ক্ষত-স্থান শুষ্ক হইয়া গেল… আরোগ্যলাভ করিলেন। তবে ক্ষত… একটা কালশিরা দাগ চিহ্ন-স্বরূপ রহিয়া… তাহা আর কিছুতেই বিলুপ্ত হইল না।

ইহার পর একদিন রাজা অমাত্যগ… শিকারোদ্দেশে বহির্গত হইলেন। বৃদ্ধ ম… সঙ্গে ছিলেন। বন ঢুঁড়িয়া-ঢুঁড়িয়া… অনেক দূর গিয়া পড়িলেন। গভীর অ… মধ্যে শেষে তাঁহারা পথ হারাইলেন। … সমভিব্যাহারী লোকগণও একে একে… কোথায় বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। শেষে… মাত্র রাজা ও মন্ত্রী সেই নিবিড় বনে… হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। … অবশ্য শীঘ্রই অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ি… মুখে 'হা-হুতাশ' করিতেও ত্রুটী করিলেন… মন্ত্রী কিন্তু ইহাতে কিছুমাত্র ব্যাকুলতার… প্রকাশ করিলেন না; তখনও আবার… মাঝে "ঈশ্বর মঙ্গলময়, যা কর তুমি… বলিতে লাগিলেন। রাজা সেই অঙ্গুলি কা…

সময় হইতেই মন্ত্রীর প্রতি বড়ই রুষ্ট হইয়াছিলেন। সে ক্রোধ আজি অবধিও অন্তর হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। তদুপরি উপস্থিত এরূপ ব্যবহারে, মন্ত্রীর প্রতি তিনি আরও হাড়ে-হাড়ে চটিয়া উঠিলেন। মুখে কিছু না বলিয়া, অনতি-বিলম্বে প্রতিহিংসা কার্য্যে দেখাইতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন।

রাজা ও মন্ত্রী অবিরাম চলিতেছেন, এমন সময় একটি কূপ রাজার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। মন্ত্রীর মুখে 'ঈশ্বর মঙ্গলময়' এই কথা পুনঃ পুনঃ শুনিয়া, রাজা এতই বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, এই সময় তিনি মন্ত্রীকে সেই কূপ-মধ্যে নিক্ষেপ করিতে মনস্থ করিলেন। মন্ত্রী এইবার যেমন 'ঈশ্বর মঙ্গলময়, যা করেন তিনি' মুখে উচ্চারণ করিবেন, রাজা অমনি ক্রোধভরে তাঁহাকে কূপের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। নিক্ষেপ-কালীন শ্লেষ করিয়া আবার কহিলেন,—"হ্যাঁ, বটে! ঈশ্বর মঙ্গলময়, অতএব এই কূপের মধ্যে যাও, মর।"

সর্ব্বমাঙ্গল্যে-বিশ্বাসী বৃদ্ধ মন্ত্রীও পতন-কালীন 'ঈশ্বর মঙ্গলময়, ঈশ্বর মঙ্গলময়' শব্দে কূপে পতিত হইলেন।

রাজা এখন একাকী হইলেন। অজানিত পথে আরও নিবিড় বন-মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। এই স্থানে একদল দস্যু ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে,—তাহাদের শিকার অন্বেষণ করিতেছে। দলপতি দল-বল লইয়া সুসজ্জিত; সম্মুখে এক করাল চামুণ্ডা-মূর্ত্তি বিরাজমানা। দস্যুগণ দেশ লুটিতে যাইবে; তজ্জন্য অগ্রে দেবী-সমক্ষে নরবলি দিতে হইবে, নচেৎ অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। কিন্তু তাহাদের আজ সেই বলির অভাব! তাই সকলে সৌৎসুক্যে চারিদিক নিরীক্ষণ করিতেছে। এমন সময় তাহাদের সম্মুখেই শিকার মিলিল দেখিয়া, তাহারা বিকট জয়োল্লাসে সমস্ত অরণ্য প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। এই সময় রাজার অন্তরাত্মা দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু পালাইবার কোন উপায় নাই দেখিয়া তিনি সহজেই ধরা দিলেন। দস্যুগণ রাজার হস্তাদি উত্তমরূপ বাঁধিয়া তাঁহাকে স্নান করাইয়া যূপ-কাষ্ঠের সম্মুখে আনয়ন করিল। রাজার আত্মা-পুরুষ উড়িয়া গেল। এই সময় দস্যুপতি তাহার অন্যান্য সঙ্গীদিগকে কহিল,—"দেখ, আগে এর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা ক'রে দেখ্। যদি কোন স্থানে ক্ষত, দাগ্ বা আঁচড় থাকে, তবে একে প্রাণে মারবার কোন দরকার নাই। অক্ষত, ক্ষত-চিহ্নহীন মানুষ বলি দিলে তবে মা কালিকা দেবী প্রসন্ন হন; নইলে হিতে বিপরীত ঘটে।"

দলপতির আদেশমত দস্যুগণ বিশেষরূপে পরীক্ষা করায় দেখিতে পাইল, সত্যই রাজার একটি অঙ্গুলির কিয়দংশ একেবারে নাই; অধিকন্তু একটি কাল দাগও আছে। সুতরাং তাহারা হতাশ্বাস হইয়া রাজার বন্ধন মুক্ত করিয়া দিল। মুক্ত হইয়া তিনিও সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। এইবার 'বিপরীতে হিত' হইল।

এতক্ষণে রাজার চৈতন্য হইল। এতক্ষণ পরে তিনি বুঝিলেন যে, তিনি কি বিষম পাপে লিপ্ত হইয়াছেন। মন্ত্রীর জন্য এইবার তাঁহার প্রাণ কাঁদিল, মনে বিষম পরিতাপ জন্মিল, আত্মগ্লানি ও অনুশোচনায় হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে তখন সেই কূপ-সমীপে উপনীত হইলেন; অতি কষ্টে কোন প্রকারে হিতৈষী মন্ত্রীকে উদ্ধার করিলেন। বলিলেন,—"মন্ত্রিন, তোমার কথাই সত্য। 'ঈশ্বর মঙ্গলময়,' 'তিনি যা' করেন, মঙ্গলের জন্য,' এতক্ষণে বুঝিয়াছি। আমি, মূঢ়, পাতকী; বিষয়-মোহে আমার অন্তর কলুষিত। আমার বুদ্ধিভ্রংশ হইবে না কেন? নহিলে তোমার কথা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া হিতে বিপরীত বুঝিব কেন? ঈশ্বর

যে মঙ্গলময়, তিনি যা করেন, তাই যে মঙ্গলের জন্য, তাহা এখন বুঝিতেছি। সে সময় যদি আমার আঙুল কাটিয়া না যাইত, তা' হলে তো আজ আমি নিশ্চয়ই প্রাণে-মারা যাইতাম।-কেবল তুমিই সে সময় বলিয়াছিলে, 'ঈশ্বর যা করেন, মঙ্গলের জন্য'। সত্যই তিনি যা' করেন, মঙ্গলের জন্য। তা' নহিলে তো আজ আমি দস্যু-হস্তে প্রাণ হারাইয়া ছিলাম!"—এইরূপ কহিয়াই, দস্যুদিগের আদ্যোপান্ত কাহিনী বর্ণন করিলেন। যেরূপে তিনি মুক্তি পান, তাহাও বলিলেন; এবং শেষে মন্ত্রীর নিকট আপন গুরুতর অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

মন্ত্রীও হর্ষোৎফুল্ল বদনে প্রেমোন্মত্তভাবে অমনি উচ্চৈঃস্বরে—"ঈশ্বর মঙ্গলময়, ঈশ্বর মঙ্গলময়"—শব্দে সেই স্থান প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিলেন। শেষে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"রাজন্, আপনি আমার নিকট আবার কি ক্ষমা-ভিক্ষা করিতেছেন? একবার বদন ভ'রে বলুন, 'ঈশ্বর মঙ্গলময়!' ভাবিয়া দেখুন,যদি আপনিও আমায় কূপে ফেলিয়া না দিতেন, তাহা হইলে আমারই বা অদৃষ্টে কি হইত? সেরূপ না হইলে, অবশ্যই আমি আপনার অনুসরণ করিতাম; এবং দস্যু-সমক্ষে উপনীত হইলে, অবশ্য তাহারা আমাদের দুইজনকেই আক্রমণ করিত। তা'রপর, আপনার অঙ্গুলিতে কাল দাগ্ ছিল, আপনি রক্ষা পাইতেন; কিন্তু আমাকে—আমার শরীরে তো বিন্দুমাত্রও দাগ বা ক্ষত-চিহ্ন নাই—তাহারা নিশ্চয়ই বলি দিত। সুতরাং দেখুন, কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়াই আমার মঙ্গলের কারণ। আর এই জন্যই, আবার বলি, প্রাণ ভ'রে বলি—'ঈশ্বর মঙ্গলময়'; পৃথিবীতে অমঙ্গল কিছু নাই। 'যা কিছু হয়, সব মঙ্গলের জন্য।"

কথা শুনিয়া রাজার এবার সম্পূর্ণ চৈতন্য হইল। তিনি দেখিলেন, বস্তুতঃ মন্ত্রীকে মধ্যে নিক্ষেপ করাও মঙ্গলের জন্য। হর্ষ, ভক্তি ও বিস্ময়-রসে আপ্লুত হইয়া কণ্ঠে মুহুর্মুহু "জয় জগদীশ্বর মঙ্গলময়" করিতে লাগিলেন। 'সর্ব্বমাঙ্গল্যে' বি বল কিরূপ অলৌকিক, তাহা পরীক্ষিত ভক্ত-বিশ্বাসীর ভক্তি-বিশ্বাস কতদূর উদাত্ত-ভাবে পূর্ণ, তাহাই দেখাইলাম। বিশ্বাস বলিয়া যে একটা কথা প্রচলিত তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

'চোরের উপর বাটপাড়ি!'

রামেশ্বর দাস কলিকাতার একটী কুলি-আফিসের বড় বাবু। এই স্থানে অনেক দিবস হইতে কর্ম্ম করিতে কুলি-আফিসের সকল কার্য্যেই তাঁহার বুৎপত্তি জন্মিয়াছে; আফিসের কর্তৃপ বর্গের নিকটও তাঁহার বেস নামডাক কিরূপে অশিক্ষিত নিরীহ কুলিদিগের মিথ্যা প্রলোভনে প্রলোভিত করিতে কিরূপে তাহাদিগকে স্বদেশের মায়াজাল ছিন্ন করিতে হয়, কিরূপে বিনা-দোষে দিগকে নির্ব্বাসিত করিতে হয়, তাহার প্রকার মায়াজাল তাঁহার হৃদয়ে সতত আছে। এই মায়ামন্ত্রের গুণেই নিকট তাঁহার নামযশ; কলিকাতার বড় একখানি বাড়ি; লোহার সিন্ধুক পূর্ণ; আফিসের সম্মুখে প্রায় সর্ব্বদাই জন্য জুড়ি দাঁড়াইয়া থাকে। এক কথায় তেই তিনি আধুনিক 'বড়-মানুষের' পরিগণিত।

বেলা ৫টা বাজিয়াছে। রামেশ্বর আফিসের কাজ-কর্ম্ম সমাপন করিয়া, যাইবার উদ্‌যোগ করিতেছেন। এমন সুদীর্ঘ শ্বেত শ্মশ্রু-শোভিত একজন মুসলমান আসিয়া বাবুকে 'সেলাম' করিয়া বলিল,—"মহাশয়, আমি একজন কুলি-ব্যবসায়ীর সর্দ্দার। তাঁহার নিমিত্ত নানা স্থান হইতে পঞ্চাশ জন কুলি অনেক কষ্টে সংগ্রহ করিয়া, আমি অদ্য কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি; কিন্তু আমার কুলি-সকল এখন পর্য্যন্তও আসিয়া পৌঁছে নাই। পশ্চিম হইতে যে গাড়ি সন্ধ্যার পর হাওড়া-ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইবে, আমার অন্য সর্দ্দারের সহিত তাহারা সেই গাড়িতে আসিয়া কলিকাতায় পৌঁছিবে। কিন্তু এইমাত্র আমি আমার মনিবের নিকট হইতে এই টেলিগ্রাফ প্রাপ্ত হইয়াছি; এই পড়িয়া দেখুন।"—এই বলিয়া বৃদ্ধ সর্দ্দার তখন একখানি টেলিগ্রাফ বাবুর হস্তে প্রদান করিল।

তাহা পড়িয়া রামেশ্বর বাবু বুঝিলেন যে, সর্দ্দারের মনিব হঠাৎ অতিশয় বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন; এবং তজ্জন্য কুলি-সকলকে উপস্থিত-মত অন্য কাহারও নিকট দিয়া, যে টাকা শীঘ্র সংগ্রহ করিতে পারা যায় তাহা লইয়া, অদ্য রাত্রেই সর্দ্দারকে তাঁহার নিকট পৌঁছিতে হইবে। নতুবা সেই ভয়ানক বিপদ হইতে উদ্ধার হওয়ার তাঁহার আর কোন উপায়ই নাই। টেলিগ্রাফের এইরূপ মর্ম্ম তাঁহাকে অবগত করার পরই, সর্দ্দার আবার বলিতে লাগিল,—"মহাশয়, আপনি অতিশয় ভদ্রলোক; এবং কুলির কার্য্যে আপনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই নিমিত্তই এই বিপদের সময় আপনার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এখন, যাহাতে ইহার কোন উপায় হয়, তাহা আপনাকে করিতেই হইবে।"

রামেশ্বর বাবু ভাবিলেন,—"মন্দ নহে! বিনা-কষ্টে আফিসে বসিয়া একেবারে পঞ্চাশ জন কুলি সংগ্রহ করা বড় সহজ নহে। তাহাতে আবার দেখিতেছি, ইহারা বিপদগ্রস্ত! কুলি-সকল আমাকে না দিলে উহাদিগের আর

উপায়ই নাই! এই সুযোগে আমি অনায়াসেই বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিব।"—এইরূপ ভাবিয়াই, তিনি প্রকাশ্যে কহিলেন,—"আপাততঃ আমার কুলির বিশেষ আবশ্যক নাই। তবে যখন দেখিতেছি, আপনারা অতিশয় বিপদগ্রস্ত, তখন আর কি করিব? ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য কর্ম্মই ভদ্রলোকের বিপদের সময় সাহায্য-করা। কাজেই আমাকে বাধ্য হইয়া ঐ সকল কুলিকে লইতে হইবে। কিন্তু আজকাল কুলির দর যেরূপ কম হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আপনাদিগকে খরচ প্রভৃতির নিমিত্ত, প্রত্যেক কুলির জন্য পঁচিশ টাকার অধিক দিতে পারিব না। ইহাতে যদি আপনি সম্মত হন, তাহা হইলে কুলিদিগকে এখানে আনিয়া দিলেই, আপনার সমস্ত টাকা চুকাইয়া দিব।"

এই কথা শুনিয়া সর্দ্দার কতই দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল; তাহাদিগের বিপদের কথা বারবার জানাইল। কিন্তু রামেশ্বর বাবু কিছুতেই আপন স্বার্থ পরিত্যাগ করিলেন না। তবে অনেক ওজর-আপত্তি—অনেক কসা-মাজার পর, পরিশেষে প্রত্যেক কুলির নিমিত্ত ত্রিস টাকা পর্য্যন্ত দিতে সম্মত হইলেন। সর্দ্দার আর কি করে? যেন কাজেই তাহাতে সম্মত হইল। তখন হিসাব করিয়া সমস্ত কুলির নিমিত্ত ১৫০০৲ পনের শত টাকা হইল। তাহার ভিতর হইতেও দস্তুরি প্রভৃতি নানা কারণে একশত টাকা বাদ গেল। অর্থাৎ কুলিদিগকে আনিয়া হাজির করিয়া দিলে, ১৪ শত টাকা সে পাইবে, স্থির হইল।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর, সর্দ্দার কহিল,—"মহাশয়, আমি যত শীঘ্র এই স্থান হইতে আমার মনিবের নিকট গমন করিতে পারি, ততই ভাল। এই নিমিত্ত আপনি এমন কোন-প্রকার বন্দোবস্ত করুন, যাহাতে আমার আর কোনরূপে বিলম্ব না হয়!"

সর্দ্দারের কথা শুনিয়া রামেশ্বর বাবু অনেক

ভাবিয়া-চিন্তিয়া শেষে এই স্থির করিলেন যে, তিনি নিজেই তাঁহার নিজের সর্দ্দারদিগকে লইয়া হাবড়ার রেলওয়ে-ষ্টেসনে গমন করিবেন; এবং সেই স্থানে কুলি-সকল গাড়ি হইতে নামিলে, তাহাদিগকে লইয়া আপনার সর্দ্দারদিগের জিম্বায় আফিসে পাঠাইয়া দিবেন। আর, এইরূপে তাঁহার সর্দ্দারগণ সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলে, পরে তিনি ঐ সকল টাকা তাঁহাকে দিবেন; নতুবা অগ্রে কোন ক্রমেই টাকা দিতে সমর্থ হইবেন না, জানাইলেন। বৃদ্ধ সর্দ্দার প্রথমে ঐরূপ প্রস্তাবে সম্মত হইল না। কিন্তু পরিশেষে তাহাতেই তাহাকে সম্মত হইতে হইল; সে রামেশ্বর বাবুর সহিত হাবড়া-ষ্টেশনেই গমন করিল। রামেশ্বর বাবু, তাঁহার নিজের চারিজন সর্দ্দারের সহিত, টাকা-কড়ি লইয়াই, অতঃপর হাবড়া-ষ্টেসনে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

তাঁহারা সকলে হাবড়া-ষ্টেসনে গিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। এমন সময়, পশ্চিমের গাড়ি আসিয়া উপনীত হইল। তাহাতে দেখা গেল, সেই গাড়ি হইতে ৪ জন লাল পাকড়ি-বাঁধা পশ্চিমদেশীয় মুসলমান অবতরণ করিল; আর, তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ,কম্বলে-বাঁধা ছোট ছোট মোট—বাঁশের লাঠির সাহায্যে স্কন্ধে করিয়া, মলিন জীর্ণ-বস্ত্র পরিহিত পঞ্চাশ জন কৃষ্ণকায় পুরুষ ও স্ত্রীলোক, প্লাটফরম্ হইতে বাহির হইয়া আসিল। তখন লাল পাকড়ি-ধারী সেই সর্দ্দারগণ, বৃদ্ধ সর্দ্দারকে দেখিয়া 'সেলাম' করিল; ও কুলিগণকে কোথায় লইয়া যাইতে হইবে, তাহা জিজ্ঞাসা করিল। তাহাতে সর্দ্দার উত্তর করিল,—"আমাদিগকে আর কোন স্থানে লইয়া যাইতে হইবে না। এই বাবু এখন ইহাদিগকে লইয়া যাইবেন।" সুতরাং ক্রমে কুলি-সকল বাবুর নিকট অর্পিত হইল। বাবু কুলিদিগকে দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন; ও তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তা[...] অন্নকষ্টে এতদূর কষ্ট পাইয়াছে যে, যে [...] তাহাদিগকে পাঠাইয়া দেওয়া যাইবে, তা[...] হৃষ্টমনে সেই স্থানেই যাইতে প্রস্তুত আছে।

অতঃপর, রামেশ্বর বাবু ঐ কুলি[...] তাঁহার নিজের সর্দ্দারগণের হস্তে অর্পণ ক[...] তাঁহার আফিসে সকলকে লইয়া যাইতে [...] লেন। ক্রমে তাহারা ঐ শকাশ জন [...] সমভিব্যাহারে সেই স্থান পরিত্যাগ ক[...] তখন, বাবু তাঁহার কথিত-মত টাকা [...] স্থানেই ঐ সর্দ্দারকে দিয়া, আপনার [...] চড়িয়া প্রস্থান করিলেন। আর সর্দ্দা[...] টাকা-সহিত ফিরিয়া যাইবার মানসেই [...] সেই স্থানে আপনার সর্দ্দারদিগের [...] বসিয়া রহিল।

বাবুর সর্দ্দারগণ কুলিদিগকে লইয়া [...] করিতেছে। এমন সময়, একটী চৌম[...] কয়েকখানি গাড়ি কয়েক দিক হইতে [...] আসিয়া, সেই কুলি-শ্রেণীর ভিতর উপ[...] হইল। কাজেই কুলি-সকল ছত্রভঙ্গ [...] পড়িল; যে যেদিকে পাইল, দৌড়িয়া প[...] করিল। সর্দ্দারগণ ভাবিল,—"উহারা গাড়ির [...] পলায়ন করিতেছে; আবার এখনই এ[...] হইবে।" কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তাহা আর [...] না; যে যে রাস্তা পাইল, ঊর্দ্ধশ্বাসে [...] সেইদিক দিয়াই 'লম্বা' হইল। তখন সর্দ্দা[...] আর কোন উপায়ই দেখিল না; চা[...] চারিজন কুলিকে জাপটাইয়া ধরিল, [...] আর সকলে কে কোথায় চলিয়া [...] যাহারা ধরা পড়িল, তাহারাও আবার [...] ছাড়াইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতে লা[...] উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিল। সু[...] দেখিতে দেখিতে ক্রমে সেই স্থান [...] পূর্ণ হইয়া গেল। কেহ কেহ বা কুলির [...] অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে ছাড়াইয়া দি[...] কেহ কেহ বা সর্দ্দারগণকে মারিতে দৌড়ি[...]

এইরূপ অল্পক্ষণ গোলমাল হওয়ার পরও, সর্দ্দারগণ পুনরায় সেই কুলিদিগের সন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদিগকে আর দেখিতে পাইল না; তাহারা সেই গোলমালে যে কোথায় গমন করিল, তাহা আর কেহই বলিতে পারিল না। কোনরূপ সন্ধান না পাইয়া, দুঃখিত মনে, অবশেষে তাহারা তাহাদিগের মনিব রামেশ্বর বাবুর নিকট যাইয়া সমস্ত কথা বলিল। পরে রামেশ্বর বাবুও তাহাদিগের অনেক অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কোন সন্ধান আর মিলিল না।

যাহাহউক, এই ঘটনার অনেক দিবস পরে, প্রকাশ হইয়াছিল যে, ইহা একটী প্রকাণ্ড জুয়াচোরের জুয়াচুরী! বৃদ্ধই তাহাদিগের নেতা; এবং সর্দ্দারগণ তাহার সহযোগী। আর, কুলিগণ তাহাদিগেরই দলভুক্ত সামান্য অর্থলোভী দরিদ্র ব্যক্তি। ইহাকেই শঠের উপর শঠতা বলিয়া থাকে।

নমঃশূদ্র জাতি।

(প্রাপ্ত।)

নমঃশূদ্র জাতি কোন কোন স্থানে 'নমঃসুত' বলিয়া পরিচিত-হেতু কোন কোন মহাত্মা ইহাদিগকে 'সুত জাতি' বলিয়া অনুমান করিয়াছেন; এবং কেহ বা দশরাত্রি অশৌচ প্রভৃতি-হেতু 'বৈদেহ' বলিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে। ভগবান মনু বলেন,—

"সুতানামশ্বসারথ্যমম্বষ্ঠানাং চিকিৎসকং।
বৈদেহকানাং স্ত্রীকার্য্যং মাগধানাং বণিকপথঃ॥"

অর্থাৎ সুত জাতির অশ্ব-সারথ্য, অম্বষ্ঠ জাতির চিকিৎসা, বৈদেহ জাতির অন্তঃপুর-রক্ষা এবং মাগধ জাতির স্থলপথে বাণিজ্য-ব্যবসা। নমঃশূদ্র জাতির মধ্যে উপরোক্ত সুত বা বৈদেহ জাতির ব্যবসা অশ্বসারথ্য বা অন্তঃপুর-রক্ষা কোন স্থানেই নাই। অতএব নমঃশূদ্র জাতি কখনই সুত বা বৈদেহ নহে।

কোন মহাত্মা নমঃশূদ্রকে 'নমস্' মুনির শূদ্রাণী স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান কহিয়াছেন। কিন্তু তাহাও সঙ্গত নহে। যেহেতু শূদ্রাণীর গর্ভজাত হইলে এক মাসই অশৌচ হইত। আবার 'নমস্' নামক মুনিও কোন গ্রন্থাদিতে দেখিতে পাই নাই বা কাহারও মুখে শুনি নাই। তবে লোমশ মুনি!—তা' তিনি যে বিবাহাদিই করেন নাই, এইরূপই শাস্ত্রাদিতে দেখা যায়! তিনি বিবাহ করিয়াছেন এবং তাঁহার যে সন্তান হইয়াছে, ইহা আমরা জানিতে পারি নাই। তবে যে জনরব আছে, তাহা বোধ হয় 'নমঃশূদ্র' এই নামের আভাসে হইয়া থাকিবে। কিন্তু নমঃশূদ্র যে মুনির সন্তান, তাহা ঠিক্। তবে ইহাদের পিতা কাশ্যপ মুনি।

এখন প্রশ্ন, এই নমঃশূদ্র জাতি যদি শাস্ত্রীয় ক্ষুদ্র জাতি হইল, তবে নমঃশূদ্র জাতির মধ্যে যে স্থানে স্থানে পক্কান্ন দ্বারা পিণ্ডদান-প্রথা প্রচলিত দেখা যায়, তাহা কিরূপে যুক্তি-সঙ্গত হইতে পারে? এতদুত্তরে আমরা বলি যে,—

"অধর্ম্মাভি ভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণ-সঙ্করঃ॥
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কলস্যচ।
পততি পিতরোহ্যেষাং লুপ্তোপিণ্ডোদকক্রিয়া॥"
—ভগবদ্গীতা।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিতেছেন,—"হে অর্জ্জুন, অধর্ম্মের আবির্ভাব হইলে স্ত্রীগণ দুষ্টা হইয়া উঠে; স্ত্রীগণ দুষ্টা হইলে বর্ণসঙ্কর জন্মে। তখন, সেই কুলনাশকদিগের নরক হয় এবং তাহাদিগের পিতারাও শ্রাদ্ধ-তর্পণ বর্জ্জিত হইয়া ঘোর নরকে পতিত হয়।"

উক্ত বচনাবলীতে সঙ্কর জাতি যে একেবারে পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে পারিবে না, ইহা না বুঝিয়া, কেবল পিতার কর্ত্তব্য বিধিমতে শ্রাদ্ধ

করিতে পারিবে না, ইহাই বুঝিতে হইবে। অতএব অসঙ্কর জাতি পিতার রীতি অনুসারে শ্রাদ্ধাদি করিতে পারিবে, জানা গেল। কূদর জাতি যখন ব্রাহ্মণের সবর্ণ বিবাহজাত সন্তান, তখন অবশ্যই রীতিমত পক্কান্ন দ্বারা পিণ্ডদান পূর্ব্বক পিতার শ্রাদ্ধ করিতে অধিকারী। কূদর পদবীধারী নমঃশূদ্র যশোহর জেলার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে দেখা যাইতেছে। অতএব নমঃশূদ্র জাতির অশৌচ, শ্রাদ্ধকর্ম্ম, কূদর পদবী প্রভৃতিতে কূদর জাতির সহিত ঐক্য হওয়ায়, নমঃশূদ্র জাতি যে কূদর জাতি তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিল না।

অনেকে কহেন,—"নমঃশূদ্র জাতি যদি চণ্ডাল না হইবে, তবে ইহাদিগের প্রতি কুপিত ব্যক্তি, কি হেতু ইহাদিগকে চণ্ডাল শব্দে গালি দিয়া থাকে?" তদুত্তরে আমরা বলি যে,—

"প্রথমেঽহনি চণ্ডালী দ্বিতীয়ে ব্রহ্মঘাতিনী।
তৃতীয়ে রজকী প্রোক্তা চতুর্থেঽহনি শুধ্যতি॥"

—পরাশর-সংহিতা।

অর্থাৎ ঋতুমতী স্ত্রী প্রথম দিনে চণ্ডালী, দ্বিতীয় দিনে ব্রহ্মঘাতিনী, তৃতীয় দিনে রজকী হইয়া চতুর্থদিনে শুদ্ধা হয়। অতএব ঋতুর প্রথম দিনে নমঃশূদ্র জাতির জন্ম-হেতু চণ্ডালীর সন্তান-জ্ঞানে নমঃশূদ্রকে চণ্ডাল বলিয়া গালি দিয়া থাকে। বাস্তবিক ঐ দিনে সন্তান জন্মিলেই যে, সে সন্তান চণ্ডাল হইবে, এরূপ নহে। তবে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, ঐ তিন দিনে নিঃসৃত আর্ত্তব শোণিত অতি উষ্ণ ও তরল বিধায়, তাহাতে সন্তান জন্মিলে সন্তান দুর্ব্বল ও অল্পায়ু হয়; এবং পিতামাতার বিবিধ রোগ হইতে পারে। আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্রে এ বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায়। কিয়দংশ যথা,—

"তত্রপ্রথম দিবসে ঋতুমত্যাম মৈথুনগমনমনায়ুষ্যং পুংসাং ভবতি। যশ্চ তত্রাধীয়তে গর্ভঃ সপ্রসবোমান বিমুচ্যতে। দ্বিতীয়েঽপ্যেব সূতিকা গৃহেবা। তৃতীয়েঽপ্যেব অসম্পূর্ণাঙ্গোঽল্পায়ুর্ব্বা ভবতি।"—সুশ্রুতসংহিতা।

অর্থাৎ ঋতুমতী স্ত্রীতে প্রথম দিনে জাত সন্তান আয়ুহীন হইবে অথবা ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই মৃত হইতে পারে। দ্বিতীয় দিনেও এইরূপ ফল বা সূতিকা গৃহেই সন্তান বিনষ্ট হইবে। তৃতীয় দিবসেও তদ্রূপ ফল অথবা অসম্পূর্ণাঙ্গ ও অল্পায়ু হইবে।

অতএব জানা গেল, পণ্ডিতগণ লোকের ঐ সকল আপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই, ঐ তিন দিবসকে অতদূর কুৎসিতরূপে বর্ণন করিয়াছেন। অর্থাৎ সাধারণ নিষেধ কেহই মানিবে না বলিয়া, যেমন পণ্ডিতগণ লোকের স্বাস্থ্য-রক্ষার্থ "নবমীতে লাউ গোমাংস তুল্য" ইত্যাদি বর্ণন দ্বারা, তিথি-বিশেষে খাদ্য-বিশেষ খাইতে নিষেধ করিয়াছেন; সেইরূপ ঋতুমতী স্ত্রীকেও চণ্ডালী প্রভৃতি বর্ণন দ্বারা অস্পৃশ্যত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক সন্তানোৎপত্তির বাধা দিয়াছেন। বাস্তবিক যদি ইহারা চণ্ডাল হইত, তবে অন্যান্য জাতির ন্যায় ইহাদের উৎপত্তি কালেই 'কূদর' না হইয়া চণ্ডাল নাম হইত। অতএব নমঃশূদ্র জাতি কোন মতেই চণ্ডাল নহে; ইহারা শাস্ত্রীয় কূদর জাতি। তবে প্রথম ঋতুর দোষ দিয়া লোকে ইহাদিগকে চণ্ডাল শব্দে গালি দিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে যে দুইটী ভাগ দেখা যায় তাহা রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণীর রূপান্তর বলিয়া প্রতীতি হয়।

শ্রী :—

বহুরূপী।

দেখিনু—

কি যে সে মুখখানি কতই সুন্দর।
ঢল ঢল সরোবরে বিকচ কমল॥
মধুর মধুর কত কোমলতা মাখা।
সুধাকর-সুধা ল'য়ে হইয়াছে আঁকা॥

সরল সুভাব সদা বিরাজে তথায়।
জোছনার শীত রশ্মি যেন মুখে ভায়॥
কঠোর কঠিন ভাব, না আসিতে পারে।
প্রীতির প্রফুল্ল উৎস অবিরাম ঝরে॥

আবার দেখিনু—

কি যে সে মু'খানি তা'র কত মনোহর।
জলদের আড়ে যেন শোভে শশধর॥
আবৃত সে মুখ-চন্দ্র সুনীল বসনে।
ফুটিছে রূপের জ্যোতি সহস্র কিরণে॥
দেখি মনে হয়, শশী গগন ছাড়িয়া।
ভূতলে লজ্জার-বাসে মুখ জড়াইয়া॥

আবার—

আঁখি দু'টী ঢুলু ঢুলু যেন ঘুম-ঘোরে।
কি এক কোমল ভাব বাহিরিয়া পড়ে॥
ঘুম-ঘোরা দু'টী চোখ্, দু'টী চোখে মিশে।
অমনি ফিরায়ে লয়, ঢাকে লাজ-বাসে॥

আবার কি দেখি—

অশ্রুধারা বহিতেছে এবে দু'নয়নে।
বিরহিনী ব'সে যেন মলিন বদনে॥
ঊষার সে আধ-আধ অন্ধকার-ছায়।
পড়ে শিশিরের বিন্দু গোলাপের গায়॥
ঠিক ওই মুখ-খানি গোলাপ-কোমল।
আলোকে আঁধার এসে করে টলটল॥
কি এ অপরূপ ছবি মানবী-অকারে।
কবি বলে, ছবিখানি বহুরূপ ধরে॥

অদ্ভুত হত্যা।

'ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে।'

বিচারক সুরনাথ বাবুকে কোন মতে খুনের কথা স্বীকার করাইতে না পারিয়া, বলিলেন,—"দেখ, সমস্ত সাক্ষীরাই তোমার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিল। এমন যে তোমার আপনার ভগ্নীপতি!—তাহার কথাতেই তো স্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে যে, তোমার দ্বারাই এই কার্য্য হইয়াছে। যাহা হউক, তোমার নিজের কোন সাফাই সাক্ষী আছে কি?" সুরনাথ বাবু বলিলেন,—"সাফাই সাক্ষী কোথা পাইব! আমি তো আর সর্ব্বদা সাক্ষী রাখিবার জন্য, একজনকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে পারি না!" বিচারক তখন আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, রায় লিখিতে বসিলেন; এবং বিচারালয়ের সকলেই উৎকণ্ঠা-চিত্তে তাঁহার দিকে লক্ষ্য করিয়া রহিল। বিচারালয় একেবারে নিস্তব্ধ। কেহ কোন কথা কহিতেছে না। একটী সূচ পড়িলেও, বোধ হয়, তাহার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়।

এমন সময়ে, একজন পেয়াদা, একটী বড় পুলিন্দা ও একখানি চিঠি লইয়া গিয়া, বলিল,—"হুজুর, আপনার নামে এই চিঠিখানি ও এই পুলিন্দাটী আসিয়াছে।" বিচারক উপস্থিত মকর্দ্দমার রায় লেখা স্থগিত রাখিয়া, তখন প্রথমেই পুলিন্দাটির উপরের কাপড় ছিঁড়িয়া দেখিলেন,—একটী কাঠের বাক্স, উত্তমরূপে পেরেক দিয়া আঁটা। সুতরাং তাঁহার চাপরাসীকে, তাঁহার সম্মুখেই, ঐ বাক্সটী খুলিতে বলিলেন; এবং নিজে চিঠিখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। ক্রমে চাপরাসীও বাক্সটি খুলিয়া, তাঁহার সম্মুখে আনিয়া হাজির করিল। বিচারক অমনি চিঠি-পড়া স্থগিত রাখিয়া, তাড়াতাড়ি ঐ বাক্স হইতে কাগজ-মোড়া একটী গোলাকার জিনিস বাহির করিয়া যেমন তাহার উপরের কাগজখানি ছিড়িবেন অমনি, তাহার সহিত স্ত্রীলোকের লম্বা লম্বা চুলের গোছা তাঁহার হাতে পড়িল। তাহাতে আরও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, ক্রমে তিনি সমস্ত কাগজখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন; দেখিলেন,—উহা একটী স্ত্রীলোকের মাথা, এবং সেই মাথারই লম্বা লম্বা চুলগুলি প্রথমে তাঁহার হাতে পড়িয়াছিল। ইহা দেখিয়াই, বিচারক সেই দিনের জন্য বিচার স্থগিত

রাখিলেন। অপরাপর সকলেই অতঃপর আপন-আপন গৃহে প্রত্যাগত হইল; এবং কেবল সুরনাথ বাবুকেই হাজতে যাইতে হইল।

রহস্য-উদ্ঘাটন।

পরদিন। বিচারালয়ে লোক আর ধরে না। সকলেই বলিতেছে,—"এমন অদ্ভুত কাণ্ড আর তো কখনও দেখা যায় নাই!—পুলিসের অসাধ্য কায কিছুই নাই! আপনারাই খুন ক'রে, একজন বিদেশী ভদ্রলোককে মিছা-মিছি প্যাঁচে ফেলা! যাহা হউক, পরমেশ্বর নিরপরাধির সহায়; তাহা না হইলে, রায় দেবার পূর্ব্বেই খুনের চিঠি ধরা পড়িবে কেন? ভাগ্যিস্, গোয়েন্দার নাম, আর বিচারকের নাম এক! তা' না হ'লে তো আর বিচারক মহাশয় সের খাঁ গোয়েন্দার চিঠি ও পুলিন্দা নিজের মনে করিয়া খুলিতেন না? আর, চিঠি না খুলিলেও, কিছুতেই তো সে ধরা পড়িত না!" এইরূপে সকল দর্শকেরা পুলিশকে নিন্দা করিতেছে; এবং মাঝে মাঝে বিচারাসনের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে।

এমন সময়ে, একখানি খোলা চিঠি হাতে করিয়া আসিয়া, বিচারক বিচারাসনে বসিলেন। দর্শক-মণ্ডলী সকলেই, বিচারক আজ কিরূপে নূতন নূতন আসামীদের বিচার করিয়া দণ্ড বিধান করেন, তাহা দেখিবার জন্য, বড়ই উৎসুক হইল। বিচারক বিচারাসনে বসিয়াই, প্রথমে 'দ্রাসতুল্লা' নামক একজন যুবককে, 'আয়েসা' নাম্নী একটী যুবতীকে ও 'সের খাঁ' গোয়েন্দাকে তাঁহার সম্মুখে আনিতে আজ্ঞা করিলেন। দ্রাসতুল্লা দেখিতে মন্দ নহে। বর্ণ, উজ্জ্বল শ্যাম; চক্ষু দু'টি একটু স্বাভাবিক রক্তবর্ণ—দেখিলেই বোধ হয়, সর্ব্বদা নেশায় বিভোর! চুলগুলি ছোট হইলেও, তাহাতে একটু কোঁকড়ান্ ভাব দেখা যায়। দাড়ির চুলগুলিও ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা। দেহের গঠন দেখিলে, তাহাকে একজন প্রকৃত বলবান বলিয়া বোধ হয়। আর আয়েসা!—আয়েসা সুন্দরী—পূর্ণ যুবতী; বর্ণ যেন দুধে-আলতা-গোলা। মুখখানি দেখিলেই, আর তাহাকে ভাল না বাসিয়া থাকা যায় না। দেহের গঠনও অতি পরিপাটি; বোধ হয়, বিধাতা যেন নির্জ্জনে বসিয়া, সকলের মনোমুগ্ধকারী করিয়াই, তাহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তার পর, সের খাঁ!—তাহাকে দেখিলেই, একজন পাকা বদ্‌মায়েস্ বলিয়া বোধ হয়। চুল লম্বা; গোঁপ-দাড়িতে মুখের অর্দ্ধেক ঢাকা। বুক ও পিঠে খুব ঘন ঘন চুল উঠিয়াছে। দেহ চোয়াড়ের ন্যায়; মুখের ভাব দেখিলে বোধ হয়, সে ভয়ানক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

বিচারক তৎপরে সুরনাথ বাবুকে আনিতে আদেশ করিলেন। সুরনাথ বাবু আসিবা-মাত্র, বিচারক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"দেখ, সুরনাথ বাবু, বিধির বিপাকে পড়িয়া তোমাকে মিছামিছি কষ্ট পাইতে হইল। যেরূপ সাক্ষী-সাবুদে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে তোমাকেই প্রকৃত দোষী মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে, পরমেশ্বরের ইচ্ছায়, যথার্থ দোষী ধরা পড়িয়াছে। কাল এই চিঠিখানি ধরা পড়াতেই, সমস্ত প্রকাশ হইয়াছে। তুমি নির্দ্দোষী, এখন তোমার যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার। ইচ্ছা করিলে, এই পত্রের কথাও তুমি শুনিয়া যাইতে [illegible]"—এই বলিয়া বিচারক উচ্চকণ্ঠে [illegible] চিঠিখানি পড়িতে আরম্ভ করিলেন। চিঠিখানির বাঙ্গালা মর্ম্ম এই:—

"শ্রীযুক্ত সের খাঁ মহাশয় বরাবরেষু। সেলাম জানিবেন। আপনি চলিয়া আসার পরও, আমি 'আস্‌মানিকে' অনেক প্রকারে বুঝাইয়াছিলাম। কিন্তু যখন দেখিলাম, সে কিছুতেই আপনাকে বিবাহ করিতে চাহে না; তখন বুঝিলাম, তাহার অতুল পিতৃসম্পত্তি

কিছুতেই আমাদের হস্তে আসিতেছে না। আর, সেই জন্যই, আপনার শেষ-পরামর্শ-মত তাহাকে খুন করিয়াছি। তবে আপনি যে আস্‌মানিকে গোপনে বধ করিয়া তাহার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থানে স্থানে নিক্ষেপ করিতে বলিয়াছিলেন; আমি কিন্তু ততদূর পারি নাই। তাহার মস্তক ব্যতীত আর কিছুই কাটিয়া আলাহিদা করিতে আমি অবসর পাই নাই। ভাবিয়াছিলাম, গঙ্গার ধারে নিভৃতে লইয়া গিয়া, অন্ধকারে বসিয়া, উহা জলে ডুবাইয়া দিব; আর, তাহাহইলেই, সকল গোল মিটিয়া যাইবে। তবে মাথাটি যে কাটিয়া রাখিয়াছিলাম, সে অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া! এক ভাবনা, যদি লাস কোনরূপে জল হইতে ভাসিয়া উঠে, তাহাহইলে কেহ চিনিতে পারিবেনা; দ্বিতীয়তঃ আপনাকে খুনের নিদর্শন দেখাইতে। আর, তাই অদ্য আপনার বিশ্বাসার্থে সে মুণ্ড আপনার নিকট প্রেরণ করিলাম। আপনি মস্তক দেখিলেই, নিশ্চয় চিনিতে পারিবেন যে, এ'টী কা'র মাথা! আপনার হুকুম-মত তাহার গা' হইতে কোন অলঙ্কারও খুলিয়া লই নাই।

আরও, যে রাত্রে আমি লাশ পাচার করি, সে রাত্রের কষ্টের কথাও তো আপনার অবিদিত নাই! বিশেষ, আপনার শেষ পরামর্শ-মত সেই রাত্রেই আয়েসাকে সরাইয়া এ অঞ্চলে আনা কত কষ্টকর! আয়েসাকে আপনিও তো বিলক্ষণ চেনেন; মদ-মাংস—গান-বাজনা ছাড়া এক [illegible] সে কি স্থির থাকিতে পারে? সেই [illegible]কে ভুলাইয়া আমি এতদূরে—এখানে আনিয়াছি! ভাবুন দেখি, আমার কি বাহাদুরী! এজন্য আমায় কিন্তু প্রতিশ্রুত টাকার দ্বিগুণ না দিলেই চলিবে না! যাইহোক, যত শীঘ্র পারেন, এখন আপনি আমার টাকা পাঠাইয়া দিবেন। এখানে আসিয়া, আমার হাতে আর একটী পয়সাও নাই। বিশেষ, পয়সার অভাবে আয়েসাকে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট না রাখিতে পারায় সেও বড়ই চঞ্চল হইতেছে। আর অধিক কি লিখিব? আপনি শীঘ্রই টাকা পাঠাইয়া দিবেন। বিলম্ব হইলে, আয়েসা যদি চলিয়া যায়, তবে জানিবেন, বড়ই গোল! ইতি তারিখ......সন ১২৯...।

শ্রীদ্রাসতুল্লা। সাং———"

"পুনশ্চ।—আর একটা কথা, জানিতে বড়ই কৌতূহল, সেদিন আমি লাশ ফেলিয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়ার পর, খুনী ধরার আপনি আর নূতন মতলব কি আঁটিয়াছেন? সেই বেচারা সুরনাথ বাবুকেই কি চক্রান্তে জড়াইতে পারিয়াছেন? আসমানীর বদলে আয়েসা, আর আপনার-আমার বদলে কি সুরনাথ বাবুই খুনী সিদ্ধান্ত হইবেন! যাইহোক, এ উত্তরটি পাইতে আমি আরও ব্যগ্র!"—দ্রাস।

বিচারক এই পত্র পাঠ করিয়া সের খাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি এইরূপ খুন করিয়া কতদিন পুলিসের গোয়েন্দাগিরিতে বাহাদুরী লইতেছ! তুমি কি মনে করিয়াছ, পুলিসের লোক বলিয়া তোমার উপর কেহ সন্দেহ করিবেনা? যাইহোক, তুমি পয়সার লোভে এইরূপ কতগুলি খুন করিয়াছ, বল দেখি!"

সের খাঁ কোন কথার উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিল। বিচারক আয়েসাকে তখন আস্‌মানির সেই কাটা মস্তক দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ মাথা যা'র, তাহাকে তুমি চেন কি?" আসমানির সেই কাটা মস্তকটী দেখিয়াই,—"ও আমার ভগ্নী অসমানির মাথা!"—বলিয়াই, চীৎকার করিয়া আয়েসা রোদন করিতে লাগিল। বিচারক তাহাতে বলিলেন,—"এ খুনের পরামর্শের ভিতর তুমিও তো আছ!" আয়েসা বলিল,—"পরমেশ্বর জানেন, আমি এ খুনের বিষয় বিন্দুমাত্র জানি না। তবে যে উহার সঙ্গে গিয়াছিলাম, সে কেবল টাকার লোভে—আর কুহকে পড়িয়া!"

বিচারক তখন আয়েসাকে আর কোন কথাই জিজ্ঞাসা না করিয়া, দ্রাসতুল্লাকে বলিলেন,—“তোমার মত নর-পিশাচ আর তোমাদের দলে কয়টি আছে?” দ্রাসতুল্লা, আর কাহারও নাম প্রকাশ না করিয়া, বলিল,—“মহাশয়, যখন আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে আপনার হাতেই চিঠি ধরা পড়িয়াছে, তখন আর আমাদের কোন কথাই বলিবার নাই। তবে আমার মুখ হইতে আপনি নূতন কথা এইমাত্র শুনুন যে, সুরনাথ বাবুর ভগ্নীপতি আমাদের কিছু টাকা লইয়া তাঁহার বিপক্ষে সাক্ষী দিয়াছেন।”

বিচারক আর মিছা সময় নষ্ট করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া, আয়েসাকে ছাড়িয়া দিলেন। ঘুস লওয়া অপরাধে প্রসন্নের দুই বৎসর কারাবাসের আজ্ঞা হইল; আর, দ্রাসতুল্লা ও সেরখাঁকে বলিলেন,—“তোমাদিগকে ফাঁসী দিলে তোমাদের উপযুক্ত শাস্তি হইবে না। তোমরা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে বাস করিয়া নিজেদের পাপের বিষয় সমস্ত আলোচনা করিয়া অনুতাপ কর; ইহাই তোমাদের উপযুক্ত শাস্তি।”—এইরূপ আজ্ঞা দিয়াই, বিচারক বিচারাসন ত্যাগ করিলেন। আর, সকলেই তাঁহার বিচারে সন্তুষ্ট হইয়া, জয়ধ্বনি করিতে করিতে, গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

সম্পূর্ণ।

নাট্য-চিত্র।

(বিল্বমঙ্গল ঠাকুর, পূর্ণচন্দ্র ও বিষাদ)

(২)

দ্বিতীয়তঃ।—‘পূর্ণচন্দ্র’ নাটকের গল্প।—শালিবান শ্যালকোটের রাজা। ইচ্ছ্রা তাঁহার প্রথমা মহিষী। রাজা বহুদিন অপুত্রক থাকেন। মহিষী ইচ্ছ্রা ভগবান শিবসন্নিধানে অহর্নিশি পুত্র-কামনা করেন। কতদিনে জনৈক সিদ্ধ-সন্ন্যাসী তাঁহাকে আশ্বাস দেন যে, শিব-চতুর্দ্দশী-ব্রত পালন করিলে তিনি পুত্রবতী হইবেন। রাজমহিষীও যথারীতি বর্ষত্রয় উক্ত ব্রত পালন করেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার অভীষ্ট-সিদ্ধ হইল না। রাজারাণী উভয়েই সন্ন্যাসী-বাক্যে বীতশ্রদ্ধ হইলেন। কিছুদিন পরে আবার সেই সিদ্ধ যোগী-পুরুষ উদ্যান-মধ্যে রাজমহিষীকে দেখা দিলেন; জলদ গম্ভীরস্বরে রাণীকে কহিলেন,—“তুমি দেব-বাক্যে অবিশ্বাস করিয়াছ; ইহার মার্জ্জনা নাই। অবশ্য সর্ব্ব-সুলক্ষণ উত্তম সন্তান তোমার হইবে; কিন্তু বিধাতা বিমুখ—পুত্র-লাভ করিয়াও, অশেষ যন্ত্রণা তোমায় ভোগ করিতে হইবে।” তৎপরে নৃপতিকে কহিলেন,—“তোমারও ইহাতে মার্জ্জনা নাই; তুমিও দ্বাদশ বৎসর পুত্রমুখ দেখিতে পাইবে না। ইহার অন্যথা করিলে, তোমাকে অকালে জীবন হারাইতে হইবে।” যথাসময়ে তাঁহারা এক সর্ব্বসুলক্ষণ পুত্ররত্ন লাভ করিলেন। রাজার মঙ্গল-কামনায়, রাজমহিষী দ্বাদশ বৎসর উদ্যানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এ দীর্ঘকালের মধ্যে রাজা একদিনও মহিষীকে দেখিতে পান নাই।

একদিন রাজা মৃগয়ার উদ্দেশে গমন করিতেছেন। পথে এক ভুবনমোহিনী রূপজ্যোতি তাঁহার নয়ন আকৃষ্ট করিল। কামোন্মত্ত রাজা কিছুতেই সে রূপ-তৃষ্ণা বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। তাহাকে রাজধানীতে আনিয়া অতি গোপনে যথাশাস্ত্র বিবাহ করিলেন। কেবল মন্ত্রী-মাত্র এ পরিচয় পাইল। এরূপ গোপন করিবার বিশেষ কারণ এই,—সেই সুন্দরী ঘৃণিত চামার-বংশ-সম্ভূতা। নীচ-কুলে উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলে, সাধারণে অপযশ ঘোষিবে; তাই তিনি এ বিবাহ গোপন রাখিলেন। রাজার এই দ্বিতীয়া মহিষীর নাম লুনা।

যথাসময়ে দ্বাদশ বৎসর উত্তীর্ণ হইল। এই সময়ের মধ্যে, মহিষী, ‘ঈশ্বর মঙ্গলময়’ ও সংসারের কঠোরতা বুঝাইয়া, পুত্রকে বড়ই ধর্ম্মবিশ্বাসী করিয়া তুলেন। যাইহোক, সময় পূর্ণ হওয়ায়, মহিষী ইচ্ছ্রা ও পুত্র পূর্ণচন্দ্র আজ রাজপুরীতে আনীত হইলেন। রাজাদেশ-অনুসারে রাজ-দূত আসিয়া কুমার পূর্ণচন্দ্রকে রাজ-সমীপে লইয়া যাইতে চাহিল। মহিষী ইচ্ছ্রা অনুমতি দিলেন। ধর্ম্মবিশ্বাসী নৃপতি-পুত্র পূর্ণচন্দ্রও, পিতৃ-দর্শন করিয়া, পিতার চরণ বন্দনা করিলেন। এই সময়ে দ্বিতীয়া মহিষী লুনাও কুমার পূর্ণচন্দ্রকে দেখিতে চাহিল। রাজা বিষম ফাঁপরে পড়িলেন। এতদিনে তাঁহার গুপ্ত-বিবাহ সাধারণ্যে প্রকাশিত হইল। তিনি মহিষী ইচ্ছ্রার নিকট এ কারণ মুক্তকণ্ঠে ক্ষমা-প্রার্থনা করিলেন। পতিব্রতা সতীও স্বামীর দোষ গ্রহণ করিলেন না; তিনি হৃষ্টচিত্তে পূর্ণচন্দ্রকে বিমাতার চরণ বন্দনা করিতে অনুমতি দিলেন।

এদিকে লুনা ও তাহার পিশাচ-হৃদয় পিতা জম্বু পূর্ণচন্দ্র-সম্বন্ধে নানা অহিত-চেষ্টা উদ্ভাবন করিল। দারুণ হিংসা-বৃত্তির তীব্র-উত্তেজনায় তাহারা পূর্ণচন্দ্রের বিনাশোপায় চিন্তা করিতে লাগিল। সতীন-পুত্র জীবিত থাকিতে বিমাতার কিছুতেই সুখ নাই, লুনা দৃঢ়রূপে এভাব হৃদয়ে উপলব্ধি করিল। যথাসময়ে পূর্ণচন্দ্র বিমাতার চরণ বন্দনা করিতে আসিলেন। কিন্তু পূর্ণচন্দ্রের অলোক-সামান্য রূপমাধুরি দেখিয়া, পাপিষ্ঠা লুনার মনে পাপ ইচ্ছা বলবতী হইল,—মাতা-পুত্র সম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়া সেই দুর্ব্বৃত্তা পশুবৃত্তি চরিতার্থ করিতে উন্মত্তা-প্রায় হইল। প্রথমে বিনয়-নম্র বচনে—অনুরোধে, শেষে বলপূর্ব্বক পূর্ণচন্দ্রকে আলিঙ্গন করিতে, সেই পাপিয়সী কৃতসংকল্পা হয়। নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র মঙ্গলময় ভগবানকে প্রাণের ব্যাকুলতায় ডাকিতে লাগিলেন। সংসার-প্রবেশের প্রথম দিনে—প্রথম পদক্ষেপে, এই ভীষণ পাপের বিভীষিকাময় দৃশ্য প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া তিনি অধীর হইলেন। ঈশ্বরকে ডাকিতে ডাকিতে “মা—মা” রবে তিনি সেই পাপ কক্ষ হইতে দৌড়িয়া বাহির হইয়া গেলেন।

এইবার পূর্ণমাত্রায় বিষ ধরিল। নির্ম্মম প্রতিহিংসা-বৃত্তি এইবার সাঙ্ঘাতিকরূপে লুনার হৃদয় অধিকার করিল। কারণে কার্য্যের সংযোগ—অগ্নিতে ঘৃতাহুতি! আঘাতিত কাল ভুজঙ্গিনীর ন্যায় লুনা করাল মূর্ত্তিতে আততায়ীকে দংশন করিবার সঙ্কল্প করিল। বেশ্যাসুলভ চাতুরীতে পাপিষ্ঠা লুনা রাজার নিকট ঠিক বিপরীত ভাবে এ ঘটনাটি বিবৃত করিল। অদূরদর্শী সন্দিগ্ধ কামুক রাজা সহজেই সেই কথা বিশ্বাস করিলেন। লুনার অভিপ্রায়ানুসারে পূর্ণচন্দ্রকে অন্ধকূপে ফেলিয়া বধ করাই যুক্তি হইল। মহিষী ইচ্ছ্রা বিস্তর বাধা দিলেন; অনুরোধ করিলেন; ন্যায়সঙ্গত বিচার প্রার্থনা করিয়া পুত্রের নিষ্কলঙ্ক চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিতে যত্নবতী হইলেন। কিন্তু তাঁহার কোন চেষ্টাই ফলবতী হইল না। এইবার ইচ্ছ্রার ‘সর্ব্ব-মাঙ্গল্যে বিশ্বাস’ টলিল। পূর্ণচন্দ্র কিন্তু মাতাকে বুঝাইলেন; কহিলেন,—“এসংসার পরীক্ষার স্থল। ঈশ্বর অবশ্যই মঙ্গলময়; তিনি যাহা করেন, মঙ্গলের জন্যই। অতএব মা, বিশ্বাস হারাইও না।” অর্থাৎ অমানুষী বিশ্বাস-বলে বলীয়ান পূর্ণচন্দ্রের হৃদয় ইহাতেও কিন্তু ক্ষণকালের জন্য বিচলিত হইল না। তিনি মুক্তকণ্ঠে মঙ্গলময়ের মহিমা গান করিতে করিতে কূপে নিক্ষিপ্ত হইলেন।

ইহার অব্যবহিত পরেই, গোরক্ষনাথ (শি-- অবতার) সশিষ্য সেই স্থানে উ-সমান, এবং তাঁহার জনৈক শিষ্য ক আর; আনিতে গিয়া অস্ফুট কাআর কোথা আমি, পান। পরে গোরক্ষনাথের গা সংসার! পূর্ণচন্দ্রকে উত্তোলন ক রই সুশ্রূষায় পূর্ণচন্দ্র, ———

গোরক্ষনাথ এইরূপে পূর্ণচন্দ্রের প্রতি সদয় হইলেন। পূর্ণচন্দ্রের সদ্গুরু লাভ হইল; তিনি সংসারের নশ্বরতা উপলব্ধি করিয়া, যৌবনেই গুরু গোরক্ষনাথের নিকট যোগ-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।

পঞ্চনদস্থ স্বাধীন-রাজ্যের রাণী সুন্দরা দেবী, কুমারী থাকিয়া, জনৈক সহচরী-সমভিব্যাহারে ছদ্মবেশে নানা দেশ পর্য্যটন করেন। মনোমত স্বামী-লাভে বঞ্চিতা হইয়া, সুন্দরা এযাবৎ-কাল অবিবাহিতা থাকেন। এখন, অন্তর্য্যামী গোরক্ষনাথ, প্রিয় শিষ্য পূর্ণচন্দ্রের পরীক্ষার্থে, কৌশলে সুন্দরার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। কিন্তু যাহার প্রাণ প্রকৃতই ভগবানের প্রতি টলিয়াছে, তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করে কা'র সাধ্য? কামিনী-কাঞ্চনের সম্পূর্ণ প্রলোভনেও, পূর্ণচন্দ্রের হৃদয় কিছুতেই টলিল না। তিনি কিছুদিনের জন্য সংসারযোগী হইলেন বটে; কিন্তু অবশেষে কোন প্রকারে সুন্দরার নিকট হইতে বিদায় লইয়া, আবার গুরুপদ-সেবায় নিযুক্ত হইলেন। পতিপ্রাণা সতী সুন্দরা, স্বামী-সহবাসে বঞ্চিতা হইয়া, হিন্দু-স্ত্রীর কর্ত্তব্যানুসারে শাশুড়ির পদ-সেবা করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি অবগত ছিলেন যে, রাজা শালিবান দ্বিতীয়া মহিষীর কূট মন্ত্রণায় পুত্রকে অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত করিয়া, প্রথমা মহিষীকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন; আর, অভাগিনী অন্ধ ও পাগলিনী হইয়া তথায় অতি কষ্টে কালাতিপাত করিতেছেন। সুতরাং তিনি শ্যালকোটে আসিয়া, দূত-দ্বারা রাজ-সকাশে প্রচার করিয়া
দ্বিতীয়ার্ত্ত॰ সে ভয় তিনি প্রথমা মহিষীকে কারাগার
শালিবান শ্যালকোতি দেন,—নয় রাণী সুন্দরা
তাঁহার প্রথমা মহিষী। যুদ্ধে আহ্বান করিবেন।
ত্রক থাকেন। মহিষী ই কারণে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা
সন্নিধানে অহর্নিশি পুত্র- ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়া-
কতদিনে জনৈক সিদ্ধ-সন্নসুতরাং সহজেই সন্ধি-
দেবী তখন ছদ্মবেশে,

স্বয়ং দাসী-ভাবে, উদ্যান-বাটীতে শাশুড়ী ইচ্ছার সেবা করিতে লাগিলেন।

পাপের শেষ দৃশ্য অতি ভয়ঙ্কর। দুরাকাঙ্ক্ষার বশে সকলই সম্ভবে। পাপীয়সী লুনা অত্যপর তাহার পিতার সহিত পরামর্শ আঁটিয়া, রাজাকে বিষ-প্রদানে হত্যা করিতে সঙ্কল্প করিল। ইতিপূর্ব্বে পাপিষ্ঠা লুনা গোরক্ষনাথের জনৈক শিষ্য সেবাদাসের সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হয়। সেবাদাস নানাবিধ বিষ প্রস্তুত করিতে জানিত। সেই বিষের গুণ এই যে, তাহা পান করিলে দুই, চারি বা ছয় মাসে ক্রমশঃ শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া মানুষের প্রাণনষ্ট হয়। জম্বুর পরামর্শানুসারে লুনা একদিন সেই বিষ-বটিকা অপহরণ করিয়া রাজাকে প্রদান করে; আর, রাজা সেই বিষে ক্রমশঃ জর্জ্জরিত হইতে থাকেন। অধিকন্তু, বিষ চুরী করায় সেবাদাস ক্রোধান্ধ হইয়া, তপ্ত লৌহ-শলাকায় লুনার পৃষ্ঠদেশে "চোর" নাম অঙ্কিত করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। যাইহোক, রাজা শালিবান এখন এই বিষের জ্বালায় জর্জ্জরিত! বেশ্যার চতুরীতে পড়িয়া আজ তাঁহার প্রাণ কণ্ঠাগত-প্রায়! দেশ-দেশান্তর হইতে কত বৈদ্য, কত চিকিৎসক আসিতেছে; কিন্তু কেহই রোগের কারণ নির্ণয় করিতে পারিতেছে না।

ক্রমে ভগবান্ গোরক্ষনাথের মর্ত্তলীলা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। শিষ্য পূর্ণচন্দ্রের দ্বারা পৃথিবীতে 'যোগ-ধর্ম্ম' প্রচার হইতেছে বুঝিয়া, তাঁহার কার্য্য তিনি শেষ করিয়া আনিলেন। তিনি সশিষ্যে পরে শ্যালকোটে উপনীত হইয়া নগর-প্রান্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অন্তর্য্যামী গোরক্ষনাথ পূর্ণচন্দ্রকে তাঁহার সমস্ত বুঝাইয়া দিলেন। পূর্ণচন্দ্র অবধূত-বেশে সমবেত রোগীদিগকে ঔষধ দান করিতে লাগিলেন। ঔষধের আশ্চর্য্য গুণে মুহূর্ত্ত মধ্যে সকলেই সুস্থ হইতে লাগিল। অনতি-

দীর্ঘকাল-মধ্যে এ সংবাদ রাজার কর্ণগোচর হইল। তিনি পারিষদাদি সমভিব্যাহারে অবধূতের নিকট উপস্থিত হইয়া, ঔষধ সেবন করিলেন; এবং ঔষধের অপূর্ব্ব গুণে তৎক্ষণাৎ তাঁহার নব-জীবন লাভ হইল। সঙ্গে লুনা ও তাহার পিতা জম্বু তথায় উপস্থিত ছিল। শালিবান লুনাকে পুত্র-বর চাহিতে অনুমতি করিলেন। অবধূত তখন, প্রথম পুত্র পূর্ণচন্দ্রের কথা রাজার স্মৃতিপথে উদয় করিয়া দিলেন; এবং পরস্পরের কথা-প্রসঙ্গে ক্রমে সত্য বাহির হইয়া পড়িল। পূর্ণচন্দ্রের নির্দ্দোষিতা উপলব্ধি করিয়া, রাজা তখন "হা পুত্র—হা পুত্র" বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। শেষে পিতা-পুত্রে মিলন হইল। পাপিষ্ঠা লুনা নিজমুখে আপন পাপ স্বীকার করিল; এবং সেবাদাসের উক্তিতে সমস্ত রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িল। চতুর্দ্দিকে "জয় জয়" ধ্বনি আকাশ-মার্গ ভেদ করিল। মহিষী ইচ্ছা, পতিব্রতা সুন্দরা সকলেই তখন উপস্থিত হইলেন; এবং বহু বিপদের পর, এই আনন্দ-মিলনে সকলেই সর্ব্বমঙ্গলময় ভগবানের প্রতি জয়ধ্বনি করিয়া হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। লুনা, জম্বু প্রভৃতি সকলেই তখন স্ব স্ব পাপকার্য্যের প্রতিফল—প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিতে লাগিল।

এইটুকুই এ নাটকের মূল গল্প-অংশ। দামোদর প্রভৃতি আরও কয়েকটি চরিত্রের পূর্ণ-বিকাশে এ নাটকখানির পরিসমাপ্তি হইয়াছে। গ্রন্থকারের প্রতিভায় তাহা বড়ই সুন্দর ফুটিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে 'ভারতীতে' এ গল্পটি প্রকাশিত হইয়াছিল।

শৈশব-স্মৃতি।

মনে পড়ে সখি, শৈশবের কথা
কেমন মধুর অতি;
মধুর স্বপন, মধুর মিলন,
মধুর জ্যোৎস্না রাতি।
পরিমল ভরে, ফুটিত কুসুম,
ছুটিত মধুর বাস;
ঘুমন্ত চন্দ্রমা, ঢালিত কিরণ,
হাসিত মধুর হাস।
কুলায় বসিয়া, বনের বিহগ,
ছাড়িত মধুর তান;
ঘুম-ঘোর-ময় সুখের আবেশে,
বিভোর হইত প্রাণ।
নিঝুম নিশীথে, যমুনা-পুলিনে
বাঁশরী বাজিত সই;
সুখের জীবন, সুখের স্বপন,
কি এক পিরীতি ওই।
ছিলনা তখন, মান-অভিমান,
ছিলনা মলিন মুখ;
ছিলনা বেদন, ছিলনা রোদন,
ছিলনা প্রাণের দুঃখ।
সাঁজে-সকালেতে, বকুল-তলায়,
গেঁথেছি ফুলের মালা;
পরাণ খুলিয়া, গেয়েছি গান,
জুড়াতে প্রাণের জ্বালা।
তুমি আমি সই, আরো কত জন,
ছিনু সবে এক ঠাঁই;
প্রাণে-প্রাণে বাঁধা, যেন মালা-গাঁথা
এক সূত্রে ভাই ভাই।
কত কথা তবে, হয়েছিল মনে,
যাইব, চাঁদের দেশ;
তারা ধরে আনি, গাঁথিব মালিকা,
দেখিব, পৃথিবী-শেষ।
সে সব এখন, স্বপন-সমান,
কি বলিব সখি আর;
কোথা আছ তুমি, আর কোথা আমি,
এই কি গো সংসার!

খোস খবর।

ধর্ম্মের ধ্বজা।

রবিবার। ব্রাহ্ম-সমাজে ভারি ধুম। চারিদিকে লোকে লোকারণ্য। নীচের বেঞ্চি-সকল পুরিয়া গিয়াছে—তিলার্দ্ধও স্থান নাই।

বেদীর দুইপার্শ্বে কাঠগড়ার ভিতর, উচ্চ-শিক্ষা এবং স্বাধীনতা-প্রাপ্তা স্ত্রীলোকগণের বসিবার স্থান। স্থানটি অনাবৃত। দুই চারি জন বদ-মতলব-ওয়ালা ছেলে-ছোক্‌রার দল সকাল সকাল আসিয়া বেদীর সম্মুখস্থিত বেঞ্চিগুলি দখল করিয়াছে। উপাসনা প্রভৃতি তাহাদের যাহা উদ্দেশ্য, ঠিক সম্মুখে না বসিলে, সে সকল কার্য্যে বড় সুবিধা হয় না। তাই তাহারা সকাল সকাল আসে!

হঠাৎ একদিন, মুদিত-নেত্র একটি দাড়ী-ওয়ালা বাবু ঐরূপ একজন ছোকরাকে, স্থির দৃষ্টে কি জানি কোন দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া, যেন অত্যন্ত বিরক্ত-ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি ওদিকে চাহিয়া আছ যে, অসভ্য ছোকরা!"

মৃদু হাসি হাসিয়া, তখন সেই ছোকরা উত্তর করিল,—"তুমি তাহা দেখিলে কি করিয়া—তুমি তো বরাবরই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া আছ?"

এই-ই তো বন্ধু!

রামচন্দ্র সিংহ, হরিদাস রায়কে ৫০৲ টাকা কর্জ্জ প্রদান করেন। হারাণচন্দ্র তাহাতে সাক্ষী ছিলেন। দুইবৎসর অতীত হইলে পর, রামচন্দ্র সিংহ হরিদাসের নিকট উক্ত টাকা চাওয়ায়, হরিদাস উত্তর দিলেন—"আমি তোমার টাকা ধারি না।"

রামচন্দ্র অবাক-চিত্তে হারাণচন্দ্রের নিকট আসিয়া, সমস্ত কথা বিবৃত করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভাই! আমি তো নালিস্ করিতে চলিলাম! কিন্তু তোমায় তো সাক্ষী দিতে হইবে! নহিলে আমার টাকার উদ্ধারের আর কোন উপায় দেখি না।"

হারাণচন্দ্র মৃদু-হাসি হাসিয়া উত্তর দিলেন,—"তা'তো বটেই—তা'তো বটেই! বন্ধুর কায করা অবশ্য উচিত! কিন্তু কিছু না পেলে আমি কেমন করে একাজ করি—সুধু হাত কি মুখে উঠে!"

রামচন্দ্র।—"কেন ভাই! তুমি তো আর মিথ্যা-সাক্ষী দিচ্চো না যে, তোমায় আমি কিছু দেবো! তুমি সত্য কথা বল্‌বে—এক-জনের উপকার হবে—"

বাধা দিয়া, হারাণচন্দ্র কহিলেন,—"তা'তো বটেই—তা'তো বটেই! তবে কি জান ভায়া! আমিও তোমার গে বন্ধুর কায করবো, আর তুমিও আমার গে বন্ধুর কাজ ক'রো! আমার কোন মতে দিন-গুজরাণ করা তো চাই? তোমরা পাঁচজন বন্ধু লোক দুই চারিটা ক'রেও রুপোর চাক্তি যদি আমায় মাসে মাসে ফেলে দাও, তা'হলেও তো তোমাদের বেশ বন্ধুর কাজ করা হয়! কিন্তু তা'তো তোমরা করবে না? আমি যে খেতে পাই না, তা'কি তোমরা দেখ্‌তে এস? আজ বিপদে পড়েছ, তাই কেঁদে এসে পড়েছ। নইলে এদিক মাড়াও কি? তা, ভাই, আমায় গুটি দশেক টাকা যদি দাও, তবে আমি ঠিক সাক্ষী দিতে পারি। নচেৎ নয়!"

রামচন্দ্র ভাবিলেন,—হারাণ ঠাট্টা করি-তেছে। অতএব উত্তর দিলেন,—"তুমি কি ভাই দশ টাকার উপযুক্ত? তোমায় আমি দু'টী টাকা দেব; কেমন?"

হারাণ।—"বেশ! আমিও দু'টী টাকার মত কাজ করবো! 'যত গুড় দেবে, তত মিষ্ট হবে', একটা কথা আছে জান তো?"

রামচন্দ্র নিশ্চিন্ত হইয়া উঠিয়া গেলেন। ভাবিলেন,—"অনেক দিন, কাজ-কর্ম্মে ব্যস্ত ছিলাম বলিয়া, হারাণের কাছে আমিতে

পারি নাই; তাই ঠাট্টা করিতেছে। আবার দু'চার দিন আনাগোনা করিলেই সব হইবে!"

* * * *

নির্দ্ধারিত দিবসে মকর্দ্দমা উঠিল। রাম-চন্দ্র হারাণচন্দ্রকে লইয়া আদালতে গেলেন। হারাণচন্দ্র টাকা চাহিলেন; রামচন্দ্র অগত্যা দুইটি টাকা তাঁহার হস্তে দিলেন। আর, তখন ভাবিলেন,—"এতো দেখ্‌চি, ঠাট্টার কথা নয়! এযে দেখ্‌চি, সত্য সত্যই হাত-পেতে টাকা নিলে! যাইহোক, তা' আর ভাব্‌লে কি হ'বে? যাক্, দু'টো টাকার উপর দিয়েই যাক্; এখন্ সাক্ষী তো দেবে? দুটো টাকায় যদি ৫০৲ টাকার কাজ পাওয়া যায়, তবে মন্দ কি? কিন্তু সে দিন বলেছিলো,—'দু'টাকা দাও, দু'টাকার মত কাজ করবো'; শেষকালে মকর্দ্দমা খারাপ ক'রে দেবে না তো?" এইরূপ নানাপ্রকার ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে, রামচন্দ্র হারাণচন্দ্রকে লইয়া আদালত-গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন।

মকর্দ্দমার ডাক হইল। দুই ধারে দুই-পক্ষের দুইজন উকিল দেখা দিলেন। হরিদাস রায় আপনার দেনা অস্বীকার করিলেন।

তখন সাক্ষী শ্রীমান হারাণচন্দ্রের ডাক হইল। হারাণচন্দ্র কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান হইলেন। হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি রামচন্দ্র এবং হরিদাস বাবুর বিষয় কিছু অবগত আছ?"

হারাণচন্দ্র তখনও একবার রামচন্দ্রের দিকে ফিরিয়া কি ইঙ্গিত করিলেন। কিন্তু অধম রাম তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। সুতরাং হারাণচন্দ্র হাকিমের প্রশ্নে উত্তর দিলেন,—"আজ্ঞে, হাঁ ধর্ম্মাবতার! আমি টাকা দিতে দেখিয়াছি।"

প্রশ্ন।—"কয়টি মুদ্রা দেওয়া হইয়াছিল?"

হারাণচন্দ্র আর একবার রামচন্দ্রকে ইঙ্গিতে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, যদি এখনও তিনি বেশী টাকা দেন, তাহা হইলেও সুশৃঙ্খলায় মকর্দ্দমা নিষ্পন্ন হইয়া যায়। কিন্তু রামচন্দ্র তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না, অথবা বুঝিতেই পারিলেন না! কাজে কাজেই হারাণচন্দ্র হাকি-মের প্রশ্নে উত্তর প্রদান করিলেন,—"আজ্ঞে, ধর্ম্মাবতার! পাঁচটি দেওয়া হইয়াছিল।"

রামচন্দ্র এই কথা শুনিয়া একপ্রকার মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। হারাণচন্দ্র আবার ইঙ্গিত করিলেন। তাহার মর্ম্ম এই যে,—"এখনও তোমায় আমি বাঁচাইতে পারি। কিন্তু আমায় দশটি টাকা দিতে হইবে।"

রামচন্দ্র অগত্যা ভিড়ের ভিতর আসিয়া, কাঠগড়ার মধ্য দিয়া, হারাণচন্দ্রের হস্তে এক খানি দশ টাকার নোট গুঁজিয়া দিলেন। হারাণচন্দ্রও সন্তুষ্ট হইলেন।

অতঃপর, হাকিম কহিলেন,—"যিনি নালিশ করিতেছেন, তিনি বলিতেছেন,—'৫০৲ টাকা ধার দিয়াছেন'; আর তুমি, তাঁহার সাক্ষী হইয়া, বলিতেছ—'পাঁচটি!' এ কিরূপ হইল?"

হারাণচন্দ্র।—"ধর্ম্মাবতার! যাহা বলিয়াছি, একটিও মিথ্যা নহে। রামচন্দ্র বাবু হরিদাস বাবুকে যথার্থই 'পাঁচটি' বই একটিও অধিক ধার দেন নাই। তবে উক্ত পাঁচটির মধ্যে তিনটি লাল মুদ্রা, আর দুইটি সাদা!"

হাকিম।—"সে কিরূপ?"

হারাণ।—"আজ্ঞে, তিনটি মোহর, আর দুইটি টাকা।"

বিচার বটে!

যমরাজের সভায় আজ মহা ভিড়—ভারি সরগরম্! তিন চারি জন বড় বড় দেবতা বিচারপতি হইয়া বসিয়াছেন; আর, পাঁচ সাত জন ছোটখাট মাঝারি গোছের দেবতা জুরী সাজিয়া বসিয়াছেন। আজ সভায় মহাবিচার—ভারি ব্যাপার! দুইধারে দুইজন আসামী দণ্ডায়মান। একজন খুনী; আর একজন বটতলার লেখক। সাব্যস্ত করিতে হইবে, কে অধিক দোষী!

অনেক তর্কবিতর্কের পর, জুরীদিগের মতামত জানিয়া যমরাজ বিচার করিলেন—"যে খুনী, তাহাকে সাত বৎসর নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। আর, যে বটতলার লেখক, সে অনন্তকাল নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিবে।"

বটতলার লেখক তখন অন্যায় বিচার হইতেছে ভাবিয়া, যোড়করে ধর্ম্মরাজের নিকট প্রার্থনা করিল,—"হুজুর! যে খুনী, তাহাকে আপনি সামান্য দণ্ড দিলেন। আর আমি নির্দ্দোষী, আজীবন বটতলায় ।০ চারি আনা ।/০ পাঁচ আনায় এক এক বৃহৎ ফর্ম্মা লিখে' অতি কষ্টে দিনপাত ক'রেছি; আমার কি অপরাধ ধর্ম্মাবতার, যে অনন্তকাল আমায় নরকে থাকিতে হইবে?"

যমরাজ উত্তর করিলেন—"দেখ, যে খুনী, সে কেবল একটাই খুন করিয়াছে। কিন্তু তুমি এক এক খানি বই লিখিয়াছ, আর 'বঙ্গ-ভাষার' সঙ্গে সঙ্গে, শত সহস্র নর-নারীকে খুন করিয়াছ। তোমার মত মহাপাতকী কি আর আছে?" তখন, ইঙ্গিতমাত্রেই যমদূতগণ বটতলার লেখককে গুঁতা দিতে দিতে নরকে লইয়া গেল।

পুলিসের অসীম কীর্ত্তি!

পুলিস বড়ই ভয়ঙ্কর চিজ! পুলিস না করিতে পারেন, দেখিতেছি,—এমন আর কিছুই নাই! শুনিয়া পেটের ভিতর হাত-পা সেঁধোয়—মনে হয়, আবার গিয়া মাতৃ-গর্ভেই বাস করি। এত গৌরচন্দ্রিকা, বড় অল্প ক্ষোভে নহে; দেখুন পাঠক, নিম্নে পড়িয়া, কি ফাঁদ পাতিয়া, পুলিস কি কাণ্ডই না করিয়াছেন।

"১৮৮৬ সালে কোন যোগ-উপলক্ষে সারণের জাহ্নবী-তীরে এটা-জেলার দাল নামক জনৈক অধিবাসী সস্ত্রীক স্নানার্থ আগমন করে। যোগে বহুলোক ভাগীরথীতে স্নানার্থ আগমন করিয়াছে; বৃহৎ মেলা বসিয়াছে; জনতার একশেষ! কে কাহার অনুসন্ধান রাখে, তাহার স্থিরতা নাই। সকলেরই চেষ্টা, কোনরূপে গঙ্গা-স্নান করিয়া, পুণ্যার্জ্জন করিবে। দাল ও তাহার স্ত্রী সেই ভীষণ জনতা-স্রোতে মিশিল। কিয়ৎক্ষণ তাহারা একত্রে ছিল; কিন্তু সেই লোক-সাগরের মধ্যে উভয়ের হস্ত উভয় হইতে বিচ্যুত হইল—লোকের তরঙ্গে উভয়কে ঠেলিয়া দূরে লইয়া গেল। সেই মহা লোকারণ্যের মধ্যে দালের স্ত্রী হারাইয়া গেল।

জনতায় সকল শ্রেণীর লোক আছে; কেহ সু, কেহ কু; কেহ সাধু, কেহ পাপী; কাহারও লক্ষ্য পুণ্যার্জ্জন, কাহারও লক্ষ্য পাপ-সাধন। দালের স্ত্রী স্বামী হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়া চারিদিকে স্বামীর অন্বেষণ করিতে লাগিল; দালও স্ত্রীর জন্য সেই মহাজনতা মথিত করিতে লগিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পরস্পরের সহিত পরস্পরের আর মিলন হইল না। দালের স্ত্রীকে অসহায়া অবস্থায় নিরীক্ষণ করিয়া, জনৈক দুষ্ট আড়কাটী স্বীয় কৌশল-জাল বিস্তার করিল। দালের স্ত্রী সেই আড়কাটীর কৌশল-জালে পড়িল। সে কুলী-রমণীরূপে পরে আমেরিকার নিকটবর্ত্তী এক দ্বীপে প্রেরিতা হয়।

এদিকে দাল ভাবিল, তাহার স্ত্রী তাহাকে অন্বেষণ করিয়া না পাইয়া হয়ত গঙ্গা-স্নান করতঃ কোন আত্মীয়-কুটুম্বের বাড়ী গিয়া থাকিবে। এই মনে করিয়া, দালও স্বয়ং ত্বরান্বিত হইয়া স্নান-সমাপনান্তর যেখানে যেখানে তাহার স্ত্রীর গমনের সম্ভাবনা ছিল, সেই সেই স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার স্ত্রী কোথায়? দাল বৃথা অন্বেষণ করিল। তখন দাল ভাবিল, বোধ হয় স্ত্রী বাড়ী গিয়া থাকিবে। সুতরাং দ্রুতপাদবিক্ষেপে সে স্বীয় বাটীর অভিমুখে চলিল। কিন্তু বাটীতে আসিয়া দেখিল, গৃহ শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে; স্ত্রী বাটীতেও প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই। দালের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল।

দালের স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজনদিগের সহিত দালের বিবাদ ছিল। তাহারা যখন এই বার্ত্তা শ্রবণ করিল, তখন তাহারা পুলীষে যাইয়া অভিযোগ উপস্থিত করিল যে, দাল বিষ-প্রয়োগে পত্নি-হত্যা করিয়াছে। পুলীষ ইহাই ত চাহে! একটা এইরূপ খুন-ডাকাইতির অভিযোগ না পাইলে, পুলীষ-কর্ম্মচারিদিগের উদরপূর্ণ বা নাম-জাহিরের সুবিধা হয় কৈ? পুলীষ এই সংবাদ পাইয়া দালের বাটীতে যাইয়া দালকে গ্রেপ্তার করিল; তাহার বাড়ী খানাতল্লাসী হইল। হতভাগ্য দাল, পত্নীর বিচ্ছেদে একে জীবন্মৃত; তাহার উপর আবার এই অভাবনীয় বিপদপাত! সে একেবারে হতভম্ব হইয়া গেল। পুলীষ সাক্ষ্য প্রস্তুত করিয়া দালকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট চালান দিল।

ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচার। দাল হত্যাপরাধে অভিযুক্ত। পুলীষ ও দালের শ্বশুর-সম্পর্কীয় ব্যক্তিরা দালের বিপক্ষে সাক্ষী। পুলীষ সমস্ত তদন্তের বৃত্তান্ত বলিয়া, এক প্রস্তর বাহির করিল। পুলীষ বলিল, 'এই প্রস্তর দালের বাটী হইতে বাহির হইয়াছে, এবং দাল ঐ প্রস্তরে বিষ বাটিয়াছিল।' মাজিষ্ট্রেট পুলীষের নিকট হইতে এই সকল অকাট্য প্রমাণ পাইয়া দালকে ফৌজদারী-সোপর্দ্দ করিলেন। ইহার পর দায়রার বিচারে, সেশন-জজ সমস্ত অবগত হইয়া যখন দেখিলেন যে, দালের বিপক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছুই নাই, তখন তিনি দালের প্রতি জীবন-দণ্ড না করিয়া আজীবন দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা করেন। পুলিসের কৌশলে, ইংরাজ-বিচারকের বিচারে, নির্দ্দোষী দালের উপর এইরূপ দণ্ড-বিধান হইয়া গেল।

দুই বৎসরের অধিক কাল হইল, দাল আন্দামান দ্বীপে বাস করিতেছে। দালের পত্নী যে দ্বীপে কুলীরূপে গিয়াছিল, এই বৎসর দালের গ্রামের একজন লোক সেই দ্বীপে গমন করিয়াছিল। সে লোকটা দালের পত্নীকে চিনিত। সে দালের পত্নীর ন্যায় একটী রমণীকে তথায় দেখিয়া, তাহাকে পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করে। দালের পত্নীও তাহাকে চিনিতে পারিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে; এবংপরে, সে স্বামীর অবস্থা শুনিয়া অত্যন্ত শোকাকুলা হইয়াছে। দালের স্বগ্রামবাসী এক্ষণে তত্রত্য গভর্ণরের নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া এক আবেদন প্রেরণ করিয়াছে। গভর্ণর আবার এটার ম্যাজিষ্ট্রেটকে এ বিষয় উল্লেখ করিয়া এক-পত্র লিখিয়াছেন। এটার ম্যাজিষ্ট্রেট ফরক্কাবাদের সেশন-জজের নিকট এ ঘটনা বলিয়া পাঠান। তিনি এক্ষণে এ ব্যাপার তদন্ত করিতেছেন। ফরক্কাবাদের সেশন-জজের রেকর্ডে দালের মকর্দ্দমার কোন নথিপত্র পাওয়া যায় নাই। ১৮৮৬ সালে এটা-জেলার ভার আলিগড়ের সেশন জজের উপর ছিল। এক্ষণে আলিগড়ের সেশন-জজের আদালতের নথিপত্র অনুসন্ধান করা হইতেছে।"—সময়।

এইরূপ হাবড়ার সেই ঈশ্বর নাপিতের মকর্দ্দমার কথাও, অনেকদিন হইল, পাঠক শুনিয়াছিলেন। আর আজ দেখুন, এই আর এক চিত্র। রহস্য বাহির হইয়া পড়িয়াছে; তাই আজ আপনারা জানিতে পারিলেন—জানিয়া, চোখের জল চোখেই ঢাকিলেন। নতুবা ভাবুন দেখি, এরূপ ব্যাপার, আমাদের চক্ষের আড়ালে, আরও কত না ঘটিতেছে! ভগবান, এসব ষড়যন্ত্রকারীদের কি আর দণ্ড নাই! যাইহোক, এখনও গভর্ণমেণ্ট এঘটনার সম্পূর্ণ তত্ত্ব লউন; আর, তত্ত্ব লইয়া, যাহারা এ চক্রান্তে লিপ্ত, তাহাদের উচিত শিক্ষা দেন। নতুবা যদি ঈশ্বর বলিয়া এক-জন কেহ আছেন মানিতে হয়, তবে এ পাপে যে তাঁহার নিকট কি শাস্তি পাইতে হইবে, তাহা বলা যায় না।

মতামত।

পুস্তক-সম্বন্ধে।

ইলা ও প্রমীলা।—দুইখানি উপন্যাস। এ উপন্যাস দু'খানি একজনেরই প্রণীত; দেখিতেও একই রকম। আকার-আস্‌বাব দু'খানিরই সুন্দর—অনেকটা বিলাতী-ধরণের অনুকরণে। বিশেষ, দু'খানির মুখপাতেই সুন্দরী 'ইলা' ও 'প্রমীলার' মূর্ত্তি—মলাট-দেশ সুশোভিত! তবে লেখকের বাহাদুরী যে, আকার-অবয়ব-গত এতটা সামঞ্জস্য সত্বেও, ভিতরের লেখায় কিন্তু অনেকটা 'মার-প্যাঁচ' আছে—ইলা-প্রমীলায় যেন ঢের পার্থক্য! এক কথায়, যদি পরিচয় না পাইতাম, তবে দু'খানি যেন দু'হাতের লেখা বলিয়াই মনে হইত। কারণ, ইলা এ দেশের ঘটনা; তাহাতে কতকটা বিদেশী গন্ধ থাকিলেও, ইলার ধরণ-ধারণ—চাল-চলন অনেকটা বাঙ্গালা পুস্তকেরই মত। কিন্তু প্রমীলা—এ যেন পুরা ইংরাজী; পার্থক্য, বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপা। ইলায় সুখ্যাতি করিবার অনেকটা আছে; কিন্তু প্রমীলায় দেখিতেছি, নিন্দা করিবার জিনিসও ততটা। 'প্রমীলায়' হিন্দুকুলের কুল-

নারী—সুন্দরী ষোড়ষী যুবতী, অনায়াসে একজন অপরিচিত ডিটেক্‌টিভের গলা ধরিয়া প্রেম করিতে পারে; কখনও সাপ, কখনও বিড়াল, কখনও কুকুর সাজিয়া, ডিটেক্‌টিভও অকার্য্য সাধন করিতে পারেন—যদিও মানুষ তিনি! কথায় কথায় বন্দুক-চালান, কথায় কথায় লম্ফ-ঝম্প, কথায় কথায় হামাগুড়ি—হায় হায়!—আবশ্যক পড়িয়াছে বলিয়াই কি, এতটা করাইতে হয়! ইংরাজের দেশে—বিলাতী নভেলে, এ সকল শোভা পাইলেও পাইতে পারে! কিন্তু বাঙ্গালা-দেশে বাঙ্গালীর ছবি এরূপ তো কখনও শুনিও নাই—দেখা তো দূরের কথা! বাঙ্গালীর মেয়েও অতটা পুরুষের বাবা, এ চিত্রও যেন আর না দেখিতে হয়! এতটা যে বলিলাম, তজ্জন্য গ্রন্থকার কিছু মনে করিবেন না। অন্যে—নবীন লেখকের কাঁচা হাতে এরূপ জিনিস বাহির হইলে, আমরা এতটা বলিতাম না। তবে আপনার লেখায় অনেকটা রস পাইয়াছি—পড়িতে পড়িতে অনেক সময় তন্ময়ত্ব হইতে হইয়াছে; তাই এত কথা বলিলাম। আপনার ক্ষমতা আছে, পছন্দ আছে, সখ আছে, চেষ্টা আছে; কিন্তু তৎসঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিলে, আরও সুখী হইতাম। আর, তাই এতটা বলিলাম। তাড়াতাড়ি—মাসে মাসে এক একখানি পুস্তক না লিখিয়া, ভাবিয়া-চিন্তিয়া লিখিলে, আপনি অনেক উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন, ভরসা হয়।

চিকিৎসা-পরিচয়।—ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরিদাস চক্রবর্ত্তী-প্রণীত। অধিকাংশ হোমিওপ্যাথিক মতের ঔষধ ব্যবহারে—কতকটা টোট্‌কা-টুট্‌কী-মুষ্টিযোগের সাহায্যেও, অন্যূন দেড় শত প্রকার পীড়ার চিকিৎসা-উপায়, এই পুস্তকে লিখিত আছে। পথ্যাপথ্য-নির্ব্বাচন, ঔষধের ক্রম-মাত্রা, শরীরের স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্যের সম্বন্ধেও অনেক উপদেশ, এ পুস্তকে পাওয়া যায়। ফলতঃ দেখিয়া বোধ হইল, পুস্তকখানি যেরূপ উপকারী, তাহাতে যদিও আজকালকার বোলবোলাও-পূর্ণ জমজমাট বিজ্ঞাপনের বাজারে ইহার বেশী বিক্রয় না হয়, তথাপি ইহা যে অনেকেরই উপকার আসিবে, তাহা বলা বাহুল্য। হাতুড়ে ডাক্তার ও পল্লীগ্রামবাসী শিক্ষিত পরিবারের পক্ষেও এ পুস্তকখানি উপকারে আসিবে। বিশেষ, দামেও সস্তা। তবে গ্রন্থে দোষও যে কিছু নাই, এরূপ নহে। কিন্তু গ্রন্থকার নূতন লেখক—তুলনায় সে দোষ অনেক কম। সুতরাং তাহা আর বলিতে চাহি না।

অপূর্ব্ব-দর্শন।—শ্রীযুক্ত মোজাম্মেল হক প্রণীত। এখানি একখানি ক্ষুদ্র কাব্য। 'দিল্লীশ্বর কেকোবাদ ও তৎপিতা বাবরের সাক্ষাৎ'—এই ঘটনা লইয়া, এখানি রচিত। লেখক মুসলমান হইলেও, আমরা সন্তুষ্ট হইলাম যে, তাঁহার বাঙ্গালা লিখিবার ক্ষমতা আছে। অনেক স্থল বেশ মিষ্ট হইয়াছে।

গয়াসুর বধ।—(দৃশ্য কাব্য)।—শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল রায় মিত্র প্রণীত। দৃশ্য-কাব্য লেখা, লেখকগণ যত সহজ মনে করেন, বাস্তবিক কিন্তু উহা সেরূপ সহজ নহে। ওরূপ শক্ত বিষয়—দৃশ্যে-দৃশ্যে, অঙ্কে-অঙ্কে চরিত্রের পরিস্ফুটন—বিশেষ কাব্যে, যিনি-তিনি লিখিবার উপযুক্ত পাত্র নহেন। আর, সেই জন্যই আজকাল ঐরূপ যত যা' বাহির হয়, সকলই সেই একঘেয়ে। তবে বেওয়ারিশ বাঙ্গালা ভাষা, আর মহাভারত-রামায়ণের যেন রাস্তায়-ছড়ান চরিত্র—তাই সকলেই ক্ষোভ মিটান। যাইহোক, ততদূর নিকৃষ্ট না হইলেও, বড়ই দুঃখে বলিতে হইতেছে যে, এ নাটকখানিও কিন্তু সেই শ্রেণীর। তবে প্রশংসার কথা, ইহার স্থানে স্থানে মিষ্টত্ব আছে। চেষ্টা করিলে, লেখক পরে কৃতকার্য্য হইতে পারেন, আশা হয়।

রঙ্গভূমি-সম্বন্ধে।

ষ্টার থিয়েটারের 'হারানিধি।'

ধীরে ধীরে এক একখানি নূতন নূতন সামাজিক নাটকের অভিনয় করিয়া, ষ্টার থিয়েটার আজকাল বড়ই বাহাদুরী লইতেছেন। 'সরলা'-'প্রফুল্লের' পর, সম্প্রতি আবার 'হারানিধি' নামক একখানি নূতন সামাজিক নাটকের অভিনয় দেখিয়া, আমরা বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। 'সরলা'-'প্রফুল্ল' দেখিয়া যেমন একাদিক্রমে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়াছিলাম, 'হারানিধি' দেখিয়া তেমনই হাসিয়াছি ও কাঁদিয়াছি—একাধারে দুই সুখই উপভোগ হইয়াছে। বড়মানুষের সহিত গরিবের যে বন্ধুত্ব—কথামালার বাঘ ও বকের বন্ধুত্বের ন্যায়—হারানিধির মোহিনী-হরিশই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জামাই বাবাজী ঠিক হারানিধিই' বটেন! বাবাজীর চাল চলন—ঢং-রঙ্ ঠিক নামেরই পরিচায়ক। বাবাজী আমাদের 'সরলার' 'গডাঢর চণ্ড্র', 'প্রফুল্লের' 'মুল্লুকচাঁদ ধুঁধুরিয়া' জমীন্দার, আর 'হারানিধির' 'হারানিধি'! সাজান হ'য়েছে ঠিক! হরিশ ও হরিশ-পরিবারের ক্ষমাগুণ, এবং সে গুণে মোহিত হইয়া মোহিনীর জ্ঞানোদয়, বড়ই শিক্ষার বিষয়। এইরূপ আরও নানা কাণ্ডে নাটকখানি বড়ই জমিয়াছে—না দেখিলে, সংক্ষেপে বলিলে, কেহই সে ভাব অনুভব করিতে পারিবেন না। তবে দোষ যে নাটকখানিতে একেবারেই নাই, এরূপও নহে। কিন্তু সে কথা আজ নহে; যদি কখনও সময় ও সুবিধা পাই, তবে 'নাট্যচিত্রে' সে কথা একবার দেখাইব।

এমারেল্ড থিয়েটারের পরিণাম।

আমরা যাহা বলিয়াছিলাম, কার্য্যেও দেখিতেছি, ক্রমে তাহাই গড়াইল। আমাদেরই আন্দোলন-আলোচনায় বুঝিবা 'এমারেল্ড থিয়েটার' উঠিয়া যায়! এতদিনে বুঝিলাম' গোপাল বাবু জ্ঞানবান—ক্রীড়া-পুত্তলির ন্যায় লোকের কুহকে তাঁহাকে হাসাইতে-নাচাইতে পারে না। রঙ্গালয়ের দিন দিন অধোগতি দেখিয়া, সুসময়েই তিনি উহা বন্ধ রাখিবেন সঙ্কল্প করিয়া, বড়ই বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছেন। মাননীয় মনোমোহন বাবুর নিকট কেদারনাথের 'হাম-বড়াই' ভাব, সাধারণের প্রতি 'থিয়েটার-পার্টির' অত্যাচার-অবিচার—পতনের এই যে সকল বাড়াবাড়ী—ইহাতেই 'এমারেল্ডের' বুঝি এই ঘটিল! যাইহোক, এখনও আমরা কিন্তু উহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। গোপাল বাবুকে যদিও 'আমার আর ঐরূপে, কুপোষ্য পুষিয়া, টাকার শ্রাদ্ধ করিতে পরামর্শ দিই না; কিন্তু যদি তিনি এখনও উহা চালাইতে চাহেন, তাহা হইলে কার্য্য-প্রণালীর পরিবর্ত্তন ও সুবন্দোবস্ত করিয়া, তবে যেন উহাতে হাত দেন, এই মাত্র তাঁহার প্রতি আমাদের পরামর্শ।

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা—প্রবঞ্চনা।

পূজার বাজারে

মফঃস্বলবাসী বিশেষ সতর্ক হউন। উপহারের লোভানি, সস্তার ঢেউ এ সময় বড়ই উঠিয়াছে। কতজনের আর নাম করিব? বিশেষ না দেখিয়া-শুনিয়া, এখন আর আপনারা যেন কোন-কিছু কুহকে না মজেন, এই বাসনা। কলিকাতায় আসিয়াও, এ সময় বড় সতর্ক হইয়া চলা উচিত। পকেট-কাটা, রাস্তায় সোণা-ফেলা, রেলগাড়িতে টিকিট কিনিয়া দিতে গিয়া তাহা আত্মসাৎ করিয়া পলায়ন,—এইরূপ নানা জুয়াচুরীর এই সময় কলিকাতায় প্রাদুর্ভাব। জুতার বাজারে, কাপড়ের বাজারে, পরিচ্ছদ-আস্‌বাবের দোকানে ঠকান তো

আছেই! এ, সকল দিক দেখিয়া চলা বড়ই দায়! আর, তাই বলিতেছিলাম, মফঃস্বল-বাসী পূজার বাজারে বিশেষ সতর্ক হউন।

নকল সর্ব্বত্রেই।

এক 'ডি, গুপ্ত', 'সুধাসিন্ধুর' নহে; দেখিতেছি, নকল সর্ব্বত্রেই। যে ঔষধের বেশী কাটতি; যে ঔষধের বেশী নামডাক; যে জিনিসের বেশী আদর—কি পুস্তক-পত্রিকা, কি পরিচ্ছদ-আস্‌বাব্ সকল বিষয়েই; নকলের ছড়াছড়ি। ঔষধের কথা উঠিয়াছে; সুতরাং সেই হিসাবেই আজ আরও দুই চারিটি কথা বলি। এই এক হরিশ শর্ম্মার 'ধাতুদৌর্ব্বল্যের ঔষধ', আর ৩৯নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, মুর্গীহাটার এ, সি, মুখার্জি এণ্ড কোংর 'পুরুষত্বহানির মহৌষধ সকোর্টিনা রেস'—এসব ঔষধেরও কত না নকল বাহির হইয়াছে! এই ধরুণ, এক 'সকোর্টিনা রেস'—অনেক দিন পূর্ব্বে আমরাও অনেককে দিয়া ইহার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলাম। কিন্তু দেখাদেখি,তাহারও আজ-কাল আবার নকলের একশেষ! দশ বৎসর পূর্ব্বে এই ঔষধই লোকে জানিত; কিন্তু আজ-কাল এরূপ অনেক ঔষধের ছড়াছড়ি—বিক্রয়াধিক্য দেখিয়া, যে-না-সে এইরূপ একটা-না-একটা ঔষধ করিয়া বসিয়াছে। তা'রপর ধরুণ, 'এন, সি, ঢোল এণ্ড কোম্পানির' সুবাসিত গোলাপী নারিকেল তৈল।—ইহার পূর্ব্বে সুগন্ধি তৈল আর যে ছিল, এমন স্মরণ হয় না! কিন্তু আজকাল রাস্তায়-রাস্তায়--তামাকের দোকানে, মুদীর দোকানেও, ঐরূপ তৈলের ছড়াছড়ি। সুতরাং পাঠকগণ, বুঝুন দেখি, ব্যাপার কি দাঁড়াইয়াছে! যাইহোক, দেখিতেছি, এখনও এরূপ-সকল নকল-নিবারণের জন্য, গভর্ণমেণ্টের না দৃষ্টি পড়িলে, কিছুতেই আর সুরাহা নাই। এরূপ নকলে সদ্ব্যবসায়ীর ব্যবসায় বন্ধ হইবার উদ্যোগ হইয়াছে—নকলে নকলে দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

গোল বাধিয়াছে।

'সুধাসিন্ধু' ও 'ডি, গুপ্ত' কোম্পানির অসংখ্য নকলের কথা 'অনুসন্ধানে' প্রকাশ করায়, বড়ই গোল বাধিয়াছে। এক প্রধান গোল, নকলকারীদিগের গাত্রজ্বালা; আর, দ্বিতীয় গোল, চারিদিকে তুমুল আন্দোলন উঠিয়া—কাগজে-কাগজে তাহার বিষম হুলুস্থূল হওয়ায়, ক্রমে বুঝি বা উহাতে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়ে! প্রতারক নকলকারীগণ এ দেখিয়া এখন আমাদের 'এক পোঁচে কাটিতে পারিলে আর দু'পোঁচেরও অপেক্ষা' করিতেছে না। নানা ষড়যন্ত্র—নানা প্রতারণা-কুহক পাতিয়া, তাহারা আমাদিগকে দিন দিন বিপদস্থ করিবার চেষ্টা পাইতেছে। কেহ কেহ বা আমাদের আপিশ-চড়াও হইয়া আসিয়া ঝগড়া করিতেছে; কেহ কেহ বা দূর হইতে গালাগালি দিয়াই পৌরুষ লইতেছে। আর, কেহ বা আমাদিগকে সুবিধায় পাইলে, উত্তম-মধ্যম দিবারও যোগাড় খুঁজিতেছে। তা' ছাড়া, নালিশ করিবে—আমাদিগকে জেলে পুরিবে, এ কল্পনায়ও অনেকে আপনাপন মনকে প্রবোধ দিতেছে। কিন্তু আমরা বলি, বাপু, তোমাদের সকলই বৃথা! তোমাদিগকে আর বড় একটা কষ্ট পাইতে হইবে না; আমরাই তাহার সত্বর যোগাড় করিতেছি। যে 'সুধাসিন্ধুর' এক শিশি ঔষধের দাম ১।০ পাঁচ সিকা, বা যে 'ডি গুপ্তের' এক বোতল ঔষধের দাম দেড় টাকা, সে ঔষধের ডজন দু'টাকা-ন'সিকায় বেচিয়া—অল্প দামের দোহাই দিয়া সুধার বদলে বিষ খাওয়াইয়া, তোমরা তো লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছ! তাই বলি, তোমাদিগকে আর বড় করিতে হইবে না; আমাদেরই চেষ্টাতেই, স্মরণ রাখিও, শীঘ্রই তোমরা প্রতিফল পাইবে। তবে ভালয়-ভালয় এখনও বলি, চোখ না রাঙাইয়া, বাপুরা সব, জাল-জুয়াচুরী এখনও ত্যাগ কর—

নকলের দোকান মানে মানে তুলিয়া দেও। আর, সুধু তোমাদিগকেও বলি না; তোমাদের পাইকারগণ—যাহারা তোমাদের চুরি-জুয়াচুরীতে আবার সহায়তা করে—তাহাদিগকেও এবার সাবধান করিতেছি। মফঃস্বলে বসিয়া, তোমাদের সাহায্যেই, তাহারাও দিন দিন কত খুন করিতেছে, ভাব দেখি! খুনের সহায়কারী, সুতরাং পাইকারগণ, তোমরা আরও কতদূর অপরাধী, বল দেখি! যাইহোক, ভবিষ্যৎ ভাবিয়া, এখনও যদি সতর্ক না হও, তবে জানিবে, তোমাদেরও বিপদ! সামান্য লাভের আশায়, খুনের সহায়কারী হইয়া, তোমরাও প্রাণে মারা যাইবে। যখন হাত দিয়াছি, তখন জানিও, আমরা শেষ পর্য্যন্ত দেখিব। আমাদিগের সমিতি হইতে সত্বরই এবিষয়ের বিশেষ প্রতিকার-চেষ্টা হইবে। প্রতারকগণ আরও জানিও, সুধু আমরা নহি, তোমাদিগকে জব্দ করিবার জন্য, বাঙ্গালার সকল সংবাদ-পত্রই প্রায় উদ্যোগী। এই দেখ, মুর্শিদাবাদের 'প্রতিকার' কি বলেন,—

"'অনুসন্ধান' দ্বিতীয় বর্ষ অতিক্রম করিয়া তৃতীয় বর্ষে উপনীত হইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে উন্নতিও হইয়াছে। 'অনুসন্ধানের' দ্বারা অনেক জুয়াচুরির প্রশমন হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়,জুয়াচুরির সংবাদ জানিয়াও প্রতারকের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অনেকেই চেষ্টা করেন না। 'অনুসন্ধানের' ৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যায় 'সুধাসিন্ধুর অসংখ্য নকল' হওয়ার কথা লিখিত হইয়াছে। মফঃস্বলবাসীগণ 'সুধাসিন্ধু' কিনিবার সময় সতর্ক হইবেন।"

আর দেখ, ফরাসী-রাজ্যের সহযোগী 'প্রজাবন্ধু' কি কি বলিতেছেন,—

"অনুসন্ধান—পাক্ষিক পত্র। ইহার প্রতিষ্ঠা অবধি দেশের অনেক উপকার হইতেছে। ইহা তৃতীয় বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। গত সংখ্যায় 'সুধাসিন্ধুর ভয়ানক নকল' শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের ইচ্ছা ছিল, সেইটী প্রকটিত করি; কিন্তু স্থানাভাবে তাহা ঘটিয়া উঠিল না বলিয়া দুঃখিত হইলাম। সাধারণের সেইটী পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য। অনুসন্ধান যেরূপ ভাবে চলিতেছে, তাহাতে আমরা ইহার দীর্ঘজীবন আশা করি।"

শেষ দেখ, বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান পত্র 'বঙ্গবাসী'ও এসম্বন্ধে কি বলিতেছেন,—

"অনুসন্ধান।—২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা। জুয়াচোরের জুয়াচুরী ধরিতেই প্রথমে অনুসন্ধানের জন্ম। আপনার শক্তিতে এ কার্য্য যতটা সাধন করা যায়, অনুসন্ধান তাহাতে ত্রুটী করেন নাই। কিন্তু শুদ্ধ জুয়াচোরের জুয়াচুরী পড়িতে লোকে মূল্য দিয়া 'অনুসন্ধান' পত্র লইবে,দেশের সে অবস্থা আজিও হয় নাই। এ জন্য, 'অনুসন্ধান' পত্রের উদ্যোগী, ইহাকে নানা আভরণে ভূষিত করিয়া, লোক-মনোহর করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এখন, অনুসন্ধানে সুমধুর পদ্য, চুটকি গালগল্প, গল্পচ্ছলে জাল-জুয়াচোরের আত্মকাহিনী, উপন্যাস, প্রাপ্ত প্রবন্ধ, সংবাদ, জুয়াচুরী-সম্বন্ধে অনুসন্ধান-সমিতির কার্য্য-বিবরণ প্রভৃতি নানাবিধ বিষয় থাকে। এ সব নানা বিষয়ে 'অনুসন্ধান' পূর্ণ, অথচ এ পাক্ষিক পত্রিকার বার্ষিক মূল্য মায় ডাকমাসুল দেড় টাকা মাত্র। জাল-জুয়াচুরী দমনের সঙ্গে সঙ্গে সাময়িক পত্র পড়িতে যাঁহাদের সখ আছে, তাঁহারা সাধ্যমতে এ পত্রের উৎসাহ দিবেন,এমন আশা আমরা করিতে পারি। এবার কার অনুসন্ধানে ভয়ানক জুয়াচুরি-তত্ত্ব (সুধাসিন্ধু প্রভৃতির নকলের কথা) প্রকাশিত হইয়াছে। কেবল দুই আনা মূল্যে এই খণ্ড অনুসন্ধান পাওয়া যায়।"

এবার স্থানাভাব। আর উদ্ধৃত করিবার এবার ক্ষমতা নাই। তবে দেখিব, বারান্তরে কতদূর কি পারি!

মফঃস্বলের বিবরণী।

রঙ্গপুর।

বিগত ৮ই সেপ্টেম্বর বঙ্গেশ্বর স্যার ষ্টুয়ার্ট বেলী মহোদয় ধুবড়ী হইতে আসিয়া রঙ্গপুরে পৌঁছেন। স্থানীয় মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি প্রধান সরকারী কর্ম্মচারীগণ এবং কাকিনার রাজা মহিমারঞ্জন রায় বাহাদুর প্রভৃতি স্থানীয় জমীদারগণ, রঙ্গপুর-ষ্টেসনে আসিয়া, তাঁহার বিশেষ অভ্যর্থনা করেন। পরদিন ৯ই তারিখে, বঙ্গেশ্বর রঙ্গপুরের রাজা গোবিন্দলাল রায় বাহাদুরের বাটীতে নিমন্ত্রিত হন। রাজা বাহাদুর তাঁহাকে বিশেষ যত্নের সহিত অভ্যর্থনা করেন। এই উপলক্ষে রাজবাটী এবং নিকটবর্ত্তী রাস্তা-ঘাট সুন্দররূপে সুসজ্জিত ও আলোকিত করা হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে ইলেক্‌ট্রিক লাইট ও বোহিমিয়ান ব্যাণ্ড আনা হইয়াছিল। রাজা বাহাদুরের যত্নে ও অভ্যর্থনায় বঙ্গেশ্বর বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

কানসাট, মালদহ।

গঙ্গার জল বৃদ্ধি হইয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। রাস্তায় একগলা জল। লোকের বাটীর মধ্যে প্রাঙ্গনে তো জল আছেই; অনেকের ঘরের মেজেতেও এক হাত —আদ হাত জল। কানসাট মুক্তাগাছার রাজা সূর্য্যকান্ত বাহাদুরের জমীদারী; মধ্যে তাঁহার

সুপারিণ্টেডেণ্ট বাবু জলধর সান্যাল মহাশয় এখানে আসিয়া স্বচক্ষে এ সব দেখিয়া গিয়াছেন। অনেক আবেদনেও, গভর্ণমেণ্ট তো আমাদের কোনই কিনারা করিলেন না; এখন, দেখি, রাজা বাহাদুরের কৃপায় কি হয়! বানরের উপদ্রবও গ্রামে বড়ই। লোকের বাড়ীতে শস্যাদি ও ফল-মূল কিছুই হইতে দেয় না। লোকের ঘর ছিদ্র করিয়া, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, যাহা পায় তাহা খাইয়া, প্রস্থান করে। বাঁসের ঝোপে উহাদের আড্ডা—সময়ে সময়ে বাহির হইয়া উহারা ঐরূপ উপদ্রব করে। এ উপদ্রবেরও প্রতিকার হয়, রাজার নিকট এই প্রার্থনা।

সাঁত্রাগাছি, হাওড়া।

এখানকার প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যত্নে ও আরও কতিপয় ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তির চেষ্টায়, এখানে একটি 'হিতকরী সভা' স্থাপিত হইয়াছে। সভাটির উদ্দেশ্য, চাঁদা করিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়া, অনাথ দীন-দুঃখীগণকে বিপদে সহায়তা করা। এরূপ সভা স্থায়ী হয়, এই আমাদের একান্ত বাসনা।

সংবাদ।

—বাগবাজার, 'আদরিণী' আপিসের প্রসিদ্ধ রাজেন্দ্রলাল বিশ্বাস এবার দেখিতেছি, বড়ই ফাঁপরে পড়িয়াছেন। আমরা ইতিপূর্ব্বেই আমাদের পাঠকগণকে জানাইয়া সতর্ক করিয়াছি যে, তিনি 'সুখ-সম্ভোগ-রত্নাকর' নামক একখানি অশ্লীল পুস্তক লিখিয়া, গুপ্তভাবে মফঃস্বলে হ্যাণ্ডবিল বিলাইয়া তাহার বিক্রয়োপায় স্থির করিতেছেন। কিন্তু পাঠক, এখন শুনিলে দুঃখিত হইবেন যে, সেই অশ্লীল পুস্তক প্রকাশ করার অপরাধে, প্রসিদ্ধ ডিটেকটিভগণের চেষ্টায়, তিনি ফৌজদারী-সোপর্দ্দ হইয়াছেন। পুস্তকগুলি পুলিসে চালান গিয়াছে; আপাততঃ তিনি জামিনে খালাস পাইয়াছেন। মকর্দ্দমা বিচারাধীন; সুতরাং আমরা এখন আর অধিক কিছু বলিতে চাহি না।

—বেলজিয়ামের রাজধানী এন্তোয়ার্প। এখানে সম্প্রতি এক ভীষণ লঙ্কাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে; দুই হাজার টন টোটা জ্বলিয়া গিয়াছে। সর্ব্বনাশ! অশনি-পাতের শব্দ ও ভূকম্পনের আন্দোলন এক সঙ্গে প্রায় অনুভূত হয় না; কিন্তু এন্তোয়ার্পে সেইরূপ কাণ্ড ঘটিয়াছিল। মহানাদে হঠাৎ সহরটা বিকম্পিত হইয়া উঠে। এই অগ্নি তৎক্ষণাৎ সহরময় ছড়াইয়া পড়ে।

—বিলাতের পেনিকুক খনিতে এক লোমহর্ষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। হটাৎ অগ্নিস্পর্শে খনির অভ্যন্তর ভাগটা জ্বলিয়া গিয়াছে। বিস্তর কুলি এই আকস্মিক বিপদ-পাতে প্রাণ হারাইয়াছে। এপর্য্যন্ত ৫৭টী মৃত দেহ পাওয়া গিয়াছে। এখন ও ৪২।৪৩ জন লোক খনির মধ্যে আছে। ইহাদিগকে উদ্ধার করা অসাধ্য। খনির মধ্যে ভীষণ অগ্নি; তাহার ভিতর প্রবেশ করিবার যো নাই। সকলেই হতাশ-চিত্তে খনির মুখে বসিয়া আছে! ক্রমাগত ধুম ও অগ্নিশিখা বহির্গত হইতেছে।

—পরিচ্ছদ-বিক্রেতা মল্লিক-ব্রাদার্সদের কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া, আমাদের কোন প্রতিনিধি তাঁহাদের দোকান দেখিতে গিয়াছিলেন। দেখিয়া, তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। পূজার-বাজারে, দোকানটি বেশ সাজাইয়া রাখা হইয়াছে; মালপত্রও, অর্ডার পাইবামাত্র, প্রেরিত হইতেছে। আরও প্রতিনিধি মহাশয় দেখিয়াছেন, তাঁহাদের দরেও তেমন ব্যবসাদারী নাই। যাইহোক, তাঁহার মুখে তাঁহাদের এরূপ প্রশংসার কথা শুনিয়া, আমরাও বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম।

—তান্তিয়া-সম্বন্ধেও অনেক কথা বলিবার ছিল। কিন্তু 'অনুসন্ধানের' পরম হিতৈষী ডিটেক্টিভ পুলিসের সুযোগ্য কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'তান্তিয়ার' এক বিস্তৃত জীবন-চরিত সত্বরই প্রকাশ করিতেছেন। আশা আছে, তাহাতেই অনেকাংশে পাঠকগণের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তি হইবে। তবে স্থূলতঃ তাহার জীবনের ঘটনা এই:—

"তান্তিয়া ভিল কোনও এক গো-রক্ষকের একমাত্র পুত্র। তান্তিয়া নিতান্ত শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন হয়। তাহার আত্মীয়েরা অনাথ দেখিয়া তাহাকে তাহার পিতৃ-সম্পত্তিতে বঞ্চনা করে। তান্তিয়া সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য ইংরেজের আদালতে বিচারপ্রার্থী হয়। কিন্তু সে দরিদ্র; টাকা ব্যয় করিয়া উকীল প্রভৃতির নিয়োগ-পূর্ব্বক সে মকর্দ্দমার উপযুক্ত তদ্বির করিতে পারেনা। মকর্দ্দমা ডিস্‌মিস হইয়া যায়। তান্তিয়ার মনে এই ঘটনায় দারুণ আঘাত লাগে; এবং সে বৃটিস-শাসনের শত্রু হইতে সঙ্কল্প-বদ্ধ হয়। ইহার পর তান্তিয়া দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করে; এবং দশ বৎসর কাল যাবৎ ইংরেজের পুলিসের চক্ষে ধূলি দিয়া সে আপনার ব্যবসা চালাইতেছিল। লোকে বলে, তাহার সঙ্গী ১২ জনের বেশী নহে; ইহাদের সকলেই ভিল বা নীচবংশীয় মহারাষ্ট্র-জাতীয় লোক। তান্তিয়া হোসেঙ্গাবাদের বাহিরে প্রায় কখনও যায় নাই; ভিটুল এবং খান্দোয়া জেলাতেই সে তাহার লুণ্ঠন-ব্যাবসায় জাঁকালরূপে চালাইয়াছিল। মাল-গুজারদিগের পক্ষে সে জীবন্ত আতঙ্কস্বরূপ। সে মাল-গুজারদিগকে লুণ্ঠন করিয়া, লুণ্ঠিত সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ দীনদুঃখী ও দরিদ্রদিগকে বাঁটিয়া দিত। সুতরাং গরীবলোক সমস্তই তাহার বন্ধু; সম্ভবতঃ পুলিসও এইজন্যই কোনও সন্ধান পাইতে পারে নাই। ডাকাতেরও দয়া আছে, ডাকাতেরও একটা নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম আছে। তান্তিয়া সেই দয়া ও ধর্ম্মে যেন মূর্ত্তিমান।"

অনুসন্ধান।

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

৩য় খণ্ড] ১৫ই আশ্বিন, ১২৯৬ সাল। [৫ম সংখ্যা।

দুর্গোৎসব।

১।—সাহস।

আজি এ সপ্তমী দিনে, এস জাগি, মার সনে
মিলিয়া সকলে।
আজি শক্তিময়ী ঘরে, এসরে সকলে ভাসি
উল্লাস-সলিলে।
যাঁহারে এনেছ ঘরে, মহাযোগী ধ্যান করে—
ধ্যান করে চরাচরে, এই বিশ্ব-জননী!
জলধি উন্মত্ত হ'য়ে, সাগর অনন্ত-ছুঁয়ে,
আকাশ বিভোর হ'য়ে, ডাকে দিবা-রজনী।
কে বলে এ জড়-শক্তি, যাঁ'র শক্তি অভিব্যক্তি
স্থাবরে জঙ্গমে আর মানবের মানসে।
সান্ধ্য গগনের কোলে, রাঙ্গা রবি-মধ্যস্থলে,
অগণ্য নক্ষত্র-কুলে যাঁ'র হস্ত প্রকাশে।
দেখরে কি শক্তি ধ'রে, জগন্মাতা কার্য্য ক'রে;
নির্জীব নিষ্কর্ম্মা নন, সদা ব্যস্ত করমে।
আজিরে দেখিতে পাবে, আদ্যাশক্তি দেখা দিবে,
জ্ঞান-চক্ষু মেলি শুধু, দেখ পশি মরমে।
জগন্মাতা যত্ন করি, এনেছে আঁচল ভরি,
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—চল লই চাহিয়া।
আজি কিরে ভয় আছে, জননী দাঁড়ায়ে কাছে;
যে যথা পেয়েছি ব্যথা, দেখাবো রে খুলিয়া।

২।—উচ্ছ্বাস।

তোলরে আনন্দ-ঊর্ম্মি হৃদয়-সরসে আজ,
নাচাও মানস-হংস সে ঊর্ম্মি উপরি।
বুক-ভরা সুখ-জলে, পদ্মিনী উঠুক ভাসি,
ডুবারে হৃদি-যাতনা হেরে ক্ষেমঙ্করী।
মঙ্গল-বাজনা বাজে, মঙ্গলার আগমনে,
পূর্ণ ঘট আম্রশাখা মঙ্গল-সূচনা।
নিরীহ কদলী বৃক্ষে, শান্তিরে আনিছে ডাকি;
হেন শুভদিন আর কখন যে হয় না!
চলরে মণ্ডপে আজ, ভবানী পূজিতে হবে,
দেখহ বাহন-সহ এল শিব-ললনা!
তুলি ফুল, গাঁথি মালা, মায়েরে পূজিতে হবে,
তুষিতে শক্তিরে, আজ পুরাতে রে কামনা।

৩।—প্রকাশ।

মরি কি সুন্দর মূর্ত্তি, বহ্নি-ভানু সম দীপ্তি,
শকতি-রূপিণী মাতঃ সিংহ'পরি শোভিছে।
ভূজে ভূজে অস্ত্র ধরি, বিনাশিয়া বিশ্ব-অরি,
পরিতৃপ্ত সুখে, মুখ ঝলমলি ভাতিছে।

দেখ দশভুজা-পাশে, বীণা-পাণি-মূর্ত্তি হাসে,
দিব্য-শঙ্খ-তুষারাভ পূর্ণ-ইন্দু-আননা।
জ্ঞানময়ী থাকি পাশে, জননীরে পরিতোষে;
শুধু শক্তি হয় কিরে করমের সাধনা?
নেহার দক্ষিণে মার, মরি কিবা মূর্ত্তি আর,
নীল-সরোরুহ-নেত্রে কোমলাঙ্গী শোভিছে।
মহালক্ষ্মী অন্নদাত্রী, জগত-পালনকর্ত্রী;
শক্তি, ধন-জ্ঞান-সনে রিপুনাশি' হাসিছে।
কিছু নিম্নে ডান-পাশে, গণপতি পরকাশে;
সিদ্ধিদাতা বিঘ্নহারী, অগ্রে যাঁর সাধনা।
শক্তি, জ্ঞান, ধন সনে, সিদ্ধি বাঁধা সযতনে;
সিদ্ধি-আশা বিনা মন উৎসাহে মাতেনা!
সর্ব্বশুভ্রা-নিম্নদেশে, কার্ত্তীকেয় বীরবেশে,
শকতি-উদ্ভব দেব ধনুর্দ্ধারী-কল্পনা।
শক্তি কার্য্যে পরকাশি, দেবসেনা রিপু-নাশী;
সুধু ধনে, সুধু জ্ঞানে, অরি বধ হয় না!
মা বধিল দেবাসুর, কি ছার তোর অসুর;
সতত সঙ্গিনী মার 'জয়া' আর 'বিজয়া'।
পূর্ণ অবয়বে তারা, আসিলেন ভয়হরা;
শিখ রে, শেখা রে, আজ পূজিতে অভয়া।

শারোদোৎসবে

উচ্ছ্বাস।

আজ বরষপরে, হরষ ভরে,
সরস সুখ-শরতে,
কেমন মন-ভুলান, প্রেম-মাখান,
উঠ্‌লো সুতান মরতে।
কোথায় ঘুমের ঘোরে, ঘোর-আঁধারে,
আঁধার-ঢালা শয়নে,
ছিলেম মুদে নয়ন, মড়ার মতন,
নাইক চেতন জীবনে।
মোরে চ'খের দেখা, কেউ দেখেনি,
মড়া ব'লে কেউ ছোঁয়নি,
আমি যেমন ছিলেম, তেমনি ছিলেম,
পাশ দিয়ে কেউ আসেনি!
তবে বরষপরে, হরষ ভরে,
সরস সুখ-শরতে,
কেন মন-ভুলায়ে, প্রেম-মজায়ে,
উঠ্‌লো সুতান মরতে?
কেন মরুর খনি, হৃদয়খানি,
সে সুর শুনি জাগিল?
কেন সেদিন মত, অবিরত
পতিত চিত মাতিল?
কেরে আঁধার-ঠুলি, দিয়ে খুলি,
আলোর তুলি আঁকিলি,
কেরে মড়ার বুকে, আগুন ঢুকে
প্রাণ আলোকে আনিলি?
আমি সারা বরষ, অন্ধ হয়ে,
প্রাণ-হারায়ে পড়ে আছি,—
কেরে দুখের দুখী, ব্যথার ব্যথী,
প্রাণ দিয়ে হলি কাছাকাছি?
ওমা তোর চিনেছি, সব বুঝেছি,
জগতমাতা উদয় হলি;
দশদিকে দশ হাত বাড়িয়ে,
দশদিকে তুই অভয় দিলি!
দশদিকের সব কোলের ছেলে,
দশে মিশে অভয় পেলে,
মোরেও কি মা দশের দলে,
ঠাঁই দিবি না—দিবি ফেলে!
ঘুমপাড়ায়ে রেখেছিলি,
সে ঘুম তবে কেন ভাঙ্গালি!
ভাঙ্গা বীণায় কেন বল্ মা!
সুর দিয়ে তবে না বাজালি!
রোগের জ্বালা, শোকের জ্বালা,
মনের জ্বালা, প্রাণের জ্বালা,
জ্বালায় জ্বালায় জ্বলে আমি,
হয়েছি মা ঝালাপালা।
ত্রিতাপ-জ্বালার নিবারিণী,
তুই মা তারা তিন্‌লোচনি,
প্রাণের জ্বালা নিবিয়ে দে মা,
সইব কত আর পারিনি।

এসেছিস্ তাইতে বলি,
দুঃখের কথা শোন্ মা বলি;
বাপের ধারা ধরিস্‌না মা
পুষ্পাঞ্জলী নে মা তুলি!
দু'হাত তুলে 'মা-মা' ব'লে,
ঝাঁপিয়ে পড়ি অভয় কোলে,
দশহাত চেপে, বুকে টেকে,
রাখ্ মা তোর এ তাপিত ছেলে!

শক্তি-পূজা।

মা আসিতেছেন। দশদিকে প্রচার হইয়াছে। স্বয়ং প্রকৃতি আয়োজন করিতেছে। দরিদ্র বঙ্গবাসী আজ কিরূপ আয়োজন করিবে?

বঙ্গবাসী দরিদ্র। জগজ্জননী, জগতাধিষ্ঠাত্রী, জগৎ-প্রসবিত্রী, রাজরাজেশ্বরী সেই দরিদ্রের গৃহে আসিবেন। আজ বঙ্গবাসী কিরূপে তাঁহার অভ্যর্থনা করিবে?

চন্দ্রে, সূর্য্যে, সাগরে, জঙ্গমে, সাঙ্খ্যগগণে, জীবিত পবনে, পুষ্প-পত্রে, পুষ্প-ক্ষেত্রে, যাহা শান্তিময়, যাহা পবিত্র, সেই খানে—জগৎ জননীর অধিষ্ঠান! অশান্ত, অপবিত্র বঙ্গবাসী আজ সেই পূর্ণ-পবিত্রতায় কোথায় বসাইবে?

রোগে, শোকে, মনস্তাপে বঙ্গবাসী প্রপীড়িত। অন্তরে, বাহিরে, দেবালয়ে, তীর্থক্ষেত্রে—তাহাদের সর্ব্বত্রেই অপবিত্রতা। সমগ্র আর্য্যজাতি আজ বিপন্ন, হতভাগ্য বঙ্গবাসী বড়ই কাতর। মা কি তবে আসিবেন? মন্ত্রহীন, পূজাহীন, ভক্তিহীন, সাধনাহীন এ জাতি কি জগৎজননীকে ডাকিতে পারিবে?

আর্য্যজাতি বিপন্ন। বঙ্গবাসী কাঙ্গাল হইয়াছে। এই-ই তো ডাকিবার প্রশস্ত সময়!

কিন্তু মা যে রাজরাণী, রাজার মেয়ে! তিনি কি দরিদ্রের কুটীরে পদার্পণ করিবেন? জানিনা, রাজরাণীকে কি দিয়া তৃপ্ত করিতে হয়? জানিনা, রাজরাণীর আহার্য্য কি? বিদুরের খুদ-কুঁড়াই সম্বল। মা কি তবে তাহাই ভোজন করিবেন? করিবেন বৈ কি! এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে, সকলই তো তাঁহার! কোথায় চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র-সাগর-পর্ব্বত-সমন্বিত কোটি কোটি জগৎ ব্রহ্মাণ্ড, আর কোথায় কীটানুকীট ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মানব? আমি কি দিয়া জগজ্জননীকে পরিতৃপ্ত করিব? তথাপি বাসনা অনিবার্য্য; ইচ্ছা হয়, ভক্তি-ভাবে এই খুদ-কুঁড়া দিয়াই মার আহার্য্য সাজাইয়া দিই। মা কি আমার সে সেবা গ্রহণ করিবেন না? করিবেন বৈ কি?

ক্ষীরোদ-সাগর হইতে যাঁহার উদ্ভব, তাঁহার আর দুগ্ধের অভাব কি? কিন্তু গোপবধূর হৃদয় তাহা শুনিল কৈ? দুগ্ধ-ভাণ্ড হইতে গোপবধূ দুগ্ধ লইয়া ক্ষীরোদ-সমুদ্র-সম্ভব ভগবানের হস্তে দিল। ভক্তির ভগবান তাহাই হাত পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর, তাঁহার অনন্ত রত্ন থাকিতে পারে; কিন্তু দরিদ্রের খুদ-কুঁড়াই যে অনন্ত রত্ন! ভগবান ইহা লইবেন বৈ কি? ইহাই তো তাঁহার মহত্ত্ব!

শ্রীমন্ত যখন বধ্যভূমিতে—যমদূতাকৃতি কোটাল যখন শানিত খড়্গ উত্তোলন করিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদনে প্রস্তুত; বিপদে কাতর-প্রাণে শ্রীমন্ত তখন মাকে ডাকিয়াছিলেন। কিন্তু মা থাকিতে পারিলেন কৈ? বিপন্নের কাতরোক্তিতে মার মন চঞ্চল হইল; পদ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পদ্মা, আজ আমার এমন হইল কেন? আজ আমার মন টলিল কেন? কে বুঝি কোথায় বিপদে পড়িয়া, প্রাণ-ভয়ে আমার স্মরণ লইতেছে! আজ কেন পদে পদে পদস্খলন হইতেছে; শির-মুকুট কেন নড়িয়া উঠিতেছে!" জিজ্ঞাসা করিয়াই, মা আর থাকিতে পারিলেন না। বধ্যভূমিতে শ্রীমন্তকে দেখা দিলেন—ভক্তকে একেবারে ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন। তখন

আর কি ভয়? মার ক্রোড়ে উঠিয়া সন্তান কি বিনাশের ভয় করে? মা যে অভয় দিতেছেন!

আমরাও আজ সেইরূপ বধ্যভূমিতে। মা কি আমাদিগকেও সেইরূপে অভয় দিবেন না? আমরা কুপুত্র সত্য; কিন্তু মাতা তো কদাচ কুমাতা নহেন!

মা আসিতেছেন! প্রকৃতি, জননীর আগমন সূচনা করিয়া দিতেছে। প্রকৃতি সুন্দর সাজিয়াছে।

সুন্দর শরৎকাল। তরুলতা শ্যামল পত্র পরিয়াছে; শরদাকাশে নির্ম্মল নক্ষত্ররাজি হীরকখণ্ডবৎ জ্বলিতেছে; শস্যক্ষেত্র হরিদাবরণে সুসজ্জিত হইয়াছে। নদীর জল স্ফটিকবৎ পবিত্র হইয়াছে; পদ্মকুমুদ সরোবরের শোভা সম্পাদন করিতেছে! সেফালিকা-অপরাজিতা বনভূমি সুসজ্জিত করিতেছে: ঝিল্লি মধুর স্বরে প্রাণের মধ্যে কত কি অস্ফুট ভাব জাগ্রত করিয়া দিতেছে। এসময়ে তুমি-আমি নীরব কেন? এসময়ে শক্তিময়ীর শক্তি অনুভব করিতে তুমি-আমি ক্ষান্ত কেন? প্রকৃতি অঙ্গস্পর্শ করিয়া জাগাইয়া দিতেছে; চক্ষু মিলিয়া চাহিবে কি?

দেখ, তোমার সম্মুখে কে? সবাহনা জগৎজননী—যেখানে যাহা সাজে সেই সাজে সাজিয়া—তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন। এস, একবার নয়ন মেলিয়া দেখি!—একবার প্রাণ ভরিয়া দেখি! মরি মরি কি সুন্দর মূর্ত্তি! শক্তিময়ী একস্থানে সর্ব্বশক্তি-সমবেত করিয়া দাঁড়াইয়াছেন! একবার চক্ষু মেলিবে কি?

উপরে দেবশক্তি—জগৎপ্রসবিত্রী দশভুজা। মার পদতলে, পশুশক্তি। পশু-শক্তি দেবশক্তির পদতলে দাঁড়াইয়া কার্য্য করিবে; এই তো জগতের প্রকৃতি! যেখানে পশুশক্তি দেবশক্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া কার্য্য করে, সেখানেই যে বিকৃতি!

এই যে অনন্ত সাগরসদৃশ মানবজাতি, এখানে দ্বিবিধ শক্তি পরিলক্ষিত হয়। কাম-ক্রোধাদি পশুশক্তি, এবং দয়া-দাক্ষিণ্যাদি দেবশক্তি। চক্ষু মেলিয়া মার প্রতিমাপানে চাহিয়া দেখ; বুঝিবে, কাম-ক্রোধাদি বিনাশ করিলে জীবন-সংগ্রামে তুমি পরাস্ত হইবে—দুর্দ্দান্ত অসুর বিনাশ করিতে পারিবে না; অসুরই তোমায় বিনাশ করিবে। কিন্তু তাই বলিয়া পশুশক্তিকে উচ্ছৃঙ্খল হইতে দিওনা—দয়া-ধর্ম্মাদি দেব-শক্তির পদতলে রাখিয়া সঞ্চালিত কর; তাহাদিগকে ভৃত্য করিয়া কার্য্যে প্রেরণ কর। তবে ভৃত্যের কখনও বশ হইও না—ভৃত্যকে কখনও প্রাধান্য দিও না; তাহাদিগকে ভৃত্যভাবে খাটাইয়া লও। তাহাতে দেখিবে, তোমার কার্য্যোদ্ধার হইয়াছে; দেখিবে, তোমার জয়-বিজয় লাভ হইয়াছে। প্রতিমূর্ত্তিতেও মা এই শিক্ষা দিতেছেন।

তোমরা যদি বল,—মা নিষ্ক্রীয়; মার আবার কার্য্য কি? যিনি কর্ম্মাতীত, যাঁহার করণীয় কিছুই নাই, যাঁহার কামনার বিষয় নাই, তাঁহার আবার কার্য্য কি জন্য? কিন্তু তাহাতে বলি, তোমার শিক্ষার জন্য, ভগবানের কথা স্মরণ কর। ভগবান বলিয়াছেন,—

"যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥
ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সংকরস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥"

তোমার শিক্ষার জন্য মার এই মূর্ত্তি। সুতরাং সংসারে আর ভয় কি? সম্মুখে শিক্ষাদাত্রী! চক্ষু মিলিয়া চাহিয়া দেখ—দেখিবে, সংসারাশ্রমে থাকিয়াই তোমার জয়-বিজয় লাভ হইবে। অসুর বিনাশ হইবে।

মা কেবল দেবশক্তি ও পশুশক্তির সমাবেশ দেখাইতেছেন না। মার দক্ষিণে অন্নপূর্ণা রাজলক্ষ্মী, বামে সর্ব্বশুক্লা স্বরস্বতী। অন্নপূর্ণা ধনশক্তি—স্বরস্বতী বিদ্যাশক্তি। ধন ও বিদ্যা ব্যতীত কোথায় দেখিয়াছ, সংসারে সর্ব্বাঙ্গীন কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে? শুধু শক্তি থাকিলে কার্য্যোদ্ধার হয় না—শক্তির সহায় ও পরামর্শ জন্য ধন ও বিদ্যা উভয়ই আবশ্যক। তাই মা আমাদের পূর্ণ শক্তি—তাই মার সঙ্গে লক্ষ্মী, আর স্বরস্বতী।

কিন্তু শুধু ধন, বিদ্যা ও শক্তির সমাবেশ করিয়াই বা কি হইবে? এত সব কিসের জন্য? কেন!—সিদ্ধি লাভ হইবে বলিয়া ইহাই তো তোমার বাসনা! আমার কর্ম্ম সফল হউক—এ আশা যদি হৃদয়ে না থাকে, তবে তো আর কার্য্যে উৎসাহ হয় না—তবে তো হৃদয় আর উৎসাহেই মাতে না! তবেই অগ্রে সিদ্ধিলাভের আশা চাই। আর, এইজন্যই, অগ্রে সিদ্ধিদাতা গণদেবের বন্দনা করিতে হয়,এই বিধি। অর্থাৎ যদি কখনও তুমি সিদ্ধিলাভাশায় উৎসাহিত হইয়া,ধন, বিদ্যা, পশুশক্তি ও দেবশক্তির একত্র-সমবেত করিতে পার; তখনই জানিও, তুমি কার্য্যোদ্ধারের পথে দাঁড়াইয়া!—তখনই বুঝিও,তোমার কার্য্যোদ্ধারের পূর্ণ শক্তি জন্মিয়াছে।

কার্ত্তিকেয় দেব-সেনা। কার্ত্তিকেয় ঐ তিন শক্তির কার্য্যে-বিকাশ। যখন ঐ শক্তিসমূহ কার্য্যে পরিণত হইল, তখনই তোমার মনস্কামনা পূর্ণ; তখনই জানিও, তোমার অসুর-বধ শেষ হইয়াছে—জয়া-বিজয়া তোমার সঙ্গেই থাকিবে।

মা আমাদের পূর্ণাবয়বা। শক্তির কোথাও অসম্পূর্ণতা নাই। লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণপতি,জয়া, বিজয়া লইয়া, তাই মা অসুর বধ করিতেছেন!

দরিদ্র বঙ্গবাসী! আজ এই দুর্দ্দিনে কি একবার চক্ষু মিলিয়া দেখিবে, কে আজ তোমার পর্ণগৃহে! আজ তোমার ধন ও বিদ্যার সমাবেশ কোথায়? দুরন্ত প্রভৃত পরাক্রমশালী অসুর কোথা হইতে ছদ্ম-বেশে আসিয়া, দেখ দেখি, তোমার কি না করিতেছে! তোমার ধনবানকে বিদ্যান হইতে পৃথক করিয়া দিতেছে; তোমার পশুশক্তি ও দেবশক্তিকে স্বস্থানচ্যুত করিয়া দিতেছে। তোমার পশুশক্তি আর দেবশক্তির পদতলে থাকিয়া কার্য্য করিতেছে না—উচ্ছৃঙ্খল হইয়া সমকক্ষ হইবার চেষ্টা করিতেছে; কাম-ক্রোধাদির প্রাবল্যে তোমার শক্তি হ্রাস হইয়া আসিতেছে।

দুর্ব্বল শরীরে রিপুর প্রাবল্য হইয়া থাকে। দুর্ব্বল ব্যক্তির কাম-ক্রোধাদি অতি প্রবল। তুমি এখন তোমার পশুকে ছাড়িয়া দিয়াছ—পশুকে যদৃচ্ছা ব্যবহার করিতে দিতেছ। কাজেই সেই বলশালী পশু এখন তোমার রক্তমাংস আহার করিতেছে! তুমি দুর্ব্বল হইবে না তো কি? আর, তাই এখন তোমার আত্মরক্ষার শক্তি নাই, সংসারিক কার্য্যে প্রবৃত্তি নাই, জীবনে স্পৃহা নাই—সংসার তোমার নিকট দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণার স্থান হইয়াছে! তুমি সংসার-সংগ্রামে পরাস্ত হইতে বসিয়াছ!

কিন্তু আর কতকাল এভাবে যাইবে? আর কতকাল বিনা-প্রাণে মার পূজা করিবে? বৎসরান্তে সময় আসিয়াছে; একবার চাহিয়া দেখ! এস, একবার ভক্তিভরে মার পূজা করি—একবার মার শিক্ষা গ্রহণ করি!

এস, এই আশ্বিনে—অম্বিকা-মাসে, ধনবান, বিদ্বান, ধার্ম্মিক, বলবান সকলে মিলিয়া এস,—একবার উচ্চৈঃস্বরে প্রাণ ভরিয়া মাকে ডাকি। এস, আমরা ঘরে ঘরে প্রতিমা তুলিয়া মার পূজা করি। ভক্তিভাবে ডাকিলে মা দুর্ব্বলের সহায়—মা বিদুরের খুদ গ্রহণ করিবেন। ইহাই মার মাতৃত্ব। সব তো হারাইয়াছি! এসময়ও, একবার এস, কাতর প্রাণে একবার মাকে ডাকি। ডাকিলে, মার মোহিনী মূর্ত্তি এখনও দেখিতে পাইব—মহাশক্তির

জগৎ-পালন বুঝিব—কর্ত্তব্য-জ্ঞান জন্মিবে। মা আমাদের দেবাসুর বধ করিয়াছিলেন; কিন্তু আমাদের অসুর তো অমর নহে! তাই বলি, একবার এস, 'দুর্গে দুর্গতি হরা' মাকে একবার প্রাণ ভরিয়া ডাকি!

চোরে-চতুরে।

চিৎপুর-রোডের একটী দ্বিতল বাটীর সম্মুখে—ফুটের উপর, একজন ৫০ বৎসর বয়স্ক মনুষ্য বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া জল-ধারা ঝরিতেছে। তাঁহাকে দেখিলে, একজন দরিদ্র ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার পরিধানে একখানি মলিন থান, ও গলায় সেইরূপ আর একখানি সামান্য থানের কাচা। পায় পাদুকা নাই; হাঁটুর নিম্নদেশ পর্য্যন্ত ধূলায় আচ্ছন্ন। তৈলবিহীন শরীরে যেন খড়ি উড়িতেছে। এই ব্যক্তি কোন্ সময় হইতে যে এখানে বসিয়া আছেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না। তবে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত যে এই স্থানে বসিয়া নীরবে রোদন করিতেছেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র ভুল নাই।

এই দ্বিতল বাড়িটী একজন বেশ্যার বাস-স্থান। কলিকাতার ভিতর নব্য সৌখিন বাবু-দিগের মধ্যে ইহাঁর বেশ নামডাক আছে; অনেক বড়মানুষ ইহাঁর মোহিনী-মায়ায় ভুলিয়া, আপনার যথা-সর্ব্বস্ব খোওয়াইয়া, পরিশেষে মাথা মুড়াইয়া, এই স্থান হইতে বাহির হইয়াছেন। কাজেই ইহাঁর দশ টাকার সংস্থান হইয়াছে; এবং ইনি উৎকৃষ্ট-উৎকৃষ্ট কতকগুলি অলঙ্কার-দ্বারা আপনার শরীর সুসজ্জিত করিতে পারিয়াছেন।

বেলা ৮টার সময়, নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাহিরের বারাণ্ডায় আসিবামাত্রই, সেই বারাঙ্গনা ঐ দরিদ্র ব্যক্তিকে প্রথম দেখিতে পান। এইরূপ দশটার সময়, স্নান করিয়া চুল শুখাইবার নিমিত্ত পুনরায় বারান্দায় আসিয়া যখন বসিলেন তখনও দেখিলেন, সেই ব্যক্তি সেই স্থানে বসিয়া আছেন; পুনরায় আহারান্তে সেই বারান্দায় আসিয়াও তাহাকে দেখিতে পান। দিনমানে একটু ঘুমাইয়া উঠিয়া পরে যখন আবার সেই বারান্দায় আসিয়া বসিলেন, তখনও সেই বৃদ্ধ সেই স্থানে বসিয়া আছেন! এবার তাঁহাকে দেখিয়া, রমণীর হৃদয়ে কিন্তু একটু দয়ার উদ্রেক হইল; সেই বৃদ্ধ কে, কোথায় থাকেন, সমস্ত দিবস একস্থানে সাশ্রু-নয়নে বসিয়া কেন দিনটী অতিবাহিত করিতেছেন, জানিবার নিমিত্ত, তাঁহার মন অতিশয় উৎসুক হইল। তখন তিনি তাঁহার একটী চাকরকে ডাকাইয়া কহিলেন,—"ফুটের উপর ঐ যে একটী বৃদ্ধ ব্যক্তি বসিয়া আছেন, তাঁহার নিকট গমন করিয়া আমার কথা তাঁহাকে বল; ও মিষ্ট কথা বলিয়া, তাঁহাকে আমার নিকট লইয়া আইস।" ভৃত্যও, আদেশ পাইবামাত্র, তাহাই করিল; বৃদ্ধের নিকট গমন-পূর্ব্বক, তাঁহাকে তাহার কর্ত্রীর আদেশ জ্ঞাপন করিল। বৃদ্ধ প্রথমে তাহার কথা শুনিলেন না, ও বেশ্যার বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতে অস্বীকৃত হইলেন; কিন্তু পরিশেষে, অনেক বুঝাইয়া বলায়, তিনি সম্মত হইয়া ভৃত্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

বৃদ্ধ উপরে উঠিলে, রমণী তখন দেখিলেন যে, তিনি একজন ব্রাহ্মণ। তখন, কি জানি কি ভাবিয়া, তাঁহাকে বসিবার নিমিত্ত একখানি আসন প্রদান করিলেন, ও তাঁহার অবস্থা দেখিয়া যেন অতিশয় দয়ার্দ্র হইয়া কহিলেন,—"মহাশয়, আপনাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, আপনি বিশেষ আন্তরিক কোন কষ্ট অনুভব করিতেছেন। যদি কোনরূপ প্রতিবন্ধক না থাকে, ও আপনার কষ্টের বিষয় আপনি আমাকে খুলিয়া বলেন, তাহা হইলে আমি

বিশেষ সন্তুষ্ট হইব; এবং আমার সাধ্যানুযায়ী যদি কোন বিষয় হয়, তবে তাহার প্রতিবিধানেরও বিশেষ চেষ্টা দেখিতে পারি।"

রমণীর এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ কহিলেন,—"বোধ হইতেছে, আপনি একজন বারাঙ্গনা হইবেন। আপনাকে আমার দুঃখের কথা বলিয়াও কিছু লাভ নাই। আপনার দ্বারা আমার কোন উপকার যে হইতে পারিবে, তাহা বোধ করি না। বিশেষ, আপনি এই বৃদ্ধ পাগল ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়াই বা কি করিবেন! আমার অদৃষ্টে ঈশ্বর যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইবেই হইবে। আপনি আমার কি উপকার করিতে পারিবেন? এই পাগলের কোন উপকার আপনার দ্বারা সম্ভব নহে।"—এই বলিয়া বৃদ্ধ নীরব হইলেন। কিন্তু তাঁহার চক্ষু দিয়া দরদর-বেগে জল-ধারা পড়িতে লাগিল।

বৃদ্ধের এই অবস্থা দেখিয়া, সেই রমণী তাঁহাকে বিশেষরূপে সান্ত্বনা করিলেন; এবং পরিশেষে অনেক করিয়া বলায়, তখন তিনি আপনার অবস্থা এইরূপ বলিতে লাগিলেন,—

"আমি একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ। পূর্ব্ব-অঞ্চলে আমার বাসস্থান। আমি বহুদিবস হইতে কলিকাতায় আসিয়া সামান্য দালালী-কার্য্যের দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতাম। আমার মাতা অতিশয় বৃদ্ধ হওয়ায়, তিনি ৺কাশীধামে ছিলেন। আমার স্ত্রী বরাবরই আমার দেশে থাকিতেন। আমি এই স্থানে যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতাম, তাহা হইতে কিছু আমার মাতার নিকট ও কিছু আমার স্ত্রীর নিকট পাঠাইয়া দিতাম; এবং তদপর, আমার নিজের বাসাখরচাদি বাদ অবশিষ্ট যাহা কিছু থাকিত, তাহা আমার নিজের নিকটই রখিয়া দিতাম। গত ভাদ্র মাসে আমি ৺কাশীধাম হইতে পত্র পাইলাম যে, আমার মাতা নিতান্ত শঙ্কটাপন্ন রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন; বোধ হয়, এ যাত্রা তাঁহার আর নিস্তার নাই। এই কথা শুনিবা-মাত্র, আমার যাহা কিছু সংস্থান ছিল, তাহা সমস্তই, মেছুয়া-বাজারের একজন পোদ্দারের নিকট রাখিয়া দিলাম। ঐ পোদ্দারকে অনেক দিবস হইতেই আমি জানিতাম; এবং তাহাকে ভাল লোক বলিয়াই আমার বিশ্বাস ছিল। কাজেই তাহার উপর কোনরূপ অবিশ্বাস না করিয়া, কোনরূপ রসিদ-পত্র না লইয়াই, আমার চিরকালের সঞ্চিত ৭০০৲ টাকা তাহার নিকট রাখিয়া, ৺কাশীধামে গমন করি। যখন আমি সেই স্থানে গমন করিলাম, সেই সময় কেবল ২৫টী-মাত্র টাকা আমার সঙ্গে লইয়া যাই। সেখানে গমন করিয়া দেখি, আমার মাতা প্রকৃতই মৃত্যু-শয্যায় শায়িত। তথাপি আমার যেরূপ সামর্থ্য, সেইরূপ চিকিৎসাও করাইলাম; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। এই আশ্বিন মাসের প্রথমেই তাঁহার ৺কাশীধাম প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই স্থানে সেই সাময়িক আবশ্যকীয় খরচাদির নিমিত্ত আমার নিকট যে কয়েকটী মাত্র টাকা ছিল, তাহার সমস্তই নিঃশেষ হইয়া তো গিয়াছেই; অধিকন্তু আমি আরও ঋণ-জালে জড়িভূত হইয়াছি। যাহাই হোক, অনন্যোপায় হইয়া এখন কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলাম; ভাবিয়াছিলাম, পোদ্দারের নিকট আমার যে টাকা আছে তাহা লইয়া সেই দেনা পরিশোধ করিব; এবং আমার যেরূপ সাধ্য, সেইরূপে শ্রাদ্ধ ও ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক মাতৃদায় হইতে অব্যাহতি পাইব। কিন্তু আমার সে আশায় এখন ছাই পড়িয়াছে! যখন পোদ্দারের নিকট গিয়া আমি আমার টাকা চাহিলাম, তখন সে আর আমাকে চিনিতেই পারিল না; টাকার কথা তো একেবারেই অস্বীকার করিল! আমি তাহাকে নানারূপ বুঝাইলাম, ধর্ম্মভয় দেখাইলাম ও অভিসম্পাতও

প্রদান করিতে লাগিলাম; কিন্তু সেই পামর পোদ্দার কিছুতেই আমার দিকে আর চাহিল না; আমার কথা আর শুনিল না। অধিকন্তু পাগল বলিয়া সকলের নিকট আমার পরিচয় দিল। ইহার পর, দুই একজন ভদ্রলোকের নিকটও আমি আমার দুঃখের কথা বলিয়াছিলাম। কিন্তু রসিদ-পত্র কিছুই না থাকায় ও আমার এই অবস্থা দেখিয়া, কেহই আমার কথা শুনেন নাই। পুলিসে গিয়াও নালিশ করিয়াছিলাম; তাহার ফলও কিছুই পাই নাই। অধিকন্তু সকলের নিকটই আমি পাগল বলিয়া এখন উপহাসাস্পদ হইতেছি। যদিও আমি প্রকৃত পাগল নহি, কিন্তু এখন আমি পাগল হইয়াই দাঁড়াইয়াছি। হায়-হায়! এখন আমি কিরূপেই বা আমার দেনা পরিশোধ করিব, ও কিরূপেই বা আমি আমার মাতৃদায় হইতে উদ্ধার পাইব? কি করিব, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, রাত্রিদিন তাহাই ভাবিতেছি, ও সেই বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য দেখিয়া তাহার চরিত্রের কথা মনে আন্দোলন করিতেছি। দেখুন, আজ ১১ই আশ্বিন গত হইল—শারদীয়া পূজা আগত-প্রায়; সকলেই পূজার আয়োজনে নিযুক্ত। আর, আমি যে কিরূপে শ্রাদ্ধের আয়োজন করিব, তাহাই ভাবিতেছি।"—এই বলিয়া, বৃদ্ধ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া ফেলিল।

রমণী তখন, মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া, তাঁহার সেই টাকা আদায় করিয়া দিবেন বলিয়া, বৃদ্ধকে চুপ করাইলেন; এবং কহিলেন,—"আমিও সেই পোদ্দারকে চিনি। অদ্য ৫টার সময় আমি তাহার নিকট হইতে আপনার সমস্ত টাকা আদায় করিয়া দিব; আপনার আর কোন ভাবনা নাই 'এখন' আপনি এই স্থানেই অপেক্ষা করুন। আমি এইস্থান হইতে পূর্ব্বেই বাহির হইয়া যাইব। কিন্তু আপনি ঠিক পাঁচটার সময় সেই দোকানে গিয়া উপস্থিত হইবেন। সেই স্থানেই আপনার সহিত আমার আবার সাক্ষাৎ হইবে। তখন কিন্তু আমাকে কোন কথা বলিবেন না; আপনি যে আমাকে চিনেন, তাহাও তাহাকে জানিতে দিবেন না। তবে সে সময় কেবলমাত্র আপনি সেই পোদ্দারের নিকট আপনার গচ্ছিত টাকা চাহিবেন; এবং আমি যদি দুই এক কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলে কেবলমাত্র সেই কথারই উত্তর প্রদান করিবেন। আর, তাহা হইলেই দেখিবেন যে, পোদ্দার তৎসহ আপনার টাকা মিটাইয়া দিবে। যদি না দেয়, তাহা হইলে আপনি আস্তে আস্তে আবার আমার বাটীতে চলিয়া আসিবেন; আমি অন্য কোন উপায় দ্বারা আপনার টাকা আদায় করিয়া দিব।"

এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ চুপ করিলেন, ও একটু সান্ত্বনা পাইয়া, সেই স্থানেই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

মেছুয়াবাজারের যে পোদ্দারের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহাকে কলিকাতার অনেকেই জানেন বলিয়াই, এই স্থানে তাহার আর নাম করিলাম না। বৃদ্ধকে যেরূপ উপায়ে সে প্রবঞ্চিত করিয়াছে, সেইরূপ, ও অন্যান্য অনেক উপায়ে, অনেকের সর্ব্বনাশ করিয়া সে অর্থের যথেষ্ট সংস্থান করিয়াছে।

৫টা বাজিতে প্রায় ১৫ মিনিট বাকী আছে। পোদ্দার আপন দোকানে বসিয়া কর্ম্ম-কাজ দেখিতেছে। এমন সময়, একখানি গাড়ি আসিয়া সেই দোকানের সম্মুখে থামিল; গাড়ি হইতে একটী রমণী বাহির হইলেন। পোদ্দার রমণীকে দেখিবামাত্রই চিনিল। রমণী তখন সেই দোকানের ভিতর গমন করিয়া উপবেশন করিলেন; এবং গাড়ি হইতে অল্প এক ব্যক্তি দুইটী বড় বড় ক্যাস বাক্স বাহির করিয়া সেই রমণীর নিকট রাখিয়া দিল। রমণী বাক্স দুইটী খুলিলেন; তাহার একটী ভাল ভাল অলঙ্কারে ও অপরটী তাড়া-

বন্দী নোটে পরিপূর্ণ। বাক্স খুলিতে খুলিতে তিনি সেই পোদ্দারকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন,—"আমার মাতা ৺বৃন্দাবনে বাস করেন। তিনি নিতান্ত পীড়িত, এইজন্য এখনই আমাকে তথায় গমন করিতে হইবে। কিন্তু আমার যত লোকের সহিত আলাপ আছে, তাহার মধ্যে তোমার অপেক্ষা বিশ্বাসী লোক আর কাহাকেও দেখি না। এই নিমিত্ত আমার গহনাগুলি ও টাকা তোমার নিকট রাখিয়া যাইব, মনস্থ করিয়াছি। আর, সেই নিমিত্তই এ সকল লইয়া আসিয়াছি। এখন, তুমি একবার দেখিয়া লও ও রাখিয়া দেও। তোমার নিকট রসিদ-আদি আর কি লইব? যাহাকে বিশ্বাস করি, তাহার নিকট আর লেখাপড়া কি? আমি যখন ফিরিয়া আসিব, তখন এসকল তোমার নিকট হইতে আবার লইয়া যাইব। তবে ঈশ্বর-ইচ্ছায় যদি আমার ভাল-মন্দ হয়, তাহা হইলে আমার একটী ভ্রাতা আছে, সে আসিবে। তাহাকে অর্দ্ধেক দিবে ও বক্রী অর্দ্ধেক তোমার ইচ্ছানুযায়ী কোন সৎকার্য্যে ব্যয় করিবে।"

পোদ্দারের সহিত এইরূপ কথা-বার্ত্তা হইতেছে; পোদ্দার এবার খুব এক হাত 'দাঁও' মারিব, এইরূপ ভাবিল। এমন সময়ে, সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই, সেই পোদ্দারকে কহিলেন,—"মহাশয়, আমার মাতৃদায় উপস্থিত। আমার গচ্ছিত টাকাগুলি অনুগ্রহ-পূর্ব্বক প্রদান করুন।" এই কথা শুনিয়া পোদ্দার অতিশয় বিপদে পড়িল; ভাবিল,—"এখন যদি কোন প্রকার ওজোর করিয়া ব্রাহ্মণকে বিদায় করি, বা আমার ব্যবহারের কথা বৃদ্ধ যদি এখন প্রকাশ করে; তাহা হইলে এই অগাধ অর্থ আমার হস্তগত হইবে না, দেখিতেছি। কোনরূপে অবিশ্বাস হইলে, এই রমণী আমার নিকট রাখিতে সাহসীই হইবে না।"—এই ভাবিয়া, বিশেষ যত্ন করিয়াই, সেই পোদ্দার তখন সেই ব্রাহ্মণকে বসাইল; এবং হিসাব করিয়া তাঁহার সমস্ত টাকা সুদ-সমেত চুকাইয়া দিল। বৃদ্ধ টাকা পাইয়া সমস্তগুলি গুণিয়া-গাঁথিয়া তখন আপনার সেই কাছার মুড়ায় বাঁধিলেন; এবং দ্রুত-পদে সেই স্থান হইতে বহির্গত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। মধ্যে মধ্যে এক এক বার পশ্চাৎ দিকেও চাহিতে লাগিলেন; কারণ, মনে ভয়, পাছে পোদ্দার আর কোনরূপ উপায় বাহির করিয়া টাকাগুলি কাড়িয়া লয়। এইরূপে বৃদ্ধ, রাস্তার কোন স্থানে আর না দাঁড়াইয়া, একেবারে সেই বারবনিতার বাড়ীতে গিয়া পৌঁছিলেন।

এদিকে, বৃদ্ধ সেখান হইতে বহির্গত হইতে না হইতেই, একজন লোক দ্রুতবেগে আসিয়া সেই দোকানে উপস্থিত হইল; এবং সেই রমণীকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—"আপনার পীড়িত মাতা আপনার বাড়িতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।" সেই সংবাদ শুনিবামাত্র, পোদ্দারকে আর কিছু না বলিয়াই, রমণী বাক্স দুইটী বন্ধ করিয়া আপনার চাকরের হস্তে দিলেন, ও উৎসুক-মনে দ্রুত-পদে গাড়িতে গিয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে গাড়ি সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

পোদ্দার দেখিয়া-শুনিয়া গালে হাত দিয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণও, সেই রমণীর বুদ্ধি-কৌশলে টাকাগুলি পাইয়া, এখন আর পাগল নহেন; এখন আর কেহই তাঁহাকে পাগল বলিতে সাহসী হয় না।

মানবজাতির প্রকৃত উন্নতি কি?

মানবের জীবন কার্য্যময়। যেদিন তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, সেই দিন হইতে যতদিন না ভবলীলা সম্বরণ করেন, ততদিন পর্য্যন্ত,

তিনি কার্য্য ভিন্ন কিছুই জানেন না। তাঁহার জীবনের এক মুহূর্ত্তও বিনা-কার্য্যে অতিবাহিত হয় না। যখন দেখিব তাঁহার কার্য্য শেষ হইয়াছে, তখন জানিব তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

মানবের যাবদীয় কার্য্যই জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হয়, কার্য্যমাত্রই তাঁহার সুখ-সম্বর্দ্ধনের জন্য। কেহ বা ইহকালের সুখান্বেষণে, কেহ বা পরলোকের সম্পত্তির জন্য যত্নবান। যাঁহার হৃদয়ে যেরূপ জ্ঞানের বিকাশ হইয়াছে, তাঁহার কার্য্যও তদনুরূপ।

জ্ঞানের বিকাশ নানা কারণে সকল হৃদয়ে সমান হয় না। ভূয়োদর্শন (Observation) এবং চিন্তা (Meditation) মন্থনে জ্ঞানের উৎপত্তি। যাঁহার ভাগ্যে যতদূর দর্শন ও চিন্তার অবসর ঘটিয়াছে, তাঁহার জ্ঞানও ততদূর বিস্তৃতি-প্রাপ্ত হইয়াছে।

অধ্যয়ন, ভ্রমণ এবং চিন্তা, জ্ঞান-পরিসর-করণের প্রধান পথ। নানা মনস্বী ব্যক্তিগণ দেখিয়া-শুনিয়া যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা অধ্যয়ন করিয়া, এবং নানা দেশের লোকের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া, যিনি যতদূর তাহাতে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন ও চিন্তার দ্বারা তাহাকে যতদূর বিশুদ্ধ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার জ্ঞানও ততদূর বিস্তৃত।

মানব এই জ্ঞানের দ্বারা তাঁহার যাবদীয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। কাহারও জ্ঞানে বা ইহলোকের সুখবর্দ্ধন করা সার বলিয়া প্রতীত হয়, আবার কেহ বা ইহলোককে তুচ্ছ করিয়া পরলোকের সদ্গতির জন্য ব্যস্ত হন। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে, যিনি দেখিয়া-শুনিয়া জ্ঞানলাভ করেন, তাঁহার কার্য্য প্রায়ই ইহলোকের সুখ-বর্দ্ধনের জন্য পর্য্যবসিত হয়; আর যাঁহার জ্ঞান প্রধানতঃ চিন্তা হইতে উদ্ভূত, তাঁহার কার্য্য পরলোক লইয়া।

যেখানে দেখিয়া-শুনিয়া কার্য্য, সেখানে কল্পনা স্থান পায় না। কিন্তু যেখানে কার্য্যের উপাদান চিন্তা, সে স্থান কল্পনার রাজ্য। মানব সাগর-উপকূলে বসিয়া দেখেন, সাগর অকূল। যতদূর পর্য্যন্ত দেখিতে পান, ততদূর কি আছে জানিতে পারেন বটে; কিন্তু যেই তাঁহার দৃষ্টি আর চলে না, অমনি কল্পনা আসিয়া তাঁহার চিত্তকে অধিকার করে—সাগরের পারে নানা বরণের নানা ছবি দেখিতে পান। কিন্তু যিনি সাহস করিয়া সমুদ্রের উপর অর্ণবপোত চালাইয়া যাইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত রহস্য জানিতে পারেন। তাঁহার নিকট আর কল্পনা আশ্রয় পায় না।

যিনি চিন্তার দ্বারা পরলোক নির্ণয় করিতে যান, তিনি যে কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া পড়েন, তাহা বলা বাহুল্য। মৃত্যুর পরই মহা অনন্ত; কাহার সাধ্য তাহার গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটিত করে? মানব অনন্তের অনন্তত্ব ভাবিতে ভাবিতে তাহাতে ডুবিয়া যায়—কূল কিনারা কিছু দেখিতে পায় না—শেষে জলমগ্ন ব্যক্তির ন্যায় আকুল হৃদয়ে চারিদিক অনুসন্ধান করিতে থাকে। এই সময় কল্পনা আসিয়া তাহাকে ক্রোড়ে বসাইয়া বলে,—"ওরে অভাগা সন্তান! ভয় নাই, আমি আসিয়াছি।" মানব অমনি আহ্লাদে গদ্গদ্ হইয়া দেখে, চারিদিক প্রভাসিত—মহাজ্যোতিঃ তাহাকে ওৎপ্রোত ভাবে ঘেরিয়াছে। সে তখনই বিনীত ভাবে কল্পনা-দেবীকে প্রণাম করিয়া বলে,—আমি ধন্য হইলাম।

দুর্ব্বল-চিত্ত ব্যক্তি ইহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। প্রকৃত পথ পরিত্যাগ করিয়া, কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া, যদি অনুমানকে পূজা করিলে ধর্ম্মার্চ্চনা করা হইত, তাহাহইলে আর ভাবনা কি? কিন্তু দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ মানবই এই পথ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন।

যে জাতি ভীরু, দুর্ব্বল, অথবা ভূয়োদর্শন

এবং চিন্তার দ্বারা জ্ঞানকে মার্জ্জিত করিতে অবসর পায় না; তাহাদের মধ্যেই অনুমানের সেবক বহুল পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু যাহারা কৃতী, তাহারা জ্ঞানের উন্নতির পথে ব্যবধান বসাইয়া, নিজের উন্নতির অন্তরায় হয় না। ইয়োরোপ ও এসিয়ার তুলনা করিয়া দেখিলে, সহজেই উপরোক্ত বক্তব্যের সত্যতা প্রতিপন্ন হইবে। আমি একথা বলি না যে, ইয়োরোপবাসী-মাত্রেই অনুমান-পূজার হাত হইতে নিস্তার পাইয়াছেন; তবে এই মাত্র বলি যে, ইয়োরোপে এখন এমন লোক জন্মগ্রহণ করিতেছেন, যাঁহারা জ্ঞানোন্নতির অন্তরায় অনুমানকে দূরে ফেলিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছেন; এবং এই সকল সমাজের শিরোভাগে শোভা পাইতেছেন। এসিয়ায় স্বাধীন-চিন্তা নাই—স্বাধীন চিন্তার আদর নাই। তাই ইহা ইয়োরোপবাসীর পদানত।

একদিন ভারতে স্বাধীন চিন্তার আদর ছিল। তাই ভারতে ষড়দর্শন, চার্ব্বাক-দর্শন প্রভৃতি নানা দর্শন-বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাই ভারতের গৌরবে সমস্ত জগৎ আকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য, এখন সে সময়ের সমস্তই ধ্বংশ হইয়া গিয়াছে! তবে যাহা দুই চারিখানা ধ্বংশাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা লইয়াই আমাদের এখন গৌরব।

অতএব, যে জাতির জ্ঞান, ভূয়োদর্শন এবং স্বাধীন চিন্তার পরিপুষ্ট না হয়, তাহারা কখনই মস্তক উত্তোলন করিতে সক্ষম হইবে না। প্রকৃত জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি না হইলে, প্রকৃত কার্য্যেরও অনুষ্ঠান হইবে না। কার্য্যই মানবের উন্নতির পরিচায়ক।

শ্রী শ:

ঠগী-কাহিনী।

(ঠগের নিজের মুখে শুনিয়া)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"The slack sail shifts from side to side,
The boat, untrimm'd, admits the tide,
Borne down, adrift, at random tost;
The oar breaks short, the rudder's lost."

Gay's Fables.

"No schoolboy, who, betwixt frolic and defiance, had executed a similiar rash attempt, could feel himself, when adrift in a strong current, in a situation more awkward than mine, when I found myself driving, without a compass, on the ocean of human life".

Sir Walter Scott.

"পরদিবস প্রাতঃকালে পিতা গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতি-কালে যাহাতে আমার কোনরূপ কষ্ট না হয়, সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। কিন্তু তিনি কোথায় গমন করিলেন, কত দিবস পরে প্রত্যাগমন করিবেন, তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তখন নানা-প্রকার চিন্তা আসিয়া আমার হৃদয় অধিকার করিল; ক্রমেই আমার মন বিচলিত হইতে লাগিল। রাত্রের সেই পরামর্শ—সেই সকল কথা, যতই চিন্তা করিতে লাগিলাম; ততই যেন অপার সমুদ্রের ভিতর হাবু-ডুবু খাইতে লাগিলাম। মন যেন সন্দেহ-যানে ভাসমান হইয়া অকূল পাথারে পড়িয়া ঘুরিতে লাগিল; নাবিক-বিহীন পোত অপার সমুদ্রে যেরূপ অবস্থায় পতিত হয়, আমারও তাহাই হইল। তখন আমি পুস্তক লইয়া আবার আমার সেই শিক্ষক বৃদ্ধ মোল্লার উদ্দেশে চলিলাম; তাঁহার নিকট গিয়া উপবেশন করিলাম। 'রেহলের' উপর 'কোরাণ সরিফ' রাখিয়া সমস্ত শরীর দোলাইয়া দোলাইয়া, উহা পড়িবার চেষ্টা করিলাম;

কিয়ৎক্ষণ পড়িলামও। কিন্তু উহা ভাল লাগিল না। মধ্যে মধ্যে অন্যমনস্ক হইয়া আবার ভাবিতে লাগিলাম।

"বৃদ্ধ মোল্লা, যাঁহাকে আমি বিশেষ বিদ্বান বলিয়া জানিতাম, তিনিও তখন, আমার মনের ভাব বুঝিলেন; ভাবিলেন, আমার মনে অতিশয় দুঃখ হইয়াছে, আমার পিতার নিমিত্তই আমার মন কাঁদিতেছে। তিনি আমার মনকে অন্যমনস্ক করিতে চেষ্টা করিলেন, 'কোরাণ' হইতে বাছিয়া বাছিয়া উপদেশ সকল আমাকে শোনাইতে লাগিলেন, মুসলমান-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, ইহ-কাল পরকালেরও অনেক কথা বলিলেন। কিন্তু তাহার একটীও আমার ভাল লাগিল না, এক-টীও আমার নূতন বোধ হইল না। সে সমস্ত কথাই আমি বারবার যেন তাঁহার নিকট শুনি-য়াছি, অনেকবারই যেন সেই সকল উপদেশ তিনি আমাকে প্রদান করিয়াছেন! তখন আমি কোরাণের আরও নূতন কথা বৃদ্ধের নিকট শুনিতে চাহিলাম। কিন্তু আমার সে আশা পূর্ণ হইল না; আমি যাহা কখন ভাবি নাই, তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিলেন। তিনি স্পষ্ট করিয়াই কহিলেন,—'আমি কোরাণের সকল কথা অবগত নহি; যাহা জানি, তাহার সমস্তই তোমাকে বলিয়াছি। যাহা বলিয়াছি, তাহার অধিক আর আমি জানি না, আর আমি শিখিও নাই। অধিকন্তু, উহা ব্যতীত আর কোন নূতন কথা কোরাণে আছে কি না, তাহাও আমি অবগত নহি।' সেই দিবস হইতেই আমি আর কোন কথা মোল্লাকে জিজ্ঞাসা করিলাম না। ক্রমে তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইবার আশাও পরিত্যাগ করিলাম। ভাবিলাম, উহাই মুসলমান-ধর্ম্মের শেষ; মোল্লার নিকট যে ধর্ম্ম-পুস্তক পাঠ করিয়া ধর্ম্মের উপর কিছুই বিশ্বাস হইল না, তখন আর সে ধর্ম্ম-পুস্তক পাঠে আবশ্যক কি!—সে ধর্ম্মে প্রয়োজনই বা কি! তখন আমি আমার পিতা ইস্‌মাইলের কথা ও হোসেনের পরামর্শ মনে করিলাম। মনে মনে তাঁহাদিগের ধর্ম্মেই দীক্ষিত হইতে মনস্থ করিলাম। কিন্তু তখন পর্য্যন্তও আমি জানি না যে, সে ধর্ম্ম কি!

"একমাস পরে আমার পিতা হোসেনের সহিত ফিরিয়া আসিলেন। আমার সমস্ত অবস্থা দেখিলেন, ও সমস্ত কথা শুনিলেন। আমি বুঝিলাম যে, পিতা আমার এভাবে অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং সন্তুষ্টই হইয়াছেন। কিন্তু স্পষ্ট তিনি কিছুই বলিলেন না। সেই সময় আমি একবার মনে মনে ভাবিয়াছিলাম যে, আমি নিজেই সেই দিবসের রাত্রির পরামর্শের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আলোড়িত মনকে স্থির করি, প্রাণকে শীতল করি। কিন্তু তাহা বলিতে পারি-লাম না; বলিতে গিয়া মুখ যেন বন্ধ হইয়া আসিল। কাজেই চুপ করিলাম; ভাবিলাম, আরও কিছু দিবস অপেক্ষা করিয়া দেখি; যদি পিতা নিতান্তই নিজে না বলেন, তখন যাহা হয় করিব।

"এক দিবস সন্ধ্যার সময় পিতা আমাকে তাঁহার শয়ন-ঘরে ডাকিলেন, ও আমি তাঁহার নিকট গিয়া উপবেশন করিলাম। তিনি আমার সহিত নানা-প্রকার গল্প আরম্ভ করিলেন; নানা কথা বলিতে লাগিলেন। সেই সকল কথা শুনিতে শুনিতে আমার মনের ভাব যেন কেমন একরকম পরিবর্ত্তিত হইল, হৃদয় সেই পুরাতন তরঙ্গে উথলিয়া উঠিল, চক্ষু দিয়া জল ঝরিল। পিতা আমার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন, ও চক্ষু-জল মুছাইয়া দিলেন; এবং হঠাৎ এইরূপ দুঃখের কারণ কি, জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন আমি তাঁহার নিকট আমার মনের সমস্ত কথা অকপটে বলিলাম। সেই দিবস রাত্রে যে যে-ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহা যাহা দেখিয়াছিলাম, যাহা কিছু শুনিয়াছিলাম, সমস্তই বলিলাম;

পিতা কোন ধর্ম্ম উপাসক, তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম; এবং আমিও যে মনে মনে সেই অজানিত ধর্ম্মের প্রতি আমার মন-প্রাণ অর্পণ করিয়াছি, তাহাও তাঁহাকে বলিলাম।

"তিনি এই সকল কথা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরিশেষে আমাকে সান্ত্বনা করিয়া মিষ্ট কথায় আমাকে ভুলাইলেন, ও তিন দিবসের মধ্যে আমাকে সমস্ত কথা বলিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। আমি সে দিবস ক্ষুণ্ণ মনে পিতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আপন ঘরে গমন করিলাম।

"পিতা যাহা বলিয়াছিলেন, পরে কিন্তু তাহাই করিলেন। দুই দিবস পরে তিনি আমাকে সমস্ত কথা বলিলেন। তাঁহার ধর্ম্মের কথা প্রকাশ করিলেন, তাঁহার কার্য্যের কথা বলিলেন, এবং আমার মনকে দৃঢ় করিতে পরামর্শ দিলেন। আমিও সে সমস্ত কথাই বিশেষ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিলাম। মনকে দৃঢ় করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

"পিতা কহিলেন,—'পুত্র, আমি মুসলমান। মুসলমান মোল্লার নিকট আমিও প্রথমে মুসল-মান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলাম, কোরাণের আগাগোড়া সমস্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। কিন্তু জানি না, আমার সেই ধর্ম্ম কেন ভাল লাগিল না, কোরাণ পড়িতে আর কেন ইচ্ছা হইল না! তোমার যেরূপ মনের গতি হইয়াছে, আমারও মন সেইরূপ আলোড়িত হইয়াছিল। কিন্তু সেই সময়ে একটী বৃদ্ধ হিন্দু-ঠগের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়; এবং তাঁহার নিকট আমি প্রথমে প্রকৃত ধর্ম্মের মাহাত্ম্য পাই, তাঁহার কথায় আমি পরিতুষ্ট হই। তিনি আমাকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা সমস্ত আমার মনে নাই। যাহা আছে, তাহার সমস্তও এখন বলিবার সময় নহে। তবে সংক্ষেপে তাহার এক-আধটী কথা বলি; ইহা-তেই তুমি আমাদিগের ধর্ম্মের কতক আভাস পাইবে। দেখ পুত্র, এজগতে কর্ম্মযোগ ভিন্ন কাহারও উদ্ধার হয় না,—কর্ম্ম-যোগ ব্যতিরেকে এই অপার সংসার হইতে উদ্ধার হইবার আর কোন উপায়ই নাই। সেই জন্য, কর্ম্মযোগের নিমিত্ত, মন-প্রাণ নিযুক্ত করা আমাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য।

'আমি যদিও মুসলমান, পৈত্রিক-ধর্ম্ম যদিও একেবারে পরিত্যাগ করা আমার কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু ইহাতে আমাদিগের উদ্ধার নাই। আমরা ভবানীর আদেশমত যে কর্ম্ম-যোগে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই কর্ম্মযোগের গুণেই আমাদের উদ্ধার হইবে, তাহার নিষ্কাম ফল আমরা প্রাপ্ত হইব, সর্ব্বদুঃখনাশী শান্তির ক্রোড়ে শয়ন করিয়া অনন্ত শান্তি-সুখ অনুভব করিব। আমাদিগের প্রশংসনীয় বুদ্ধি আত্মাতে গিয়া লীন হইবে।

'পুত্র, তুমি বোধ হয়, আমাদিগের ধর্ম্ম যে কি, তাহা এখন বুঝিতে পারিয়াছ। যদি না পারিয়া থাক, তাহা হইলে আমি স্পষ্ট করিয়াই তোমাকে বলিয়া দিতেছি যে, আমাদিগের ধর্ম্ম ঠগীধর্ম্ম—ভবানী আমাদিগের নিমিত্তই এই ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছেন, ও বাছিয়া বাছিয়া কতকগুলি লোককে এই ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া-ছেন। আমাদিগের নিমিত্ত একটী স্বতন্ত্র ভাষারও সৃষ্টি করিয়াছেন; সে ভাষা ঠগ ভিন্ন আর কেহই বুঝিতে পারে না। আমরা যেস্থানে যাইব, সেই স্থানেই আমাদিগের অবারিত দ্বার, সেই স্থানের ভ্রাতারাই আমাদিগকে প্রাণের মত দেখিবে।

'এই ধর্ম্মে ভাল-মন্দ বিচার নাই; কারণ, ইহাতে মন্দ নাই—সমস্তই ভাল। ইহাতে হিন্দু-মুসলমানের কোন পার্থক্য নাই; কারণ, সকলেই ভবানীর সেবক—সকলেই পরস্পর ভ্রাতা। পৃথিবীর ভিতর যদি কোন বিশ্বাস-উপযোগী ধর্ম্ম থাকে, তবে তাহা 'ঠগ-ধর্ম্ম'! এই জগতকে

পাপীদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত এই ধর্ম্মের সৃষ্টি। পাপীগণ আমাদিগের হস্তে জীবন ত্যাগ করিলে, তাহারা পাপ হইতে বিমোচিত হইয়া ধার্ম্মিকের স্থান অধিকার করে, ও অনন্ত-কালের নিমিত্ত অনন্ত স্বর্গ-সুখ অনুভব করে। যদি তুমি বল, পাপীগণকে হত্যা করিলে তাহাদের পাপ বিমোচিত হইবে, কিন্তু আমরা মহাপাপে পড়িব; কিন্তু, পুত্র, সেরূপ মনে করিও না। এক সময় এ চিন্তা আমারও মনে উদয় হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে আমার দীক্ষাগুরু সেই বৃদ্ধ হিন্দু-ঠগ বলিয়াছিলেন,

"সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবম্ পাপমবাপস্যসি।"

অর্থাৎ তুমি যে কহিতেছ, ইহাদিগকে হনন করিলে আমাদিগের মহাপাপ হইবে; তাহার উত্তর এই যে, সুখ এবং দুঃখ, লাভ এবং ক্ষতি, জয় এবং পরাজয় এ সমুদায়ে সমান জ্ঞান করিয়া, সুতরাং তাহাতে হর্ষবিষাদ শূন্য হইয়া, ধর্ম্মযুদ্ধে উদ্যুক্ত হও। তাহাতে তোমার কোন পাপ হইবে না।

'ইহাতে আমাদিগের কোনরূপ পাপ হইবার সম্ভাবনা নাই। তৎব্যতীত ঐ সকল ব্যক্তির নিকট হইতে অনেক বিষয়াদি অনায়াসেই প্রাপ্ত হইয়া মহাসুখে ঐ সকল ভোগ-পূর্ব্বক কাল-যাপন করিতে পারিব। ইহাই আমাদিগের কৈবল্য-প্রাপ্তির আর একটী প্রধান কারণ।

'পুত্র, ইহাই আমাদিগের ধর্ম্ম, ইহাই আমাদিগের কর্ম্ম। এখন ভরসা করি, তুমি আমাদিগের ধর্ম্মের কথা কতক অবগত হইয়াছ। এখন, তুমি আমাদিগের এই সর্ব্বজন-প্রশংসিত ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আপন মনকে পরিতৃপ্ত ও আত্মাকে কৃতার্থ কর! এখন, মনকে দৃঢ় করিয়া, ধৈর্য্য-রজ্জুতে তাহাকে বাঁধিয়া, বিশ্বাস-পথে তাহাকে চালিত কর; তাহা হইলেই তুমি ঠগদিগের মধ্যে ক্রমে একজন প্রধান ঠগরূপে পরিগণিত হইয়া সর্ব্বোচ্চ আসনে উপবেশন করিবে। আমিও বৃদ্ধ বয়সে আমার পুত্র আমির আলির কার্য্যকলাপ ও কীর্ত্তি শুনিয়া পরম প্রীত হইতে থাকিব।'

"ইসমাইলের এই কথা শুনিয়া আমি কহিলাম,—'পিতা আমাকে আর অধিক কিছু বলিতে হইবে না; বুঝি না বুঝি, পিতা যে ধর্ম্ম-গ্রহণ করিয়াছেন, আমিও অদ্য হইতে সেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম গ্রহণ করিলাম। আপনি যেরূপ আদেশ প্রদান করিবেন, অবলীলাক্রমে আমি তাহাই সম্পন্ন করিব।"

হিন্দু-সমাজ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান একস্থানে বলিয়াছেন,—"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।" অর্থাৎ কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের ভেদবুদ্ধি জন্মাইবে না। সমাজ যেরূপ অবস্থায় উপস্থিত হউক না কেন, তন্মধ্যে দুই শ্রেণীর মনুষ্য থাকিবেই। এক শ্রেণী জ্ঞানী, তত্ত্বদর্শী; অন্য শ্রেণী কর্ম্মাসক্ত, অজ্ঞানী। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম্মাসক্তকে পরিচালনা করিবেন। কর্ম্মাসক্ত ব্যক্তি ঘোরতর সংসারী হইয়া থাকে; স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পরিবারবর্গ, ধন, অর্থ, ব্যবসায়, বাণিজ্য ভিন্ন অন্য বিষয়ে তাহার অস্তিত্বই থাকে না। এইরূপ ব্যক্তির যুক্তি-তর্ক দ্বারা কোন বিষয় মীমাংসা করিবার অবসর থাকে না। এজন্য জীবনের গুরুতর বিষয়ে ইহাদিগকে জ্ঞানী ব্যক্তির আশ্রয় লইতে হয়। জ্ঞানী ব্যক্তির বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কর্ম্ম করিতে করিতে ইহাদের জ্ঞানলাভ হয় তখন ইহাদের প্রথমকার বিশ্বাস দূরীভূত হয়; তখন ইহারা শাস্ত্রে-বিশ্বাস, ঈশ্বর-ভক্তি, কর্ম্মানুরাগ প্রভৃতি সদ্গুণে অলঙ্কৃত হইয়া নবজীবন লাভ করে।

ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত যে, কর্ম্মাসক্ত ব্যক্তির ভেদবুদ্ধি জন্মিলে, সমাজে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা, নানাবিধ পাপ ও অশান্তি প্রবেশ করে।

সুতরাং যদি কোন কারণে সমাজে এই ভেদবুদ্ধি উৎপন্ন হয়, তখন জ্ঞানী সমাজ-তত্ত্ববিৎ ব্যক্তিদিগের কর্ত্তব্য কি?

যে কারণেই হউক না কেন, উপস্থিত সমাজে কর্ম্মাসক্ত ব্যক্তির সংখ্যাই অধিক; এবং তাহাদের মধ্যে কিছু না কিছু ভেদবুদ্ধি জন্মিয়াছেই। অনধিকার-চর্চ্চা প্রবল বেগে সমাজ-মধ্যে বহিয়া চলিয়াছে। যিনি ঘোরতর সংসারী, তাঁহার মুখেও, ন্যায় বা অন্যায় হউক, ধর্ম্ম ও শাস্ত্র-সম্বন্ধে নানা-প্রকার কুতর্ক শুনিতে পাওয়া যায়। এমন কি, স্ত্রীলোক, বালক, যুবক সকলেই, সমাজ, নীতি ও সংস্কার-সম্বন্ধে কত না কথাই কহিয়া থাকেন।

উচ্ছৃঙ্খল মনে কাজেই নানা-প্রকার সন্দেহ জন্মিয়া থাকে। রাজপুরুষ হইতে আরম্ভ করিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই, হিন্দু-ধর্ম্ম, হিন্দু-সমাজ ও হিন্দুর আচার-ব্যবহার-সম্বন্ধে নানা কথাই কহিয়া থাকেন; নানা-প্রকার যুক্তির আবরণ দিয়া নীল, পীত, লোহিত ও লাল বর্ণের বিষ উদ্গীরণ করিতেছেন। অন্য পক্ষে প্রকৃত জ্ঞানী, প্রকৃত তত্ত্ববিৎ সুতার্কিকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইয়াছে। অন্নচিন্তা এরূপ ভয়ঙ্করী হইয়া উঠিয়াছে যে, প্রকৃত শাস্ত্র-ব্যবসায়ী আর দেখাই যায় না। ইয়ুরোপ এদেশে বিলাসিতা আনিয়াছে। যাঁহারা নামে এখনও শাস্ত্র-ব্যবসায়ী আছেন, তাঁহাদেরও অনেকের মধ্যে অদ্ভুত বিলাসিতা দেখা দিয়াছে। প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান দেশ হইতে উঠিয়া যাইতেছে।

হিন্দুধর্ম্মের মত সারবান ধর্ম্ম জগতে নাই। নাই বলিয়া, এত বিপত্তিতেও হিন্দুধর্ম্ম টিকিয়া আছে। কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন, অদ্য হিন্দু-সমাজ যে অবস্থায় আসিয়াছে, সে অবস্থায় চারিদিকেই ভয় ও বিপদ। যদি ইহার প্রকৃত রক্ষার উপায় না হয়, তবে ঠিক বলা যায় না যে, এ ধর্ম্ম ভারতবর্ষে আর কত দিন থাকা সম্ভব! বলা যায় না, পাষণ্ডদিগের ভয়ে সদ্গ্রন্থ-সমূহ লুপ্ত হয় কিনা? বলা যায় না, আধুনিক আর্য্যজাতিকে অনুপযুক্ত ভাবিয়া বেদ, শাস্ত্র, তন্ত্র, মন্ত্র এদেশ পরিত্যাগ করিয়া যায় কি না? ভগবান কাপুরুষ দ্বারা নিজ-মহিমা কখনও প্রকাশ করিতে চাহেন না। তুলসিদাস বলেন,—

"হরিত ভূমি তৃণসঙ্কুল সমুঝি পরে নাহি পন্থ।
জিমি পাষণ্ড বিবাদতে লুপ্ত হয়ে সদ্গ্রন্থ॥"

অর্থাৎ যেমন বর্ষাকালে নূতন তৃণ দ্বারা পরিপূরিত হওয়ায় পথ-সকল লুপ্ত হয়, তদ্রূপ পাষণ্ডদিগের বিবাদ দ্বারা উত্তম গ্রন্থ-সকল লুপ্ত হইয়াছে। হিন্দু-সমাজে কুতর্ক-বর্ষাজাত সংশয়-তৃণ এত জন্মিয়াছে যে, ভক্তি, শ্রদ্ধা, ধর্ম্মভাব, সামাজিক শান্তি, স্নেহ, দয়া, মমতা, প্রণয়, সদ্চিন্তা প্রভৃতি সুপন্থাগুলি বিলীন-প্রায় হইয়া উঠিয়াছে। ইহা যদি হিন্দুজাতির বিপদের সময় না হয়, তবে বলা যায় না, কাহার নাম প্রকৃত বিপদ?

এ অবস্থায় হিন্দু-সমাজের রক্ষক কে? যখন এইরূপ ভেদবুদ্ধি জন্মিয়াছে, তখন উপায় কি? সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী কতকগুলি ব্যক্তি দুই একটি উপায় স্থির করিয়াছেন। সে উপায় কএকটী এই:—

(১) কতকগুলি লোক বলিতেছেন,—শাস্ত্রের কথার উপর তর্ক করিও না। হিন্দুর আচার-ব্যবহার, হিন্দুর শিক্ষা অতি উচ্চ ও পবিত্র। ইহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কার্য্য কর, সুফল ফলিবে। পূজা, দান, ধ্যান, অতিথি-সেবা, ফোঁটা-কাটা, টিকি-চৈতন-রাখা, সমস্তই পালন কর; হিন্দুধর্ম্মের কোন বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক নাই। যাহা পিতা-পিতামহ পালন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই পালন কর—তোমার মুক্তি হইবে। কিন্তু যখন মন কারণ-জিজ্ঞাসু হইয়াছে, তখন প্রথমতঃ ইহা পালন

করাই যায় না। যদিও বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু সে বিশ্বাস অধিক দিন কিছুতেই স্থায়ী হয় না। এরূপ দেখা যায়, অনেকেই অপরের কথা-মত ৫।১০ বৎসর ফোঁটা কাটিয়া, টিকি-চৈতন রাখিয়া কার্য্য করিলেন; কিন্তু পরে হতাশ হইয়া আসিয়া বলিলেন, আমার ধর্ম্ম-জ্ঞান, ভক্তি-শ্রদ্ধা কিছুই হয় নাই। সুন্দর হিন্দুর আচার-ব্যবহার পালন করিব কি, নানা-বিধ প্রশ্ন উঠিয়া অন্তরাকাশ অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে যখন মনে সন্দেহ না উঠে, তখন সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য, যাহাতে ভেদ-বুদ্ধি না জন্মে। কিন্তু যখন কুতর্ক কুযুক্তি দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া হৃদয়ে ভেদবুদ্ধি বদ্ধমূল হইয়া যায়, তখন শাস্ত্রের দোহাই দিলে ধর্ম্ম বা সমাজ রক্ষা হয় না।

(২) উপস্থিত বিপদ হইতে হিন্দু-ধর্ম্ম, হিন্দু-সমাজ রক্ষা করিবার জন্য ইহাঁরা হিন্দু-শাস্ত্র সাধারণের পাঠোপযোগী করিয়া দিতেছেন। ইহাতে সাধারণের পক্ষে বিলক্ষণ সুফল ফলিতে পারে। কিন্তু শাস্ত্র-বিরোধী যে সমস্ত যুক্তি ও তর্ক শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের অন্তর আক্রমণ করিয়াছে, শাস্ত্র-প্রচারে তন্নিবারণের কোনই উপায় হইতেছে না। কারণ, যে সমস্ত শাস্ত্রীয় উপদেশ আজকাল বঙ্গ-ভাষায় প্রচার হইতেছে, সেই সমস্ত শাস্ত্রীয় বাক্য, কু-টীকা কু-টিপ্পনী সহিত অনেক পূর্ব্বে বিজাতীয় ভাষায় প্রচার হইয়া লোকের মস্তক অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। এজন্য, বিরোধীয় মত ভ্রান্ত হইলেও অবয়ব-বৃদ্ধি করিয়া সুশিক্ষা লোপ করিতেছে। আর,এই জন্যই বলিতেছিলাম, ভেদবুদ্ধি জন্মিলে, শাস্ত্রের দোহাই দিলে বা শুধু শাস্ত্রের উপদেশ ভাষান্তরে প্রচার করিলে,আংশিক ফললাভ হয় সত্য, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্ম-রক্ষা বা সমাজ-রক্ষা হয় না। আমরা এ সম্বন্ধে দুইটি উপায় বলিতে পারি। প্রথমতঃ—যুক্তি দ্বারা ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম উদ্ঘাটন করা কর্ত্তব্য। সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত অশাস্ত্রীয় কথা প্রচারিত হইতেছে, ধীর ভাবে তাহারও ভ্রম প্রদর্শন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়তঃ—শাস্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা একত্রে সমবেত হইয়া, যে সমস্ত বিষয়ে মতবিরোধ নাই, সেইগুলি বক্তৃতা দ্বারা সাধারণের নিকট প্রচার করেন।

বলিতে হইবে না, অল্প পরিমাণে সমাজে উপরোক্ত দুইটি উপায়েই কার্য্য হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যেরূপ হওয়া আবশ্যক, তাহা হইতেছে না। হিন্দুধর্ম্মের শত্রুদিগের সহিত বিবাদে কিছুই ফল নাই। তবে যদি হিন্দু-ধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ লোকের মধ্যে প্রচার করা যায়, তাহাহইলে কোন ধর্ম্মই ইহার ছায়াও স্পর্শ করিতে পারে না।

আমরা উপরে দেখাইয়াছি, কি কি উপায়ে উপস্থিত বিপদ হইতে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু-সমাজকে রক্ষা করা যাইতে পারে। তাহা সংক্ষেপতঃ এই :—

(১) হিন্দু-ধর্ম্মের অর্থ কি, হিন্দু-আচার-ব্যবহারের যুক্তি কি, এক মত হইয়া তাহা প্রচার করা অতি আবশ্যক।

(২) হিন্দু-ধর্ম্ম, সমাজ, আচার-ব্যবহার-সম্বন্ধে যে সমস্ত মতামত প্রচার হয়, তাহা যদি হিন্দু-ধর্ম্মের বিরোধী হয়, তবে তাহার ভ্রম প্রদর্শন করিয়া বিরোধীয় মতের বিনাশ-সাধন আবশ্যক।

(৩) ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এবং ইংরাজী-শিক্ষিত হিন্দু-ধর্ম্মে আস্থাবান ব্যক্তি মিলিয়া,একটি সভা সংস্থাপিত হওয়া আবশ্যক। বৎসরে অন্ততঃ একবার করিয়া এই সভার অধিবেশন আবশ্যক। এই সভা হইতে বক্তা ও পণ্ডিত মনোনীত করিয়া ধর্ম্মপ্রচার আবশ্যক। মূল সভার মত আংশিক সভাও আবশ্যক। অন্ততঃ যে বিষয়ে সকলে একমত সেই সমস্ত বিষয়ে বক্তৃতা প্রয়োজন।

যাহা বলা গেল, প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ মিলিয়া তাহার আয়োজন করিলে, এ সকল বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়াও অসম্ভব নহে। আর, ইহা অপেক্ষা গুরুতর কর্ত্তব্য হিন্দুর আর কি হইতে পারে!

দুইখানি ছবি।

দশম দৃশ্য।*

পর পর।

কলিকাতার সেই পল্লীটি। গলির ভিতরের একখানি দ্বিতল বাড়ীর দরজায়, সন্ধ্যার সম-সমকালে, একখানি 'ছ্যাকড়া গাড়ি' আসিয়া থামিল। গাড়ীর ভিতর হইতে একটী ভদ্র-বেশ বাবু, একটী যুবতী স্ত্রীলোকের হাত ধরিয়া নামিলেন। সঙ্গে আর কোনরূপ জিনিষ-পত্র ছিল না; কাজেই কেবল স্ত্রীলোকটির হাতখানি ধরিয়াই, বাবুটি বাড়ীর ভিতর তাড়াতাড়ি প্রবেশ করিলেন। গাড়োয়ানও, বক্‌শিস্-মত ভাড়া চুকাইয়া পাইয়া, অন্যপথ দিয়া বিদায় হইল।

বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, একেবারেই স্ত্রীলোকটীকে সঙ্গে লইয়া (এখন আর হাত ধরিয়া নহে) বাবুটি অন্দরে প্রবেশ করিলেন; এবং বাহ্য আনন্দভাব প্রকাশ করিয়া, অথচ বিশেষ চিন্তিত মনে, আপনার স্ত্রীকে বলিলেন,—"এই ন্যাও; রাম দাদার স্ত্রীকে দেখ্‌তে বড় সাধ—এই তাঁকে এনেছি। রাম দাদা বৈকালে আসবেন—আজ তাঁকেও নেমন্তন্ন ক'রে এসেছি। রাত্রে আজ এঁকেও রাখ্‌বো, তাঁকেও রাখ্‌বো।"

সরলা পত্নী তাহাই বুঝিল; "ভাল—ভাল; বেশ ক'রেছ!"—বলিয়া, বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিল। তাহার অনেক দিনের আশা মিটিল—সে তা'র স্বামীর পরম-বন্ধু রাম বাবুর স্ত্রীকে দেখিতে পাইয়া যেন পরম আপ্যায়িত হইল। রাম বাবুর স্ত্রীকেও সে তখন নানারূপে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টিত হইল। তবে কি জানি কেন, স্ত্রীটী কিন্তু তত আনন্দ অনুভব করিলেন না; কি এক দুর্ভাবনায় তাঁহার মন যেন চঞ্চল হইয়া আসিল। আর, সে ভাব মুখ-ভঙ্গীতেও যেন কতক ব্যক্ত হইতে লাগিল। তবে প্রকাশ্যে কিছুই বুঝা গেল না। যাইহোক, বাড়ীর বধূ রাম বাবুর স্ত্রী-বোধেই স্ত্রীলোকটীকে আদর করিতে লাগিল। তবে বুধুটি কোন কথাবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে, তার আর তেমন উত্তর পাওয়া গেল না; স্ত্রীলোকটি বুধুটির সহিত তেমন মিশিলেনই না। কাজেই বধূ কতকটা যেন হতাশ্বাসই হইল।

* * * *

খানিক পরেই, রাম বাবু অভিধেয় একটী বাবুও আসিয়া সেই বাড়ীতে পৌঁছিলেন। বাড়ীর নব্য-কর্ত্তা সেই প্রথমকার বাবুটির সহিত, গাড়ি হইতে নামিয়াই, তাঁহার সাক্ষাৎ হইল।

রাম বাবু হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিহে ভায়া, বাড়ীতে এনে পুরে, শেষে আমাকেও ফাকি দেবে নাকি? তা' যাই কর, এখন বল দেখি, তার পর কি হ'ল!"

"তার পর আর কি! ওয়ারেণ্ট লইয়া যে ডিটেক্‌টিভটা আসিয়াছিল, গৌরেটাকে আমি তখনই তা'র হাতে ধরিয়ে দিলেম; বল্লেম,—'চঞ্চলা বলে কেউই এ বাড়ীতে থাকে না। সেদিন একটা নূতন স্ত্রীলোক এসেছিল বটে, কিন্তু সে সেই দিন সন্ধ্যার সময়ই চলিয়া যায়। তবে তাহাদের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, তাহারা কাশী যাইবে।'—এই বলিয়া, ডিটেক্‌টিভকে কাশীর একটা বাজে ঠিকানাও বলিয়া দিয়াছি। যাইহোক, ডিটেক্‌টিভ কিন্তু আমার সেই হ্যাঁপাতেই ভুলিয়া গেল—গৌরে বেটারই

* এ বর্ষের ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর।

হাতে হাত-কড়ি বেঁধে, খুনী আসামী বলিয়া, চালান দিল। তবে গৌরেটাকে একটু কৃতজ্ঞ বলিতে হয় যে, সে তখনও চঞ্চলার নাম করিল না; চঞ্চলাকে বড়ই ভাল বাসিত বলিয়াই, বোধ হয়, তাহাকে আর বিপদে জড়াইল না! সে জড়াইলে কিন্তু বড়ই মুস্কিল হইত!"

রাম বাবু।—"বেশ—বেশ! আচ্ছা, তা'র পর!—তা'র পর!"

"তা'র পর আবারও শুনতে চাও! আচ্ছা শোন। তার পর, তুমি পশ্চাৎদিকের দুয়ারে যে গাড়িখানা আনিয়া দিয়া যাও, সেই খানাতেই চঞ্চলাতে ও আমাতে উঠি। কিন্তু সে সময়ও, বড় অল্পে যায় নাই! আমরা গাড়িতে উঠিতেছি, এমন সময় এক বেটা থানার জমাদার, বোধ হয় সে বেটাও ঘাটি আটকাইয়া ছিল, অমনি আমাদের গাড়ি চাপিয়া ধরে; বলে,—'বাবু খুনি আসামী লেকে কাঁহা যাতা হ্যায়! ও রেণ্ডাকো ছোড়!' কথা শুনিয়া আমি তো অবাক! যাইহোক, প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বের গুণে, তৎক্ষণাৎই তাহার হাতে একখানা পাঁচ টাকার নোট গুঁজিয়া দিলাম। আর, তাহা পাইয়াই কিন্তু জমাদার-জী একেবারেই নীরব! —আর যেন সে তিনিই নন! বরং আমাদের অভয় দিয়া বলিল,—'বাবু সাহেব, জলদি করকে যাও—জলদি করকে যাও।' শুধু এরূপ বলাও নহে!—এই বলিয়া গাড়োয়ানকেও খুব জোরে গাড়ী হাঁকাইতে বলিল।"

রাম বাবু।—"ভাল—ভাল! আচ্ছা, তার পর—তার পর!"

"তা'র পরও আবার কি কিছু থাকে? একেবারেই সটান বাড়ী আসিয়া হাজির! মাসির নিকট চঞ্চলার পরিচয় দিয়াছি,—সে যেন তোমার স্ত্রী—তাহাকে দেখাইতে আনিয়াছি। সব গোল মিটিয়াছে! ঈশ্বর-কৃপায় এখন আর কোন নূতন গোল না বাধে, এই প্রার্থনা। তবে মনে একটা বড় খট্‌কাও জন্মেছে। কারণ, পুলিসের লোককে বিশ্বাস করতে নেই। যে জমাদার বেটার হাত থেকে অব্যাহতি পাই, সে বেটা এখন সব ফাঁস না ক'রে দিলে বাঁচি! সে বেটা আবার আমার বাড়ী পর্য্যন্ত সব চেনে!"

রাম বাবু।—"তা' তা তে আর তত ভাবনা নেই! আজ রাত্রে না পারি, কাল সকালেই চঞ্চলাকে একেবারে একটা নতুন বাড়ী দেখে নিয়ে যাব। সেখানে নিয়ে গেলে, আর কে সন্ধান পায়! তা'র পর, চঞ্চলার নাম পর্য্যন্ত বদ্‌লে দেব!"

"অগত্যা তাই—ই! এখন এর মধ্যে কোন কিছু না ঘটলে বাঁচি! তা'হলে তো দেখচি। খুনী আসামীকে বাড়ীতে লুকাইয়া আনার জন্য, আমিও বিপদে পড়বো!

এইরূপ কথোপকথনের পর, তাঁহারা উভয়েই বাড়ীর অন্দরে প্রবেশ করিলেন; ভাবিলেন, একটু হাঁপ ফেলিয়া তো এখন বাঁচা যা'ক্! যাইহোক, বাড়ীর ভিতর গিয়াও, নির্জ্জনে তাঁহাদের আরও অনেক কথা-বার্ত্তা হইল। সে সকল কথাবার্ত্তায় আরও কিন্তু বুঝা গেল চঞ্চলাকে লইয়া গৌর যেদিন ট্রেণে পৌঁছে সেই দিন হইতেই, তাঁহারাও চঞ্চলার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হন। এই কয়দিন যাবৎ তাহারা যোগাড়-যন্ত্র আঁটিয়া, পরে 'শ্যামা পিসি' হত্যার অভিযোগে সন্ধানে সন্ধানে ডিটেক্‌ তাহাদিগকে ধরিতে আসলে, তাঁহারা গৌ ও চঞ্চলাকে পৃথক করিয়া দেন। আর, পু তাহাতে গৌরকে ধরিয়া লইয়া যায়—চঞ্চলা লইয়া তাঁহারা চলিয়া আসেন। যাইহো এখন তাঁহারা ভাবনায় বড়ই অস্থির,—ক পুলিস আসিয়া উপস্থিত হয়, সদাই এই চিন্তা

একাদশ দৃশ্য।

বিচারালয়ে।

নবগ্রামের কৃষকদিগের আজ 'বিচা দিন। জমীদারের বাড়ীতে ডাকাতি-করা

রাধে আজ অন্যূন ২৫ জন কৃষক ফৌজদারী-সোপর্দ্দ। কয়দিন হাজতে পচিয়া ও এক-রার করাইবার জন্য পুলিসের গুঁতা খাইয়া, একরূপ অস্থিচর্ম্ম-সার কৃষকগণ, আজ কাঠ-গড়ায় দণ্ডায়মান। বিচারক এক একটী করিয়া সকলকে প্রশ্ন করিতেছেন। উত্তরে কৃষকগণ সকলেই কিন্তু একবাক্যে বলিতেছে,—"পুলিস কত কষ্ট দিয়াছে; কত কথা বলিতে বলিয়াছে! কিন্তু কিছুতেই আমরা মিথ্যা বলিব না। হতভাগ্য জমীদার—সকলের সাক্ষাতে স্পষ্টই বলিতেছি, হতভাগ্য জমীদার—আমাদের দেবীকে কলঙ্কিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল; আমাদের জননী কামিনীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়া, তাঁহার উপর বলাৎকারের চেষ্টা পাইয়াছিল। আর, সেইজন্যই, পুত্র হইয়া মার প্রতি অত্যাচার কিরূপে দেখিব, তাই, আমরা সকলে মাকে উদ্ধার করিতে জমীদারের বাগানে গিয়াছিলাম! একজন সতীর সতীত্ব রক্ষার জন্য চেষ্টা পাইয়া ও তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়া, যদি আমরা ডাকাইত বলিয়া পরিগণিত হই, ও সেজন্য আমাদিগকে কোন শাস্তি পাইতে হয়, তা' ভালই। সেজন্য আমরা অবশ্যই গৌরবান্বিত হইব। কিন্তু ধর্ম্মাবতার, আমাদের সকলকে জেলে পুরুন; একজনকে কেবল ছাড়িয়া দেন। আমরা জানিতে পারিতেছি না যে, এতক্ষণ আমাদের মার দশা কি হইতেছে! যদি তিনি বাঁচিয়া থাকেন, তবে এখনও একজনকে ছাড়িয়া দিলে আমরা তাঁহার সংবাদ পাইয়াও তৃপ্ত হই। দোহাই ধর্ম্মাবতার—দোহাই আপনার!"—এইরূপ বলিয়াই, কৃষকগণ সকলেই মাথায় হাত দিয়া 'হায় হায়' করিতে লাগিল।

ইহার পর বিচারক মহাশয় জমীদার-পক্ষের অনেক সাক্ষীর এজাহার পাইলেন। সকলেই একবাক্যে ডাকাতির কথা সাক্ষী বন্দীভাবে-আনীত সেই কয়জন কৃষক ছাড়া, এককথায় গ্রামশুদ্ধ সকলেই তাহাদের বিপক্ষ সাক্ষী! সুতরাং হাকিমও বড়ই বিপদে পড়িলেন। যদিও কৃষকদের ভাবভঙ্গী ও কথা-বার্ত্তা শুনিয়া তাঁহার মন সন্দেহ-দোলায় দোলায়মান হইতে লাগিল; কিন্তু প্রতি পক্ষের প্রমাণে—আইনের হস্ত হইতে, তিনি কিছুতেই তাহাদিগকে অব্যাহতি দিতে পারিলেন না। অবশেষে, অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া, তিনি মকর্দ্দমা 'সেসনে' অর্পণ করিলেন। কৃষকগণ কাঁদিতে কাঁদিতে আবার তখনকার মত হাজতে রক্ষিত হইতে চলিল।

পূজার পঞ্চরঙ্গ!

পূজায় গরু-বন্ধক।

পূজার-বাজারে খরচ-পত্রের বড়ই অনাটন বিধায়, ভট্‌চায্ ভায়া কয় দিন কয় রাত্রি যাবৎ ভাবিয়াই আকুল! কি করিয়াই বা পরিবারের অন্ততঃ একখানি নূতন সাটী কেনা হয়, কি করিয়াই বা ছেলে-পিলে গুলোকে ভুলান যায়, এই চিন্তাতেই, দিব্য করিয়া বলিতে পারি, তাঁহার আর ঘুমটুকু পর্য্যন্তও নাই! ক্রমে অনেক চিন্তার পর তিনি ঘোষেদের রামসিং পাঁড়ে দরোয়ান-জীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন; তাহাকে বলিলেন,—"পাঁড়ে-জী, তুমি তো সকলকেই রোপেয়া-ওপেয়া ধার-ধোর দেতা হ্যায়। তা' বল্‌তে সাহস হোতা নেই, কিন্তু বন্ধক রাখেগা—যদি মেহের বাণী করকে হাম্‌কো এ পূজার বাজারে রক্ষা করতা হ্যায়!"

পাঁড়ে জী।—"ক্যা চিজ্ হ্যায়, দেখ্‌লাও! তব্ যো হোগা, দেখেঙ্গে।"

ভট্‌চায্ তখন আমতা আমতা সুরে ধরিলেন,—"হামার তো তেমন কিছু হ্যায় নেই! তবে হামার সেই যে একঠো ভালা গাই-বাছুর হ্যায়, ঐঠো তোমারা পাশ বাঁধা রাখে-গা!

যব মেহের বাণী হোতা, তব্ আনিয়ে দেগা! যাস্তি সুদ দেগা—ভালা বাছুর হ্যায়!"

পাঁড়ে-জী আর তত তলাইয়া বুঝিল না। বলিল,—"আচ্ছা, লে আও।" উত্তর পাইয়াই, ভট্‌চায্ আহ্লাদ-সহকারে বাড়ী হইতে বাছুরটিকে আনিয়া পাঁড়েজীর হাতে প্রদান করিলেন; এবং অনেক কসামাজা করিয়া, প্রায় বাছুরটির দামই, ৮৲ আটটী টাকা ধার লইয়া প্রস্থান করিলেন। কথা থাকিল, পূজা বাদ তাহা খালাস হইবে!

কিন্তু পরদিনই পাঁড়ে-জী গিয়া ভট্‌চাযের বাড়ীতে হাজির! বন্ধক রাখিতে চাই না, এখন টাকাও চাই না,—এই বলিয়া বাছুর ফিরাইয়া লইতে অনুরোধ!

ভট্‌চায্ তাহাতে উত্তর করিলেন,—"আউর এক মাস বাদ লেগা। হাম তো বন্ধক দিয়া; যব্ রুপেয়া চুকাইতে পারে গা, তব্ লেগা! আবি তোমারা পাশ রাখ।"

তখন পাঁড়ে-জী ব্যতিব্যস্ত হইয়া উত্তর করিল,—"আরে, এ ক্যায়া ব্যাত হ্যায়! এস্কো খোরাকী কোন্ দেগা!"

তখন ভট্‌চাজ্ উত্তর করিলেন,—"খোরাকী কোন্ দেগা, তোম্ জান্‌তা নেই! তোম গরু বন্ধক রাখা আর হামি খোরাকী দেগা?"

বরযাত্রী Vrs. কন্যাযাত্রী।

একজনদের বাড়ীতে বিবাহ—ভারি ধুম! আসর সরগরম! তখন, নানারূপ প্রশ্নোত্তরের পর, বরপক্ষীয় একজন, কন্যাপক্ষীয় অপর একজনকে ঠাট্টাচ্ছলে জিজ্ঞাসিলেন,—"আচ্ছা বাপু! তোমার বাড়ী কোথায়?"

কন্যাপক্ষীয়।—"বাঁশবেড়ে।"

বরপক্ষীয় তাহাতে ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন,—"আরে ছ্যা! তোমার সঙ্গে আর কথা কইবো কি? এমন স্থানের নাম বল্লে যে, কেউ চিন্‌তেই পাল্লে না!"

এমন সময়ই লুচির ডাক্! সকলেই গোলমাল করিয়া উঠিয়া পড়িল। কাজেই তখনকার মত কন্যাযাত্রীর হার বজায় রহিল।

কিন্তু আহারের সময় সেই কন্যাযাত্রী কি এক ফন্দী ঠাওরাইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন;—"আচ্ছা, মহাশয়ের নাম?"

বরযাত্রী।—"নিবারণ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।"

কন্যাযাত্রী।—"মহাশয়ের পিতার নাম?"

বরযাত্রী।—"৺ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।"

কন্যাযাত্রী।—(ঈষৎ হাসিয়া) "আরে ছ্যা! তোমার সঙ্গে আর কথা কইবোই বা কি? বাপে এমন নাম বোল্লে যে, কেউ চিন্‌তেই পাল্লে না! রামমোহন রায় বল, কেশবসেন বল, রাধাকান্ত দেব বল, কেষ্টদাস পাল বল, শিবনাথ শাস্ত্রী বল; তবে তো লোকে চিন্‌বে! কিন্তু তা' ব'লে, কি একটা বল্লে যে, কেউই চিন্‌তে পাল্লে না!

(বি) লাতি-জুতা।

কোন প্রসিদ্ধ * * পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল—"লাতি-জুতা। মূল্য৲ টাকা হইতে আরম্ভ করি ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত আছে।" সকলে পড়িয়া অবাক! যাইহোক, শেষে কিন্তু জানা গেল উহা আর কিছুই নয়; কেবল "বিলাতি জুতা' 'বি' কথাটি 'প্রিণ্টিং মিষ্টেক্' হইয়াছিল।

শরীরের বাঁধন ছিঁড়ে সুতো বেরুচ্চে!

রামসদয় বড় তুখোড় ইয়ার! নেশা ভরপুর!! 'কোনটি বাকি নাই' বলিলে অত্যুক্তি হয় না। একদিন নেশায় চতুরঙ্গ হইয়া গভীরা রজনীযোগে বাটী আসিয়া উপস্থিত। বাটীতে একমাত্র পিসি-মা বর্ত্তমান। ক্ষুধার উদ্রেক হওয়াতে, পিসিমার নিদ্রা করিয়া যৎকিঞ্চিৎ আহার যাঞা করায়, বিরক্ত চিত্তে উত্তর দিলেন—"ঐ তাকের সন্দেশ আছে, গেল্!"

রামসদয় মুদিত-নেত্রে সন্দেশ অনু করিতে করিতে, একটি গুলি সুতা

সন্দেশ-ভ্রমে তাহাই বদনে দিল। গুলি সুতা গলায় আট্‌কাইয়া যাওয়াতে ও কেমন-কেমন বোধ হওয়াতে, রামসদয় মুখের ভিতর অঙ্গুলি দিয়া সুতার একখাই ধরিয়া টানিয়া বাহির করিতে লাগিল। যত টানে, সুতা ততই বাহির হয়। কাজে কাজে রামসদয় অত্যন্ত ভীত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পিসিমাকে বলিল,—"পিসিমা! শরীরের বাঁধন ছিঁড়ে সুতো বেরুচ্চে।"

পিসিমা—"ওমা! বলে কিগা? সর্ব্বনাশ!!" এই বলিয়াই, পিসিমা প্রদীপ জ্বালিয়া দেখিলেন,—সত্যই তো! কি হবে গা?

রামসদয় তখন কাঁদিয়াই অস্থির!—কাঁদিতে কাঁদিতে আবার বলিল—"পিসিমা! শরীরের শরীরের বাঁধন ছিঁড়ে সুতো বেরুচ্চে!!"

বড়বাজার—ঔষধের দোকানে।

ক্রেতা।—"ম'শায়! এইখানে কি 'সুধা-সিন্ধু' ঔষধ পাওয়া যায়?"

বিক্রেতা।—"আজ্ঞে, হাঁ মহাশয়!"

ক্রেতা।—"আসল, না নকল? শুনেছি, এই ঔষধের নাকি নানা রকম নকল বেরিয়েছে!"

বিক্রেতা।—"সত্যি-সত্যিই! এই যে আশে-পাশে অলিতে-গলিতে নানারকম ঔষধের দোকান দেখ্‌চেন,—জান্‌বেন, এ সবই নকল; আর আমাদেরই ঔষধ কেবল 'আদি ও অকৃত্রিম!"

ক্রেতা।—"তবে দেন ম'শায়!"

বিক্রেতা।—(টাকা লইয়া ঔষধ প্রদান করতঃ) "এই দেখুন ম'শায়! নকল ব'লে বোধ হ'চ্চে কি? এই দেখুন, সেই লেবেল, লেবেলে ঠিক সেই একই রকম লাল-কাল কালিতে ছাপা! আগাগোড়া সেই-ই সব!

ক্রেতা।—(কি জানি কি ভাবিয়া, ঔষধ ফিরাইয়া দিয়া) "না ম'শায়! এ ঔষধ ফিরাইয়া লউন। এ নিশ্চয় নকল! তা-না হ'লে ক্ষুদ্র অক্ষরে উপরে 'মহৎ' কথাটি লেখা কেন? আমার বাবু আমায় ব'লে দিয়েছেন যে, প্রায় দেড় শত রকম নকল বেরিয়েছে—খুব সাবধান! কাহারও 'শক্তি', কাহারও 'ভব', কাহারও 'নব' ইত্যাদি অনেক রকম নকল বা'র হয়েছে। আজ আপনাদের আবার দেখ্‌ছি, 'মহৎ'! তা' আর কাজ নেই ম'শায়!"

বিক্রেতা।—(তখন একটু কড়া মেজাজ ধরিয়া) "এ'খানে গোল করবেন না! কোন্ দোকানে নকল ঔষধ কিনে, এখানে আর কেন গোল কর্‌চেন! আমরা কি আপনাকে ঔষধ বেচেছি?"

ক্রেতা।—"সে কি মহাশয়! এখনও যে দু' মিনিট হয়-নি? বলেন কি? তবে কি টাকা ফেরত দিবেন না?"—এই বলিয়া, ক্রেতা—"পাহারওলা—পাহারওলা! আমাকে ফাকি দিল"—বলিয়া চেঁচাইতে লাগিলেন।

কাজেই গতিক খারাপ দেখিয়া, বিক্রেতাও তখন, তাড়াতাড়ি দোকান হইতে লাফাইয়া রাস্তায় নামিয়া, ক্রেতার মত স্বরেই—"পাহারওলা!—চোর—চোর! আমার দোকান থেকে ওষুদ চুরী করে নিয়ে যায়!"—এই বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল। এবং দোকানের আর একজন ক্রেতার হাত চাপিয়া ধরিল।

ক্রেতা তো অবাক্!

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা!

খরিদ-বিক্রয়-কার্য্য

করিয়া দিব বলিয়া নানারূপে বিজ্ঞাপন দিয়া, আজকাল অনেকেই মফঃস্বলের অনেক মূর্খলোককে ঠকাইতেছে। জিনিস কিনিবার জন্য টাকা পাঠাইয়া দিয়া তো অনেকেই ঠকেন; কিন্তু জিনিষ বিক্রয় করিতে পাঠাইয়াও ঠকার ভাগ বড় কম নহে। আমরা নানা স্থান হইতে এরূপ নানা অভিযোগ পাই যে, কেহ তুলা, কেহ পাট, কেহ ধান-চাউল

বা শস্যাদি, এইরূপ নানা লোকে নানা জিনিস কলিকাতার অনেক এজেন্সিতে বেচিতে পাঠাইয়াও, একেবারে 'মূলেই হাবাত' হইয়াছেন। এরূপ অনেক এজেন্সি আড়তের নাম আমাদের জানা আছে; কিন্তু তন্মধ্যের আজ একজন নূতন এজেণ্টের বিষয় নিয়ে লিখিত হইল। আমাদের একজন পত্র-প্রেরক বলেন,—

"মহাশয়! গত সন ১২৯৫ সালের ভাদ্রমাসে, রেলওয়ে-পার্শেল যোগে, ৩৬নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, চায়নাবাজার, কলিকাতা ঠিকানায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাস কোংর নিকট ৬০, টাকা মূল্যের 'বকের পালক' বিক্রয়ার্থ পাঠাই। পরে জিনিস বিক্রয় করিয়া,—'এই টাকা পাঠাইতেছি; অমুক তারিখে নিশ্চিত পাঠাইব।'— সে এইরূপ পত্র দেয়। কিন্তু সে সেই পর্য্যন্তই! এখন আর টাকাও দেয় না, বা পত্রাদি লিখিলে উত্তরও নাই।"

এই তো ব্যাপার! এখন দাস মহাশয় কি উত্তর দেন, জানিতে চাই। যাইহোক, মোটের উপর আবারও বলিতেছি, মফঃস্বলবাসীগণ কলিকাতায় বিশেষ জানিয়া-শুনিয়া তবে ক্রয়-বিক্রয়-কার্য্য করেন, এই প্রার্থনা।

বেলুনে ঘোড়া উঠে নাই।

বেলুনে ঘোড়া উঠিবে এবং সেই ঘোড়া ছাতা মুখে করিয়া আকাশ হইতে নীচে নামিবে, আজ কয়েক সপ্তাহ যাবৎ কলিকাতায় এই এক বিজ্ঞাপন জাহির হইতে থাকে; এবং লোকে তাহা দেখিবার জন্য ব্যগ্র হন। কিন্তু ইতিমধ্যে বিজ্ঞাপনদাতাদের অভিসন্ধি টের পাইয়া, 'অনুসন্ধান-সমিতি' হইতে গত ২১এ ডিসেম্বর 'অনুসন্ধানের' এক স্বতন্ত্র ক্রোড়পত্র ছাপান হয়, ও তাহা বিনামূল্যে বিলাইয়া কলিকাতাবাসী সাধারণকে সতর্ক করা হয়। কিন্তু পরেও দেখা গেল, সমিতির সংবাদ [illegible] ঠিক দাঁড়াইল। অর্থাৎ বেলুনে ঘোড়া উঠাইতে সাহেবগণ কৃতকার্য্য হন নাই; এবং শেষে এক কাঠ-খড়ের তৈয়ারী মানুষ উঠান হইয়াছিল। ফলতঃ যাহারা আমাদের প্রচারিত বিজ্ঞাপন দেখিয়া সতর্ক হন নাই, তাঁহারা অনেকে এখন পরিতপ্ত হইয়াছেন! আর, এরূপ কেলেঙ্কারী হওয়ায়, অপর কোন বেলুনবাজের প্রতি যে লোকে আর বিশ্বাস করিবে, এমনও বোধ হয় না।

ফল ফলিয়াছে।

'সুধা-সিন্ধু' ও 'ডি গুপ্ত' ঔষধের নানা নকলের বিষয় প্রকাশ করায়, ক্রমে দেখিতেছি, ফল ফলিতেছে! 'অনুসন্ধান' ও অন্যান্য পত্রে ইহার আন্দোলন দেখিয়া অনেকে সতর্ক হওয়ায়, কতকাংশে বিক্রয় বন্ধ-হেতু এবং কতকটা লোকনিন্দায় ও লজ্জায় পড়িয়া, দেখিতেছি, আজকাল দুই চারিজন নকলের দোকান প্রকৃতই উঠাইয়া দিতে সঙ্কল্প করিতেছেন। কেহ কেহ এরূপ জাল-জুয়াচুরী করিয়া সাধারণকে ঠকানর জন্য, প্রকাশ্য পত্রে আপনাদের ক্রটী-স্বীকার করিতেও প্রস্তুত আছেন। যাইহোক, দুই একজন নকলকারীর নিকট এরূপ শুনিয়াও আমরা আশ্বস্ত হইলাম; বুঝিলাম, আমাদের আন্দোলন অনর্থক হইতেছে না। আর, প্রকৃতই যদি কেহ, আমাদিগকে যেমন বলিতেছেন, সেইরূপ ক্রটী স্বীকার করেন, তাহা হইলে আমরা আরও সুখী হইব; বুঝিব, তাঁহারা কোন কুহকে পড়িয়াই বুঝি বা এরূপ ব্যবসায় গ্রহণ করিয়াছিলেন; নতুবা আদৌ কোন অসৎ মতলব তাঁহাদের ছিল না! যাইহোক, দেখা যাক, কতদূর কি গড়ায়! ফলতঃ আমরা আশা করিতেছি, সত্বরই ইহার কোন না কোন প্রতিকার হইবেই; যাঁহারা এখনও মানে মানে দোকান না তুলিবেন, শেষে ব্যতিব্যস্ত হইয়াও তাঁহাদিগকে যে পরিতাপ করিতে হইবে, ইহা নিশ্চিত। যেরূপ আন্দোলন উঠিয়াছে, তাহাতে গভর্ণমেণ্ট হইতে এসম্বন্ধে কোন আইন হওয়াও সম্ভব। আমরা চেষ্টা তো পাইতেছি; দেখি, কতদূর সফলকাম হই! আমাদের এদেশীয় সহযোগীগণের ন্যায় হিন্দুস্থানী পত্রিকা-সমূহেও ইহার আন্দোলন উঠিয়াছে। আমাদের হিন্দুস্থানী সহযোগী 'সারসুধানিধি' এসম্বন্ধে একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। পারি তো সময়ান্তরে তাহাও পাঠকগণকে শুনাইব। যাইহোক, এখনও গভর্ণমেণ্টের এসকল নকল নিবারণের দিকে দৃষ্টি পড়ে, এই বাসনা।

মফঃস্বলের বিবরণী।

শান্তিপুর, নদীয়া।

প্রতি বৎসর বর্ষা-কালে খালে গঙ্গার জল আসিলে, স্ত্রী-পুরুষ সকলেই তাহাতে স্নান করিয়া থাকে। অন্যান্য বৎসর ঘাটগুলি কাটাইয়া, সাইন-বোর্ড-দ্বারা স্ত্রী ও পুরুষের ঘাট পৃথক করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু এবার তাহার কোন বন্দোবস্তই করা হয় নাই। স্ত্রী ও পুরুষ একত্রেই স্নান করিতে দেখা যায়। মেম্বরগণ তো নিদ্রিতই; ভদ্র করদাতাগণও কি তদ্রূপ! এসেসর নিযুক্ত হইয়া, অনুমানদ্বারাই করদাতাদিগের সম্পত্তি আদির পরিমাণ ও রাজস্ব স্থির করিয়া, নূতন টেক্স ধার্য্য হয়। তাহাতে প্রায় সকলেরই বেশী বেশী ট্যাক্স ধার্য্য হইয়াছে। এজন্য অনেকে আপিল করিয়াছেন। এক্ষণে সুবিচার হয়, প্রার্থনা।

সূত্রাগড়, শান্তিপুর।

শান্তিপুর-মিউনিসিপালিটীর অধীন সূত্রাগড়ও একটী বৃহৎ স্থান। কিন্তু শান্তিপুরের অধিক লোকেই মেম্বর নিযুক্ত হওয়ায়, পাকা রাস্তা, ঘাট ও ড্রেন প্রভৃতি প্রস্তুত হওন, রীতিমত ঐ সকল মেরামত ও পরিষ্কার-করণ-কার্য্য, এবং আলোর বন্দোবস্ত প্রভৃতি এখানকার অপেক্ষা শান্তিপুরে সুচারু-রূপে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। আগামী নির্ব্বাচন-সময়ে, শান্তিপুর ও সূত্রাগড় এই উভয় স্থানেরই যাহাতে সমান সমান মেম্বর নিযুক্ত হইয়া, অন্ততঃ গবর্ণমেণ্ট হইতে, এই অসুবিধার দূর হয়, ইহাই বাসনা। সূত্রাগড় কৃষ্ণনগরের মহারাজা ক্ষিতীশচন্দ্র রায় বাহাদুরের ইষ্টেট। কিন্তু গ্রামের গোমস্তা ও পাইকগণের অত্যাচারে গরিব মূর্খ প্রজারা যে এখনও ব্যতিব্যস্ত, তাহা বেশ বলা যায়; চরের গোমস্তা ও পাইকগণের অত্যাচারের তো কথাই নাই! চরের জমী সমস্তই প্রজা-বিলি হইয়া যায়; এরূপ একটুও স্থান থাকে না যে, তাহাতে এস্থানের গোপদের গরু রীতিমত চরিতে পারে। কাজেই গোরু লইয়া চাষী মুসলমানদের সঙ্গে তাহাদের হামেসাই বিবাদ বাধিয়া থাকে। সম্প্রতি একটী ধর্ম্মের ষাঁড় কোন মুসলমানের ফসলে গেলে, মুসলমানগণ একত্র হইয়া ষাঁড়টীকে অস্ত্রের আঘাতে জখমী ও অকর্ম্মণ্য করে। তজ্জন্য ষাঁড়ের পূর্ব্বমালিক রাণাঘাটের ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিকট মকদ্দমা রুজু করেন। শুনা যায়, চরের গোমস্তাও নাকি ঐ সকল মুসলমানদের স্বপক্ষে ছিল।

সোনামুখী, বাঁকুড়া।

সোনামুখীর অত্যাচার-নিবারণ জন্য, এখানকার কতিপয় যুবক মিলিয়া 'যুবক-সভা' নামে একটী সভা হইয়াছে। অত্যাচারের প্রতিকার জন্য ছোটলাটের নিকট এক দরখাস্ত যাইল।

খুলনা।

আজকাল এখানকার মাতালেরা বড় জব্দ! কারণ, সহরের সব মদের দোকান বন্ধ। আবকারীর কমিসনার সাহেব, উপযুক্ত দরে বিক্রয় না হওয়ায়, ভাটি বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। সুঁড়িরাও বেশী দর দিয়া ভাঁটি লইতেছে না। তবে লুকাচুরিতে মদ যে তৈয়ার হইতেছে না, এমনও নহে। কিন্তু সেও কম! যাইহোক, এই হ্যাপায় এ পাট উঠিয়া যায়, এই বাসনা।

কানসাট, মালদহ।

গঙ্গার জল অনেক কমিয়া গিয়াছে; লোকের বাটীর মধ্যের বন্যার জলও কমিয়া গিয়াছে। রাস্তার জল এখনও আছে; রৌদ্রের প্রখর তেজে একটু কমিলে, বৃষ্টির জলে পরিপূর্ণ করিতেছে। অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত জুতা পায়ে দিয়া বেড়ান যাইবে না। এখানে একটী মাইনার স্কুল আছে। স্কুলটি চলিতেছিল ভাল; কিন্তু এখন অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। জমীদার বাহাদুর এখনও কৃপা না করিলে, ইহা আর টেকা কঠিন। এ বিষয়ে তাঁহাকে দরখাস্ত করা হইয়াছে; কিন্তু এখনও কোন ফল হয় নাই। দেখি পরে কি হয়!

সংবাদ।

—তান্তিয়া ভীলের বিচার এখনও সুরু হয় নাই। মকর্দ্দমা আরও কিছুদিন মুলতবী থাকিবে। তান্তিয়ার সহযোগীগণ, ইতিপূর্ব্বে যাহাদের দ্বীপান্তর প্রভৃতির আদেশ হইয়াছে তাহারা, তান্তিয়াকে সোনাক্ত করিলে, তবে তাহার বিচার শেষ হইবে। কারণ, এখনও সন্দেহ দাঁড়াইতেছে যে, যে ধরা পড়িয়াছে, সে প্রকৃত তান্তিয়া কি না!

—মতিলাল ঘোষ নামক এক ব্যক্তি ট্রেটি-বাজারের নিকট দিয়া যাইতেছিল। সেই সময়ে তথায় এক দল লোক তিন-তাস খেলিতেছিল। তাহারা মতি ঘোষকে খেলিতে ডাকে; মতি ঘোষ অস্বীকার করায় তাহাদিগের মধ্যের এক ব্যক্তি মতি ঘোষের মুখে এক প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করে। মতি ঘোষের হাতে টাকা ছিল, মুষ্ট্যাঘাত-প্রভাবে তাহা পড়িয়া যায়। যাহারা তিন-তাস খেলিতেছিল, তাহারা তখন টাকাগুলি কুড়াইয়া লইয়া চম্পট দেয়। তাহাদিগের মধ্যে মন্নু নামক এক ব্যক্তি কেবল ধরা পড়িয়াছিল। বিচারে মন্নুর দুই বৎসর কঠিন পরিশ্রম-সহ কারাদণ্ড এবং ৫০ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

—ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে গোলাপী নাম্নী ৩৭ বর্ষ বয়স্কা একটি রমণীর এক খানি মুদির দোকান ছিল। বহুবাজার-থানার শিউহরক মিশ্র নামক এক পাহারাওয়ালার সহিত গোলাপের গুপ্ত-প্রেম জন্মে। সে গত ৬ মাস কাল পাহারাওয়ালার দ্বারা রক্ষিতারূপে ছিল। পাহারাওয়ালা ছুটী পাইলে, গোলাপের নিকট যাইত। ১৫ দিন হইল, সে সন্দেহ করে যে, তাহার অবর্ত্তমানে অন্য লোক গোলাপের নিকট যায়। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় পাহারাওয়ালা ছুটি পাইলে চাঁদনী হইতে একখানা ছোরা কিনিয়া আনিয়া গোলাপের বাটী যায়। সেই সময়ে আর একজন পাহারাওয়ালা তাহা দেখিতে পায়। কিয়ৎক্ষণ পরে গোলাপের বাটীর মধ্য হইতে রব উঠে,—'আমাকে খুন করিল।' ঘাটির পাহারাওয়ালা ভিতরে গিয়া দেখে যে, শিউহরক উক্ত গোলাপকে ছোরা মারিতেছে। দ্বিতীয় কনষ্টেবল অপর কয় জনের সাহায্যে তৎক্ষণাৎ শিউহরককে ধৃত করিয়াছে। গোলাপ সেই আঘাতে মারা গিয়াছে। ২৭এ তারিখে বিচার হইবে।

—সম্প্রতি বিলাতের এক দরজীর দোকানের অধ্যক্ষ পথে-ঘাটে যাহাকে তাহাকে, লণ্ডন হইতে প্যারী নগরের বর্ত্তমান প্রদর্শনী দেখিতে যাইবার ও তথা হইতে ফিরিয়া আসিবার জন্য রেলে যাতায়াতের প্রথম শ্রেণীর টিকিট বিনামূল্যে বিতরণ করিতে থাকেন! টিকিটের অপর দিকে কিন্তু লেখা থাকে যে, উহা আসল-টিকিট নহে; তবে যে ব্যক্তি নিম্নলিখিত কার্য্য করিবেন, তিনি বিনা-মূল্যে এক আসল টিকিট পাইবেন। কার্য্য এই:—দোকানের অধ্যক্ষ একটা পাত্রের ভিতর কতকগুলি বোতাম পূরিয়া রাখিয়া দিয়াছেন; পাত্রের মুখ ছিপি দ্বারা বন্ধ করা, ছিপি আবার সীল-মোহরে বন্ধ। ন্যূন কল্পে ৫ টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি যাঁহারা সেই দোকান হইতে ৮ই আগষ্টের মধ্যে ক্রয় করিবেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা সেই পাত্রস্থিত বোতামের সংখ্যা ঠিক্ বলিতে পারিবেন, তাঁহারা প্রত্যেকে এক এক খানি বিলাত হইতে প্যারী যাইবার ও প্রত্যাগত হইবার প্রথম শ্রেণীর আসল টিকিট পাইবেন। উপায় মন্দ নহে; ইহাতে উক্ত দরজীর দোকানে বিস্তর ক্রেতা জুটিয়া যায়।

—আড়কাটির চাতুরি বুঝা ভার! মেদেনীপুরের নিকটস্থ কোন পল্লী হইতে এক কিশোরী উক্ত সহরে পূজা দেখিতে যায়। পূজা-বাড়ীতে এক রাক্ষসী তাহাকে সুখের আশা দিয়া স্থানান্তরে লইয়া গিয়া রাখে। যাহাতে যুবতীর মন ভুলে, সেইরূপ দুষ্প্রাপ্য সুখের আশা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া সে দেখে, আড়কাটির কবলে পড়িয়াছে। কি সর্ব্বনাশ! হতভাগিনী রেজেষ্টরির সময় সকল রহস্য প্রকাশ করিয়াছে। এখন আড়কাটির নামে পুলিশ-কোর্টে অভিযোগ উপস্থিত।

—কলিকাতার বড় পোষ্ট অফিসে ৮টা বড় পুলিন্দা পুড়িয়া গিয়াছে। এই আটটা থলিয়ার ভিতর বিস্তর ছোট বড় পার্শেল ছিল। অনেকের বিশ্বাস, সালফিউরিক এসিডে এই লঙ্কাকাণ্ড ঘটিয়াছে। সকল পুলিন্দাই পুড়িয়াছে; সুতরাং কোন্‌টায় ঐ দাহ্য পদার্থ ছিল এবং কোন ব্যক্তি তাহা প্রেরণ করিতেছিল, তাহা কিছুই ঠিক করিবার যো নাই। অনেকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে।

—সুদানে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। খার্ত্তুমে পেটের জ্বালায় মানুষে মানুষ খাইতেছে। ইহা যুদ্ধ বিগ্রহেরই অন্যতম ফল।

—বাগবাজারের 'আদরিণী' আপিসের বাবু রাজেন্দ্রলাল বিশ্বাসের সম্বন্ধে আমরা যেরূপ আশঙ্কা করিয়াছিলাম, কার্য্যেও দেখিতেছি, তাহাই গড়াইল। 'সুখ-সম্ভোগ-রত্নাকর' নামক একখানি অশ্লীল পুস্তক প্রকাশ করিয়া হ্যাণ্ডবিলের কুহকে মফঃস্বলবাসীদিগকে প্রতারিত করিতে গিয়া, তিনি যে পুলিসের হাতে ধরা পড়িয়াছেন, এ সংবাদ গত বারের 'অনুসন্ধানেই' প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু তাহার পরের সংবাদ এই যে, গত ১১ই আশ্বিন, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের এজলাশে, ঐ অশ্লীল পুস্তক প্রকাশ-অপরাধে তাঁহার একশত টাকা জরিমানা হইয়াছে; এবং তাঁহার পুস্তকখানি প্রেসে ছাপানর জন্য—'চোরা গাই-এর সহিত কপিলা গাইও বাঁধা পড়ে' এই নীতিক্রমে—প্রেসের পিণ্টারেরও ৫০ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। যাইহোক, আদরিণী-আপিসের ধনুর্দ্ধরগণ ইহাতেও শিক্ষা প্রাপ্ত হন, এই বাসনা। প্রথম বার বলিয়া এবার বলিতে হইবে, অল্পের উপর দিয়াই গেল; এখনও সুমতি না হইলে,জানিবেন, পরে অদৃষ্টে না জানি আরও কত কি আছে!

—পূর্ব্ব-নিয়ম-মত পূজা-উপলক্ষে আগামী ৩০এ আশ্বিনের সংখ্যা 'অনুসন্ধান' বন্ধ থাকিবে।

অনুসন্ধান

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

৩য় খণ্ড] ১৫ই কার্ত্তিক, ১২৯৬ সাল। [৬ষ্ঠ সংখ্যা।

বিজয়া-গীতি।

(মা) এলেন আর চলে গেলেন,
বলা তো কিছু হ'লো না!
মনের কথা, মনেই রইলো,
আশা তো কই মিট্‌লো না!

সারাটি বরষ ধরে, কত কি ব'ল্‌বো ব'লে,
রেখেছিনু মনে মনে;
(হায়-হায়!) বল্‌তে গেলেম ভুলে।
(কত) প্রাণের ব্যথা, প্রাণের জ্বালা,
প্রাণের হাহাকার।
স্তরে স্তরে, শিরায় শিরায়, বিদ্ধ অভাগার।
(আহা!) দেখাতে গিয়ে, ভুলে গেলেম,—
দেখানো হলো না;
(হায়-হায়!) এত দিনের এত আশা,
এক্‌বার মিট্‌লো না!

তিন্ দিন, তিন্ দণ্ডের মত, নিমিষে চলে গেলো;
অভাগার প্রাণের জ্বালা, যেমন তেম্নিই রইলো!
তুই নয় মা দয়াময়ী, দয়ার আধার প্রাণ;
একবার তোরে, ডাক্‌লে পরে, হয় মা জীবের ত্রাণ!
কিন্তু মাগো,এত ডাকি, এত কাঁদি,তবু অভাগায়;
কি দোষে ঠাঁই, দিস্‌না তোর ওই, পূত রাঙা পায়?

যদি বলিস্, মনের ডাকা, না ডেকে তোয়,
মুখের ডাকা ডাকি;
ত' হলে মা, কাজেই বলি, সে তোর ছলা
দিতে মোদের ফাঁকি।

তুই কেন মা, সন্তান ব'লে, শিখিয়ে দিস্ না,
ডাকা ব'লে কা'কে!
শিখিয়ে দিয়ে, বলিয়ে নিয়ে, নিজেই আবার
নিস্‌না কেন ডেকে?
তবেই তো মা, জান্‌বো তোকে, জগন্মাতা
দয়াময়ী ব'লে।
তবেই তো মা, বুঝ্‌বো তোরে, তুই মোদের মা—
আমরা তোর ছেলে।
তবেই তো মা, দশ দিকে তোর, দশ হাত যে,
বুঝ্‌বো মোদের তরে।
জান্‌বো তবেই, মোদের মত, অভাগারাও
যেতে পারে ত'রে।

নৈলে মা তোর, যাওয়াই ভাল,
আসায় কাজ আর নাই!
বরষ বরষ, দেখে তোরে, চোখের জলে
ভাস্‌তে আর না চাই!
যেমন আছি, তেম্নিই ভাল, আঁধার-আলো
সমান মোদের থাক!
যদি পাপী না তরাবি, পুণ্যাত্মাদের
কেন আর ডাক!

অনেক উপায়আছে তাদের,মোদের উপায় নাই,
যেরূপে হো'ক, ত'রবে আবা[illegible] নাহি চাই!
পাপীর উপায়, কর্‌তে গতি-বিশিষ্ট[illegible] মা বল;
চাইনে তোরে, থাক পুষ্প-সকল 'বিজয়া' কেবল!
'আগমনী' চাইনা দেখি[illegible]চাইনা হাসির তরঙ্গ;
'বিজয়াই' করুক [illegible], মোদের নিয়ে রঙ্গ।

মানস-সরোবর।

অনন্ত চিন্তার অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়া আজ এ কি দেখিলাম ? একটি সুবৃহৎ উপবন, আর তন্মধ্যস্থ মানস-সরোবর। সম্মুখে অনন্ত প্রবাহিনী নদী ভীষণ আবেগে প্রবাহিত হইতেছে। তাহার আদিতে অন্ধকার, অন্তে অন্ধকার। কেহ বলিতে পারেন না, কোথায় তাহার উৎপত্তি, কোথায় নিবৃত্তি। অনন্ত আকাশের অনন্ত ছায়াপথের সহিত, কে জানে কোথায়, মিলিয়া গিয়াছে। তীরে বহু জনমানবের কোলাহল। কেহ নদীর ধারে বসিয়া বালুকাস্তূপ একত্রিত করিয়া তাহার গণনায় আপনার ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক আলোড়িত করিতেছেন। কেহ প্রবাহিনীর প্রত্যেক তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত সন্দর্শনে নিরাশ মনে বসিয়া আছেন। কেহ জলে অর্দ্ধ অঙ্গ নিমজ্জিত করিয়া স্রোতের অপ্রতিহত গতি দেখিয়া ভয়ে ফিরিয়া আসিতেছেন। কেহ সাহসে নির্ভর করিয়া সন্তরণে নদী পার হইবেন বলিয়া অগ্রসর হইতেছেন। কেহ বা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া, স্রোতের মুখে আপনাকে ঠিক রাখিতে না পারিয়া, কোথায় ভাসিয়া যাইতেছেন, তাহা কেহই বলিতে পারেন না।

এই অনন্ত প্রবাহিনী নদীতে পারাপারের জন্য একখানিও তরণী নাই। আছে কেবল, একটি সেতু। সেতুর দুইটী পথ। দুইটী পথের দুইটী দ্বার। একটি পথ দিয়া প্রবেশ করিতে হয় ও অপরটীর দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হইতে হয়। প্রবেশ-পথে দুই জন দ্বারী দণ্ডায়মান; তাহাদিগের নাম 'শ্রম' এবং 'যত্ন'। পারাপারের জন্য সেতু অবলম্বন করিতে সকলেই যত্নবান; কিন্তু অনে[illegible]দিকে কিন্তু কাকুতি-মিনতি সত্ত্বেও উভয় দ্বারী বজ্র[illegible] ব্যক্তি নি[illegible]র উত্তর দিতেছে,—"'যা'—যা,' যা' ভীরু, [illegible]রুষ, সন্দেহাক্রান্ত জীব! সেখানে প্রবেশ করিবার তোদের অধিকার নাই।" তাহারা এই প্রকার উত্তর প্রাপ্ত হইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে সেতুদ্বার হইতে ফিরিয়া গিয়া, সন্তরণে নদী পার হইবার জন্য যত্ন করিতেছে।

আবার কিন্তু দেখিলাম, কতকগুলি লোককে দ্বারীদ্বয় সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া চলিতেছে। তাহাদিগের মুখ প্রফুল্ল, হৃদয়ে আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত। তবে আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহাদের মধ্যেরও অনেকে, সেতুর কিয়দংশ অতিক্রম করিতে না করিতেই, ভীষণ সন্দেহ-দোলায় দোলায়মান হইয়া, শ্রম ও যত্ন পশ্চাতে আসিতেছে কি না দেখিবার জন্য যেমন পশ্চাৎ ফিরিতেছে, অমনি সেতুর গুপ্ত গর্ত্ত দিয়া পতিত হইয়া একেবারে নিম্নতল-প্রবাহিত অনন্ত প্রবাহিনী নদীতে পড়িয়া যাইতেছে। সেতুর উপরে এরূপ গর্ত্ত অনেক। প্রথমাংশে কিছু কম, মধ্য ভাগে বড় বেশী, শেষে আবার কম। এই সকল গর্ত্ত অতিক্রম করিয়া, শতকরা কদাচ দুইজন মাত্র সেই উপবনে উপস্থিত হইতেছে। সেতু দিয়া পার হইয়াই উপবনের দ্বারদেশে উপস্থিত হওয়া যায়। তথায় একটি ভীষণ রাক্ষস দণ্ডায়মান। তাহার নাম 'ভ্রম'। রাক্ষস প্রথমে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ক্ষুদ্র প্রাণী মানবের নিকট অগ্রসর হইয়া বলিতেছে,—"কে তোমরা? এখানে কি সাহসে প্রবেশ করিতেছ? যাও, এখান হইতে প্রস্থান কর!" যিনি রাক্ষসের মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে ভীত হইতেছেন, রাক্ষস তাঁহাকেই আক্রমণ করিয়া দূরে নদীজলে নিক্ষেপ করিতেছে। তবে যিনি রাক্ষসের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়াও ভীত না হইয়া আপনার গন্তব্য স্থানাভিমুখে গমন করিতেছেন, রাক্ষস তাঁহাকে আর কিছু না বলিয়া, "আপনার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি পরিহার-পূর্ব্বক মোহন বেশ ধারণ করতঃ তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইয়া ক্রমাগত বলিতেছে,—"মহাশয়! আপনি

যথেষ্ট সাহসী পুরুষ দেখিতেছি। কেন নিজ পদে কুঠারাঘাত করিতেছেন? ওদিকে গেলে, আপনার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে। আপনি আমার সহিত আগমন করুন, আমি আপনাকে আর একটি সুন্দর উপবনে লইয়া যাইতেছি।"

পথিক যদি এ সকল গ্রাহ্য না করিয়াও আপন মনে চলিতে থাকে, তাহা হইলে সেই রাক্ষস আর একবার আপনার সয়তান মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পথিকের সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হয়। এততেও যদি পথিকের একাগ্রচিত্ততা বিচলিত না হয়, তখন রাক্ষসের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম বাধে। এই সময় 'শ্রম' ও 'যত্ন' আপনাদের পরীক্ষা শেষ হইয়াছে দেখিয়া, পথিককে 'জ্ঞান'-অসি প্রদান করে। পথিক সেই অসি হস্তে 'ভ্রম' রাক্ষসের সম্মুখে উপস্থিত হইলেই, সে পরাজয় স্বীকার-পূর্ব্বক পলায়ন করে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, একটী উপবন, আর একটি মানস-সরোবর। আহা! উপবনের কি অদ্ভুত শোভা! ফলপল্লব-পরিশোভিত বৃক্ষ শ্রেণীর কি সৌন্দর্য্য! কুসুমমালা-পরিশোভিত লতিকার কি অপূর্ব্ব রমণীয়তা! কি নির্জ্জন স্থান! যেন শচীপতি নন্দন-কাননের অনুকরণে, মর্ত্তে আর একটি উদ্যান প্রস্তুত করাইয়াছেন! 'শ্রম' ও 'যত্নের' দ্বারা পরিচালিত হইয়া, পথিক প্রথমেই একটি বৃহৎ বৃক্ষ সন্দর্শন করেন। এই বৃক্ষের নাম 'সাহিত্য'। একবার ইহার তলদেশে উপস্থিত হইলে, আর পরিত্যাগ করিয়া যাইতে ইচ্ছা করে না। ইহার চতুর্দ্দিকস্থ বিস্তৃত শাখা-প্রশাখা ও পত্রের একটিও ভগ্ন বা ক্ষত নহে—নিত্য নব পল্লব-মুকুল পরিশোভিত হইয়া ইহা উদ্যানের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। ইহার একটি শাখা উদ্যানের অনেক স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে—নাম, 'কাব্য'-শাখা। এই শাখাটী আবার 'অলঙ্কার' নামক কতকগুলি সুন্দর চিত্র বিচিত্র লতিকায় জড়িত। ছায়া বহুদূর ব্যাপী। সুকুমার-মতি তরুণ বয়স্ক বালক কবিগণের ইহার ছায়াই একমাত্র বিশ্রাম-স্থল। 'অলঙ্কার' শাখাটী কুসুমমালায় পরিশোভিত হইয়া উদ্যানের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। কুসুম দুই প্রকার—শ্বেত ও রক্ত বর্ণ। শ্বেতবর্ণ কুসুমের নাম 'গদ্য', এবং রক্তবর্ণ কুসুমের নাম 'পদ্য'। এই সকল পুষ্প আহরণ করিয়া সুকুমার-মতি বালক কবিগণ, আপনাকে ভুবন-মোহন-রূপে সাজাইয়া, দর্শকদিগের চিত্ত-বিনোদন করেন।

পথিক এ সকল দেখিয়া, 'সাহিত্য'-বৃক্ষ সম্পূর্ণ পর্য্যবেক্ষণ-পূর্ব্বক অগ্রসর হইলে, 'শ্রম' ও 'যত্ন' পথ দেখাইয়া তাঁহাকে 'স্মৃতি'-বৃক্ষমূলে লইয়া যান। 'স্মৃতি' বৃক্ষটী স্বভাবতঃ স্থূল; কিন্তু সর্ব্বদা প্রয়োজনীয় বলিয়া অনেক মহানুভবই ইহার তলদেশে কয়েক দণ্ড বিশ্রাম গ্রহণ করেন। তৎপরে 'ন্যায়' বৃক্ষ। ইহা দেখিতে অতি মনোহর, শাখা-প্রশাখা চতুর্দ্দিকে সমবিস্তৃত, পত্র সকল স্বভাবতঃ নির্ম্মল প্রভাবিশিষ্ট; পুষ্পদল দেখিতে তেমন সুন্দর নয় বটে, কিন্তু গন্ধ অতি মিষ্ট। ফলসকল অতি রসাল বটে, কিন্তু বর্ণ-চোরা। অদূরে 'দর্শন' নামে যে ছয়টী বৃহৎ বৃক্ষ আছে, এই 'ন্যায়' বৃক্ষটী তাহারই অন্যতম।

'দর্শন' বৃক্ষগুলি দেখিতে অতি সুন্দর। অন্যান্য বৃক্ষ হইতে ইহা অপেক্ষাকৃত নূতন ও ও মহাকায়-বিশিষ্ট। ইহার শাখা অধিক নাই; কিন্তু যাহা আছে তাহা অতি সুগঠিত, সুরচিত, সুদৃশ্য ও বিবিধ আনন্দ-প্রদ। ইহার নয়ন-তৃপ্তিকর উজ্জ্বল দ্যুতি-বিশিষ্ট পত্র-সকল একটিও ক্ষত নয়। পুষ্প-সকলের গন্ধ অতি আদরনীয় এবং উহা দেখিতেও বিলক্ষণ সুন্দর। ফল সকল স্বভাবতঃই অতি মিষ্ট। 'শ্রম' এবং 'যত্নের' উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া পথিক

'দর্শন' প্রভৃতি যাবতীয় বৃক্ষ সন্দর্শন করিয়া অবশেষে মহাবৃক্ষ 'গণিত'-মূলে উপস্থিত হন।

এই বৃক্ষমূলে উপস্থিত হইলে পথিকের আরও তিনজন সঙ্গী জুটিয়া থাকে। ইহা-দিগের নাম 'ধৈর্য্য', 'স্থির প্রতিজ্ঞা' এবং 'শ্রদ্ধা।' অপেক্ষাকৃত উপবনের যাবতীয় (সাহিত্য ব্যতীত) বৃক্ষাপেক্ষা 'গণিত' বৃক্ষই অতি সারবান, উচ্চ, স্থূল, প্রাচীন ও প্রবীণ। 'জ্যোতিষ' প্রভৃতি ইহার বহুবিস্তৃত শাখা-প্রশাখা সকল অন্যান্য বৃক্ষের শাখা প্রশাখা হইতে স্থূল; পত্রাবলী এত সূক্ষ্ম এবং জটিল যে, বিশেষ স্থির দৃষ্টি ও মনোযোগের সহিত দর্শন না করিলে, তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য কিছুই দেখা যায় না। পথিক ইহার সৌন্দর্য্য একবার সন্দর্শন করিতে সমর্থ হইলে শীঘ্র আর কোথাও যাইতে স্বীকৃত হয়েন না। পুষ্প-সকল মনোহর গন্ধবিশিষ্ট ও মিষ্ট। ইহার ফল, কাননের যাবতীয় ফল অপেক্ষা সুস্বাদু, স্বাস্থ্যজনক ও রসনার তৃপ্তিকর; এবং দেখিতেও অতি রমণীয়। অধিক বয়স্ক চিন্তাশীল বুদ্ধি-মান ব্যক্তি ভিন্ন ইহার তলদেশে কেহ অধিক-ক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করেন না। কেবল তাঁহা-রাই এই বৃক্ষমূলে অবস্থিতি-পূর্ব্বক পুষ্পচয়ণ করতঃ মালা গাঁথিয়া আপনাকে সজ্জিত ও ভূষিত করিয়া থাকেন।

উদ্যানের মধ্যস্থলে মনোহর মানস-সরোবর। স্বচ্ছ জল—তলদেশ পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে দেখা যায়।

একি! সরোবরে এত আলো কোথা হইতে আসিল! যে জ্যোতিতে সমগ্র জগৎ-সংসার আলোকিত, যে জ্যোতি-বলে দেবতা-রাও মানবের নিকট পূজ্য, যে জ্যোতি-বলে এ ব্রহ্মাণ্ড এক হইয়া রহিয়াছে, সে স্বর্গীয় আলোক এখানে কোথা হইতে আসিল?

সরোবরে শত-সহস্র প্রস্ফুটিত পদ্ম ভাসিয়া ইহার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়াছে। মধু-লোভে প্রমত্ত মধুপ একবার এ পদ্ম আবার ও পদ্মে উড়িয়া বসিতেছে। এক একটি পদ্মের এক একটি নাম। সে নামের সংখ্যা নাই—কত বলিব? ভবভূতি, কালিদাস, শ্রীহর্ষ, নারদ, পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য, মনু, অত্রি, হারিত, বেদব্যাস, বাল্মীকি, উশনা, অঙ্গিরা, সেক্ষপীয়র, মিল্টন, কাউপার, ড্রাইডেন, হ্যামিল্টন, কোমথ্ প্রভৃতি পৃথিবীর যাবতীয় বৈজ্ঞানিক দার্শনিক, যত কবি, যত শাস্ত্রকার, সকলেই একত্রিত রহিয়াছেন। এই সকল পদ্মের উপর কি জানি কোথা হইতে এত আলো আসিয়া পড়িয়াছে, কে তাহাদিগকে হেমকিরণে মণ্ডিত করিয়া তারামালা সাজাইয়াছে? দূর—দূর—যত দেখি, ততই তারা দেখিতে পাই। বুঝি আকাশে এত তারকা নাই। বোধ হয়, যেন প্রকৃতিও সন্ধ্যা-সতীর সুনীল চন্দ্রাতপে এত মণি-মুক্তা সাজাইতে পারেন না; সুনীল গগণে সমগ্র তারামালারও এত সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয় না। তারামালা কেন, চন্দ্রের কিরণের সহিতও তুলনা হয় না। দূর—দূর—দূর—যত চাহি, ততই অসংখ্য হেমকিরণ-মণ্ডিত পদ্ম-সকল ভাসিতেছে। মধ্যস্থলে, শতচন্দ্র-বিনি-ন্দিত অতুল রূপরাশি লইয়া কমল-দলে কমল-বাসিনী বাগ্‌দেবী বীণাপাণি ভুবনমোহিনী-রূপে বসিয়া পীযূষ-রসবর্ষী সুরে বীণাবাদন করিতে-ছেন। আর এই অসংখ্য পদ্ম-সকল, এক একটী এক একবার আসিয়া, ধীরে ধীরে বীণা-পাণীর পাদদেশ স্পর্শ করিয়া আবার চলিয়া যাইতেছে। কেহ কি বলিতে পারেন, আমি অনন্ত চিন্তার অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়া, এ কি স্বপ্ন দেখিলাম? এ কোন রাজ্যে আসিয়া পড়িলাম?

"* * * * ফুলরেণু' পরে
বসি বাণী, বীণা শোভে স্কন্ধ'পরে,
অঙ্গুলি-তরঙ্গে সুধা-ধার ঝরে,
ভরিয়া জগত-প্রাণ।"

পুঞ্জীকৃত বিভারাশি বিভাকর, অনন্ত বিভার অংশমাত্র! সেই অংশুমালী যখন লোক-লোচনের অদৃশ্য হইতে থাকেন, তখন তিনি সন্ধ্যাদেবীকে সাজাইয়া যান। সন্ধ্যা-দেবী তখন অনন্ত আকাশের অসীম-প্রসার বসন পাতিলে, বিভাকর সে বসনাঞ্চলে সুবর্ণ-ময় বিভারাশী ছড়াইয়া দেন। সন্ধ্যাদেবী সেই রাশিকে পুঞ্জীকৃত করিয়া অগ্রে একটী তারা গড়িয়া দেখেন, কেমন দেখায়! পরে তিনি সে তারার উজ্জ্বলতায়, সৌন্দর্য্যে ও স্নিগ্ধতায় মোহিত হইয়া পড়েন। সেই তারাকে শিরোভূষণ করিয়া তখন অগণ্য তারা গড়িয়া আপনার অনন্ত বসন ভূষিত করেন। কোনখানে সিংহ, কোনখানে মেষ, কোনখানে বৃষ, কোনস্থানে মিথুন প্রভৃতি রচনা করিয়া তাহাদের সৌন্দর্য্য বাড়াইবার জন্য জগৎকে ধ্বান্ত-রাশিতে পরি-ব্যাপ্ত করেন। মাঝে বিভার ছায়াপথ সজ্জিত থাকে। তখন তিনি বিভাবরী নামে সেই তারা-খচিত ও ছায়াপথ-সজ্জিত বসন পরিয়া শোভিত হন। নিত্য নিত্য নূতন-সাজে সজ্জিত হইয়া এইরূপে বিভাবরী দেবী জগতের মনোহরণ করিতেছেন। সেই বিভাবরী-রচিত তারার কি রূপ! যদি তুমি বিভার সৌন্দর্য্য দেখিতে চাও, তবে সেই তারাবলীকে দেখ; ঘোর তমিশ্রা রজনীতে এক একটীকে লক্ষ্য কর। তখন দেখিতে পাইবে, বিভার কি স্বর্গীয় দ্যুতি, কি জ্যোতির্ম্ময় রূপ! সে রূপজ্যোতিতে তেজ আছে, অথচ মাধুরী আছে; সে রূপের বিভার উজ্জ্বলতা আছে, অথচ স্নিগ্ধতা আছে। তারা যেন সেই রূপ-বিভা লইয়া তোমার সহিত সম্ভাষণ করিতে আসেন; যেন স্বর্গের কি সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য, তাই দেখাইতে আসেন। তোমার কল্পনা তাহাকে কবিত্বে পূর্ণ করে। বিভা তখন স্বর্গের কাব্যরূপে প্রকাশিত হন। এইরূপে সন্ধ্যাদেবী আপনাকে সজ্জিত করিয়া থাকেন। কেহ কি বলিতে পারেন, কোন্ দেবী আমার এ মানস-সরোবর আর বিদ্যা-উপবন নির্ম্মাণ করিয়াছেন?

এজগতে, দেখিতে পাই, অনেকেই এই মানস-সরোবর আর বিদ্যা-কানন দেখিবার জন্য ব্যগ্র। পূর্ব্বেই তো বলিয়াছি, কোটী কোটী যাত্রী এই অনন্ত প্রবাহিনী নদীতটে দণ্ডায়মান থাকিয়া, কেমন করিয়া পরপারে যাইবে তাহাই ভাবিতেছে; কিন্তু কেহই অগ্র-সর হইতে সাহস করিতেছে না। যাহারা দুঃসাহসিকের ন্যায় সন্তরণে নদী পার হইবে বলিয়া জলে পড়িতেছে, তাহারা অনন্ত সাগ-রের অনন্ত তরঙ্গের সহিত ভাসিয়া যাইতেছে; —তাহারা কি আর ফিরিয়া আসিবে? কবে আমাদের সেদিন আসিবে, যেদিন 'শ্রম' ও 'যত্ন' পথ দেখাইয়া এই দ্বিতীয় স্বর্গে লইয়া যাইবে? কবে আমরা বিদ্যা-কাননে প্রবেশ করিয়া আনন্দিত হইব? কবে আমরা এই মানস-সরোবর দেখিয়া সুখী হইব?

দুইখানি ছবি।

দ্বাদশ দৃশ্য।*

ধূ-ধূ-ধূ!

ধূ-ধূ-ধূ! পল্লী জ্বলিতেছে,—ধূ-ধূ-ধূ! লক-লক অগ্নি-শিখা দিগন্ত প্রসারিত হইয়াছে; গ্রামকে গ্রাম, হায়-হায়, আর ক্ষণ-পরেই বুঝি বা ভস্মে পরিণত হয়! গ্রামের ত্রি-সীমা-নায় জল তো নাই-ই—বিশেষ আগুন নিবাই-বার লোকই বা কই? যাহারাও আছে, কি আশ্চর্য্য, তাহারাও তো চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় নীরবে দাঁড়াইয়া—কই, কিছুরই তো প্রতিকার করিতেছে না! অধিকন্তু, তাহাদের মুখে আবার কেন আনন্দের খল-খল অট্ট-হাস! —যেন জড় পুত্তলিকার মুখে প্রদীপ্ত বহ্নি-শিখা পড়ায়, সে মুখ সে আলোকে আরও উদ্ভা-

*তৃতীয় বর্ষের ৭ম সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর।

সিত। হায়-হায়, এ বিকট দৃশ্য—এ অদ্ভুত ভাব আর তো কোথাও দেখি নাই! নিরীহ কৃষকমণ্ডলীর শান্তিময় কুটীরে, হা বিধাতঃ, এ কঠিন—কঠোর দৃশ্য কেন দেখিতে হইতেছে! গৃহীর সম্বল পত্নী-পুত্র জ্বলিয়া মরে; জীবনের উপায় গাভী-বৎস বন্ধন-দশায় 'হাম্বা'-রবে অগ্নির সন্তাপে ছটফট করিতেছে; হে পরমেশ্বর, এ দৃশ্য দেখিয়াও আজ প্রতিকার নাই কেন?

অবশ্যই কারণ আছে! প্রতিকার করে কে? নবগ্রামের কি কেহ আর প্রাণে আছে, যে, প্রাণ-বিনিময়েও প্রতিকার করিবে! প্রাণ যাহাদের ছিল, তাহারা তো এখন জীবন্মৃত—চক্রীর চক্রে পড়িয়া কারাগারে হস্ত-পদ-বদ্ধ। চক্ষু থাকিতেও তাহারা দেখিতে পাইতেছে না, তাহাদের পুত্র-পরিবারের কি হইতেছে; হস্তপদ থাকিতেও তাহারা প্রতিকার করিতে পারিতেছে না, উপস্থিত বিপদ কিরূপে যায়! তাই আজ গ্রাম জ্বলিয়াছে—আগুন নিবাইবে কি, কেহ আত্মরক্ষা করিতেও সক্ষম হইতেছে না। কারণ, পুরুষ যাহারা, তাহারা সকলেই তো কারাগারে; আর, তাহাদের অবলা স্ত্রীগণ, কাজেই হাহাকারে! তদ্ভিন্ন, গ্রামে আর যে দুই চারিজন লোক আছে, তাহারা তো কেবল দেখিতেই দাঁড়াইয়াছে; কাজেই দেখিতেছেই কেবল! বিশেষ, মনে তাহাদের কোনরূপ বাসনা থাকিলেও, কার্য্যতঃ তাহারা তাহা সিদ্ধ করে, তাহাদের এমন সাধ্য কোথায়? অধিকন্তু, সঙ্গেই তাহাদের যখন জীবন-মরণের কর্ত্তা সেই জমীদার—যাঁহার নাম করিতেও পাপ বর্ত্তে সেই নবীন-বল্লভ! তিনিও সঙ্গে থাকিয়া, উদ্যোগী হইয়া, দেখিতেছেন, গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কিরূপে দাঁড়াইয়া মরে; আর, প্রবল প্রতিহিংসারই বা তাহাতে কতদূর কি শান্তি হয়!

প্রথমতঃ আগুন লাগিয়াছিল, শ্রীনাথের বাড়ীতে। তার পর, সে অগ্নি সে পল্লী ভস্মস্তূপে পরিণত করিয়া, এখন ক্রমে কৃষক-পল্লীতে আসিয়া লাগিয়াছে। অর্থাৎ এইবার নবীনদাসের চণ্ডীমণ্ডপে আগুন ধরিল। এতক্ষণ হইতে নবীনদাসের বাড়ীর স্ত্রীলোকগণ গৃহ হইতে দ্রব্যাদি বাহির করিয়া বাহিরে ফেলিতেছিল; ভাবিয়াছিল, "ব্রাহ্মণ-পল্লী হইতে আগুন যদিও এতদূর অগ্রসর হয়, তবে আসিতে আসিতেও, তাহারা সকল জিনিসই রক্ষা করিতে পারিবে। তাই তাহারা এযাবৎ গৃহের দ্রব্যাদিই বাহির করিতেছিল। কিন্তু এখন, এত সত্বরই সে আগুন আসিয়া তাহাদের চণ্ডীমণ্ডপে লাগায়, তাহারা বড়ই শঙ্কিত হইল। তখন তাহারা ভাবিল,—বুঝিবা আর কিছুই রক্ষা করিতে পারিলাম না! এই ভাবনায় পরই, হঠাৎ সেই রুগ্ন-শয্যায়-শায়িতা কামিনীর কথা তাহাদের মনে পড়িল। নবীনদাসের গৃহিনী তখন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"তোরা যা'—যা; আগে কামিনীকে বা'র ক'র। জিনিস-পত্র যত পাওয়া যাক আর না যাক, ব্রাহ্মণ-কন্যাকে আগে বাঁচা।"

এই বলিয়াই, অপরাপর স্ত্রীলোকগণের সঙ্গে, নবীনদাসের গৃহিনীও, কামিনী যে ঘরে শয্যাশায়ী ছিলেন সেই দিকে, ছুটিল। বাসনা, এই বেলা চণ্ডীমণ্ডপ পুড়িতে পুড়িতে, বাড়ীর অন্য-প্রান্তস্থিত ঘর হইতে কামিনীকে কোনরূপে বাঁচায়।

কিন্তু কি দুর্দ্দৈব! তাহাদের সে চেষ্টা যে সকলই বৃথা! চণ্ডীমণ্ডপের দিক হইতে ছুটীতে ছুটীতে আসিয়া যেমন তাহারা বাড়ীর অপর প্রান্তের সেই গৃহে প্রবেশ করিবে, অমনি দেখিল,—কোথা হইতে আসিয়া প্রবল অগ্নি-শিখা সে গৃহেরও দ্বার-দেশে সংলগ্ন হইয়াছে; গৃহের সম্মুখীন 'চাল' ও দরজা 'ধূ-ধূ' করিয়া জ্বলিতেছে। কে আগুন ধরাইল, কিরূপে ধরিল, তাহা আর কেহ বুঝিতেই পারিল না। সকলেই তখন কপালে হাত দিয়া হাহাকারে রোদন করিতে লাগিল। রক্ষার আর কোন উপায়ই নাই—অগ্নি-রাশি ক্রমেই প্রশস্ত হইয়া জ্বলিতেছে! তখন বাড়ীর যেদিকেই দেখি, সেই দিকেই ধূ-ধূ-ধূ।

ত্রয়োদশ দৃশ্য।

ফিরিয়া আসিয়া।

যে সময় নবীন দাসের গৃহে এইরূপ ক্রন্দনের রোল—হাহাকার উঠিয়াছে, যে সময় তাঁহার পত্নী-পুত্রবধূগণের শোকোচ্ছ্বাসে গৃহ প্লাবিত, ঠিক সেই সময়ই, কি জানি কোথা হইতে, হঠাৎ নবীনদাস, তাঁহার পুত্র ও সঙ্গীগণ এবং শ্রীনাথ সকলেই ছুটিতে ছুটিতে গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিতে আসিতে দূর হইতেই তাঁহারা যাহা অনুমান করিয়াছিলেন, আসিয়াও দেখিলেন, ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। কামিনী যে ঘরে, ঠিক সেই ঘরের দুয়ার হইতে, তাঁহাদিগকে দেখিয়া নবীনদাসের পত্নী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল,—"সর্ব্বনাশ হইয়াছে—সর্ব্বনাশ হইয়াছে। হায়-হায়! এত করিয়া কামিনীকে বাচাইয়াও, আর রক্ষা করিতে পারিলাম না! কাল যে কামিনী পথ্য পাইত! হে ঈশ্বর, তোমার মনে কি এই ছিল—" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই, আর অভাগিনী কোন কথাই বলিতে পারিল না। তখন সে কেবল—"হায়-হায়! কি হলো—কি হলো!"—বলিয়া, বক্ষে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ক্রমে অপর সকলেরও ব্যাপার আর বুঝিতে বাকী রহিল না। সকলেই বুঝিল, যে ঘর জ্বলিতেছে, কামিনী তখনও সেই ঘরে—কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে পারে নাই। বুঝিয়া, তাহারাও সকলে তখন, 'হায়-হায়!' করিতে লাগিল। "জীবন্ত প্রতিমা চক্ষের উপর পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইতেছে, এ দেখিয়া কেই বা আর স্থির থাকিতে পারে? সুতরাং স্ত্রীগণের সঙ্গে পুরুষগণের হাহাকারও মিশ্রিত হইয়া, ক্রমে বড়ই ভীষণতা উপস্থিত হইল। তবে ইহার মধ্যেও একটি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নবীন দাস এপর্য্যন্ত কিন্তু বিচলিত হন নাই। ক্ষণমাত্র কি জানি কি মনে মনে ভাবিয়া,—"শীঘ্র তোমরা একটা-আদটা অস্ত্র-শস্ত্র যদি কিছু পাও, লইয়া আইস"—এই বলিয়াই, পাগলের মত, তিনি সেই গৃহের পশ্চাৎদিকে ছুটিলেন। তাঁহাকে ছুটীতে দেখিয়া অগত্যা সঙ্গীদেরও দুই এক জন তখন দু'ই একখানি 'কাতারি' লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

পশ্চাতে চলিল বটে, কিন্তু তাহাদিগকেও আর তত আবশ্যক হইল না। তাহারা গিয়াই দেখিল, বৃদ্ধ নবীনদাস মুহূর্ত্তের মধ্যেই গৃহের পশ্চাৎদিকের সেই একমাত্র ক্ষুদ্র জানালাটি ভাঙ্গিয়া, তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। গৃহের চারিদিকে তখন আগুন ধরিয়াছে—'চটাপট' 'হুস্' শব্দে তখন বাঁশ ফাটিতেছে, আর স্থানে স্থানে মাত্র প্রজ্জ্বলিত 'খড়' পতিত হইতেছে। দেখিয়া মনে হইল, আর ক্ষণপরেই এখনই 'চাল' ভাঙ্গিয়া পড়িবে—বুঝিবা তাহা হইতে বৃদ্ধও রক্ষা পায় না; কামিনীর সঙ্গে সঙ্গে হতভাগ্য নবীনদাসও বুঝি জীবন্তে পুড়িয়া মরে! হা জগদীশ, এই কি তোমার ন্যায়-বিচার!—একের প্রাণ বাঁচাইতে গিয়া, তোমার বিচারে, অপরে প্রাণে মরিবে, পিতঃ গো, দয়াল তুমি, তোমার রাজ্যের একি নিয়ম!

* * * *

এদিকে, যখন কৃষক-পল্লীর এইরূপ অবস্থা, দুরন্ত জমীদার নবীন-বল্লভের মনে তখন আরও এক নূতন দুষ্প্রবৃত্তি জন্মিল। পাপিষ্ঠ মনে মনে ভাবিল,—"এই সময় গৃহে আগুন লাগায় পল্লীর সকলেই শশব্যস্ত; বিশেষ, কাঁহারও

বাটীতে পুরুষটি পর্য্যন্ত নাই। সুতরাং আমার বহুদিনের সেই আর এক কামনা পূর্ণ করিবার এই আর এক সুন্দর অবসর। অনেক দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি, নবীনদাসের পুত্রবধূ পরমা সুন্দরী; কিন্তু সে রূপ-দর্শনও এপর্য্যন্ত আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। তা' এই সুযোগে, কেন একবার তাহাকেই হস্তগত করি না!"—এইরূপ ভাবিয়াই, প্রকাশ্যে তাঁহার প্রিয় বয়স্য হরিদাসকে তিনি বলিলেন,—"দেখ হরিদাস, তোমাকে আর এক কাজ কর্ত্তে হ'চ্চে।"

হরি।—"কি কাজ, আদেশ করুন।"

জমীদার।—"দেখ, আমরা সকলে মেলে গিয়েই, চল একবার নবীনে বেটার ঐ বাড়ীতে উপস্থিত হইগে'। আজ ওখানে সবগুলোই স্ত্রীলোক; তা'র মধ্যে থেকে আজ নিশ্চয়ই বৌ-টাকে 'লুফে' নেওয়া যা'বে!"

হরি।—(বাধা দিয়া)—"এ বিপদের সময় অতটা——"

জমীদার।—(কিছু রাগিয়া)—"কি, আমায় অবহেলা——"

চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ করিয়া এই পর্য্যন্ত বলিতেছেন, এমন সময়ই, অমনই যোড়করে হরিদাস বলিল,—"না—না, আমি তা' বলিনি। চলুন—চলুন্ না, যোগাড় করিগে!"

ইহার পরই, বড়ই আহ্লাদ-সহকারে, তাঁহারা নিকটস্থ কএকটী বাড়ী অতিক্রম করিয়া ক্রমে নবীনদাসের প্রাঙ্গনেই উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, তথায় স্ত্রীগণ হাহাকার করিতেছে—গৃহ-সকল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে; তাহাদের নিকটে পুরুষ বলিতে আর কেহই নাই। দেখিয়াই তাঁহারা ভাবিলেন,—এরূপ সুবিধা আর হইবে না।

এইস্থানে বলা আবশ্যক যে, জানালা ভাঙ্গিয়া কামিনীকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রজ্জ্বলিত গৃহে প্রবেশ করার সংবাদ পাইয়া, বাড়ীর যাবতীয় লোকজন—যাহারা তখনই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল তাহারা সকলেই—তখন বাড়ীর সেই পশ্চাৎদিকের জানালার নিকট ছুটিয়াছে। কাজেই বাড়ীর অন্দরের দিকে কেবল স্ত্রীগণই—সঙ্গে সঙ্গে নবীনদাসের শোকেও তাহাদের প্রাণ বহির্গত-প্রায়।

এ দেখিয়া, জমীদার মহাশয় যেন আনন্দে আটখানা হইলেন। হরিদাস বা হীরে অগ্রসর হইয়া বধূকে আক্রমণ করিবার অগ্রেই, তিনিই তাহাকে ধরিতে অগ্রসর হইলেন। বিশেষ, শ্বাশুড়ী প্রভৃতির নিকট হইতে একটু দূরে—সকলের পশ্চাৎদিকে বসিয়া এসময় বধূটি কাঁদিতেছিল। কাজেই, বড়ই সুবিধা বুঝিয়া, তাঁহার আর বিলম্ব সহিল না। তিনিই সকলের অগ্রে, তাড়াতাড়ি গিয়া অভাগিনীর হাত চাপিয়া ধরিলেন;—বলিলেন,—"সুন্দরি, তোমার জন্যই এতটা করিয়াছি। এখন এ কেন কৃষকের ঘরে কষ্ট পাও; জমীদারের গৃহিনী হইবে, চল!"

রমণী চমকাইয়া উঠিল। সম্মুখে তিনটি রাক্ষস-প্রকৃতির লোককে দেখিয়া ভীষণ আর্ত্তনাদ সহকারে সে চেঁচাইয়া বলিল,—"মা—মা আমায় রক্ষা কর—আমায় রক্ষা কর আমার সর্ব্বনাশ হলো—সর্ব্বনাশ হলো" চীৎকার শুনিয়াই, সেদিকে তাকাইয়া, তাহার শ্বাশুড়ী প্রভৃতিও চেঁচাইতে চেঁচাইতে সেই দিকে ছুটিয়া আসিল। আরও, সঙ্গে সঙ্গে সে সর্ব্বনাশ-সূচক চীৎকার-ধ্বনি শুনিয়া বাড়ীর পশ্চাৎদিক হইতেও, যত কৃষক ও নবীনদাসের পুত্রাদিও ছুটিয়া আসিল। জমীদার মহাশয় দেখিলেন, আর রক্ষা নাই!

তিনি যে অবস্থায় বধূটির হাত ধরিয়াছিলেন তাহা ছাড়িয়া তাঁহাকে আর বড় নড়িতে হইল না; তেমনই তাঁহাকে থাকিতে হইল। ধরিয়া লইয়া যাইবেন কি, তিনিই আর আপনাকে ছাড়াইতে পারিলেন না; সকলে গিয়া অতর্কিতে

তাঁহাকেই আক্রমণ করিল। গতিক খারাপ দেখিয়া তাঁহার সঙ্গী হীরে ডোম পূর্ব্ব হইতেই ছুটিয়া পলাইয়াছিল বটে; কিন্তু তাঁহার দক্ষিণ-হস্ত হরিদাসও ধরা পড়িল। তখন আর তাঁহাদের সে দুর্দ্দশা দেখে কে? বিস্ময়ে, ভয়ে, লজ্জায় তাঁহাদের আর বাঙ্‌নিষ্পত্তিটি পর্য্যন্ত করিবার সামর্থ্য রহিল না। তখন তাঁহাদের শরীরে যেন আপনা-আপনিই শত বৃশ্চিক দংশন করিতে লাগিল; মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কৃষকদিগের এক-একটী বাক্য-বাণে তাঁহাদের মনে হইতে লাগিল,—এ অপেক্ষা মরণ অনেক ভাল। বেশীর ভাগ, ডাকাতি-মকর্দ্দমায় দোষী সাব্যস্থ হইয়া 'সেসানে' গিয়া, বিশেষতঃ সেখানেও আবার বড় বড় ব্যারিষ্টার, উকিল ও তদ্বিরকারক থাকিতেও, কি করিয়া কৃষকগণ হঠাৎ আসিয়া বাড়ী পৌঁছিল—এ ভাবনায়, জমীদার মহাশয়কে আরও উৎকণ্ঠিত করিতে লাগিল। অধিক কি, সে ভাবনায় তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে, সে যন্ত্রণা অপেক্ষা তখন আত্মহত্যা করিবার কোন উপায় থাকিলে তিনি তাহাই করেন।

চতুর্দ্দশ দৃশ্য।

অন্তিমে।

"নাথ! আমার মাথার কাছে একবার তোমার পা-দু'খানি দেও—আমার কানের কাছে একবার 'হরি হরি' বল। তোমার পা-দু'খানি দেখিতে দেখিতে, তোমার মুখে হরিনাম শুনিতে শুনিতে আমি যাই—ই—ই!"

"উ-হু! ও! কামিনী—কামিনী! আমায় ফেলে তুমি কোথায় যা'বে! যা'বে, আমায় নিয়ে যাও! আমি যে তোমার কিছুই কর্‌তে পাল্লেম না! হা অদৃষ্ট!—হা ভাগ্য!"

"সে দুঃখ করিয়া আর কি হইবে? সকলই অভাগীর ভাগ্য—সকলই বিধাতার লিপি! তা' যা'হোক, এখনও সময় আছে—এখনও এস—এখনও একবার আমার মাথার কাছে তোমার পা-দু'খানি দেও! এখনও জ্ঞান আছে—এখনও দেখিতে পাইতেছি; তাই বড় ইচ্ছা, এখনও তোমার পা দু'খানি মাথায় রাখিয়া, তোমায় দেখিতে দেখিতে চলিয়া যাই!—তোমার মুখে হরিনাম শুনি।"

গাঙ্গিনীর ক্রোড়ে, অন্তর্জ্জলী অবস্থায়, আসন্নশায়ী কামিনী! তাঁহার মস্তকের নিকট পবিত্র তুলসী-বৃক্ষ, তচ্ছায়ায় সিংহাসনোপরি নারায়ণ। পার্শ্বে তাহার পত্নীগতপ্রাণ স্বামী শ্রীনাথ, আর তাঁহার কিয়দ্দূরে সেই নবগ্রামের ধর্ম্ম-প্রাণ কৃষক-মণ্ডলী।

অনেক কষ্টে, আপনিও একরূপ অর্দ্ধদগ্ধ হইয়া, বৃদ্ধ নবীনদাস সেই প্রজ্জ্বলিত গৃহ হইতে কামিনীকে বাহির করেন। কিন্তু তা'র-পর হইতেই, অনেকাংশে অগ্নির সন্তাপেই, তাঁহার জীবনের আশা ফুরায়। আর, তাই, তদ্দণ্ডেই তাঁহারা সকলে কামিনীকে লইয়া, তাঁহার গঙ্গাপ্রাপ্তির জন্য, চলিয়া আসেন। যে সময় কামিনীকে গৃহ হইতে বাহির করা হইয়াছিল, সে সময় তাঁহার অজ্ঞান অবস্থা—তিনি মূর্চ্ছায় জ্ঞানহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং বাহির করিয়াই তাঁহার সুশ্রুষার জন্য সকলে ব্যাপৃত হন। এবং সকলেই তখন আশা করেন, তখনও তাঁহার সর্ব্বপ্রকারে সুশ্রুষা হইলে, তিনি আরও দুইএকদিন বাঁচিতে পারিবেন; আর, তাহা হইলে, আবারও চিকিৎসা চলিবে। কিন্তু কি দুর্দ্দৈব যে, ঠিক সেই সময়ই আবার জমীদার নবীনবল্লভকে লইয়া সেই গোল উঠে—নবীনদাসের পুত্রবধূর প্রতি তিনি আবার অত্যাচার করিতে অগ্রসর হন। আর, কাজেই কামিনীকে ছাড়িয়া, সকলকে বধূর উদ্ধারের জন্যই আবার চেষ্টা পাইতে হয়। বিশেষতঃ, তজ্জন্যই তখন সুশৃঙ্খলায় সুশ্রুষা না হওয়ায়, কামিনীর ক্রমেই অন্তিম দশা উপস্থিত হইতে

থাকে। সুতরাং জমীদারের একটা গত্যন্তর লাগাইয়াই, নবগ্রামের প্রায় দেড় ক্রোশ দূরস্থিত গঙ্গাতীরে সকলেই কামিনীকে লইয়া চলিয়া আসেন।

তৎপরেই কামিনীর এই অবস্থা। গঙ্গার ক্রোড়ে, অন্তর্জ্জলী অবস্থায় শুইয়া এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে স্বামীর চরণ ও নারায়ণ-মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া, তিনি এখন পরম ভাগ্যবতী।

ক্রমে স্বামীর চরণ দু'খানি তিনি আপন মস্তকে স্থাপিত করিলেন। স্বামীর মুখনিঃসৃত "হরিবোল—হরিবোল" ধ্বনি তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। তিনিও "হরিবোল—হরিবোল" বলিয়া একবার চক্ষু মুদিলেন। তা'রপর!—তা'রপর আর কিছুই নাই! সেই-ই তাঁহার শেষ দৃশ্য! স্বামীর চরণে মাথা রাখিয়া, স্বামীর মুখে হরিনাম শুনিতে শুনিতে এবং আপনিও হরিনাম বলিতে বলিতে, তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

এইখানে সকলই ফুরাইল। চারিদিকে কেবলই হা-হুতাশ! সে মর্ম্মভেদী দৃশ্যে পশু-পক্ষীও কাঁদিল—বৃক্ষ-লতা কাঁপিল! স্থাবর-জঙ্গম সকলেই ভাবিল,—হায়—হায়! হা জগদীশ! এ অন্তিম দৃশ্য এ জগতে আর কতদিন দেখিব?

নাট্যচিত্র।

(বিল্বমঙ্গল ঠাকুর, পূর্ণচন্দ্র ও বিষাদ!)

(৩)

তৃতীয়তঃ।—"বিষাদ" নাটকের গল্প।—অলর্ক অযোধ্যার রাজা,—মাধব রাজ-বয়স্য। 'রাজ-বয়স্য' বলিয়া কেবল যেমন-তেমন একটা 'মোসাহেব' বা 'ভাঁড়'-শ্রেণীর নহে—মাধব রাজার দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ ছিল। মাধবের উপদেশ, মাধবের শিক্ষা, মাধবের পরামর্শ ভিন্ন, রাজা কোন কার্য্যই করিতেন না। অধিক কি, রাজা অলর্ককে, মাধব যন্ত্র-পুত্তলি-প্রায় করিয়াছিল। মাধবের অন্তরের উদ্দেশ্য কি, তাহার লক্ষ্য কি, তাহা আমরা এখন বলিব না। তবে মাধবের পরামর্শানুসারে অলর্ক অহর্নিশি আমোদ-প্রমোদে মগ্ন থাকিতেন। মাধব বলিয়াছে,—আনন্দই জগতের সার, আনন্দ-ভোগই মানুষের একমাত্র বিমল সুখ। কাজেই রাজাও বুঝিয়াছেন, তাই। তবে তাঁহার সে আনন্দের একটু বিশেষত্ব এই, কেবলই ভোগ-বিলাস ও ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করা,—ঐশ্বরিক চিন্তায় যে আনন্দ, ভগবদ্ভক্তি পর্য্যালোচনায় যে সুখ, তাহা তিনি করিতেন না। মাধবের আন্তরিক ভাব এইরূপ হইতে পারে, এই চরম লক্ষ্যই তাহার জীবনের এক মাত্র অবলম্বনও হইতে পারে; কিন্তু তাহার বাহ্য কার্য্যকলাপে, আচারে ব্যবহারে, লৌকিকতায় অনুষ্ঠানে, সে ভাব উপলব্ধি হইত না;—অন্ততঃ সাংসারিক লোকের তাহা বোধগম্য ছিল না। তবে তাহার হৃদ্গত ভাব একটি কথায় সময়ে সময়ে এ উচ্চভাব পরিলক্ষিত হইত। তাহার অন্তরের ভাব যাহাই হউক, রাজা কিন্তু এইটুকুই জানিতেন আমোদই সুখ; যেরূপে হউক, তাহাই সম্পন্ন করিতে হইবে। যৌবনের প্রখর মনোবৃত্তির তীব্র উত্তেজনায়, দুর্ব্বল-চিত্ত মানুষের মন স্বভাবতঃ অধঃপথেই অগ্রসর হইয়া থাকে। পাশব ইন্দ্রিয়-চরিতার্থেই তাহাদের দুর্দ্দমনীয় রিপুগণ উত্তেজিত হয়। হতভাগ্য রাজা অলর্কের অদৃষ্টেও ইহাই ঘটিয়াছিল।

রাজ-কার্য্য ও রাজধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অহর্নিশি তিনি কুৎসিত অমোদে ও ভোগ-লিপ্সায় নিযুক্ত হইয়া পড়েন। সুচতুর মাধব কুহকে পড়িয়া এবং নিজের তীব্র বুদ্ধি-দোষে তিনি যে আপনার লোমহর্ষণ সর্ব্বনাশ আপনি করিয়াছিলেন, এমন কি, শেষে কালসাপিনী বেশ্যার বেশ্যা-সুলভ আকর্ষণে বিমোহিত

হইয়া নিজ জীবন-পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতেও প্রস্তুত-প্রায় হইয়াছিলেন, তাহা কল্পনায় আনিতেও কষ্ট বোধ হয়। অপরিণামদর্শী ও তরল বুদ্ধিসম্পন্ন অসার ইন্দ্রিয়-পরায়ণের পরিণাম যাহা হয়, রাজা অলর্কের ভাগ্যে তাহার চূড়ান্ত হইয়াছিল। দুষ্টবুদ্ধি মাধব 'উজ্জ্বলা'-নাম্নী জনৈক অসামান্যা রূপসী বারবিলাসিনীর উপর অলর্কের আসক্তি জন্মাইয়া দেয়। কামোন্মত্ত রাজাও উজ্জ্বলার ঘৃণিত প্রেমে আপনা-বিস্মৃত হন; এবং অহর্নিশি তাহাকে ধ্যান করিয়া পাপ নরকের কুৎসিত কুটীল পথের চরম-সীমায় উপনীত হইতে থাকেন। রাজ্য, ধন, ঐশ্বর্য্য সকলই বিস্মৃত হন; আদর্শসতী সাধ্বী সহধর্ম্মিণী 'সরস্বতী'কে ভুলিয়া, অমাত্য, মন্ত্রী, সভাসদ্বৃন্দ ও প্রজাবর্গকে ভুলিয়া, তিনি অসীম পাপ-সমুদ্রে ঝাঁপ দেন। হলাহলই তাঁহার জীবনের প্রায়শ্চিত্ত হয়।

হিন্দুর চিরগৌরব সতীর সতীত্ব পৃথিবীতে অতুলনীয়। পতিপ্রাণা সরস্বতী, পতি-বিচ্ছেদ-যন্ত্রণায় অধীরা হইলেন। রাজভক্ত বৃদ্ধ সচিব রাজ্যের অশেষ প্রকার বিশৃঙ্খলতা ও রাজ-কার্য্যের দৈন দশা রাজ-রাণীর নিকট আবেদন করিল। সরস্বতী চক্ষেও সমস্ত দেখিলেন। রাজা অহর্নিশি বেশ্যালয়ে কালযাপন করেন, তাঁহার সহিত ত আর দেখা হইবার কোন উপায় নাই! সুতরাং প্রথমে তিনি মাধবকে রাজার বুদ্ধিভ্রংশের অপনোদন করিতে বিস্তর অনুরোধ করিলেন; বুঝাইলেন, মিনতি করিলেন, শেষে দিনান্তে একবার-মাত্র রাজাকে দেখিতে চাহিলেন। কিন্তু, দুষ্টবুদ্ধি মাধব কিছুতেই তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিল না। সতীর প্রাণ কাঁদিল, পতির বিরহ সহ্য করা অসাধ্য বোধে সতী 'সরস্বতী' এক অসাধারণ উপায় উদ্ভাবন করিলেন। পর্ব্বত নিঃসৃতা বেগবতী নদীর বেগ রোধ করিতে কে সক্ষম! সুস্থান-কুস্থান তাহার কিছুই জ্ঞান থাকে না; শত বাধা-বিপত্তিতেও সে আপন ক্ষুদ্র প্রাণ এক মহাপ্রাণে মিশাইবেই! কল্পনা স্তম্ভিত হয়, লেখনী কাঁপিয়া উঠে, হৃদয় বিস্ময়-রসে আপ্লুত হয়,—রাজ-রাণী সরস্বতী মনোহর বালক সাজিয়া ছদ্মবেশে 'বিষাদ' নাম ধারণ করিয়া, সেই বেশ্যা-গৃহে দাসত্ব স্বীকার করিলেন। পতিকে চক্ষে দেখিতে পাইবেন, এই-ই যথেষ্ট! বেশ্যা উজ্জ্বলাও ইহাতে সন্তুষ্ট হইল। লিখিতে লজ্জা হয়, পাপীয়সীও নিত্য-নূতন-প্রিয় পাপ-ইচ্ছা সাধন-মানসেই বালকরূপী বিষাদকে স্নেহ করিতে লাগিল; এবং বেশ্যা-উপযোগী ভালবাসার চক্ষে তাহাকে দেখিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, রাজা অলর্ক পত্নী সরস্বতীকে এ অবস্থায় চিনিতে পারিলেন না। তিনিও বিষাদের স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইলেন; এবং তাহার সরলতাপূর্ণ মুখ দেখিয়া, তাহার নিকট নিঃস্বার্থ স্বর্গীয় প্রেমের কথা শুনিয়া, তিনিও সময়ে সময়ে মোহিত হইতে লাগিলেন।

পাপ-কার্য্য কখনও চিরদিন অক্ষুণ্ণ ভাবে থাকে না। ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়িবেই। তাহার সময় আসিলে সে আপনিই প্রকাশ হইয়া পড়িবেই। উজ্জ্বলার পাপ-ইচ্ছা ক্রমে ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিল। মাধবের সাহায্যে, ছলে, কৌশলে, কামোন্মত্ত রাজা অলর্কের নিকট হইতে সে সমস্ত রাজ্য আপন নামে লিখাইয়া লইল। আজ হইতে পাপীয়সী অযোধ্যার অধিশ্বরী হইল। মন্ত্রী এ সময় প্রাণপণে রাজাকে এ দুষ্কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু তাঁহার উদ্যম ব্যর্থ হইল।

কাশ্মীরাধিপতি জিৎসিং অযোধ্যা-রাজের শ্যালক। তিনি ভগিনীপতি অলর্কের আচরণ যেরূপে হউক সমস্তই শুনিলেন। রাজ্য ও রাজ-কার্য্যের বিশৃঙ্খলতা ও ভগিনী স্বরস্বতীর মনোকষ্ট—তিনি সমস্তই শ্রুত হইলেন; এবং

সত্বরই ইহার প্রতিবিধানার্থ কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি সসৈন্যে একেবারে অযোধ্যায় উপনীত হইয়া বিনা আয়াসে, বিনা যুদ্ধে, রাজ-দুর্গ হস্তগত করিলেন। পরে অলর্কের সন্ধান করিতে লাগিলেন। রাজ-মন্ত্রী 'শিব-রাম' প্রমুখাৎ তিনি শ্রুত হইলেন যে, তাঁহার ভগিনী সরস্বতী আজ কিছুদিন হইতে নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। একথা শুনিয়া তাঁহার ক্রোধ শত-গুণে বর্দ্ধিত হইল। মন্ত্রীকে তিনি তিন দিনের সময় দিলেন। যদি রাজরাণী সরস্বতীর কোনও সংবাদ তাঁহারা না দিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি সমগ্র অযোধ্যানগরী শোনিতে সিক্ত করিবেন, এ কথাও বলিলেন।

এদিকে পূর্ণমাত্রায় বিষ ধরিল। উজ্জ্বলা রাজ্যেশ্বরী হওয়া অবধি প্রতিদিনই একটা না একটা গোলযোগ হইতে থাকে। পাপ-উজ্জ্বলার জনৈক পাপ-সহচরী তাহাকে পরা-মর্শ দিল যে, রাজাকে একেবারে হত্যা করাই শ্রেয়ঃ। কি জানি, আবার কখন কি মূর্ত্তি ধরিয়া তাহাকে দূর করিয়া দিতে পারে! কথাটা উজ্জ্বলার নিকট নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হইল না। তবে সে নিজ-হস্তে এ কার্য্য করিতে একটু ইতস্ততঃ করিল।

একদিন রাজা ভাঙপানে অচেতন। উজ্জ্বলা বিষাদকে আপন পাপ ইচ্ছা এইবার নিজ-মুখে ব্যক্ত করিল; এবং অধিকন্তু, শীঘ্র রাজাকে হত্যা করিয়া তাহার পথ পরিষ্কার করিবে, এ কথা বলিল। সতীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল; তিনি অস্থির হইলেন, কৌশলে অলর্কের বিলাস-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সত্যই রাজা ভাঙ্পানে অচেতন। ভাগ্য-ক্রমে এই সময় কতকগুলি চোর তাহাদের তস্কর-বৃত্তি সিদ্ধ করিতে আসিয়াছিল। বিষাদ তাহাদিগকে দেখিবামাত্র কাতর বিনয়-নম্র বচনে রাজার প্রাণ রক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন; এবং তাহাদিগকে আশাতীত পুর-স্কার দিতে স্বীকৃত হইলেন। অনন্তর চোর-বন্ধুদিগের সাহায্যে গুপ্তপথ দিয়া তিনি সে যাত্রা পতির প্রাণ রক্ষা করিলেন। সতীত্বের আদর্শ দেখাইলেন।

কাশ্মীরপতি জিৎসিং উজ্জ্বলার গৃহে প্রবেশ করিয়া রাজার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; এবং পাপিষ্ঠা উজ্জ্বলাকে বন্ধন করিতে অনুমতি দিলেন। এদিকে বিষাদ-ময়ী বিষাদ রাজাকে এক পর্ণ-কুটীরে আন-য়ন করেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার চৈতন্য হইলে, তিনি বিষাদ-প্রমুখাৎ আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত শুনিলেন। এতদিনে তিনি বেশ্যার চাতুরী বুঝিলেন। 'বিষাদ'-বেশী সরস্বতীর নিকট কৃতজ্ঞতা দেখাইতে লাগিলেন। এমন সময়, কাশ্মীরপতি কয়েকজন সৈন্য সমভিব্যাহারে সেই স্থানে উপনীত হইলেন। "এই ঘরে রাজা আছে"—এই কথা শুনিয়া, পতিপ্রাণা সতী ভাবিলেন,—"আবার বুঝি উজ্জ্বলার চর রাজাকে হত্যা করিতে আসিতেছে।" তাই অমনি তিনি ভয়-ব্যাকুল-চিত্তে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হই-লেন; অস্ত্রধারী পুরুষ তাঁহার সম্মুখীন হইলে, বলিলেন,—"আমার প্রাণ বধ না ক'রে যেতে পারবে না।" অস্ত্রধারী রাজসৈন্যও স্বাভা-বিক নিষ্ঠুর ভাবে—"তবে মর" বলিয়া সেই কোমল অঙ্গে তীক্ষ্ণ অস্ত্র বিদ্ধ করিল। "কেরে চণ্ডাল" বলিয়া রাজা অলর্ক কাঁদিয়া উঠি-লেন। এইবার তিনি বিপদের প্রকৃত পরি-চয় পাইলেন। সতী সরস্বতী পতির কোলে মস্তক রাখিয়া চক্ষু মুদিত করিলেন; স্বামী-সুখে চির-অভাগিনী সরস্বতী আজ মরিয়া জুড়াইল। কাশ্মীরপতি ভগিনীর মৃত্যুতে অধীর হইলেন; অলর্ককে কহিলেন,—"দেখ্ দুরাচার, কুৎ-সিৎ ব্যা'ভার তোর!" জায়া-শোকে অলর্ক উন্মত্তপ্রায় হইলেন। এতদিনে তাঁহার মহা-পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল।

এইটুকুই মূল নাটকের গল্পাংশ। এই-টুকুই বিয়োগান্ত নাটকের চূড়ান্ত। তবে নাটককার কল্পনা বলে শেষে আরও কতকগুলি দৃশ্যের অবতারণা করিয়া পুঁথি বাড়াইয়াছেন। এইখানে তিনি মাধবের চরিত্র ও তাহার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে দেখাইয়াছেন। তাহার পরিচয় এইরূপ:—মাধব অযোধ্যা-রাজের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। তিনি এবং তাঁহার আর তিন সহোদর মাতৃ-উপদেশে শৈশবেই সংসার-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। পরে লোক মুখে শুনিলেন, তাঁহার অন্যতম সহোদর অলর্ক সংসারে লিপ্ত আছেন। তাই তিনি রাজ-বয়স্য-বেশে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ইচ্ছা, কোনও কৌশলে, অলর্ককে সংসারের নশ্বরতা ও অসারত্ব উপলব্ধি করাইয়া সন্ন্যাসী করিবেন। তাই চোরকে চুরী করিতে বলিয়া গৃহস্থকে সাবধান করি-তেন। কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। কুকার্য্য দ্বারা যে কিছুতেই সৎ অভিসন্ধি সিদ্ধ হয় না, তাহা তিনি এক্ষণে বুঝিলেন; এবং নিজ-দুষ্কার্য্যের প্রায়শ্চিত্তও ভোগ করিলেন। সেই বেশ্যা উজ্জ্বলা একদিন নিভৃতে তাঁহার বক্ষে ছুরিকাঘাত করিল, এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হইল। বেশ্যা উজ্জ্বলা ও তাহার পাপ সহচরীও প্রবল নদীতে ঝাঁপ দিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল। এদিকে গোলক হইতে রাজমাতা আবির্ভূতা হইয়া পত্নী-শোকোন্মত্ত অলর্ককে সান্ত্বনা করিলেন; সরস্বতীও সুবর্ণ-ময় রথে তাঁহাকে দেখা দিয়া আশ্বস্ত করিলেন। মাধবের মৃত্যুকালেও রাজমাতা তাঁহাকে দেখা দিলেন, এবং পুষ্পক-রথে তাঁহাকে শান্তি-ময় বৈকুণ্ঠ-লোকে লইয়া গেলেন। এই ভাবে নাটকের শেষ অঙ্ক পরিসমাপ্তি হইয়াছে। ইহার দোষগুণ আমরা এখন কিছু বলিতেছি না। আমাদের আলোচ্য "বিল্বমঙ্গল," "পূর্ণ-চন্দ্র" ও "বিষাদ" এই তিনখানি নাটকের গল্প শেষ করিলাম। আগামী সংখ্যা হইতে নাট্যচিত্রে এই তিনখানি নাটকের তুলনায় স-লোচনা করিতে ইচ্ছা রহিল।

শশাঙ্কশেখর।

(আত্ম-কাহিনী)

(১)

বাল্যকালে পিতৃমাতৃহীন হইয়া আমি বড়ই দুরবস্থায় পড়ি; এবং একজন স্বদেশস্থ বন্ধুর পরামর্শে কলিকাতায় আসিয়া বিশ্ব-মোহন দে নামক একটি ভদ্রলোকের বাড়ীতে সরকারী চাকরী গ্রহণ করি। সেই বাটীতে কৃষ্ণদাস বাবু নামক একজন ভদ্রলোক ছিলেন। দুই একদিনের মধ্যেই, তাঁহার সহিত আমার বিশেষরূপ বন্ধুত্ব জন্মে। তিনি ঐ বাটীর অনেকানেক বিষয় অবগত ছিলেন। একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়, হঠাৎ সংবাদ পাইয়া কৃষ্ণদাস বাবু ও আমি কোন এক গুপ্ত অর্পিত্র অনুসরণ করিতেছি, এমন সময়, আবার এই পত্র কয়খানি কুড়াইয়া পাইলাম। পাইয়াই পড়িলাম,—

প্রথম পত্র।

"ভবানীপুর, ১২ই বৈশাখ।

মহাশয়, সেদিকের কাজ একপ্রকার রফা করিয়াও, কিছু করিয়া উঠিতে পারিলাম না। ঘোষেদের পুকুরে একটা খোঁটায় দড়ি বেঁধে পুঁতে রেখেছিলেম। কিন্তু দশরথে বোধ হয় সে দড়ি কাটিয়া দিয়াছে; তাহাতেই লাস ভাসিয়া উঠিয়াছে। পরদিন প্রাতঃকালে শুনিলাম যে, সে লাস পুলিষে চালান গিয়াছে; আর গোয়েন্দায় সন্ধান লইতেছে। আপাততঃ ঘোষেরা আসামী। তাঁহাদের খিড়কির পুকুরে যখন লাস পাওয়া গিয়াছে, তখন অবশ্যই তাঁহাদের বাড়ীরই কেউ না কেউ খুন্ করিয়াছে—এই ভাবিয়া, পুলিষ তাঁহা-দের বাড়ী-শুদ্ধ সকলকেই আসামী স্থির

সত্বরই ট

লেন
রিয়াছে। আর অধিক কিছু খবর পাওয়া যায় নাই। আমি ভাল আছি।

অনুগ্রহাভিলাষী শ্রীনারায়ণচন্দ্র নাগ।"

পত্রখানি পড়িয়া, আমরা উভয়েই শিহরিয়া উঠিলাম। কৃষ্ণদাস বাবু বলিলেন,—"শশাঙ্ক বাবু, এ কি ভয়ানক কথা! কে এমন লোক এবাড়ীর মধ্যে আছে যে, এমন ভয়ানক কাজে হাত দেবে?"

আমি বলিলাম,—"পড়ুন মহাশয়! তা'র পরের চিঠিখানা পড়ুন। কি জানি, যদি এমন কিছু কথা থাকে, যাতে আমরা কোনরূপে সন্ধান করিতে পারি।"

দ্বিতীয় পত্র।

"হুগ্লি, ১৫ই বৈশাখ।

মহাশয়, আপনার অনুমতিক্রমে তাঁহাকে এখানে গঙ্গার ধারের বাগান-বাড়ীতে বন্দিনী-স্বরূপে রাখা হইয়াছে। কিন্তু তিনি আজ ছয় দিবস আহারাদি পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস, আপনিই এই সমস্ত ষড়যন্ত্রের মূল। তিনি আমায় উৎকোচ-প্রদানে বশীভূত করিতে চাহেন। এতদিন পরে তাঁহার এই ধারণা হইয়াছে যে, তাঁহার একমাত্র পুত্র শিরিশকুমার এখনও জীবিত আছে—আপনি হয় তো তাহাকেও কোথায় বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন। আপাততঃ এখানকার সমস্তই মঙ্গল। আপনার মঙ্গল সংবাদ পাইলে কৃতার্থ হইব।—আপনার ভৃত্য শ্রীরাইচরণ।"

পত্রখানি পাঠ করিয়াই, কৃষ্ণদাস বাবু বলিলেন,—"তাইতো, কিছুই যে বুঝ্‌তে পাচ্চিনে! এ বড় আশ্চর্য্যের কথা! কে এমন লোক এ বাড়ীতে আছে, যে, এমন ভয়ানক কার্য্যে হস্তক্ষেপ কর্‌বে? তাইতো সরকার মহাশয়, এ যে বিষম বিপদ দেখ্‌চি! কোথা থেকে রাত দু'টোর সময় এ বিষম ব্যাপার যোগাড় কর্‌লেন? না পারি এর ভাব বুঝ্‌তে, না পারি বুঝ্‌তে লোকটা কে?"

আমি বলিলাম,—"তাইতো ম'শায়! দুদিন চাকরী ক'রে সংসারের উপর আমার ঘৃণা হয়ে গেলো দেখ্‌তে পাচ্চি। উঃ! যিনি এই ব্যাপারে লিপ্ত আছেন, তিনি কি ভয়ানক লোক! সত্যি বল্‌তে কি মশায়, কলিকাতা 'রাজধানী' নামে অভিহিত না হ'য়ে যদি 'নরক' নামে অভিহিত হ'তো, আমার মতে তা'হলে আরও উত্তম হ'তো।"

কৃষ্ণদাস বাবু ব্যগ্র হইয়া বলিলেন,—"যাক্‌গে ম'শায়, ওসব কথা! এখন বাকি কয়খানা পড়ে ফেল্‌তে পাল্লে হয়। রাত্রিও ঢের হ'য়ে গিয়েছে!"

আমিও তাহাতে সম্মত। সুতরাং আর কথা না বাড়াইয়া তাঁহার কথায় অনুমোদন করিলাম। তিনি আবার একখানি পত্র তুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পত্র।

"ভবানীপুর, ২০এ বৈশাখ।

মহাশয়, আপনার প্রেরিত তিন হাজার টাকার মধ্যে, এক হাজার টাকা দিয়া শিবুকে হাত করিয়াছি। সে গরিব মানুষ; এক হাজার টাকা পাইয়া জল হইয়া গিয়াছে।

একজন পাকা চোরকে গোয়েন্দা-রূপে নিযুক্ত করিয়াছি—তাহাকেও কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায় প্রদান করিতে হইবে। কারণ, কাজটা বড় শক্ত—সে গোয়েন্দার উপর গোয়েন্দাগিরি করিতেছে! এই পর্য্যন্ত আপাততঃ এদিককার সব মঙ্গল। আপনার মঙ্গল-সমাচার পাইলে অধীন কৃতার্থ হইবে। ইতি।

অনুগ্রহাভিলাষী শ্রীনারায়ণচন্দ্র নাগ।"

চতুর্থ পত্র।

"হুগ্‌লি, ২৫এ বৈশাখ।

মহাশয়, আপনার অনুমতিক্রমে তাঁহাকে অনেক ক্লেশ দেওয়া হইতেছে; তথাপি তিনি আমাদের কথায় কর্ণপাত করেন না। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন,—মৃত্যু হয় সেও স্বীকার, তথাপি সতীত্বরূপ অমূল্য নিধি কাহারও হস্তে সমর্পণ করিবেন না। এখানে হরি গোয়ালিনী নামক একজন স্ত্রীলোককে আমি নিযুক্ত করিয়াছি। সে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া তাঁহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছে। তাহার দ্বারাই আমি সমস্ত খবরাখবর ও তাঁহার মনের কথা জানিতে পারিতেছি। প্রথমে অর্থের লোভ দেখান হইয়াছিল, কিন্তু বুঝিলাম সে আশা বৃথা!

এখন এই পর্য্যন্ত। পরে আপনার যাহা অনুমতি হয়, করিব। কারণ, আমি পয়সার গোলাম—বোধা-বোধের গোলাম নহি। হুজুরের আজ্ঞা পাইলে আমি পৃথিবীতে প্রলয় উপস্থিত করিতে পারি—এতো কোন ছার!—আপনার অনুগত ভৃত্য শ্রীরাইচরণ।"

পত্রপাঠ শেষ করিয়াই, কৃষ্ণদাস বাবু দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিলেন,—"উঃ! পাপিষ্ঠ—নরাধম!"

আমি তাঁহার উত্তেজিত হৃদয়কে শান্ত করিয়া আবার আর একখানি পত্র পাঠ করিতে বলিলাম। কৃষ্ণদাস বাবু তাহাই করিলেন।

পঞ্চম পত্র।

"বারাশাত, ৩০এ বৈশাখ।

মহাশয়, বন্দী কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছেন। কেমন করিয়া পলায়ন করিলেন, তাহা বলিতে পারি না। যে গৃহে তিনি আবদ্ধ ছিলেন, তাহার সমস্ত জানালা-দরজা লোহার গরাদে দিয়া নির্ম্মিত। তাহার কোন স্থান ভগ্ন হয় নাই, তাহাতে কোন প্রকার সুড়ঙ্গ ও ফাটা নাই। তবে কেমন করিয়া বন্দী অদৃশ্য হইলেন, তাহা বলিতে পারি না। সে ঘরের চাবি রামসিং পাঁড়ে রাখিত। যখন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ভাত দিয়া আসিত, রাম সিং তখন সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া চাবি খুলিয়া দিত; আবার রাঁধুনি বামুন বাহির হইয়া আসিলে, সে চাবি বন্ধ করিয়া আসিত। আপাততঃ রামসিংও নাই, শিরিশ বাবুও নাই। আমার বোধ হয়, শিরিশ বাবু রামসিংকে অর্থের লোভ দেখাইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যে দিন তাঁহারা পলায়ন করিয়াছেন, সে দিন আমি আপনার 'সেই কাজ-রফা' করিতে গিয়াছিলাম। বোধ হয়, রামসিং সে বিষয় সন্ধান রাখিয়াছিল। যাহা হউক, যে ব্রাহ্মণীর জন্য এত ক্লেশ-স্বীকার, তাহাকে পাওয়া যায় নাই; সে বাড়ীতে ছিল না। যে ব্রাহ্মণ শিরিশ বাবুকে ভাত দিয়া আসিত, আপনার হুকুম-মত তাহাকে নিকেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আমি জানি না, কেন তাহারা সে মৃত দেহ বাগানের মধ্যস্থলে ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছিল। বোধ হয়, কাহাকেও দেখিতে পাইয়া, পাছে ধরা পড়ে এই ভয়ে, এ প্রকার কার্য্য করিয়াছে। যাহা হউক, আমার ইচ্ছা যে, শিরিশকুমারকে কোনরূপে খুনী আসামী স্থির করাইয়া পুলিসের উপর যদি তাহার সন্ধানের ভার অর্পিত হয়, তাহা হইলে তিনি অনায়াসেই ধৃত হইতে পারেন। আট বৎসর বয়সের সময় আপনি তাহাকে নৌকা-ভ্রমণ-চ্ছলে বাটী হইতে বাহির করিয়া আনেন; আর, আজ দশ বৎসর অতীত হইল, তিনি এখানে বন্দীস্বরূপে আবদ্ধ ছিলেন। এখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, বোধ হয়, তিনি আপন অবস্থা অনুভব করিতে পারিয়াছেন। তাই এতদিন পরে এই অচিন্তনীয় উপায়ে নিস্কৃতি লাভ করিয়াছেন। হয় তো, ইহাতে আপনার সমূহ বিপদ ঘটিতে পারে। রামসিং সকল বিষয়ই জ্ঞাত আছে; সে যদি সমস্ত কথা বলিয়া দেয় বা বলিয়া দিয়া থাকে, তাহা হইলে শিরিশকুমার হয় তো আদালতের সাহায্যে আপনার বিষয়ও পুনরুদ্ধার করিতে পারেন। অতএব যাহা ভাল বিবেচনা হয়, করিবেন; আমি আপনকার দাস—আজ্ঞা পালনে কখনও পরাঙ্মুখ হইব না।

অনুগত ভৃত্য দামোদর ঘোষ।"

৬ষ্ঠ পত্র।

"হুগ্‌লি, ৭ই জ্যৈষ্ঠ।

মহাশয়, আপনার কথামত তাঁহাকে জানান হইয়াছে যে, আগামী ১৬ই জ্যৈষ্ঠ আপনি বল-পূর্ব্বক তাঁহার সতীত্ব হরণ করিবেন। আমি দরজার আড়ালে দণ্ডায়মান থাকিয়া হরি গোয়ালিনীকে ভিতরে পাঠাইয়াছিলাম। হঠাৎ তিনি আমায় দেখিতে পান।

হরি গোয়ালিনী প্রথমে অনেক করিয়া বুঝাইল। যখন দেখিল, কিছুতেই কিছু হইবে না; তখন সে তাঁহাকে ১৬ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের কথা বলিল।

তিনি সে কথা শুনিয়া প্রথমে স্তম্ভিত হইলেন, তৎপরে অনেকক্ষণ ধরিয়া ক্রন্দন করিলেন। আমি যখন দেখিলাম, তিনি আমায় দেখিতে পাইয়াছেন,তখন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আপনার স্বাপক্ষে অনেক কথা বলিলাম—নানা মতে তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তাহাতে হিতে বিপরীত ফল দাঁড়াইল—শুপ্তা সিংহিনী যেন গর্জ্জিয়া উঠিল। তিনি চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া আমার দিকে ভীষণ মূর্ত্তিতে চাহিয়া উত্তর দিলেন,—'দেখ্ রাইচরণ! 'সতীত্ব অমূল্যনিধি বিধিদত্ত-ধন—কাঙ্গালিনী পেলে রাণী এমন রতন।' এরতন তস্করে চুরী করিতে পারে না, ডাকাইতে লুণ্ঠন করিতে পারে না; তোর মেজো বাবু কোন্ ছার! বলিস্ নেমকহারাম, বলিস্ তোর মনিবকে, যে, আমি তাঁর মত পামর দুরাচারের নাম উচ্চারণ করিতেও ঘৃণা বোধ করি। তিনি আমার স্বামীর স্বোপার্জ্জিত তিন লক্ষ টাকার সম্পত্তি হস্তগত করিবার জন্য আজ দশ বৎসর অতীত হইল, আমার অষ্টম বর্ষীয় শিশু পুত্র শিরিশকুমারকে হত্যা করিয়াছেন; আমাকেও অনায়াসে বধ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া, নারকী পিশাচ, নারকীয় আচার অবলম্বনে যত্নবান হইয়াছেন কেন? যদি আমি প্রকৃত সতী হই, যদি একমনে সেই একমাত্র স্বামী পরম গুরুর পদ ভিন্ন অন্য কোন জনকে মুহূর্ত্তের জন্যও মনে স্থান দান করা পাপ বলিয়া আজীবন তাঁহার পদ-সেবা করিয়া থাকি; তাহা হইলে ভগবানকে সাক্ষ্য করিয়া আমি শাপ দিতেছি যে, তিনি অল্পদিনের মধ্যেই উৎসন্ন যান্। যদি আগামী ১৬ই জ্যৈষ্ঠ তাঁহার কাল্ হইয়া আসে, তবে তিনি এখানে পদার্পণ করিবেন—নচেৎ নয়। উপরে কি ভগবান নাই? ধরায় কি এখনও একবিন্দু কাহারও পুণ্য সঞ্চয় নাই? যাও—যাও,দূর হও; আমার যাহা বলিবার বলিলাম। ইচ্ছা হয়, এ কথা তোমার প্রভুকে জানাইও। আর আমি তোমার সহিত কথা কহিয়া আমার জিহ্বা কলঙ্কিত করিতে চাহি না।'

এই সকল কথা শুনিয়া, মহাশয়, আমি তো অবাক হইয়া গিয়াছি! আপনার ইচ্ছা হয়, আগামী ১৬ই জ্যৈষ্ঠ এখানে উপস্থিত হইবেন। আমার মতে কিন্তু আরও কিছুদিন অপেক্ষা করা ভাল ছিল। যদি একান্তই আসেন, তবে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আর একখানি পত্র লিখিয়া আমায় বাধিত করিবেন। আমি ও ডুা প্রভৃতি যোগাড় করিয়া রাখিব।

আর, আপনি পূর্ব্বপত্রে শিরিশকুমারের পলায়নের কথা লিখিয়া যে প্রকারে সন্ধান করিতে বলিয়াছেন, সেই প্রকারেই কার্য্য করা হইতেছে। কিন্তু সকলেই নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে। যাহাহউক, এখানকার মঙ্গল—আপনার মঙ্গল সমাচার পাইলে বাধিত হইব।——অনুগত ভৃত্য শ্রীরাইচরণ।"

"পুনশ্চ,—গঙ্গা হইতে বাগানের মধ্যে খাল কাটিয়া যে জল আনা হইয়াছে, তাহার একটি বাঁধ ভাঙ্গিয়া পূর্ব্ব ধারের পুষ্করিণীর সহিত মিশিয়া গিয়াছে। পুষ্করিণীতে অনেক বৃহৎ মৎস্য ঘাই দিত; কিন্তু গঙ্গার সহিত যোগ হইয়া যাওয়াতেই বোধ হয়, সে সকল মৎস্য

'বার জলে' ভাসিয়া গিয়াছে। ভাল করিয়া গাঁথিয়া না তুলিলে, পুষ্করিণী এবং ঝিল এক হইয়া যাইবে। যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা হয়, করিবেন। আমি কেবল আপনার হুকুম বাহাল করিব।

অনুগ্রহ-প্রয়াসী শ্রীরাইচরণ।"

ক্রোধে আমার শরীর কাঁপিয়া উঠিল। আমি কৃষ্ণদাস বাবুকে বলিলাম,—"মহাশয়! আর এ সকল পত্র পাঠ করিয়া কাজ নাই। আজ ১৩ই জ্যৈষ্ঠ—এখনও সময় আছে; এখনও আমরা যাহাতে সতীর সতীত্ব রক্ষা করিতে পারি, তজ্জন্য চেষ্টা করা উচিত। কালই প্রাত:কালে চলুন, আমরা হুগ্‌লিতে গমন করি। তথায় খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিব,—কাহার বাগানের মধ্যে ঝিল কাটিয়া গঙ্গাকে উদ্যানের মধ্যে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। যদি কাল্‌কের মধ্যেও সন্ধান করিতে পারি,তাহা হইলেই অভাগিনীর সতীত্ব রক্ষা হইবে। নচেৎ যে কি বিভৎস কাণ্ড সংঘটিত হইবে, তাহা বলা যায় না।"

কৃষ্ণদাস বাবু আমার কথায় সম্পূর্ণ সম্মতি প্রদান করিলেন; আমিও হুগলিতে যাইবার জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলাম। পত্র কয়খানি খুব সযত্নে অতঃপর আমার পকেটের মধ্যে রাখিয়া প্রাতঃকালের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কৃষ্ণদাস বাবু তখন "বাবুর" নামে একখানি পত্র লিখিতে গেলেন। তাহার মর্ম্ম এই যে, কোন (অপ্রকাশ্য) কারণ-বশতঃ আমরা দুই জনে, তাঁহাকে না বলিয়াই, কোন স্থানে যাইলাম—ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করিব। অপেক্ষা করিবার সময় নাই বলিয়া, বাটী পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে, তাঁহাকে সবিশেষ জানাইয়া যাইতে পারিলাম না। তজ্জন্য তিনি যেন ক্ষমা করেন।

• • •

বিশ্বাস।

জনৈক পতিব্রতা রমণীর হঠাৎ পতি-বিয়োগ হয়। মৃত্যুকালে তাহার পতি কিছুই অর্থ রাখিয়া যাইতে পারেন নাই; তিনি সৎকার্য্যে এবং ধর্ম্মকার্য্যে সমস্ত ধনসম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পরেই রমণীর কষ্ট আরম্ভ হইল। তৈজস পত্র প্রভৃতি যাহা কিছু ছিল, তাহাই বিক্রয় করিয়া, রমণী কালাতিপাত করিতে লাগিল। তাহার একটি শিশু সন্তান ছিল; দুগ্ধ অভাবে তাহারও অনেক সময়ে কষ্ট হইত। রমণী তাহার কষ্ট দেখিয়া অনেক সময়ে কাঁদিত। কিন্তু কাঁদিয়া দারিদ্র্যতার কিছুই করিতে পারিত না। বরং উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তৈজস পত্র যাহা কিছু ছিল, তাহা ক্রমেই শেষ হইয়া আসিতে লাগিল। রমণী নিজে না খাইয়া অতি কষ্টে শিশুটীকে পালন করিতে লাগিল। রমণীর স্বামী এক সময়ে ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন; সুতরাং তাঁহার বন্ধু-বান্ধব কেহই গরিব ছিল না। কিন্তু এক্ষণে তাঁহার কোন বন্ধুই তাঁহার অনাথ স্ত্রী-পুত্রকে সাহায্য করিল না। রমণীর দুঃখ ক্রমে বাড়িয়া উঠিল; তৈজস পত্র যাহা কিছু ছিল, সমস্তই নিঃশেষিত হইল। আর খাইবার উপায় নাই! রমণী তখন দাসীবৃত্তিতে নিযুক্ত হইল। দিন কতক কর্ম্ম করিয়া, তাহাতে কিছু সুবিধা বুঝিল না। সুতরাং কর্ম্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। এক্ষণে রমণী দাসীবৃত্তি করিয়া যাহা অর্থ পাইয়াছিল, তদ্দ্বারা পশম কিনিয়া, জুতা ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া, বিক্রয় করিতে লাগিল। তাহাতেই একরূপ দিন কাটিতে লাগিল। শিশুসন্তানটীর বয়সের পর বয়স যাইয়া, এক্ষণে সে সাত আট বৎসরের হইয়াছে। রমণী তাহাকে পাঠশালায় পড়িতে দিয়াছে। পাঠশালাটী কোন একটী ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিল। সুতরাং তথায় ধর্ম্মনীতি

সর্ব্বদাই শিক্ষা হইত। রমণীর শিশুটী প্রতিদিন পাঠশালায় গিয়া শিক্ষকের কাছে এই উপদেশ পাইত, স্বর্গের ঈশ্বর সকলের পরম বন্ধু; যে যাহা কিছু তাঁহার কাছে প্রার্থনা করে, তিনি তাহার সেই প্রার্থনাটিই পূর্ণ করেন।

মনুষ্যের শরীর কখন বিকল হয়, কে বলিতে পারে! কয়েক দিন হইল, রমণীর জ্বর হইয়াছে। সে আর কোন কর্ম্মই করিতে পারে না। যাহা কিছু অর্থ ছিল, তাহাও ঔষধাদিতে এবং পথ্যে ব্যয় হইতে লাগিল। ক্রমে সঞ্চিত ধন সকলই নিঃশেষিত হইয়া গেল। আজ আর একটিও পয়সা নাই,যে, দিন চলিবে। কেমনে পথ্য হইবে, কেমনে ঔষধি হইবে, এবং কি খাইয়াই বা বালক পাঠশালায় যাইবে? তাহাতে অদ্য আবার পাঠশালার মাহিনা দিবার দিন, মাহিনার নিমিত্ত বালক ব্যস্ত করিতেছে। এই সব কারণে রমণী ভাবিয়া আকুল হইল। কে পয়সা দিবে, কোথা যাইলে পয়সা ধার মিলিবে, ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল। অতঃপর ধীরে ধীরে উঠিয়া, পল্লীর দু-একজনের কাছে গিয়া ধার চাহিল; কিন্তু কেহই তাহাকে বিশ্বাস করিয়া একটি পয়সাও দিল না। নিরুপায় হইয়া রমণী বাড়ীতে আসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

রমণীর পুত্র তখন মাতাকে কাঁদিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"মা! তুমি কাঁদিতেছ কেন?"

রমণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—"আজ আমাদের একটীও পয়সা নাই। তুমি কি খাইয়া পাঠশালে যাইবে, তাই কাঁদিতেছি।"

বালক তখন কহিল,—"কেন, তুমি কাহারো নিকট ধার কর না!"

রমণী কহিল,—"আমি ধার করিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু কেহ আমাকে ধার দিল না।"

বালক।—"আচ্ছা, মা, তবে তুমি কাঁদিও না। আমার একজন বন্ধু আছেন, আমি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া টাকা ধার করিয়া আনিতেছি।"

এই কথা বলিয়া, বালক তখন একখানি কাগজ লইয়া পত্র লিখিতে বসিল। পত্র লেখা সাঙ্গ হইলে, বালক তাড়াতাড়ি ডাকঘরে উপস্থিত হইল, এবং পত্র ফেলিবার বাক্সে পত্র ফেলিতে গেল। কিন্তু বাক্সটি উচ্চ বলিয়া ফেলিতে পারিতেছিল না। এই সময় একজন আচার্য্য সেই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। বালক বাক্সে পত্র দিতে পারিতেছে না দেখিয়া, তিনি তখন বালককে কহিলেন,—"পত্রখানি আমাকে দাও, আমি ফেলিয়া দিতেছি।"

বালক পত্রখানি তাঁহার হাতে দিল। আচার্য্য তখন দেখিলেন, পত্রের শিরোনামায় লেখা আছে,—পরম পূজনীয়, ভক্তিভাজন, পরম পিতা পরমেশ্বর, শ্রীচরণ কমলেষু। ঠিকানা—স্বর্গধাম। পত্রের শিরোনামা দেখিয়া আচার্য্য কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কাহাকে পত্র লিখিতেছ?"

বালক কহিল,—"আমি ঈশ্বরকে পত্র লিখিতেছি। তিনি আমাদের পরম বন্ধু।"

আচার্য্য তখন পত্রখানি পাঠ করিলেন। পত্রে এইরূপ লেখা আছে,—"পরম বন্ধু ঈশ্বর! আমি পাঠশালে শিক্ষকের মুখে শুনিয়াছি, তুমি আমাদের পরম বন্ধু। তোমার নিকট যে যা চায়, তুমি তাহাকে তাই দাও। আমরা বড় গরিব, আজ আমাদের খাইবার পয়সা নাই। তাহাতে অদ্য মায়ের জ্বর হইয়াছে, তিনি উঠিতে পারেন না। এখন, তুমি যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের কিছু পয়সা ধার দাও, তবেই আজ আমাদের খাওয়া হইবে; নচেৎ হইবে না।"

আচার্য্য শিশুর বিশ্বাসজনক পত্র দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। অতঃপর তিনি জামার পকেট হইতে কয়েকটী মুদ্রা বালকের হস্তে দিয়া কহিলেন,—"আমি ঈশ্বরের দূত। এক্ষণে এই কয়েকটী টাকা লইয়া যাও; পরে তোমার এই পত্রখানি তাঁহাকে দিব। যাহা তিনি বলেন, তুমি জানিতে পারিবে।"

সেই দিন আচার্য্য ধর্ম্মমন্দিরে আসিয়া শিশুর পত্রখানি পড়িয়া তাহার বিশ্বাসের কথা প্রচার করিলেন। তখন, উপাসকমণ্ডলী কাঁদিতে কাঁদিতে যাহার যাহা কিছু ছিল বালকের সাহায্যার্থে দান করিল; এবং সকলে মিলিয়া প্রার্থনা করিল,—"হে ঈশ্বর, আমরাও যেন ঐ বালকের মত বিশ্বাসী হই।"

মতামত।

পুস্তক-সম্বন্ধে।

সংসার-আশ্রম।—সামাজিক উপন্যাস।—শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত। উপন্যাস, নবন্যাস, রহোন্যাস, রমন্যাস প্রভৃতি ন্যাস-ভাগান্ত কথাগুলি শুনিলেই গা যেন জ্বলিয়া উঠে। উপন্যাস লেখা কাজটা যেন বড়ই সহজ; তাই আজকালকার যে-না-সে লিখিতে শিখিয়াই, উপন্যাস লিখিয়া আপনা-আপনিই 'মস্ত লোক!' এক কথায়, বেকার-বিকারগ্রস্ত আজকালকার সকলেই এক-একজন 'প্রসিদ্ধ উপন্যাস-লেখক!' কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, এপর্য্যন্ত কেহই তলাইয়া বুঝিলেন না যে, 'উপন্যাস' জিনিসটা কি? বিশেষতঃ 'সামাজিক উপন্যাস' লেখা আরও যে কত শক্ত, তাহা বলা যায় না। অধিক কি, অনেক কালের মধ্যে আমরা তারক বাবুর সেই 'স্বর্ণলতা'-খানি ব্যতীত আর কোনখানিকে প্রকৃত 'সামাজিক উপন্যাস' বলিয়া অভিহিত করিতেই পারিলাম না। এহেন বিষম সমস্যার সময়, হারাণ বাবু আজ এই 'সংসার-আশ্রম' উপস্থিত করিয়াছেন। হারাণ বাবু বাহাদুর বটেন; অধিক বাহাদুরী তাঁহার এই যে, তিনি অনেকাংশে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। হারাণ বাবুর এখানির গল্পাংশ সংক্ষেপতঃ এই যে,—ঘরে ঘরে মেয়েলি বিবাদ-সূত্রে ঘর-ভাঙা; আর, তাহার পরিণাম, সোণার সংসার ছারে-খারে যাওয়া। যে সংসার আগে ছিল, শান্তির আলয়—আনন্দের আশ্রম, পাপিনী-পিশাচিনীদিগের নৃত্য-লীলায় সে সংসার শেষে হইয়াছিল, নরক! এই-ই হারাণ বাবুর আলোচ্য 'সংসার-আশ্রম!' অর্থাৎ আশ্রমের যে কাল অংশ (Black side), তিনি তাহাই দেখাইয়াছেন। চিত্র ফুটিয়াছেও, ভাল। তবে যদি হারাণ বাবু আরও একটু সাবধানতার সহিত, অন্ততঃ প্রথমাংশের ন্যায়ও শেষাংশ পর্য্যন্ত, ভাবিয়া-চিন্তিয়া লিখিতেন, তাহাহইলে বড় 'উঁচু দরেরই' হইত। যাইহোক, আমরা এ পুস্তকের সর্ব্বতোভাবে বিক্রয়-কামনা করি; এবং সামাজিক উপন্যাস লেখার এই নবীন উদ্যমে যদি তিনি উৎসাহ পান, তবে তাঁহার দ্বারা যে অনেক কাজ হইবে, 'সংসার-আশ্রম' দেখিয়া, আমাদের এ আশাও হইতেছে।

স্বর্গের চাবি।—শ্রীচুনিলাল মিত্র প্রণীত। আকার ২৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ৵০ আনা। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে বড়ই সুন্দর কয়েকটী ধর্ম্মোদ্ভাবোদ্দীপক গল্প আছে। গল্প কয়টি পড়িতেও যেমন চিত্তাকর্ষক, ইহার উপদেশাবলিও তেমনই মূল্যবান। 'বিশ্বাসে মিলায় হরি তর্কে বহু দূর'—এই নীতির সার্থকতা এ ক্ষুদ্র পুস্তিকায় সম্পূর্ণ দেখা গেল। পাঠককেও সে ভাব বুঝাইবার জন্য স্থানান্তরে 'বিশ্বাস' শীর্ষক একটি প্রস্তাব উদ্ধৃত হইল।

পদ্য-পুরাবৃত্ত।—শ্রীঅঘোরনাথ বসু প্রণীত। সংক্ষেপে ভারতবর্ষের ইতিহাস ইহাতে পদ্যে লিখিত আছে। অর্থাৎ,—

"ষোল শ' সাতাস অব্দে জাহাঙ্গীর ম'ল,
সাজাহান ভারতের বাদসাহ হ'ল।
ষোল শ' ছত্রিশ অব্দে সম্রাট এখন,
আমেদনগর রাজ্য করেন গ্রহণ।"

এইরূপ ভাবে ইতিহাস লিখিত। বুঝি না, ইহাতে কি উপকার আছে! বিশেষতঃ খেই হারালেই 'মুস্কিল'। তবে এই আশ্চর্য্য, পুস্তকখানির 'দ্বিতীয় সংস্করণ' হইয়াছে।

শাক্যসিংহ-প্রতিভা।—শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র সরকার প্রণীত। এখানি একখানি নাটক; ভগবান বুদ্ধদেবের বাল্যলীলা এখানিতে নাটকাকারে বর্ণিত আছে। নাটকাংশে না হউক, ইহাতে লেখক মহাশয় আপন ভাষাজ্ঞানের অনেকটা পরিচয় দিয়াছেন। তবে যে পরিশ্রমে নাটক লিখিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাতে এখানি বুদ্ধদেবের জীবনী-রূপে লিখিত হইলে, তাঁহার আরও সুখ্যাতি হইত। ছাপা মন্দ নহে; কিন্তু কাগজ ও প্রকাশক বটতলার!

রঙ্গভূমি-সম্বন্ধে।

(এমারেল্ড থিয়েটারে 'কিরণশশী।'

"সামাজিক নাটক" অভিধের একখানি নূতন পুস্তক 'কিরণশশী' নামে উক্ত রঙ্গালয়ে আজকাল অভিনীত হইতেছে। অনেক দিন অনেক রাত্রি জাগিয়া, অনেক কষ্টে, অনেক টাকার শ্রাদ্ধের পর, এমারেল্ড থিয়েটার 'এই এক নূতন' সামাজিক নাটক দেখাইলেন! আর, দেখিয়াও আমরা বুঝিলাম,—'পর্ব্বতের প্রসব বেদনা' বলিয়া যে এক প্রাচীন কাহিনী আছে, এমারেল্ডের 'কিরণশশী'ও ঠিক তাই-ই। পর্ব্বতের প্রসব বেদনায় যেমন তর্জ্জন-গর্জ্জন ও কম্পন-উদ্বেগের পর, তাহা হইতে এক মূষিক প্রাণের দায়ে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল; অনেক গর্ভযন্ত্রণা সহ্য করার পর, এমারেল্ডও সেইরূপ এক কন্যা প্রসব করিয়াছেন—নাম দিয়াছেন কিন্তু 'কিরণশশী।' স্পষ্ট করিয়া 'ইন্দুর' দেখিতে বলিলে, লোকের তাচ্ছিল্য হইতে পারে; কিন্তু 'মূষিক' শব্দটি শুনিলে, হয় তো অর্থ না বুঝিয়াই, নামের বাহারে, অনেকে ব্যগ্র হইয়া দেখিতে যায়। সেইরূপ এমারেল্ডও কি না 'কিরণশশী'! নামের চটক মন্দ নয়!

অধিকন্তু হ্যাণ্ডবিল, প্ল্যাকার্ড, বিজ্ঞাপন প্রভৃতিতে আরও বাহার বাড়িয়াছিল, ভাল। অধিক বাহার আবার 'প্রোগ্রামে!' 'প্রোগ্রামে' প্রথম দেখিলাম, 'নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ'—তালিকা পড়িতেই ঘণ্টাখানেক যায়; তা মনে রাখিয়া অভিনয় ঠিক রাখা তো দূরের কথা! বিশেষ শুধু সে তালিকাতেও নিস্তার নাই; তাহার উপরও আবার 'বৈদ্যনাথ' (কাজেই বোঁদের মার পুত্র) প্রভৃতি কতকগুলির পরিচয় আসমান হইতেই লইতে হয়! বোধ হয়, এমারেল্ডে অনেক লোক মাহিনা খায় ও তাহারা ফাঁকি দিতে না পারে—এই জন্যই, সকলের এক না একটা কোন কাজ চাই তো—সম্ভবতঃ এই মনে করিয়াই, বাছিয়া বাছিয়া এই নাটকের অবতারণা! থিয়েটারের সত্বাধিকারীকে বুঝাইবার সুবিধা হইয়াছে, ভাল! তবে আরও সুবিধা হইত, যদি এই সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজার কেদার বাবু প্রভৃতি আরও বক্রী দুই একজনকে আসরে নামান হইত। মোট কথা, অভিনয় বড়ই বিরক্তিকর হইয়াছিল। কেবল এক লালজী ও ভৈরবীর 'গান'-ব্যতীত আর কিছুতেই যেন জমজমা হয় নাই—সকলই যেন ফাঁকা! কি যে দেখিয়াছি, তাহার কিছুই যেন হৃদয়ে অঙ্কিত হয় নাই। শুধু আমাদের কথা নহে; সকলেরই ঐ একই কথা।

নাটকখানির দোষ-গুণ বিচার করিতে অনেক কথা—সে স্থান ও সময় আপাততঃ নহে। বিশেষতঃ পুস্তক আমরা দেখি নাই—অভিনয় মাত্র দেখিয়াছি। আর, তাহাতেই উহা 'শিব', কি 'বানর', যতটুকু বুঝিতে হয়, বুঝিয়াছি। তবে কিছু বলিতে হইলে, প্রথমতঃ এই বলিতে হয় যে, এত চরিত্র নাটকে প্রস্ফুটিত হইতেই পারে না। হয়ও নাই তাই। এটা নিশ্চিতই গ্রন্থকারের ভুল—তিনি একার্য্যে যতই প্রাচীন হউন না কেন! ভৈরবীর সার্থকতা কেবল গানের খাতিরেই যেন জোর করিয়া রাখা হইয়াছে—মিলনগুলিও এরূপ ঠিক ধরিয়া-বাঁধিয়া! সাধু সরকারের ভয়ঙ্কর পাপচিত্র দেখান হইল, কিন্তু তাহার পরিণাম কই? সে কি তবে শেষে বিষয়ী হইয়া, দেশে গিয়া, পাপের ফল 'সুখ-ভোগ' করিতে লাগিল! এ শিক্ষা জনসমাজে মন্দ নহে! পূর্ব্বরাগ দেখিয়া বোধ হইয়াছিল, নির্ম্মলা নির্ম্মলে আসক্তা; কিন্তু কাজে জোর করিয়া সে হইল, পুলিনের স্ত্রী! অধিকন্তু, পল্লীগ্রামের হিন্দুর ঘরে এমন কে আছেন যে, তিনি মাষ্টার রাখিয়া পরিচারিকার কন্যাকে উচ্চ শিক্ষা দেন! এইরূপ বলিবার আরও বিস্তর আছে; কিন্তু স্থানাভাব! অভিনয়াংশেও এইরূপ অনেক ত্রুটী দেখা গিয়াছে। ফলতঃ কিছুই হয় নাই।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, পুস্তকখানি একজন বিখ্যাত নাটককারের লেখা বলিয়া পরিচিত হইতেছে বলিয়াই, আমরা এত কথা বলিলাম। নতুবা বাজে লোকে লিখিলে দোষ না ধরিয়া তাঁহার উৎসাহের জন্য অবশ্যই সুখ্যাতি করিতাম। শ্রীঃ—)

ষ্টার থিয়েটার।

ষ্টার থিয়েটার সেই সমভাবেই চলিতেছে। সেই জমজমা—সেই গৌরব ষ্টার থিয়েটারের আজি পর্য্যন্তও অক্ষুণ্ণ আছে। নূতন নাটক 'হারানিধি' পূর্ব্ববৎ লোকের মন আকর্ষণ করিতেছে।

বেঙ্গল থিয়েটার।

বেঙ্গলের সেই বনেদী চাল—বাঁধা কায়দা সমভাবেই আছে। দিন দিন উন্নতি বই অবনতি নাই। 'জন্মাষ্টমী' প্রভৃতিই এতদিনও বেঙ্গল জমকাইয়া রাখিয়াছে। অধিকন্তু, সম্ভবতঃ আগামী সপ্তাহেই 'শকুন্তলা' নামক আবার একখানি নূতন 'অপেরা' বেঙ্গলে খোলা হইবে।

বীণা-থিয়েটার।

দেখিয়া আশা হইতেছে, অনেক বিঘ্ন-বিপত্তির পর, এইবার বুঝি বীণা-থিয়েটারটি স্থায়ী হইল! সেদিন রবিবারে বীণায় অভিনয় দেখিয়া আমরা বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি; দর্শকগণও সকলেই বিস্মিত হইয়া গিয়াছেন। অধিকন্তু, সেদিন বীণায় আদর-আপ্যায়িত—ভদ্রতারও চরম দেখা গেল। দর্শকমাত্রকেই তাহাতে তুষ্ট হইতে হয়। যাইহোক, সাধারণকে আমরা অনুরোধ করি, ষ্টার ও বেঙ্গলের ন্যায় সকলে বীণাতেও এক একবার অভিনয় দেখিয়া আমোদ উপভোগ ও তৎসঙ্গে সঙ্গে বীণার অধিকারীকেও উৎসাহিত করুন।

বিন্তি-খেলা।

হেরিয়া কলির খেলা লাজে মরে যাই!
সাহেব টেক্কার আর, নাহি তেজ সে প্রকার,
গর্ব্ব খর্ব্ব হয়ে আহা গেছে সমুদাই!
এ রহস্য কব কায়, দেখে তনু জ্বলে যায়,
সামান্য গোলাম হ'য়ে সবার প্রধান;
দম্ভেতে প্রভুত্ব করে, কম্পিত সাহেব ডরে,
ছোট লোক-হাতে পাছে হয় অপমান!
রাখিতে বিবীর মান, সাহেব সে যত্নবান,
সেই বিবী গোলামের কাছে মানহীন।
(পুনঃ) দেখনা কলঙ্ক-খোঁটা, সামান্য এ নয় ফোটা,
একি চমৎকার, দশ তাহার অধীন!!
কালে কালে হল একি, সত্যের লাঞ্ছনা দেখি,
নীচ-ভয়ে সশঙ্কিত উচ্চ অনিবার,
ধন্য কলিকাল! তোর পদে নমস্কার!

অবসান

অনন্ত বাসনা ল'য়ে ছুটে জলধর,
অনন্ত আশার রেখা তটিনীর গায়;
অনন্ত জলধি-মাঝে আশা থরেথর,
আশার অনন্ত ছটা ফুটে জোছনায়।
আশা মদে মত্ত সবে এ বিশ্ব মাঝারে,—
আশার পরশে ছুটে অবিরাম গতি,
অন্তরে লইয়া শুধু বিপুল স্ফূর্ত্তি,
অজানা অচেনা দেশে যায় দূরে দূরে।
কি দুর্ব্বল, দীন-দুঃখী, কি শিথিল-কায়,
সকলে বিপুল আশা হৃদয়েতে ধরে।
আমার—আমার শুধু আশাশূন্য প্রাণ।
তাইতে এ পথহারা, সুখ-অবসান॥

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

সাধারণে সাবধান!

Translator এই নাম দিয়া আজকাল সংবাদ-পত্রে এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছে যে,—"ঘরে বসিয়া শিক্ষকের বিনা সাহায্যে তিন মাস মধ্যে বাঙ্গালা, সংস্কৃত, হিন্দি, ইংরাজী, লাটিন, ফ্রেঞ্চ, এবং উড়িয়া এই কয় ভাষায় যদি উত্তমরূপে পারদর্শিতা লাভ করিতে চান, তবে Translatorএর গ্রাহক হউন।" এইরূপ বিজ্ঞাপনের সহিত পুস্তকের প্রণেতারও আবার বড়ই জমকাল পরিচয় আছে। 'এচ্, পি, বানার্জ্জি' যেন তাঁর নাম; আর এ (A) হইতে জেড্ (Z) পর্য্যন্ত ইংরাজীর সকল বর্ণমালাগুলিই যেন তাঁহার 'টাইটেল।' প্রকাশকগণের নাম আবার,—'এচ, পি, বানার্জ্জি এণ্ড কোং' এবং ঠিকানা,—'২২।১নং রাজচন্দ্র সেনের গলি, কলিকাতা।' কিন্তু পাঠকগণ শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, হরিপদ বন্দোপাধ্যায় নামক একটি বেকার যুবক এই আর এক নূতন ফন্দি পাতিয়া বসিয়াছে। এ ব্যক্তির অন্যান্য অনেক জুয়াচুরীর কথা ও নাম-ধাম প্রথম বর্ষের 'অনুসন্ধানের' ১৭শ সংখ্যক পত্রিকায় বাহির করা হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য, তাহাতেও লজ্জাবোধ না করিয়া, আবার এই নাম ভাঁড়াইয়া হরিপদ লোক ঠকাইবার চেষ্টায় আছে। যাইহোক, সকলে সাবধান!—কুহকে যেন কেহ না মজেন।

পুনশ্চ, এই ব্যক্তি

আবার 'বানার্জ্জি ব্রাদার্স' নাম দিয়া ঐ উপরোক্ত ঠিকানা হইতেই 'গুরুচরণ' প্রভৃতি পত্রে এইরূপ আরও এক বিজ্ঞাপন বাহির করিতেছে। সে বিজ্ঞাপনের আবার বোল এইরূপ :—"যদি শিক্ষকের বিনা সাহায্যে ঘরে বসিয়া ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষা শিখিতে ও শিখাইতে চান, তবে একখানি ক্রয় করুন। মূল্য ।০।" অর্থাৎ বাপাজী আমাদের বার আনাতেই ইংরাজী ও সংস্কৃতে পণ্ডিত করিয়া দিতে চান আর কি! যাইহোক, অধিক পরিচয়ে আর আবশ্যক নাই। মোটের উপর সাধারণে ঐ নাম ও ঠিকানার প্রতি দৃষ্টি রাখুন, এই বাসনা।

'শান্তি' পত্রিকার বিরুদ্ধে

এক আধখানি নহে—আজকাল রাশি রাশি অভিযোগ আসিতেছে। কেহ বা অগ্রিম টাকা দিয়া 'শান্তি' পাইতেছেন না, কেহ বা 'শান্তিতে' যে সকল বিজ্ঞাপন বাহির হয় তাহা দেখিয়া টাকা পাঠাইয়া ঠকিয়াছেন, কেহ বা উপহার পান নাই, এইরূপ নানা অভিযোগ। এদিকে 'শান্তি'-সম্পাদক পোষ্টেজের টাকা যোগাড় করিয়া উঠিতে না পারায়, তাঁহার কাগজ সাধারণ সংবাদপত্রের ন্যায় এক পয়সায় পোষ্ট হইতেছে না। সুতরাং চারি দিক হইতে সম্পাদক ব্যাচারি বড়ই ফাঁফরে পড়িয়াছেন। এখন, শান্তি চলে কি না সন্দেহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাইহোক, আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও সাধারণকে সতর্ক করিতেছি যে, 'শান্তি'-পত্রিকা সম্বন্ধে এবং শান্তিতে যে সকল রঙ্দার বিজ্ঞাপন বাহির হয় সে সম্বন্ধে, সাধারণে অতঃপরও সাবধান হউন।

সাহেবী নাম দিয়া,

মফস্বলবাসীদিগকে সাহেব-কোম্পানির দোকান বা জিনিস বুঝাইয়া, আজ-কাল সংবাদ-পত্র-সমূহে নানা বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছে। সে সকল বিজ্ঞাপনদাতাদের স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, নামের ভরসে লোক-মজাইয়া খেলো জিনিস (নেহাত ভাল হইলে না হয় চল্‌তি জিনিসই) দামে বেচিব, এ ভিন্ন আর কোন উদ্দেশ্যই নাই। মফস্বলের লোকেও সাহেবের তৈয়ারী জিনিস, সুতরাং ভাল ও দাম বেশী দিয়া লওয়া যায়—বোধ করিয়া, তাহা লন; এবং শেষে দেখেন, তাহার অপেক্ষা কালা বাঙ্গালীর নামের জিনিষই ভাল। এই ধরুণ,—'বি, পারনাল এণ্ড কোং', 'পি, হারওয়েল এণ্ড কোং', 'বি, ব্রাউন এণ্ড কোং', 'ভব্‌লিউ রুডার এণ্ড কোং', 'হেরি এণ্ড কোং', 'এ হিলার এণ্ড কোং', 'ওমর এণ্ড কোং'—প্রভৃতি এই যে সকল ইংরাজী নাম দিয়া আজকাল সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি দেখা যায়, পাঠক শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন যে, ইহার কেহই সাহেব নহেন—সকলেই এই কালা বাঙ্গালী। কেবল প্রভেদ, নামের। যাইহোক, আজ এসম্বন্ধে আর অধিক বলিব না। বাসনা রহিল, সময়ান্তরে একবার সকলেরই সবিশেষ পরিচয় দিব; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বুঝাইব যে, কিরূপে কত অনিষ্ট এই প্রকারে সাধিত হইতেছে!

প্রতারক গ্রাহকগণ।

১। বাবু গিরীশচন্দ্র দাস, ডাক্তার মৃত্তিঙ্গা, মুন্সীবাজার পোঃ, শ্রীহট্ট। সংবাদ পাইলাম, এক্ষণে ইনি শিলচর-কাছাড়ে ডাক্তারী করিতেছেন। এই ব্যক্তি বাগবাজারের আদরিণী-আপিসে ঠকিয়া, সেখান হইতে ঘড়ি আদায় করিয়া দিবার জন্য, তিনটি টাকা পাঠান; এবং যদি আদায় হয় তবে ঘড়িটি ভ্যালুতে পাঠাইয়া 'অনুসন্ধানের' দুই বর্ষের দামের তিন টাকা আদায় করিয়া লইতে বলেন। কিন্তু 'আদরিণী'-আপিসের ধনুর্ধরগণ ঘড়ি না দেওয়ায়, অগত্যা তাঁহার মতক্রমেই 'অনুসন্ধানের' দাম বাবদ ঐ প্রেরিত তিন টাকা জমা হয়। এখন, এ পর্য্যন্ত ডাক্তার-জি কাগজ লইয়া, তৃতীয় বর্ষের দাম চাওয়ায়, প্রাপ্য টাকা না দিয়াই, আমাদের গ্লানি করিয়া কোন সংবাদপত্রের আপিসে পত্র দিয়াছেন। বলিহারী ডাক্তার বাপাজীর চাতুরী! দয়া করিয়া তাঁহার উপকার করিতে গিয়া, বহু চেষ্টা পাইয়াও তাহা করিতে পারি নাই—এই অপরাধে, বাপাজী টাকা তো ফাকি দিলেনই; অধিকন্তু গালাগালি! এ মন্দ ব্যবহার নহে।

২। বাবু গোপালচন্দ্র দাস, বেভিনিউ সেরেস্তাদার, বড়্‌পেটা।—ইনিও একবর্ষের দেড় টাকা দাম দেন; কিন্তু পর বর্ষের এ পর্য্যন্ত কাগজ লইয়া, এখন দাম দিবার সময় বলেন,—'আদরিণী'-আপিসে ঠকিয়াছেন, সে টাকা আমরা আদায় করিতে পারি নাই; সেইজন্য আমাদের নামে কাগজে লিখিবেন ও আমাদের পাওনা বাজেয়াপ্ত! মন্দ আবদার নহে!

আজ এই দুইজনের নাম করিলাম। এইরূপ অনেক ধনুর্ধরের জ্বালাতেই আমরা জ্বালাতন। আর, এই জ্বালাতেই বুঝি, বাঙ্গালা কাগজের দুর্দ্দশা!

মফঃস্বলের বিবরণী।

কাঁথি, মেদিনীপুর।

গত বর্ষের সেই অতি বৃষ্টির পর হইতেই, এখানকার লোকের যে কি কষ্ট হইয়াছে, তাহা বর্ণনার অতীত। লোকে অন্নাভাবে হাহাকারে মরিতেছে। ধান-চাউল এরূপ দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য যে, অনেকে দু'বেলা খাইতেই পাইতেছে না। শাক সামুক খাইয়াও অনেকে প্রাণধারণ করিতেছে। এমন কি, অনাহারে দুই একজনের মৃত্যুও হইয়াছে। পেটের দায়ে চুরি-চামারিরও কমি নাই। অধিক কি, হাঁড়ি হইতে ভাত-চুরী পর্য্যন্ত হইয়া যাইতেছে। ইতিমধ্যে একজনদের হাঁড়ি হইতে পান্তা-ভাত চুরী করিয়া খাওয়ায়, এক চোরের বেত্র-দণ্ড হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আর অধিক বলিব কি! এখনও গভর্ণমেণ্ট এদিকে তাকান, এই বাসনা।

আন্দুল, হাওড়া।

পূজার কয় দিন ভারি ধূম গিয়াছে। বারওয়ারীতে দুর্গাপূজা করিয়া আন্দুল গ্রাম সে কয় দিন বড়ই জমকাইয়াছিল। আজকাল 'আন্দুলের' শ্মশান-ঘাটটি লইয়া বড়ই গোল উঠিয়াছে। এতদিন পরে সে জমিটী জমীদারের জমীদারী-ভুক্ত হওয়ার কথা উঠিয়াছে। তজ্জন্য গ্রামের সকলে আন্দুলের রাণী শ্রীযুক্তা দুর্গাসুন্দরীর নিকট আবেদন করিয়াছেন যে, যাহাতে সে হুকুম রদ হয়। সকলেরই আশা, রাণী তাহাতে কর্ণপাত করিবেন

সাঁড়াপুল, ২৪ পরগণা।

ইতিমধ্যে এই গ্রাম ও মালঙ্গপল্লীতে প্রায় ৩।৪টি চুরী হইয়া গিয়াছে। কিন্তু পুলিশ এপর্য্যন্ত কিছুই করিতে পারেন নাই। স্কুলটির অবস্থা আজকাল মন্দ নহে।

রসপুর, হাওড়া।

রসপুর, কালিকাটা ও কোনেশ্বর প্রভৃতি গ্রামের চারিদিকেই জল। পূর্ব্বে দামোদরের দিকের বাঁধে ও খালের দিকের বাঁধে গ্রামসকল সুরক্ষিত হইত। কিন্তু এখন, পলি পড়িয়া খাল বুজিয়া আসায়, জল দাঁড়াইয়া গ্রামের বড়ই অনিষ্ট করিতেছে। এই বর্ষায় শস্যাদি পচিয়া যাইতেছে।

সংবাদ।

চুরী, জুয়াচুরী, জাল ও খুন।

—একজন তাড়ি-বিক্রেতার তাড়ি চুরি করিয়া খাওয়ায় কালীধন বন্দ্যো এবং হরনাথ ও লালমোহন মুখো এই তিন ধনুর্ধরের প্রত্যেকের ৫০৲ টাকা করিয়া জরিমানা হইয়াছে। শাস্তি ঠিকই হইয়াছে!

—ওডেসার একজন শিক্ষক আত্ম-হত্যা করে। তাহার স্ত্রী স্বামীর বিরহে ক্ষেপিয়া, আপনার ৫টী সন্তানকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া নিজেও পরে ছাদ হইতে লাফাইয়া মরিয়াছে।

—সুন্দরী স্ত্রীলোকদের চুলগুলি চুরী করিয়া কাটিয়া লইয়া, পরচুলা-ওয়ালাদের বিক্রয় করা একজন চোরের কর্ম্ম ছিল। সম্প্রতি পারিসের একটী স্ত্রীলোকের চুল কাটিয়া লইবার সময় সে ধরা পড়িয়াছে। তাহার নিকট আরও অনেক সুন্দরীর চুল বাহির হইয়াছে।

—মধ্য-ভারতের ভূপাবল ষ্টেসনে একজন ধাত্রী একটী কচি মেয়ে কোলে করিয়া, ষ্টেসনের বিশ্রাম-ঘরে একটী বিবির নিকট গমন করে; এবং তাঁহাকে বুঝায় যে, মেয়েটির মা প্রসব করিয়াই মরিয়া গিয়াছেন, ও মেয়েটিকে সে কোন আশ্রমে রাখিতে যাইতেছে। বিবির মনে এইরূপে বড়ই দয়া হয়;—বুঝিয়া, ধাত্রী তখন বিবির কোলে মেয়েটীকে একবার রাখিয়া, সে যেন কি ফেলিয়া আসিয়াছে তাই লইতে যাইতেছে, এই ভান করিয়া চলিয়া যায়। তার পর, কিন্তু আশ্চ-

র্য্যের বিষয়, সে আর ফিরিল না। পরের মেয়ে কোলে করিয়া বিবি ফাঁপরে পড়িলেন! অদ্ভুত প্রতারণা!

—পঞ্জাবের এক দুশ্চারিণী, নিজের উপপতির সহিত পরামর্শ আঁটিয়া, আহারের সহিত সেঁকো বিষ দিয়া ক্রমে ক্রমে নিজের স্বামীকে হত্যা করিবার চেষ্টা পায়। বেচারী মরিলও, কিন্তু তাহাতেই! এখন কিন্তু ক্রমে সকল গুপ্ত কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। অভাগিনীর সকল ষড়যন্ত্রই ফাঁস হইয়াছে। সম্প্রতি তাহার ফাঁসি হইবে।

—একজন চীন দেশীয় বণিক, রেঙ্গুনের কোন মহাজনের নিকট হইতে প্রায় লক্ষাধিক টাকার চাউল খরিদ করেন; এবং মূল্যের বাবদ মহাজনকে ঐ টাকার এক কেতা চেক দেন। যে সময় চেক দেওয়া হয়, তখন বেলা ঠিক ৪টা—ব্যাঙ্কে যাইতে যাইতেই ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়। কাজেই চেকই বুঝাইয়া দিয়া, বণিক মাল লইয়া জাহাজে উঠেন; এবং মহাজনও আর কোন সন্দেহই করেন না। কিন্তু পর দিন চেক ভাঙাইতে যাইলে, মহাজনকেই ধরিয়া, ব্যাঙ্কের অধিকারী পুলিসে দিলেন; বলিলেন,—"তুমি জাল চেক তৈয়ার করিয়াছ।" বিপদের উপর বিপদ আর কি!

—একজনের মনিঅর্ডার তাহাকে না দিয়া নিজে জাল-সই করিয়া টাকা কয়টি আত্মসাৎ করায়, জুনাগাদন ডাকঘরের একজন পিওনের ৯ বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ড হইয়াছে।

—১৭ই সেপ্টেম্বর উত্তর-পশ্চিমের ফিলিভিট জেলায়, একদল ডাকাত ক্ষেত্রের শস্যাদি লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করে; এবং পুলিস দলবল লইয়া বাধা দিতে যাইলে পুলিসকেও আক্রমণ করিয়া বসে। যাইহোক, অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর, অবশেষে কিন্তু তাহাদের ২০ জন ধৃত হইয়াছে।

স্কুলের ছাত্রদের জন্য।

১। ১৮৯১-২ সনের এণ্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য থ্যাকার স্পিঙ্ক কর্ত্তৃক প্রকাশিত ১৮৯১ সনের ইংরাজী এণ্ট্রান্স কোর্সের নিম্নলিখিত অংশগুলি নির্ব্বাচিত হইয়াছে।

Prose.—The Battle of Bannockburn, The Battle of Killiecrankie, Escape of Prince Charles, Death of Sir Philip Sidney, Battle of Sedgemoor, Isac Newton, Life of the Rev. Robert Walker, Life of Captain James Cook, Life of King Alfred, Life of Heyne, History of the Abolition of the Slave-trade by Gramville Sharp, Clerkson and Buxton, Anecdotes of Lord Exmouth, Anecdotes of Lord Collingwood, Account of Howard—the Philanthropist, Anecdotes showing the humanity of sailors, Account of Fenelon, Account of Mr. Mompesson, Self-Control, The Student—His Health.

Poetry.—Epitaph on a Hare; The Dog and the Water-Lily; Alexander Selkirk; Ye Mariners of England; Allice Fell, or Poverty; Lucy Gray, or Solitude; Casabianca; A Psalm of Life.

To be Committed to memory.—Epitaph on a Hare, Alexander Selkirk, Casabianca, A Psalm of Life.

ইংরাজীতে দুইটি প্রশ্ন পত্র দেওয়া হইবে। এক-খানিতে নির্ব্বাচিত পুস্তক ও তৎসংক্রান্ত ব্যাকরণের প্রশ্ন থাকিবে; এবং অপর খানিতে ইংরাজী হইতে দেশীয় ভাষায় অনুবাদ ও ইংরাজীতে প্রবন্ধ লিখিতে দেওয়া হইবে।

২। সংস্কৃত।—পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ও বাবু নীলমনি মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত 'Calcutta University Selection of 1891' নামক পুস্তক ঐ বর্ষে পড়িতে হইবে। ব্যাকরণের মধ্যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'ব্যাকরণ কৌমুদী' বা রাজকৃষ্ণ বাবুর অনুবাদিত 'উপক্রমণিকা ব্যাকরণ', বা নীলমনি বাবুর 'লঘুমঞ্জরী' বা হেরম্ব বাবুর 'ব্যাকরণ-সংগ্রহ' বা কালীকুমার শর্ম্মার 'ব্যাকরণাদর্শ'—যাঁহার যেখানি ইচ্ছা পড়িতে পারেন। অধিকন্তু, 'পঞ্চতন্ত্রের' ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ হইতে গদ্যাংশ পড়িতে হইবে।

বিবিধ।

—জর্ম্মনীর একজন বণিকের সহিত বিলাতের একজন ধনীর বড়ই বিবাদ ছিল। ধনী অনেকবার অনেক মিথ্যা মামলা-মকর্দ্দমায় জেরবার করিয়া বণিকের নিকট হইতে এক সময় প্রায় ১৮ হাজার টাকা আদায় করেন; এবং বণিক তাহাতে বড়ই কষ্টে পড়েন। সম্প্রতি ধনীর মৃত্যু-কাল উপস্থিত হয়; এবং তিনি উইল করিয়াছেন যে, তাঁহার সম্পত্তি হইতে এক লক্ষ টাকা সেই বণিক পাইবেন। অর্থাৎ মিথ্যা মকর্দ্দমা করিয়া বণিকের নিকট হইতে তিনি যে টাকা পাইয়াছিলেন, তাহার সুদ প্রভৃতি সমেত ঐ টাকা বণিককে দেওয়া হইবে। অদ্ভুত দান!

—বৈজ্ঞানিক এডিসন লিখিবার এক কল আবিষ্কার করিয়াছেন। কলের কাছে কথা কহিলে তাহাতে নাকি আপনা-আপনিই লেখা বাহির হয়!

—তান্তিয়া ভীলের বিচার শেষ হইয়াছে। পূর্ব্বেই যাহা অনুমান করিয়াছিলাম, তাহার অদৃষ্টে তাহাই ঘটিয়াছে। একটা চার্জ্জের বিচারে প্রথমতঃ তাহার প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। কিন্তু পুলিশ তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া, তাহার উপর আর এক নূতন চার্জ্জ দিয়া আবার তাহার বিচার আরম্ভ করেন। আর, সে বিচারে তান্তিয়ার ফাঁসির হুকুম হইয়াছে। অর্থাৎ প্রথম আদেশ পুলিসের পছন্দ না হওয়াতেই যাহা ঘটিবে বুঝা গিয়াছিল, ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। এ অপেক্ষা বিচার না করিয়াই কি তান্তিয়াকে ফাঁসি দিলে ভাল হইত। যখন ফাঁসি নহিলে গভর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হইবেনই না, তখন আর লোক দেখান বিচার করার আবশ্যকতা কি ছিল!

অনুসন্ধান।

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

৩য় খণ্ড] ২৯এ কার্ত্তিক, ১২৯৬ সাল। [৭ম সংখ্যা।

পরিতাপীর ক্রন্দন।

সত্য কথা,
পাঠায়ে দিয়েছ নাথ! যবে মহীতলে।
শিখায়েছ সেইদিন, পাপ কারে বলে!।
মনে আছে,
তা'রপরো নিতিনিতি তোমার শিক্ষায়।
পাপপুণ্যে ভেদাভেদ জানালে আমায়॥
এখনও তো,
প্রতিদিন প্রতিপদে প্রতি আঁখি-ঠারে।
দেখাও পাপের শাস্তি—পাপ বলে কারে!।
অধিক বলিব কিবা,
নীচ আমি; যে মুহূর্ত্তে যেদিন যখন,
পাপ-কার্য্য করিবারে হৈনু দৃঢ়-মন;
সেদিনো—তখনো নাথ! তুমি দয়াবান!
মন-মাঝে দিব্যজ্ঞানে কৈলে সাবধান॥
কিন্তু অহো,
পাতকী নারকী আমি, অভাগা অশেষ।
তবুও মহিমা তব না বুঝি পরেশ!
মরু-হৃদে মরীচিকা করিয়া বিস্তার।
ভুলাইছে সদা মোরে, পাপ-অবতার॥
বল—বল, বল নাথ!
অবশেষে অভাগার কি হবে উপায়!
বাঁচিয়া, পাপের ভার বড়ান না যায়!।
উপায় না থাকে যদি, আছে তো নিরয়!
দেরী কেন, দেও মোরে, তা'তেই আশ্রয়!!
সেও ভাল,
নরকে ডুবিয়া যদি ভুঞ্জি পাপ-ফল।
বাড়িতে তো পারিবেনা পাপের সম্বল!!
তেঁই ডাকি,
ভক্তপ্রাণ দীনসখা দয়াল পিতায়।
দেরী কেন, নরকেই ডুবাও আমায়॥

ভক্তি-পরীক্ষা।

ভক্তি বড়ই দুর্ল্লভ বস্তু। জীব-জগতে প্রকৃত ভক্তের সংখ্যা বড়ই অল্প। ভক্তের আধিক্য থাকিলে, এ সংসার কি আর মরুময় হইত? যদি সংসারী ভক্ত হইতেন, যদি পরম-পিতা আমাদিগকে পাষণ্ড নাস্তিক না করিয়া জগতে পাঠাইবার সময় কণামাত্র ভক্তিও আমাদের হৃদয়ে প্রদান করিতেন; তবে কি আর আমরা এমন হতভাগ্য হইতাম? হিংস্র শ্বাপদ-শঙ্কুল তিমিনক্রপূর্ণ এই ধরিত্রীই, তাহা-হইলে দেখিতাম, আজ স্বর্গের নন্দনকানন; দেখিতাম, এখানকার কণ্টকাকীর্ণ অগম্য অরণ্যেই আজ নন্দনের পারিজাত বৃক্ষ জন্মি-

য়াছে—শিবা-কুক্কুটের নৃত্য-গীতে পরিবর্ত্তে আজ তাহা হইলে এই নরকেই অপ্সরা-কণ্ঠ-নিঃসৃত মধুর সঙ্গীতের তানে বীণা-বেণু শ্রুত হইত! কিন্তু প্রকৃতই অভাগা আমরা—পিতা ইচ্ছা করিয়াই যেন আমাদিগকে সকল সুখে বঞ্চিত করিয়াছেন! তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া মনে হইতেছে, আমাদের সে সুখের দিন এখনও বহু দূরে। বুঝি বা এ জগতেই সে সুখ পাইবার অধিকারী আমরা নহি। এখানে পড়িয়া আছি, যেন কেবল পরীক্ষার জন্য। তিনি কেবল এখানে আমাদের রাখিয়াছেন, দেখিবেন বলিয়া—আমরা কোন্ ফল-ভোগের অধিকারী!

স্বর্গ আর নরক এই দুই-ই যেন সে পরীক্ষার ফল। পরীক্ষায় আমরা যেরূপ কৃতকার্য্য হইব, তিনি আমাদিগকে সেইরূপ ফল প্রদান করিবেন। যে ফল পাইবার যেরূপ উদ্যোগী আমরা হইয়াছি, তিনি সেই ফলই আমাদিগকে দিয়া থাকেন। দৃষ্টান্তের জন্যও অধিক দূরে অন্বেষণ করিতে হইবে না। সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে দেখিলে, আমাদের প্রাত্যহিক কার্য্য-কলাপে, নৈমিত্তিক আচার-ব্যবহারেই, আমরা তাহা স্পষ্টতঃ দেখিতে পাই।

প্রতি জীবনই, উত্তাল তরঙ্গমালায় পতিত তৃণকণার মত, সংসার-সমুদ্রে কখনও ভাসিয়া উঠিতেছে; কখনও তলাইয়া যাইতেছে। বল-বল, বল দেখি, এপ্রহেলিকার মর্ম্ম কি? তুমি দীনহীন অন্নের ভিখারী বটে, কিন্তু তজ্জন্য তোমায় কায়িক, মানসিক বা সাংসারিক কোন কষ্টই অনুভব করিতে দেখি না; আর আমি লক্ষপতি, অথচ আমার সেরূপ কোন সুখই নাই—কখনও রোগের জ্বালায়, কখনও শোকের সন্তাপে, একরূপে না একরূপে, আমি সর্ব্বদাই আত্মহারা! বুঝি না, চক্রধরের এ কি অপরূপ চক্র-বিবর্ত্তন! পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলেই, সকল সহায় থাকিতেও, তাহাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছি; অথচ নিঃসহায় অনাথ আবার সদর্পে তাহাকে ভ্রূকুটী দেখাইতেছে।

এখনও এ দৃশ্য আমরা প্রতিদিনই দেখিতে পাই। এখনও আমরা দেখিয়া থাকি, ভক্তি ও ভক্তের কত ক্ষমতা,—বিশ্বাসী কত বলীয়ান! নিত্য ঘটনা হইতে সে ভাব তত না বুঝিতে পারি, কিন্তু আমাদের প্রত্যক্ষীভূত একটী সত্য-ঘটনা এস্থলে বিবৃত করিতেছি। তাহাহইতেই সম্পূর্ণরূপে এ সত্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। সে সত্য ঘটনাটী এই:—

হরিপদ এবং সত্যচরণ নামক দুইটী ব্রাহ্মণ যুবা বাল্যাবধি যৌবনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত বহু পাপ-কার্য্যে রত থাকে। উহাদের দুইজনের দ্বারাই, জগতে যে কত অপকর্ম্মের সূচনা হইয়াছিল, তাহা বলিবার নহে। চৌর্য্য, মিথ্যা কথা, নরহত্যা, গোহত্যা প্রভৃতি হরিপদের যেন অঙ্গের আভরণ ছিল—বাল্যাবধি সে যে কত চুরী, কত হত্যা, কত কদাচার করিয়াছিল, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। আর সত্যচরণ!—সে লম্পট, অধার্ম্মিক। সে যে কত কুলকামিনীর কুল-নষ্ট, কত সতী স্ত্রীর সতীত্ব-নাশ, কত লোকের ধর্ম্মকর্ম্মে কত বিঘ্নপ্রদান করিয়াছিল, তাহাও বলিবার নহে। ফলতঃ উভয়েই মহাপাপী, ঘোর পাষণ্ড!

অধিক কি, উহাদের পাপভারে ধরিত্রী ক্রমে এতদূর ক্লিষ্ট হইয়াছিলেন যে, ইহ-জীবনেই উহাদের পাপের ফল-প্রদান ঈশ্বরের আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। এজগতেই পাপের উপযুক্ত শাস্তি-স্বরূপ, ঈশ্বর উহাদিগের দেহে 'মহাব্যাধির' সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিলেন। দেখিয়াছিলাম, পাপের ফলস্বরূপ এ-জীবনেই উহারা মহাব্যাধি কুষ্ঠগ্রস্ত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভুগিতে থাকে। অহো! পাপের কি শোচনীয় পরিণাম! এরূপ কঠোর শাস্তি, এরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, বুঝি বা আর দেখিতেই পাওয়া যায় না!

এইরূপে মহাব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া হরিদাস ও সত্যচরণ উভয়ে দিন দিন বড়ই কাতর হইয়া পড়িল। পূর্ব্বে যেমন স্ফূর্ত্তি, যেমন অহঙ্কার ছিল, এখন তেমনই নিরানন্দ, তেমনই দর্পচূর্ণ হইয়া আসিল! দেখিতে দেখিতে দুইচারি বর্ষের মধ্যে মহাপাপী হরিপদের শরীরে কুষ্ঠ ফুটিয়া বাহির হইল; তাহার গাত্র-মুখ অধিক বিবর্ণ, হস্তপদ ক্ষতপূর্ণ ও ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। দিনরাত্রিই তাহাকে কেবল হাহাকারে, "উহু-উহু—গেলাম-গেলাম" করিয়া, কাটাইতে হইল। অধিক কি, এত কষ্ট—এত যন্ত্রণা যে, মৃত্যু হইলেই সে যেন তখন বাঁচিত! আর, সত্যচরণেরও তখন সূচনা—তাহারও মুখ বিবর্ণ; হস্তপদ কেবল ফুলিয়াছে, কিন্তু ফাটে নাই। তবে জানি না, অন্তরের যাতনা উভয়েরই সমান কি না! তখনও যদি কিছু তারতম্য থাকে, কিন্তু বিশ্বাস, আর দুই পাঁচ দিনের মধ্যেই উভয়েরই সমাবস্থা হইবে। হরিপদের মত সত্যচরণেরও শরীর গলিত কুষ্ঠে খসিতে থাকিবে!

যাইহোক, প্রত্যক্ষ ফলভাগী হইয়া, কিছু দিনের মধ্যেই হরিপদ ও সত্যচরণ উভয়েরই কিন্তু জ্ঞানের সঞ্চার হইল। উভয়েই তখন বুঝিল, কি কার্য্যে কি ফল-ভোগ করিতেছে! ক্রমে তজ্জন্য পরিতাপ আসিয়া তাহাদের হৃদয় অধিকার করিল। তাহারা তখন পরিতপ্ত অন্তঃকরণে ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিল,—"পিতঃ! যাহা করিয়াছি, তাহার আর হাত নাই। কিন্তু দয়াল তুমি, এবার আমাদের ক্ষমা কর। আর আমরা কখনও তোমার পথ হইতে দূরে যাইব না, সপথ করিতেছি।"

এইরূপ পরিতপ্ত অন্তকরণে অবশেষে তাহারা পুণ্যভূমি তারকেশ্বর-তীর্থে মহাপ্রভু মহাদেবের শরণাপন্ন হইল। অনিদ্রায়, অনাহারে সেখানে গিয়া 'হত্যা দিল'; ডাকিল,—"পিতঃ! আমাদিগকে রক্ষা কর।" তখন, আর তাহাদের কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই—শীত-গ্রীষ্মে সমান ভ্রূকুটী! কেবল প্রার্থনা,—কিসে ঈশ্বর এ মহাপাপীদের উদ্ধার করেন। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি এইরূপে কতই কাটিয়া গেল। কিন্তু তথাপিও তাহাদের বিরাম নাই—তাহারা উভয়েই আর উঠিল না, নড়িল না বা পশ্চাতেও ফিরিয়া দেখিল না। প্রাণের দায়ে, অকৃত্রিম ভক্তি যেন তখন তাহাদের প্রাণে আপনাপনিই আসিয়া উপস্থিত হইল।

ভগবানও 'ভক্তের ভগবান' চিরদিন। অকৃত্রিম ভক্তি পাইলে, তিনি আর কেমনে স্থির থাকিতে পারিবেন? মহাপাপী মহা-পাষণ্ডও যদি পরিতপ্ত হইয়া একবার তাঁহাকে অন্তরের ডাকা ডাকে, তবে তিনি তখনই তাহার সে ডাকা শুনেন। নহিলে তাঁহার ভক্তবৎসল নামের সার্থকতা থাকিবে কেমন করিয়া? কাজেই হরিপদ ও সত্যচরণের কাতর-ক্রন্দনও তাঁহার কর্ণে গেল; তিনি স্বপ্নে তাহাদিগকে দর্শন দিলেন। তাহাদের উভয়কেই দেখা দিয়া তিনি যেন বলিলেন,—"বৎস হরিপদ! বৎস সত্যচরণ! যাও তোমরা, গৃহে যাও। সেখানে গিয়া, তোমাদের উভয়েরই বাড়ীর পশ্চাৎদিকের পুষ্করিণীর ঘাটে, এক ধাপ নামিয়াই, জলের নিম্নে, হাঁড়ির ভিতর এক এক দ্রব্য পাইবে। ভক্তি করিয়া তাহাই খাইও—তাহাতেই তোমাদের সকল ক্লেশ দূর হইবে। অধিকন্তু তাহাতে তোমাদিগকে পরলোকেও আর এজন্মের পাপভাগী হইতে হইবে না।" এইরূপ বলিয়াই, ভগবান যেন জ্যোতির্ম্ময় আকারে তাহাদের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইলেন; তাহারা তাঁহার সেই দিব্যকান্তি, অপূর্ব্বজ্যোতি দেখিয়া চমকিত হইল।

ইহার পর, সত্যচরণ ও হরিপদ উভয়েই স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগত হইল; এবং উভয়েই আপন-আপন আদিষ্ট দ্রব্য অন্বেষণে তৎপর

হইল। অন্বেষণ করিয়া হরিপদ প্রথমে দেখিল, সত্য সত্যই নির্দ্দিষ্ট স্থানে একটী হাঁড়ি রহিয়াছে। সে আনন্দে তাহা উত্তোলন করিল। কিন্তু উত্তোলন করিয়াই চক্ষু-স্থির!—সে দেখিল, তাহার ভিতর একরাশি বিষ্ঠা! কিন্তু অপূর্ব্ব-ভক্তি—অদ্ভুত কাণ্ড! সে তখন এতদূর প্রেমোন্মত্ত যে, কিছুতেই সে দিকে দৃক্‌পাত করিল না। "ভগবান যখন আদেশ করিয়াছেন, তখন এই-ই আমার অমৃত"—এই বলিয়া, সে সেই দুর্গন্ধ অপবিত্র বিষ্ঠা অমৃতজ্ঞানে হাতে তুলিল। তুলিয়াই মুখে দিতে প্রস্তুত! এমন সময় একি আবার অদ্ভুতের উপর অদ্ভুত কাণ্ড!—আশ্চর্য্যের উপর আশ্চর্য্য-সংঘটন! একি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন, একি অপূর্ব্ব প্রহেলিকা! মুখে তুলিতে গিয়াই, হরিপদ দেখিল,—নিমেষের মধ্যেই অস্পৃশ্য বিষ্ঠা সর্ব্বাকাঙ্ক্ষিত নবনীরূপে পরিণত! দেখিয়া সে চমকাইয়া উঠিল, তাহার শরীর শিহরিল; তাহার শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইল। সে মহানন্দে তাহা তুলিয়া মুখে দিল।

আর, তাহা মুখে প্রদান করিতেই, আরও বিস্ময়কর দৃশ্য! স্বপ্নের অতীত, কল্পনার বহির্ভূত কাণ্ড,—তাহার ব্যাধি-মুক্তি! দেখিতে দেখিতে দণ্ডেকের মধ্যেই হরিপদের শরীর পরিবর্ত্তিত হইল। তাহার গলিত অঙ্গুলি পূর্ণাবয়ব-সম্পন্ন সুন্দর আকার ধারণ করিল; মুখ-শ্রী প্রফুল্ল কমলবৎ ফুটিয়া উঠিল। অধিক কি, কখনও সে যে রোগাক্রান্ত বা ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহা আর বোধই হইল না। সে যেন নবজীবন প্রাপ্ত হইল।

কিন্তু অপর দিকে সত্যচরণের ঘটনা! সে ঘটনাও আবার এইরূপই বিস্ময়কর—এইরূপই অভূতপূর্ব্ব! কিন্তু বিপরীত! সেও স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছিল; পাইবার সময় পাইল, ঠিক সেই-ই জিনিস। অর্থাৎ হরিপদের মত সেও একরাশী বিষ্ঠা প্রাপ্ত হইল। কিন্তু সে ঘোর পাষণ্ড—ঘোর নারকী! সে ভাবিল,—"না—না, আমি স্বপ্ন দেখিতে ভুলিয়াছি!" এইমাত্র ভাবিয়াই, সে ঘৃণা-সহকারে বলিয়া উঠিল,—"কি আপদ! কি আপদ! অস্পৃশ্য ছুঁইয়া আবার স্নান করিতে হইল।"—এই বলিয়াই, সত্যচরণ সেই বিষ্ঠাপূর্ণ হাঁড়িটিকে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল,—ঘৃণায় তাহার ন্যক্কার আসিতে লাগিল।

নিক্ষিপ্ত হইবামাত্রই, কি অদ্ভুত কাণ্ড—কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি, সেই হাঁড়িটি ধূ-ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। আর, সঙ্গে সঙ্গে সত্যচরণেরও পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। সে কেবল "জ্বলে মলেম—জ্বলে মলেম" ক'রে, আর তাহার হস্তপদ ফুটিয়া ফাটিয়া যাইতে লাগিল। জীবন্ত শরীর জ্বলন্ত অনলে প্রদান করিলে, যেরূপ জ্বলন, যেরূপ ফোস্কা, যেরূপ ক্ষত দণ্ডেকের মধ্যেই হইতে পারে; অদূরে হাঁড়িটি যেমন জ্বলিতে লাগিল, সত্যচরণেরও শরীর দেখিতে দেখিতে সেইরূপ হইয়া আসিল। সে যন্ত্রণা—সে কষ্ট, অহো অতি ভয়ঙ্কর—অতি মর্ম্মভেদী! নরকের অধিক যাতনা যদি কিছু থাকে, বোধ হয়, সত্যচরণের সেই যাতনাই তাহাই।

যাইহোক্, দেখিতে দেখিতে ক্রমে হাঁড়িটী নিবিল; আর, সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, সত্যচরণও গলিত কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। ক্ষণ-পূর্ব্বে যাহা চিহ্নমাত্র ছিল, এক্ষণে তাহাই বিস্তৃত আয়তন!

অহো! ভক্তি ও ভক্তের পরীক্ষা কি গুরুতর—কি সমস্যাপূর্ণ! অভাগা জ্ঞানহীন মূঢ় আমরা, তাই আমরা সে তত্ত্ব দেখিয়াও বুঝি না—শুনিয়াও শুনি না। পরম দয়াল, পরম পিতঃ! সে জ্ঞান আমাদের কবে হইবে, যেদিন আমরা তোমাকে প্রকৃত ভক্তি করিতে শিখিব! —ভক্তের মাহাত্ম্য যেদিন আমাদের মনে গ্রথিত হইবে! হে পিতঃ! সত্যচরণ-রূপে অন্ধ-বিশ্বাসী

না করিয়া হরিপদের মত ভক্ত-বিশ্বাসী আমাদের কবে করিবে? সেদিন কি আসিবে?

আমার গোয়েন্দাগিরীর চূড়ান্ত!

(প্রেরিত কাহিনী।)

'অনুসন্ধান'-পত্রের মান্যবর সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

মহাশয়, আপনার 'অনুসন্ধান'-পত্রিকায় যে সকল জাল-জুয়াচুরি-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি বাহির হয়, তাহা আমি বিশেষ মনোযোগের সহিত আনুপূর্ব্বিক পাঠ করিয়া থাকি। কারণ, আমি নিজেও অনেক দিবস পর্য্যন্ত ঐ সম্বন্ধীয় বিষয়ে বিশেষরূপে লিপ্ত ছিলাম। আর, কখন কখন মনেও করিয়া থাকি যে, আমিও ঐরূপ দুই একটী প্রবন্ধ লিখিয়া সাধারণের গোচর করি। কিন্তু আমার না আছে, সেরূপ বিদ্যা, না আছে সেরূপ লিখিবার ক্ষমতা! কাজেই এপর্য্যন্ত আমার সে সাধ পরিপূর্ণ করিতে পারি নাই। তথাপি এই কার্ত্তিক পূজার সময় আমি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিতেছি না! আমার জীবনের একদিবসের একটী সামান্য ঘটনা এসময় আপনা-আপনিই যেন বাহির হইতে চাহিতেছে! আর, তাই, সেটীকে এই স্থানেই সন্নিবিষ্ট করিলাম। যদি কেহ অনুগ্রহপূর্ব্বক পাঠ করেন, ভালই; না পড়েন, আমি নিজেই পড়িয়া অপার আনন্দ অনুভব করিব।

আমি কলিকাতা-ডিটেকটিভ্-পুলিশের একজন ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী। প্রায় ১০ বৎসর অতীত হইল, আমি সেই বিভাগ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছি। যখন প্রথম ডিটেক্‌টিভে প্রবেশ করি, সেই সময় অনেক দিবস অবধি কোনরূপ কার্য্য দেখাইতে না পারায়, এক দিবস আমি আমার ঊর্দ্ধতন ইংরাজ-কর্ম্মচারীর নিকট নিতান্ত লাঞ্ছিত হই। তিনি আমাকে নানারূপে মিষ্ট মিষ্ট ভৎর্সনা করেন; এবং একটু বুদ্ধি ও বিবেচনার সহিত কর্ম্ম করিতে পরামর্শ দেন।

বেলা ৩টার সময় এইরূপে ভৎর্সিত হইয়া আফিস হইতে বহির্গত হইলাম; ও কোন্ দিকে গমন করিব, রাস্তায় দাড়াইয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। এমন সময়, একজন পরিচিত বন্ধুর সহিত বহুদিবস পরে দেখা হইল। তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহার সহিত গল্প করিতে করিতে, ক্রমে ক্রমে গমন করিতে লাগিলাম; ও পরিশেষে চোরবাগানের ভিতর তাঁহার বাসায় গিয়া উপনীত হইলাম। যখন সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম,তখন বেলা ৫টা।

গল্পে গল্পে ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তখন আমি আমার বাসায় আসিবার নিমিত্ত ইচ্ছুক হইলাম। কিন্তু আমার সেই বন্ধু তাহাতে নিতান্ত অসম্মত হইলেন; আমাকে তখন আসিতে না দিয়া সেই স্থানেই আমার আহারের যোগাড় করিলেন। বন্ধুর অনুরোধ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া, কাজেই আমিও সেই স্থানে আহার-কার্য্য সমাপন করিলাম। ক্রমে রাত্রি ৯টা বাজিয়া গেল। তখন আর দেরী করা অসঙ্গত বিবেচনায় উঠিবার উদ্যাগী হইলাম। উঠিয়াই কিন্তু দেখিলাম,—পরিস্কার আকাশ ঘনঘটায় আবৃত হইয়াছে; দিঙ্মণ্ডল একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে; শূন্য পথে মধ্যে মধ্যে বিদ্যুত চমকিতেছে; বৃষ্টি উপস্থিত-প্রায়! আকাশের এই অবস্থা দেখিয়া ভাবিলাম,—"বৃষ্টি একবার পতিত হইলে সহজে আর ছাড়িবে না; অথচ না না যাইলেও নহে!" এইরূপ ভাবিয়াই, সেই স্থানে আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিতে পারিলাম না। বৃষ্টি আসিবার পূর্ব্বেই আপন স্থানে উপস্থিত হইতে পারিব ভাবিয়া, তাড়াতাড়ি বহির্গত হইলাম; ও প্রাণপণে চলিতে লাগিলাম। কিন্তু আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম,

তাহা হইল না। অল্পমাত্র পথ গমন করিতে না করিতেই, পর্জ্জন্যদেব ভয়ানক আকার ধারণ করিয়া দর্শন দিলেন।

যে সময় বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল, সেই সময় আমি চোরবাগানের একটী সঙ্কীর্ণ গলির ভিতর আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। ঐ গলির দুই পার্শ্বে একটীও ইষ্টক-নির্ম্মিত বাটী নাই—কেবল সারিসারি খোলার ঘর। পূর্ব্বে অনেকবার আমি এই গলি দিয়া গমন করিয়াছিলাম; তাহাতেই আমি বিশেষরূপে অবগত ছিলাম যে, ঐ ঘরগুলির প্রায় সমস্তই বারবণিতার দ্বারা অধিকৃত।

ক্রমেই মূষলধারে বৃষ্টি আসিল। তখন আর রাস্তায় দাঁড়াইয়া ভিজি কি প্রকারে? নিকটে সেরূপ কোন গৃহও নাই! কাজেই দ্রুতপদে একখানি খোলার ঘরের দরজায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। কিন্তু আমার অদৃষ্ট-ক্রমে সেই বাড়ীর দরজাও আবার ভিতর হইতে বন্ধ! কাজেই অনন্যোপায় হইয়া সেই খোলার ঘরের ছাঁইচের নীচে দাঁড়াইলাম—আশা, কোন গতিকে সেই মূষলধার-বর্ষিত বৃষ্টি হইতে মস্তককে বাঁচাই। কিন্তু জুতা, ধুতি, পিরাণ, চাদর প্রভৃতি সমস্তই ভিজিয়া গেল। এইরূপে সেই স্থানে প্রায় ২।৩ মিনিট আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম; রাস্তায় একটী লোককেও দেখিতে পাইলাম না। ক্রমে রাস্তা-সকল একেবারে ডুবিয়া গেল।

আমি সেই স্থানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় ঘরের ভিতর হইতে মনুষ্যের কথা শুনিতে পাইলাম। যাহা শুনিলাম, তাহাতে কিন্তু আমার মস্তক ঘুরিয়া গেল; শরীর অবসন্ন হইল; বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়া গেল। শুনিলাম,—"গণেশ! তুমি জোর করিয়া পা দু'খানি চাপিয়া ধর, আর 'রাম' তুমি হাত ধর; দেখিও, যেন কোন প্রকারে না নড়ে! আমি গলাটি কাটিয়া ফেলি।"

ইহা শুনিয়া আমি তো একেবারে অজ্ঞান হইলাম। যদিও আমি পুলিশ-কর্ম্মচারী, আর আমার সম্মুখে এইরূপ একটী ভয়ানক হত্যা-কাণ্ড সম্পন্ন হইতেছে; তথাপি আমি একাকী সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে সাহসী হই কি করিয়া? বিশেষ, তাহাদিগের কথা শুনিয়া বোধ হইল যে, তাহারা তিনজনের কম নহে; তাহাতে আবার হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করিতেছে! সুতরাং তখন আমি কেন, বোধ হয় কেহই, প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া সেই সময়ে সেই স্থানে গমন করিতে সাহসী হয় না! যাইহোক, আমি আর ভাবিবার সময় পাইলাম না; দ্রুতপদে সেই স্থান হইতে বহির্গত হইলাম। এক হাঁটু জলের ভিতর দিয়া কেবল ছুটিতে লাগিলাম। মনে করিলাম,—বড় রাস্তায় অবশ্যই কোন না কোন পাহারাওয়ালাকে দেখিতে পাইব; এবং তাহার সাহায্য লইয়া এই ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া হত্যাকারীদিগকে ধরিব। কিন্তু যাহা ভাবিলাম, তাহা হইল না; পাহারাওয়ালা তো পরের কথা, জনমানবকেও আমি রাস্তায় দেখিতে পাইলাম না। কাজেই, ভিজিতে ভিজিতে, জল ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে, আরও দ্রুতপদে চলিতে লাগিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তখনও রাস্তায় কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না।

এইরূপে চলিতে চলিতে, অনেকক্ষণ পরে তবে দেখিলাম, একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ি আসিতেছে। ভাগ্যক্রমে তাহার ভিতর অপর কোন আরোহীও নাই। তখন, আমি ঐ গাড়ি ভাড়া করিলাম। গাড়োয়ানের নিকট আমার পরিচয় দিলাম; যেরূপ ভয়ানক কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে তাহাও তাহাকে বলিলাম। অধিকন্তু তাহাকে পারি-তোষিকের লোভ দেখাইলে, সে দ্রুতবেগে তাহার গাড়ি চালাইতে লাগিল।

আমাদিগের আফিসও এই স্থান হইতে

অর্দ্ধমাইলের অধিক ছিল না। দেখিতে দেখিতে গাড়ি আসিয়া আফিসে পৌঁছিল। গাড়ি হইতে বহির্গত হইয়া সম্মুখেই আমি আমার সাহেবকে দেখিতে পাইলাম, ও দেখিয়াই তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিলাম। তিনিও তখন আর কাল বিলম্ব না করিয়া, সেই স্থানে আর যে কয়েকজন কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিল তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া, ভিজিতে ভিজিতে গাড়িতে উঠিলেন। বৃষ্টির প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। গাড়ি পুনরায় চোরবাগান-অভিমুখে ছুটিল।

সেই সময়ে আমার মনে যে কি প্রকার আনন্দ হইল, তাহা আর কি বলিব! ভাবিলাম,—"সাহেব আজই যেমন আমাকে নানা-রূপ ভৎর্সনা করিয়াছেন; তেমনই আজই এক খুনি-মকর্দ্দমা তাঁহাকে দিলাম। এখন যে তিনি আমার উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হইবেন, তাহার আর কোন ভুলই নাই!" এইরূপ নানা প্রকার ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে, আনন্দে মনকে উৎসাহান্বিত করিতে করিতে, ক্রমে সেই ঘটনা-স্থলে আসিয়া আমরা উপস্থিত হইলাম। তখনও সমভাবে বৃষ্টি পড়িতেছে; ঘরের দরজাও সেইরূপে বন্ধ রহিয়াছে।

গাড়ি সেই স্থানে গিয়া যেমন থামিল, অমনি সাহেব গাড়ি হইতে নামিলেন। তাঁহার জুতা-পেণ্টুলান প্রভৃতি সমস্তই ভিজিয়া গেল। কিন্তু তাহাতে দৃকপাতও না করিয়া দ্রুতপদে সেই ঘরের দরজায় গিয়া তিনি উপস্থিত হইলেন। অন্যান্য কর্ম্মচারীগণও ভিজিতে ভিজিতে সেই বাড়ীর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিল। আমি কিন্তু সাহেবের পশ্চাৎ ছাড়িলাম না। সাহেব তখন সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াই, "গণেশ—গণেশ", "রাম—রাম" বলিয়া ডাকিলেন। কিন্তু তাহাতে কোনরূপ উত্তরই পাওয়া গেল না বা শুনিতে পাইলাম না। তখন সাহেব সেই দরজায় সজোরে এক পদাঘাত করিলেন। খোলার ঘরের জীর্ণ দরজা বৃটিশ-পদাঘাত সহ্য করিতে পারিবে কেন? কাজেই উহা ঝন্ ঝন্ শব্দে শব্দিত হইয়া ভগ্ন হইয়া গেল। সাহেব ও আমি সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম।

কিন্তু ভিতরে গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে সাহেব 'হো' 'হো' করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; আমি মস্তকে হাত দিয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িলাম। দেখিলাম, সেই ঘরের ভিতর একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে; আর সেই স্থানে তিন জন লোক বসিয়া একখানি কার্ত্তিক প্রতিমার কাটাম বাঁধিতেছে। দরজা ভাঙ্গিয়া আমাদিগকে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া, তাহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইল।

সাহেব তখন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা হাত-পা বাঁধিয়া কিসের গলা কাটিতেছিলে?"

সাহেবের কথা শুনিয়া তাহাদিগের মধ্যের একজন বলিলেন,—"গণেশ এই প্রতিমার পা ধরিয়াছিল; আর 'রাম' ইহার হাত ধরিয়াছিল। গলায় খড়-জড়ান শেষ হইলে, দেখিলাম, গলাটি একটু বড় হইয়াছে। তাহাই আমি কাটিয়াছিলাম।"

এই কথা শুনিয়া সাহেব উচ্চ হাস্য করিয়া সেই গাড়িতে আসিয়া উঠিলেন। আর আমি যেরূপ অপ্রস্তত* হইলাম, তাহা পাঠকগণই বুঝিয়া দেখুন!—বশম্বদ শ্রীঃ

---

* প্রবীণ ডিটেক্‌টিভ-কর্ম্মচারী মহাশয়—আপনার গোয়েন্দাগিরীর এ বর্ণনায় আমরা বড়ই প্রীত হইলাম। আপনি সরল মনে নিজের 'বাহাদুরী' নিজেই স্বীকার করিলেন, এই-ই যথেষ্ট। তলাইয়া না বুঝিয়া, হঠাৎ কোন কার্য্য করিতে গিয়া, আপনার ন্যায় আমরাও অনেক সময় এইরূপ অনেক শিক্ষা পাইয়া থাকি; তাই আপনার এ বিবরণ আমাদের বড়ই মনে লাগিল। কিন্তু আমরা সে সব বড় একটা প্রকাশ করি না; শঙ্কা, পাছে লোকে আমাদিগকে কম 'বাহাদুর' বলে!

দুইখানি ছবি।

পঞ্চদশ দৃশ্য।

পরিণাম।

পাপের ফল একদিন না একদিন ফলিবেই। সাক্ষাৎ দৃশ্যে আজ তাহা না বুঝিতে পারি, কিন্তু পরে সে ফল ভুগিতেই হইবে। আর, তাই আজ নবীনবল্লভ, গৌর ও চঞ্চলা সকলেই সেই ফলভোগের জন্য ধর্ম্মাধিকরণে আনীত। একদিকে নবীনবল্লভের বিরুদ্ধে যেমন মিথ্যা করিয়া চুরী-মকর্দ্দমা আনা ও গৃহে অগ্নি-প্রদান করার প্রমাণ আপনিই জুটিয়া দাঁড়াইতেছে; অন্য পক্ষে তেমনই চূড়ামণি-পুত্র গৌর ও চঞ্চলা উভয়েই শ্যামা বৈষ্ণবীর হত্যাকারী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। ডিটেক্‌টিভের চেষ্টায়, শ্যামার হত্যাকারী বলিয়া গৌর ধরা পড়িয়া যখন বিচারালয়ে আনীত হয়, এবং জানিতে পারে যে, শ্যামা বৈষ্ণবীর হত্যাপরাধে সে বিচারাধীন; তখন সে স্পষ্ট করিয়াই সকল কথা খুলিয়া বলিতে যায়। অর্থাৎ সে যতটুকু জানে, সেইটুকুই তখন বলিয়া ফেলে। সে বলে যে,—শ্যামার খবর কিছুই সে জ্ঞাত নহে; সে যখন বেশ্যালয় হইতে বাড়ী ফিরিতেছিল, তখন বাঁশ বনের দিক হইতে হঠাৎ বাহির হইতে দেখিয়াই, সে চঞ্চলাকে ধরিয়া লইয়া যায়। আর, তারপর হইতেই তাহারা কলিকাতায়। ফলতঃ শ্যামার খবর জানার ভার সমস্তই সে চঞ্চলার উপর নির্ভর করায়। কাজেই, তখন চঞ্চলাকেও পাওয়ার আবশ্যক হয়। এবং ছলে-কৌশলে গৌরের নিকট হইতেই তাহার সন্ধান বাহির করিয়া পুলিশ চঞ্চলাকেও গ্রেপ্তার করে। এই পর্য্যন্তই গৌর-চঞ্চলা সংবাদ। ইহার পরই, তাহারা উভয়েই শ্যামার হত্যা-সন্দেহে অভিযুক্ত।

এদিকে নবীনবল্লভ!—নবীনদাসের পুত্র-বধূর হস্ত-ধারণ অবধিই তিনি সেই একই ভাবে অবস্থিত! ডাকাতি-মকর্দ্দমা ডিসমিস হইয়া যাও য়ায় ও নবীনদাস প্রভৃতি সকলে খালাস পাইয় জমীদারের উপর আবার মিথ্যা মকর্দ্দমা আনা দাবী দেওয়ায়, ইতিপূর্ব্বে পুলিশের উপর বড়ই দোষ বর্ত্তিয়াছিল; এমন কি, মকর্দ্দমার রা দিবার সময় ম্যাজিষ্ট্রেটও পুলিশকে বেশ এক ধমক দিয়াছিলেন। আর, সেই জন্যই, কতক নিজেদের বাঁচাইবার মানসেই, নবীনদাসে বাড়ীতে ধরা পড়ার পরই, পুলিসের দারোগ নবীনবল্লভকে ধৃত করিয়া থানায় চালান দেন তাহার পর হইতেই বিচার আরম্ভ হয়; এব যতই সন্ধান হইতে থাকে, ততই তাঁহা কীর্ত্তিকাহিনী বাহির হইয়া পড়ে। অধিক নবীনবল্লভের নিকট হইতে ঘুষ লইয়া কো কার্য্য করিয়াছে,—এ কেহ না বুঝে, এই জন্য প্রত্যক্ষ-পরোক্ষে পুলিশ প্রকৃতই তাঁহার বিরুদ্ধা চরণ করিতে আরম্ভ করে। অর্থাৎ পূর্ব্ব-রা তাহাদের প্রতি যে অভিযোগ আনীত হইয় ছিল, এবং যাহার জন্য উচ্চ কর্ম্মচারীগণ তদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন; পুলিশ এখন বুঝি -সুজিয়া সেই কলঙ্কের অপনোদনে চেষ্টি হয়। কাজেই নবীনবল্লভ কৃষক-পল্লী হইতে আর গৃহাভিমুখীন হইতে পারেন নাই। ত পর হইতেই তিনি দোষী সাব্যস্থ হইয়া আই নের বিচারে আয়ত্বাধীন।

বিচার-ফলও ক্রমে ফলিল, ঠিক। পুলিশ যোগাড়-যন্ত্র করিয়া সকল প্রমাণ করাইয়া দিল নবীনবল্লভকে মিথ্যা-মকর্দ্দমা আনা, ঘ আগুন-লাগান প্রভৃতি-হেতু, এবং গৌর চঞ্চলা উভয়কেই শ্যামার হত্যাপরাধী বলি পুলিশ প্রমাণ করাইল। নবীনবল্লভ-সম্বন্ধে আত্মদোষ-স্খালন পুলিশের যেরূপ আবশ্যক গৌর ও চঞ্চলা সম্বন্ধেও ঠিক তাই-ই। কারণ জমীদারের নিকট হইতে নিযুক্ত হওয়ার পর পুলিশ যে রিপোর্ট প্রদান করে, এবং যাহার জন্য গোয়েন্দা নিযুক্ত হয়, পুলিশের তাহাও বজা

রাখা চাই তো! অধিকন্তু এরূপে আসামীদের ধরিয়া খোসনাম পাওয়া!—এও বড় পুলিশের অল্প লাভ নহে! কাজেই বিচার-কালে সাক্ষীরও অভাব হইল না। অধিক কি, হীর ডোম, হরিদাস প্রভৃতি জমীদারের যাহারা সহকারী, পুলিশ কৌশলে তাহাদিগকেই হস্তগত করিয়া, তাহাদের দ্বারাই জমীদারের বিরুদ্ধে সকল প্রমাণ করাইল। আসামী-শ্রেণীতে ভুক্ত না করিয়া, অনেককে পুলিশ সাক্ষী মানিল। সুতরাং এইখানেই সকল মিটিল। তিন আসামীই সেসনের বিচারে দণ্ডিত হইলেন।

অন্যান্য অনেক কথার পর, এই মকর্দ্দমায় বিচারক যাহা রায় দিয়াছেন, তাহার সারাংশ এই। প্রথম আসামী নবীনবল্লভকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিয়াছেন,—"এ পর্য্যন্ত এত মকর্দ্দমার বিচার করিয়াছি; কিন্তু জমীদার, তোমার মত ভয়ঙ্কর অপরাধী আর দেখিয়াছি কি না, সন্দেহ। শুনিলাম, বুঝিলাম এবং দেখিলাম, যে, তোমার মত কদাচারী পাষণ্ড জগতে অতি অল্পই। তুমি না করিতে পার বা না করিয়াছ, এমন অপকর্ম্ম যে কিছু আছে, তাহা আমার বিশ্বাসই হয় না। কত কুল-স্ত্রীর কুল-নাশ, কত ধার্ম্মিকের ধর্ম্মে-বাধা, কত প্রজার উচ্ছেদ, কত নিরীহের জীবন-নাশ তুমি যে করিয়াছ, তাহার ইয়ত্বাই করিতে পারি না। বুঝিতেছি, আইনে তোমার মত পাপীর পাপের উপযুক্ত শাস্তিই নাই। আইন-অতিরিক্তও যদি কোন শাস্তির বিধান করিবার ক্ষমতা থাকিত, তবে তাহাই তোমার পক্ষে প্রযুজ্য। কিন্তু সে ক্ষমতা নাই। সেই জন্যই মাত্র, জুরীগণের মত-ক্রমে, তোমার প্রতি চৌদ্দ বৎসরের জন্য দ্বীপান্তর-মাত্র আদেশ হইল। তোমার মত নারকীর মুখ-দর্শন করিতেও পাপ বর্ত্তে!"

ইহার পরই চঞ্চলার বিচার-ফল বাহির হয়। ভাগ্যক্রমে সে দিন দেশীয় বিচারকের হস্তেই বিচার-ভার পড়ে। সুতরাং তিনি আরও নানা মন্তব্যের সহিত দশ বর্ষের জন্য তাহার প্রতি কঠিন পরিশ্রমের সহ দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করেন। অধিকন্তু এই বিচারেও বিচারক বলেন,—"আইনের শাস্তি এই-ই বটে; কিন্তু চঞ্চলা জানিও, তোমার জন্য ঈশ্বর আরও কত না শাস্তি বিহিত করিয়া রাখিয়াছেন! তুমি পিশাচী—প্রেতিনী; যে দিন হইতে তুমি গৃহের বাহির হইয়াছ, সে দিন হইতেই তোমার জন্য স্বতন্ত্র নরকের সৃষ্টি হইতেছে, জানিও। পরিণামে তোমার শাস্তির শেষ নাই—তোমার দুঃখের অবধি থাকিবে না। তোমার মত কলঙ্কিনীদের দ্বারাই দেশ উৎসন্ন যাইতেছে।"

এইদিন একই সঙ্গে গৌরের বিচার হয়। বিচারে তাহার প্রতিও ৭ বর্ষের জন্য কারা-দণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

ষোড়শ দৃশ্য।

উপসংহার।

উপসংহার আর বলিতে হয় কি? রাজার বিচার অপেক্ষা ঈশ্বরের বিচার আরও যে ভয়ানক! রাজার বিচার লঙ্ঘনও করা যাইতে পারে; কিন্তু ঈশ্বরের বিচার হইতে অব্যাহতি কিছুতেই যে নাই! চঞ্চলা দশ বর্ষের জন্য কারাবাসিনী হইল বটে, কিন্তু তাহাতেই বা তাহার নিস্তার কই? পাঁচ বৎসর যাইতে না যাইতেই, কি আশ্চর্য্য, কারাগারেই সে আপন মহাপাপের মহা-ফল মহাব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল! দেখ-দেখ! আজিও সে, সে যমযন্ত্রণা ভুগিতেছে—গভর্ণমেণ্টের নূতন আইনে তাহাকে এখন 'কুষ্ঠাশ্রমে' কালযাপন করিতে হইতেছে! হায়-হায়! এখন গলিত কুষ্ঠের বিষম যাতনায় সে অস্থির—দিনরাত্রি পাপের পরিতাপ করিয়া হাহাকারে কাল কাটাইতেছে।

কিন্তু নবীনবল্লভের কোন সংবাদ তাহার পর

হইতে আর পাওয়া যায় নাই। তবে তাঁহার দেশের সংবাদ এই যে, তাঁহার এখন আর বংশেই কেহ নাই। একটী পঞ্চম বৎসর বয়স্ক বংশধর পুত্র তাঁহার ছিল; আহা, কিছুদিন হইল, দশম বর্ষে পদার্পণ করিয়া, সেও এখন ইহজগৎ হইতে অন্তর্হৃত—কাল বিসূচিকায় সেদিন তাহার প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। অধিকন্তু, অবশেষে পতিপুত্রের শোকে ও নানারূপ যন্ত্রনায়, তাঁহার সহধর্ম্মিণীও গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া এ জগৎ হইতে অব্যাহতি লইয়াছেন।

গৌরের সংবাদও এইরূপ বিষাদ-মাখা। কারাগারের যন্ত্রণা কিছুতেই সহিতে না পারিয়া, শেষে সে কারাগারেই উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করে। জন্মাবধি সে পিতার একমাত্র আদরের বস্তু ছিল—আদরে-আদরেই সুখে-সচ্ছন্দেই সে এ-পর্য্যন্ত কাটাইয়াছিল। কারাগারের অসহ্য যন্ত্রণা তাহার কি সহ্য হয়? কাজেই সে ঐ উপায় গ্রহণ করিয়া কষ্ট হইতে অব্যাহতি লইয়াছিল। আর, তাহার বৃদ্ধ পিতা!—আহা, তাঁহাকে দেখিলে কিন্তু এখন কান্না আসে! পুত্র-শোকে কাঁদিয়া কাঁদিয়া তিনি এখন অন্ধ হইয়া পড়িয়াছেন—চলৎশক্তি নাই!

অবশেষে—অপর দিকের চিত্র! তাঁহারা কিন্তু এখন বড়ই ভাগ্যবান! সেদিকে নবীনদাস এখন পুত্র-পৌত্রাদি লইয়া মহাসুখে কালযাপন করিতেছেন। জমীদারের ভাগ্য-লক্ষ্মীও, এখন তাঁহাতেই যেন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। দান-ধ্যান, ক্রিয়া-কলাপ, পূজা-অর্চ্চনা প্রভৃতিতেই তিনি দিনযাপন করিতেছেন। পূজ্য পুরোহিত শ্রীনাথকেও এখন তিনি আপনার সদনুষ্ঠানের সহায়স্বরূপ পাইয়াছেন। পত্নীর মৃত্যুর পর হইতে দিন কতক শ্রীনাথ পাগলের মত হইয়া পড়েন। কিন্তু তৎপরেই কোন এক সিদ্ধ যোগী পুরুষের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়; এবং যোগী তাঁহাকে সংসারের নশ্বরতা বুঝাইয়া ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার মন-প্রাণ অর্পণ করিবার উপদেশ দেন। তদনুযায়ী তদবধি সেই যোগীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া, এপর্য্যন্ত শ্রীনাথ যাবতীয় তীর্থ-পর্য্যটন ও দেব-দর্শনে কালাতিপাত করিয়াছেন। এখন তাঁহার যোগীজনোচিত সৌম্য-মূর্ত্তি, ঋষিতুল্য দেবভাব দেখিলে, তাঁহার প্রতি স্বতঃই ভক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়; তাঁহার চরণামৃত পান-জন্য অনেকে উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকে। বৃদ্ধ নবীনদাস এখন তাঁহারই শিষ্য-স্বরূপে দান-ধ্যান প্রভৃতি নানা সদনুষ্ঠানে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। পরম পিতা পরমেশ্বর এখন তাঁহাদিগকে যেন আপন সেবক-স্বরূপ চরণে স্থান দিয়াছেন। যদি চর্ম্মচক্ষে দৃষ্টি থাকিত, তবে বোধ হয় দেখিতে পাইতাম, শ্রীনাথ ও নবীনদাস এজগতেই সেই পরম পিতার পরম পদে স্থান পাইয়াছে। তাঁহার শক্তি-সামর্থ্য যেন এখন আংশিক ভাবেও উহাঁদের শরীরে প্রবেশ করিয়াছে! ধন্য সাধু!—ধন্য ঈশ্বরের সাধু-প্রীতি!*

সম্পূর্ণ।

*দ্বিতীয় বর্ষের ১৮শ সংখ্যা হইতে আরম্ভ হইয়া এই সংখ্যায় ইহা শেষ হইল।

শশাঙ্কশেখর।

আত্মকাহিনী।

(২)

আমার যখন অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রম, সেই সময়ে পিতা-মাতার সহিত একদিন নৌকা করিয়া কলিকাতায় আসিতেছিলাম। পিতা কলিকাতায় সামান্য চাকরী করিতেন। দেশে জ্ঞাতিদিগের চক্রান্ত-জালে জড়িত হইয়া আমরা সর্ব্বস্বান্ত হই; সেই জন্য আমরা জন্মের মত জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিতেছিলাম। কিন্তু চন্দননগরের নিকট, ভয়ানক ঝড় উপস্থিত হওয়াতে, আমাদের নৌকাডুবি হয়। সেই অবধিই আমি

পিতৃমাতৃহীন। আমি যদিও সে সময়ে প্রাণে বাঁচিয়াছিলাম, তথাপি নিঃসহায় নিঃসম্বল অবস্থায় স্বদেশে ফিরিয়া যাওয়া অবৈধ বিবেচনায়, কোন একটি ভদ্রলোকের সাহায্যে এই কলিকাতায় আসি।

হাবড়ার পোল পার হইয়া সবে-মাত্র দুই-চারি পদ অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময় সম্মুখস্থ একটি বাবুর পকেট হইতে, রুমাল তুলিবার সময়, একতাড়া নোট পড়িয়া গেল; দেখিয়া, আমি তাহা তাঁহাকে কুড়াইয়া দিই। তিনি তাহাতে আমার প্রতি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়া, আমার পরিচয় ও আনুপূর্ব্বিক বিবরণ জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহার নাম হরিদাস দত্ত। তিনিই আমায় তাঁহার প্রতিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বমোহন দে মহাশয়ের বাটীতে সরকারী চাকরী করিয়া দেন।

বিশ্বমোহন দে মহাশয়ের বাটী নানাবিধ গুপ্ত-রহস্যে পূর্ণ। আমি কৃষ্ণদাস বাবুর সাহায্যে সে সকল রহস্য অনেক জানিতে পারিয়াছিলাম। এই সকল গুপ্ত-রহস্য জানিবার জন্য কৃষ্ণদাস বাবু আবার আর এক সহায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কেমন করিয়া তাহা পাইলেন, জিজ্ঞাসা করাতে কৃষ্ণদাস বাবু আমায় বলেন,—"দেখুন! এই বাড়ীতে একজন দাসী আছে; তাহাকে আমি একদিন কোন অসৎ-কর্ম্মে লিপ্ত দেখিয়া ধৃত করিয়াছিলাম। তদবধি সে আমার বড়ই অনুগত। পাছে আমি সকলের নিকট তাহার অসচ্চরিত্রের কথা প্রকাশ করিয়া দিই, সেই ভয়ে, সে আমার হাতে-পায়ে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা ও তাহার কলঙ্কের কথা অপ্রকাশ রাখিতে অনুরোধ করে। আর, আমি তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই বলিয়া, সে আমার নিকট বড় বাধ্য। এই বাটীর অনেক গুহ্য বিষয় সে আমায় প্রচ্ছন্নভাবে লইয়া গিয়া দেখাইয়া দেয় ও অনেক গুপ্তকথা প্রকাশ করে। আজ রজনীতেও সে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে বলিয়াছে। বোধ হয়, কোন গুপ্তকথা সে জানিতে পারিয়াছে—তাহাই দেখাইবে!"

আমরা দুইজনে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় এইরূপ কথোপকথনে নিযুক্ত আছি, এমন সময় নারী-কণ্ঠে প্রশ্ন হইল,—"কৃষ্ণদাস বাবু আছেন?"

কৃষ্ণদাস বাবু উত্তর দিলেন—"হাঁ আছি। কেন গা?"

দাসী বলিল—"একবার উঠে আসুন।" তারপর দাসী ফিস্-ফিস্ করিয়া আরও অনেক কথা বলিল। আমি তাহার সকল কথা শুনিতে পাইলাম না। কেবল "দালান", "হরিদাস বাবু", আর "মোহিনী" এই কএকটি কথা শুনিতে পাইলাম; এবং তাহাতেই যতটুকু পারি, ব্যাপার এক প্রকার বুঝিয়া লইলাম।

কৃষ্ণদাস বাবু দাসীর সহিত চলিলেন। আমিও সঙ্গ লইলাম। সে আমাদিগকে পূর্ব্বদিক দিয়া ঘুরাইয়া, ভিতর-দালানের দরজার কাছে লইয়া গেল। গিয়াই দেখিলাম, ভিতর-দালানে কতকগুলি যে বেঞ্চি ছিল, তাহাতে একজন রমণী ও একজন পুরুষ বসিয়া আছেন। দাসী বলিল,—"হরিদাস বাবু ও মোহিনী।" আমার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইল। কারণ, মোহিনী এই বাটীর একজন কন্যা—বাল-বিধবা। আর হরিদাস বাবু আমার কলিকাতা-প্রবেশের সেই প্রথম সহায়।

* * * *

এই স্থান হইতেই প্রত্যাগমন-কালীন্ আমরা পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদোক্ত পত্রগুলি কুড়াইয়া পাই। তারপরই আমাদের হুগ্‌লি যাওয়ার পালা।

(৩)

ভোর হইল। নব-রাগে রঞ্জিত হইয়া পূর্ব্বাকাশে সূর্য্যদেব উদয় হইতে লাগিলেন। জলে, তমালে, বকুলে একে একে সূর্য্যকিরণ

পড়িয়া এক অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি হইল। জল নব-রাগে রঞ্জিত হইয়া মৃদুবায়ু-হিল্লোলে থরে থরে নৃত্য করিতে লাগিল। তমাল নব-কিসলয়ে সূর্য্যকিরণ পাইয়া এক অপূর্ব্ব চিক্কণ ভাব ধারণ করিল। পৃথিবী নব উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আনন্দে হাস্য করিতে লাগিলেন। এমন সময় আমরা হাবড়ার ষ্টেসনে গিয়া পৌছিলাম।

বেলা ছয়টার সময় একখানি ট্রেণ ছাড়িয়া গেল। আমরাও হুগ্‌লির টিকিট লইয়া ভগবানের নাম স্মরণ করিতে করিতে অন্তর্দ্ধান হইলাম। হুগ্‌লিতে নামিয়া, একটি হিন্দুহোটেল হইতে কিঞ্চিৎ আহার করিয়া, আমি এবং কৃষ্ণদাস বাবু গঙ্গাতীরাভিমুখে গমন করিলাম। অনেক অনুসন্ধানের পর একটি উদ্যান-মধ্যে স্রোতস্বতী ভাগিরথীর শাখা দেখিতে পাইয়া, উদ্যান-রক্ষককে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ উদ্যানটী কার?" উদ্যান-রক্ষক যাহা উত্তর দিল, তাহাতে আমরা উভয়েই শিহরিয়া উঠিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই কৃষ্ণদাস বাবু আমায় চোক টিপিয়া সাবধান করিয়া দিলেন। আমি তখন আবার স্থির হইয়া দাঁড়াইলাম।

কৃষ্ণদাস বাবু উদ্যান-রক্ষককে একটি টাকা প্রদান করিলেন। দরওয়ানজী তাহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া একটি সেলাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অনুগ্রহ করিয়া ঘর হইতে দুইটি মোড়া বাহির করিয়া আনিয়া আমাদিগকে বসিতে দিল। এইরূপে, অনেক রকমে, সেই হীন কর্ম্মচারী দরওয়ানজী ওরফে উদ্যানরক্ষক মহাশয়ের সহিত কৃষ্ণদাস বাবুকে আলাপ করিতে হইল। দেখিয়া, মনে মনে তাঁহার অনেক প্রশংশা করিলাম।

কৃষ্ণদাস বাবু বলিলেন,—"দরওয়ানজী! তুমি তো বড় ভাল লোক দেখ্‌চি! আচ্ছা, তুমি কত মাইনে পাও?"

দরওয়ানজী।—"দশ রুপেয়া, বাবু!"

কৃষ্ণদাস।—"আহা! তুমি এত ভালমানুষ—তোমার বাবুর তোমায় ২০৲ টাকা করে মাইনে দেওয়া উচিত।"

দরওয়ানজী।—"হ্যাঁ বাবু! দেতা কই?"

কৃষ্ণদাস।—"হাঁ, হাঁ, দেগা—দেগা! হামারা সাথ তোমারা বাবুকা আলাপ হ্যায়, হামি উন্‌কো বলিয়ে দেগা।"

কৃষ্ণদাস বাবুর অপূর্ব্ব হিন্দি কথা শ্রবণ করিয়া দরওয়ানজী একটু মৃদু হাসিলেন। তারপরেই বোধ হয়, একটাকা পুরস্কারের কথা তাঁহার স্মরণ হইল—তিনি হাসি চাপিয়া গেলেন। বলিলেন,—"বাবুর সাথ আপ্‌নাকো আলাপ হ্যায়?"

দরওয়ানজী বোধ হয় অনেকদিন মুল্লুক ছাড়িয়া আসিয়াছে। কাজেই তাহার বিশ্বাস, যে অনেক বাঙ্গালা কথা শিখিয়াছে! তাই সে কৃষ্ণদাস বাবুর ভাবগতিক দেখিয়া হিন্দি-বাঙ্গালায় মিশাইয়া কথোপকথন আরম্ভ করিল। আমি কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলাম।

কৃষ্ণদাস বাবু বলিলেন,—"হাঁ!—হাঁ, খুব আলাপ হ্যায়! হামি ভাল করে বলিয়ে দেগা, তোমার খুব মাহিনা বাড়িয়ে যাগা। হাম্ বলেগা যে, 'বাবু! আপ্‌কা দরওয়ান খুব পরিশ্রমী লোক হ্যায়; তোম্ উস্‌কো কুড়ি রুপেয়া মাহিনা করিয়ে দেও।' কেমন?—"

"হাঁ—হাঁ—বাবু! ঐতো ঠিক!"—এই বলিয়া দরওয়ানজী বার বার ঘাড় নাড়িয়া সেলাম করিল।

কৃষ্ণদাস।—"হাঁ দরওয়ানজী! তোমাদের বাবুর সঙ্গে আমি অনেকদিন হলো এই বাগানে এসেছিলেম। এত্‌না দিনে বাগানের কুচ্ বদল্ নেই হুয়া?"

দরওয়ানজী আহ্লাদিত হইয়া প্রভুর প্রশংসা করণার্থ বলিল,—"আপ্ চলিয়ে না, বাগান্‌কা ভিতর্ সব দেখেগা, কেয়া আচ্ছা হুয়া!"

কৃষ্ণদাস বাবুও তাই তো চান। তিনি দরওয়ানের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। আমিও তৎ-পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলাম।

উদ্যানটির গেট হইতে একটি সোজা রাস্তা বরাবর বাটির সম্মুখস্থ পুষ্করিণীতে যাইয়া মিশিয়াছে। তারপর সেই রাস্তা সরু হইয়া, পুষ্করিণীর দুই পাড় অবলম্বন করিয়া আবার বাটীর গাড়ী-বারান্দার ভিতর যাইয়া, এক হইয়া গিয়াছে।

বাড়ীটি বেশ উচ্চ তোলার উপর নির্ম্মিত। বরাবর সিঁড়িতে উঠিয়া একটি সুবৃহৎ বৈঠকখানা বা হল্ ঘর। তাহার সম্মুখে বিস্তৃত দরদালান; দুইপার্শ্বে চারিটি ছোট ছোট ঘর। তাহার পরেই প্রশস্ত প্রাঙ্গন। প্রাঙ্গনের পূর্ব্ব এবং পশ্চিমধার প্রাচীর-বেষ্টিত। প্রাঙ্গনের পরে আবার দ্বিতল একসার বারান্দাওয়ালা ঘর। নীচে ছয়টি এবং উপরে ছয়টি ঘর—দক্ষিণ দুয়ারি।

দরওয়ানজী আমাদের পথ-প্রদর্শক হইয়া একে একে সকল ঘরগুলি দেখাইতে লাগিল। আমরাও আমাদের উদ্দেশ্য সংসাধনার্থ চারিদিক উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। উপরের কয়টি ঘর আমরা প্রথমে দেখিয়া নীচে নামিয়া আসিলাম। একে একে দরওয়ানজী আমাদিগকে পাঁচটি ঘর দেখাইল। কিন্তু পশ্চিমদিকের সর্ব্বশেষের ঘরের চাবি খুলিল না; বলিল,—"উয়ো ঘর্‌মে কুছ্ নেই বাবু! উস্‌মে ভাণ্ডার হ্যায়।"

আমরা দরওয়ানজীর অপার করুণার উপর আর কোন কথা না কহিয়া, ধীরে ধীরে সেই ঘরের সম্মুখ দিয়া চলিতে লাগিলাম। এমন সময়, অতি ক্ষীণ স্বরে, মর্ম্মান্তিক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বিপদ্‌গ্রস্তা স্ত্রী-কণ্ঠে উচ্চারিত হইল—"মাগো! তুমি এখন কোথায়?——"

আমরা উভয়েই চমকিয়া উঠিলাম। দরওয়ানজী আমাদের ভাব দেখিয়া বলিল,—"বাবু! চলিয়ে আও! উধার কেয়া দেখ্‌তা?"

আমাদের কার্য্যোদ্ধার হইল! পাছে দরওয়ানজী আরও অধিক সন্দেহ করে, সেই জন্য, আমরা সে বিষয় যেন শুনিতেই পাই নাই, এই ভাব দেখাইলাম। উভয়েই আবার দরওয়ানজীর পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলাম। এইরূপে অনেকক্ষণ উদ্যান-মধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া, সন্ধ্যার সময় আমরা বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করি।

প্রসিদ্ধ দস্যু-দলপতি

তান্তিয়া ভীল

বা সচিত্র তান্তিয়ার জীবনী।*

আজ আর ভারতে 'তান্তিয়ার' নাম কাহারও অজানিত নাই। প্রতি প্রদেশে, প্রতি নগরে, প্রতি পল্লীতে, এমন কি অনেক মাঠে-ঘাটে-হাটে-বাজারেও, আজ তান্তিয়ার নাম প্রতিধ্বনিত! কাগজে-কলমে, সংবাদপত্রে-সাময়িক আলোচনায়, পুস্তকে-পুঁথিতে আজ সর্ব্বত্রেই 'হা তান্তিয়া-যো তান্তিয়া!' অধিক বলিব কি, যে দেশে—অন্ততঃ যে ভাষায়, গণ্যমান্য লোকেরও একখানি 'জীবন-চরিত' নাই, সেই হতভাগ্য দেশের—সেই অবহেলিত বাঙ্গালা ভাষায়ও আজ তান্তিয়ার এক প্রকাণ্ড 'জীবন-চরিত' বাহির হইয়াছে। ডিটেক্‌টিভ-পুলিসের সেই সর্ব্ব-সুপরিচিত কর্ম্মচারী বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বহু পরিশ্রম করিয়া—অনেক পাঁজি-পুঁথি—দলিল-দস্তাবেজ ঘাঁটিয়া, দুইশত পৃষ্ঠা পরিমিত তান্তিয়ার এক প্রকাণ্ড জীবনী বাহির করিয়াছেন।

সুসময়েই তান্তিয়ার এই জীবনী বাহির হইয়াছে। লোকে এসময় 'তান্তিয়া-তান্তিয়া' করিয়া যেমন পাগল, সে কৌতূহল-নিবারণ করার এই তো সাময়িক কার্য্য! অবসর বুঝিয়া প্রিয়নাথ বাবু ও, বুঝিলাম, ঠিক কার্য্যই করিয়াছেন।

*'পাহাড়ে মেয়ে' প্রভৃতি প্রণেতা ডিটেক্‌টিভ পুলিসের কর্ম্মচারী বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ১৸০ এক টাকা দুই আনা।

তান্তিয়াকে লইয়া এত কেন ?

তান্তিয়া নীচকুলোদ্ভব, তান্তিয়া দরিদ্র, তান্তিয়া দস্যু—এককথায় হীনত্ব-জ্ঞাপক যা' কিছু বিশেষণ আছে, তান্তিয়ার প্রতি সকলই অর্পিত। কিন্তু তথাপি তান্তিয়াকে লইয়া এত কেন? তান্তিয়ার নামে লোক কিসে পাগল ?

অবশ্যই কারণ আছে। বিনা কারণে কার্য্য কোথায় সম্ভবে? ডিটেক্‌টিভ মহাশয়ের সংগৃহীত জীবনীও সে কারণের প্রধান প্রদর্শক। এ জীবনী দেখিয়া—পড়িয়া বুঝিলাম, প্রকৃতই 'তান্তিয়া-তান্তিয়া' করিবার হেতু বর্ত্তমান। সে কারণ আমার দেখাইব কি, যে পুলিশ তান্তিয়াকে 'এক কোপে কাটিতে পারিলে আর দুই কোপে কাটিতে চাহেন না', সেই পুলিসের কর্ম্মচারীই—এই জীবনী-লেখক তান্তিয়া-সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, দেখুন। তিনি বলেন,—"তান্তিয়ার উদ্যোগ, উদ্যম, সাহস, চতুরতা প্রভৃতির বিষয় যখন শুনিয়াছি, তখনই অবাক হইয়াছি; যখন দেখিয়াছি, তখনই অজ্ঞান হইয়াছি; যখন ভাবিয়াছি, তখনই হতজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছি।" তান্তিয়া যাঁহাদের শত্রু, তাঁহাদের মুখেই তান্তিয়ার এই প্রশংসা! সুতরাং সাধারণ নিরপেক্ষ সমাজের (Neutral partyর) তান্তিয়ার বিষয় আলোচনা করিবার কারণ কি অল্প ?

কারণ বাস্তবিকই অনেক। প্রথমতঃ তান্তিয়া ইংরাজ-রাজত্বের পরম শত্রু। শত্রু বলিয়া আবার যেমন তেমন শত্রু নহে; তান্তিয়া ইংরাজ-রাজকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তান্তিয়ার ভয়ে মধ্য-ভারত কাঁপিত; তান্তিয়াকে ধরিবার জন্য 'তান্তিয়া পুলিশ' নাম দিয়া এক শ্রেণীর স্বতন্ত্র পুলিশ-প্রহরীর বন্দোবস্ত করিয়াও, গভর্ণমেণ্ট সতত উদ্বিগ্ন ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, এই দুর্দ্ধর্ষ ভাবের মধ্যেও তান্তিয়ার দয়াদাক্ষিণ্য, বুদ্ধি-কৌশল, পরোপকার প্রভৃতি অনেকগুলি গুণ ছিল। বিশেষতঃ দস্যু হইয়াও ধার্ম্মিক, হত্যাকারী হইয়াও প্রাণদাতা, নিজের উদর-পূরণ জন্য চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও দাতা, এসকল কি অল্প কথা! তাই আবারও বলি, এখনও কি জিজ্ঞাস্য আছে, তান্তিয়াকে লইয়া এত কেন ?

প্রিয়নাথ বাবুর পুস্তকে তান্তিয়ার পরিচয়, তান্তিয়ার বীর্য্য-বিক্রম, তান্তিয়ার প্রতিহিংসা-প্রত্যুপকার, তান্তিয়ার কৌশল-কার্য্য, তান্তিয়ার চুরী-ডাকাতি, তান্তিয়ার বিচার-বিবরণ, তান্তিয়ার গুণ-গরিমার পরিচয় প্রভৃতি তান্তিয়া-সংক্রান্ত নানা কথা সরল ভাষায় বর্ণিত আছে। একটু রঞ্জিত বলিয়া বোধ হইলেও, তাহা সুখ-পাঠ্য বটে। পড়িতে পড়িতে তান্তিয়ার প্রতি প্রকৃতই ভক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। মনে হয়, তান্তিয়াকে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট ধরিয়াছেন, ভালই; কিন্তু তাঁহার যেন কিছুতেই প্রাণদণ্ড না হয়। প্রাণদণ্ড না দিয়া তান্তিয়াকে নির্ব্বাসন-দণ্ড দেওয়াই যেন সকলের আন্তরিক প্রার্থনা।

অধিকন্তু, প্রিয়নাথ বাবুর পুস্তক পড়িয়া এও আবার মনে হয়, তান্তিয়াকে পুলিশের কোন কর্ম্ম দেওয়া বরং ভাল ছিল। তাহাতে তান্তিয়ার সন্ধানে অনেক চোর-ডাকাইত ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকিত। ইহাতে যদি কেহ সন্দেহ করেন, এমন হয়; তাহা হইলে, আমরা বলি, এ গ্রন্থ-পাঠে সে সন্দেহও ভঞ্জন হইতে পারে। গ্রন্থকার তান্তিয়ার চিত্রে স্পষ্ট বুঝাইয়াছেন যে, অত্যাচারিত না হইলে তান্তিয়া কখনও কাহারও প্রতি কোন অত্যাচার করেন নাই। গ্রন্থকারের ভাষাই এসম্বন্ধে এই :—"অতিশয় অপরাধী বলিয়াই তাহার প্রতিফল প্রদান করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার স্ত্রীপুত্র বা পরিবারবর্গের প্রতি কোন অত্যাচার হয় নাই।" যে অপর

তাহার পরিবারবর্গের প্রতিও যখন তান্তিয়া অত্যাচারী নহেন, তখন তাঁহাকে বিশ্বাস করিলে তিনি কি বিশ্বাসঘাতক হইতে পারেন ?

এইরূপ তান্তিয়ার অনেক মহত্ত্বের পরিচয়েই, তান্তিয়ার প্রতি স্বতঃই ভক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। ঘৃণাবিদ্বেষ ভুলিয়া তাঁহার প্রতি আপনা-আপনিই সহানুভূতি দেখাইতে ইচ্ছা করে। আর, সেইজন্যই, নিম্নে পাঠকগণকেও আমরা তান্তিয়ার কথঞ্চিৎ পরিচয় সংগ্রহ করিয়া উপহার দিতেছি।

তান্তিয়া ভীল।

তান্তিয়ার পরিচয়।

উপরে যাঁহার প্রতিমূর্ত্তি দেখা যাইতেছে, তাঁহারই নাম তান্তিয়া ভীল। মধ্যভারতের অন্তর্গত নিমার জেলায় বিরদা-গ্রামে তান্তিয়ার জন্মস্থান। তান্তিয়ার পিতার নাম ভাও সিং। হিন্দু-ভীলদিগের মধ্যে গোপজাতীয় এক বংশ আছে। সেই বংশে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে তান্তিয়া জন্ম-গ্রহণ করেন। বাল্যাবধিই

তান্তিয়া বলিষ্ঠ ও সাহসী ছিলেন। বালক-বয়সেই তাঁহাকে মাতৃবিয়োগ সহিতে হয়; এবং তাঁহার বয়ঃক্রম যখন ৩০ বৎসর, সেই সময় তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। তান্তিয়ার পিতা কৃষিকার্য্যেই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। যে গ্রামে তান্তিয়া বাস করিতেন, সে গ্রামে তাঁহার পিতার কোনও ভূ-সম্পত্তি ছিল না; অপরের জমিতে নিয়মিত কর দিয়া তিনি চাস করিতেন। তবে নিকটস্থ পোখার-গ্রামে তাঁহাদের কতকগুলি ভূ-সম্পত্তি ছিল; শিবা পেটেল নামক এক ব্যক্তির সহিত একযোগে ঐ সকল জমিতে চাস-আবাদ হইত। তান্তিয়ার পিতৃবিয়োগের পর, সুযোগ বুঝিয়া, শিবা কৌশলে তান্তিয়াকে সেই জমিতে বঞ্চিত করে। তান্তিয়া তাহা উদ্ধারের জন্য প্রথমতঃ আইনের আশ্রয় লন। কিন্তু তাঁহার অর্থাভাব; সুতরাং বিচারেও শিবা জয়ী হয়।

নিরীহ তান্তিয়া এইবার হইতেই রুদ্র-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। জোর করিয়া পিতৃ-সম্পত্তি দখল করিতে গেলেন। শিবা পেটেলের লোক-জনের সহিত তাঁহার তুমুল দাঙ্গা হইল। তিনি সকলকেই উত্তম-মধ্যম বেশ শিক্ষা দিলেন; এবং শিবাকেও উপযুক্ত প্রতিফল দিবেন, ভয় দেখাইলেন। তান্তিয়ার ভয়ে লোকে জড়সড় হইল; তান্তিয়া 'বদমাইস' বলিয়া আখ্যাত হইলেন।

ইহার পরই বদমায়েস বলিয়া পুলিস তান্তিয়াকে এক বর্ষের জন্য জেলে দিলেন। তান্তিয়াও সেণ্ট্রাল-জেলে এইরূপে অতি কষ্টে একটী বৎসর কাটাইয়া আসিলেন। এই-ই তান্তিয়ার প্রথম কারাবাস।

গ্রামের লোকের নিষ্ঠুর আচরণে ও পুলিশের দুর্ব্ব্যবহারে এই সময় হইতে তান্তিয়া বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন; এবং গ্রাম ত্যাগ করিয়া কোন দূর-স্থানে গিয়া বাস করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই। অতঃপর যেখানে যত চুরী-মকর্দ্দমা হইতে লাগিল, পুলিশ তান্তিয়াকেই প্রথমে 'চোর' বলিয়া গ্রেপ্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। অধিকন্তু, এই সময় পোখার-গ্রামের এক চুরী-মকর্দ্দমায় সকলে ষড়যন্ত্র করিয়া তান্তিয়াকেই দোষী সাব্যস্থ জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিল।

কাজেই লোকালয়ে থাকা আর তান্তিয়ার পক্ষে ভার হইল। অগত্যা তদবধিই তিনি লোকালয়-ত্যাগী হইলেন। পুলিশের শাস্তি, জেলের যন্ত্রণা অপেক্ষা জঙ্গলে জঙ্গলে জীবন কাটানই এ সময় তাঁহার পক্ষে শান্তিপ্রদ হইল। অধিকন্তু, এই সময় হইতেই তিনি তাঁহার শত্রুদিগের কার্য্যের প্রতিহিংসা লইতে ও আপনার দল পরিপুষ্ট করিতে যত্নবান হন। আরও, পেটের দায়ে এই সময় হইতেই বাধ্য হইয়া তান্তিয়াকে চুরি-ডাকাতি প্রভৃতিও অবলম্বন করিতে হয়। পুলিশের অত্যাচারে ও লোকের ষড়যন্ত্রে এইরূপে এক নিরীহ কৃষক দুর্দ্দমনীয় ডাকাইত হইয়া উঠেন।

এই সময় এক বিশ্বাসঘাতকের ষড়যন্ত্রে তান্তিয়া, এবং দৌলিয়া ও বিজনিয়া নামক তাঁহার দুইজন সহকারী, ধৃত হন। পুলিশ তখন এক মকর্দ্দমা সাজাইয়া তাঁহাদিগকে সাজা দিতে চেষ্টিত হয়। যোগাড়-যন্ত্রে পুলিশের সে চেষ্টাও ক্রমে সফল হইয়া আসিল; হিমত পেটেল প্রভৃতি কতকগুলি সাক্ষী প্রত্যক্ষ প্রমাণ-স্বরূপ দাঁড়ানয়, তাঁহাদের সকলেরই কারাদণ্ড হইল। মিথ্যা অভিযোগ ক্রমে সত্য-স্বরূপ প্রমাণিত হওয়ায়, তাঁহারা খান্দোয়ার জেলে প্রেরিত হইলেন।

এই সময় হইতে তান্তিয়ার মনে আরও ক্লেশ হইল; 'দেশে তবে বিচার নাই' বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল। এবং প্রাণ-বিনিময়েও এসব অত্যাচারের প্রতিফল প্রদান করিতে

তিনি প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইলেন। বিশেষতঃ সে প্রতিজ্ঞার ফলও ফলিল, দেখিতে দেখিতে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ২০ এ ডিসেম্বর পুলিশকে ফাকি দিয়া তাঁহারা জেল হইতেই পলাতক হইলেন। পুলিস ত্রস্ত, গভর্ণমেণ্ট ভীত, গ্রামবাসী তাঁহার বিপক্ষগণ সন্ত্রাসিত!

সেই অবধি আর এই একাল পর্য্যন্ত তান্তিয়া বনে-বনে। তান্তিয়ার জীবনে, এই দীর্ঘকালের বিবর্ত্তনে কত যে কি ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? কত বিপদ, কত অন্তরায়, কত শত্রুতা, কত ক্লেশ, এ দীর্ঘকালের মধ্যে তাঁহাকে যে সহিতে হইয়াছে, তাহারই বা ইয়ত্তা কি?

তান্তিয়ার সামর্থ্য।

বাল্যাবধি এ বয়স পর্য্যন্ত তান্তিয়া যত কার্য্য করিয়াছেন, তাহার সকলগুলিতেই তাঁহার অপূর্ব্ব অকুতোভয়তা ও অসীম সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। খান্দোয়ার যে জেল হইতে তান্তিয়া রাত্রিযোগে পলায়ন করেন, সে জেলের প্রাচীরের উচ্চতা অন্যূন ১৫ ফিট করিয়া। অধিকন্তু সেই জেলের এক অর্গলাবদ্ধ গৃহে তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। কিন্তু তান্তিয়ার কি অলৌকিক সামর্থ্য যে, সেই লৌহ-শৃঙ্খল চুরমার করিয়া —গৃহের অর্গল ভাঙ্গিয়া, তিনি সেই জেল হইতে লাফাইয়া পলায়ন করেন। তাও আবার একা নহে—তের জন তাঁহার সহকারী ভীল কয়েদীকে সঙ্গে লইয়া! বিশেষতঃ ইহার মধ্যে আরও আশ্চর্য্য এই যে, তিনি পলাইবার সময় —প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়াই, জেল-রক্ষকদিগকে আবার চীৎকার করিয়া বলিয়া যান,—"জেলের প্রহরীগণ! তোমরা দেখ, তান্তিয়া তাহার অনুচরবর্গ-সমভিব্যাহারে জেল হইতে পলায়ন করিতেছে। তোমরা শীঘ্র তাহাদিগকে ধরিবার চেষ্টা কর।" বুঝুন দেখি পাঠক, একি অল্প সামর্থ্য ও অল্প সাহসের কাজ!

তান্তিয়াকে ধরিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট 'তান্তিয়া-পুলিশ' নাম দিয়া এক স্বতন্ত্র পুলিশের সৃষ্টি করেন। সেই পুলিশ হইতে লোক-জন নিয়তই তান্তিয়াকে ধরিতে চেষ্টা পাইত। কিন্তু ধরা দূরে থাক, এপর্য্যন্ত যিনি তান্তিয়ার সম্মুখীন হইয়াছেন তিনিই একরকম-না-একরকম শিক্ষা পাইয়াছেন। এমনও সব সময় গিয়াছে, যখন পুলিশ তান্তিয়াকে গুলি করিবার অবসর পাইয়াছেন; অথচ গুলি ছুড়িতে যাইবার সময়ই, কিজানি কি উপায়ে পুলিসের হাতের সে বন্দুক কাড়িয়া লইয়া, তান্তিয়াই পুলিশকে গুলি করিয়াছেন! এইরূপ আরও রহস্যের কথা, অনেক সময় তান্তিয়াকে ধরিতে গিয়া, তান্তিয়ার নিকট পুলিশকেই ধরা পড়িতে হইয়াছিল; এবং অবশেষে পুলিশের লোকের নাক-কান কাটিয়া তবে তান্তিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। অধিকন্তু সম্মুখীন হইয়া, অস্ত্রশস্ত্র লইয়া—তরবারি-বন্দুক চাঙ্কাইয়াও, তান্তিয়া অনেক সময় পুলিশ ও তৎসহকারী শত শত লোককে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। এইরূপই তান্তিয়ার অমানুষী শক্তি-সামর্থ্য!

তান্তিয়ার কৌশল-বল।

তান্তিয়া কৌশলীও বড় অল্প ছিলেন না। তান্তিয়াকে ধরিবার জন্য একদিন পুলিশ প্রায় সম্মুখীন! এমন সময় অমনই তান্তিয়া এক কৃষকের বেশ ধারণ করিয়া বসিলেন; এবং পুলিশকে গিয়া বলিলেন,—"তান্তিয়া এই নিকটস্থ পাহাড়ের উপর আছে, আমি দেখাইয়া দিতে পারি।" পুলিশও তাই-ই বুঝিলেন। কিন্তু পাহাড়ের সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া উঠিবার জন্য একে একে যখন পুলিশের লোকজন অগ্রসর হইল, তান্তিয়া অমনি পুলিশের কর্ত্তাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া তাঁহার হাত হইতে বন্দুকটী কাড়িয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"এই আমিই তান্তিয়া! এখন তান্তিয়াকে

-মারিবে কি, তান্তিয়ার হস্তেই মর!" সকলে বিস্মিত, তান্তিয়া কি অপূর্ব্ব কৌশলী!

এইরূপ আর এক সময় তান্তিয়া যে জঙ্গলে থাকিতেন, তাহার নিকটস্থ এক স্থানেই পুলিশ দলবল-সহ আসিয়া তাঁবু ফেলেন; যোগাড়-যন্ত্র হয়, তাঁহারা তান্তিয়াকে ধরিবেনই! তখন, আবশ্যক বুঝিয়া, এক নাপিতের বেশ ধরিয়া—ক্ষুর-ভাঁড় সঙ্গে লইয়া, তান্তিয়াই একদিন তাঁহাদের নিকট গিয়া উপস্থিত! পুলিশ কিন্তু তত তলাইয়া বুঝিতে পারিলেন না। আবশ্যক হওয়ায়, প্রকৃতই নাপিত-জ্ঞানে তত্রত্য প্রধান কর্ম্মচারীই তান্তিয়ার নিকট কামাইতে গেলেন। কিন্তু ক্ষণপরেই তাঁহার চক্ষু-স্থির! কামাইতে কামাইতেই কর্ম্মচারীর নাসিকাটি কাটিয়া দিয়া, তান্তিয়া বলিলেন,—"এই দেখ কে তান্তিয়া!" তাহার পরই চম্পট! পুলিশ ত্রস্ত—সকলে অবাক!

তান্তিয়ার প্রত্যুপকার-প্রতিহিংসা।

তান্তিয়ার জীবনীতে আরও জানা যায়, তান্তিয়া অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে যেরূপ দৃঢ়ব্রত ছিলেন; উপকারীর প্রত্যুপকারেও তাঁহার তেমনই লক্ষ্য ছিল। হিমত পেটেল নামক একব্যক্তি তাঁহার বিপক্ষে মিথ্যা-সাক্ষী দেয়; এবং সেই সাক্ষ্যতেই তিনি খান্দোয়ার জেলে প্রেরিত হন। সে অত্যাচার কিন্তু তাঁহার মনে মনে গ্রথিত ছিল। জেল হইতে পলায়নের পরই, তিনি দলবল-সহ যাইয়া প্রথমেই হিমত পেটেলকে সে পাপের শাস্তি দেন। ডাকাতি করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করেন; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে হিমতকে মানব-লীলাও সম্বরণ করিতে হয়! ফলতঃ এইরূপ প্রতিশোধের চিত্র তান্তিয়ায় বিস্তর।

তারপর তান্তিয়া প্রত্যুপকারী! জেল হইতে জেলের কৌপিন পরিয়া স্বদল-সহিত তান্তিয়া যখন পলায়ন করেন, সেই সময় তাঁহাদের বস্ত্র-পরিবর্ত্তনের ও ক্ষুন্নিবৃত্তির বড়ই আবশ্যক হয়! তাঁহারা জেল হইতে ৩০ ক্রোশ দূরস্থিত এক বস্ত্র-বিক্রেতার বাড়ীতে গিয়া অতিথি হন। বস্ত্র-বিক্রেতাও তাঁহাদিগের আতিথ্যে কিন্তু বড়ই পরিতৃপ্ত হয়; এবং তাহার নিকট যে সকল বস্ত্র ও তাহার গৃহে আহারোপযোগী যা'কিছু সম্বল ছিল, নিজেদের জন্য পর্য্যন্ত না রাখিয়া, সে সকলই উহাঁদিগকে খাইতে দেয়। তান্তিয়া এ উপকার কিন্তু জীবনেও ভুলেন নাই। অধিক কি, কিছুদিনের মধ্যেই, তিনি ঐ বস্ত্র-বিক্রেতাকে একরূপ ধনবান-রূপে পরিণত করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তান্তিয়ার সাহায্যে 'তাহাদের চিরদিবসের কষ্ট দূর হয়।' এইরূপ চিত্র তান্তিয়ায় আরও অনেক আছে।

তান্তিয়ার দয়া।

তান্তিয়া কিরূপ দয়াল-হৃদয়, এসম্বন্ধে পুলিশ-কর্ম্মচারী—জীবনী-লেখকই, দেখুন, এই বলেন,—"তান্তিয়া দরিদ্রের পিতা। অতিশয় দরিদ্রতা-নিবন্ধন পিতাও কখনও স্নেহময় পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, শুনা যায়; কিন্তু কেহ কখনও বলিতে পারিবে না যে, তান্তিয়া কোন দারিদ্র্য-পীড়িত ব্যক্তিকে কখনও পরিত্যাগ করিয়াছেন। যিনিই বিপদজালে জড়িভূত হইয়া তান্তিয়ার শরণ লইয়াছেন, যেরূপ হউক, তান্তিয়া তাঁহাকেই সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।" এ অপেক্ষা জীবনের গুরুতর মহত্ত্ব আর কি হইতে পারে?

তান্তিয়া নিজে ধনী ছিলেন না বটে; কিন্তু তিনি ধনদান করিয়াছিলেন, অনেক! যে সকল কৃপণ ধনী ধনের সদ্ব্যয় করিত না, তান্তিয়া তাহাদের সেই ধন লুণ্ঠন করিয়া দরিদ্রদিগকে দান করিতেন। এ সম্বন্ধে কয়েকটী সুন্দর গল্পও তান্তিয়ার জীবনীতে পাওয়া যায়। তান্তিয়া এক সময় সংবাদ পান যে, নিকটস্থ এক গ্রামে বড়ই অন্নকষ্ট উপস্থিত—লোকে অনাহারে কঙ্কালাবশিষ্ট-প্রায়; অথচ সেখানকার

এক জন কৃপণ-ধনীর ধনাগার পরিপূর্ণ—টাকায় ময়লা ধরিয়া যাইতেছে। শুনিয়াই, তান্তিয়ার প্রাণ কাঁদিল। তিনি তাড়াতাড়ি সেই গ্রামে আসিলেন; সেই ধনীর গৃহে ডাকাতি করিলেন; এবং তাঁহার সমস্ত ধন গ্রামের যাবতীয় আর্ত্ত প্রাণীকে বাঁটিয়া দিলেন। এই ঘটনায় ধনী পরে পুলিশকে সংবাদ দেন; কিন্তু পুলিশও "দস্যুর এইরূপ দয়া দেখিয়া একেবারে বিমোহিত হইলেন।"

সংক্ষেপতঃ তান্তিয়া কত লোককে কত দান করিয়াছেন; কতলোকের কত সৎকার্য্যে সহায় করিয়াছেন; কত ব্রাহ্মণ, কত স্ত্রীলোক, কত বালক-বালিকা যে তাঁহা কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছে; তাহার আর ইয়ত্তা নাই। বুঝিবা, সকলে এইরূপ উপকৃত হওয়াতেই তান্তিয়ার দল বাড়িয়াছিল; সন্ধান করিয়া পুলিশ কোন মতেই তান্তিয়াকে এপর্য্যন্ত ধরিতে পারেন নাই।

তান্তিয়ার ধর্ম্ম।

বলা বাহুল্য, তান্তিয়া একজন প্রকৃত হিন্দু। এবং এপর্য্যন্ত তাঁহার যত গুণ-গরিমার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাও তাঁহার হিন্দুত্বের পরিচায়ক। দস্যু হউন, কিন্তু আজিও আমাদের বিশ্বাস, তান্তিয়া অধার্ম্মিক নহেন।

তান্তিয়া-জীবনের উপসংহার।

তান্তিয়ার জীবনের বলিবার কথা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আর বলা হইল কি? একখানি বিস্তৃত জীবনী লিখিয়াও, তান্তিয়ার জীবনের সম্পূর্ণ ও প্রকৃত পরিচয় জীবনী-লেখকই যখন দিতে পারেন নাই—তিনিই যখন বলিয়াছেন, "বহু অনুসন্ধান, যত্ন, পরিশ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিয়াও তান্তিয়ার জীবনী যে সম্যক সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না"; তখন সেই বিস্তৃত পুস্তকের সংক্ষিপ্তসারে আমরা আর কি দেখাইব? তবে এই মাত্র বলি, তান্তিয়ার জীবনী বড়ই রহস্যময়—বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক! যাইহোক, পরিশেষে এই ক্ষোভ যে, "একজন বিশ্বাসঘাতকের ষড়যন্ত্রে তান্তিয়া ধরা পড়ায় আজ তান্তিয়ার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে! কি যে ভগবানের লীলা, কে বলিতে পারে!

বসন্তকুমার*।

(সমালোচনা)

এখানিও একখানি সামাজিক উপন্যাস। তবে বটতলা হইতে প্রকাশিত! বটতলা হইতে প্রকাশিত বটে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এখানি বটতলার শ্রেণীভুক্ত নহে। বটতলাই সাধারণ নভেল-নাটক হইতে এখানি অনেক উচ্চে—এমন কি অনেক আঁবতলা-কাঁঠালতলার পার্শ্বেও ইহা দাঁড়াইতে পারে। আর, সেইজন্যই, এই উপন্যাসখানি-সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিলে, গ্রন্থকার বোধ হয় রাগ করিবেন না, ভরসা করি।

গ্রন্থকারের এই উপন্যাসের কার্য্যস্থল, কলিকাতায়; দেখিয়া বোধ হইল, যেন এই চিনি-চিনি! অর্থাৎ কল্পিত হইলেও, অনেক স্থলে যেন তাঁহার প্রাণের কথা—ঘরের সন্ধান বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ফলতঃ সে চিত্র ফুটিয়াছে, মন্দ নহে। তা'র পর, তাঁহার বসন্তকুমারের আলোচ্য বিষয়!—একদিকে স্বর্গ, আর অন্যদিকে নরক; একদিকে পিশাচ-অবতার জ্যেষ্ঠ ভুবনমোহন, আর অন্যদিকে জ্যেষ্ঠগত-প্রাণ, ধর্ম্মপরায়ণ মোহিনীমোহন। কতকটা যেন সেই স্বগুণ-প্রসিদ্ধ 'স্বর্ণলতার' শশীভূষণ ও বিধুভূষণের ছায়ায়! শশীভূষণের যেমন 'প্রমদা' ছিল, ভুবনমোহনেরও তেমনই 'বড়বউ'; বিধুভূষণের যেমন 'সরলা' ছিল, মোহিনী-মোহনেরও ঠিক তেমনই 'শান্তিময়ী'। ইচ্ছা

* বাবু শরচ্চন্দ্র সরকার-প্রণীত।

করিয়াও অন্ততঃ, গ্রন্থকার এরূপ অনুকরণেরই চেষ্টা পাইয়াছেন বলিয়া বোধ হইল। তিনি একদিকে আঁকিয়াছেন, ভুবনমোহনের পরিবার, আর অপরদিকে মোহিনীমোহনের সংসার; দেখাইয়াছেন, ভুবনের সহকারী সকলেই পিশাচ ও উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতির, আর মোহিনীর সংশ্লিষ্টগণ ধার্ম্মিক ও সহিষ্ণু।

ভুবনের চারিটি পুত্র ও দুইটি কন্যা; মোহিনীমোহনের দুই পুত্র—বিজয় ও বসন্ত, এবং দুই কন্যা। বসন্তের নাম অনুসারেই যেন পুস্তকের নাম হইয়াছে, 'বসন্তকুমার।' ভুবনের জ্যেষ্ঠা কন্যা মহামায়া—সে আবার সর্ব্বাপেক্ষা পিশাচী—প্রেতিনী। অধিক কি, হিন্দুর ঘরে, হিন্দুর চক্ষের সমক্ষে, এ চিত্র না দেখাইলেই ভাল হইত। মহামায়ার স্বামী অবিনাশ—তাঁহারও মুখ দেখিতে আমাদের ঘৃণা হয়। এত মনুষ্যত্ব-বর্জ্জিত চিত্র বড়ই অস্বাভাবিক—অন্ততঃ হিন্দুর চক্ষে! এরূপ চিত্র গ্রন্থকার জন-সমাজে না আঁকিলেই ভাল করিতেন। এতদ্ভিন্ন, অবিনাশের প্রতি বারাঙ্গনার প্রেম ও সম্পত্তি-দান—এও বড় কুশিক্ষা-মূলক। বিশেষতঃ এ ঘটনা-কএকটিকে পুস্তক হইতে বাদ দিলেও পুস্তকের কোন অঙ্গহীন হইত না, বোধ হইল।

গ্রন্থকার এইরূপ আরও অনেকগুলি চরিত্রকে গ্রন্থে অকারণ স্থান দিয়াছেন; তাহাদিগকেও না আনিলে, তাঁহার উদ্দেশ্যের যেন কোন ব্যাঘাতই ঘটিত না! আর, এই জন্যই, গ্রন্থখানি পাঠ করিবার সময়, অনেক স্থলে চেষ্টা করিয়া, চরিত্র চিনিয়া লইতে হইয়াছে। দুইটি পরিবারের সকলকেই না আনাইলে, বোধ হয়, ভাল হইত। আরও গ্রন্থকারের একটী মহৎ দোষ দেখা গেল যে, যে-সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা নাই, তিনি সেরূপ দুই একটী বিষয়ের অবতারণা করিয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছেন। আর, সেই জন্যই বোধ হইল, তিনি সহরের চিত্র যেমন আঁকিয়াছেন, পল্লী-গ্রামের চিত্র কিন্তু তেমন আঁকিতে পারেন নাই—বিশেষতঃ তারকেশ্বরের-মাঠের ডাকাতির বিবরণ।

এইরূপ কতকগুলি ত্রুটি-সত্ত্বেও মোটের উপর গ্রন্থখানি কিন্তু ভালই হইয়াছে। তাঁহার প্রধান চিত্র ভুবন ও মোহিনী দু'টিই প্রস্ফুটিত বটে! বড় বউ ও শান্তিময়ীও ঐরূপ। ময়রাণী দিদি প্রকৃতই পরোপকারিণী বটেন। তবে তাঁহাতে স্বর্ণলতার শ্যামার যেন যৎকিঞ্চিৎ ছায়া পড়িয়াছে বলিয়া বোধ হইল—বিশেষতঃ তৃতীয় পরিচ্ছেদটিতে। তারপর, মোহিনীমোহনের গুরুদেবটিকেও গ্রন্থকার মিলায়েছেন, ঠিক। গুরুর হৃদয় তো ঐরূপই অমায়িক হওয়া চাই! বিশেষতঃ পঞ্চম পরিচ্ছেদের শেষ অংশের,—"তবে ভাই, তুমি আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা কইছিলে! আচ্ছা, এর জরিমানা-স্বরূপ তুমি আমার মাথা থেকে দশগাছা পাকা চুল তুলে দেও।"—এটী বড়ই স্বাভাবিক। এ চিত্র একদিন রবি বাবুর সেই 'বসন্তরায়ে' দেখিয়াছিলাম; আর যেন এই-ই দেখিলাম। অল্পের মধ্যে গ্রন্থকারের একটু বেশ!

তারপর গ্রন্থকারের বসন্তকুমার!—ভুবন ও মোহিনীর চরিত্র যেমন বিপরীত, ভুবন-পুত্র যোগেন্দ্র এবং মোহিনীর পুত্র বসন্তকুমারও ঠিক সেইরূপ। মোহিনীর যেমন জ্যেষ্ঠ-গত প্রাণ, বসন্তেরও আবার তেমনিই জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র যোগেন্দ্র-গত প্রাণ! যোগেন্দ্রের অপরাধে বসন্ত পুলিশে পর্য্যন্ত আত্মসমর্পণ করেন। এরূপ সারল্য বড়ই সুন্দর। জীবন তো এরূপেই গঠিত করা চাই। ফলতঃ গ্রন্থখানিতে পাপের যে শাস্তি, সংসার-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পারিলেই, ধার্ম্মিকের যে শান্তি, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। মোটের উপর এ বর্ণনায় আমরাও সুখী বটে। এখন, বিশেষ সতর্ক-

তার সহিত উপস্থিত দোষগুলিকে গ্রন্থকার পরিহার করেন, এই বাসনা। আমরা তাঁহার সর্ব্বোন্নতি কামনা করি।

শেষ কথা, বসন্তকুমার-সম্বন্ধে বলিবার আরও অনেক কথা ছিল। কিন্তু তত স্থান ও সুবিধা না পাওয়ায় বড়ই ক্ষুব্ধ-চিত্তে এই খানেই আমরা ইহার উপসংহার করিলাম। আর, এই অভাবেই অনেকানেক সুন্দর পুস্তকের প্রাপ্তি-স্বীকার-মাত্রতেই আমাদিগকে পরিতৃপ্ত হইতে হয়।

মতামত।

পুস্তক-সম্বন্ধে।

সিন্দুরবিন্দু।—বাবু সুরেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত প্রণীত। এখানি একখানি ক্ষুদ্র উপন্যাস; গ্রন্থকার বলেন, 'প্রকৃত ঘটনামূলক।' ঘটনা প্রকৃত হউক অথবা কাল্পনিক হউক, উপন্যাস লেখায়, তাহাতে কিছু আসে-যায় না। বরং কল্পিত চরিত্রে যদি স্বাভাবিকত্ব বর্ত্তে, ও সে স্বাভাবিকত্বে শিক্ষার বিষয় কিছু থাকে, তবে তাহাতেই লেখকের বাহাদুরী। নতুবা প্রকৃত হইলেও, অস্বাভাবিকত্ব যাহাতে পূর্ণরূপে বিদ্যমান—বিশেষ যাহা সম্পূর্ণ কুশিক্ষার পরিচায়ক—সেরূপ চিত্র কখনও বাঞ্ছনীয় নহে। আর, সেই জন্যই, লেখকের যত লিপি-চাতুর্য্যই থাকুক না কেন, আমরা এ 'সিন্দুরবিন্দুতে' সুখী হই নাই। সুখ্যাতি করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াও, গ্রন্থকার মাপ করিবেন, তাঁহার নিন্দা করিতে হইতেছে! প্রথমতঃ তাঁহার যে উদ্দেশ্য, তাহা অতি নীচ। দ্বিতীয়তঃ সে উদ্দেশ্যও তিনি আবার বজায় রাখিতে পারেন নাই। বেশ্যার কুহকে পড়িয়া লম্পট বেহারী সর্ব্বস্বান্ত হইল; আর গ্রন্থকার কি না তাহার সাফাই গাহিয়া বলিলেন,—"পাছে বেহারী অসুখী হয়, এইজন্য ইদানীন্তন 'নিজের অনিচ্ছা-সত্ত্বেও' বিহারী যখন যাহা খরচ করিয়াছে, তাহাতে রাগ না করিয়া 'হাস্যমুখে' অনুমোদন করিয়াছে।" এইখানেই, গ্রন্থকার কি বুঝেন নাই, সত্য বাহির হইয়া পড়িয়াছে; তিনি যাহা দেখাইবেন বলিয়া আস্ফালন করিয়াছেন, তাহাও বৃথা হইয়াছে! ফলতঃ জোর করিয়া অঘটন ঘটাইতে গিয়া—বেশ্যা সতীতুল্যা আর লম্পট প্রেমিক, এ চিত্র আঁকিতে প্রয়াস পাইয়া—গ্রন্থকার যেমন নীতির মস্তকে পদাঘাত করিয়াছেন, তেমনই অকৃতকার্য্যও হইয়াছেন! অধিকন্তু, তাঁহার ভাষা-ভাবের পরিচয়ও, উদ্ধৃত অংশ হইতেই, পাঠক লউন।

ধ্যানাবলী।—বাবু বরদাপ্রসাদ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এখানিতে অনেকগুলি হিন্দু দেব-দেবীর ধ্যান, মূল ও বঙ্গানুবাদ-সহ, প্রকাশিত আছে। সুতরাং বলা বাহুল্য, নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া-কলাপে যাঁহাদের আনুরক্তি আছে, তাঁহারা অবশ্যই ইহা পাইয়া সুখী হইবেন। তবে আরও সুখী হইতেন, যদি ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে পূজাপদ্ধতিও লিখিত থাকিত। পুস্তকখানির ছাপা ও কাগজ ভাল।

মহাভারত।—(নাট্যকাব্য)। বাবু প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মহাভারত গদ্যে-পদ্যে অনেকে অনেক প্রকারেই অনুবাদিত করিয়াছেন; কিন্তু এ অনুবাদ স্বতন্ত্র প্রকারের। প্রফুল্ল বাবু সমগ্র মহাভারতখানিকে নাটকাকারে অনুস্যূত করিতেছেন। তন্মধ্যে আমরা পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ, শকুন্তলা প্রভৃতি কএকখানি খণ্ড-পুস্তক উপহার পাইয়াছি। লেখকের উদ্যম-উৎসাহ প্রশংসনীয়, লিখন-প্রণালীও অনেক স্থলে সুন্দর। সুবিধা হইলে, সময়ান্তরে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিবার বাসনা রহিল। তবে উপসংহারে বক্তব্য এই যে, মহাভারত এক বিরাট ব্যাপার, এবং উহা শেষ করাও বহু অর্থ ও সময় সাপেক্ষ; আমরা ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে

প্রার্থনা করি, প্রফুল্লবাবু দীর্ঘজীবি হইয়া তাঁহার সাধের মহাভারত সম্পন্ন করুন।

বিজন-সঙ্গীত।—ষ্টানহোপ প্রেস হইতে মুদ্রিত। এখানি একখানি ক্ষুদ্র কবিতা-গ্রন্থ। গ্রন্থখানির ছাপা ও কাগজ পরিস্কার। সুতরাং প্রথমতঃ ইহা হাতে পড়িলেই তৃপ্ত হইতে হয়। তারপর, লিখন-প্রণালীও আবার সুন্দর! কবিতাগুলি পড়িয়া অনেক স্থলেই আমরা সুখী হইয়াছি।

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

এচ, সি, দাস এণ্ড কোম্পানী

এই নাম দিয়া, আজকালও আবার কোন কোন কাগজে ৯নং কলেজষ্ট্রীট বাইলেন ঠিকানা হইতে এবং কোন কোন কাগজে ১-১নং কলেজ স্কয়ার ঠিকানা দিয়া, নানা চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছে। অথচ আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, আজিও উক্ত কোন ঠিকানাতেই 'এচ, সি, দাস এণ্ড কোম্পানীর' কেমিক্যাল সোনা ও অঙ্গুরী প্রভৃতির কোন দোকান দেখিতে পাই না! কলেজ বাই-লেনে তো কেমিক্যাল সোনার দোকান একেবারেই নাই; তবে কলেজ স্কয়ারের নিকট (৭১ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট বলিয়া যাহার ডাক শুনিয়া থাকি) শুদ্ধ "দাস এণ্ড কোম্পানী" এই নামের একখানি-মাত্র দোকান আছে। কই, তদ্ভিন্ন আর তো কোন দোকান আমাদের চর্ম্ম-চক্ষে পতিত হয় না! এরূপ করিয়া—ভিন্ন ভিন্ন ঠিকানার ভিন্ন ভিন্ন দোকান বলিয়া পরিচয় দিয়া, অথচ কোথাকার সেই একই কোণে বসিয়া, এরূপ কার্য্য কি সদোচিত কার্য্য? যাইহোক, আমরা সাধারণকে আবারও সতর্ক করিতেছি যে, সাধারণে সাবধান! উক্ত ঠিকানায় উক্ত দোকান নাই—প্রতারিত হইলে প্রতারকের সন্ধানও হয় তো মিলিবে না!

কে সি দাস এণ্ড কোং

এই নামে কখনও ৭নং হাড়কাটা গলির, কখনও বা মৃজাপুর ষ্ট্রীটের ঠিকানা দিয়া, ঐরূপ নানা বিজ্ঞাপন বাহির হয়। অথচ পাঠকগণ শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন যে, কোন প্রতারিত ব্যক্তির টাকা আদায় করিতে গিয়া আমাদের লোকে উঁহাদের সন্ধানই পাইলেন না—দোকান তো পরের কথা!

এই বা কি?

বহরমপুরের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় সানুবাদ 'শ্রীমদ্ভাগবত' প্রকাশের বিজ্ঞাপন বাহির করেন। তাহাতে অনেক বোল-চালের মধ্যে লেখা থাকে,—"শ্রীল শ্রীযুক্ত ত্রিপুরেশ্বরের অর্থসাহায্যে ইহা প্রকাশিত হইতেছে।" সুতরাং 'রাজার সাহায্যে অবশ্যই পুস্তক সম্পন্ন হইবে'—বিবেচনায়, অনেকেই উক্ত পুস্তকের গ্রাহক হয়েন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, অগ্রিম মূল্য জমা দিয়াও, এখন অনেকে পুস্তক পাইতেছেন না। আমরা বিদ্যারত্ন মহাশয়ের এরূপ কার্য্যে বড়ই ক্ষুব্ধ হইলাম। বিশেষতঃ ত্রিপুরেশ্বরেরও ইহাতে দোষ বর্ত্তিতেছে। তিনি যদি প্রকৃতই সাহায্যকারী ছিলেন এমন হয়, তবে উহা সম্পন্ন না করা অথবা লোকের উহা না পাওয়া কি ভাল!. যাইহোক, আমরা অভিযোগের প্রতিবিধানের আশা করি।

পুস্তকের দাম-কমানর লোভ।

বটতলার পুস্তকগুলিতে একটাকা দাম লেখা থাকিলে দুই আনায়, চারি আনা লেখা থাকিলে এক পয়সাতেও, সচরাচরই পাওয়া যায়। কিন্তু আজকাল কএকজন বটতলার পুস্তক-বিক্রেতা সেই সকল পুস্তক লইয়াই এক এক খেলা খেলিয়া থাকেন। একখানি ১৷৷০ দেড় টাকা দামের পুস্তকের সঙ্গে ৫৲ টাকার পুস্তক উপহার—এই যে লোভানি, এও ঐ সকল খেলার এক অঙ্গ। অর্থাৎ যে পুস্তক-

খানি ৵০ বা ।০ চারি আনায় বিক্রয় হয়, অথচ যাহার দাম লেখা ১৷৷০ দেড় টাকা, সেইরূপ একখানি পুস্তকের সহিত ৫৲ পাঁচ টাকা দাম-লেখা কিন্তু ঐরূপই দু'আনা দশ পয়সা দামে বিক্রেয় পুস্তক দিয়া, তাহারা একএকটী সেট প্রস্তুত করে। এবং বিজ্ঞাপন লিখিবার সময় লেখে,—১৷৷০ টাকা দিলে দেড় টাকার 'অমুক' পুস্তক-খানি তো দিবই; অধিকন্তু উহার সহিত পাঁচ টাকার পুস্তক উপহার! কাজেই অল্পবুদ্ধি গ্রাহকও লোভে পড়িয়া তাহাতে মজেন; এবং কোন সৎ-বিক্রেতার হস্তে কিনিবার ভার দিলে আট বা দশ আনায় যাহা কিনিয়া পাইতেন, সেইস্থলে ১৷৷০ দেড় টাকা দিয়া, উপহার ওরফে ভিক্ষা-স্বরূপ, তাহাই পাইলেন। একটী আদটী নহে—'বঙ্গবাসী' সংবাদ পত্র খুলিলে, এইরূপ বিজ্ঞাপনই বিস্তর দেখা যাইবে। এবার স্থানাভাব। সময়ান্তরে তাহার এক একটীর নাম-ঠিকানা ও বিস্তারিত পরিচয় পাঠকগণকে জানাইতে বাসনা রহিল। তখন সকলে দেখিবেন একবার, এ উপায়েও কত অধিক জুয়াচুরী চলিয়া যাইতেছে।

সংবাদ।

চুরী, জুয়াচুরী, জাল ও খুন।

—বিধুভূষণ ঘোষ নামক এক ছোকরা কিছুদিন পূর্ব্বে 'শান্তি' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক বলিয়া পরিচয় দিত। এক্ষণে সে এক বড়ই জালিয়াতে পড়িয়াছে। রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ নামীয় তাহার কোন দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়ের সেভিংস্ ব্যাঙ্কে পাঁচশত টাকা জমা ছিল। বিধু কৌশলে সেই সেভিং-ব্যাঙ্কের খাতাখানি চুরী করিয়া, ইতিপূর্ব্বে একদিন ডাকঘর হইতে জালসহি করিয়া একশত টাকা বাহির করিয়া লয়; এবং সেদিন আবার আরও দুইশত টাকা লইতে যায়। দ্বিতীয় দিন টাকা লইতে গিয়া বিধু কিন্তু ধরা পড়িয়াছে। সে এখন বিচারাধীন; সম্ভবতঃ গুরুদণ্ডই পাইবে।

—সম্প্রতি এক চুড়িওয়ালি চুড়ি-বিক্রয় করিতে গিয়া গরিফা-গ্রামে এক বড়ই কাণ্ড বাধাইয়া বসিয়াছে। যে বাড়ীতে সে চুড়ি বেচিতে যায়, সেই বাড়ীর একটী ছোট মেয়ের গায়ে কএকখানি রূপার গহনা ছিল; মেয়েটিকে নির্জ্জনে পাইয়া সে প্রথমে এই লোভ দেখাইল যে, সে যদি তাহার সঙ্গে অপর এক নিকটস্থ গ্রামে যায়, তবে রূপার বদলে চুড়িওয়ালী তাহাকে সোণার গহনা দিবে। মেয়েটিও কিন্তু বুঝিল তাই; পিতামাতাকে লুকাইয়া সে সেই চুড়িওয়ালীর সঙ্গেই চলিল। এইরূপে যত্নের সহিত গ্রামের বাহির করিয়া,—"এই আর একটু যাইলেই গহনা দিব" বলিয়া ভুলাইতে ভুলাইতে, মেয়েটিকে ক্রমে সে কলিকাতায় আনিয়া হাজির করে; বদলাইয়া দিবে বলিয়া তাহার গায়ের গহনাগুলি খুলিয়া লয়। তাহার পরও অধিকন্তু অভাগীকে সে আবার এক বেশ্যার নিকট বিক্রয় করিয়াছিল। এখন পুলিশ সন্ধানে সকল বাহির করিয়াছেন। মেয়েটী উদ্ধার পাইয়াছে।

—চিৎপুর রোডে এক মাড়োয়ারী একটি পুঁটুলি কুড়াইয়া পায়; এবং খুলিয়া দেখে, তাহার ভিতর একছড়া সোণার মালা। সে অমনি আস্তে আস্তে তাহা পকেটজাত করে। এমন সময়, তাকে তাকে থাকিয়া, দুইজন লোক হঠাৎ তাহাকে চোর বলিয়া ধরিল; বলিল,—"বেটা কাহার জিনিস চুরী করিয়াছিস্?—ডাকিব পাহারওয়ালা? যদি আমাদের কিছু ভাগ না দিস্, তবে তোকে ধরাইয়া দিই!" মাড়োয়ারী তো অবাক! যাইহোক, অনেক ওজর-আপত্তির পর তাহাকে কিন্তু ভুলিতে হইল। সে তখন অনেক করিয়াতাহাদের হাতে ধরিয়া, আপনার কান হইতে দুইটী সোণার মাকড়ী খুলিয়া তাহাদিগকে দিল। তাহারা চলিয়া গেল। কিন্তু আশ্চর্য্য, ইহার পরই মাড়োয়ারী যাচাইয়া দেখে, সে মালা পিতলের—জুয়াচোরগণ তাহাকে ঠকাইয়াছে।

—কলিকাতাতেও চোরের উৎপাৎ কম নহে! উল্টাডিঙ্গিতে সে দিন ভয়ঙ্কর চুরী হইয়া গিয়াছে। ঠনঠনিয়ার কালিদাস কর্ম্মকারের দোকান হইতেও অনেক টাকার দ্রব্য চুরী গিয়াছে।

—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শ্যামপুকুর ব্রাঞ্চ-স্কুলের একটী ছাত্র অপর এক বালকের পুস্তক চুরী করে। বিচারে তাহার ছয় মাসের মেয়াদ হইয়াছে।

—চোরের উচিত শাস্তি এ অপেক্ষা আর কি হইতে পারে? এক ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ কলিকাতার বড়বাজার দিয়া যাইতেছিলেন। কতকগুলা জুয়াচোর তাঁহাকে ঠকাইবার বড়ই এক ফন্দি খাটাইল; তাঁহাকে চুপি চুপি বলিল,—"মশায়, ভাল ছুরি-কাঁচি—বিলাতী জিনিষ—সস্তায় যায়! আমরা চুরী করিয়া ইহা আনিয়াছি; যৎকিঞ্চিৎ পাইলেই ছাড়িতে পারি।" ব্রাহ্মণ কাজেই লোভে পড়িলেন। কয়েকটী টাকা দিয়া তিনি সেগুলি কিনিলেন; আশা, অনেক লাভ করিবেন! কিন্তু বাড়ী গিয়াই দেখেন, সবই বৃথা—খেলো জিনিষ ভাল বলিয়া আহারা তাঁহাকে ঠকাইয়াছে। ভট্টাচার্য্য কাজেই তখন বড়ই চটিলেন; প্রবঞ্চকদিগকে জব্দ করা তখন

তাঁহার সঙ্কল্প হইল। অতঃপর জুয়াচোরগণ যেখানে লোক ঠকাইবার চেষ্টা পাইতে লাগিল, তিনিও সেইখানে আসিয়া সকলকে "সাবধান—সাবধান—ইহারা জুয়াচোর—আমায় ঠকাইয়াছে" বলিয়া চেঁচাইতে লাগিলেন। কাজেই চোর ব্যাচারীদের বড়ই বিপদ। অধিক কি, পরে তাহারা ব্রাহ্মণের পায়ে ধরিয়া টাকা কয়টী ফেরত দিয়া তবে নিস্তার পায়!

—বড়লাটের সিমলার রাজভবন হইতে বহুতর টাকা-কড়ি চুরী গিয়াছে। ছয় সহস্র টাকা-সহ একজন এখন ধৃত। অপরের সন্ধান হয় নাই।

—উল্‌টাডিঙ্গির একজনের বালিকা-স্ত্রী মাতুলালয়ে পলাইয়া যায়; ও তাহার মাতুল তাহাকে আবার শ্বশুর বাড়ীতে রাখিয়া আসেন। এই অপরাধে, তাহার স্বামী তাহার পেটে এরূপ গুরুতর আঘাত করে যে, তাহাতেই অভাগিনীর মৃত্যু হয়। হতভাগ্য শেষে পত্নীর লাশ জ্বালাইতে গিয়াই কিন্তু ধরা পড়িয়াছে!

—আম্বালার গির্জ্জা হইতে লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিয়া বিস্তর টাকার দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে।

—'আকতাপ্ পাঞ্জাব' নামক পাঞ্জাবের কোন সংবাদ-পত্র সম্পাদক, সোণা তৈয়ারী করিতে শিখিবেন—এই লোভে, একজন অবধৌতিককে একহাজার টাকা প্রদান করেন। কিন্তু সে এখন চম্পট দিয়াছে!

বিবিধ।

—ড্রেসডেনের এক ঘড়ীওয়ালা কাগজের ঘড়ি প্রস্তুত করিয়াছে। সাধারণ ঘড়ির মত সে ঘড়িও নাকি ব্যবহার করা যায়।

—এলাহাবাদের কোন পুলিশ-প্রভু কতকগুলি কনেষ্টেবোলকে একখানি গাড়িতে জুড়িয়া বিলাসিনী সুন্দরীদিগকে তাহাতে চড়াইয়া, সাধ মিটাইয়াছিলেন। পত্রান্তরে এই এক নূতন কথা দেখিলাম।

—গত ৩৪ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান যুদ্ধে বাইশ ক্রোড় পঁয়ত্রিশ লাখ মহাপ্রাণী (মানুষ) মারা গিয়াছে। ইহা অপেক্ষা ভয়ঙ্কর মহামারী আর কি হইতে পারে? ডাক্তার আর্ণেষ্ট এঞ্জেল এইরূপ তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন।

—যে সকল বালক ফাকি দিয়া—প্রতারণা করিয়া, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করে, চীন-গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগের গলা কাটিবার হুকুম দিয়াছেন।

—সেদিন পারিসে এক সুন্দরীর হাট বসিয়াছিল। হাটে ইংরেজ, ফরাসী, আমেরিকান প্রভৃতি অনেক শ্রেণীর স্ত্রীই হাজির ছিলেন। কিন্তু তন্মধ্যে একজন ফরাসী, একজন ইংরাজ ও একজন মুসলমান-মহিলাই নাকি সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা বলিয়া হাট-গুলজার করেন। হাটে কেনা-বেচা তো হয় নাই!

—আমাদের মহারাণীর জ্যেষ্ঠ পৌত্র—আমাদিগের ভাবী অধিপতি প্রিন্স ভিক্টর সম্প্রতি ভারতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। গত ৯ই নবেম্বর তিনি বোম্বাই সহরে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন; এবং ইহার পর দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য প্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া, সম্ভবতঃ আগামী ৪ঠা জানুয়ারী তিনি কলিকাতায় আসিবেন। রাজপৌত্রের পদার্পণে সে সময় না জানি নগরী কতই শোভাময়ী হইবে—কলিকাতা তখন ইন্দ্রপুরী হইয়া উঠিবে। আশা, রাজ-পৌত্রের দর্শনে আমরা পরম পরিতৃপ্ত হইব।

—কলিকাতার চুনাগলির এইবার নাম পরিবর্ত্তন হইল, 'ফিয়ার ষ্ট্রীট।' তবেই বোধ হয়, পদীর বেটা এইবার পদ্মলোচন হইবে!

—ব্রহ্মের কোন এক ইংরাজ-কর্ম্মচারী অকারণ তথাকার প্রজাদিগকে মারপিট করেন। তজ্জন্য তাঁহার ৩০০ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

—ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লেখায়, গভর্ণমেণ্ট 'প্রজাবন্ধু' কাগজখানি ইংরাজ-রাজ্যে যাহাতে আর প্রচারিত হইতে না পারে, এইরূপ আদেশ করিয়াছেন। অধিকন্তু প্রজাবন্ধুর অধিকারীর শিক্ষাবিভাগে যে চাকরীটুকু ছিল, তাহাহইতেও তাঁহাকে বড়তরফ করা হইয়াছে।

—এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় এবার হইতে ১৫২টী বৃত্তি দিবার নিয়ম হইল। তন্মধ্যে ২০ টাকার বৃত্তি ১০টি, ১৫ টাকার বৃত্তি ৪৭টি এবং ১০ টাকার বৃত্তি ৯৫টি। বৃত্তি দুই বর্ষের জন্য। বৃত্তিভোগী ছাত্রকে সচ্চরিত্র হওয়া চাই। ছাত্র যদি গভর্ণমেণ্টের কলেজে পড়ে, তাহাহইলে সে কিরূপ পড়িতেছে, মধ্যে মধ্যে কলেজের প্রিন্সিপ্যাল তাহা শিক্ষাবিভাগকে জানাইবেন। আর অন্য কলেজে পড়িলে, শিক্ষাবিভাগের কোন কর্ম্মচারী আসিয়া তাহাকে পরীক্ষা করিয়া যাইবেন। এইরূপে যদি ছাত্রের কোন ত্রুটি না পাওয়া যায়, তবেই ভাল। নতুবা তাহার বৃত্তি-বন্ধ হইতেও পারে।

—এইরূপ এল, এ পরীক্ষায়ও ৫০টি বৃত্তি থাকিবে। ৫০টাকার বৃত্তি ১০টি এবং কুড়ি টাকার ৪০টি। এসম্বন্ধে অন্যান্য নিয়মও এইরূপ। এতদ্ভিন্ন, কেবলমাত্র মুসলমানদিগের জন্য ৭ টাকার ২০টি বৃত্তি থাকিবে। নিম্নবঙ্গের মুসলমানগণ যাহারা উপরোক্ত কোন বৃত্তি পাইবে, তাহার উপরও তাহাদিগকে যোগ্যতাক্রমে এই বৃত্তি দেওয়া হইবে। স্ত্রীলোকদিগের জন্যও বিশেষ বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে।

—বঙ্গদেশ হইতে খোলাভাটী তুলিয়া দিলে বার্ষিক এক কোটী টাকার অধিক রাজস্ব কমিয়া যাইবে। সেই জন্য গভর্ণমেণ্ট ক্ষতিপূরণার্থ 'শিক্ষা কর' স্থাপনের প্রস্তাব করিতেছেন।

—পৃথিবীর মধ্যে চীনদেশেই সর্ব্বপ্রথমে ব্যাঙ্ক খোলা হয়। উহার নাম ছিল, 'উড়ো টাকা' (flying money)। খৃষ্ট জন্মাইবার ২৬৯৭ বর্ষ পূর্ব্বে ঐ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়।

অনুসন্ধান।

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

৩য় খণ্ড] ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১২৯৬ সাল। [৮ম সংখ্যা।

রাগিণী বেহাগ, ভাল একতালা।

সংসার সমরে ভীষণ।
বুঝিরে রাখিতে নারিনু এবার
অমূল্য আমার জীবন রতন॥
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ আদি সবে,
সেজেছে সকলে সদলে আহবে,
মন-রথী তাহে কত স্থির রবে,
রিপু প্রহরণে ক্ষীণ অনুক্ষণ॥
চক্ষু কর্ণ আদি দশটি যে হয়,
দেহরথে যুক্ত ছিল সমুদয়,
লইল তাহারা শত্রুর আশ্রয়,
দুর্দ্দশা দেখিয়া মম;—
সর্ব্ব শক্তিমান, তোমার সন্তান,
হয়ে কি হে আজি হারাইব প্রাণ,
ছ'জনার সহ করিতে সংগ্রাম,
মুষিকের করে মরে কি বারণ॥

ভক্তের পূজাপদ্ধতি।

ভক্তের কার্য্য, অনুষ্ঠান ও আড়ম্বর-শূন্য। তিনি কার্য্যে কখনও প্রকাশ করিতে চাহেন না যে, তাঁহার আচমন-আবাহন কি প্রকার! দীর্ঘ জটাজুট-শ্মশ্রুধারী, চীর কৌপিন পরিহিত ঐ যে ভস্মবিলেপিত-অঙ্গ সন্ন্যাসী "ব্যোম ব্যোম হরে হরে" শব্দে দিঙ্মণ্ডল কম্পিত করিয়া চলিয়াছেন, অথবা ঐ যে মুণ্ডিত মুণ্ড, হরিনামাঙ্কিত-বপু, সর্ব্বথা হরিনাম-জপরত বৃদ্ধ—প্রকৃত ভক্তের মহিমা বুঝি বা উহাঁদের কাহাতেও নাই! ভক্তের ভক্তির উচ্ছ্বাস নাই, উদ্বেগ নাই, তরঙ্গ নাই—তাহা অচঞ্চল, প্রশান্ত—সদাই অন্তঃশীলা বহিয়া থাকে। বহিশ্চক্ষে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না—পার্থিব কর্ণে ভক্তের আবাহন চির অশ্রুত রহিয়া যায়। আমরা যে চক্ষে যে ভাবে, যাঁহাকে ভক্ত বলিয়া দেখি, বুঝি বা আমাদের সে চক্ষের সে দৃষ্টি চির-ভ্রান্ত!—আমরা ভ্রান্তিবশে বিপথে যাইয়া প্রতারিত!

কিরূপে ভ্রান্ত, কিরূপ প্রতারিত, যদিও সে

দৃশ্য নিত্য নিত্যই দেখিতে পাই, কিন্তু এই ক্ষোভ যে, এ পর্য্যন্ত তাহা বুঝিতে শিখিলাম না—মনে মনে সে দৃশ্য কই জাগিয়াও তো জাগে না! আমরা তো ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র—এ ভাব অনেক সময় অনেক সাধক-শ্রেষ্ঠ দেব-চরিত মহাত্মাই বুঝিতে পারেন নাই। হরি-পরায়ণ অদ্বিতীয় ভক্ত মহর্ষি নারদও একদিন, এ ভাব না বুঝিতে পারিয়া, বড়ই ক্ষোভে বলিয়াছিলেন,—"লীলাময়! তোমার লীলা, অধম আমি, কি বুঝিব!"

অর্থাৎ মহর্ষি নারদ একদিন বৈকুণ্ঠে উপনীত হইয়াই দেখিলেন, নারায়ণের আবাস-মন্দিরের পার্শ্বেই তদপেক্ষাও এক সুন্দর মন্দির নির্ম্মিত হইতেছে। তাহার নির্ম্মাণ-প্রণালী এত সুন্দর যে, তাহা দেখিয়াই মহর্ষি বুঝিলেন,—'নিশ্চিতই নারায়ণ পূর্ব্বমন্দির ত্যাগ করিয়া এখন হইতে এই নূতন মন্দিরে বাস করিবেন।' এইরূপ বুঝিয়াই, একবার নারায়ণ-সমীপে সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেও, তাঁহার বড়ই কৌতূহল জন্মিল। ভাবিলেন,—"হঠাৎ এরূপ পরিবর্ত্তনের আবশ্যক কি! প্রাচীন মন্দিরে এখনও তো সম্পূর্ণ নূতনত্ব বর্ত্তমান। তথাপি হঠাৎ তিনি কেন এরূপ পরিবর্ত্তন করিতে অগ্রসর!"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বিষ্ণুমন্দিরে উপনীত হইয়া, নারায়ণের চরণার্চ্চনার পরই, মহর্ষি অভিবাদন-পূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রভো! আপনার মন্দির-সংলগ্ন ঐ যে নব-রচিত সুন্দর মন্দিরটি দেখিতেছি, আপনি কি এখন হইতে ঐ মন্দিরেই বাস করিবেন? হঠাৎ আপনার এরূপ পরিবর্ত্তনের আবশ্যক কি!"

নারায়ণ সস্নেহে উত্তর করিলেন,—"না-না নারদ—আমার জন্য নহে। ও মন্দির আমি বাস করিব বলিয়া প্রস্তুত হয় নাই। আমার এক পরম ভক্ত কৃষক—মনে করিয়াছি, তাঁহাকেই এইখানে আনিয়া রাখিব। তাঁহার সেই অপূর্ব্ব ভক্তি দেখিয়া, তাঁহার নিকট হইতে অপরিমেয় প্রেম পাইয়া, নারদ, আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। মনে করিয়াছি, তাঁহাকে আমার যোগ্যাসনেই স্থান দিব; তাঁহার মুখে মধুর হরিনাম শুনিয়া আমি পরিতৃপ্ত হইব।"

নারায়ণের উত্তর শুনিয়াই মহর্ষি চমকিত হইলেন। সে কথা তাঁহার মনেই যেন স্থান পাইতে পারিল না। তিনি ভাবিলেন,—'ঠাকুরের এ বোধ হয় ভ্রান্তি! নহিলে মর্ত্তে এমন ভক্ত কে আছে যে, তাঁহার তুল্যাসনে স্থান পায়? এই আমরা সর্ব্বত্যাগী—সদাই হরিনাম-জপে নিমগ্ন। কিন্তু কই, ঠাকুর তো এমন একদিনও বলিলেন না,—'নারদ', তোমার জন্য এই কার্য্য করিতেছি।' যাইহোক, আমাকে একবার দেখিতে হইতেছে যে, সে ভক্ত কে?—দেখিব একবার, তাহার ভক্তি আমাদের ভক্তি অপেক্ষাও কত উচ্চ!" এইরূপ ভাবিয়াই মহর্ষি—আর একবারও প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা, দয়াময়, আপনার সে ভক্ত থাকেন কোথায়?—তাঁহার পরিচয় কি?"

ভগবান তখন সেই ভক্তের পরিচয় মহর্ষিকে প্রদান করিলেন; তাঁহার সেই ভক্ত কৃষক কোন্ গ্রামে, কোন্ স্থানে বসতি করেন, নারদ সকলই শুনিলেন। শুনিয়াই, মহর্ষি আর বৈকুণ্ঠে রহিলেন না—পুনরভিবাদন-পূর্ব্বক নারায়ণকে প্রণাম করিয়াই তিনি বৈকুণ্ঠ হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহার বাসনা, একবার দেখিবেন, সে ভক্তের ভক্তি কিরূপ—সে কিরূপ 'পূজা-পদ্ধতি' শিক্ষা করিয়া ভগবানকে মোহিত করিয়াছে!

* * *

পূর্ব্বদিক নবরাগে রঞ্জিত। অরুণ-কিরণচ্ছটা ধীরে-ধীরে পত্রে-পত্রে শাখায়-শাখায় হেলিয়া-দুলিয়া মাখিয়া যাইতেছে। প্রভাতী

পাখী সে শোভা দেখিয়া, মোহিত হইয়া, আপন প্রণয়ী-প্রণয়িণীকে আবার সে সুখভাগী করিতে, মধুর নিক্কণে আবাহন করিতেছে। দেখিতে শুনিতে এমন তৃপ্তিপ্রদ দৃশ্য বুঝি বা আর নাই! সংসার-নাট্যশালার এই মধুর দৃশ্য কি চমৎকার!

মহর্ষি নারদ এই মধুর ঊষা-সমাগমে আপন আশ্রম হইতে বহির্গত হইলেন। প্রাতে শয্যাত্যাগ করিবার পর হইতে আরম্ভ করিয়া, সন্ধ্যার পর পুনরায় শয্যায় শয়ন করিবার সময় পর্য্যন্ত, তিনি নিভৃতে সেই কৃষকের কার্য্যানুষ্ঠান দেখিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে একদিন, দুইদিন, তিনদিন, দেখিতে দেখিতে, কাটিয়া গেল। কিন্তু মহর্ষি নারদ বিন্দু-প্রমাণেও তাহাতে প্রমাণ পাইলেন না যে, সে কৃষক অনুমাত্রও ভগবদ্ভক্ত কি না! তিনি দিনান্তে একবারও দেখিতে পাইলেন না যে, কৃষক ভ্রমেও কখনও হরিনাম জপ করিতেছে। তিনি কেবল এইমাত্র দেখিলেন, কৃষক প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়াই আপন কৃষাণগণে লইয়া মাঠে হলচালনা করিতে যায়; স্নানাহারও তাহার সেই মাঠে-মাঠে। তারপর, দ্বিপ্রহরে মাঠ হইতে ফিরিয়া সে হাটে হাট-বাজার করিতে যায়। হাট-বাজার করিয়া ফিরিয়া আবার কৃষাণ-মজুরদিগের হিসাব-পত্র পরিষ্কার-করণ, দেনা-পত্রের আদান-প্রদান, পরদিনে কিরূপ কি হইবে তাহার কার্য্য-ভাগে, প্রভৃতি কার্য্যে সে ব্যস্ত থাকে। ফলতঃ মহর্ষি এক মুহূর্ত্তের জন্যও দেখিলেন না যে, কৃষক ভ্রমেও একবার হরিনাম জপ করিতেছে।

তিন দিন মহর্ষির এইরূপে অতিবাহিত হইল। তখন তাহার মন সন্দেহ-দোলায় দোলায়মান হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন,—নারায়ণ নিশ্চিতই ভ্রান্ত হইয়াছেন। নহিলে যে দিনান্তে একবারও তাঁহার পূজা করে না, সেই তাঁহার পরম ভক্ত হইবে কেন? যাইহোক, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াই, আরও দুই তিন দিন মাত্র দেখিয়াই, ভগবান-সমীপে গমন করিয়া তাঁহার ভ্রম তাঁহাকে বুঝাইবেন, অতঃপর মহর্ষির এইরূপ বাসনা জন্মিল। এখন তিনি আরও কিছু-দিন দিনরাত্রি প্রতীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন যে, কৃষক কি করে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, বরাবরই কৃষকের সেই একই ভাব! তবে বেশীর ভাগ এইটুকুমাত্র মহর্ষি সে কয়দিনে দেখিলেন যে, সন্ধ্যার পর—শয়নের সময় কৃষক একবার কেবল এইমাত্র বলে,—"হরিহে, পার কর।" এই প্রকারে ভিন্ন, আর কোন মুহূর্ত্তে, তিনি কৃষকের মুখে হরিনাম শুনিতে পাইলেন না। সুতরাং ক্রমে তাঁহার সে সন্দেহ সত্য বলিয়াই ধারণা হইল। তিনি তখন সদম্ভে একবার ভগবানের নিকট গমন করিয়া, তাঁহার ভ্রম দেখাইতে সোৎসুক হইলেন।

* * *

পরদিন দিবা দ্বিপ্রহর। মধুর অরুণ এখন প্রখর মার্ত্তণ্ডদেব! চতুর্দ্দিক তাপদগ্ধ। সেই পাখী—প্রভাতে যে তখন নবারুণ-আগমনে প্রিয়জনে সম্ভাষণ করিয়াছিল, তাহার মুখে এখন "পালাও-পালাও।" সে যেন এখন আপনার আত্মীয়স্বজনকে দূরে পলাইয়া বাঁচিতে বলিতেছে। স্নানাহ্নিক সমাপনান্তে, এই প্রখর রৌদ্রতাপে অবহেলা করিয়া, মহর্ষি বীণা বাদন করিতে করিতে ভগবান-সমীপে উপনীত হইলেন; এবং ভক্তিভরে তাঁহার চরণার্চ্চনান্তর করযোড়ে নিবেদন করিলেন,—"দেব! আপনি প্রকৃতই ভ্রমে পড়িয়াছেন। আপনি যাহাকে পরম ভক্ত বলিয়া মনে করিতেছেন, দেখিলাম, সে পরম অধার্ম্মিক—সে ভুলিয়াও একবার আপনার নাম করে না। তবে দেব! এ কেমন আপনার মহিমা যে, আপনি বলিতেছেন, সে আপনার এক অদ্বি-

তীয় ভক্ত? একি দেব, আমার সহিত ছলনা করিতেছেন? আপনার প্রতি আমার ভক্তির কি কিছু ত্রুটি হইয়াছে!"

ভগবান তখন স্নেহ-সম্ভাষে নারদকে বলিলেন,—"নারদ! আমি ভ্রমে পড়ি নাই। আচ্ছা, এখন থাক; তোমাকে আমি বুঝাইব, সে আমার কতদূর ভক্ত!"—এই বলিয়াই ভগবান তখন, কি যেন কি স্মরণ করিয়া লইলেন এই ভাব দেখাইয়া, নারদকে বলিলেন,—"নারদ! তাইতো, তোমার সহিত কথা কহিতে কহিতে আমি তো একটী বড় কাজ ভুলিয়া আসিয়াছি! আমার একজন ভক্ত ঐ নূতন মন্দিরে আমার জন্য কিঞ্চিৎ দুগ্ধ রাখিয়া গিয়াছেন! তা' যাইহোক, তুমি যদি সেই দুগ্ধ-ভাণ্ডটীকে এখন এখানে লইয়া আইস, তবে বড় ভাল হয়। নারদ, আমি বড়ই ক্ষুধিত হইয়াছি।"

ভগবদ্গত-প্রাণ নারদ ভগবানের এ আদেশে আর বিলম্ব করিতে পারেন কি? ভগবানের আদেশমাত্র তিনিও তৎক্ষণাৎ সেই নূতন মন্দিরে গমন করিলেন; এবং সত্বর সেই দুগ্ধভাণ্ড আনয়নে তৎপর হইলেন।

কিন্তু আনয়ন বড়ই অসাধ্য হইল। মহর্ষি দেখিলেন, দুগ্ধে ভাণ্ডটি সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ। হাতে তুলিলেই ভাণ্ড হইতে দুগ্ধ উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ে। যাইহোক, উপায়ান্তর নাই! —না লইয়া যাইলেই চলিবে না! বিশেষতঃ ভগবান বড়ই ক্ষুধিত হইয়া যখন আদেশ করিয়াছেন! সুতরাং মহর্ষি তখন অতি সন্তর্পণে সেই ভাণ্ডটীকে হস্তে উত্তোলন করিলেন; এবং দুই হস্তে উহা ধারণ করিয়া অতি ধীরে ধীরে ভগবান-সমীপে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অর্থাৎ তখন তাঁহার কেবল এইমাত্র দৃষ্টি রহিল, যেন দুগ্ধ উচ্ছ্বসিত হইয়া না পড়ে। এইরূপে অতি যত্নে, মুহূর্ত্তেক সময় দণ্ডেকে অতিবাহিত করিয়া, ধীরে ধীরে ক্রমে তিনি নারায়ণের নিকট আগমন করিলেন; আসিয়াই তাঁহাকে বলিলেন,—"প্রভো! একে ক্ষুদ্র ভাণ্ড, তা'য় দুগ্ধে পরিপূর্ণ। বড়ই কষ্টে আনিতে হইয়াছে। বিলম্ব হইয়াছে; কি করিব!—ক্ষমা করুন।"

নারদের এইরূপ কাতরোক্তিতে কিছুমাত্র ক্লেশ না দেখাইয়া, ভগবান তখন হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন,—"নারদ! আচ্ছা বল দেখি, এই যে সময়টি তুমি দুগ্ধ-আনয়নে অতিবাহিত করিয়াছ, ইহার মধ্যে ভ্রমেও কি তুমি একবার হরিনাম করিতে পারিয়াছ?"

নারদ বিস্মিত হইয়া উত্তর করিলেন,—"ঠাকুর! একি বলেন? আমি যদি দুগ্ধভাণ্ড লইয়া আসিবার সময় হরিনামে মন দিতাম, তবে কি এতখানিও দুগ্ধ আনিতে পারিতাম? তাহাহইলে নিশ্চিতই যে উহা সমস্তই উছলিয়া পড়িত! সেরূপ করিলে আপনি, বোধ হয়, এক বিন্দুও দুগ্ধ খাইতে পাইতেন না!"

ভগবান তখন আপনার পূর্ণমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া, মহর্ষিকে দিব্য চক্ষু প্রদান করতঃ গম্ভীর বদনে বলিতে লাগিলেন—"নারদ!—নারদ! দেখিলে—দেখিলে! এইবার একবার ভাব দেখি, ভক্তের পূজাপদ্ধতি কিরূপ অসামান্য! সামান্য এক ভাণ্ড দুগ্ধের ভার লইয়া যখন তুমি অস্থির হইলে—এত যে তুমি ভগবদ্ভক্ত তবুও এতখানি সময় পর্য্যন্ত যখন একবারও হরিনাম করিতে তোমার অবকাশ হইল না; তখন একবার ভাব দেখি কঠোর সংসার-ভার প্রপীড়িত—বহু পরিবারের প্রতিপালন-ভারে অস্থিচর্ম্মসার, অথচ ভিখারী সেই দরিদ্র কৃষক কি করিয়া কেবল আমায় ডাকিবে? বিন্দু পরিমাণ দুগ্ধের ভার প্রদান করায় তুমি হেন আমার প্রধান ভক্ত যখন আমায় বিস্মিত হইতে পারিলে, তখন বল-বল, বল দেখি, এত গুরু ভার তাহার মস্তকে রাখাতেও সে যে আমায় একেবারে

ভুলে নাই, এই কি আশ্চর্য্য নহে? নারদ! তুমি এত জ্ঞানী, এত ভক্ত; তবুও তুমি আমার সে ভক্তকে চিনিতে পারিলে না! সে যে সেই দিনান্তে একবার "হরি, আমায় পার কর' বলিয়া ডাকে, সেই তাহার পক্ষে তাই কি যথেষ্ট নহে! তাহার সে প্রাণের ডাকা-শুনিয়া—তাহার সে সভক্তি ক্রন্দনে, বল দেখি, মন বিগলিত হয় কি না? তোমাদের সময় আছে, সামার্থ্য আছে, উপায় আছে; তবুও তোমরা একএকবার আমায় ভুলিয়া যাও; কিন্তু আহা সে!—সে তো কই এত যন্ত্রণা পাইয়াও আমায় ভুলে নাই! নারদ! তুমি কি জান না, এই প্রলোভনময় সংসারে থাকিয়াও প্রলোভনে না মজিয়া—অচঞ্চল স্থিরভাবে, যে আমায় একবারও ডাকিবার সময় করিয়া লয়, সে কি ধন্য নহে? নারদ! তুমি কি আরও জান না যে, মুখের ডাকা ডাকা নহে, প্রাণের ডাকাই ডাকা! বাহ্য আবরণ ভক্তের পরিচায়ক যদি হইত, তবে কি নারদ, এত যোগী-সন্ন্যাসী থাকিতে ঐ লোকঋণ্য কৃষক আমার আদরের পাত্র হইতে পারিত? তাই আরও বলি নারদ, সংসারের এত প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়াও, এত গুরুভার বহনের ক্লেশ সহিয়াও যিনি অচঞ্চল—উদ্বেগ-শূন্য, অথচ আমার ভক্ত, তিনিই আমার কৃপার পাত্র। নারদ! জানিও, 'ভক্তের পূজা পদ্ধতি' কিছুই নাই। বাহ্য আবরণে কেহ ভক্ত হইতে পারে না!"

ভগবানের এই উপদেশ শুনিয়া এতক্ষণে মহর্ষির চমক ভাঙ্গিল। তিনি অনুতপ্ত হৃদয়ে শ্রীহরির চরণে পতিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"লীলাময়, অধম আমি, তোমার লীলার মহিমা কি বুঝিব?"

ঠগী-কাহিনী।*

(ঠগের নিজের মুখে শুনিয়া)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"কে বলে আমাদের দেশ হইতে বীরত্ব লোপ পাইয়াছে, বীর-প্রসবিনী ভারত মাতা বীর প্রসব করিতে বিরত হইয়াছেন? কে বলে, আমাদের সাহস নাই, বীর্য্য নাই, সহিষ্ণুতা নাই?" —তান্তিয়া ভীল।

'পিতার নিকট সমস্ত কথা শুনিয়া আমার এত দিবসের চিন্তা দূর হইল; মন পরম আনন্দে আনন্দিত হইয়া পিতৃধর্ম্ম-পথে সবেগে ধাবমান হইল। তাহার উপর হোসেনের হৃদয়-মুগ্ধকারী যুক্তি, উপদেশ ও পরামর্শ পাইয়া হৃদয় আরও আনন্দে টলমল করিতে লাগিল। আকস্মিক আমার মনের গতির এতদূর পরিবর্ত্তন হইল দেখিয়া, পিতা অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন; হোসেনও মনে মনে হাসিলেন। তথাপি এই নবধর্ম্ম-সম্বন্ধে তাঁহারা নিত্য নিত্য নানা-প্রকার হৃদয়মুগ্ধকারী উপদেশ প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন না। আমার হৃদয়ে এই নব ধর্ম্মের ভিত্তি ক্রমেই সুদৃঢ় হইতে লাগিল।

"এই ঘটনার অতি অল্প দিবস পরেই আমাদিগের গ্রামের ভিতর একটী ব্যাঘ্র প্রবেশ করিয়া দুই তিন দিবসের মধ্যেই

---

* টেলর সাহেব (Taylor) সাহেব প্রণীত 'ঠগীর আত্মকাহিনী' (Confession of a Thug) নামক প্রসিদ্ধ ইংরাজী পুস্তকের নাম বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। এবং যিনিই তাহার পরিচয় শুনিয়াছেন, তাঁহাকেই তাহা পড়িবার জন্য ব্যগ্র দেখিতে পাই। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, উক্ত পুস্তক একরূপ অপ্রাপ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; এবং যদিও বা কোথাও এক আধখানি পাওয়া যায়, তবে ইংরাজীতে লিখিত বলিয়া বাঙ্গালাভিজ্ঞ পাঠক তাহাতে তৃপ্তি পান না। আর, সেই জন্য, 'অনুসন্ধানের' অনেক পাঠক পূর্ব্বাপরই আমাদিগকে তাহার অনুবাদ প্রকাশ করিতে বলিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে, বোধ হয় বলা বাহুল্য, তদনুযায়ীই আমাদের এই 'ঠগী-কাহিনীর' অবতারণা। টেলর সাহেব প্রণীত সেই প্রসিদ্ধ পুস্তকের মর্ম্মমাত্র সংক্ষেপে অনুবাদিত হইয়া, কোন প্রসিদ্ধ লেখক কর্ত্তৃক, এই প্রবন্ধে লিখিত হইতেছে।

গ্রামকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল; আজ একটী গাভী, কাল একটী বৃষ, পরশ্য একটী মনুষ্য প্রভৃতি হত্যা করিয়া তাহার জঠরানল পরিতৃপ্ত করিতে আরম্ভ করিল। তাহার ভয়ে গ্রামস্থ সমস্ত লোক একেবারে নিতান্ত ভীত হইয়া পড়িল। আপন আপন গরু বাছুর ও প্রাণ লইয়া সকলেই নিতান্ত অস্থির হইতে হইল। যে সময় আমাদিগের গ্রামে ব্যাঘ্রের এইরূপ ভয়ানক উপদ্রব উপস্থিত হয়, সেই সময়ে গ্রামের 'পেটেল' বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন না; কোন কার্য্য-উপলক্ষে তিনি স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন। এক দিবস সন্ধ্যার পর, তিনি আপন বাড়িতে আসিবার কালীন, পথিমধ্যে সেই ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া সাংঘাতিক রূপে আহত হইলেন ও পরিশেষে তাহার পর দিবস ইহ-জীবন পরিত্যাগ করিলেন। গ্রামের মুখপাত্র সেই পেটেলের মৃত্যুতে গ্রামের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল; সকলের মনে আরও ভয় ও ভাবনা যুগপথ আসিয়া উপনীত হইল।

"তাহার পরদিবস গ্রামস্থ সমস্ত লোক একস্থানে সমাবেত হইয়া, কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে এই বিপদ হইতে উদ্ধার হওয়া যায় তাহারই মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে অনেক তর্ক বিতর্কের পর ইহাই স্থিরীকৃত হইল যে, গ্রামস্থ সমস্ত সাহসী ও বলশালী লোক, অস্ত্র-সস্ত্রে সুসজ্জিত ও একত্রে মিলিত হইয়া, সেই ব্যাঘ্রকে অনুসন্ধান পূর্ব্বক হত্যা করিবে। এই উপায় ভিন্ন এ বিপদ হইতে গ্রামকে উদ্ধার করার আর কোন উপাই নাই। এই প্রস্তাব স্থিরীকৃত হইলে গ্রামস্থ সমস্ত লোকই অস্ত্র-সস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সেই স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন।

"এই সময় আমাদিগের গ্রামে একজন পাঠান বাস করিতেন। বিশেষ পরাক্রমশালী লোক বলিয়া তিনি সকলের নিকটই পরিচিত ছিলেন। তিনিই এই দলের নেতৃত্য পদ গ্রহণ করিলেন। খাঁ সাহেব যেরূপ অস্ত্র-সস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আগমন করিলেন, তাহা দেখিয়া সকলেরই মন যেন কেমন একটু হইল। পিতা কিন্তু তাঁহার মনের ভাব গোপন করিতে না পারিয়া কহিলেন,—"খাঁ সাহেব, আপনি দেখিতেছি প্রকৃতই বীর-বেশে সজ্জিত হইয়াছেন; আপনার কোমর-বন্ধে দেখিতেছি বড় বড় দুইখানি তরবারি মৃত্তিকায় ঠেকিয়া ঝুলিতেছে। তাহার ভিতর আবার মধ্যে মধ্যে কয়েকখানি ছোরা-ছুরি বিদ্যমান রহিয়াছে। পৃষ্ঠদেশে একখানি প্রকাণ্ড ঢাল, বামস্কন্ধে গুলি বারুদ বোঝাই একটী তোজদান, বাম হস্তে একটী আগুন দেওয়া একনলা বন্দুক ও দক্ষিণ হস্তে একটী প্রজ্জ্বলিত পলিতা। এতগুলি অস্ত্র লইয়া আপনি কি প্রকারে গমন করিবেন, জানি না। আর যদি সেই স্থান হইতে পলায়ন করিতেই হয়, তাহা হইলেই বা কিরূপে দৌড়াইবেন, বুঝিতে পারিতেছি না।'

"পিতার এই কথা শুনিয়া খাঁ সাহেব অতিশয় কুপিত হইলেন, ও কহিলেন।—"ইসমাইল সাহেব, তোমার দেখিতেছি বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পাইয়াছে! তুমি কি কখন শুনিয়াছ যে দিলদার খাঁ তাহার বিপক্ষ পক্ষীয় কাহাকে কখন পৃষ্ঠ দেখাইয়াছে? এই সকল অস্ত্রের গুণ তুমি কি জান? যদি কখনও চক্ষে আমার পরাক্রম দেখিতে পাও, তবেই বুঝিতে পারিবে যে, এতগুলি অস্ত্র আমি কেন বহন করিয়া থাকি।' দিলদার খাঁ এইরূপ আরও কত কথা বলিলেন, আপনার বীরত্ব-সূচক আরও কত প্রমাণ প্রয়োগ প্রদান করিলেন।

"পরিশেষে সকলে সেই ব্যাঘ্রের উদ্দেশে গ্রামের বহির্ভাগস্থিত জঙ্গলাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। একটী জঙ্গলের নিকট গমন করিবামাত্রই সকলে দেখিতে পাইলেন যে, সেইস্থানে অস্থি ও মনুষ্যের ব্যবহার-উপযোগী ছিন্ন বস্ত্র-সকল পড়িয়া রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া তখন সকলেই স্থির করিলেন, যে ব্যাঘ্র ইহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে আছে। এই চিহ্ন-দৃষ্টে সকলেই অতিশয় উৎসাহান্বিত হইয়া সেই জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিতে লাগিলেন,। সকলেরই মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে—সকলেরই কত আনন্দ! কিন্তু কেবল দিলদার খাঁকেই যেন কেমন কেমন বোধ হইতে লাগিল; তাঁহার হস্তস্থিত বন্দুক যেন কাঁপিতে লাগিল। তিনি সকলের অগ্রে ছিলেন, ক্রমে সকলের পশ্চাৎ পদ হইলেন; ও সকলকে কহিলেন,—"তোমরা সকলে জঙ্গলের ভিতর গমন করিয়া সেই ব্যাঘ্রের অন্বেষণ কর। যদি দেখিতেপাও, তাহা হইলে আমাকে সংবাদ প্রদানকরিও—আমি গিয়া আমার এই বন্দুকের দ্বারা তাহাকে আহত করিব, পরিশেষে এই তরবারির দ্বারা তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিব। আমি এই স্থানেই অবস্থিতি করি। কারণ, তোমরা জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিলে ব্যাঘ্র নিয়শ্চই এই দিকে আগমন করিবে আর তখন, আমি ভিন্ন এই দিক আর কেহই রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না।"—এই বলিয়া নিরস্ত হইলে সকলেই সেই জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিল। আর দিল্‌দার খাঁও সেই স্থান হইতে প্রায় ২৮০ হস্ত পশ্চাৎ গমনকরিয়া নিতান্ত ভীত মনে একস্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন। বলা বাহুল্য, আমিও এই সময় আমার সামান্য ঢাল ও তরবারি হস্তে সেই জঙ্গলের নিকট দাঁড়াইয়া কোনদিক দিয়া প্রবেশ করিব তাহাই নিমেষের নিমিত্ত ভাবিতে, লাগিলাম। এমন সময় শুনিলাম, সেই জঙ্গলের ভিতর হইতে ভয়ানক গর্জ্জন-ধ্বনি উত্থিত হইল। সেই শব্দ শুনিবামাত্রই দিলদার খাঁ অচৈতন্য অবস্থায় সেই স্থানে পড়িয়া গেলেন; এতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি যে বীর-দর্প করিতেছিলেন, তাহা তাঁহার হৃদয় হইতে লোপ পাইল।

"দেখিতে দেখিতে জঙ্গলের ভিতর একটী বন্দুকের আওয়াজ হইল। সেই সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক গর্জ্জনে সেই জঙ্গলকে প্রতিধ্বনিত করিয়া, একটী প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র সবেগে বহির্গত হইয়া আমি যে দিকে দণ্ডায়মান ছিলাম, সেই দিকেই আগমন করিল। জঙ্গলের ভিতর হইতে সকলেই পলাইবার নিমিত্ত চীৎকার করিয়া আমাকে সাবধান করিতে লাগিল। আমি কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া, দক্ষিণ হস্তে সজোরে তরবারি উত্তোলন করিলাম; এবং বাম হস্তে দৃঢ়রূপে আমার সেই সামান্য ঢাল ধরিয়া এক লম্ফ-প্রদান পূর্ব্বক সেই ভয়ানক ব্যাঘ্রের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। ব্যাঘ্র আমাকে দেখিয়া আমার উপর পড়িবার নিমিত্ত চকিতের ন্যায় এক লম্ফ প্রদান করিল। আমি তখন সেই স্থানেই দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান হইলাম; এবং ব্যাঘ্র আমার উপর পড়িবার সময় আমার সেই অসির দ্বারা তাহার উপর এমন এক ভীষণ আঘাত করিলাম যে, একদিকে তাহার সম্মুখের পা'দু'খানি গ্রীবা ও মস্তকের সহিত দ্বিখণ্ডিত হইয়া পড়িল, ও অন্যদিকে তাহার শরীরের অপরার্দ্ধ পতিত হইল। রক্তে আমার শরীর ও ধরাতল ভাসিয়া গেল। তখন সকলে আসিয়া সেই স্থানে উপনীত হইলেন; ও আমার বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পিতা আমার অবস্থা দেখিয়া যেরূপ সন্তুষ্ট হইলেন, দিলদার খাঁর অবস্থা দেখিয়াও সেইরূপ হাসিলেন। আমার অস্ত্র চালনার গুরু বৃদ্ধ রাজপুত 'বেণী সিংও' সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তখন, সকলে আমাকে যেমন প্রশংসা করিতে লাগিলেন আমার ওস্তাদকেও তদপেক্ষা প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অস্ত্রশিক্ষা করাইবার কৌশলকে সকলেই ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

"সেই সময় আমার পিতা আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"পুত্র! আজ বীরত্বের

সহিত রক্তপাতন করিয়া ধরণীকে যেমন প্রথম রঞ্জিত করিলে, ভরসা করি, ইহাই যেন শেষ রক্ত-পাতন না হয়। কল্য তুমি আমার সহিত শিবপুরে গমন করিও; সেই স্থানে আমাদিগের প্রধান দলের জমাদারিতে একেবারে তোমাকে বরিত করিয়া দিব।"

শশাঙ্কশেখর।

(আত্মকাহিনী)

(৪)

শিরিশকুমার।

—০:০—

সে রাত্রিতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা উভয়ে পরামর্শ করিলাম, কিন্তু কি প্রকারে অবলার সতীত্ব রক্ষা হইবে, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। ভগবানের কি অদ্ভুত ইন্দ্রজাল! তাঁহার এই বিশাল রাজ্যে কত লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু সকলগুলিই সেই মঙ্গলময়ের মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, কার্য্য মাত্রেই নিয়মিতরূপে সাধিত হইতেছে; কিন্তু মানব কেবলমাত্র সুখ-দুঃখের ভাগী। প্রকৃতি-পূজক বলিতেছেন,—"মা ভবলীলাময়ী প্রকৃতি দেবী! তোমার প্রতিমূর্ত্তিতে কি না অঙ্কিত রহিয়াছে? কোন স্থানে ভাতিতম, হুহুঙ্কারপূর্ণ, উত্তাল তরঙ্গাকুল মহাসাগর; কোন স্থানে বিভীষণ মূর্ত্তি পশুগণের বিকট চীৎকারপূর্ণ, লতা-গুল্ম-তরু প্রভৃতি বেষ্টিত মহারণ্য; কোথাও সৌধ-স্ফটিকময়ী হর্ম্ম্য ও বসন্তানিল প্রবাহিত রম্যোপবন-পরিপূর্ণ রাজনগরী; কোথাও তৃণগুল্মাচ্ছাদিত কুটীর। কোথাও কলাপী-কলাপ-বিগঞ্জিত, কেশদাম-সুশোভিত, সৌদামিনী-বিনিন্দিত, তাম্বুল-রাগ-বিচিত্রিত, সুকোমল কান্তিময়ী সুহাসিনী অসতী যুবতীর আনন্দ; কোথাও সতীর আজীবন শোক জর্জ্জরিত হৃদয়োচ্ছাপিত অশ্রু। কোথাও ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত হইতেছে; কোথাও অধর্ম্মের বিজয়-পতাকা গগণমার্গে সাবহেলে উড্ডীয়মান হইতেছে। এ সংসারের কিছুই স্থির বা কিছুই স্থায়ী নয়। এই হাসি—এই কান্না। এই আনন্দ—এই শোক। সকলেরই প্রতি মুহূর্ত্তে বিলোপ হইতেছে, আবার প্রতি মুহূর্ত্তে সকলেরই সৃষ্টি হইতেছে।"

প্রভাত হইল। হাসিতে হাসিতে উষা-সতী নবরাগে রঞ্জিত হইয়া জগৎকে পুলকিত করিলেন। আমরাও শয্যাত্যাগ করিলাম।

কৃষ্ণদাস বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সরকার মহাশয়! আজ কি করিবেন?"

আমি বলিলাম,—"আজ সেই উদ্যানের পশ্চাৎদিগের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া, হে ঘরে সতী বন্দিনীস্বরূপে আবদ্ধা আছেন, তাহার সন্নিকটে থাকিব। ভগবান তাঁহার সহায়—তিনি অবশ্য এবিপদে রক্ষা পাইবেন। আমাদিগের দ্বারা যদি কোন উপকার সম্ভব হয়, প্রাণ দিয়াও তাহা করিব!"

কৃষ্ণদাস বাবু আমার কথায় সন্তুষ্ট হইলেন। এইরূপে সমস্ত দিন নানা কথাবার্ত্তায়—নানা পরামর্শে অতিবাহিত হইল।

অপরাহ্ণপ্রায়।—তপনদেব গগণপট হইতে অবতীর্ণ হইবার উপক্রম করিতেছেন। যেন একখানি তেজোময় রাঙ্গা ছবি গগণে চিত্রিত রহিয়াছে। পশ্চিমাকাশ লাল মেঘে সমাচ্ছন্ন সূর্য্যদেব, তাহার মধ্য দিয়া, সূর্য্যদেব তাহার অভ্যন্তর হইতে কিরণজাল বিস্তার করিতেছেন; লাল মেঘের মধ্য দিয়া সূর্য্যকিরণ বৃক্ষ-শাখায়, প্রাচীরের মাথায় এবং অট্টালিকার উপরে পড়িয়া এক অপূর্ব্ব রক্তিম সাজে সাজাইয়াছে। এক্ষণে পৃথিবী পরিভ্রান্ত দিনমণি দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া বিশ্রাম-গৃহে প্রবেশ করিতেছেন। পশু পক্ষী—কোটরে, গহ্বরে, নীড়ে, পলায়ন করিতেছে।

মানব-কুল বৈষয়িক কর্ম্মে ক্লান্ত হইয়া বিশ্রাম-সুখভোগ বাসনায় প্রত্যাগমন করিতেছে।

আমরা রাত্রি আটটার সময় (রহস্য ময় পত্রগুলি সঙ্গে লইয়া) বাসা হইতে বাহির হইলাম। একঘণ্টা কাল মধ্যে, সেই উদ্যানের নিকটবর্ত্তি হইলাম। এবারে আর সম্মুখস্থ ফটকের দিকে না যাইয়া আর একটি শুঁড়ি পথ অবলম্বন পূর্ব্বক উদ্যানের পশ্চাৎদিকে উপস্থিত হইব ভাবিতেছি, এমন সময় একখানি "যুড়ী গাড়ী" আমাদিগের পশ্চাৎদিক হইতে উদ্যানের দিকে আসিতে লাগিল। আমরা গলির ভিতর একটু প্রবেশ করিয়াই, ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। পাঠক মহাশয়! বলিতে কি, গাড়ীর ভিতরে যাঁহাকে দেখিলাম, তাঁহাকে দেখিয়া আমার "এ ধরা পিশাচের ধরা" বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

বাবুর সম্মুখে বসিয়া একজন বিকটাকার মুস্কোজোয়ান, বর্ণ আল্‌কাত্‌রার ন্যায়, মস্তকে লাল পাগ্‌ড়ী, হস্তে একগাছি পিত্তল দিয়া বাঁধান লগুড়। গাড়ীখানি চকিতের মধ্যে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। আমাদের হৃদয় ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। দ্রুতবেগে উভয়ে সেই গলি অবলম্বন করিয়া উদ্যানের পশ্চাদ্দিকে আসিয়া পড়িলাম, একলাফে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিলাম, তার পর উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। বরাবর উদ্যানবাটীর নিকটে আসিয়া, একটি নিম্নশাখা বিশিষ্ট আম্র-বৃক্ষের উপর উপবেশন করিলাম।

একে কৃষ্ণপক্ষীয় গাঢ়-অন্ধকার-ময়ী-রজনী, কোলের মানুষ দেখা যায় না,—সে সময়ে উদ্যান মধ্যে কে দুইজন লোক বৃক্ষের শাখায় বসিয়া আছে, কে তাহার সন্ধান রাখে? করাল-বদনা নিশীথিনী, কামোন্মত্তা মাতঙ্গিনী বেশে, প্রচণ্ড মূর্ত্তিতে অশিব ঘটনা সমূহকে সমভিব্যাহারে লইয়া হিঃ—হিঃ—শব্দে বিকট হাস্য করতঃ উলঙ্গ হইয়া নৃত্য করিতেছেন। কখন পাগলিনীর ন্যায়, কাহারও হৃদয়স্থ উচ্ছ্বাসকে নিরাশা দূতীর দ্বারা নৈরাশ্যে লিপ্ত করিতেছেন, কখনও হাসিতে হাসিতে সেই আশাকে সজীব করিতেছেন। আমি প্রচণ্ডরূপিণী নিশাদেবীর সেই ভীষণ মূর্ত্তিকে বড় ভয় করি।

আমরা যে স্থানে বসিয়াছিলাম, সে স্থানটি ঠিক সেই ঘরের (যে ঘরে সতী আবদ্ধা) উত্তর দিকে। "বাতায়ন উন্মুক্ত থাকিলে হয়তো তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম" এই কথা ভাবিতেছি, এমন সময় উত্তরদিকের জানালা খুলিয়া গেল। একটি সৌদামিনী-বিগঞ্জিতা, আলুলায়িত-কেশা, সাদা-ধূতি-পরিধৃতা এক-ত্রিংশ বা দ্বাত্রিংশ বর্ষিয়া কামিনী সেই মুক্ত বাতায়ন পথের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ঘরে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল, সুতরাং সে ঘরের যাহা কিছু সমস্তই আমরা দেখিতে পাইলাম; কিন্তু তিনি আমাদিগকে দেখিতে পাইলেন না। আমরা উভয়ে সেই সৌদামিনী মূর্ত্তির প্রভায় দৃষ্টিহীন হইয়া, অবাকচিত্ত হইয়া রহিলাম। কেশ আলুলায়িত, বর্ণ—আষাঢ়ে গোলাপের ন্যায় সুন্দর, চক্ষের ভ্রূ-যুগল ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, তন্মধ্যস্থ তারা-যুগল প্রভাতের পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় ভাসমান। আকার খর্ব্ব, কণ্ঠে কম্বুরেখা চিত্রিত, উন্নত বক্ষ। রমণী একবার গবাক্ষ-পথে দাঁড়াইলেন, আবার তখনি নবজলধরের ক্রোড়স্থ সৌদামিনীর ন্যায়, সৌদামিনী বেগে প্রস্থান করিলেন। যেন চঞ্চল মন কিছুতেই শান্ত হইতেছে না, যেন আজ—কাল রজনী উপস্থিত। এত চিন্তা, এত আবেগ, তথাপি রমণী ধীর, স্থির, শান্ত, গাম্ভীর্য্যশালিনী।

দেখিতে দেখিতে ঘড়িতে দশটা, এগারটা, বারটা বাজিয়া গেল—রমণী হঠাৎ শিহরিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই এক জন লোক সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। কি জানিয়া রমণী উঠিয়া দাঁড়াইলেন—চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। তিনি

বলিতে লাগিলেন—"ঠাকুরপো! এ তোমার কি অত্যাচার? তুমি আমার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছ, আমার হৃদয়রত্ন একমাত্র ধন, পুত্রকে বিনাশ করিয়াছ, তথাপিও কি তোমার ধন-লালসা পরিতৃপ্ত হইবে না? ভাবিয়া দেখ, তুমি কি ছিলে, কি হইয়াছ? তোমার অমন নির্ম্মল চরিত্র—যাহা লইয়া আমি সর্ব্বদা স্বামীর নিকট প্রশংসা করিতাম—তাহা তুমি এখন কি প্রকারে কলুষিত করিয়াছ—"

এই কুলাঙ্গার দেবর কে? প্রবাসে আমার প্রথম সহায়—শ্রীযুক্ত হরিদাস দত্ত।

হরিদাস বাবু তাঁহার কথায় বাধা দিয়া, বিকট হাসি হাসিয়া কহিলেন—"আরে! রেখে দে—তোর সতীপনা! আমি এই বয়সে তোর মত কত সতীর সতীত্ব হরণ করেছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। ধনলোভে যাহা করিয়াছি, তাহাতে মনোরথ সফল হইয়াছে, কিন্তু এখনও একটি কার্য্য বাকি আছে। সে কার্য্য আজি সম্পূর্ণ করিব! তোমার যদিও বয়স হইয়াছে—তথাপি তুমি আমার নিকট যুবতী। আমি তোমার মোহনরূপে মোহিত হইয়া, উন্মত্তপ্রায় হইয়াছি—আজ নিশ্চয় তোমায় আত্মসমর্পণ করিতে হইবে—"

সুপ্তা সিংহিনী গর্জ্জিয়া উঠিল—"কি পিশাচ! নরপশু!! তোমার এতদূর স্পর্দ্ধা? ধর্ম্মের দিকে একবার লক্ষ্য কর—একবার উপরপানে চাহিয়া দেখ, তোমার জন্য নরককুণ্ডের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে। তুমি মাতৃস্বরূপিনী জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়ার সতীত্ব অপহরণে অভিলাষ করিয়া ক্ষুদ্র পতঙ্গের ন্যায় কেন সে প্রবল বহ্নিতে স্ব-ইচ্ছায় ঝাঁপ দিবে? এখনও তোমায় সৎপরামর্শ দিতেছি, আমায় কারাগার বিমুক্তা করিয়া দাও, আমি সন্ন্যাসিনী-বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইব। আমার স্বামীর স্বোপার্জ্জিত বিষয় তুমি গ্রহণ কর, তাহার জন্য একদণ্ডের তরেও তোমায় বিরক্ত করিতে আসিব না, কিন্তু—কিন্তু ঠাকুর পো—"

রমণী বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। হরিদাস বাবু পাশব-পিয়াসা তৃপ্তির জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন,—সে হস্ত কাঁপিতে লাগিল। পরক্ষণেই আবার কি ভাবিয়া কাহাকে ডাকিলেন—"আমেদ!"

"হুজুর" বলিয়া সেই প্রকাণ্ড মুস্কোজোয়ান সেই ঘরে প্রবেশ করিল। হরিদাস বাবু হুকুম দিলেন—"এই একে হিড্ হিড্ করে টেনে বাগানের ভেতর নিয়ে যা'। যদি এ আমার কথায় রাজী হয়, তবে একে ফিরিয়ে আন্‌বি; আর না শুনে, এর বুকের রক্ত আমি দেখ্‌তে চাই—"

আমেদ হুকুম মত কাজ করিল। হিড্ হিড্ করিয়া টানিয়া রমণীকে উদ্যানে আনিয়া ফেলিল। আমরা উভয়ে সমস্তই দেখিলাম, কিন্তু কি করিব—উপায় নাই। তখনও ভাবিলাম ভগবান রক্ষা করিবেন। আমরা বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া আবার আর এক স্থানে যাইয়া লুক্কাইত হইলাম। সেখান হইতে আমেদ এবং সেই রমণী অতি নিকটেই ছিলেন সুতরাং আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম, আমেদ একখানি তীক্ষ্ণ ছুরিকা উন্মুক্ত করিয়া রমণীর মুখের কাছে ধরিয়া বলিল—"বল্ এখনও রাজী হ'বি কি না?"

রমণী তীব্রকণ্ঠে উত্তর করিলেন,—"আমেদ! তুই এতদূর নিমকহারাম! তোর কি মনে নাই যে, একদিন তুই, খুন করিয়া প্রাণে বাঁচিবার জন্য, আমার পায়ে ধরিয়া আমার স্বামীকে অনুরোধ করিতে বলিয়াছিলি? আমি তোর প্রাণরক্ষা করিয়াছিলাম? তোর কি স্মরণ নাই, যে, তুই এখনও, কার প্রজা? যে জমীতে তুই বাস করিস্ সে জমী কার তা কি তুই জানিস্ না?"

রমণীর কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইল, আমেদের হস্তস্থিত ছুরিকা ভূতলে পড়িয়া গেল। রমণী পুনরায় সেই ছুরিকা উত্তোলন করিয়া আমেদের হস্তে তুলিয়া দিতে গেলেন,—বলিলেন—"আমেদ! পিশাচ!! অর্থলোভে তোর এতদূর নেমকহারামি করিতেও ইচ্ছা হইয়াছিল—তাহাতে তোর উপর ভৎর্সনা করা আমার অন্যায়। এই ছুরিকা নে, আমায় হত্যা কর্। আর আমার বাঁচিবার সাধ নাই। আজ, না হয় কালি, পিশাচ আমার সতীত্ব হরণ করিবে—তদপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। আমেদ! নে—নে শীঘ্র আমায় এ যাতনা হইতে মুক্ত কর্।"

আমেদ তাহা পারিল না। নিজ অঙ্গুলি দংশন করিতে লাগিল। এমন সময় পশ্চাতে ভয়ানক রব উত্থিত হইল। "পাকড়ো পাকড়ো!!" বলিয়া জনকয়েক পাহারাওয়ালা, জমাদার এবং পশ্চাতে মশালধারী জনকয়েক গ্রাম্য প্রজা। আমেদ বুঝিল বিপদ উপস্থিত, তিন লম্ফে উদ্যান অতিক্রম করিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক সে স্থান হইতে পলায়ন করিল। রমণী মূর্চ্ছিতা হইয়া সেই স্থানে পড়িয়া গেলেন।

এমন সময় পুলিষের দলবল সমেত একটি অষ্টাদশ বর্ষিয় যুবা এবং একজন বৃদ্ধ দরওয়ান সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সেই প্রতিভা বিস্ফারিত-প্রফুল্ল-পদ্মবৎ-সৌন্দর্য্যরাশি নবতৃণ-শয্যায় পতিত দেখিয়া, সেই অষ্টাদশ বর্ষিয় যুবক করুণ কণ্ঠে কহিল—"মা! মা!——উঠ, উঠ, আমি তোমার শিরিশ কুমার—তোমায় উদ্ধার কর্‌তে এসেছি——"

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

ভয়ানক জুয়াচুরী—প্রবল প্রতারণা।

সম্প্রতি মফঃস্বল হইতে একখানি হাণ্ডবিল বা স্যরকুলার সম্বন্ধে কয়েকখানি পত্র আমরা পাইয়াছি। এ পর্য্যন্ত আমরা অনেকের অনেক রকম অদ্ভুত অদ্ভুত জুয়াচুরী কাণ্ড প্রকাশ করিয়া দিয়াছি বটে, কিন্তু এখানি পড়িয়া

আমাদিগকেও বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হইয়াছে। এ স্যরকুলার-বিজ্ঞাপন খানি কি, ইহা কাহার কাণ্ড, ইহাতে কি ফল হইতেছে, কেমন কেমন লোকে ইহাতে ভুলিয়াছেন, কাহারা ইহাতে প্রতারিত হইয়াছেন, এসব এবং ইত্যাদি পরিচয় দিবার পূর্ব্বে এই স্যরকুলার-বিজ্ঞাপন খানির সহিতই পাঠকের অগ্রে পরিচয় করিয়া দিই। বিজ্ঞাপন খানির অবিকল নকল এই :—

লোক ভুলানে বিজ্ঞাপন।

"অনুগ্রহ করিয়া পাঠ করিবেন ও বন্ধুগণকে দেখাইবেন।

অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার! অভাবনীয় ঘটনা! কখনও যাহা হয় নাই, তাহাই এত দিনে সম্পন্ন হইল!

গৃহে গৃহে পুস্তকালয়!

ঘরে ঘরে বাড়ী বাড়ী লাইব্রেরি!

জগতের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ এক শত পুস্তক মাটীর দরে বিক্রয় হইতেছে।

এমন আর কখন হয় নাই, হইবেও না,—হইবার সম্ভাবনাও নাই।

রত্ন গৃহ।

HUNDRED CHOICE BOOKS OF THE WORLD.

ইহা রত্ন হইতেও মূল্যবান,

মণি মুক্তা হইতেও সারবান,

ইহার মূল্য নাই।

এ সুবিধা কেহ ছাড়িবেন না।

দেশে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকের আদর দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে; সকলেই নিজ নিজ গৃহে সামর্থানুসারে দুই চারিখানি ভাল ভাল পুস্তক রাখিতে ইচ্ছা করেন,—অথচ বাঙ্গালা দেশের লোক এমনই দরিদ্র যে অধিক পয়সা ব্যয় করিয়া পুস্তক ক্রয় করিতে সকলেই অক্ষম। একে অধিক সংখ্যক পুস্তক ক্রয় করিবার ক্ষমতা কাহারই নাই, তাহার উপর বাঙ্গালী অর্থ চিন্তা ও অন্ন চিন্তায় দিবারাত্রি ব্যস্ত, অধিক পুস্তক পাঠ করিবারও তাহাদের সময় নাই। এতদ্ব্যতীত দেশের লোক এক্ষণে স্ত্রী শিক্ষার আবশ্যকতা বুঝিতে-

যেন জগতে স্ত্রীলোকেরা যে রান্নাবান্না ছাড়িয়া আজীবন বহু বিদ্যা শিখিবে, ইহাও কাহারও ইচ্ছা নহে ; অল্প সময়ে অল্প সংখ্যক পুস্তকের বিস্তৃত সমালোচনী পাঠ করিয়া তাহারা মোটামোটি শিক্ষিতা হউক,—ইহাই সকলের ইচ্ছা।

দেশের এই গুরুতর অভাব দূর করিবার জন্য আমরা এই নূতন, অদ্ভুত, ও অত্যাশ্চর্য্য।

রত্ন গৃহ।

বা

FAMILY POCKET LIBRARY.

সৃষ্টি করিয়াছি। বাঙ্গালা দেশে এ অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার আর কেহ কখনও করিতে সাহস করেন নাই। বাঙ্গালা দেশ কেন? জগতের আর কোন প্রদেশে এরূপ অদ্ভুত-পূর্ব্ব ব্যাপার আর কখনও হয় নাই।

জগতের প্রধান ও শ্রেষ্ঠ—

একশত পুস্তক।

সকল দেশের, সর্ব্ব প্রধান ও সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ

এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট

একশত পুস্তক।

বহু যত্নে ও বহুব্যয়ে একত্রে সংগৃহীত সমালোচিত হইয়াছে।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

বিশ বৎসর অবিরত পরিশ্রম করিয়া যাহা শিক্ষা করিতে হয়, সেই একশত পুস্তক যত্নের সহিত এক-মাস পাঠ করিলে অনায়াসে তাহাই শিখিতে পারা যাইবে। ঘরে বসিয়া অল্প পরিশ্রমে ও অল্প ব্যয়ে জ্ঞান লাভের আর এরূপ সুবিধা কখনও হয় নাই। বহু পরিশ্রমে ও বহু ব্যয়ে আমরা এই সকল পুস্তক অনুবাদিত ও সংগৃহীত করিয়াছি। যিনি এই অমূল্য রত্ন গৃহ গৃহে রাখিবেন, তাঁহার গৃহ জ্ঞানালোকে আলোকিত হইবে,—তাঁহার গৃহে কিছু না থাকিলেও তাঁহার গৃহশোভা অতুলনীয় হইবে।

এই সকল সুবিখ্যাত, জগৎপূজ্য, সর্ব্বত্র আদৃত

একশত পুস্তকের নাম

নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী।

(১) ঋগ্বেদ সংহিতা (২) সাম বেদ (৩) অথর্ব্ব বেদ (৪) যযুর্ব্বেদ (৫) উপনিষদ সার সংগ্রহ (৬) শ্রীমৎভাগবত (৭) মহাভারত (৮) বিষ্ণুপুরাণ (৯) মনুসংহিতা (১০) পুরাণ সার সংগ্রহ (১১) প্রাণতোষিণী (তন্ত্রসার সংগ্রহ) (১২) বৌদ্ধধর্ম্ম শাস্ত্রসার সংগ্রহ (১৩) বাইবেল (১৪) ঈশা অনুকরণ (immitation of Christ) (১৫) কোরাণ।

দর্শন গ্রন্থাবলী।

(১৬) সাংখ্য (১৭) পাতঞ্জল (১৮) ন্যায় (১৯) বৈশেষিক (২০) উত্তর মীমাংসা (২১) পূর্ব্ব মীমাংসা (২২) হিন্দু দর্শন সার সংগ্রহ (২৩) কনফিউসস্ (চীন দর্শন) (২৪) সেক্রেটিস্ (২৫) প্লেটো (২৬) আরিষ্টটল (২৭) কান্ত (২৮) কোমত (২৯) বেকন (৩০) ইয়ুরোপীয় দর্শন সার সংগ্রহ (Lewe's History of PHilosophy)

বিজ্ঞান গ্রন্থ সমূহ।

(৩১) অর্থনীতি (Political Economy) (৩২) সমাজনীতি (Sociology) (৩৩) পদার্থ বিজ্ঞান (Physics) (৩৪) যন্ত্র বিজ্ঞান (Machanics) (৩৫) রসায়ন (Chemistry) (৩৬) ভূবিদ্যা (Geology) (৩৭) প্রাণী বিদ্যা (Zoology) (৩৮) উদ্ভিদ বিদ্যা (Botany) (৩৯) কৃষি বিদ্যা ((Agriculture) (৪০) পুষ্প বিদ্যা (Hotriculture) (৪১) সঙ্গীত বিদ্যা (Music) (৪২) শিল্প বিদ্যা (Fine Arrs) (৪৩) রন্ধন বিদ্যা (cookery)

এক্ষণে বিলাতের সুবিখ্যাত অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যে সকল বিজ্ঞান গ্রন্থ "সায়েন্স প্রাইমার" (Science Primer) নামে প্রকাশিত হইতেছে তাহাই অবলম্বনে লিখিত।

(৪৪) অস্থি বিদ্যা (Anatomy) (৪৫) জীবতত্ত্ব (Physiolog (৪৬) চিকিৎসা (Pathology)

চিকিৎসা গ্রন্থ।

(৪৭) এলোপ্যাথি (৪৮) হোমিওপ্যাথি (৪৯) হাকিমী (৫০) অবধূত চিকিৎসা (৫১) গৃহ চিকিৎসা (টোট্‌কা টুট্‌কি)

ইতিহাস।

(৫২) ইংলণ্ডের ইতিহাস (Green) (৫৩) রোম (৫৪) গ্রীস্ (Goldsmith) (৫৫) মিসর (৫৬) ভারতবর্ষ (Wheeler) (৫৭) ফ্রান্স (৫৮) আমেরিকা (৫৯) সভ্যতার ইতিহাস (Bucle)

জীবন বৃত্তান্ত।

(৬০) জীবনী সংগ্রহ (The Biographical Treasury)

কাব্য।

(৬১) রামায়ণ (বাল্মিকি) (৬২) ইলিয়াড (Homer) (৬৩) ওডেসি (Vergil) (৬৪) প্যারা ডাইস লষ্ট (Milton) (৬৫) নরক (Dante) (৬৬) লেডি অব দি লেক (Scott) (৬৭) বিদ্যাসুন্দর (ভারতচন্দ্র) (৬৮) মেঘনাদ বধ কাব্য (মাইকেল) (৬৯) গুলেস্তান।

নাটক।

(৭০) শকুন্তলা (কালিদাস) (৭১) হামলেট (৭২) ওথেলো (৭৩) ম্যাকবেথ (৭৪) রোমিও জুলিয়েট (Shakespeare) (৭৫) ডুইল এলমিনিষ্টার (Gœthe) (৭৬) সতী নাটক (মোনমোহন) (৭৭) সধবার একাদশী (দিনবন্ধু) (৭৮) বিল্ব মঙ্গল (গিরিশ চন্দ্র)।

উপন্যাস।

(৭৯) কাদম্বরী (৮০) বিষবৃক্ষ (বঙ্কিম) (৮১) বঙ্গ বিজেতা (রমেশচন্দ্র) (৮২) স্বর্ণলতা (তারক নাথ) (৮৩) আইভানহো (৮৪) লা মিজারেবল (৮৫) গোলেবকাওয়ালী (৮৬) লয়লা মজনুন (৮৭) বোকাসিও (৮৮) পিলগ্রিমস্ প্রগ্রেস (৮৯) আরব্য উপন্যাস (৯০) পিকউইক (৯১) ডনকুইকসোট (৯২) রবিনসন ক্রুসো (৯৩) ভ্যানেটী ফেয়ার (Thackeray) (৯৪) নানা (Zola) (৯৫) সি (Haggard)

ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

(৯৬) কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কার (Irving) (৯৭) পৃথিবী ভ্রমণ (Cook) (৯৮) ভারত ভ্রমণ (Bholanath Chundra) (৯৯) প্রধান প্রধান রাজধানী (১০০) পাঁচ সপ্তাহ বেলুনে (Five Weeks in a Baloon)

জগতের এই শ্রেষ্ঠ ও সুবিখ্যাত একশত পুস্তক অতি উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়াছে। এই সকল পুস্তক অল্পের মধ্যে এত সরল ও সহজ ভাষায় লিখিত ও সমালোচিত হইয়াছে যে বালকেও বুঝিতে পারিবে।

মূল্যাদি।

এই একশত পুস্তকের মূল্য অতি কম হইলেও দুই শত টাকার কম নহে, তবে অত্যধিক বিক্রয় আশায় বহু পুস্তক ছাপাইয়াছি এবং বিলাতি নিয়মে মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য শেষ করিয়াছি বলিয়া আমরা ইহার মূল্য সর্ব্ব সাধারণের সুবিধার জন্য কেবল মাত্র ৫, টাকা স্থির করিলাম। এতদ্ব্যতীত উপহার ও পুস্তকাদির প্যাকিং ও ডাক মাশুলের জন্য অতিরিক্ত আরও এক টাকা দিতে হইবে। বাঙ্গালী গরিব,—এককালে এত টাকা দিতে পারিবে না বলিয়া আমরা এই টাকা দুই তিনবারে দিবারও সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করিয়াছি।

কেবল ইহাই নহে ইহার মধ্যে এই মূল্যেই

উপহারও আছে।

আমরা যেমন পুস্তকের সুলভ মূল্যের চূড়ান্ত করিয়াছি,—সেইরূপ উপহারেরও চূড়ান্ত করিতে অগ্রসর হইয়াছি। আর কেহ কখন এরূপ উপহার প্রদানে সাহস করেন নাই ও করিবেনও না।

১ম উপহার।—গ্রাহক মাত্রকেই আমরা **"সঙ্গীতসুধা"** নামক একখানি সুন্দর গানের বই উপহার প্রদান করিব। ইহাতে বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ বহুসংখ্যক গান আছে।

২য় উপহার।—যাঁহারা এক মাসের মধ্যে গ্রাহক হইবেন, তাহাদের সকলকেই শ্রেষ্ঠ গায়িকা ও অভিনেত্রীগণের ছবি আছে।

৩য় উপহার।—যাঁহারা এক টাকা (ঘড়ি পাঠাইবার ডাক মাশুল) অগ্রিম দিয়া গ্রাহক হইবেন, তাঁহাদের সকলকেই এক একটা সুন্দর টাইমপিস ঘড়ি উপহার দিব।

৪র্থ উপহার।—যাঁহারা ১৫ দিবসের মধ্যে এক টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া গ্রাহক হইবেন, তাঁহাদের সকলকেই আমরা এক সেট এইটটিন ক্যারেট সোনার বোতাম ও ঘড়ি উভয়ই উপহার দিব।

যাঁহারা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন না তাঁহাদিগকে পুস্তক ও দ্রব্যাদি কোন মতেই এক সঙ্গে পাঠান হইবে না,—কারণ তাহাতে আমাদের লোকসান হইবার সম্ভাবনা আছে। তাঁহাদিগের তিন কিস্তিতেই দ্রব্যাদি পাঠাইয়া টাকা আদায় হইবে।

শেষ পঞ্চম উপহার।

অদ্ভুত পূর্ব্ব উপহার! অত্যাশ্চর্য্য উপহার!

ট্যাঁক ঘড়ি, আঁংটী, বোতাম ও চেন।

উপরের লিখিত তিন প্রকার উপহার সকলেই পাইবেন,—ইহা ছাড়া গ্রাহকদিগের মধ্যে যাঁহাদের পত্রে হস্তাক্ষর সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কার হইবে ও অক্ষরের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প থাকিবে, তাঁহাদের মধ্যে ২৫ জনকে এই উপহার প্রদত্ত হইবে। কোন উপহারের জন্যই গ্রাহকদিগকে আর কিছুই স্বতন্ত্র দিতে হইবে না।

বিশেষ সুবিধা! বিশেষ সুবিধা!

মূল্য সম্বন্ধে সুবিধা।

যিনি অগ্রিম মূল্য দিবেন, তাঁহারও সুবিধা;

যিনি অগ্রিম মূল্য দিতে অসম্মত

তাঁহারও সুবিধা।

১। যাঁহারা এককালে ৫, টাকা অগ্রিম পাঠাইবেন,—তাঁহাদিগকে আর ডাক মাশুলের অতিরিক্ত এক টাকা দিতে হইবে না। কেবল ৫, টাকাই তাহারা সমস্ত পুস্তক ও উপহার পাইবেন। টাকা পাঠাইলে দ্রব্যাদি প্রেরিত হইবে।

২। যাঁহারা এক টাকা অগ্রিম দিয়া গ্রাহক হইবেন, তাঁহাদের নিকট বাকি ৫, টাকা দুই কিস্তিতে আদায় হইবে। প্রথম,—বোতাম, ছবির আলবাম ও গানের বই ভিপিতে পাঠাইয়া পোষ্টাফিসের সাহায্যে দুই টাকা আট আনা আদায় করিব; তৎপরে ঐরূপে ঘড়ি ও বই পাঠাইয়া আর দুই টাকা আট আনা আদায় হইবে।

৩। যাঁহারা এক টাকাও অগ্রিম পাঠাইতে অসম্মত, তাঁহাদের নিকট তিন কিস্তিতে টাকা আদায় হইবে,—তবে তাঁহাদিগকে অতিরিক্ত আর ছয় আনা ডাক মাশুল দিতে হইবে। প্রথম,—বোতাম, আলবাম ও গানের পুস্তক ভি পিতে পাঠাইয়া ২।৶০ আদায়

হইবে ; পরে ঐরূপ ভি পি ডাকে ঘড়ি পাঠাইয়া ২৸০ টাকা আদায় হইবে,—পরে বই পাঠাইয়া ভি পি তে বাঁকি ২৸০ আদায় হইবে।

যাঁহারা কেবলমাত্র লিখিয়া গ্রাহক হইবেন,

তাঁহাদিগকে আমরা বিশেষ করিয়া অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন আমাদের প্যাকেট ফেরত দিয়া আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্থ না করেন। আমরা তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া প্যাকেট পাঠাইব,—অথচ তাঁহারা ফেরত দিবেন,—ইহা নিতান্তই অন্যায় কার্য্য,—কারণ ইহাতে প্রতি প্যাকেটে আট আনা করিয়া আমাদের ডাক মাশুলের জন্য লোকসান হইবে। যাহার হাতে যখন টাকা থাকিবে, আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন,—তাহা হইলে আমরা ঠিক সেই সেই সময় ভ্যালুপেয়ল প্যাকেট পাঠাইয়া পোষ্টাফিসের সাহায্যে টাকা আদায় করিব।

যিনি পাঁচ জন গ্রাহক করিয়া দিবেন তিনি
এইটটিন্ ক্যারেট সোনার বোতাম
বিনামুল্যে পাইবেন।

শ্রীপরেশনাথ মিত্র।

নূতন বাল্মিকী যন্ত্র কার্য্যালয়, ১৬৯ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।"

ছাপাখানার সুনাম।

বিজ্ঞাপন খানি বড়ই সুকৌশলে লেখা। বংশীরবে হরিণকে ফাঁদে ফেলিবার অমোঘ যন্ত্র। অমোঘ ত বটেই। নতুবা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এল উপাধিধারী সুবুদ্ধি, সুচতুর মুন্সেফ হাকিম, পল্লীগ্রামের মধ্যবিত্ত জমীদার সন্তান, এবং আরও অনেকে ইহাঁর ফাঁদে পড়িবেন কেন?

এ বিজ্ঞাপন পত্র এই কলিকাতা সহরে বিলি হয় নাই। অন্ততঃ অনুসন্ধানে আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে উহা সহরে বিলি হয় নাই বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছে। তবে বিজ্ঞাপন দাতা, চালাক চুড়ামণি মিত্রজার দুই একজন বন্ধু বান্ধব বা অপর কেহ দুই চারি খানি চাহিয়া আনিয়াছেন বটে। সহরে বিলিতে অবশ্যই আশঙ্কা আছে, সহজে এবং শীঘ্র ভ্রম ভাঙ্গাইবার, এবং ধরা পড়িবার ভয় আছে, তাই বুঝি বিজ্ঞাপন দাতা সাহসভরে সহরে ইহা ছড়াইতে পারেন নাই। ছড়াইয়াছেন কেবল মফঃস্বলে, অপরিচিত লোকের সর্ব্বনাশ করিতে।

অপরিচিত লোকের সর্ব্বনাশ কথাটা নেহাত অনর্থক বলি নাই। কারণ শ্রীযুক্ত পরেশ নাথ মিত্র মহাশয়ের ছাপাখানার সহরে বেশ সুনাম আছে। তাঁহার ছাপাখানা হইতে এই অপূর্ব্ব জুয়াচুরী কাণ্ড বাহির হইতে জানিলে ব্যাপার বুঝিতে লোকের বড় বিল হইত না। সুনামটা কি ভাঙ্গিয়া একটু ভাল। তবে শুনুন। একটী পরিচয় এই ;—

"শান্তি" সংবাদ পত্রের নাম পাঠক শুই শুনিয়াছেন। শান্তি-সম্পাদক ধীরে নাথ পালের নামও বোধ হয় অনেকে জানিতে বাকি নাই। বঙ্গবাসী ও সঞ্জীবনীর তৃতীয় শ্রেণীর নামকাটা কেরাণী ও শান্তির কার্য্যাধ্যক্ষ পূর্ণচন্দ্র দত্তে নাম লোকসমাজে তত পরিচিত না তবে এই কয় মাসে "শান্তির" জুয়াচুরী কাণ্ডে যাহা জাহির হইয়াছে। জুয়াচুরী বলিলা ইহাতে হয়তঃ শ্রীমান ধীরেন্দ্র নাথ একটু ব করিবেন। পূর্ণচন্দ্রের মনে একটু হইবে। কিন্তু চারা নাই। আমরা কর্ত্তব্য স্কন্ধে করিয়া লোক সমাজে দিয়াছি, তাহাতে রূঢ় হইলেও আমাদিগ সত্য কথা বলিতে হয়। বাস্তবিক 'শা লোকের সহিত বড়ই জুয়াচুরী খেলিয়াছে উপহার দিব বলিয়া টাকা লইয়া উপহার নাই। আর উপহার দূরে যাউক, মফঃস্ব অনেকে টাকা দিয়াও 'শান্তি' পাইতেছেন এ সম্বন্ধে বহু পত্র আমাদের নিকটই আছে বাঙ্গালা নেহাত নিরীহের দেশ তাই পা আজও স্বচ্ছন্দে লীলাখেলা করিয়া বেড়াইতে নতুবা অপর দেশ হইলে তাহাকে বিপাকে পড়িতে হইত। কিন্তু "শান্তির"

পরিচয় আজ বলিতেছি না। পরেশ নাথ মিত্রের বাল্মিকী যন্ত্রে সেই শান্তি ছাপা হয়, সেই যন্ত্রালয় ও কার্য্যালয় বাটীতেই শান্তির আফিস, এই পরিচয়ে মিত্রজার যন্ত্রালয়ের যে সুনাম আছে, তাহা বলিতেই এই কথা পাড়িয়াছিলাম। সে পরিচয়, উপরোক্ত সামান্য আভাসেই পাঠক বুঝিবেন, মিছা আর কেন? কেবল মফঃস্বলে পরেশ নাথ মিত্রের এই "রত্ন-গৃহের" বিজ্ঞাপন স্যরকুলার বিলি হইতেছে। কত বিলি হইয়াছে, আমরা সঠিক জানি না। কিন্তু শুনিয়াছি ৩০। ৪০ হাজার বিলি হইয়াছে। দু' দশ হাজার কমও হইতে পারে, বেশীও হইতে পারে। কিন্তু মফঃস্বলে ইহার বিষম ফল ধরিয়াছে। অনেকে এই বিজ্ঞাপনের মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া টাকা পাঠাইতেছেন, ঠকিতেছেন; আর ঠকিয়া আমাদিগকে পত্র লিখিতেছেন।

দুই দশখানি এইরূপ পত্র পাওয়ার পর আমরা এ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কাহার কাহার নিকট এ বিজ্ঞাপন প্রচারিতহইয়াছে জানি না, জানিবারও উপায় নাই। কিরূপে প্রকৃত কথা বুঝাইব, তাহাই এখন আমাদের ভাবনা হইল। আমরা উপায়ান্তর না দেখিয়া "বঙ্গবাসীতে" বিজ্ঞাপন দিলাম।

"সাবধান!—পরেশনাথ মিত্র 'রত্নগৃহ' পুস্তকের যে যে বিজ্ঞাপন বিলি করিতেছে, তাহাতে ঠকিবেন না। ১৫ই অগ্রহায়ণের 'অনুসন্ধান-পত্রে' তাহার প্রতারণা দেখুন। শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী, অনুসন্ধান সমিতি, কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা।"

উকিলের চিঠি।

১৯ই অগ্রহায়ণ শনিবার বিজ্ঞাপন বাহির হয়। সেই দিন রাত্রি নয়টার সময় আমরা নিম্নের এই চিঠি খানি পাইলাম। চিঠি খানি এই :—

To
BABOO DURGA DAS LAHIRI,
"Anushandhan Samiti"
College Street, CALCUTTA.

SIR,

The attention of my client Baboo Poresh Nath Mitra, the proprietor of the *Balmiki* Press, residing at 169, Maniktollah Street in the town of Calcutta, has been drawn to a libellous and defamatory advertisement purporting to be signed by you, which appears in the first page of this day's issue (23rd. November 1889) of the *Bangabasi* newspaper. I am instructed by my client that the matter contained in the advertisement in question has no foundation in fact and is a gross libel on him. I am also instructed to call upon you to offer an ample and satisfactory apology within twenty four hours for the unfounded calumny that you have caused to be published in the above-named newspaper. Should no apology be forthcoming, I am instructed by my client to take such Criminal or other proceedings as he may be advised on Monday next the 25th of November 1889 without any further reference to you.

12 Nebutala Bowbazar
Calcutta, 23rd November 1889.
6 P. M.

Yours faithfully,
HEM CHANDRA RAI.
M. A. B. L.
Pleader, Judge's Court
24 Pergunnahs.

ইহার তাৎপর্য্য এই ;—

"কলিকাতা সহরের ১৬৯ নম্বর মানিকতলা ষ্ট্রীটবাসী নূতন বাল্মিকী প্রেসের স্বত্ত্বাধিকারী বাবু পরেশ নাথ মিত্র আমার মক্কেল। অদ্য ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ২৩এ নবেম্বরের বঙ্গবাসীর প্রথম পৃষ্ঠায় আপনার দস্তখতি আমার মক্কেলের মানহানী এবং নিন্দাজনক যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আমার মক্কেলের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। আমার মক্কেল আমাকে উপদেশ দিতেছেন যে, উপরোল্লিখিত বিজ্ঞাপনের লিখিত বিষয়ের মূলে কোনই সত্য নাই; এবং উহা তাঁহার ঘোর মানহানীজনক। তিনি আমাকে আরও উপদেশ দিয়াছেন যে, উপরোক্ত সংবাদ পত্রে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া আপনি যে তাঁহার মিথ্যা কলঙ্ক রটনা করিয়াছেন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাহার সন্তোষ জনক মার্জ্জনা প্রার্থনা করিবার জন্য আপনাকে যেন পত্র লেখা হয়।

আর যদি মার্জ্জনা আপনি না চাহেন, তাহা হইলে আপনার নামে ফৌজদারীই হউক, কিম্বা আর যাহা কিছুই হউক, যেরূপ উপদেশ পাইব, ১৮৮৯ সালের ২৫এ নবেম্বর আগামী সোমবার আমি আপনার নামে সেইমত নালিশ করিব। তজ্জন্য আপনাকে আর কোন জিজ্ঞাসাবাদ করিব না।"

পত্রের দস্তখত

এইরূপ :—'আপনার বিশ্বাসী হেমচন্দ্র রায়,

এম্, এ, বি, এল,

উকীল, জজ আদালত

২৪ পরগণা।

ঠিকানাও তারিখ এইরূপ :—

"১২ নং নেবুতলা,

বৌবাজার,

কলিকাতা, ২৩এ নবেম্বর, ১৮৮৯।

সময় রাত্রি ৬টা।"

রাত্রি ৯টার পর আমরা তো এই পত্র পাইলাম। পত্র পাইয়া অবশ্য আমরা কোনরূপ ভীত বা চিন্তিত হই নাই। মার্জ্জনাপত্র তো পাঠাই নাই; আর কিছুতেই পাঠাইবও না। তা' সেকথা এখন যাক। পত্র পাইয়া, 'এমনতর কাণ্ডের উকীলটী কে, জানিবার জন্য আমাদের একটু ইচ্ছা হইল। ১৮৮৮ সালের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কালেণ্ডার দেখিলাম; খুঁজিয়া বি, এল, তালিকার মধ্যে হেম চন্দ্র রায়ের নাম তো পাইলাম না! তবে ১৮৮৫ সালের এম, এর লিষ্টের মধ্যে এক হেম চন্দ্র রায়ের নাম দেখিলাম। কিন্তু নিকটেই তো বৌবাজার—নেবুতলা; সন্দেহের দরকার কি? আর এদিকেও ২৪ ঘণ্টা প্রায় উতরাইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। এই রকম নানা প্রকার ভাবিয়া আমরা একবার হেমবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করাই সাব্যস্ত করিলাম। নেবুতলায় গেলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে হেমবাবু তখন বাসায় ছিলেন না; দেখা হইল না। তবে বাসায় পরিচয় লইয়া জানিলাম, বাবুটী বাড়ী ঢাকায়; সবে এইবার মাত্র বি, এল পা করিয়াছেন। কিন্তু এসব কথার অত দরকা কি? আর দুটা কাজের কথা বলি, শুনুন।

মফঃস্বল হইতে এই সব স্যরকুলার—বিজ্ঞাপন এবং তৎসহ প্রতারিত লোকের প পাইয়া গত ৮ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার আম কলিকাতা পুলিশ-আপিসে গিয়া ডেপুটি কমি সনর শ্রীযুক্ত বার্ডণার্ড সাহেব বাহাদুরে সহিত সাক্ষাৎ করি। আমাদের মুখে প্রা পত্রাদির কথা শুনিয়া এবং বিজ্ঞাপনের এ আধটু আভাস দেখিয়া বিচক্ষণ সাহে বাহাদুর ব্যাপার কতকটা বুঝিতে পারিলেন বুঝিয়া ইহার অনুসন্ধানের জন্য ডিটেক্‌টি পুলিসে পত্র লিখিলেন; এবং অনুসন্ধানে ফলাফল আমাদিগকে সত্বরেই জানাইবে বলিয়া দিলেন। সাহেবের অনুগ্রহে আম বড়ই বাধিত হইলাম।

ডিটেক্‌টিভের তদারক।

১০ই অগ্রহায়ণ রবিবার ডিটেক্‌টিভ আপি সের দুইজন কর্ম্মচারী তদারকে ১৬৯ মাণিকতলা ষ্ট্রীটে গমন করেন। তদার কেমন হইয়াছে, ইহাতে তাঁহারা কি বুঝি ছেন, তাহা তাঁহারা জানিয়া গিয়াছেন তবে আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে বুঝিয়াছি যে, এ ব্যাপার যে সম্পূ জুয়াচুরী তাহা তাঁহারা বেশ স্পষ্ট বুঝি আসিয়াছেন। ডিটেক্‌টিভেরা যখন তদার করিতেছিলেন, তখন ঘটনাক্রমে আমার একজন সে স্থলে যাইয়া উপস্থিত হই ছিলেন। পুলিসের সহিত পরেশনাথ মিত্রে যেরূপ কথাবার্ত্তা শুনিয়াছি, তাহার এক আভাস পাঠকগণকে দেওয়া নেহাত ম কি? ইহাতেও তো তাঁহারা ঐ বিষম জু

চুরী কাণ্ডের কতকটা পরিচয় পাইবেন। প্রথমেই পরেশ নাথের পরিচয়। পরেশ নাথের নিবাস হুগলি জেলায় শ্রীরাপুর মহকুমার অধীন আটপুর গ্রামে। শ্রীরামপুর মিশনরি স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতেই তাহার পাঠ পরিসামপ্ত হয়। তারপর আর পড়া-শুনা হয় নাই। পরেশনাথ এই বাষ্পিকী যন্ত্রের স্বত্বাধিকারী বলিয়াই পরিচয় দিলেন। এই 'রত্নগৃহ' কাণ্ড পরেশনাথের নিজকৃত কি না, তাহাই জিজ্ঞাসা করা হইল। তিনি প্রথমে আমতা আমতা করিয়া সারিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু পুলিশ বাবুরা পরিচয় দিয়া বলিলেন,—"বাবু, এ ঠাট্টাতামাসার কথা নহে। আমরা ডিটেক্‌টিভ পুলিসের কর্ম্মচারী। আদিষ্ট হইয়া, অনুসন্ধান করিতে এখানে আসিয়াছি। সকল কথা খুলিয়া বল— আমতা আমতা করিলে চলিবে না।" তখন পরেশনাথ বলিলেন,—"যখন আমার নামে এটা বাহির হইয়াছে, তখন সুতরাং আমারই।" কিন্তু আবার প্রশ্ন হইল। এইরূপ দুই তিন বার প্রশ্নের পর পরেশনাথ বলিলেন যে, "এ কাজে ধীরেন্দ্রনাথ পাল আছেন; আরও আছেন, দুইজন।" ধীরেন্দ্রনাথের সহিত একাজের সম্পর্ক কি জিজ্ঞাসা করা হইল। শ্রীমান পরেশনাথ উত্তর দিলেন,—"ধীরেন আমার প্রেসে 'শান্তি' ছাপাইতেন। টাকাকড়ি বড় পাই নাই। তাঁহার কাছে এখনও পাঁচশ' টাকার উপর পাওনা। ধীরেন বলিয়াছেন যে, রত্নগৃহের এই ফন্দি বাহির করিয়া আমাকে ঐ পাঁচশত টাকা দেওয়াইবেন। সেই ফন্দিতেই রত্নগৃহের সূচনা।" শান্তির আপিস এই ১৬৯নং মানিকতলা ষ্ট্রীট বাষ্পিকী যন্ত্রের বাড়ীতে কি না—এই কথা জিজ্ঞাসা করা হইল। আবার নাহুঁ নাহুঁ—তখন প্রশ্নের উপর প্রশ্ন চলিল। পরিশেষে মিত্রজা বলিয়া ফেলিলেন যে, ধীরেনের টাকাকড়ি নাই; তাই এখানে এসেই তাঁরা বসেন; প্রুফটা-আসটাও দেখেন; একটু আদটু কাজকর্ম্মও করেন। শান্তি এখান হইতেই বিলি বিক্রিয় হয়।"

তখন, শান্তির কথা ছাড়িয়া আবার রত্নগৃহের কথা পড়িল। ডিটেক্‌টিভ কর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই রত্নগৃহের প্রকৃত ব্যাপারটা কি? আপনারা কি প্রকৃতই এই একশত খণ্ড এই সব বই দিবেন?" পরেশ নাথ বলিলেন, "না! আমরা একখণ্ড বই দিব; তাহাতেই এই এক শত পুস্তকের সার থাকিবে। এই সমগ্র পুস্তক খণ্ড হইবে, আন্দাজ দেড় শত ফর্ম্মা।" জিজ্ঞাসা করা হইল তোমরা যে এই সংক্ষিপ্তসার দিব বলিতেছ, তোমার প্রচারিত বিজ্ঞাপনস্যরকুলার তাহার কোন আভাস আছে কি? এবার আর পরেশনাথের মুখে বাক্য সরিল না। তখন আবার জিজ্ঞাসা হইল আচ্ছা তোমার কথাই যদি সত্য হয় তবে তোমার বিজ্ঞাপন লোক ঠকান misleading কি না? ইহাতেও পরেশনাথ নিরুত্তর রহিলেন, কোন উত্তর করিতে পারিলেন না; তাঁহার মুখে কথা ফুটিল না। আবার জিজ্ঞাসা হইল যে, কাশ্মীরী শাল দিব বলিয়া তুমি যে এখন গ্রাহককে দিবার জন্য জীর্ণ একখণ্ড শাল কাষ্ঠ বাহির করিতে চাহিতেছ ইহার কি? এবারও নিরুত্তর। পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে, বিজ্ঞাপন স্যরকুলারে এইরূপ প্রকাশ। তাই ডিটেক্‌টিভ বাবু এক খণ্ড পুস্তক দেখিতে চাহিলেন। পরেশনাথ বলিলেন,—"পুস্তক ছাপা হয় নাই। পৌষ মাসের ১১ই ছাপা হইয়া বাহির হইবে।" ডিটেক্‌টিভ বাবু তাহাতে বলিলেন,—"তবে ১১ই পৌষই বই লইতে আসিব।" তখন, চাপাচাপি করায়, পরেশনাথ বলিলেন, "পৌষ মাসের শেষাশেষেই আসিবেন।" বাবু বলিলেন,—"আচ্ছা, বই তো কিছু ছাপা হইয়াছেই; তাই-ই দেখি না কেন?" ইহাতেও প্রথমে নাই-নাই পড়িয়াছিল। এখানে ওখানে ছাপা হইতেছে বলিয়া পরেশনাথ

কথাটা উড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু পারিলেন না। অবশেষে বার পেজী ডিমাই এক ফর্ম্মা বাহির করিলেন। দেখিয়াই তো আমরা অবাক্! এই ১২ পেজী ডিমাই ফর্ম্মার মধ্যে সপ্তকাণ্ড রামায়ণের সমগ্র শেষ করিয়া আবার একখানা বই আরম্ভ করা হইয়াছে। এই সংক্ষিপ্ত সার দেখিয়া আমাদের সেকালের মৌলবী সাহেবের একটা গল্প মনে পড়িল। গল্পটা বলা বোধ হয় নেহাত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। গল্পটা তবে শুনুন।—

সেকালে সম্ভ্রান্ত হিন্দু সন্তানকে মৌলবী সাহেবের নিকট পারসী শিখিতে হইত। একদিন একটী সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্রাহ্মণ সন্তান মৌলবী সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিলেন যে, আমাদের বাড়ীতে মহাভারত পাঠ হইবে। আমি আর তিন মাস কাল পড়িতে আসিতে পারিব না। মৌলবী সাহেব তো শুনিয়াই অবাক! তিনি বলিলেন,—"মহাভারতের কথার জন্য তিন মাস কামাইয়ের প্রয়োজন কি? ওতো পাঁচ মিনিটেরও কাজ নহে।" ছাত্র ব্রাহ্মণ-তনয় বলিলেন,—"যে বলেন কি মৌলবী সাহেব! অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত, লক্ষাধিক শ্লোক, তাহার পাঠ, ব্যাখ্যা, কথকতা তিন মাসেও সমাপ্ত না হইবার কথা! আমি ভয়ে ভয়েই আপনাকে তিন মাসের কথা বলিয়াছিলাম। আপনি পাঁচ মিনিটের কথা কি বলিতেছেন?" মৌলবী সাহেব বলিলেন,— "তুমি ছেলে মানুষ জান না। তোমাদের মহাভারত পাঁচ কথায় পূর্ণ। বিশ্বাস না হয়, শুন।" তখন মৌলবী সাহেব সেই পাঁচ কথার মহাভারতের কেমন বিবরণ দিতেছেন, শুনুন, মৌলবী সাহেব বলিলেন,—"এক কুত্তি (কুন্তী) থি। উস্‌কা পাঁচ লেড়্‌কা থা। এক [illegible] মুধিষ্টিরা, একঠো কা নাম ভীমা, [illegible] অর্জুনা, আর দু' ভেড়ুয়া কা নাম [illegible] নেই। উস্‌কা পিছে একটা কালা (কৃষ্ণ) বেড়াইতে থা। তো ফস্‌লাই করকে ফস্‌লাই করকে (উসকাইয়া উসকাইয়া) একঠো লড়াই খাড়া কিয়া। তো দিল্লিকো রাজা যো দুর্য্যোধন থা উস্কো মারডালে তো ইস্কো রাজা কিয়া। এই তো তোমরা মহা-ভারত হ্যায়। এর জন্য আবার তিন মাসের ছুটী?" আমাদের এই পরেশ নাথ বাবুর 'রত্নগৃহেও' এইরূপ সংক্ষিপ্ত সারে পূর্ণ হইতেছে; তাহার মুদ্রিত রামায়ণের নমুনা দেখিয়া তাহা আমরা বুঝিয়াছি—পুলিশ কর্ম্ম-চারীদ্বয়ও অবশ্য বুঝিয়া আসিয়াছেন। আর যাহারা পুরা ৫৲ পাঁচ টাকার জগতের সমগ্র গ্রন্থ পাইবেন বলিয়া বড় আশায় বুক বাঁধিয়া শ্রীমান পরেশ নাথকে ৫৲ পাঁচটী করিয়া টাকা পাঠাইয়াছেন, তাঁহারাও এখন বুঝিতে পারিবেন।

রামায়ণের এ পরিচয়ের পর অন্য কোন গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া বোধ হয় আবশ্যক হইবে না। কিন্তু যাহা দেখিয়াছি, সেটাও বলি। পুলিশ কর্ম্মচারীদ্বয় যেখানে বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের পার্শ্বেই একটী বাবু প্রুফ দেখিতেছিলেন। তাঁহার কাছ হইতে সেই প্রুফটী চাহিয়া লইয়া বাবুরা দেখিলেন, মিলটনের 'প্যারাডাস লষ্ট' নামক পুস্তকের সংক্ষিপ্ত বাঙ্গালার প্রুফ দেখা হইতেছে। পরেশনাথ বলিলেন যে, ইহাই মিলটনের প্যারাডাইস লষ্টরূপে রত্নগৃহের রত্নস্বরূপ শোভা পাইবে। এক পৃষ্ঠার মধ্যেই এ "প্যারা-ডাইস লষ্ট" শেষ হইয়াছে। যাঁহারা ইংরাজী জানেন এবং মিলটনের প্যারাডাইস লষ্ট দেখিয়াছেন, তাঁহারা ইহা যে কিরূপ প্রকাণ্ড গ্রন্থ তাহা জানেন। আর তাহার কেমন সংক্ষিপ্ত সার হইতেছে, তাহার আভাস উপরোক্ত ইঙ্গিতেই বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু সংক্ষিপ্ত সার সম্বন্ধে ইহাই যথেষ্ট; অন্য পরিচয় এখন আর দিব না। পরেশ নাথকে

তখন ডিটেকটিভ জিজ্ঞাসিলেন যে তুমি যে প্যারাডাইস লষ্টের এক পাতায় এই সংক্ষিপ্ত-সার করিলে, তুমি প্যারাডাইস লষ্ট পড়িয়াছ কি। পরেশনাথ বলিলেন "না।" তিনি ইহা দেখেন নাই বলিলেই চলে।

এই সব কথার পর ডিটেকটিভ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা তো মূল বই দেখিয়া সংক্ষিপ্ত সার করিতেছ; অতএব একবার মূল অথর্ব্ববেদ খানা দেওনা, দেখি!" তখন পরেশনাথ আমতা আমতা করিতে করিতে বলিলেন যে,—"পুস্তক তো আমাদের এখানে নেই। ধীরেন বাবু (শান্তিসম্পাদক ধীরেন্দ্র নাথ পাল) আমাদের কাছে ১২৲ বার টাকা লইয়া গিয়াছেন। বলিয়াছেন যে,— "প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরীতে' ১২৲ বার টাকা জমা দিলে সমস্ত পুস্তকই দেখিতে ও বাড়ী লইয়া আসিতে পারা যায়।" তখন জিজ্ঞাসা করা হইল যে,—"প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী কোথাও?" উত্তর—"তাতো জানি না; সে ধীরেন বাবুই জানেন!" পরেশনাথ আর সাম-লাইতে পারিলেন না; সহসা বলিয়া ফেলি-লেন,—"ধীরেন তবে আমাদের সঙ্গেও জুয়াচুরী খেলিয়া ১২টা টাকা ফাকি দিয়াছে নাকি?" প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরীর অনুসন্ধান আমরাও লইয়াছিলাম। সহর খুঁজিয়া তো পাইলাম না। অবশ্য আমাদের অনুসন্ধানের ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু অবশেষে ৫৪ নং কলেজ ষ্ট্রীটে দেখিলাম তিন চার দিনের নূতন খোলা একটী দোকানের উপর টীনের পাতে "প্রেসি-ডেন্সি লাইব্রেরী" কথাটি লেখা রহিয়াছে। একটু ঔৎসুক্য জন্মিল। সেই প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরীতে গেলাম। দোকানদার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আপনার এখানে বেদ, উপনিষদ, দর্শন, পুরাণ এসব পাওয়া যায় কি? দোকানদার তো শুনিয়াই অবাক! আমারা তখন আবার জিজ্ঞাসা করিলাম যে, টাকা জমা লইয়া আপনি লোককে পুস্তক দেখিতে বা পড়িতে দেন কি? তিনি বলিলেন,—"না মহাশয়, আমি মোটে এই দিন দুই তিন দোকান খুলিয়াছি; এসব আমি কিছুই করি না। বেদ দর্শন আমি কোথায় পাইব?" তখন আবার জিজ্ঞাসা করা গেল,—"আপনি বেশ মনে করিয়া দেখুন, এমন তো কাহাকেও পুস্তক দেন নাই।" তিনি বলিলেন,—"না!" তখন তাঁহাকে আবার প্রশ্ন হইল,—"আপনি যে লাইব্রেরীর নাম প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী দিয়াছেন, তা' এনামে অন্য লাইব্রেরী আছে, আপনি জানেন?" তিনি বলিলেন,—"না! আমি বহুকাল পুস্তকের ব্যবসায় করিতেছি, অনেক যায়গায় পুস্তকালয়ের সন্ধান লইয়াছি, কিন্তু প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী নামে কোন লাইব্রেরীর সন্ধান আমি কখনও পাই নাই। তাই নূতন নাম বলিয়া আমার এ পুস্তকা-লয়ের নামকরণ করিয়াছি, প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী।" ইহার পর অনুবাদের কথা পড়িল। পরেশনাথ বলিলেন তিনি কিছুই সংস্কৃত জানেন না। বেদ, উপনিষাদি কোন পণ্ডিতে অনুবাদ করিতেছেন, ডিটেকটিভ তখম তাঁহাদের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। পরেশনাথ বলিলেন, "সে সব আমি কিছুই জানি না, সবই ধীরেন বাবু জানেন।"

পাঠক! পরেশনাথের 'রত্নগৃহ' কাণ্ডের কতক কতক পরিচয় পাইলেন। এসম্বন্ধে আমাদের আরও অনেক বলিবার আছে। কিন্তু আজ আর বলিব না। ব্যাপার কতদূর গড়ায়, আপনারা ক্রমে জানিতে পারিবেন।

যাঁহারা রত্নগৃহের জন্য পরেশনাথকে টাকা পাঠাইয়াছেন, তাঁহারা কি বুঝিয়া টাকা পাঠা-ইলেন, নিজের নামধামসহ আমাদিগকে এই সংবাদটী দিলে আমরা বাধ্য হইব। দশেরও বিশেষ উপকার হইবে। আর তাঁহারা যদি ভ্রমে পড়িয়া প্রতারিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের টাকা উদ্ধারের কতকটা উপায় হইবে।

লিবরপুলে ভারতবর্ষের জাতীয় সমিতির কথা।

(উদ্ধৃত)

লিবরপুলের রিফরম ক্লব সে দিন জর্জ ইউল সাহেব ও, শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের বিলক্ষণ সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। সেই উপলক্ষে যে সভা হইয়াছিল, তাহাতে ভারতবর্ষের জাতীয় সমিতির সম্বন্ধে অনেকে বক্তৃতা করেন। তন্মধ্যে ইউল সাহেবের বক্তৃতা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়। তিনি কংগ্রেসের উদ্দেশ্য এবং ইহার কার্য্য প্রণালী সংক্ষেপে ব্যক্ত করিলেন। বলিলেন, কংগ্রেসের কার্য্য হিত পরিপূর্ণ, এবং কংগ্রেস ভারতবর্ষের জাতিসাধারণের বিদ্যাবুদ্ধির উন্নতির চিহ্ন ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইংরাজ জাতির যে সম্প্রদায় ভারতবর্ষীয় যুবকদিগের শিক্ষা ও উন্নতির বিষয়ে যত্ন লইয়া থাকেন, তাঁহারা কংগ্রেসের কার্য্যে অবশ্যই আহ্লাদিত হইয়াছেন। যে সকল ইংরাজ কংগ্রেসের বিরোধী, তাঁহাদের ইহা মনে করা উচিত যে, শিক্ষিত ভারতবর্ষীয়দিগের উচ্চ আশার চরিতার্থতার নিমিত্ত যদি কেহ দায়ী থাকেন, সে দায়িক ইংরাজ। ইউল সাহেব আরও বলিলেন, "ইংরাজই ভারতবাসী যুবকদিগকে পাশ্চাত্য সাহিত্য বিজ্ঞান ও শিল্পের শিক্ষা দিয়াছেন, এবং দিতেছেন। ইংরাজই ইংরাজের অহঙ্কার ও গৌরবের বিষয়ীভূত বৃটিশ রাজ-শাসন-প্রণালী ভারতবর্ষীয় ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, ও দিতেছেন। এমত স্থলে যদি শিক্ষিত ভারতবর্ষীয় যুবকেরা শিক্ষকের পদানুসরণ করিতে যায়, তাহা হইলে সেই শিক্ষাদাতা দোষী, না, শিক্ষিত ছাত্র দোষী? তাহাদিগকে যেমন শিখান হইয়াছে, তাহারা তেমনি করিতে যাইতেছে। ইহাতে দোষী শিক্ষক, ছাত্র নহে। যদি ইংরাজগণ শিক্ষিত ভারতবর্ষীয়দিগের উচ্চ আকাঙ্ক্ষায় দোষ ধরেন, যদি রাজনৈতিক উন্নতির নিমিত্ত তাহাদের আন্দোলন ও চেষ্টাতে বিরক্ত হন, তাহাদিগকে মোটে শিক্ষা দেওয়াই উচিত ছিল না, এবং তদ্দ্বারা আপনাদের মহত্ত্বের পরিচয় দান করারও কোন আবশ্যকতা ছিল না। যখন তাহাদিগকে সেই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তখন ইংরাজের পদ্ধতির অনুসরণ করায়, বা তাঁহাদের ন্যায় সভা সমিতি করিয়া বক্তৃতাদি করায় ভারতবাসী তিরস্কারার্হ হইতে পারে না।"

তিনি আরও বলিলেন, "যদি ভারতবর্ষীয় যুবকদিগের সঙ্গত উচ্চ আকাঙ্ক্ষার আমরা পোষণ করি, তাহা হইলে ভারতবর্ষের কোটী কোটী লোক আমাদিগের সহিত এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইবে যে, সে বন্ধন চিরকালের জন্য ছিন্ন হইবার নহে। পক্ষান্তরে যদি তাহাদিগকে গন্তব্য পথে বাধা দেওয়া যায়, তাহা হইলে উহাদিগের মধ্যে অসন্তোষের পুষ্টিসাধন করা হইবে, সেটী উহাদের মধ্যেও অসুবিধা এবং আমাদিগের মধ্যেও অসুবিধা, এবং তাহা কষ্ট ও বিসম্বাদের সময়ে বিশিষ্টরূপে পরিস্ফুট হইবে।"

ইউল সাহেবের এই সকল কথা ইংলণ্ডের মুখোজ্জ্বলকারী উদারচরিত্র তাবৎ ইংরাজের মনেই প্রতিধ্বনিত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহারা অবশ্য মনে করিবেন যে, ইংরাজি জ্ঞান শিক্ষার অবশ্যম্ভাবি স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন প্রবৃত্তিরূপ যে ফল, তাহা যখন ইংরাজেরাই এতদ্দেশীয়দিগের হস্তগত করিয়াছেন, তখন সেই ফল ভোগে ইহাদিগকে বাধা দিলে কিরূপ অবস্থাই ঘটিবে। ইংরাজের উপদিষ্ট পথে চলিবার নিমিত্ত তাঁহাদের স্থানে উৎসাহ পাওয়াই আবশ্যক। এতদ্দেশীয়েরা তাহারই আশা করিয়া থাকে। অতএব ইহারা যাহাতে আপনাদের উন্নতি করিতে পারে, সে বিষয়ে সাহায্য করাই ইংরাজের

গৌরবের বিষয়। অধীন ব্যক্তিদিগের প্রতি উদার ব্যবহার করিতে ইংরাজ ভিন্ন অপর জাতি জানে না। এতদ্দেশীয়দিগের ইহা ধ্রুব সংস্কার। তাই ইংরাজ শাসনের প্রশংসা এতদ্দেশীয় আপামর সাধারণের মুখেই ব্যক্ত হইয়া থাকে। ইউল সাহেব উপসংহারে বলিয়াছেন যে, ইংলণ্ড ভারতবর্ষের অনুকূলে অনেক কার্য্য করিয়াছেন, কিন্তু এখনও অনেক কার্য্য করিতে বাকি আছে।

মতামত।

রঙ্গভূমি সম্বন্ধে।

বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমে 'শকুন্তলা'।

গত দুই সপ্তাহ হইতে বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমে 'শকুন্তলা' নামক একখানি নূতন 'নাট্য-একটী' অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। মহাকবি কালিদাসের 'শকুন্তলা' এক অপূর্ব্ব রত্ন; বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমির অধ্যক্ষ বাবু কুঞ্জবিহারী বসু মহাশয় সেই আদর্শ রত্নের অনুসরণে এই নাট্যগীতি প্রণয়ণ করিয়াছেন। এ অনুসরণে প্রবৃত্ত হওয়া বড়ই দুরূহ কার্য্য;—কৃতকার্য্য হইবার আশা স্বভাবতঃই অল্প। আর সেই জন্যই প্রথম হইতেই আমাদের শঙ্কা হইয়াছিল যে, কুঞ্জবাবু হয় তো বা এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। কিন্তু এক্ষণে অভিনয় দেখিয়া বুঝিলাম যে, আমরা তাঁহার নিকট যাহা আশা করিতে পারি, তিনি এ বিষয়ে তাহারও অধিক কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাঁহার উদ্যোগ নিষ্ফল হয় নাই। অভিনয় কার্য্য যথেষ্ট সুন্দর হইয়াছিল। গানগুলি এরূপ সুর-লয়-যুক্ত সুন্দরে গীত হইয়াছিল যে, সকলেই তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পুনর্ম্মিলনে পুত্র সর্ব্বদমনকে কোড়ে লইবার সময় সুকোমল বালক-কণ্ঠের সেই গানটী :—

মিশ্র দেবকিরী—একতালা।

তুমি দেশের রাজা হয়ে আমার মাকে চিন্‌লে না,
বুঝি দুঃখিনী বনবাসিনী বলে তাই মাকে চিন্‌লে না॥
আমি তোমার কোলে তো যাবনা, না, না, না,
আমি তোমার কোলে তো যাবনা, না, না, না;—
মা মা মা, আমায় কোলে নেনা;
তুই মা একবার আমায় কোলে নেনা;
যে পিতা তোকেও স্নেনে না, আমায়ও জানে না,
আমি কখন সে পিতার কোলে যাবনা, কোলে নেনা;
যে পিতা এতদিন ধরে কাঁদাইল ভোরে,
কখন সে পিতার কোলে তো যাবনা।
কোলে নেনা, মা মা মা, কোলে নেনা॥"

বড়ই মধুর; এইরূপ আরও অনেকগুলি সুমিষ্ট গান ছিল; কিন্তু স্থানাভাবে—আমরা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। তবে সংক্ষেপে এই বলি যে,—প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে "বোধোনা বোধোনা রাজা সরলা হরিণী" ঋষিকুমারদ্বয়ের এই গানটীও অপ্সরাগণের "উঠ শশী গগনেরি ভালে আজি সুহাস বদনে" প্রভৃতি গানগুলির সুরও অতি সুন্দর। দেখিয়া বোধ হইল, সুরযোজনায় গ্রন্থকার অধিক নিপুন। দুষ্মন্ত, জেলে ও শকুন্তলা প্রভৃতির অংশ ও দক্ষতার সহিত অভিনীত হইয়াছিল। ফলতঃ, সে দিনের অভিনয় দেখিয়া আমরা পরিতুষ্ট হইয়াছি। অধিকন্তু অপ্সর কাননের শেষ দৃশ্যটি বড়ই সুন্দর হইয়াছিল। আমরা সেবার 'থিয়েটার রএল নামক ইংরাজী নাট্যশালায় 'শ্লিপিং বিউটীর' (Sleeping Beauty) অভিনয়ে যে সুন্দর দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, এটি যেন তাহারই অনুকরণ বলিয়া মনে হয়। উপসংহারে বক্তব্য এই যে, যদিও সমালোচকের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কোন কোন দোষ দেখা যায়, কিন্তু অনুসরণের গুরুত্ব বুঝিয়া তাহা আর দেখাইতে আমরা ইচ্ছুক নহি।

বীণা রঙ্গভূমে 'চমৎকার'।

সম্প্রতি বাবু রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের রঙ্গালয়ে 'চমৎকার' নামক এক নূতন নাটকের অভিনয় হইতেছে। 'চমৎকার' নাটকের ঘটনাকৌশল প্রকৃতই 'চমৎকার' বটে! এরূপ সুন্দর অথচ স্বাভাবিক ঘটনার সমা-

বেশ গ্রন্থকারের বড় অল্প নিপুণতার পরিচায়ক নহে। বিশেষতঃ অভিনয়াংশেও নাটক খানির স্থানে স্থানে বড়ই জমজমা হইয়াছিল। ধনেশ্বর সিংহ রায়ের অভিনয়—বিশেষতঃ দস্যু কর্ত্তৃক অর্থাপহরণের সংবাদ প্রাপ্তির পর, বড়ই সুন্দর ও স্বাভাবিক মুদীর দোকান, মুদির সাজ-সজ্জা, কথাবার্ত্তা, লুটপাট ব্যাপার, সমস্তই পরিপাটী বলিতে হইবে। সর্ব্বাপেক্ষা শেষ মিলন দৃশ্য! সেটিতেই নাটকের সম্পূর্ণ সার্থকতা, সেই দৃশ্যেই চমৎকার!! এ রচনা-কৌশল এক 'অপূর্ব্ব কারাবাস' ব্যতীত আমরা আর কোন পুস্তকে দেখিয়াছি বলিয়া মনেই হয় না। ফলতঃ এরূপ অভিনয়ের আবার সম্পূর্ণ প্রতিপোষণ প্রার্থনা করি।

উপসংহারে উক্ত রঙ্গালয়ের নূতন অভিনীত আর একখানি প্রহসন—'ঘোষের পো'! সে খানিও বড়ই মজাদার! দেখিতে-শিখিতে অনেক জিনিস তাহাতে আছে। আমরা সে সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলি না—যাঁহাদের জন্য সেখানি চরিত, তাঁহারাই তাহাতে শিক্ষা পাইবেন।

মফঃস্বলের বিবরণী।

ঘিয়র, মানিকগঞ্জ, ঢাকা।

আবাদাদি ভাল নহে। না পাকিতেই জলমগ্ন হওয়ায় আউস ধান্য তো হয়ই নাই। অধিকন্তু আমনের আশাও ভাল নহে। চুরী-জুয়াচুরীও দেখা যাইতেছে। পেটের দায়ে মহাজনের পাট চুরী করিয়া সেদিন দুই জন চোরের মেয়াদ হইয়াছে।

আন্দুল, হাবড়া।

"আন্দুলের স্বর্গীয় রাজা বিজয় কেশব বাহাদুরের বিধবা রাজ্ঞী রাণী দুর্গা সুন্দরী প্রজাদিগের দুঃখ নিবারণের জন্য একটী খাল কাটিয়া দিতেছেন; এবং বন্যা নিবারণের জন্য যে সময় বাঁধ আছে তাহাও মেরামত করিয়া

দিবেন, জানা গিয়াছে। আরও তিনি বেড়িয়া এণ্ট্রেন্স স্কুলটীর সমস্ত ব্যয় ভার করিয়া লোকের বড়ই উপকার করিয়া আমরা সর্ব্বান্তকরণে মহারাণীর কামনা করি।

বক ব্রাহ্মণগড়িয়া, বর্দ্ধমান।

গ্রামের আজকাল বড়ই দুর্দ্দশা। যাঁহারা কৃতী সন্তান ছিলেন, তাঁহারা লেই গ্রামত্যাগী হইয়া স্ব স্ব সুবিধা স্থানে বাস করিতেছেন। যাহারা গ্রামে তাহাদের মধ্যেও বিবাদ-বিসম্বাদ সর্ব্বদাই দেখা যায়। পূর্ব্বে স্কুল পো একরূপ ছিল। কিন্তু আজকাল কিছুই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পোষ্ট আপি ত পোষ্ট মাষ্টার মহাশয়েরও এ আর সেই পাঁচ টাকার বেশী না।

বাণেশ্বরপুর, হুগলি।

সম্প্রতি এখানে, সাবিত্রী পুস্তকালয় একটী পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে। রা কদর্য্য ও অপ্রশস্ত।

বকুলপুর, ময়মনসিংহ।

এ গ্রামটী ভাওয়ালের রাজার জমি কিন্তু তাঁহার বর্ত্তমান নায়েবের অত্য এখানে তিষ্ঠান ভার হইয়াছে। অস য়ায় সম্প্রতি গ্রামের একটী ভদ্রলো নায়েব মহাশয়ের নামে ফৌজদারীতে করিয়াছেন। নায়েব মহাশয় উক্ত ভদ্র টীকে না কি কাছারীতে ডাকিয়া লইয়া অবমানিত করেন। তজ্জন্য পুলিসের নায়েব ও তাহার কএকজন সহকারী চালান গিয়াছেন। বিচার চলিতেছে। কন্তু ইতিমধ্যে নায়েব মহাশয়েরও প্রভু রাজা বাহাদুরের নিকট হইতে সে বিষয়ে সাছে।

গোরার অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ড।

বিগত ৭ই নবেম্বর রাত্রি প্রায় ২॥ টার সময় তকগুলি গোরা উত্তর দমদমা মিউনিসিপালিটীর জনৈক কার্য্যকারক ভূতনাথের মুদি দাকানে যাইয়া তাহার নিকট তাড়ি চায়। ত রাত্রিতে কোথাও তাড়ি পাওয়া যাইবে না লিয়া সে তাহাদের জবাব দেয়। তাহাতে কটা গোরা তাহাকে বন্দুক তুলিয়া ভয় প্রদর্শন করে, আর একটা তাহার প্রতি লক্ষ্য রিয়া গুলি ছুড়ে; কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ গুলি াহার গায়ে লাগে নাই। সে প্রাণের ভয়ে াহাদিগকে তাড়ির দোকানে লইয়া চলিল; াকান দেখাইয়া দিয়াই সে দৌড়িয়া পলাইল। াড়িওয়ালা সুধিয়া পাসি এত রাত্রিতে তাড়ি াক্রি করা নিষিদ্ধ বলিয়া তাহাদিগকে তাড়ি তে অস্বীকার করে। একথা শুনিয়া একটা াারা তাহাকে আঘাত করে। সে মার খাইয়া লাইতে চেষ্টা করে, তাহাতে একজন তাহাকে ক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়ে; কিন্তু গুলি তাহার গায় লাগাতে সে ছুটিয়া পলাইল। গোরারা াখান হইতে মাতাবুদ্দিনের ডাক্তারখানায় াল, এবং কাঠের আগড় ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ রিল। ঘরে প্রবেশ করিয়া আলমারী হইতে াচের জিনিশ পত্র বাহির করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ বং দুটা বন্দুকের আওয়াজ করিল। সেই ঔষধালয় পরদিন একটা কাট্রিজ পাওয়া গিয়াছে। াখান হইতে তাহারা একটা মাটে যাইয়া খেজুর াছে চড়িয়া খেজুরের হাঁড়ি হইতে রস পান ার এবং বন্দুক ছুড়ে। সেই মাঠেও কতকগুলি াট্রিজ পাওয়া গিয়াছে। সেই মাঠে সাধ না াটাতে তাহারা অবশেষে গৌরীপুর গ্রামে লিম মল্লিকের বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইল। লিম ঘরের খোলা দাওয়ায় শুইয়াছিল। হাদের গোলমাল শুনিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া াসল। গোরারা তাহার নিকট আসিয়া তাড়ি চাহিল। তাহার নিকট তাড়ি নাই বলিয়া সে জবাব দিল। তাহার উত্তর শুনিয়া একজন দাওয়ার উপর উঠিতে যাইতেছিল, সেলিম তাহাতে আপত্তি করিল। তাহার ঘরের পশ্চিমস্থ আর এক বাড়ীর লোকজনেরা ভয়ে চীৎকার ও গোলমাল আরম্ভ করিল। গোরারা বন্দুক ছুড়িতে লাগিল এবং তাহাদিগকে তাড়ি আনিয়া দেওয়ার জন্য সেলিমকে ধরিয়া লইয়া চলিল। প্রায় ২। ৩ রসি জমি তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল, সে জোর করিয়া পলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল; তখন একটা গোরা তাহাকে এক খালে ফেলিয়া দিল। খালের পার দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে, সে তাহাতে উঠিতে চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু গোরারা তাহার উপর গুলি ছুড়িতে লাগিল। দুবার গুলি তাহার গায় লাগিল, "গোরারা আমায় মেরে ফেল্লে" বলে সে চীৎকার করিয়া উঠিল; আর তাহারা অমনি পলাইল। সে কোন রূপে বাড়ীতে আসিল বটে, কিন্তু ভোরের বেলা ৫॥ টার সময় তাহার মৃত্যু হইল। তাহার বাড়ীতেও কয়েকটা কাট্রিজ পাওয়া গিয়াছে। সহযোগী বেঙ্গলি এই বিবরণ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ৮ই নবেম্বর প্রাতে ১০টার সময় কেণ্টনমেণ্টে গোরাদিগকে সার করাইয়া ভূতনাথকে দিয়া পূর্ব্ব রাত্রির অপরাধীদিগকে সোনাক্ত করিতে চেষ্টা করান হইয়াছিল। ভূতনাথ তাহাদিগের মধ্য হইতে অপরাধীদিগকে বাছিয়া বাহির করিতে সমর্থ হয় নাই। কেণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট তাহাতে নিশ্চেষ্ট না হইয়া অপরাধীদিগের খোঁজ করিয়া দিতে পারিলে ৫ শত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন; পরন্তু হত্যাকারী বা হত্যাকারীগণ ব্যতীত তাহাদের সহিত সংসৃষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ যদি হত্যাকারীদের নাম দেয়, তবে তাহাকে বা তাহাদিগকে ক্ষমা করা হইবে বলিয়াও আশ্বাস দিয়াছেন। কিন্তু আজ

পর্য্যন্তও হত্যাকারীদের কোন খোঁজ খবর হয় নাই। যে পশুরা এমন অমানুষিক হত্যাকাণ্ড করিতে পারে, তাহারা যে আবার স্বেচ্ছা পূর্ব্বক আপনাদের বা সহযোগীদের দোষ স্বীকার পাইবে, তাহা সম্ভবপর নহে। কেবল ঘোষণা প্রচার করিয়া মাজিষ্ট্রেটকে নিশ্চিন্ত বা নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না। এই হত্যাকাণ্ডের সুলাক জন্য গবর্ণমেণ্টের ইহাতে বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন; নতুবা এই দুর্দ্দান্ত পশু প্রকৃতি গোরাদের আস্পর্দ্ধা ও দুষ্প্রবৃত্তি আরও বাড়িয়া চলিবে, দমদমা ও তন্নিকটবর্ত্তী লোকদের নিরাপদে ও শান্তিতে বাস করা ভার হইবে। এরূপ একটা জীবন্ত হত্যাকাণ্ড হইয়া গেল, অথচ তাহার সুলাক হইবে না, অপরাধীর খোঁজ হইবে না,—হত্যাকারীগণ দণ্ড পাইবে না; ইহা অপেক্ষা অরাজকতা আর কি হইতে পারে? সৈনিক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ ও গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ের তদন্তে বিশেষ যত্নবান হন, আমাদের ইহা একান্ত অভিলাষ ও প্রার্থনা।

সংবাদ।

—বিগত মঙ্গলবার পুরীতে ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে।

—এবার আমাদের মহামান্যা মহারাণী স্বয়ং পার্লামেণ্ট মহাসভার অধিবেশন করিবেন।

—ইউরোপীয় কোন পণ্ডিত সিখিয়াছেন যে সুগন্ধি পুষ্পের সৌরভে স্বাস্থ্য ভাল হয় এবং অনেক ব্যাধি হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। এ কথা ইউরোপবাসীদিগের নূতন তাহার কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু ভারতবাসীরা পুরাকাল হইতেই পুষ্পের পক্ষপাতী।

—পরীক্ষার দ্বারায় প্রমাণ হইয়াছে যে, যাহারা বহু দিবসাবধি ইঞ্জিন পরিচালকের কাজ করে তাহারা প্রায়ই স্থূলাকার হইয়া থাকে

—ইতিমধ্যে এইরূপ জনরব উঠিয়াছিল যে হাইকোর্টের মাননীয় জজ শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র মিত্র মহাশয় কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি যে এ কথার কোন মূল নাই।

—কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয় রাজ পৌত্র প্রিন্স ভিক্টরকে এল, এস, ডি উপাধিতে ভূষিত করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

—জাপীলেও তান্তিয়ার প্রাণদণ্ড রহিত হ
আমরা সংবাদ পাইয়াছি যে, মধ্যভারতের
ভদ্র ও ইতর ব্যক্তিগণ তান্তিয়ার প্রাণ
বড়লাট বাহাদুরের সকাশে দরখাস্ত করি
করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তান্তিয়ার
প্রকাশ করা বড়লাটের উচিত। তান্তিয়া
জীবন দ্বীপান্তর করিলে তাহার যথেষ্ট শাস্তি হ

—ইতিমধ্যে কলিকাতা জেনারেল পোষ্ট
১৯ হাজার টাকা হাফ্ নোট শুদ্ধ একটী পুলি
যায়। তদন্তে বিশেষ ফল না পাওয়ায় ক
পোষ্ট মাষ্টার ওয়েন সাহেব চোর ধরিবার একটী
অবলম্বন করেন। তিনি হাওড়া ডাকঘর হইতে
নোট ও নগদ ৫ টাকা করিয়া একটা পুলি
করেন এবং উক্ত পুলিন্দার এক ধার খোলা
অমৃত লাল মিত্র নামে একটী কেরাণী এই
নোট টাকা চুরী করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত হয়।
অন্য চুরীও ইহার কাজ। কিন্তু বিচারে অ
সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষী প্রমাণ হওয়ায় নিষ্কৃতি পা
ছেন। একজন ভদ্র সন্তানকে যে মিথ্যা
কষ্ট দেওয়া হইল তাহার কি কোন প্রতিকার না

—রাজপৌত্র কলিকাতা আগমন উপলক্ষে
কাতা মিউনিসিপালিটী দশ সহস্র টাকা
প্রস্তাব হইয়াছিল। কমিশনরদের গত
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় এবং আ
জন কমিশনার ইহাতে আপত্তি করিয়া বলে
দাতাদের অর্থ এরূপ অভিপ্রায়ে ব্যয় করা
অন্যায়। অবশেষে দশ সহস্র স্থলে দুই স
হইয়াছে।

—লণ্ডন গেজেট প্রকাশ যে, ইণ্ডিয়া
কর্ণেল সার হেনরী ইয়ুল এবং জেনারেল স
ষ্ট্রাটীর স্থলে অপর কেহ নিযুক্ত হইবেন না।

—বিলাতে মিস্ ডি-ভয় নাম্নী একটি যুব
চৌদ্দ হাজার ফিট্ উর্দ্ধ হইতে প্যারাসুট
অবতরণ করিয়াছেন।

—আমরা শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ
যে, টাকীর মুন্সী বংশের অন্যতম জমীদার
নাথ রায় চৌধুরী গত ৩রা অগ্রহায়ণ পর
করিয়াছেন।

—এবার বিলাতে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষ
বসন্ত কুমার মল্লিক উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

—কবরস্থ মৃতদেহে স্বাস্থ্য নষ্ট করে
সমস্ত ইউরোপবাসীদের মত। হিন্দুর সর্
যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্রমে পৃথিবীর সকল জাতিকে
করিতে হইবে।

অনুসন্ধান।

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

৩য় খণ্ড] ৩০এ অগ্রহায়ণ, ১২৯৬ সাল। [৯ম সংখ্যা।

নির্গুণ ব্রহ্মরূপ কৃষ্ণের মাহাত্ম্য।

(অমিত্রাক্ষর ছন্দ*)

নমি হে তোমারে আমি কৃতাঞ্জলি হয়ে
বিশেশ! অশেষ কৃপা-কল্পদ্রুম তুমি
পুরুষপ্রবর। কর প্রকৃতি হইতে
প্রপঞ্চ সংসারে দেব! ভৌতিক পদার্থ
নশ্বর, নশ্বর লূতাতন্তু-জালে যথা
কুজ্ঝটিকাহার। ওহে বিশ্বচিত্রকর!
চিত্রকর কিবা তুমি বিশ্বচিত্রপটে
বিচিত্র! চিত্রিত তব নভে নভোমনি
(জগৎলোচন রবি) জগৎ উজলে।
উছলে চন্দ্রমা-তনু-কান্তির হিল্লোল
পৃথ্বীতে, উছলে যথা সিন্ধুবারি নদে।
আর এক বিচিত্র হে চিত্র অবলোকি
চিত্রকর! চিত্র কর সৌদামিনী ঘনে
(জগৎ-উজ্জ্বলরূপে চকমকে ক্ষিতি।)

কি চিত্র করেছ দেব! মানসহারিণী
উষা, সালঙ্কৃতা দেবী বিবিধ-ভূষণে,
বিভাবরি-শেষে। শিরে উজ্জ্বল মুকুট—
সুখতারা, অর্পে দেবী প্রকৃতি সুন্দরী
সুন্দর, অর্পয়ে কিবা মুক্তাহার গলে।
সে তুষারবিন্দু, হিমগিরি; ফুল্ল ফুল
সৌরভ সহিত অর্পে বসুন্ধরা দেবী,
উল্লাসে চরণতলে; উল্লাসে অরুণ
অর্পে সে তরুণ বাস পূর্ব্বদিক ভাতি।
প্রভাতি মঙ্গল-গান গায় পিককুলে।

অদ্ভুত চিত্রিত তব যামিনী হে বিভো!
তিমিরবরণী, ঘোর ভয়ঙ্কর-রূপা—
বিক্রমশালিনী, যথা শঙ্কর-উরসে
নৃমুণ্ডমালিনী কালী। কাল-বিভাবরী।
বিলম্বিত ছায়াপথ তীক্ষ্ণ অসিধরা—
করালবদনা, বহুনক্ষত্র-দশনা—
চতুর্দ্দিকভূজা, গলে দীপমুণ্ডমালা।
লোলজিহ্বা ধূমকেতু প্রদর্শয়ে রাগে,
লক্ষিত কখন; ঘর্ম্ম তুষারের রাশি।
উল্কাপাত নেত্র-অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সঘনে
নির্গত ভূতলে। একি ভয়ঙ্করা নিশা!
প্রভাতে প্রকৃতি দেবী উজ্জ্বল অরুণ—
রক্তজবা দিয়া সুখে বিসর্জ্জে রজনী।

* প্রবীণ কবি রসিকলাল রায় মহাশয়ের কবিতাটী এই স্থানেই সন্নিবিষ্ট হইল। মাইকেল মধুসূদন দত্তের অনুকরণে অমিত্রাক্ষর-ছন্দে আজকাল অনেকেই কবিতা লিখিয়া থাকেন। কিন্তু দেখুন পাঠক, সে কালের বৃদ্ধ কবি রসিকচন্দ্র সে উদ্যমেও কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন—প্রবীণ কবির প্রবীণ ভাব ইহাতেও কত স্পষ্ট প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

পাদপ, কুসুম তৃণবল্লি বালপর্ণ
বর্ণচয়ে, করেছ কি সমুদ্ভূত চিত্র
চিত্রকর! চিত্রে যেন প্রকৃতি রূপসী
মূর্ত্তিমতি দেবী, হেরি, উল্লাসে উদাসী
গৃহবাসী যোগী। নব পল্লব-সমূহ
কুসুমকলাপে, আহা! কি শোভে উদ্যানে
বসন্তে, শোভিত যথা নক্ষত্রনিকর
নির্ঘন আকাশ! ধন্য চিত্রকর তুমি।
ময়ুরের পুচ্ছে কিবা চন্দ্রময় ছবি
তবাঙ্কিত, শিখী বুঝি প্রদর্শে নীরদে,
অহঙ্কারে, "ঢাকিতে কি পার রে এ চাঁদে,
অম্বুধর" বলে ছলে "কলঙ্কিত নয়।"
তোমার নিয়মবদ্ধ বিশ্বচরাচরে,
বিশ্বনাথ! সদাকাল নিয়মে ভ্রমিছে
শশধর, রবি, বায়ু, ভাসন্তীর পাতি
মঙ্গলাদি গ্রহ। দেবী প্রকৃতিসহায়া
সমস্তে। কে বুঝে তব মাহাত্ম্য জগতে!
ধর হে বিশ্বেশ! তুমি অনন্ত মহিমা,
কটাক্ষে করুণা-দান-শীলতা অনন্ত,
অনন্ত জগতে। তুমি করুণার পাত্র,
পাত্র বুঝি দাতা। আমি অজ্ঞ অতি দান—
যোগ্যপাত্র নহি; তুমি সর্ব্বব্যাপী, বিভো!
আমাতে কি নাই? তুমি জ্ঞানের প্রদীপ
থাকিলে; থাকিব কেন অজ্ঞান-আঁধারে!

শশাঙ্ক-শেখর।

(আত্মকাহিনী)

(৫)

যে সময়ে শিরিশকুমার—"মা! মা! ওঠ—ওঠ, আমি তোমার শিরিশকুমার। তোমায় আমি উদ্ধার করিতে আসিয়াছি"—এই বলিয়া,মাতার বুকের উপর পড়িয়া আক্ষেপ করিতেছিল; আমরা সেই সময়ে তথায় উপস্থিত হইলাম।

শিরিশকুমারের মাতা যেন স্বপ্নে শিরিশকুমারের মূর্ত্তি দেখিয়া বলিলেন,—"কই! কই বাপ আমার! বাবা শিরিশ, কোথায় তুমি!"

বাধা দিয়া শিরিশকুমার কহিল,—"মা! মা! এই যে— এই যে মা!"

মাতা চেতনা প্রাপ্ত হইয়া, চতুর্দ্দিকে পুলিশ-পাহারা দেখিয়া চমকিত হইলেন। সময় বুঝিয়া শিরিশকুমার আবার বলিল,—"মা! মা! এই আমি তোমার শিরিশকুমার!"

মাতা করুণকণ্ঠে কহিলেন,—"বাবা!—বাবা!—"

আর কথা বাহির হইল না। প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র মাতৃক্রোড়ে পড়িয়া প্রাণ ভরিয়া ক্রন্দন করিল। মাতা তাহার মস্তকাঘ্রাণ ও মুখচুম্বন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"একি বাবা? একি?"

শিরিশ।—"কাকার কঠোর হস্ত হইতে তোমায় উদ্ধারার্থ আমায় পুলিশের সহায়তা গ্রহণ করিতে হইয়াছে।"

এমন সময় একজন সার্জ্জন অগ্রসর হইয়া বিজাতীয়ভাষায় আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমরা কে বাপু!" আমি ইংরাজীতে কথার উত্তর দিতে সাহস করিলাম না। কৃষ্ণদাস বাবু উত্তর দিলেন,—"আমরা কোন অভাবনীয় ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছি। আপনারা যদি জানিতে ইচ্ছা করেন, আমি তাহা বলিতে পারি। বিশেষতঃ কোন প্রকারে আমরা এই হরিদাস বাবুর আরও অনেক ঘটনা জানিতে পারিয়াছি। তাহাও আপনাদিগকে জ্ঞাত করিতে ইচ্ছা করি।"

ইন্‌স্পেক্টর্ মহাশয় একবার আমাদিগের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিলেন। তার পর একজন জমাদারের কাণে, কাণে কি বলিলেন। জমাদার তখন আমাদিগের কাছে আসিয়া বলিল,—"আসুন, আপনারা আপাততঃ বাগান-বাটীতে বসিবেন; তারপর এই খানেই বা পুলিশে আপনাদের এজেহার দিতে হইবে।"

কাজেকাজেই আমরা জমাদারের সঙ্গে উদ্যান-বাটীতে যাইয়া সেখানকার সেই 'হল'-ঘরে প্রবেশ করিলাম। 'হল'-ঘরে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আনন্দও হইল, দুঃখও হইল। দেখিলাম, বন্ধনাবস্থায় হরিদাস বাবু, এবং তাঁহার চতুর্দ্দিকে সার্জ্জন-পাহারওয়ালা প্রভৃতি লোকে ঘর পরিপূর্ণ। আমরা জমাদারের সহিত সেই ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র হরিদাস বাবু একবার আমাদিগের দিকে চাহিলেন; এবং তৎপরেই লজ্জায় মস্তক নত করিলেন। কৃষ্ণদাস বাবু তাঁহাকে ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন—"একি হরিদাস বাবু যে! এমন উত্তম কার্য্যে আপনার প্রবৃত্তি কয় দিন?" হরিদাস বাবু কোন প্রকার উত্তর দিলেন না; নতমুখে নীরবে বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই শিরিশকুমার, অবগুণ্ঠনবতী শিরিশের মাতা, ইন্‌স্পেক্টারদ্বয়, চারিজন জমাদার, ১০ জন পাহারওয়ালা এবং ৩০।৩৫ জন গ্রাম্য প্রজা সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। ইহার মধ্যের একজন ইন্‌স্পেক্টার সাহেব, বোধ হয়, অত্যন্ত কোপনস্বভাব ছিলেন; তিনি প্রথমে ঘরে প্রবেশ করিয়াই, ইংরাজী-বাঙ্গালা ভাষায় গালাগালি দিয়া ও উচ্চ চীৎকারে, ঘর কম্পিত করিয়া তুলিলেন। তারপরও আবার দ্রুতগতিতে নিকটস্থ হইয়া সজোরে হরিদাস বাবুকে এক-লাথি মারিলেন, ও নানাপ্রকার গালি বর্ষণের সহিত আস্ফালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে, দেখাদেখি জমাদার হইতে সামান্য কর্ম্মচারী পাহারওয়ালা পর্য্যন্তও আপনাপন সেই অপূর্ব্ব নাগোরা জুতা-শুদ্ধ দুই একটি করিয়া পদাঘাত ব্যবস্থা করিলেন। হরিদাস বাবু নীরবে এ সমস্তই সহ্য করিলেন। কিন্তু তাঁহার মুখের ভাবে বোধ হইল, যেন এই-খানেই তাঁহার পাপের অর্দ্ধেক প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গেল।

(৬)

এই সময়ে গম্ভীর গলায় ইন্‌স্পেক্টার সাহেবের হুকুম হইল,—"ভিড় তফাৎ করো।" অমনি তৎক্ষণাৎ পাহারওয়ালা মহাশয়েরা অপার করুণা বিতরণ-পূর্ব্বক তাঁহাদের সেই ক্ষুদ্র খেঁটেরূপী রুল ঘুরাইতে ঘুরাইতে—"ভিড় তফাৎ—ভিড় তফাৎ"—বলিয়া বাজে লোক-দিগকে সেই ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন। এতক্ষণে ইন্‌স্পেক্টার মহাশয়ের সময় হইল। তিনি তাঁহার পাততাড়ি বাহির করিয়া সকলের এজেহার লইবার জন্য বসিলেন। প্রথমেই আমাদের ডাক হইল। কৃষ্ণদাস বাবু এবং আমি তাঁহাদের সম্মুখে নীত হইলাম। শিরিশ-কুমারের মাতাকে সে স্থান হইতে সরাইয়া অন্য গৃহে লইয়া যাইতে অনুমতি হইল। ইন্‌-স্পেক্টার মহাশয় কৃষ্ণদাস বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার নাম কি?"

কৃষ্ণদাস।—"আমার নাম কৃষ্ণদাস দত্ত।"

ইন্।—"তোমার নিবাস কোথায়?"

কৃষ্ণ।—"আমার আদি বাসস্থান পূর্ব্ব-দেশে। কিন্তু প্রায় দ্বাদশবর্ষ অতীত হইতে চলিল, আমি সিমুলিয়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বমোহন দে মহাশয়ের বাটীতে আছি।"

ইন্।—"সেখানে তুমি কি কর?"

কৃষ্ণ।—"তাঁহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া আমি লেখাপড়া করি।"

ইন্।—"কতদূর পড়িয়াছ?"

কৃষ্ণ।—"Entrance pass হইয়া First Arts পড়িতেছি।"

ইন্।—"এখানে আসিলে কি প্রকারে?"

কৃষ্ণ।—"ঘটনা-চক্রে।"

ইন্।—"কি ঘটনা?"

কৃষ্ণদাস বাবু তখন সেই রহস্যময়ী পত্রাবলী প্রাপ্ত হওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া সেই মুহূ-

ন্তের ঘটনা অবধি বিবৃত করিলেন। কথাবার্ত্তা সমস্তই ইংরাজীতে চলিতেছিল; সুতরাং হীন কর্ম্মচারী পাহারাওয়ালা এবং জমাদারগণ তাহার কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। কেবল আর একজন ইংরাজ-ইন্‌স্পেক্টার তাহা বুঝিতে পারিয়া প্রথমে চমকিত, পরে শিহরিত, তার পর ক্রোধে অজস্রধারে বাঙ্গালী জাতির উপর গালিবর্ষণ ও দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন; এবং আবার হরিদাস বাবুকে দুই তিনবার সজোরে পদাঘাত ও মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। নিদারুণ প্রহারে হরিদাস বাবু—"বাপ্‌রে! মারে!"—রবে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কিন্তু কি করিবেন! লোহার শিকলি দিয়া তাঁহার হস্ত-পদ আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল—তাঁহার কোন ক্ষমতাই ছিল না। সাহেবের প্রহার-লালসা পরিতৃপ্ত হইলে, হরিদাস বাবু একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, আমায় লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—'শশাঙ্কশেখর! তুমিও এখানে?"

আমি এ প্রশ্নের কি উত্তর দিব কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। সুতরাং নীরবেই রহিলাম। কথঞ্চিৎ লজ্জিতও হইলাম। ইন্‌স্পেক্টর কৃষ্ণদাস বাবুকে তখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি হরিদাস বাবুকে জানেন?"

কৃষ্ণ।—"জানি।"

ইন্।—"কেমন করিয়া জানিলেন?"

কৃষ্ণ।—"উনি আমাদের বাড়ীতে যাতায়াত করিতেন?"

ইন্।—"হরিদাস বাবুর সহিত আপনাদের বাড়ীর কাহারও সহিত আলাপ আছে?"

কৃষ্ণ।—"আলাপ? সকলের সঙ্গেই আছে। কারণ, উনি পাড়ার লোক।"

এই অবধি কৃষ্ণদাস বাবুর এজেহার লওয়া শেষ হইল। আমাকেও এইরূপ অনেকানেক প্রশ্ন করা হইল। কৃষ্ণদাস বাবু ইন্‌টারপিটারের কার্য্য করিতে লাগিলেন; অর্থাৎ আমি যাহা বলিতে লাগিলাম সে সকল কথাগুলি ইংরাজীতে এবং সাহেবের ইংরাজী কথাগুলি বাঙ্গালাতে তরজমা করিয়া বলিতে লাগিলেন। কৃষ্ণদাস বাবু যাহা এজেহার দিয়াছিলেন, আমিও বোধ হয় ঠিক তাহাই বলিয়াছিলাম। কারণ, দেখিলাম, সাহেব বাবাজীও আমার দিকে সমান নেকনজরে চাহিয়া গোঁফে চাড়া দিতে লাগিলেন। দুঃখের মধ্যে 'রহস্যময়ী পত্রাবলীর' তাড়াটি ইন্‌স্পেক্টার মহাশয়কে দিতে হইল। বাকি কয়খানা পড়া হইল না।

আমার এজেহার গ্রহণ শেষ হইলে, শিরিশকুমারকে আহ্বান করা হইল। কৃষ্ণদাস বাবু শিরিশকুমারের হইয়াও ইন্‌টারপিটারি করিলেন। ইন্‌স্পেকটার একে একে শিরিশকুমারকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, শিরিশকুমারও তাহার যথাযথ উত্তর প্রদান করিল। তাঁহার (প্রত্যেক প্রশ্নের) প্রত্যেক উত্তর আর শ্রেণীবদ্ধ না করিয়া একেবারে শিরিশকুমার যাহা বলিয়াছিল, সংক্ষেপতঃ তাহাই বলিয়া যাই।

শিরিশকুমার বলিল—"আমার নাম শ্রীশিরিশকুমার দত্ত। পিতার নাম ৺শ্যামদাস দত্ত। তাঁহার দুই কনিষ্ঠ সহোদর। একজনের নাম হরিদাস দত্ত (যিনি আপনাদিগের আসামী); আর ছোট কাকার নাম, গোবিন্দদাস দত্ত। শুনিয়াছি, আমার পিতামহী এখনও জীবিতা আছেন। যখন আমার বয়ঃক্রম আট বৎসর মাত্র, তখন আমার মেজোকাকা (হরিদাস দত্ত) 'নৌকা করে বেড়াতে যাবি' এই কথা বলিয়া আমায় বাটী হইতে বাহির করিয়া লইয়া যান। আমি তখন সামান্য বালক; গঙ্গা কোন্ দিকে, আর কাকা আমায় গাড়ী ক'রে কোন্ দিকে নিয়ে যাচ্চেন, তাহা আমি ভাবি নাই; এবং ভাবিলেও সে বিষয় স্থির করিতে পারিতাম না। যাহা হউক; কাকার সহিত গাড়ী করিয়া আসি কোথায় গিয়াছিলাম, তাহা আজিও জানি না। কেবল এই পর্য্যন্ত আমার মনে আছে যে, কাকা গাড়ীতেই আমার নাকের কাছে একখানি রুমাল নাড়িয়াছিলেন; আর তাহাতেই আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। তাহার পর আমার চেতনা হইলে দেখিলাম যে, আমি একটি বাগানের মাঝখানে, একটি বৃহৎ বাড়ীর নিম্নতলে, লোহার গরাদে দেওয়া ঘরে সুকোমল শয্যায় শায়িত। সে দুর্দ্দিনের কথা আমার মনে এখনও জাগিতেছে। বিছানায় উঠিয়া বসিলাম। দেখিলাম, একজন বৃদ্ধ দরওয়ান আমার পার্শ্বে বসিয়া ক্রন্দন করিতেছে। আমি সে দরওয়ানকে বিশেষরূপ চিনিতাম; কারণ, সে প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া আমাদের বাড়ীতে যাইত। আমরা তাহাকে 'বারাসত বাগানের দরওয়ান' বলিতাম। তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়াও আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সেই অবধি আমি বারাসতের বাগানে বন্দী হইয়া রহিলাম। যখন আমি কাঁদিতাম, তখন সেই বৃদ্ধ দরওয়ান আমায় কোলে করিয়া আদর করিত—মুখচুম্বন করিত, আর প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিত। ক্রমে ক্রমে আমার জ্ঞান হইতে লাগিল, আমি সমস্তই বুঝিতে পারিলাম। যখন আমার প্রায় অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম, তখন একদিন উক্ত বৃদ্ধ দরওয়ান আমায় সমস্ত কথা শুনাইল। অনেক দিন বন্দীস্বরূপে স্থানান্তরিত হইয়া থাকাতে আমি বাটীর বিষয় এক প্রকার সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কেবল মাতার মুখখানি ভুলিতে পারি নাই। দরওয়ানের নিকট মাতার উপরে কাকার অত্যাচার-কাহিনী শ্রবণ করিয়া আমি তাহার সহিত ষড় করিয়া পলায়নের চেষ্টা করিলাম; কার্য্যেও সফল হইলাম। মাতা হুগলিতে বন্দিনীস্বরূপে (আমারই মত) আবদ্ধা আছেন, তাহা দরওয়ান কেমন করিয়া জানিল, এই প্রশ্ন মনে উদিত হওয়াতে, আমি একদিন তাহাকে সে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। সে উত্তর করিল,—হুগ্‌লিতে যে দরওয়ান থাকে, সে আমার পিস্‌তুতো ভাই। সেই আমায় সব বলেছে।' এই সকল কথা শুনিয়া আমার প্রাণ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল; মাতৃ-উদ্ধারার্থ আমি বদ্ধপরিকর হইলাম। ইহার পরই, একদিন রাত্রিতে দরওয়ান আসিয়া আমায় চুপি চুপি বলিল,—'আজ বাগানের সরকার কোথায় চলে গিয়েছে; চল, আজই আমরা পালাই।'

"দরওয়ানের কথার সম্পূর্ণ সম্মতি প্রকাশ করাতে সেই দিনই আমি কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিলাম। যে সময়ে আমি কারাগার হইতে বাহির হইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি ঠিক সেই সময় অন্ধকারের ভিতর দিয়া চারিজন গুণ্ডাকৃতি লোক একটা শবদেহ বহন করিয়া পুষ্করিণীর দিকে যাইতেছিল। হঠাৎ আমাদিগকে দেখিয়া সেই শবদেহ সেইস্থানে ফেলিয়া তাহারা পলায়ন করিল। অন্ধকারে দরওয়ানও সেই গুণ্ডাকৃতি লোকগুলিকে চিনিতে পারে নাই।

"আমরা শবদেহের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম যে, যে ব্রাহ্মণ প্রতিদিন আমায় ভাত দিয়া যাইত, সেই মৃত হইয়াছে। যাহাহউক, আমরা সে সময়ে আপনাদিগের বিপদ লইয়াই ব্যস্ত। সুতরাং অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াও সে খুনের কারণোদ্ধার করিতে পারিলাম না। মায়া-বিবর্জ্জিত হইয়া ধীরে ধীরে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। দিন দশ বার' আমরা ছদ্মবেশ পরিধান-পূর্ব্বক পদব্রজে এখান-ওখান দিয়া ভ্রমণ করিয়া শেষে ১৩ই জ্যৈষ্ঠ হুগ্‌লিতে আসিয়া পৌঁছিলাম। এবং ছদ্মবেশ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিজ নিজ বেশ ধারণ করতঃ বাড়ীভাড়া করিয়া খুব সাবধানে মাতার দুরবস্থার খোঁজ-খবর লইলাম। গোপনে আমার হিতৈষী দরওয়ান 'হুগ্‌লির বাগানের

দরওয়ানের' সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মাতার শোচনীয় অবস্থা এবং (অদ্য) ১৬ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে মাতার উপর কাকা যে প্রকার পাশব অত্যাচার করিবেন তাহা জানিয়া, আমায় জ্ঞাপন করিল। আমি সেই কথা শুনিয়া অস্থির হইয়া পড়িলাম। দরওয়ানকে কোন উপায় নির্দ্ধারণ করিতে বলায়,সে বলিল,—"এখানকার প্রজারা সমস্তই তোমার মেজোকাকার টাকার বশ; তাহারা কখনই তাঁহার বিপক্ষে কাজ করিবে না। তবে তুমি যদি পুলিশের সহায়তা লইয়া এবিষয়ের কোন উপায় করিতে পার, তাহার চেষ্টা কর।' আমি তাহার পরামর্শ-মতই কাজ করিলাম। তাহাকে সঙ্গে করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের বাটীতে যাইয়া তাঁহার হাতে পায়ে ধরিয়া সকল বিষয় জ্ঞাপন করিলাম। তারপর উদারচেতা ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের পরামর্শে যে প্রকারে কার্য্য করিয়া যে ফল দাঁড়াইয়াছে, তাহা আর বলা বাহুল্য।"

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

জুয়াচোর ধীরেন্দ্রনাথ পাল।

ধীরেন আমাদের পাকা জুয়াচোর। বাছা অনেকদিন হইতেই এ জুয়াচুরী-ব্যবসা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এবার বুঝি বাছাকে ফাঁদে পড়িতে হইল! কবির মুখের খেঁউড় গাহিলে লোকে আর তাহাকে বিশ্বাস করিতেছে না, ও করিবেও না। বরং সে নীচত্বে লোকের অবিশ্বাস আরও দৃঢ় হইবে।

ধীরেন আমাদের তারকেশ্বরের মহান্তের পক্ষ। তা যেমন দেবতা, তেমনই উপাসক জুটিয়াছে। মহান্ত মহাশয়ের কলঙ্ক-কেলেঙ্কারী তো জানিতে কাহারও বাকি নাই। এখন বাপাজির উপাসকের একটু বিদ্যা দেখুন। ধীরেন অবশ্য হিন্দু সাজিয়া মহান্তের পক্ষ সমর্থন করিতে বসিয়াছেন। কিন্তু বেচারি হিন্দুয়ানির পরিচয়টা একটু লইবেন কি ইহাতে হিন্দুয়ানি এবং জুয়াচুরী ও বদমায়ে সকল রকমেরই পরিচয় পাওয়া যাইবে। কথাটা বলিতে হইল। নতুবা নীচ লোকে এ নীচ কথা লইয়া আমরা 'অনুসন্ধানের' কলঙ্কলেপন করিতাম না।

বলি, কলিকাতা ছোট-আদালতে ১৮ সালের ২৩,১৫৩ নম্বর যে মকর্দ্দমা রুজু হই ছিল, তাহার খবর কেহ রাখেন কি? মকর্দ্দ মুসলমানের দোকানে মুরগী ইত্যাদি অখা খাদ্য খাওয়ার দরুণ। আদালতে বাদী মা মান হোটেল-ওয়ালার নালিসের হেতুবা বর্ণনা পত্র আছে, প্রতিবাদী বাবু ম ও তাঁহার বন্ধুবর্গ কি কি খাইয়াছি তাহার বিল আছে। ৮ই নবেম্বর তা এ মকর্দ্দমা রুজু হয়। ২২এ নবেম্বর প্র বাদী বাবু মহাশয় লজ্জায় কালামুখ ল আদালতে হাজির হন নাই বলিয়া, মক একতরফা ডিক্রি হয়। তাহার উপর ডি জারি হইয়া মাল ক্রোক হইয়াছে। শুনিতেছি, ইহাতে মোজাহেম পড়িবে। বাদী ওয়ারণ্ট করিয়া প্রতিবাদী মহা গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টায় আছে। ব্যাপার শুনিলেন! কিন্তু এ প্রতিবাদী বাবুটী কে চিনিয়াছেন কি? আদালতে বাবুর পুরা প্রকাশ নাই। আর কোন লজ্জাতেই বা এ তিনি পুরা নাম দিবেন! আদালতে এ মকর্দ্দমার প্রতিবাদী ডি, পাল। এ ডি, পালটি কে? আমাদের মহান্তের পক্ষ কুলচূড়ামণি, পাল-বংশের উজ্জ্বলরত্ন ধীরেন্দ্রনাথ নন তো? ননই বা বলি করিয়া! কেন না, বাদী যে এই ধীরেন্দ্র 'শান্তি'-আফিসেই—শ্রীবিষ্ণু পরেশনাথে সাম, যযু, অথর্ব্ব প্রভৃতি বেদ-প্রকাশের লয়, "রত্নগৃহে"—বাল্মিকী যন্ত্রালয়ে, এই

জারি করিয়া, মাল শিল করিতে গিয়াছিল! শ্রীমান ধীরেন্দ্রনাথই যে এই কুলাঙ্গার, বাদী যে আমাদিগকেও সে কথা বলিয়াছে! তবে কেমন করিয়া বলুন দেখি যে, পালপুত্র ধীরেন্দ্র এ কাণ্ডের নায়ক নন, একথা বিশ্বাস করি! ধীরেন্দ্র কাগজে-কলমে জুয়াচুরী করেন, এই জানি। কিন্তু তিনি যে নিমক্ খাইয়া ছোট-লোকের সহিত নিমকহারামি করেন, এ পরিচয় আমরা ছোট-আদালতের কাগজ-পত্রে এই নূতন পাইলাম। ভদ্রলোকের টাকা ফাকি দেও, সয়; নির্ব্বোধ লোককে বিজ্ঞাপনের প্রলোভনে ফেলিয়া অহম্মুক বানাও, তাহাও জানি; কিন্তু একি অদ্ভুত কাণ্ড! তুমি যদি সংবাদপত্রের সম্পাদক বলিয়া পরিচয় না দিতে, তুমি যদি মহান্তের পক্ষ হইয়া হিন্দুয়ানির গোড়ামি না করিতে, তুমি যদি হিন্দু সাজিয়া অপরের জাতিকুল মজাইবার চেষ্টা না করিতে, তুমি যদি ইংরেজি-মতে পুরা 'প্রাইভেট ম্যান' (Private man) থাকিতে, তাহাহইলে তোমার এ মুখোস খুলিবার প্রয়োজন আমাদের হইত না। কিন্তু তুমি সাধারণের মুখপাত্র সাজ, নিজে এই অখাদ্য খাইয়া সামাজিক পংক্তি-ভোজনে বসিয়া দশের জাতিকুল মজাও, মহান্ত মহাশয়ের পক্ষ হইয়া তারকনাথের পবিত্রতা নষ্ট করিবার চেষ্টা পাও, তাই তোমার এ মর্ম্ম-কথা বাহির করিতে হইল। নতুবা তুমি অতি সামান্য কৃমি-কীট, পদদলিত হইবারও উপযুক্ত পাত্র নহ;—তোমার কথা লইয়া আমরা লেখনী কলঙ্কিত করিতে বসিব কেন?

যাক ও নীচ কথা। ধীরেন্দ্রনাথের পুরাণ জুয়াচুরীর কথাও আজ তুলিতে চাহি না। তবে সম্প্রতি "শান্তি" সংবাদপত্র লইয়া ধীরেন্দ্রনাথ যে জুয়াচুরী খেলিয়াছেন, তাহার যৎসামান্য পরিচয় আজ দিব।

বটতলার শ্রীযুক্ত বৈষ্ণবচরণ বসাক "শান্তি" সংবাদপত্র প্রথমে প্রকাশ করেন। তাহার পর আমাদের ধীরেন্দ্র "শান্তির" সত্বাধিকারী হইলেন। লেখা-পড়া করিয়া তিনি বৈষ্ণবচরণের কাছে "শান্তি" গ্রহণ করেন। এ লেখা-পড়া রেজেষ্টরী হইয়াছে কি না, জানি না। কিন্তু ধীরেন যেরূপ চালাক ছেলে, তাহাতে সে যে সহজে রেজেষ্টারীর বাঁধা-বাধিতে ধরা দিবে, এমন বোধ হয় না। তা' সে খোজে আমাদের তত দরকার নাই! ক্রমে যখন দরকার হইবে, তখন এ ব্যাপারের গূঢ় রহস্য সকলই বাহির হইবে।

ধীরেন রেজেষ্টারী লেখা-পড়ায় ধরা দেয় নাই; পুলিসের সঙ্গেও ধীরেন জুয়াচুরী খেলিয়াছে। বৈষ্ণব বাবুর নিকট হইতে "শান্তি" লইয়া, ধীরেন 'শান্তির' সত্বাধিকারী হয়। আইন-অনুসারে পুলিসে ডেপুটী-কমিশনরের কাছে তাহার এ খবর দেওয়া উচিত ছিল। তাহাও সে দেয় নাই। আপনার নাম গোপন রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। এ জুয়াচুরীর দরুণ স্বয়ং পুলিশ কমিশনর বাহাদুরই যাহা উচিত বিবেচনা হয়, করিবেন। আমরা এখানে একথা তাঁহাকে জানাইয়া খালাস। যাইহোক, এই খটকা আছে বলিয়া 'শান্তির' জুয়াচুরীর দরুণ মফস্বলে যে সব নালিস দায়ের হইবে, তাহাতে শ্রীমান ধীরেন্দ্রনাথের এবং 'শান্তির' কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীমান পূর্ণচন্দ্র দত্তের সহিত শ্রীযুক্ত বৈষ্ণবচরণ বাবুর নামেও নালিস হইবে, এমন কথা আমরা শুনিতেছি। বৈষ্ণব বাবুও বেশ সুচতুর লোক; কিন্তু এবার ধীরেনের পাল্লায় পড়িয়া তাঁহাকেও বিপাকে পড়িতে হইয়াছে। আমরা জানি, বৈষ্ণবচরণকে ধীরেন যে লেখা-পড়া করিয়া দিয়াছে, তাহা দেখাইলেই বৈষ্ণব বাবু আসামী-শ্রেণী হইতে মুক্ত পাইবেন—অন্ততঃ পাইবার সম্ভাবনা। কিন্তু লাঞ্ছনা, বিড়ম্বনা ও অর্থব্যয় তো তাঁহাকে সহিতে হইবে। আমাদের যদি কেহ পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন, তাহাহইলে

আমরা বৈষ্ণবচরণকে আসামী-শ্রেণী ভুক্ত না করিয়া, সাক্ষী-শ্রেণীতে ফেলিতে বলি। যাহা হউক, বেচারী পূর্ণচন্দ্রের জন্যই দুঃখ হয়! ভাল মানুষের ছেলে শেষে জুয়াচোরের ফাঁদে পড়িয়া জেলে যাইবে নাকি? মনিঅর্ডার রসিদে দস্তখত করিয়াই বেচারী ফাঁদে পড়িয়াছে। তবে ধীরেন যদি বাপের বেটা হন, তাহাহইলে বৈষ্ণবচরণ ও পূর্ণচন্দ্রকে ছাড়িয়া, 'শান্তি'-সম্বন্ধে সমস্ত ঝোঁকই তাঁহার নিজের ঘাড়ে লওয়া উচিত। কিন্তু ব্যবসাদার জুয়াচোরের এ সাহস হইবে কি?

যাইহোক, সকলে 'শান্তির' জুয়াচুরীর পরিচয়টা একবার দেখুন। দ্বিতীয় বর্ষের প্রারম্ভে 'শান্তি' মন-ভুলানে, লোক-ঠকানে এক জুয়াচুরীর বিজ্ঞাপন বাহির করেন। বরাবর এই বিজ্ঞাপন জারি করিয়া যেই বিজ্ঞাপনোক্ত উপহার দিবার সময় আসিল, সেই আবার শান্তি বলিলেন যে, উপহার দেওয়া বড়ই মন্দ কাজ; আমরা উপহার দেওয়া বন্ধ করিলাম। যে সকল গ্রাহক উপহার পাইবার আশায় টাকা পাঠাইয়া আমাদের গ্রাহক হইয়াছেন, তাঁহারা আমাদের এই উপহার বন্ধ করা দেখিয়াও যদি আমাদের প্রতি সহানুভূতি না দেখান, "তাহা হইলে তাঁহাকে আমরা নিতান্ত অবিবেচক, স্বার্থপর, জ্ঞানশূন্য ও নীচ লোক মনে করিতে বাধ্য হইব।"

জুয়াচোরের ব্যবহার দেখিলেন! তা' উপহার দূরে যাউক, জুয়াচোর ধীরেন্দ্রনাথ গ্রাহকের টাকা ফাকি দিয়া তাহাদিগকে কাগজও দেন নাই। গ্রাহকেরা নিজে কি বলিতেছেন, দেখুন। বহু পত্র—প্রকাশের প্রয়োজন নাই। দুই পাঁচ খানি পড়ুন, ইহাতেই যথেষ্ট হইবে। পত্র এই:—

১ নং।

"মহাশয়,—'অনুসন্ধান' পত্রিকার তৃতীয় বর্ষের অগ্রিম মূল্য ১৷০ টাকা অদ্য ডাকযোগে আপনার নিকট
পাঠাইলাম। এই পত্রিকার মূল্য দিয়া
যে সার্থকতা হয়, আমার বিবেচনায় এরূপ ন্যা
অন্য কোনরূপে হয় কিনা সন্দেহ। অর্দ্ধ
কতকগুলি বঙ্গীয় যুবক অর্থ-উপার্জ্জনের
কোথাও না পাইয়া আজকাল নিরীহ বঙ্গ
এমন কি সমগ্র ভারত-বাসীর উপর যেরূপে
উপায়ে অনিষ্ট সাধনে তৎপর হইয়াছেন,
দেখিয়া-শুনিয়া ঘৃণা বোধ হয়। 'অনুসন্ধান'
অন্য জুয়াচুরীর অনুসন্ধান ত্যাগ করিয়া যদি কি
এই বঙ্গীয় কুলাঙ্গারগণের শাসনের উপায়
করেন, তাহাহইলে দেশের অতীব মঙ্গল-কার্য্য ক
কলিকাতা সহরে সাধারণ জুয়াচোরগণ যে
সাধন করে, বলিতে গেলে তাহা ব্যক্তিগত অনিষ্ট।
ধীরেন্দ্র পালের ন্যায় 'সভ্য', 'সাধু' ও 'সুশিক্ষিত
যে উপায়ে জন-সাধারণের জ্ঞান-বর্দ্ধণ ও জনসাধা
জ্ঞান শিক্ষা দিতেছেন, তাহা কি সাধারণ জুয়াচুরীর
লঘুতর? দেখা যাইতেছে বঙ্গদেশে ও বাঙ্গালী
দিন অধঃপতন হইতেছে। নতুবা কৃষি, বাণিজ্য
থাকিতে কতকগুলি কুলাঙ্গার এই পথ কেন অ
করিবে! আর বাঙ্গালার সাধু পুরুষেরা কে
তাঁহাদের চক্ষের উপর এই সব ব্যাপার ঘটিতেছে
তাঁহারা দেখিয়াও দেখিতেছেন না। যদি
দেখিয়াও না দেখেন, তবে যে বাঙ্গালীর অধ
নিশ্চয় হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ধীরেন্দ্র
আমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা
না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। অন্য অন্য
কের ন্যায় আমি ধীরেন্দ্র বাবুর মোহমন্ত্রে মু
তাঁহার প্রকাশিত 'শান্তি' নামক সাপ্তাহিক
গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলাম। প্রথম বৎসর নি
রূপে শান্তি পাইয়াছি, প্রথম বৎসরের উপহারও
য়াছি; কিন্তু যেমন দ্বিতীয় বর্ষের মূল্য ১৷০
পাঠাইলাম, অমনি ধীরেন্দ্র বাবু নীরব।
তাঁহার শান্তি এবং কোথায় বা তাঁহার উপহার
তিনি পূজার পূর্ব্বে টাকা পাইয়া যে নিস্তব্ধ হই
সেই নিস্তব্ধতা এখনও বিরাজ করিতেছে। উপ
পত্র-বর্ষণেও ধীরেন্দ্রের সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করি
নাই। এখন দেখিতেছি তিনি টাকা দেড়ী
দিলেন। আপনার 'অনুসন্ধান' পড়িয়া দেখিলাম,
বাবু আমার ন্যায় শতাধিক লোককে এইরূপে
দিয়াছেন। আরও দেখিলাম, কেবল মাত্র ফাঁকি
নয়, সেই অন্যায়লব্ধ ধনদ্বারা ধীরেন্দ্র বাবু 'বুড়
গড়িয়া মফঃস্বলবাসীগণকে আবদ্ধ করিতে বাস
বোধ হয় সে "বুড়া জাল" যে "রত্ন-গৃহ", এক
বলিতে হইবে না। এখন ধীরেন্দ্র বাবুর ন্যায়
আমরা কি বলিব! সাধু না অসাধু? যদি অসা
তবে দেশের সাধুলোকগণের উচিত, তাঁহাকে
কর্ম্ম। তাঁহাকে শাসন করিলে যে তৎকর্ত্তৃক

বদ্ধ হইবে, কেবল তাহা নয়; তাঁহার ন্যায় অনেকানেক লোককেও শিক্ষা দেওয়া হইবে। এখন আমার বক্তব্য এই যে, ধীরেন্দ্র বাবুর ন্যায় বা 'রত্নগৃহের' প্রচারকের ন্যায় লোককে শাসন করিবার জন্য কিছু ধনসংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। 'অনুসন্ধানের' ব্রত ইহা হইলেও ইহা তাঁহার সাধ্যাতীত। এ বিষয়ে সাধারণের সাহায্য আবশ্যক। আমি সেই ধন-সংগ্রহের জন্য ৫৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলাম; এবং বন্ধুবান্ধবকেও কিছু কিছু দিতে অনুরোধ করিব। আশা করি, বঙ্গীয় ভদ্রসমাজ বদ্ধপরিকর হইয়া এই জুয়াচোর সম্প্রদায়কে সমূলে উৎপাটন করেন; এবং যাহাতে নিরীহ লোকের উপর উৎপীড়ন না করিয়া ইহারা 'কোদালী-'কুঠার' বা 'লাঙ্গল' অবলম্বন করে, তাহার চেষ্টা করেন। আর যদি পারেন ধীরেন্দ্র বাবুর নিকট হইতে আমার ১৷০ টাকা আদায় করিয়া অনুসন্ধানের পুষ্টিবর্দ্ধন করিবেন। সন ১২৯৬ সাল, ২০এ অগ্রহায়ণ।

বশম্বদ
শ্রীআশুতোষ বন্দোপাধ্যায়।
সাং ভীলসা, গোওয়ালিয়র ষ্টেট।"

২ নং।

"Muldari. Pirganj P. O. (Dinajpur Dt.)
Dear Sir,

আমি 'শান্তি' পত্রিকার উচিত মূল্য দিয়াছি। মূল্য দিয়া কেবল দুই মাস 'শান্তি' পাইয়াছি; আর "শান্তি" পাইতেছি না। পত্র লিখিলেও সাড়া-শব্দ নাই। উপহার পাওয়া তো দূরের কথা, পত্রিকাই পাই নাই। মহাশয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহার উচিত প্রতিকার করিবেন।

বশম্বদ
S. K. Das."

৩ নং।

"মহাশয়, আমি গত ১২৯৬ সালের বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহে মাণিকতলা ষ্ট্রীটে 'শান্তি' কাগজের জন্য শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে ২৲ টাকা মণিঅর্ডার করিয়া পাঠাই। উপহার না পাঠাইয়া কেবল কাগজ পাঠাইতেছিলেন, কিন্তু আবার পূজার ছুটিতেই কাগজেরও ছুটি হইল! ইহার মীমাংসার জন্য বঙ্গবাসীর ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে লেখায় তিনি আপনার ঠিকানা-সহ আমাকে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, অনুসন্ধান-সমিতির ম্যানেজার মহাশয়কে পত্র লিখিলে ইহার মীমাংসা হইবে। তজ্জন্য আপনাকে পত্র লিখিতেছি যে, যাহাতে ইহার মীমাংসা হয়, তাহা করিবেন। পূর্ব্বে বাঁকুড়া জেলার সামিল মৌজল পোষ্টাফিসের এলাকা ডাঙ্গামেজিয়া স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলাম। তাঁহার হস্তের পত্র এবং লেফাফাসহ মণি-অর্ডারের ফেরত রসিদখানা মজুত আছে; আদেশ করিলেই পাঠাইব।

শ্রীফকিরচন্দ্র ঘোষ।
চাঁদরা, উখারা পোঃ, বর্দ্ধমান।"

৪ নং।

"বিগত বৈশাখ মাসে আমি 'শান্তি' সাপ্তাহিক পত্রিকার গ্রাহক হইয়াছিলাম। এবং কলিকাতাস্থ খ্যাতনামা কোন ব্যক্তির অনুরোধে উক্ত পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা দিয়াছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, উপহারাদি তো পাইই নাই, অধিকন্তু গত আশ্বিন মাস হইতে "শান্তি"ও আর পাইতেছি না। উক্ত পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়কে ৭।৮ খান পত্রও লিখিয়াছি; কিন্তু উত্তর কিম্বা পত্রিকা কিছুই আমি এ পর্য্যন্ত পাইতেছি না।

অবশেষে যিনি আমাকে উক্ত পত্রিকার মূল্য দিতে অনুরোধ করেন (পরে ইহাঁর নাম প্রকাশ করিব), তাঁহাকেও ২ খান পত্র লিখি; এবং উত্তর পাইবার জন্য টিকিটও দিয়াছিলাম। কিন্তু সমস্তই বিফল!

এখন প্রার্থনা, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার পত্রখানি স্থান দিবেন। এবং ইহার যদি কোন প্রতিবিধানের উপায় থাকে, তবে লিখিয়া বাধিত করিবেন। নিবেদন ইতি

শ্রীদ্বারকানাথ রায়
কোগিয়াগ্রাম, ভালোর পোষ্ট, রাজসাহী।"

৫ নং।

"মহাশয়, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 'শান্তির' গ্রাহক। 'শান্তি'-কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন, হাতি দিব—ঘোড়া দিব। কিন্তু শেষে দেখিলাম, বিড়াল দিয়াই ক্ষান্ত। শান্তি-সম্পাদক মিথ্যাবাদী, একারণ আপনাকে লিখিতেছি।

বশম্বদ
শ্রীপঞ্চানন দাস
গোবরডাঙ্গা, ২৪ পরগণা।"

৬ নং।

"আমি একজন 'শান্তি' সপ্তাহিক পত্রিকার গ্রাহক ছিলাম। ৺ শারদীয়া পূজার পর হইতে আর পত্রিকা বা কোনরূপ সম্বাদ পাই নাই। তাঁহাদের নিকট আমার পাওনা আছে। কয়েকখানা পত্র লেখাতেও কোন উত্তর দেন নাই। কারণ কি বুঝিতে পারি নাই; বোধ হয় 'শান্তি' চিরশান্তি লাভ করিয়া থাকিবেন। এক্ষণে আমার পাওনার উপায় কি? যদি কোনরূপ সদুপদেশ দিতে পারেন, বিশেষ অনুগৃহীত হইব। নিবেদন ইতি। ১৬ অগ্রহায়ণ, ১২৯৬।

শ্রীরাসবিহারি সাহা
রাদাঘর স্কুল, সাজিয়াড়া পোষ্ট, জেলা খুলনা।"

৭ নং।

"মহাশয়, আমি 'শান্তি' সংবাদ পত্রিকার ১০৫নং গ্রাহক। গত বৎসর শ্রাবণমাসে গ্রাহক হইয়াছিলাম। শান্তির বিজ্ঞাপনে ভুলিয়া শান্তির দ্বিতীয় বৎসরের গ্রাহক হইলাম, টাকা দিলাম; কিন্তু উপহার পাইলাম

না। কাগজ পাইলে সন্তুষ্ট হইতাম। কিন্তু 'শান্তি' সত্ত্বাধিকারি এমন বিশ্বাসঘাতক যে, সন ১২৯৬ সালের ৯ই শ্রাবণ পর্য্যন্ত 'শান্তি' দিয়া পরে 'শান্তি' একবারে বন্ধ করিল। 'শান্তির' এইরূপ অভদ্রতাতেও দুঃখিত নহি; ভাবিলাম, কোন দুর্ঘটনাতে বন্ধ হইয়াছে। তদনুযায়ী 'শান্তিকে' ছয়খানি পত্র লিখিলাম; কিন্তু 'শান্তি'-কার্য্যাধ্যক্ষ এমনই অভদ্র যে, পত্রের উত্তরও দিল না। এরূপ প্রতারণা করিলে আর কেহ সংবাদ-পত্রের গ্রাহক হইবে না। ইতি সন ১২৯৬ সাল, তারিখ ৮ অগ্রহায়ণ।

শ্রীকালীকান্ত চক্রবর্ত্তি
বড়ইবাড়ীগ্রাম, পোষ্ট দিনহাটা, রঙ্গপুর।"

৮ নং।

"মহাশয়, গত চৈত্রমাসে আমি 'শান্তির' গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলাম এবং তাহার অগ্রিম ২ মূল্য পাঠাইয়াছিলাম। চার আনা অতিরিক্ত দিয়াছি; সেই চার আনার বহি আমি চাহিয়া পাঠাই। কিন্তু এযাবৎ প্রাপ্ত হইলাম না; আর যে হইব তাহারও আশা বড় নাই। আর পূজার পূর্ব্বে অর্দ্ধ আনার টিকিট চাহিয়াছিলেন (পূজার শান্তির জন্য) তাহাও পাঠাইয়াছি; কিন্তু সে 'শান্তি'ও প্রাপ্ত হই নাই। কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়কে জানাইয়া বিরক্ত হইয়াছি। এক্ষণে মহাশয়কে জানাইতেছি; যাহা বিহিত হয়, করিবেন।

শ্রীশরৎচন্দ্র মৈত্র।
বহরমপুর, গোরাবাজার।"

সবই তো পড়িলেন। এখন ধীরেন্দ্রনাথ পাকা জুয়াচোর কি না বলুন।

'রত্নগৃহের' জুয়াচুরী।

"রত্নগৃহ"-কাণ্ডে পরেশনাথই আপাততঃ ধরা পড়িয়াছেন। পরেশনাথ ধরা পড়ুন; কিন্তু কাণ্ডটা যে শ্রীমান ধীরেন্দ্রনাথের, ইহা জানিতে কাহারও আর বাকি নাই। ১৫ই অগ্রহায়ণের "অনুসন্ধানে" রত্নগৃহের জুয়াচুরীর কথা প্রকাশ হয়। ১৬ই অগ্রহায়ণের "বঙ্গবাসীতে" "অনুসন্ধানের" সে প্রবন্ধ উদ্ধৃত হয়। ১৬ই অগ্রহায়ণই সন্ধ্যাকালে 'অনুসন্ধান' ও 'বঙ্গবাসীর' নামে কুৎসা করিয়া খেঁউড়-পূর্ণ 'শান্তির' এক ক্রোড়পত্র বাহির হয়। 'শান্তি' মৃত; গ্রাহকগণ টাকা দিয়া শান্তি পান না; ডাকঘরে জুয়াচোরের এ কাগজ একপয়সা মূল্যে অন্যান্য কাগজের ন্যায় ডাকে যায় না; কলিকাতাতেও অনেকে শান্তি পান না; উঠিয়া গিয়াছে, ইহাই সকলে জা... অথচ ১৬ই অগ্রহায়ণ 'শান্তির' এক ক্রো... পত্র বাহির হইল! "ঘোটে মা রাঁধে না, ... তপ্ত আর পান্তা।" এ ক্রোড়পত্রও তাহা... ইহাও আবার 'পঞ্চাশ সহস্র বিনামূল্যে বি... রিত!' জুয়াচোরের কারখানাই স্বতন্ত্র।... বাপাজির সে পেজোমির উত্তর দিতে আ... বসি নাই। আমরা কাজের কথা বলিব; ... জনে বিচার করিবেন।

'শান্তির' এ ক্রোড়পত্রেই 'রত্নগৃহের' বি... পনের কৈফিয়ত আছে। 'রত্নগৃহের' স... ধীরেন্দ্রনাথের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক; বাহিরে ... না হইলেও, কাজে 'শান্তি'-সম্পাদক ধীরেন্দ্রনা... যে এ রত্নগৃহের মূল; তাঁহারই যত্নে—তাঁহা... চেষ্টায় যে এ জুয়াচুরী চলিতেছে; রত্নগৃ... বিজ্ঞাপনদাতা বাল্মিকীযন্ত্রের সত্ত্বাধিকা... পরেশনাথ মিত্র নিজেই ডিটেক্‌টিব-পুলি... নিকট কথোপকথনচ্ছলে একথা স্পষ্ট প্রক... করিয়া ফেলেন। পরেশনাথ কাঁচা হইলে... শ্রীমান ধীরেন্দ্রনাথ ঝুনা ছেলে; 'রত্নগৃ... বিজ্ঞাপন-প্রচারের ফলে পরিণাম কি হই... ধীরেন তাহা বুঝিতে পারিয়াছে। তাই কি... হইতে আপনাকে এড়াইবার জন্য, 'শান্তি... উপরোক্ত ক্রোড়পত্রে 'রত্নগৃহের' সহিত আপ... কোন সম্পর্ক নাই, এই কথা বলিয়াছে। কি... ধীরেন যে আসামী! আসামীর একথা লো... এখন বিশ্বাস করিবে কেন? ধীরেন 'শান্তিতে... লিখুন, আর লোকের দ্বারে দ্বারে মাথা কু... বেড়ান; ধীরেনই যে রত্নগৃহের মূল, একথা এ... সহজে লোকের মন হইতে কিছুতেই বিদূ... হইতেছে না। ধীরেন আপনাকে যত... নিশ্চিত মনে করুন, ধীরেনকেও 'রত্নগৃ... জুয়াচুরীর দরুণ ইংরেজের ফৌজদারী-আ... লতে আসামী-শ্রেণীতে দাঁড়াইতে হইবে।

জুয়াচুরিতে বেগতিক দেখিয়া এখন আপনারাই ধরা দিবার চেষ্টা করিয়াছে; আর ধরা দিয়া কৌশল পাতিবার চেষ্টায় আছে। 'রত্নগৃহ' জুয়াচুরার মূল খেঁড়ো ধীরেন্দ্রনাথ 'শান্তির' ক্রোড়পত্রে লিখিতেছেন,—"পরেশনাথ মিত্রের অপরাধ, তিনি ১০০ খানি নানা দেশের পুস্তকের নাম করিয়াছেন ও বলিয়াছেন যে, রত্নগৃহে এই সকল পুস্তক থাকিবে। ইহাতে বঙ্গবাসীর পণ্ডিতগণ বুঝিয়াছেন যে, পরেশনাথ মিত্র এই একশতখানি পুস্তকের মূল পুস্তক প্রদান করিবেন। এমন মূর্খ দুনিয়ায় আর জন্মিয়াছে কি?" জুয়াচোরের জাতিগত ভাষা বটে! 'শান্তির' মূল্য ও উপহারের টাকা লইয়া পাকা বদমায়েস শ্রীমান ধীরেন্দ্রনাথ ইতিপূর্ব্বেও এইরূপে গ্রাহকবর্গের প্রতি 'স্বার্থপর, নীচ, মূর্খ' প্রভৃতি ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। আর, এখন যাঁহারা ধীরেনের বিজ্ঞাপনের মায়াজালে পড়িয়া 'রত্নগৃহে' একশত পুস্তক পাইব বলিয়া টাকা পাঠাইতেছেন, তাঁহারাও হইলেন,—"মূর্খ!" এখন কেবল আমাদের জুয়াচোর ধীরেন্দ্রনাথ ও পরেশনাথ হইলেন, সাধু সন্তান—ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির! কলির রাজ্য বটে!

আপন কথার কৈফিয়ত দিবার চেষ্টাও ধীরেন করিয়াছেন। আমরা কিন্তু কাগজে-কলমে সে কৈফিয়ত এখন দিব না। পরেশনাথ আমাদের নামে যে মানহানির নালিশ করিয়াছেন, সেই মকর্দ্দমায় এজাহার দিবার সময়ই, আমরা জেরা-সওয়ালে তাঁহার কথার গূঢ় অর্থ, তাঁহার বদমায়েসীর ফন্দি সব তাঁহারই মুখে বাহির করিব। এখন এখানে আপাততঃ সে সব কথার পরিচয়ে আবশ্যক নাই। পরেশনাথ এখন না পলাইলেই সকল দিক রক্ষা হয়। পরেশনাথ না পালাইলেই, ধীরেন যে কতদূর বদমাইস, তাহা প্রমাণেও আর বাকী থাকিবে না।

রত্নগৃহের নালিশ।

আমাদের নামে।

পরেশনাথের পরামর্শদাতা ধীরেন তাহার মরা 'শান্তির' ক্রোড়পুত্র প্রসব করিয়া জাহির করিতেছেন, আর গলায় কাচা বাঁধিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া লোকের দ্বারে দ্বারে মিথ্যা করিয়া বলিয়া বেড়াইতেছেন যে, পরেশনাথের নালিসের শমনের ভয়ে 'বঙ্গবাসীর' ম্যানেজার শ্রীযুক্ত ব্রজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমাদের শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী ফেরার হইয়াছেন। তা' ভয়ের বিষয়ই বটে! এমন ভয় না হইলে আমরা কি এমন ধাড়ী জুয়াচোর ধরিতে পারি! বাপাজি নিশ্চিন্ত হউন; আমরা এবার আপনিই লোক ডাকিয়া নিজে পরিচয় দিয়া সমন গ্রহণ করিয়াছি,—বঙ্গবাসীর ম্যানেজার মহাশয়ও করিয়াছেন। আমরা তো হাজির হইবই; কিন্তু সেই দিন পরেশনাথ না পালাইলেই মঙ্গল।

পরেশনাথের নামে।

অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ কুত্রাপি এ বিজ্ঞাপন ছড়াইতে পরেশনাথ ত্রুটী করেন নাই। ঠকিয়াছেনও, সকল স্থানের লোকে। আসাম—ধুবড়ীনগরের একটী বাবুও পরেশনাথের চাতুরীতে পড়িয়া ঠকিয়াছেন। শুনিতেছি, তিনি পরেশনাথের নামে তথাকার ডেপুটী-কমিশনরের আদালতে জুয়াচুরীর অভিযোগ আনিয়াছেন। পরেশনাথের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে। পরেশনাথ দুইজন দালালকে নাকি জামিন দিয়া আপাততঃ খালাস আছেন। আহা! যাহাকে সামান্য পাঁচ শত টাকা জামিনের জন্য দালালের দ্বারস্থ হইতে হয়, সে আবার এই মহা জুয়াচুরী করিতে আইসে!

ধুবড়ি ভিন্ন আরও অনেক স্থান হইতে প্রতারিত বহু ব্যক্তি, পরেশনাথের নামে নালিস করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাঁহারা আমাদিগকে পত্র লিখিয়া এ কথা জানাইয়া-

ছেন। কিন্তু একটা লোকের উপর একবারে এত কেন? এক একটা মকর্দ্দমা শেষ হউক, আবার আর একটা রুজু করিলেই চলিবে। ইহাতে তাঁহাদেরও মহত্ত্ব প্রকাশ হইবে, পরেশনাথেরও উপকার করা হইবে। নতুবা পাঁচ স্থানে এককালে নালিস দায়ের হইলে বেচারী যে মহা বিব্রত হইয়া পড়িবে!

পরেশের এ ভয়ানক জুয়াচুরী জব্দ করিবার জন্য অনেকে আমাদিগকেও সাহায্য করিবেন বলিয়া পত্র লিখিতেছেন। যাঁহারা টাকা পাঠাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন, অথচ আমাদের বিজ্ঞাপন দেখিয়া সাবধান হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা লিখিতেছেন যে,—"মহাশয়, আমাদের তো টাকা যাইতেই বসিয়াছিল, তা' সে টাকা আমরা আপনাকে দিব,—আপনি এ ঘোর প্রতারক, প্রবঞ্চককে উপযুক্ত শিক্ষা দিবেন।" এখন আমরা এ সাহায্য লইব কি না, আজিও তাহা সাব্যস্ত করিতে পারি নাই। যাঁহারা এ অনুগ্রহ-পত্র লিখিয়াছেন, তাঁহাদের পত্রের আমরা উত্তর দিব। উত্তর দিতে দুই একদিন বিলম্ব হইলে তাঁহারা যেন কোন মতে বিরক্ত না হন।

অদ্য এ বিষয়ের অন্য কথা আর বলিব না। আমরা এসম্বন্ধে যে সব পত্র পাইতেছি, তাহারই দুই চারিখানি নমুনা দেখুন:—

১ নং।

"মহাশয়, 'রত্নগৃহ'-সম্বন্ধে আমি বড়ই প্রতারিত হইয়াছি। কারণ, আমি ৫ টাকার নোট উক্ত প্রতারককে ডাকে পাঠাইয়াছি। কিন্তু এ পর্য্যন্ত সে কোন পুস্তক পাঠাইল না; এবং পত্র লিখিলেও কোন উত্তর দেয় না। উক্ত প্রতারক পূর্ব্বে যে দুইখান পোষ্টকার্ড লিখিয়াছিল, তাহা আমার নিকটে আছে। এই জুয়াচুরী কাণ্ড ধরিতে আমাকে যতদূর চেষ্টা ও যত্ন করিতে হয়, তাহাতে আমি প্রস্তুত আছি।

শ্রীমহিমচন্দ্র সরকার

মুনসেফ, বগুড়া।"

২ নং।

"মহাশয়, গত ২৩এ নবেম্বর তারিখে শ্রীযুক্ত পরেশনাথ মিত্রের নিকট ৫ টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া তাহার প্রকাশিত 'রত্নগৃহ' অর্থাৎ Hundred cho[ice] books of the World আনাইবার জন্য গ্রা[হক] হইয়াছিলাম। পরেশনাথ মিত্র যে আমার প্রে[রিত] টাকা পাইয়াছে, তাহাও তাহার নিজ-স্বাক্ষরি[ত এক]খানা রসিদ পাইয়া জানিয়াছি। কিন্তু আজ-পর্য্য[ন্ত] তাহার বিজ্ঞাপনের লিখিত কোন বহি বা উপ[হার] পাই নাই; এবং পাইবারও কোন সম্ভাবনা না[ই]। আমি পরেশনাথ মিত্রের সুমধুর ভাষার বি[জ্ঞাপনে] ভুলিয়া, তাহার জুয়াচুরীর ফাঁদে পড়িয়াছি। অ[তএব] আপনার নিকট নিবেদন, যাহাতে আমাদের দে[য় টাকা] পাইতে পারি, তাহার উপায় করিয়া দিবেন। [আমা]দের এখান হইতে আরও দুই একজন পরে[শনাথ] মিত্রের নিকট টাকা পাঠাইয়া ঠকিয়াছেন, তাঁ[হারা] শীঘ্র আপনাকে চিঠি লিখিয়া জানাইবেন।

নিবেদক শ্রীশ্রীনাথ বসু

গ্রাম ও পোষ্টাপিস বড়দী, ...

৩ নং।

"মহাশয়, পরেশনাথ মিত্র আমাকে ... বিজ্ঞাপন প্রেরণ করায় আমি 'মেঘনাদ বধ' ও '...' প্রভৃতির নমুনা চাই। তাহাতে তিনি লেখেন,—... রণা নাই, গ্রাহক হইবেন। তদনুসারে আমি ... তিন জনের তিন টাকা এবং নিজের ১ এ[কুনে] মোট চারি টাকা 'এজেণ্ট-স্বরূপ' হইয়া প্রেরণ ক[রি]। কিন্তু তাহার পর কিছুই না পাইয়া পত্র লিখি[তে] করিতেছিলাম, এমন সময় আপনাদের 'অনুসন্ধা[ন' ও] 'বঙ্গবাসী' পাঠে একেবারে অবাক হইলাম। ... হউক, আপনাকে শত শত কেন, কোটী ক... 'অনুসন্ধান' যে প্রকৃত অনুসন্ধানী, তাহা জ্ঞাত হই... সবিনয় প্রার্থনা, এক্ষণে এই ব্রাহ্মণের টাকা ক... মারা না যায়।

একান্ত বশম্বদ

শ্রীগিরিশচন্দ্র বন্দোপাধ্যা...

গোট স্কুল, ভায়া সালতারা, বাঁকুড়া জে...

৪ নং।

"মহাশয়, আমি একজন 'রত্নগৃহের' গ্রাহ... সহি পাঠানর খরচ বাবদ অগ্রিম ১ এক টাকা ... ইয়া দিই। কএক দিনে ভি, পি, ডাকে ... প্যাকেট আসে; এবং ২॥০ টাকা দিয়া তাহা ... কিন্তু প্যাকেট খুলিয়া দেখি,—সবই ভেল—বহি... অন্য জিনিসের প্যাকেট দিয়াছে। এমন প্রতার... দেখি নাই। আমরা সেকেলে মানুষ, অত ... পত্র দিয়াও উত্তর পাই না।

নিঃ শ্রীবীরেশ্বর শিরোমণি

বেতাঙ্গী, বাসুটিয়া পোষ্ট...

৫ নং।

"সবিনয় নিবেদনম্, মহাশয়, রোকায় ... সেলাম। পরে নিবেদন এই যে, আমি ...

দুই টাকা পাঠাইয়া শান্তির গ্রাহক হইয়া উপহার দূরে থাক, পূজার পর আর কাগজের সাক্ষাৎ নাই। অতএব 'রত্নগৃহ' যে এই মহাত্মাদিগের অনুগ্রহ তাহা জানিলে আমি কখন এত বিশ্বাস করিয়া পাঁচ টাকা পাঠাইতাম না। আমার উপহারে লোভ কিম্বা বিশ্বাস ছিল না। কেবল পুস্তকের জন্য লোভ করিয়া পাঁচ টাকা মনি-অর্ডার করি। পরেশের রসিদ পাইয়াছি; কিন্তু আর খোঁজ নাই। এক্ষণে আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার টাকা আদায় করিয়া দেন, তবে বাধিত হইব।

শ্রীশেখ তমিজ উল্লা মিয়াঁ।

এসিষ্ট্যাণ্ট নাজির, কলেক্টরেট বালেশ্বর, উড়িশ্যা।"

৬ নং।

"মহাশয়, পরেশনাথ মিত্রের আর এক জুয়াচুরী দেখিলাম। তিনি আমাকে 'সঙ্গীত-সুধা' নামক যে গানের অতি ক্ষুদ্র পুস্তকটি পাঠাইয়াছেন, তাহা 'সঙ্গীত-হার' নামক পুস্তকের উপর একটী মোটা পটী বসান; তাহার উপর 'সঙ্গীত-সুধা' নাম এবং 'রত্নগৃহের উপহার' বলিয়া লিখিত আছে। আর ৫খানি ছবি যাহার এক একটীর দাম এখানে ১০ আদ আনা, তাহা সামান্য একটী খাতায় বসান আছে। আর বোতামের দাম ।০। অর্থাৎ মোট ॥০ আট আনার বেশী হইবে না। ইহাতে উনি ২৷০ আদায় করিয়াছেন। কত অন্যায় দেখুন!

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়।

কান্দি স্কুল, মুর্শিদাবাদ।"

৭ নং।

"সবিনয় নিবেদনমিদং,—মহাশয়, বিগত কার্ত্তিক মাসের ২৬। ২৭এ তক ৫ টাকা মণিঅর্ডার করিয়া পরেশনাথের নিকট 'রত্নগৃহ' পুস্তকসমূহ প্রাপ্তি আশায় পাঠাই। কিন্তু পুস্তক পাইতে বিলম্ব ঘটায় পরেশনাথকে পত্র লিখি। তখনও আপনাদের বিজ্ঞাপন বঙ্গবাসীতে প্রকাশ হয় নাই। তৎপরে আপনাদের বিজ্ঞাপনে ও 'অনুসন্ধানে' পরেশনাথ-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারই অবগত হইলাম। বিগত ২২এ অগ্রহায়ণ পরেশনাথের এক পত্র পাইলাম; তাহার মর্ম্ম এই, "মহাশয় বঙ্গবাসীতে আমার বিরুদ্ধে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ায় আমি তাঁহাদের নামে নালিশ করিয়াছি; এবং শমন বাহির হওয়া শুনিয়া তাঁহারা ফেরার হইয়াছেন। তজ্জন্য রত্নগৃহ প্রকাশে বিলম্ব ঘটিতেছে।"

যাইহোক, এক্ষণে যদি কোন উপায় করিয়া আমাদের টাকার কোন কিনারা করিতে পারেন, তবে আমরা চিরবাধিত হইব। আমাদেরই গ্রামে ৪ সেট পুস্তক দিবার ২০ টাকা পরেশনাথ গ্রাস করিয়াছেন। আরও ১৫। ১৬ জন টাকা পাঠাইতেন; কেবল আপনাদের অনুগ্রহে তাঁহারা আমাদের ন্যায় প্রতারিত হন নাই। তাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানের নিকট আপনাদের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছেন। আমার টাকা না পাইলেও ক্ষতি নাই। যে গতিকে হউক, পরেশনাথ যাহাতে শিক্ষা পায়, তাহা করুন। অধিক কি লিখিব! আমি তাহার ১০০ শত পুস্তক পাইবার আশায় টাকা পাঠাইয়াছি।

একান্ত বশম্বদ

শ্রীরাসবেহারি সরকার।

মাখনাজোড়া গ্রাম, পানাগড় পোঃ, বর্দ্ধমান জেলা।"

বিজ্ঞাপনের বিড়ম্বনা।

"বিজ্ঞাপনের জুয়াচুরিতে দেশ ভরিয়াছে বলিয়া মনে হয়। দেশ প্রকৃতই পূর্ণ হউক, অথবা না হউক,—প্রায় প্রত্যহই এ সম্বন্ধে আমাদের নিকট অভিযোগ আইসে। আফিসে চিঠিপত্র আইসে; তা-ছাড়া প্রতারিত মফঃস্বলের ভাল-মানুষ ব্যক্তিগণ কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়া, সশরীরে আমাদের নিকট এ বিষয়ে অনুযোগ করিয়া যান। এ বৎসর আশ্বিন মাসে আমরা ৺ হরিদ্বার, ৺ শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে গমন করি। যেখানে যাই, সেইখানেই বিজ্ঞাপনের নানা কেলেঙ্কারির কথা শুনি। কেহ বলেন, "মহাশয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার টাকাটী আদায় করিয়া দিন।" কেহ বলেন, "রত্ন কিনিতে কলিকাতায় টাকা পাঠাইলাম, মিলিল কিনা ছাই!" কেহ বা গম্ভীরভাবে একটু উপদেশ দিলেন, "এত জাল-জুয়াচুরির বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইতেছে, আপনারা কি ইহার নিবারণার্থ কোন উপায় অবলম্বন করিতে পারেন না?" বাস্তবিকই আমরা ইহার বিশেষ কোন সদুত্তর দিতে পারি নাই,—একরকম নীরবই ছিলাম।

প্রথম কথা হইতেছে, আপনারা বাজে বিজ্ঞাপন দেখিয়া বৈ কিনিতে টাকা পাঠান কেন? এ প্রশ্নের এইরূপ উত্তর প্রদত্ত হয়,—"বিজ্ঞাপন লেখার এমনই ভঙ্গি যে, তাহা দেখিলেই মোহিত হইতে হয়। জুয়াচোরদের লেখার মোহিনী মন্ত্রশক্তি আছে। কাজেই ভ্যালুপেবলে গ্রন্থ পাঠাইতে লিখিতে বাধ্য হইতে হয়।"

কিন্তু এ দোষ কার? বিজ্ঞাপনদাতার, না খরিদদারের? কেন বাপু! তুমি মুগ্ধ হও? কলিকাতায় ত পথে পথে জুয়াচোরগণ সোণার দানা বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। কিন্তু বুদ্ধিমান লোকে কি ঠকে? ঠকে কেবল পাড়াগাঁয়ের ভালমানুষ ভদ্রলোক।

বহুপূর্ব্বে একবার একজন ভদ্রলোক নগদ ৮৲ টাকা দিয়া ৩২টী বড় বড় সোণার দানা কিনেন। বাসায় আসিয়াই তাঁহার ভ্রম ভাঙ্গিল। তিনি বুঝিলেন, এই ৩২টী দানার দাম ৵০ নহে। সে লোকটী যে নিতান্ত বোকা, তাহা নহে। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, কলিকাতার জুয়াচোরের কথা ত আপনি জানেন,—তবে কেন এমন ঠকিলেন? তিনি উত্তর দিলেন, "সে কথা কিছু আর বলিবেন না! জানি সব,—তবে এরূপ জুয়াচুরীপূর্ব্বক সোণা-বেচার কথা পূর্ব্বে কখন শুনি নাই। তা, নাই শুনি, এ কাজটা যে আমার নিতান্ত আহাম্মুখির কাজ হইয়াছে, তাহাতে আর কিছু সন্দেহ নাই।" প্রশ্ন "কেন এমন হইল?" উত্তর "জুয়াচোর দুটা, ঠিক যেন আমাকে যাদুমন্ত্রে মোহিত করিল। তাহারা আমার চোখে যেন ধূলাপড়া দিল। আমি জানি, সোণার জিনিস কখন পথে পথে ফেরিওলারা বিক্রয় করিয়া বেড়ায় না,—সোণা লইতে হইলে তাহা কষ্টি-পাথরে কষিয়া, ওজন করিয়া, দুই তিন দোকান যাচাই করিয়া লইতে হয়; তথাচ আমার কেমন মতিচ্ছন্ন হইল,—সোণা বলিয়া ঐ পিতলকে ৮৲ টাকায় কিনিলাম! দুঃখের কথা আর কিছু বলিবেন না,—মনে করিলাম, একশত টাকার জিনিসটা আমি ৮৲ টাকায় পাইতেছি,—মন্দ কি? কিন্তু মনোমধ্যে একবার এমন ভাবও উদয় হইল না যে, ঐ ব্যক্তি ১০০৲ টাকার জিনিসটী আমাকে ৮৲ টাকায় দেয় কেন? একটা জুয়াচোর আমার সম্মুখ হইতে সোণার দানাগুলা কুড়াইয়া লইয়া বলিল,—আহা! এই যে দেখ্‌চি, কে সোণার দানা ফেলিয়া গিয়াছে। আর একজন তাহার সঙ্গী জুয়াচোর আসিয়া বলিল.—(হাঁ, ভাই সোণার বটে; আমিও একদিন ধর্ম্মতলার মোড়ে একটি সোণার আঙ্‌টি কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম আমার একবার এমনটাওত চিন্তা করা উচিত ছিল, 'যত সোণাদানা সবই কি কলিকাতার পথেই পড়িয়া থাকে?' দুঃখের কথা কা বলিব?—আমাকে ওকথা আর আপনার জিজ্ঞাসিবেন না।"

কলিকাতায় যেমন সোণা বিক্রয়ের জুয়াচুরি ব্যবসা আছে, আমাদের বোধ হয়, আজকাল পুস্তক-বিক্রয়েরও সেইরূপ জুয়াচুরি ব্যবসা চলিতেছে। জুয়াচোরদের একটা যেন দস্তুর আছে,—ধারাবাহিকরূপে বঞ্চনার ব্যবস্থা চলিতেছে। কলিকাতার মহামান্য সুযোগ্য পুলিশ-কমিশনর বাহাদুরের এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

জুয়াচোর-দলের বিজ্ঞাপনসমূহের ভঙ্গীই বা কি! এক একখানি বিজ্ঞাপন যেন এক একখানি মহাপুরাণ! তাঁহাদের বিক্রেয় পুস্তকে নাই, এমন জিনিষই নাই। বেদ বেদান্ত, দর্শন, স্মৃতি, কামশাস্ত্র, রতিশাস্ত্র,—ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত শাস্ত্রই সেই গ্রন্থে আছে। ইহা ব্যতীত সেই গ্রন্থখানি যিনি লইবেন তিনি আরও অন্যরকম ৫২॥ খানি পুস্তক উপহার পাইবেন। উপহারের উপর আবার উপহার। সাড়েবাহান্নখানি পুস্তক উপহার পাইবেন,—ইহা ছাড়া সোণার ঘড়ী, মাদুলি, চেন, হীরার আঙটী, জহরতের বোতাম উপহার পাইবেন। এখনও ক্ষান্ত নাই; বিজ্ঞাপনে লেখা হয়, যিনি আগামী শ্রীপঞ্চমীর দিন পর্য্যন্ত এই গুলি লইবেন, তিনি এই সমস্ত উপহারশুদ্ধ অর্দ্ধমূলে পুস্তক পাইবেন। শ্রীপঞ্চমীর পর দিন হইতেই একেবারে চতুর্গুণ মূল্য! অতএব গ্রাহকগণ সত্বর হইয়া, শীঘ্র মূল্য পাঠাইয়া দিবেন—পুস্তক প্রায় ফুরাইয়া আসিল।

মফস্বলে বোকা লোকের অভাব নাই। যখন বুদ্ধিমানে প্রতারিত হয়, তখন বোকার দোষ কি? যাই হউক, মফস্বলের কোন কোন মহোদয় মনে করিলেন,—এইবারে রাতারাতি বড় মানুষ হইবার এক উপায় হইয়াছে। নগদ ১৲ এক টাকা দিলে, সংসারে যাবতীয় গ্রন্থ এবং পুরুষ-জনোচিত অলঙ্কার পাওয়া যাইবে। অধিকন্তু শ্রীপঞ্চমীর পূর্ব্বে দিলে অর্দ্ধমূল্য ॥০ আট আনাতেই সমস্ত মিলিবে। অমনি তিনি শীঘ্র হস্তে মণি-অর্ডার করিয়া টাকা পাঠাইয়া দিলেন। এইরূপ বঙ্গের নানা দিক হইতে প্রত্যহ শত শত মণি-অর্ডার আসিতে লাগিল। বঙ্গভূমে সাতকোটী লোক,—ইহার মধ্যে সাত হাজার কি বোকা নাই? বিজ্ঞাপনদাতা নগদ ৩৷৷০ সাড়ে তিন হাজার টাকা পাইলেন। মফস্বলে বিজ্ঞাপনপত্র ডাকে পাঠাইতে বড় জোর, তাঁহার এক হাজার টাকা খরচ হইয়াছে;—সুতরাং খাঁটী লাভ দাঁড়াইল, আড়াই হাজার টাকা। দেড় মাসের মধ্যে ২৷৷০ হাজার টাকা লাভ, নিরক্ষর দীনহীনের পক্ষে মন্দই বা কি?

যিনি ক্রেতা তিনি কি একবারও ভাবিয়া দেখিলেন না,—৷৷০ বা ১৲ টাকা দিয়া কিরূপে অন্যূন ১০০৲ টাকার জিনিষ ঘরে আসিবে? কোন জগৎ-শেঠ কি কলিকাতায় বসিয়া ভাণ্ডার লুটাইতেছেন? অথবা কোন রথচাইলড্‌স্ কি কল্পতরু হইয়া বসিয়াছেন যে, ৷৷০ আট আনায় ১০০৲ টাকা পাওয়া যাইতেছে? গ্রাহকগণের একটু সহজ জ্ঞান থাকা একান্ত উচিত;—সহজ জ্ঞান থাকিলে, আর এরূপে প্রতারিত হইতে হয় না।

কলিকাতায় প্রবঞ্চকগণ নানা মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছেন। কোন প্রবঞ্চকের কেবলই বিজ্ঞাপন,—মূলে ফাঁক,—আদৌ কিছুই নাই। কোন প্রবঞ্চকের কিছু কিছু পুস্তক আছে,—বিজ্ঞাপনে লেখা আছে, প্রত্যেক গ্রাহককে এক একটী ঐরাবত দিব,—শেষে দিল,—একটী মশা। ইহারা ভ্যালুপেবলে পুস্তক পাঠাইতে কাতর নহে। পাছে ক্ষুদ্র প্যাকেট দেখিয়া গ্রাহক সেই ভিঃ পিঃ প্যাকেট ফেরত দেয়,—এই ভয়ে প্রবঞ্চক কতকগুলা বাজে কাগজ দিয়া সেই প্যাকেট খুব মোটাসোঁটা করে। এমনও শুনিয়াছি, পাছে ভিঃ পিঃ প্যাকেটটী উপরি-উপরি দেখিয়া গ্রাহক ইহার ভুয়াবাজী বুঝিতে পারেন, সেই জন্য প্রবঞ্চক এমন ভাবে প্যাকটী মুড়িয়া দেন যে, গ্রাহক কিছুতেই সেই প্যাকেটের অভ্যন্তরস্থ বস্তু দেখিতে সক্ষম হন না।

৩নং জুয়াচোর। বিজ্ঞাপনে লেখা হয়, "কলিকাতায় জুয়াচরির ভয়ানক প্রাদুর্ভাব; পাঠক সাবধান হউন; বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরে কেহ ভুলিবেন না; আমার ইহা খাঁটি মাল।" পুলিস চোরকে বলে ধর্ ধর্;—চোর বলে ধর্ ধর্।

৪নং জুয়াচোর। বিজ্ঞাপনে লেখা হয়,—"এই মহাগ্রন্থখানি শ্রীযুক্ত কালীচরণ বেদান্তবাগীশ প্রণীত।" পাঠক স্থির করেন, ইহা বুঝি সেই খ্যাতনামা গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশের দ্বারাই প্রণীত।

৫নং জুয়াচোর। শুনিতে পাই, দেখি নাই। উদাহরণ,—শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় বহুসংখ্যক বিক্রীত হয়। জুয়াচোর গ্রন্থকারও বর্ণপরিচয় ছাপাইল। মলাটে লেখা হইল,—

বর্ণপরিচয়

প্রথম ভাগ।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

মহাশয়ের পদকমল স্মরণ করিয়া

প্রণীত।

"মহাশয়ের পদকমলটী" অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে মুদ্রিত। এমন কি অণুবীক্ষণ হইয়া দেখিতে হয়। অবোধ পাঠক বুঝে, এ গ্রন্থ বুঝি স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ত্তৃক রচিত।

৬নং জুয়াচোর। বঙ্কিম বাবু বিষবৃক্ষ লিখিলেন,—এদিকে জুয়াচোর গ্রন্থকারও পুস্তক প্রকাশ করিলেন,—

সুধাবৃক্ষ।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়ের করকমল দ্বারা পবিত্রীকৃত।

নূতন নূতন ফেরেব, জুয়াচুরি যে কত ঘটিতেছে, তাহার সংখ্যা কে করিবে?

এই,—আমাদের "বঙ্গবাসী" সংবাদপত্রের নামে বোধ হয় একশত রকম জুয়াচুরি চলে। শুনিলাম, ইতিপূর্ব্বে মফঃস্বলে একটা অনুষ্ঠান-পত্র প্রচার হইয়াছিল। তাহার উপরেই লেখা আছে,—

"বঙ্গবাসীর অনুষ্ঠান।"

ভিতরে লেখাটা এই ধরণে আরম্ভ হইয়াছে,—"শাস্ত্রগ্রন্থ বঙ্গবাসীর হৃদয়ের ধন। শাস্ত্র না পাঠ করিলে, লোকের গতিমুক্তি নাই সেই জন্য কেবল ৩৲ টাকা লইয়া আমরা অষ্টাদশ মহাপুরাণ দিতে প্রতিশ্রুত হইলাম। যিনি অষ্টাদশ মহাপুরাণ লইবেন, তিনি এক খানি অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত বিনা মূল্যে পাইবেন। ইত্যাদি।" বোকা লোকে মনে করে,—ইহা বুঝি কলিকাতা ৩৪।১ কলুটোলাষ্ট্রীটস্থ বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতেই প্রকাশিত হইবে। বলা বাহুল্য, জুয়াচোরগণ 'দ্বিভাবে' বিজ্ঞাপন লেখে। "বঙ্গবাসীর অনুষ্ঠানের"—এক অর্থ, বঙ্গদেশের লোক কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত; অন্য অর্থ, বঙ্গবাসী সংবাদপত্রের অধ্যক্ষগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত।

বঙ্গবাসীর পাঠক এবং গ্রাহকবর্গকে বলিয়া রাখি, বঙ্গবাসীতে যে সকল অন্যান্য বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, তাহার সহিত বঙ্গবাসীর কোনও সম্পর্ক নাই। শাস্ত্রপ্রকাশ, মহাভারত, হরিবংশ, অষ্টাদশ পুরাণ প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থে বঙ্গবাসীকার্য্যালয়ের ঠিকানা আছে, তাহাই আমাদের নিজস্ব বলিয়া জানিবেন। তাহার জন্য আমরা দায়ী, এবং তাহার সঙ্গেই আ... দের সম্পর্ক আছে। বঙ্গবাসী কার্য্যা... ঠিকানা;—

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট কলিকাতা

এক কথায়, ঐ ঠিকানায় যে সকল ... বিক্রীত হয়, তাহাই আমাদের। কেবল এ... ভুয়া "বঙ্গবাসী" নাম দেখিয়া, ঠিকানার প্র... তত লক্ষ্য না রাখিয়া, গ্রাহকগণ কেহ কে... ভুলেন না। আমরা জানি, বঙ্গবাসীর উ... লোকের ভক্তি শ্রদ্ধা আছে, তাই যেখানে হই... একটা "বঙ্গবাসী" নাম দেখিলেই লোকে বি... চিত্তে টাকা পাঠাইয়া থাকেন। কিন্তু এ ... গ্রাহকের যেন আর না থাকে। আর এক ক... বলি; বঙ্গবাসীর সহিত মফস্বলে "বঙ্গবাসী ক্রোড়পত্র" বলিয়া যে এক টুক্‌রা কাগজ দি... হয়, তাহারও সহিত আমাদের কোন সম্প... নাই,—সে কাগজটুক্‌রা বিজ্ঞাপনমাত্র।

গ্রাহকগণকে আর অধিক কত বুঝাইব... তাঁহারা ভবিষ্যতে যেন বিশেষ অনুসন্ধান লইয়া অথবা কলিকাতার কোন আত্মীয় স্বজন বিশ্ব... ব্যক্তির দ্বারা জানিয়া, অন্যের বিজ্ঞাপিত পুস্ত... কাদি গ্রহণ করেন।"—বঙ্গবাসী।

শুধু, যাবে না এ-প্রাণ!

(১)

পায়ে ধরে সেধেছিনু বলেছিনু তারে।
তবুও সে চলে গেল অভিমান ভরে॥
জানি না কি মন তার,
দেখে গেল অশ্রুধার,
অভাগার পানে তবু চাহিল না ফিরে॥

(২)

শুধু, যাবে না এ-প্রাণ!
আবার উঠিবে হাসি,
আবার বাজিবে বাঁশী,
বসন্ত আসিবে ফিরে, গাবে পিক গান।
শুধু, যাবে না এ প্রাণ!

আবার উঠিবে রবি,
আবার গাহিবে কবি,
এ ঘোর রজনী তায় হবে অবসান!
শুধু, যাবে না এ-প্রাণ!
ফুটিবে কুসুম-রাশি,
ছুটিবে মধুর বাস,
যমুনা শুনিতে বাঁশী যাইবে উজান!
শুধু, যাবে না এ-প্রাণ!

(৩)

দিতে প্রেম, দেছি প্রাণ;
তাই এই পরিণাম!
রাবণের চিতা বুকে!—সংসার শ্মশান!
তারি ছায়া—তারি কথা,
তারি তরে প্রাণে ব্যথা,
তারি তরে কেঁদে কেঁদে অন্ধ এ নয়ান।

(৪)

জনম গোঙানু তবু পুরিল না আশ।
কলঙ্ক বাড়িল শুধু—হলো সর্ব্বনাশ॥
গেছে হাসি—গেছে সুখ,
গেছে প্রেম—হাসি মুখ,
যা' ছিল সকলি গেছে আছে দীর্ঘশ্বাস॥

(৫)

অমৃত ছানিতে হায় উঠিল গরল।
হাসি বলে ভুলে গিয়ে হলো অশ্রুজল॥
আমার এ প্রেম-আশা,
মরুভূমে মৃগতৃষা,
যতন ফুরাল এবে যাতনা কেবল॥

বক্রেশ্বর তীর্থ।

'বক্রেশ্বর' তীর্থ বীরভূম জেলার অন্তর্গত; শীহরি হইতে ৫ ক্রোশ দক্ষিণে। এ পবিত্র স্থানটী বহুকালের। পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অষ্টাবক্র ঋষি এই স্থানে কঠোর তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া বরপ্রভাবে 'অষ্টাবক্র' ও 'বক্রেশ্বর' নামে দুই অনাথ লিঙ্গ আবির্ভূত করেন। আরও মহালিঙ্গেশ্বর তন্ত্রে শিব-পার্ব্বতী-সংবাদে লিখিত আছে,—

"রাঢ়খণ্ডে বৈদ্যনাথঃ বক্রেশ্বরঃ তথাবচঃ।
বীরভূমে সিদ্ধনাথ শ্রীরাজ্যে তারকেশ্বরঃ।"

ইহাতেই জানা যায়, এ তীর্থটী পুরাণের অন্তর্গত; এবং ইহা যে বহুকালের, তাহাতেও আর সন্দেহ নাই।

এক মন্দির-মধ্যেই, উভয় মহাদেব একটী কূপের অঙ্কে স্থাপিত আছেন। মন্দিরটি উচ্চে ১০০ হস্ত পরিমিত হইবে। তাহার গঠন-প্রণালী আধুনিক ধরণের নহে; তাহার চতুর্দ্দিকে লাট-বাঙ্গালা ও গণ্ডির দ্বারা বেষ্টিত।

মন্দিরের পশ্চিমধারে 'শ্বেতগঙ্গা' নামে একটী বড় কুণ্ড আছে। ইহা দীর্ঘে প্রায় ৫০ হস্ত ও প্রস্থে ১৫ হস্ত পরিমিত। সমগ্র কুণ্ডটী ইষ্টকে বাঁধান। এই স্থানে একটী আশ্চর্য্য মহিমা দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই কুণ্ডটীর অর্দ্ধেক জল অত্যন্ত উষ্ণ ও অপর অর্দ্ধেক শীতল। নানা জাতীয় মৎস্য সর্ব্বদা সেই শীত ও উষ্ণ জলে সমভাবে খেলা করিতেছে।

পুরীর দক্ষিণধারে রুদ্রকুণ্ড, ভৈরবকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড প্রভৃতি সারি সারি ৭।৮টী কুণ্ড আছে। তাহার সকলগুলিই ইষ্টকে গ্রথিত। এই গুলির কোনটীর জল এত উষ্ণ যে, হস্ত স্পর্শ হইলেই ঝলসাইয়া যায়; কোনটীর ইহা অপেক্ষা কিছু কম; কোনটীর আবার অত্যন্ত শীতল। পৃথিবীর অভ্যন্তর হইতে সর্ব্বদা শীতল ও উষ্ণ স্বচ্ছ জল উত্থিত হইয়া এই সকল কুণ্ড পরিপূর্ণ করিয়া থাকে; এবং সর্ব্বদাই এই সকল কুণ্ড হইতে প্রভূত ধূম নির্গত হইয়া প্রদোষে ও সায়ংকালে স্থানটীকে অন্ধকারময় করিয়া তুলে। ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকেই অসংখ্য শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে; তাহা দেখিলেই সহসা ৺ কাশীধাম বলিয়া প্রতীত হয়।

প্রত্যেক কুণ্ডের উচ্ছ্বসিত জল একত্র হইয়া একটী নদীর আকারে পরিণত হইয়াছে;

উহার নাম 'বক্রেশ্বর নদী।' ইহাতে 'পাপহরা' ও 'বৈতরণী' নামে দুইটী ঘাট আছে। তন্মধ্যে 'পাপহরা' ঘাটেই শবদাহ হয়। এপ্রদেশের অধিবাসীগণের এপ্রকার স্থির ধারণা যে, এই পাপহরা ঘাটে মৃতদেহ দাহ হইলে মৃতের স্বর্গ হয়। সে কারণ চতুর্দ্দিকের ৮। ১০ ক্রোশ পর্য্যন্ত গ্রামসমূহের মৃতদেহ এখানে দাহ হয়; প্রত্যহ ৫। ৬টী শব দাহ-কারণ এই ঘাটে আসিয়া থাকে।

প্রতি বৎসর ফাল্গুণ মাহায়, ৺ শিবরাত্রি উপলক্ষে এখানে একটী ধুমধাম মেলা হয়। চতুর্দ্দশীর দিন হইতে আরম্ভ হইয়া এই মেলা ১০ দিবস থাকে। মেলা-উপলক্ষে নানা স্থান হইতে ব্যবসায়ীরা বিবিধ দ্রব্যাদি আমদানী করিয়া এখানে বিক্রয় করেন। খরিদ-বিক্রিও প্রচুর পরিমাণে হয়। মেলাটী শিবক্ষেত্রর স্থানের উপর হইয়া থাকে; এ কারণ, খাজনা ও দোকানদারের নিকট ভাড়াতেও অনেক টাকা আয় হয়। পাণ্ডারা তাহা লইয়া থাকেন। তদ্ব্যতীত প্রচুর আয়ের নাখরাজ ভূমি-সম্পত্তিও মহাদেবের সেবার কারণ দেওয়া আছে।

গত বৎসর মেলার সময় বীরভূম-জেলার শ্রীযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর এখানে আসিয়া, অসংখ্য লোকের সমাগম ও ক্ষেত্রের সকল বিষয় অবলোকন করিয়া পরম প্রীত হন; এবং তৎকালীন একটী ফটোগ্রাফ তুলিয়া লইয়া যান। পরে বিশেষ মোনযোগের সহিত অত্র ধামের আসিবার রাস্তাটী তৈয়ার করাইয়া দিয়া অপূর্ব্ব কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

অনাথ লিঙ্গের পূজা ও পবিত্র ক্ষেত্র-দর্শনে কৃতার্থ হইব এই উল্লাসে সকলেই এখানে আসেন। কিন্তু নানা কারণে ইহার এখন বড় দুঃখের অবস্থা ঘটিয়াছে। সময়ান্তরে তাহার উল্লেখ করিব।

মানুষের ভগবান হ…

(আমার স্বপ্ন)

গভীরা রজনী—চারিদিক নিস্তব্ধ… নিদ্রাদেবীর কোমল-ক্রোড়ে সকলেই … সুখে সুখী। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, … এখন—এ অবস্থাতেও নিবৃত্তি নাই কে… স্বপ্নঘোরে এখন আবার আমি এ কি… লাম! দেখিলাম,—

বৈকুণ্ঠবাসী ভগবানের পরমপ্রি… সাধুপুরুষ ভগবানকে বলিতেছেন,—"ভ… আমার সকল আশাই আপনি পূর্ণ … ছেন; কিন্তু আজ আর একটী নূতন … আমার মনোমধ্যে উদিত হইতেছে!"

বাধা দিয়া ভগবান বলিলেন,—'বল… —বল! ভক্তের মনোবাঞ্ছা কবে আমি পূ… না করিয়াছি? বল, তোমার কি অভিপ্রা…

সাধুপুরুষ কহিলেন,—"সকলই তো… ভগবন্! কিন্তু একটি সাধ আমার … অপূর্ণ রহিয়াছে—আমি একদিনও … 'ভগবান' হইতে চাই।"

ভগবান সাধুপুরুষের এ প্রকার … আশা দেখিয়া মনে মনে হাসিলেন। … কিন্তু কহিলেন,—"ভাল, তাহাই হইবে।"

* * * *

সাধুপুরুষ এখন একদিনের জন্য … হইয়াছেন; ভগবানের অতুল ঐশ্বর্য্য … করিতেছেন; ভগবানের সিংহাসনে উ… করিয়াছেন; ভগবানের ন্যায় দিব্যচক্ষু … হইয়াছেন। তিনি দেখিতেছেন,—… কোথাও ভীতিতম হুহুঙ্কার-পরিপূর্ণ … তরঙ্গাকুল মহাসাগর, কোথাও বা … মূর্ত্তি পশুগণের বিকট চীৎকারপূর্ণ ল… তরু প্রভৃতি বেষ্টিত মহারণ্য; কোথাও … স্ফটিকময়ী হর্ম্ম্য ও বসন্তানিল-… রম্যোপবন-পরিপূর্ণ রাজনগরী, কোথা… গুল্মাচ্ছাদিত কুটীর; কোথাও কলাপী…

বিগঞ্জিত কেশদাম-সুশোভিত সৌদামিনী-বিনিন্দিত তাম্বুলরাগ-চিত্রিত সুকোমল কান্তি-ময়ী সুহাসিনী অসতী যুবতীর আনন্দ, কোথাও সতীর আজীবন শোক-জর্জ্জরিত হৃদয়োচ্ছ্বাসিত অশ্রু; কোথাও ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত হইতেছে, কোথাও অধর্ম্মের বিজয়-পতাকা সাবহেলে গগণমার্গে উড্ডীয়মান হইতেছে; পৃথিবীর কোথাও প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কিরণে উত্তপ্ত, কোথাও বর্ষার ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশ হইতে অনবরত বৃষ্টিপতন হইতেছে; কোথাও রমণীর বিলোল কটাক্ষপাতে নির্দ্দোষী যুবার ভাগ্য-চন্দ্রমা কলঙ্ক-রাহুতে গ্রাস করিতেছে, কোথাও পাষণ্ড নরপিশাচ কর্ত্তৃক সতী নারীর সতীত্ব লোপ পাইতেছে; কোথাও আবার চোরে অনায়াসে শাসন-চক্ষুর অন্তরালে সাবধানে চুরি করিয়া পলায়ন করিতেছে, কোথাও বা নির্দ্দোষীকে চৌরাপবাদ দিয়া কারাগারে প্রেরণ করা হইতেছে; কোথাও এই হাসি—এই ক্রন্দন, কোথাও এই আনন্দ—এই শোক! এইরূপ পৃথিবীর নানারূপ ব্যাপার অবলোকন করিয়া সাধুপুরুষ ক্ষণে ক্ষণে বিচলিত হইতেছেন; আবার তন্মুহূর্ত্তেই—"আমি যে ঈশ্বর—আমার তো এ সামান্য বিষয়ে ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নয়!"—এই ভাবিয়া স্থির হইয়া বসিতেছেন। অর্থাৎ যে মুহূর্ত্তে পৃথিবীর কোন স্থানের একটি বীভৎস কাণ্ড তাঁহার নয়নগোচর হইতেছে; সেই মুহূর্ত্তেই তিনি মানবীয় মানসিক-বৃত্তিবলে উত্তেজিত হইয়া পরক্ষণেই আবার ঐশ্বরিক ক্ষমতায় তাহার দমন করিতে অগ্রসর হইতেছেন।

ভগবান অদৃশ্যে থাকিয়া ভক্তের বাহ্য আকার-প্রকার ও আন্তরিক অবস্থা সকলই সম্পূর্ণ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন; আর মনে মনে হাসিতেছেন।

ক্রমে আরও এক বিষম সমস্যা উপস্থিত! বসুন্ধরার কোন স্থানে, বিবাহ-বাসরে বসিয়াই, একটি নবাবের একমাত্র দুহিতার মৃত্যু হইল। সে শোক—সে বিষাদ, ভুক্তভোগী ভিন্ন কেহ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। পুরবাসী সকলে শোকে আকুল, নবাব কাঁদিয়া অস্থির, নগরবাসী শোক-মগ্ন! বিবাহার্থী যুবক প্রণয়িণীকে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে দেখিয়া উন্মাদের ন্যায় আত্মহত্যায় ধাবমান! হায়! কে কাহাকে দেখে, কে কাহাকে রাখে?

এই ঘটনায় সাধুপুরুষের মনও বিচলিত হইল, চক্ষে জল আসিল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার যেই তাঁহার মনে হইল,—"আমি যে আজ ভগবান!"—অমনি সে অবস্থা কাটিয়া গেল। তিনি সুস্থির হইয়া পরবর্ত্তী ঘটনা সকল সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

যথা-সময়ে নবাবকুমারীকে গোর দেওয়া হইল। শোকমগ্ন পুরবাসী শোকাচ্ছন্ন হইয়াই রহিলেন।

এই সময় একজন চোর সমস্ত দিবস এই সকল কার্য্য সন্দর্শন করিয়া, রজনী দ্বিপ্রহরের সময় গোরস্থানে উপস্থিত হইল; তাহার বাসনা,—সে গোর খুঁড়িয়া নবাবপুত্রীর গাত্রালঙ্কারাদি* গ্রহণ করে। কিন্তু তথায় উপস্থিত হইয়াই সে দেখিল যে, মৃত নবাবপুত্রীর প্রণয়পাত্র সেই গোরস্থানের উপর বসিয়া শোকে উন্মাদের ন্যায় আপনার বক্ষস্থলে করাঘাত ও ভূমে আছাড়ি-পিছাড়ি করিয়া ক্রমাগত ক্রন্দন করিতেছে। চোর দেখিল,—এ মহাবিপদ! নিজ-অভিষ্ট-সাধনের পক্ষে প্রধান অন্তরায়! সুতরাং সে উপায়ান্তর না দেখিয়া, সেই গোরস্থানের পৃষ্ঠে তাঁহাকেও হত্যা করিল।

নব-ভগবান তদ্দর্শনে প্রথমে রুষ্ট হইলেন। তাহার পর আবার পূর্ব্বস্মৃতি তাঁহার মনে

* এই স্থলে বলা আবশ্যক যে, এই নবাবগণের এরূপ রীতি নহে যে, পরিবারস্থ কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার অঙ্গের আভরণ উন্মোচন করে; বরং তাহার যাহা কিছু মূল্যবান সম্পত্তি বা অলঙ্কার থাকে, তাহা তাহার কবরের সহিত প্রোথিত করে।

উদিত হওয়াতে, সে রুষ্টভাবও কথঞ্চিত প্রশমিত হইল।

এদিকে চোর আপন কার্য্যসাধনে তৎপর হইল। সে প্রথমে গোর খুঁড়িল, নবাবপুত্রীর মৃতদেহ তথা হইতে বাহির করিয়া উপরে উঠাইল। একে একে সমস্ত মূল্যবান অলঙ্কার আত্মসাৎ করিল। ইহার পরও চোর যখন দেখিল যে, সে নিরাপদে সমস্ত অপহরণ করিতে পারিয়াছে; তখন সে মনে মনে ভাবিল,—"অলঙ্কারাদি সমস্তই তো লইলাম, এখন গায়ের জামা এবং কাপড়খানি কেনই বা বাকি থাকে! ইহাও আমিই লই।" এই ভাবিয়া সে কত শত রাজপুত্রের হৃদয়-বাঞ্ছিত, অপ্সরাবিনিন্দিত, লোক-ললামভূত সেই চম্পক-বরণী ললনাকে বিবস্ত্রা করিয়া তাহার বহুমূল্য অঙ্গসাটী এবং অঙ্গরাখা গ্রহণ করিল।

সাধুপুরুষ (নব-ভগবান) বৈকুণ্ঠে বসিয়া এ সকলই দেখিতেছেন; এবং বারে বারে পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া আত্মসম্বরণ করিতেছেন।

চোর বস্ত্রাদি অপহরণ করিয়া ভাবিল,—"যাহাকে সূর্য্য কখনও সন্দর্শন করিয়াছেন কি না সন্দেহ, যাহাকে একবারমাত্র দর্শন করিবার জন্য কত শত নবাবকুমার লালায়িত হইত, অতুল রূপরাশি লইয়া সে কি আজ এই মৃত্তিকা-স্তূপের উপর পতিত থাকিবার যোগ্য? দুগ্ধফেণনিভ সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়াও যাহার অঙ্গে বেদনা হইত, আহা, সে আজ এই গোরস্থানে হতাদৃতের ন্যায় পতিত? হায়! বিধির এ কি বিধান?" এই সকল ভাবিয়া-চিন্তিয়া চোর সেই শবদেহ দর্শনার্থ জানু পাতিয়া তাহার পার্শ্বদেশে উপবেশন করিল; দেখিতে লাগিল,—"আহা! কি রূপমাধুরী! বিধাতা নির্জ্জনে বসিয়া এ রত্ন গড়িয়াছিলেন। নহিলে এত সুন্দর কেন? ইহার সৌন্দর্য্য বর্ণনা করা কবির সাধ্যাতীত—কল্পনার বহির্ভূত বলিলেও, বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না।"

এইরূপে চোর সেই প্রতিভা-বিস্ফারিত প্রফুল্ল গোলাপ-কুসুমবৎ সৌন্দর্য্যরাশি নিরীক্ষণ করিতেছে; এমন সময় দূর হইতে রতিপতি ফুলশর ত্যাগ করিলেন। চোর তাহাতে অস্থির হইয়া উঠিল; মনে মনে ভাবিল,—"সবই তো হইয়াছে—এক রজনীর মধ্যে ক্রোরপতি হইয়াছি! তবে এ সুযোগে এ রমণী-রত্নকেই বা পরিত্যাগ করি কেন?"

সাধুপুরুষ আর সহ্য করিতে পারিলেন না। আত্ম-সংযমী পুরুষের এইবার সংযম ভঙ্গ হইল। এইবার তিনি আপনার অবস্থা ভুলিলেন; আপনার কর্ত্তব্যজ্ঞান হারাইলেন; তিনি একেবারে ক্রোধান্ধ হইয়া বৈকুণ্ঠ হইতে বলিয়া উঠিলেন,—"পামর! দুরাচার! তোর নিস্তার নাই।"

এই বলিয়াই যে মুহূর্ত্তে সাধুপুরুষ চোরের বিনাশ করিবার জন্য সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবেন, অমনি তিনি স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িলেন।

এই স্থানেই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। শরীর শিহরিয়া উঠিল, স্বপ্নে স্বপ্ন মিশাইয়া গেল। তারপর সাধুপুরুষ কোথায় গেলেন, কি করিলেন, তাহা আর বলিতে পারি না।

রায়শেখর বা কবিশেখর।

রায়শেখরের প্রকৃত নাম শশিশেখর রায়। ন্যূনাধিক দুই শত বৎসর অতীত হইল, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত 'পড়ান' নামক গ্রামে নিত্যানন্দ-বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। কবিশেখর সংস্কৃত ও তৎকাল-প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন; এবং তাঁহার কবিত্বশক্তিও বিলক্ষণ জন্মিয়াছিল। এই কবিত্ব-শক্তি-সহকারে তিনি রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক

কবিতা অনেকগুলি রচনা করিয়াছিলেন। ইনি বিখ্যাত পদরচয়িতা গোবিন্দদাসের পরবর্ত্তী ও শুভঙ্করী আর্য্যা-রচয়িতা দুখরাম দাসের সম-সাময়িক লোক; এবং বিষ্ণুপুরাধিপতি বৈষ্ণব চূড়ামণি মহারাজ গোপাল সিংহের এক-জন প্রধান সভাসদ ছিলেন।

যে সময়ে রাজা গোপাল সিংহ ইন্দাস গ্রামে আসিয়া অবস্থিতি করেন, সেই সময়ে শশিশেখর রায় তথায় আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। রাজার সহিত ভগবৎ-বিষয়ক বিবিধপ্রকার সদালাপ করিয়া এবং স্বরচিত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কয়েকটী পদাবলী তাঁহার নিকটে গান করিয়া তাঁহাকে বিশেষরূপ পরিতুষ্ট করেন। রাজা তাঁহার প্রতি সাতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া আপনার সভাসদ নিযুক্ত করেন, এবং তাঁহাকে আর কোন প্রকার সাংসারিক ব্যাপারে ব্যাপৃত না থাকিতে দিয়া কেবল রাধা-কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করিতে আদেশ প্রদান করেন। তদবধি কবিশেখর পৈতৃক ভূমি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সপরিবারে বিষ্ণুপুরে আসিয়া অবস্থিতি করেন; এবং রাজার আদেশ-মত সাংসারিক যাবতীয় বিষয় হইতে নিশ্চিন্ত থাকিয়া সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী রচনা করিয়া, রাজার নিকট সর্ব্বদা সেই সকল স্বরচিত গাথা মধুর-স্বরে গান করিতেন। রাজা গোপাল সিংহও তাঁহার সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া যাহার পর নাই আনন্দ অনুভব করিতেন। এখনও বৈষ্ণবগণ কবিশেখরের রচিত কবিতাবলী সকল গৃহস্থগণের দ্বারে দ্বারে গান করিয়া ভিক্ষা করিয়া থাকে।

রাজা গোপাল সিংহ পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক স্নানাদি করিয়া বেলা দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত একাগ্রচিত্তে ভগবৎ-পূজা ও আরাধনায় নিযুক্ত থাকিতেন। কেবল সময়ে সময়ে কিছুকাল রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া, বৈষ্ণবগণের সহিত পরিবেষ্টিত হইয়া হরিসংকীর্ত্তনে দিবসের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার রাজ্যের অধিকাংশ আয় কেবল দান-ধ্যানে, অতিথি-সেবা আদি নানা সৎ-কার্য্যে ব্যয় করিতেন। তাঁহার আদেশ-মতে রাজ্যের সমস্ত ব্যক্তিকেই অন্ততঃ সন্ধ্যার সময় একবার হরিনামের মালা লইয়া হরিনাম করিতে হইত; নতুবা রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে হইত। এক দিবস, রাজা ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতে করিতে সন্ধ্যার সময় এক সূত্রধরের বাড়ীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সূত্রধর সমস্ত দিবস পরিশ্রম করিয়া অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছিল; অথচ রাজ-আজ্ঞা প্রতিপালন না করিলেও নয়! তাই সে অতি বিরক্ত ভাবে অসন্তোষ-সূচক বাক্যে আপন স্ত্রীকে বলিল,—"দেতো, গোপাল সিংহের বেগারটা (অর্থাৎ হরিনামের মালাটা)! একবার বেগার খেটে নিই।" এই অবধি এতদ্দেশে হরিনাম করাকে গোপাল সিংহের বেগার বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

১৭৪৪ খৃঃ অব্দে, মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত, গোপাল সিংহের হরি-সংকীর্ত্তনে মত্ত হইবার সময়, স্বীয় অসংখ্য সৈন্য-সহ উপস্থিত হইয়া বিষ্ণুপুরের দুর্গাক্রমণ করেন। প্রহরীগণ অনতিবিলম্বে আসিয়া তৎসংবাদ প্রদান করিল। কিন্তু গোপাল সিংহ তখন জগতের সমস্ত আপদ-বিপদ, সুখসম্পদ বিস্মৃত হইয়া সংকীর্ত্তনের মধ্যে পূর্ব্বমতই নৃত্য-গীত করিতে লাগিলেন। প্রহরীগণ কোন প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত না হইয়া উদ্বিগ্নচিত্তে স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিল।

এদিকে আক্রমণকারীগণ, বিনা বাধায় অনায়াসে দুর্গ অধিকার করিবার মানসে, ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন বিপৎ-

তারণ ভক্তবৎসল ভগবান প্রেমনিমগ্ন গোপাল সিংহের আশু বিপৎপাত দর্শন করিয়া আর স্থিরভাবে থাকিতে পারিলেন না। স্বয়ং ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সমরসজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া গোপাল সিংহের নীলবর্ণ ঘোটকের পৃষ্ঠে আরোহণ-পূর্ব্বক দুর্ব্বার-বেশে সমরক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া নিমিষমধ্যে সৈন্যদলকে পরাজিত করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। কামানের গভীর গর্জ্জনে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সেই ঘোরতর শব্দে কত গর্ভবতীর গর্ভপাত হইয়া গেল। রাজার আদেশ-মতে অনুচরগণ অনুসন্ধান করিতে লাগিল, রাজার বিনানুমতিতে কোন্ ব্যক্তি এই প্রকার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

এদিকে ভক্তবৎসল মদনমোহনের আপাদমস্তক হইতে যুদ্ধশ্রমজনিত ঘর্ম্ম দরদর বেগে নির্গত হইয়া তাঁহার গাত্রের সমস্ত পরিচ্ছদ আর্দ্র হইয়া গিয়াছে; এবং মন্দিরের মধ্যে বারুদের গন্ধ বহির্গত হইতেছে। এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র রাজা বুঝিতে পারিলেন যে, প্রভু মদনমোহন তাঁহার সেবককে এই ঘোর বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য স্বয়ং শত্রুসহ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া এত দুঃখ ও কষ্ট সহ্য করিয়াছেন! তখন শশিশেখর প্রভৃতি সহচরগণের সহিত, রাজা মদনমোহন জিউর মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং প্রভুর কষ্ট দর্শন করিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। অনন্তর বহুবিধ স্তব ও স্তুতি পূর্ব্বক চামরব্যজন করিয়া ভগবানের শ্রান্তি দূর করিতে নিযুক্ত হইলেন।

কবিশেখর 'মদনমোহন' উপাখ্যান নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন; উহাতে মদনমোহন সম্বন্ধীয় অনেক ঘটনা লিখিত হইয়াছিল। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও উক্ত গ্রন্থখানি প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না। কবি উক্ত গ্রন্থে ও তাঁহার রচিত অনেক সংস্কৃত কবিতায় আপনাকে মল্ল ভূপতির কিঙ্কর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

অতৃপ্তি।

জগতে চিরদিন ধরিয়া একটা নিষ্ফল বাসনা ও অপূর্ণ সাধের স্রোত চলিয়া আসিতেছে। কোথাও বিরাম নাই—শান্তি নাই। মনুষ্য-হৃদয় হইতে ইহার উৎপত্তি, আর জগতের অবসানেই ইহার অবসান। বোধ হয়, এজগতে মনুষ্যের প্রাণের সাধ কখনও মিটে না। রমণীর সৌন্দর্য্যের আকাঙ্ক্ষা, বালকের খেলিবার সাধ, দরিদ্রের ধনলিপ্সা, বিরহীর মিলনাভিলাষ, এজীবনে কখনও পূর্ণ হইবার নহে। তাই মনুষ্য-হৃদয়ে একটা বিষম অতৃপ্তি রহিয়া গিয়াছে। এ বিষম অতৃপ্তির বিলাপ-সঙ্গীত বর্ত্তমান অতীত হইয়া অনন্তকাল বহিয়া, পরলোকের পারাবারে মিলিত হইয়াছে। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে, অতৃপ্তি, জগতের বিলয় পর্য্যন্ত, একভাবে—একটানা প্রবাহিত। অতৃপ্তি মনুষ্য হৃদয়ের এক উচ্চ মহত্ত্বের পরিচয়। এ জীবনে প্রাণের সাধ পূরিল না বলিয়া, মনুষ্য, কাতর-কণ্ঠে পরলোকে তাহা পূর্ণ হইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করে। অতৃপ্তি এই মনুষ্য জীবনে ইহকাল পরকালের মহা ব্যবধান ঘুচাইয়া, প্রাণের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। মনুষ্য আজন্ম ধনের জন্য, প্রেমের জন্য, সুখের জন্য, চীৎকার করে; কিন্তু প্রকৃত বাসনা পূর্ণ হইবার নহে। এ জড় জগতে রূপ ও গৌরব, প্রেম ও সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য ও অভিমান, সকল সামগ্রীরই বিনাশ আছে; কিন্তু বাসনার বিনাশ নাই—বিমাতার অভিশাপে সে যেন চিরদিনই অপূর্ণ। এ জীবনে যে বাসনা পূর্ণ করিতে চাহে, সে উন্মাদ—ব্যাভিচারী—নরকের কীট। অসীমের মধ্যে সীমা, অনন্তের মধ্যে অন্ত, বিস্মৃতির মধ্যে স্মৃতি, নিস্তব্ধতার মধ্যে শব্দ,

ইহা যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলেও, বাসনা পূর্ণ হইবার নহে। বাসনার প্রকৃতি কিছু স্বতন্ত্র। বিরহিণীর পুষ্পশয্যা বিছাইয়া, বীণা ক্রোড়ে লইয়া, চিরজীবন মধুর-প্রতীক্ষায় বহিয়া গেল, কিন্তু সাধ মিটিল না; বন্ধ্যার পুত্র কামনায় চিরজীবন অশ্রুজলে অতিবাহিত হইল, বাসনা পূরিল না। এ অতৃপ্তির বিরাম নাই—অবসান নাই। আমি নীল চন্দ্রাতপতলে, মধুর জ্যোৎস্নায় বসিয়া, নির্জ্জনে নীরবে, জাহ্নবীর গর্ভে, বসন্তের বনশোভা দেখিয়া মরিতে পারি; বিষাদ-প্রতিমা ভিখারিণী কন্যার মলিন মুখ-সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া এ জীবন গোঙাইতে পারি; যমুনার তীরে প্রশান্ত শেষ-নিশায় মলিন চন্দ্রমার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া এ প্রাণের অবসান করিতে পারি; কিন্তু তথাপি প্রাণের তৃপ্তি হইবে না,—অতৃপ্তির রীতিই এই। ধনের আকাঙ্ক্ষা, প্রেমের আকাঙ্ক্ষা, সুখের আকাঙ্ক্ষা, জগতে কয়জনের মিটিয়াছে? ভাল বাসিয়া কয়জনের সাধ পূরিয়াছে? কে বলিতে পারে, আমার ধনের সাধ মিটিয়াছে?—সুখের সাধ মিটিয়াছে? এ দুঃখের মনুষ্য-জীবনে এ সাধ কখনও মিটিবার নহে।

পাখীর ডাকিয়াই সুখ। বিরহীর রোদনেই সুখ। মনুষ্য-হৃদয়ের বাসনার অতৃপ্তিই অনন্ত সুখের উৎস। অতৃপ্তির মধ্যে যে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য, স্বপ্নময়ী মাধুরী, অমৃতের প্রস্রবণ, লীলাময়ী কবিতার বিকাশ; তাহা কয়জন প্রাণে প্রকৃত অনুভব করিয়াছে? অতৃপ্তির সন্তাপ-দ্রবময়ী যে সুখ, তাহা প্রাণে অনুভব করিলে প্রাণের সামগ্রী বলিয়া তাহার ছায়ায় এ জীবন বিকাইতে সকলেরই সাধ হয়। চক্ষের জলে স্বর্গ আছে, পাষাণের মধ্যে প্রাণ আছে, অতৃপ্তির মধ্যেও তৃপ্তি আছে। সুখ উৎস, সৌন্দর্য্যহিল্লোল, প্রেম-প্রস্রবণ, অতৃপ্তির কায়ায় পর্য্যবশিত। এ বিশ্বসংসারে এই তিন সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব সম্মিলন যে প্রাণে অনুভব করিয়াছে, সেই মজিয়াছে—এই মর-জগতে সেই অমর। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রেমময়ী রাধিকার অমৃতময়ী মুখ-সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া বলিয়াছিলেন——

"জনম অবধি, হাম ওরূপ নেহারিনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়ে জুড়ানো না গেল॥"

হে বিধাতঃ! আজন্মকাল এরূপ দেখিলাম; কিন্তু নয়নের তৃপ্তি হইল না। আবার আর এক স্থলে বলিতেছেন,—

"লাখ লাখ নয়ন
বিহি কাহে না দিল হামারে?"

হে বিধাতঃ! তুমি আমায় লক্ষ নয়ন কেন দিলে না! ও মুখের সৌন্দর্য্য, তাহা হইলে আমি যে ভাল করিয়া দেখিতাম! দুই চক্ষে দেখিয়া প্রাণে সাধ মিটিল না।

এই তো অতৃপ্তির সৌন্দর্য্য! এই তো প্রেমের ললিত সুখাবেশময়ী স্বর্গীয় মাধুরী! মনুষ্য-হৃদয় অতি কোমল; প্রাণ রাখিবার জন্য, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে এক একটা আশ্রয়ের জন্যই ছুটিয়াছে। মনুষ্য-জীবনের অবসান মৃত্যু নহে। প্রাণের মিলনই মৃত্যু, অতৃপ্তির তৃপ্তিই মৃত্যু। মস্তকোপরি অনন্ত নীলিমাপটে নিরীক্ষণ করিয়া দেখ, চন্দ্র-সূর্য্য-তারা ছুটিতেছে—গ্রহে গ্রহে হাহাকার করিয়া ছুটিয়াছে। নিম্নে আবার কুসুমকুন্তলা সর্ব্বংসহা ধরণীর বক্ষে চাহিয়া দেখ, অনন্ত-দেশপ্রবাহিণী ক্ষুদ্র তটিনী, পর্ব্বত, কান্তার, শ্যামল ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া প্রেমোন্মাদিনী মূর্ত্তিতে স্বামী-সহবাস-অভিলাষে সাগর-সঙ্গমে ছুটিয়াছে। এই দৃশ্য কি সুন্দর! এ বিরহের বিকার নাই। দিবস স্বামী, রজনী স্ত্রী, এ দাম্পত্য-প্রণয়ের ব্যবধান অতি ভয়ঙ্কর! প্রকৃতির এ বড় নিষ্ঠুর ব্যবহার! দিন, মাস, বৎসর, যুগ,

যুগান্তর অনন্ত কাল বহিতে চলিল; চন্দ্র-সূর্য্যের প্রাণের বিনিময় এ পোড়া সংসারে বুঝি আর ঘটিবে না! এ অতৃপ্তি চিরদিনই রহিবে; বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই। বৃষভানু-সুতা বিশ্বের আরাধ্যা প্রকৃতি সতী একদিবস অনন্ত বিষাদে অধীর হইয়া বলিয়াছিলেন,—

"জীবন গোঙাইনু তবু পূরল না সাধ।"

কি সুন্দর প্রেমের পরিচয়!!

বিধবার ইহজীবনের সাধ মিটিল না, তাই পরলোকে স্বামীর সহিত মিলিত হইবে, ইহাই তাহার ধ্রুব বিশ্বাস; ইহাই একমাত্র প্রাণের বাসনা—ইহাই দরিদ্রের অন্নচিন্তা। বিরহিনীর শোকসন্তপ্ত প্রাণের কি উজ্জ্বল প্রতিভা! এ জীবনের কি মৃত্যু আছে? অতৃপ্তির মধ্যে কি অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সুখের সমাবেশ! অতৃপ্তির কি সুখাবেশময়ী সঞ্জীবনী শক্তি!" এ মনুষ্য-জীবনের যদি বাসনা পূর্ণ হইত, অতৃপ্তির যদি তৃপ্তি হইত, তাহা হইলে প্রাণের আশা—জীবনের উন্নতি—অন্তরে [illegible] সারের সুখ—বিশ্বের সৃষ্টি সৌন্দর্য্য,—এই যে এতটা কাণ্ড-কারখানা, চিরদিনের মত নির্ব্বাণ হইয়া যাইত।

অতৃপ্তিই মনুষ্যের প্রাণ। মানব-হৃদয়ে যদি অতৃপ্তির সৃষ্টি না হইত, তাহা হইলে জগতে দুঃখ রাখিবার আর স্থান থাকিত না। যে সৌন্দর্য্যের জন্য আমি কাঙ্গাল, যে প্রেমময়ী স্বপ্নময়ী মুখের সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমি উন্মাদ, যাহাকে হৃদয়ে ধরিবার জন্য প্রাণ সর্ব্বদা লালায়িত, সে প্রাণের সাধ, সে সুখ-যন্ত্রণা, সে লীলাময়ী কল্পনা, যদি আমার পূর্ণ হইত, তাহা হইলে আর রহিল কি? তাহা হইলে অনন্ত যুগের সুখ-স্বপ্ন, আজন্মের অতৃপ্তি-বিরহ, চিরজীবনের সুখ-আশা তো এক মুহূর্ত্তে মিলাইয়া গেল! এই মি[illegible]নের মৃত্যু। এ জড় জগৎ-শরীরে যদি প্রাণের সঞ্চার হয়; সূর্য্য নিভে, চন্দ্র তারা কক্ষচ্যুত হয়; পবনের যদি গতিরোধ হয়; বোধ হয়, তাহা হইলেও জগতের এই বিলাপ-সঙ্গীত, বিশ্বের এই ক্রন্দন ধ্বনি—এই বিষম অতৃপ্তি, কখনই মিটিবে না। এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত বাসনার অনন্ত অতৃপ্তি অনন্তকাল ধরিয়া অতৃপ্ত রহিয়া যাহিবে। এ জীবনে বাসনা যে পূরে না, ইহাই মনুষ্যের সৌভাগ্য।

সংবাদ।

—'অনুসন্ধানের' মুদ্রণ-কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় সংবাদ পাইলাম যে, 'রত্নগৃহের' শ্রীযুক্ত পরেশনাথ মিত্র আমাদের নামে কলিকাতা-পুলিস-আদালতে যে মানহানির নালিশ আনিয়াছিলেন, তাহা তিনি তুলিয়া লইয়াছেন। পরের বুদ্ধিতে চালিত হইয়া তিনি এ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলেন বলিয়া, আমাদের নিকট নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া মার্জ্জনাও চাহিয়াছেন।

—"শান্তি"র সহকারী সম্পাদক বিধুভূষণ ঘোষ তাহার সম্পর্কিত ভ্রাতার নাম জালসহি করিয়া আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের ডাকঘরে সেভিংস-ব্যাঙ্ক হইতে টাকা বাহির করে, পাঠকের এ কথা বোধ হয় স্মরণ আছে। নরিস সাহেবের বিচারে গত দায়রায় তাহার ১৮ মাস কঠিন পরিশ্রমসহ কারাদণ্ড হইয়াছে।

—সেক্রেটারী কলমান মেকলের পদে এফ, বি, পিকক বাহাদুর ছোটলাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হইলেন। স্যার, জি, সি, পাল এবং সি, এইচ, মুরও এই সভার সদস্য পদে পুনর্নিযুক্ত হইলেন।

—স্ত্রী-সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণে সুব্যবস্থার জন্য, হায়দরাবাদের নিজাম বাহাদুর নিজরাজ্যে কতকগুলি মহিলাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। বড়ই সুব্যবস্থা হইয়াছে। ইংরেজ-রাজ্যেও সম্ভ্রান্ত, বংশীয়া মহিলাগণের সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য এইরূপ সুব্যবস্থা হওয়া উচিত।

—বড়লাট বিশ্ববিদ্যালয়ের চানসেলর। তিনি মান্যবর ডাক্তার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয়কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চানসেলার-পদে মনোনীত করিয়াছেন। এ পদে দেশীয়ের এই প্রথম নিয়োগ। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এ পদে সর্ব্বাংশে উপযুক্ত।

—১৮৯২ সালের মধ্য-ইংরেজী বা মাইনর পরীক্ষায় Longman's New Reader [illegible] to page ১১৮ ইংরেজি সাহিত্য এবং পদ্যপাঠ তৃতীয় ভাগ চারুপাঠ তৃতীয় ভাগের ১ম অধ্যায় ও তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ পাঠ এবং সীতার বনবাস বাঙ্গালা সাহিত্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

—সাব্যস্ত হইয়াছে নাকি যে, আগামী তিন বর্ষ উত্তর ব্রহ্মে রেলপথ-বিস্তারের জন্য বর্ষে বর্ষে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে।

—শুভসংবাদ। বর্দ্ধমান-রাজ-পোষ্য-পুত্র বিষয়ক মকর্দ্দমা আপোষে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। সোমবারে মহারাণী নারায়ণকুমারী চুক্তিপত্রে দস্তখত-মোহর করিয়া দিয়াছেন। মহারাণী নগদ তের লক্ষ টাকা, গেষ্ট হাউস নামক একটী বাটী এবং তাহার সংলগ্ন পুষ্করিণী লইয়া, সমস্ত দাবী-দাওয়া হইতে ক্ষান্ত হইতে স্বীকার করিয়াছেন।

অনুসন্ধান।

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

৩য় খণ্ড] ১৫ই পৌষ, ১২৯৬ সাল। [১০ম সংখ্যা।

পাপীর প্রার্থনা।

আজ—
কতকাল আসিয়াছি ভবের বাজারে।
ভুলেছি তোমায়, নাথ, পাপ-কোলাহলে ॥
দিন দিন—
কত শোক, কত দুঃখ, তাপ হাহাকার।
বহিল বক্ষের'পরে কত অশ্রুধার ॥
তবু না বুঝিতে পারি মায়ার বন্ধন।
রহিলাম মোহমদে মত্ত অনুক্ষণ ॥
অনন্তে উড়িতে চাই, পাছে লাগে টান।
বাঁধা রয় ভবডোরে দুর্ব্বল পরাণ ॥
মনস্তাপে, মনোদুঃখে, বিপদেতে পড়ি।
তোমার করুণা তবু সদাই পাশরি ॥
পাপে জ্বলি, পাপে পুড়ি, সংসার-অনলে।
কেহ নাহি ফিরে চায়, নিজ কাযে চলে ॥
তবুও তাহার কাছে লইতে আশ্রয়।
পরাণে আমার কভু নাহি হয় ভয় ॥
এবে বলি তাই—
বিষের জ্বালায় প্রাণ 'হাহা উহু' ক'রে।
কত দিন রব আর ভব-কারাগারে ॥
কত দিন এই ভাবে দুর্ব্বল হইয়ে।
যাইবে দীনের দিন বৃথায় চলিয়ে ॥
কত দিন পাপে আর থাকিব মজিয়া।
কত দিন বিষয়েতে রহিব ডুবিয়া ॥
ডাকি তাই—
প্রেমময়! দীননাথ, করহে করুণা।
নহিলে এ ভাঙ্গাতরী আর ত চলে না ॥

বিধির নির্ব্বন্ধ।

"বিধির নির্ব্বন্ধ কভু খণ্ডন না যায়।"

(১)

পূর্ব্বকালে পূণ্যভূমি ভারতবর্ষের কোন স্থানে একজন নরপতি বাস করিতেন। তাঁহার এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে, রাজা ভাবিলেন,—"চিরকালই রাজা-রাজড়ার পুত্র-কন্যার বিবাহ লইয়া অনেক বাদ-বিসম্বাদ চলিয়া আসিতেছে। একটা-না-একটা তুমুল কাণ্ড যেন বাধিবেই বাধিবে। আমার একমাত্র কন্যা এখন বয়স্থা। আমি তাহার বিবাহের জন্য গোপনে গোপনে এমন এক পাত্র স্থির করিব যে, আর কোন গোলযোগ ঘটিবে না।" এই স্থির করিয়া, মন্ত্রীর উপর রাজ্যভার অর্পণ করতঃ মনোগত

অভিপ্রায় কাহাকেও জ্ঞাত না করিয়া, রাজা দেশ-পর্য্যটনার্থ বহির্গত হইলেন। বহুদিন গত হইল, তথাপি তিনি ফিরিয়া আসিলেন না। যখন যেখানে যে অবস্থায় থাকিতেন, তখনই তথা হইতে পত্র প্রেরণ করিয়া আপনার কুশল-সমাচার এবং অন্যান্য সংবাদাদি মন্ত্রী ও রাজ্ঞীকে জ্ঞাত করিতেন, এই মাত্র।

এদিকে রাজ্ঞী আপনার কন্যাকে বয়ঃপ্রাপ্তা দেখিয়া প্রত্যেক পত্রেই রাজাকে তাহার বিবাহের বিষয় বিবেচনা করিতে লিখিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মহারাজ সে সকল কথায় যেন কর্ণপাতও করিতেন না। অবশেষে রাজ্ঞী স্থির করিলেন,—"কন্যা বয়স্থা, মহারাজও এসময়ে রাজ্যে অনুপস্থিত; অতএব আমিই এ বিবাহের উদ্যোগ করি।" এই স্থির করিয়া তিনি নানা স্থানে পাত্রানুসন্ধান করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে ঘটক প্রেরণ করিতে আদেশ দিলেন। ঘটকগণ, নানা স্থান হইতে নানা রাজপুত্রের সন্ধান আনিতে লাগিল।

অনেক সন্ধান লইয়া ও মহারাজের জন্য বহুদিন অপেক্ষা করিয়া, রাজ্ঞী অবশেষে এক-স্থানে কথা স্থির করিয়া ফেলিলেন।

এদিকে মহারাজ নানা দেশ-বিদেশ—নানা রাজ্য পরিদর্শন করিয়া, এক বহুসদ্গুণসম্পন্ন রাজকুমারের সহিত কন্যার বিবাহ দিবেন স্থির করিয়া (এমন কি বিবাহের দিন পর্য্যন্ত অবধারিত করিয়া) স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়াই, এই আদেশ দিলেন,—"আগামী ১৭ই বৈশাখ আমার কন্যার বিবাহ—আমি পাত্র স্থির করিয়া আসিয়াছি। আজ হইতে পঞ্চদশ দিবস রাজ্য-মধ্যে মহোৎসব হইবে। প্রতি রজনীতে আলোকমালায় আমার সমস্ত রাজ্য আলোকিত থাকিবে। আজই বন্দী ও ভাটগণকে নানা দেশ-বিদেশে প্রেরণ কর। শত শত ব্রাহ্মণকুমারকে এই নিমন্ত্রণ-কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে। আজ হইতে যাগ, যজ্ঞ, দান, ধ্যান, যাহা কিছু আবশ্যক, সমস্তই আরম্ভ করা হউক।"

রাজ-আজ্ঞা তৎক্ষণাৎ চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইল। রাজ্যে একটা মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল।

রাজ্ঞী এ-সকল কোন বিষয়ই অবগত ছিলেন না। হঠাৎ যখন শুনিলেন যে, মহারাজ কন্যার বিবাহের জন্য পাত্র স্থির করিয়া আসিয়াছেন, তখন তিনি মহা বিপদে পড়িলেন। তিনি যদি জানিতেন যে, মহারাজ পাত্র স্থির করিবার জন্যই দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন, তাহাহইলে তিনি আর উদ্যোগী হইয়া কন্যার বিবাহের জন্য পাত্র স্থির করিতেন না! এখন এ উভয় সঙ্কট! তিনিও যে তারিখে, যে লগ্নে কুমারীর বিবাহের কথা স্থির করিয়াছেন, রাজাও ঠিক সেই তারিখে, সেই লগ্নে কন্যার বিবাহার্থী অন্য এক পাত্র স্থির করিয়া উপস্থিত! কোথায় তিনি রাজার অপেক্ষায় রাজ্যে মহোৎসবের আদেশ প্রচারিত করিতে যৎকিঞ্চিত কালবিলম্ব করিতে ছিলেন,—না, একেবারে হিতে বিপরীত ফল দাঁড়াইল!

আপনার কার্য্যকে কেহ অন্যায় বলিয়া বিবেচনা করে না। তাহা যদি করিত, তাহাহইলে এ পৃথিবী স্বর্গধাম হইত; কাহারও সহিত কখনও বাদ-বিসম্বাদ কাহারও হইত না। এত মতভেদ—এত পার্থক্য কুত্রাপি আর দৃষ্টিগোচর হইত না।

এই সূত্রের প্রমাণানুসারে রাজ্ঞীও আপনার মনোনীত পাত্রকে (রাজকুমারকে) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থির করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন,—"ইহারই সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিব। মহারাজ যে পাত্র স্থির করিয়াছেন, তাহা অভ্যুৎকৃষ্ট না হইতে পারে; কিন্তু আমি বিশেষরূপ অনুসন্ধানের দ্বারা আমার মনোনীত পাত্র-সম্বন্ধে যতদূর জানিয়াছি, তাহাতে

ইহা অপেক্ষা উত্তম হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। অতএব, আমি এই পাত্র ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিবনা। এ রাজপুরে না হয়, আমি গোপনে আমার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া, কন্যার বিবাহ দিব।"

এইরূপ স্থির করিয়া রাজ্ঞী গোপনে গোপনে কন্যার বিবাহের অন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন; এবং তাঁহার নিজ-মনোনীত পাত্রের সহিত বিবাহ দিবার জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ রহিলেন।

এদিকে মহারাজ মহোৎসবে মত্ত। নানা দেশ-বিদেশ হইতে নিমন্ত্রিত রাজা, মহারাজা, সম্রাটগণের আতিথ্যসৎকারে নিযুক্ত। বিন্দুমাত্র সময়ও তাঁহার নিকট এখন বহুমূল্য বলিয়া অনুভূত; রাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎ করাও বড় ঘটিয়া উঠেনা। যদিও বা দিনান্তে একবার সাক্ষাৎ হয়, তাহাহইলেও রাজ্ঞী তাঁহার প্রাণের কথা খুলিয়া বলেন না। কারণ, যদি বলেন, তাহাহইলে হয় তো মহারাজ সে বিষয়ে অমত করিতে পারেন! এইরূপে দুই পক্ষেই বিবাহের আয়োজন চলিতে লাগিল।

(২)

ঠিক এই সময়ে বৈকুণ্ঠে একজন দেবদূত বড়ই কৌতূকহলাক্রান্ত হইয়া ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভগবন্! মর্ত্তে ঐ যে একটি নরপতির একমাত্র দুহিতার বিবাহ লইয়া এত মহোৎসব দেখিতেছি, উহার কি ঐ রাজপুত্রের সহিতই বিবাহ হইবে?"

বৈকুণ্ঠবিহারী শ্রীমধুসূদন মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন,—"না, যাহার সহিত বিবাহ হইবে, তাহা তোমায় পরে বলিব। তবে এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখি যে, সে বিবাহের আয়োজন তুমিই করিয়া দিবে। কিন্তু আপাততঃ এই বিবাহ লইয়া এক বিরাট ব্যাপার সংঘটিত হইবার উপক্রম হইতেছে; তাহা বলি, শুন।" এই বলিয়া ভগবান আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণনা করিলেন।

দেবদূত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভগবন্! যাহা শুনিলাম, তাহাতে আর একটি বিষয় জানিতে বড় কৌতূহল হইতেছে। রাজা এবং রাণী উভয়ের মনোনীত এই যে দুই রাজকুমার আপাততঃ বিবাহের জন্য আগতপ্রায়—ইহাদের মধ্যে কাহার সহিত রাজকুমারীর বিবাহ হইবে? রাজরাণী কি গোপনে কার্য্য-সমাধা করিতে পারিবেন?"

শ্রীহরি প্রফুল্লমুখে উত্তর দিলেন,—"বৎস! বিধির লিখন কখনও খণ্ডন হয় না। রাজকুমারীর ললাটে যাহা আছে, তাহাই হইবে। ঐযে রাজ-কারাগারে অন্ধকার কক্ষে একজন বন্দী ক্ষুণ্ণমনে শূণ্যদৃষ্টিতে বসিয়া আছে, উহারই সহিত রাজকুমারীর বিবাহ হইবে।"

দেবদূত কারাগৃহের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া সেই অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে দেখিলেন। তাহার মলিন বসন, শীর্ণ শরীর, অপকৃষ্ট মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার বড় ঘৃণা হইল। তৎপরে নিয়তির লিপির উপর তাঁহার বড় ক্রোধ হইল; তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন,—"না, তা' কখনই হইতে দিব না। এমন শচীসদৃশা চম্পকবরণী রাজকুমারীর সহিত একটা অপকৃষ্ট জীবের বিবাহ হইবে?—আবার 'আমিই তাহার আয়োজন কারী!' ভাল, আজ দেখিব, কেমন করিয়া বিধাতার লিপি পূর্ণ হয়।" এই স্থির করিয়া দেবদূত বৈকুণ্ঠধাম হইতে অপসৃত হইয়া মর্ত্তে অবতরণ করিলেন। ভগবানও ভক্তের ভাব অবলোকন করিয়া আপন মনে হাসিতে লাগিলেন এবং দেবদূতের দূরদৃষ্টি শক্তি হরণ করিলেন।

এদিকে দেবদূত মর্ত্তে আসিয়া মায়ায় মানবাকার ধারণ-পূর্ব্বক কারাগৃহে প্রবেশ করিলেন। বন্দী চমকিয়া উঠিল।

দেবদূত কহিলেন,—"বন্দি! তুমি মুক্তিলাভ করিতে ইচ্ছা কর?"

বন্দী। আপনি কে?

দেবদূত। আমি যেই হই, তোমায় মুক্ত করিয়া দিবার ক্ষমতা আমার আছে। তুমি মুক্তি-লাভ করিতে ইচ্ছা কর?

বন্দী। কারাগৃহের মধ্যে এমন কে বন্দী আছে যে, মুক্ত হইতে ইচ্ছা করে না? কিন্তু মহাশয়! শুনিতেছি, সম্প্রতি রাজকন্যার বিবাহ হইবে। অনেক দিন হইল, উত্তম আহার আমার ভাগ্যে ঘটে নাই—

দেবদূত। আমি তোমায় যথেষ্ট উত্তম আহারীয় পদার্থ প্রদান করিব। রাজকন্যার বিবাহের আশায় তোমায় বসিয়া থাকিতে হইবে না।

বন্দী সম্মত হইল। দেবদূত মায়াবলে কারাগৃহের দ্বার উন্মুক্ত করিলেন। বন্দী কারাগৃহ হইতে বাহির হইল। দেবদূত তখন, মায়াবলে তাহাকে অচৈতন্য করিয়া, শত সহস্র যোজন দূরস্থিত এক পর্ব্বত-শিখরোপরি বিস্তৃত উপত্যকায় লইয়া গিয়া উপবেশন করাইলেন। কোথায় নরকসদৃশ ভীষণ কারাগার, আর কোথায় এই প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের আধার স্বর্গোপম মনোহর স্থান! এই সকল অভাবনীয় ঘটনা সন্দর্শন করিয়া বন্দীর একপ্রকার বাঙ্‌নিষ্পত্তি রহিত হইল।

দেবদূত কহিলেন,—"দেখ, তোমায় আমি উদ্ধার করিলাম; কিন্তু আর একটি কার্য্য এখনও বাকি আছে আমি তোমার জন্য আহার-সামগ্রী সংগ্রহ করিতে চলিলাম। তুমি ততক্ষণ এই নির্জ্জন উপত্যকায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে আপনার মন-প্রাণ পুলকিত কর। আমি চলিলাম। দুই চারি মুহূর্ত্তের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া আবার তোমার সন্ধান লইব—তোমায় প্রচুর পরিমাণে আহার্য্য বস্তু প্রদান করিব।"

এই সকল কথা বলিয়া দেবদূত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। বন্দী বহুকাল-পরে মুক্তিলাভ করিয়া ভগবানকে শত শত ধন্যবাদ দিতে লাগিল।

(৩)

এদিকে রাজ্ঞী গোপনে কুমারীর বিবাহ দিবার সমস্ত আয়োজন করিয়াছেন। কেবল দুহিতাকে গোপনে রাজপুর হইতে বাহির করিয়া আপন পিত্রালয়ে প্রেরণ করিতে পারিলেই তাঁহার অভিষ্ট সিদ্ধ হয়। রাজ্ঞী তাহারই আয়োজন করিতে সম্পূর্ণ ব্যগ্র।

একজন বিশ্বস্ত দাসীকে রাজ্ঞী বলিলেন,—"দেখ, আমাদের সকল কৌশলই সফল হইয়াছে; কিন্তু দুহিতাকে পিত্রালয়ে প্রেরণ করি কেমন করিয়া?"

দাসী কহিল,— "নিকটেই আপনার প্রিয়সখীর বাটি আছে। আপনি একটি বৃহৎ 'চেঙারিতে' রাজকুমারীকে বসাইয়া চতুর্দ্দিকে শাল পাতা প্রভৃতি দ্বারা তাঁহাকে আবৃত করতঃ তদুপরি নানাবিধ মিষ্টান্ন সাজাইয়া দেন। আমি চারিজন বাহককে রীতিমত উৎকোচ প্রদানান্তর বশীভূত করিব। তৎপরে সেই 'চেঙারী' আপনার 'প্রিয়সখীর বাটিতে লইয়া যাইতেছি'—এই ছল করিয়া, রক্ষীগণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করতঃ পুরী হইতে বাহির হইব। অনতিদূরে আপনার পিত্রালয়-প্রেরিত রথ অবস্থান করিবে, এইরূপ বন্দোবস্ত আছে। আমি তাহাতেই উক্ত 'চেঙারী' রক্ষিত করিয়া বাহকগণকে যথেষ্ট পারিতোষিক প্রদান করতঃ বিদায় করিব। তৎপরে তাহারা চলিয়া আসিতে না আসিতেই দ্রুতগামী অশ্ব-সহযোগে রথ এতদূরে গিয়া পড়িবে যে, তথায় যদি আমি রাজকুমারীকে মুক্ত করিয়া দিই, তথাপি তাহাকে কেহ উদ্ধার করিতে পারিবে না।"

এ অতি উত্তম পরামর্শ। রাজ্ঞী তাহাতে সম্মতা হইলেন। পরামর্শমত কার্য্যও অতি দ্রুতগতিতে চলিতে লাগিল।

যে সময়ে দাসী চারিজন বাহকের স্কন্ধে সেই গুরুভার অর্পণ করিয়া রাজপথ দিয়া চলিতেছিল, ঠিক সেই সময়েই দেবদূত ছদ্মবেশে রাজবাটী-অভিমুখে ধাবিত হইতেছিলেন। এই সময়ে সহসা এক 'চেঙারী' উত্তম আহারীয় দ্রব্য তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি চকিতের ন্যায় বাহকদিগের মধ্যে পতিত হইয়া, আহারীয় দ্রব্যসহ সেই 'চেঙারী খানি' ছিনাইয়া লইয়া, শনৈঃ শনৈঃ শূন্য পথে উত্থিত হইলেন। বাহকেরা অবাক হইয়া রহিল। দাসী তদ্দৃষ্টে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

বিধিলিপি খণ্ডন করিতে গিয়া দেবদূত যে পাপসঞ্চয় করিয়াছিলেন, সেই পাপে তাঁহার দূরদৃষ্টি লোপ পাইয়াছিল। তাই তিনি দেবদূত হইয়াও জানিতে পারেন নাই যে, সেই চেঙারীর ভিতর কি ছিল! সুতরাং তিনি বরাবর সেই চেঙারী লইয়া সেই পর্ব্বতের উপর বন্দীর নিকট উপস্থিত হইলেন। বন্দী সেই অপরিমিত আহার্য্য বস্তু সন্দর্শনে পরম পুলকিত হইল। সে একবার স্বপ্নেও ভাবে নাই (জানিতেও পারে নাই) যে, উহার অভ্যন্তরস্থ বস্তু কত রাজকুমারের প্রার্থনীয়—কত শত বীর-তাহার প্রাপ্তির আশায় উন্মাদ!

দেবদূত কহিলেন,—"দেখ বন্দী! তোমায় মুক্ত করিলাম,—অপরিমিত আহারীয় বস্তু প্রদান করিলাম; এখন আমি নিশ্চিন্ত! তুমি এই নির্জ্জন স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ কর, বা নিকটস্থ ঐ পর্ব্বত-গহ্বরে বাস কর, অথবা পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিতে চেষ্টা কর, যাহা ইচ্ছা হয়, করিও; আমি চলিলাম। মর্ত্তে আর আমি অধিকক্ষণ অবস্থান করিতে পারি না—আমার শ্বাস রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিতেছে। আমি চলিলাম———"

এই বলিতে বলিতে দেবদূত শূন্যে উত্থিত হইতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তমাত্র অতীত হইতে না হইতে তিনি আকাশে অদৃশ্য হইলেন।

(৪)

বন্দী 'চেঙারিখানি' উন্মুক্ত করিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে সে একেবারে বিস্মিত, চকিত ও শিহরিত হইল। এই অসম্ভাবিত অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার অবলোকনে তাহার মনের অবস্থা যে কি হইল, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

* * * * *

এখন দ্বাদশবর্ষ অতীতপ্রায়। বন্দী এবং রাজকুমারীতে গান্ধর্ব্ব-বিধানে বিবাহ হইয়া, তদীয় সহযোগে, চারি পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

প্রথম দিন রাজকুমারী এবং বন্দীর পরস্পর পরিচয় হইলে, উভয়ে উভয়দিকে প্রস্থান করিয়াছিল। কারণ, রাজকুমারী আপনার পিতৃরাজ্যের একজন সামান্য বন্দীর সহিত বিবাহ করিবে, ইহা বন্দী স্বপ্নেও বিবেচনা করিতে পারে নাই। সুতরাং সে নিরাশ মনে ভিন্ন দিকে প্রস্থান করিবেই তো! অপর পক্ষে, রাজকুমারীও বন্দীকে ঘৃণ্য জীব-জ্ঞানে পরিহারপূর্ব্বক যাহাতে কোনরূপে পর্ব্বতশিখর হইতে অবতরণ করিয়া স্বরাজ্যে উপস্থিত হওয়া যায়, এমন কোন পথ আবিষ্কার করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছে; প্রাণের দায়ে—পদতল ক্ষত বিক্ষত হইলেও, চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়াছে; কিন্তু তথাপিও কোন পথ আবিষ্কার করিতে পারে নাই। বন্দীও তদ্রূপ। প্রায় ছয় মাস এইরূপে সমস্ত উপত্যকা তন্ন তন্ন করিয়াও যখন তাহারা উভয়েই একপ্রকার নিরাশ হইল, তখন আবার একদিন বন্দী এবং রাজকুমারীর সহিত সাক্ষাৎ হইল।

হায়! বিধির বিধান লঙ্ঘন করে, এমন সাধ্য কার? যাহার যে প্রকার ললাট-লিখন, তাহা যদি পূর্ণ না হইত, তাহাহইলে বোধ হয়, এ বিশ্ব-সংসার যথেচ্ছাচারিতায় পরিপূরিত হইত। দেখ, ছয় মাস পূর্ব্বে যে রাজকুমারী ঘৃণায় বন্দীকে পরিহারপূর্ব্বক গর্ব্বিত মনে প্রস্থান করিয়াছিল; যাহার দিকে একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিতেও ঘৃণা বোধ করিয়াছিল; আজ সে তাহাকে 'রতিপতি কামদেবের

সুন্দর বলিয়া অনুভব করিল—আজ সে যেন অন্তরে অন্তরে জানিল, বিধাতা তাহারই সহিত তাহার মিলনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাই আজ আর তাহার ঘৃণা আসিল না; ছয় মাস একাকি ছুটাছুটি করিয়াও কোন সাথী পায় নাই; আপনি প্রশ্ন করিয়া আপনিই উত্তর দিয়া আপনার মনকে প্রবোধ দিয়াছে; আজ সে বন্দীকে পাইয়া পরমানন্দে তাহাকেই আলিঙ্গন করিল। যেন তাহাতেই তাহার প্রাণ-মন তৃপ্ত হইল—সে হাতে স্বর্গ পাইল। সেই স্থানে সেই মুহূর্ত্তে গান্ধর্ব্ব-বিধানে তাহাদের বিবাহ হইল। বিধিলিপিও পূর্ণ হইল।

(৫)

দেবদূত ভাবিয়াছিলেন,—"বন্দীকে আমি সহস্র যোজন দূরস্থিত পর্ব্বত-শিখরোপরি নির্গমোপায়বিহীন এক উপত্যকায় রাখিয়া আসিয়াছি, মর্ত্তের মানবের সাধ্য কি তথা হইতে লইয়া আসে? রাজকুমারী কি আজও অনূঢ়া আছে? নিশ্চয় তাহার সেই দিনই কোন না কোন রাজপুত্রের সহিত বিবাহ হইয়া গিয়াছে।" সুতরাং দেবদূত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভগবন্! সেই রাজকুমারীর কাহার সহিত বিবাহ হইল?"

বৈকুণ্ঠবিহারী শ্রীমধুসূদন মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন,—"বৎস! তুমি যাহা চিন্তা করিতেছ, তাহা অলীক। তুমি একবার বিধিলিপি খণ্ডন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলে বলিয়া, সেই পাপে তোমার দূরদৃষ্টি হরণ করিয়াছি। আজি আবার তাহা তোমায় প্রদান করিলাম। একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ দেখি, ঐ উপত্যকার উপরে কেমন একটি ক্ষুদ্র পরিবার বিচরণ করিতেছে!"

দেবদূত তদ্দৃষ্টে অবাক! ভগবানের পদতলে পড়িয়া ক্ষমা-ভিক্ষা চাহিলেন। ভগবান তাঁহাকে অভয় দিয়া চরিতার্থ করিলেন।

মুছিতে ব'লোনা সখা, এই অশ্রুধার!

(১)

মুছিতে ব'লোনা সখা, এই অশ্রুধার।
সকলি সে নিয়ে গেছে, কি আছে আমার॥
যা কিছু সর্ব্বস্ব হায়,
দিয়াছি তাহারি পায়!
স্মৃতি, অশ্রু আছে শুধু, নহেকো যাবার।
বিরহ-মিলনে এটি সম্বল আমার॥

(২)

কে জানিত তখন,
অদৃষ্টে আমার শেষে ঘটিবে এমন?
এত প্রেম, এত হাসি,
এত ভালবাসা-বাসি,
সকলি ফুরায়ে যাবে, হইবে স্বপন।
কে জানিত তখন?
আপন সর্ব্বস্ব দিয়ে,
তার মুখপানে চেয়ে,
রেখেছিনু প্রাণ ধরে, পেতে তার মন!
ভাঙ্গিল সে সুখ-আশা, বিফল যতন॥

(৩)

আস্‌বে বলে আশার আশে,
সারা রাতই বসে বসে,
কোলে লয়ে ফুলমালা,
হাতে লয়ে বীণা॥
সারা রাত জেগে জেগে,
পথ চেয়ে কেঁদে কেঁদে,
রজনী প্রভাত হলো,
তবুতো সে এলনা

(৪)

সর্ব্বস্ব দিয়াছি তায়, যাকিছু আমার।
সুখ দুঃখ প্রেম হাসি প্রাণ উপহার॥
প্রাণ দিয়ে মন দিয়ে,
তার মন পেতে গিয়ে,
মিটিল না প্রেম-আশা যন্ত্রণা আমার।
মুছিল না অশ্রুবারি শুধু হাহাকার॥
মুছিতে বলোনা সখা! এই অশ্রুধার!

হৃদয়।

আমি তোমাকে ভালবাসি, গুরুজনে ভক্তি করি, পাপকার্য্যে ঘৃণা করি; তুমি পরোপকারে মনপ্রাণ ঢালিয়া দেও, অপরের দুঃখ দেখিয়া কাঁদিয়া ফেল, তাহাদের স্ত্রীপুত্রপরিবার-আত্মীয়-স্বজন-প্রতিবেশী—আবালবৃদ্ধবনিতা কিসে ভাল থাকে, কিসে সাধুভাবে কাল কাটায়, কিসে সকলে মিলিয়া-মিশিয়া কাজ করে, সেই চেষ্টাই কেবল তোমার; সে আবার পরের অনিষ্টসাধন করিতে ভালবাসে, অন্যের উন্নতি তাহার চক্ষের শূল, অন্যে বিপদে পড়িলে সে মনে মনে বড়ই সন্তোষ লাভ করে; ইহার কারণ কি? আমার শরীর যে উপাদানে গঠিত, তোমার বা তাহার দেহ তাহা হইতে ভিন্ন হইতে পারে না। তোমার বা আমার মনে ইচ্ছা হইল, তুমি বা আমি কার্য্য করিলাম; অপরেরও কি ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই? অপরে কি নিজ মনোভিলাষের বিপরীতে কার্য্য করে? অথবা এরূপ বিসদৃশ কার্য্য এক উপাদানে-গঠিত ভিন্ন ভিন্ন মানব হইতে সম্ভব হইল কেন? অবশ্যই ইহার কারণ আছে। মানুষের মন পরস্পর সমান হইলেও, নানা ক্রিয়ার আধার এ মনের প্রকৃতি ও শিক্ষা, সুতরাং কার্য্যও, বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে; সকল মন সমানরূপ শিক্ষা বা প্রকৃতি লাভ করিতে পারে না।

মনুষ্য, জন্মগ্রহণ-কালে, যেমন এই প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান স্থূল শরীর ধারণ করে; সেইরূপ, তখন, তাহার অন্তরে বহিশ্চক্ষুর অগোচর একটী সূক্ষ্ম শরীর প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত থাকে। এই উভয় শরীর পরস্পর মিলিত না হইলে মানব পূর্ণ হয় না। সূক্ষ্ম শরীরের অভাবে স্থূল শরীর অকর্ম্মণ্য ও মৃত; এবং স্থূল শরীর সহায়তা না করিলে সূক্ষ্ম শরীরও কার্য্য-ক্ষমতা প্রকাশ করিবার আধার পায় না,—সুতরাং তাহারও সত্ত্বা তখন স্বপ্নবৎ। এই উভয় শরীরই জড়-প্রসূত। তবে স্থূল শরীর বাহ্যেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য; আর সূক্ষ্ম শরীর তাহার অতীত। অতীত হইলেও সে জড়; সুতরাং তাহার কার্য্যও জড়াতীত নহে। তবে জড়াতীত পদার্থে তাহার জ্ঞান জন্মাইতে পারে। কিন্তু সে বিষয় অদ্যকার আলোচ্য নহে।

মনই সূক্ষ্ম শরীরের একমাত্র কর্ম্মকর্ত্তা, স্থূল শরীর চালনে মনই নিয়োক্তা। মনের ইচ্ছা ভিন্ন বাহ্য শরীর কোন কার্য্য-সম্পাদনে সমর্থ নহে। আবার সূক্ষ্ম শরীরের নানা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ মনকে পরিচালনা করিয়া থাকে। ঐ সকল পদার্থের সাধারণ নাম, বৃত্তি। অহঙ্কার না থাকিলে মনের কার্য্যক্ষমতা থাকে না বটে; কিন্তু বৃত্তি-পরিচালিত না হইলেও মনের কার্য্য-ভূমি প্রসর হয় না। ফলতঃ বৃত্তি-প্রণোদিত কার্য্য, অপর ইন্দ্রিয় দ্বারা মন বাহ্য জগতে প্রকাশ করেন।

অহঙ্কার ব্যতিরেকে মনের সাংসারিক সত্ত্বা থাকে না; এবং মন জন্মাবধিই বৃত্তিনিচয়ের সহগামী হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়। জন্মকাল হইতেই মনের সহিত সকল বৃত্তি বর্ত্তমান থাকে বটে; কিন্তু সকলগুলিই সমান তেজোবান্ থাকে না। কোন কোনটী জন্মাবধি অত্যন্ত প্রখর থাকে, এবং ক্ষেত্র পাইলে সহজে আশাতীতরূপে অঙ্কুরিত হয়; আবার কোন কোনটি বা প্রকৃষ্ট অনুশীলনেও প্রখর হয় না। অপর, মূলেই কোন বৃত্তির অনুশীলন না হইলে—প্রভাব-প্রদর্শনের কার্য্যক্ষেত্র না থাকিলে, সে বৃত্তি মৃত হইয়াও গিয়া থাকে। মনীষীরা বলেন,—পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কার্য্যফলে আমাদের বৃত্তি জন্মাবধি প্রখর থাকে; এক জন্মের অনুশীলনে বৃত্তির সেরূপ সতেজ ভাব হইতে পারে না। পিতামাতা হইতেও বৃত্তির সতেজ ও নিস্তেজ ভাব সন্তানে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এইরূপ কারণে ভূমিষ্ঠ সন্তানের বৃত্তি-সকল সমানরূপে থাকে না। ইহার সম্যক সমালোচনাও এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে হইতে পারে না;

অপর প্রবন্ধে সময়ান্তরে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার ইচ্ছা রহিল।

যাহার যেরূপ বৃত্তির প্রভাব-বৃদ্ধি হয়, তাহার প্রকৃতিও সেরূপভাবে পরিণত হয়। ভক্তিশ্রদ্ধাদি বৃত্তি যাহার মনে সদা ক্রিয়া করে, তাহার স্বভাব সেইরূপই হইয়া যায়; ঈর্ষা-ঘৃণাদি যে মনের অধিনায়ক হয়, তাহার কার্য্যও তদতিরিক্ত হইতে পারে না। অর্জ্জন-স্পৃহা মনে সতেজ থাকিলে সে ব্যক্তি অর্থবান হইতে পারে; ন্যায়পরতা-বৃত্তির প্রবল উপদেশেই আমরা জগতের কল্যাণকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকি। এরূপ এক বা ততোধিক বৃত্তির প্ররোচনায় আমরা সদসৎ নানা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, নিজের বা অপরের হিত বা অহিত আচরণ করিয়া থাকি।

বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে,—মস্তিষ্কই সকল মানসিক বৃত্তির মূল আধার। কোন বৃত্তির কার্য্য উপস্থিত হইবার অগ্রে, বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা মস্তিষ্ক আহত হয়; এবং তদ্‌কালীন-সুপ্ত সেই বৃত্তি জাগরিত হয়। বৃত্তি প্রদীপ্ত হইলে মনে তদনুরূপ ইচ্ছার উদয় হয়, এবং পরে মন কার্য্য করিতে থাকে। অন্য বৃত্তি মনকে কার্য্যে উৎসাহিত করিবার সময় বুদ্ধিবৃত্তি আসিয়া তাহাকে সহায়তা করে; এবং তদনুজ্ঞাত কার্য্য বুদ্ধিবৃত্তির সম্মত হইলে, তবে তাহা কার্য্যে পরিণত হয়। নতুবা বৃত্তি-প্রণোদিত কার্য্য বিবেক-দ্বারা অনুমোদিত না হইলে, তাহা প্রকাশ পায় না—সে বৃত্তি আবার সে সময়ের মত পূর্ব্ববৎ নিদ্রিত হইয়া যায়। মস্তিষ্ক-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা মানবের মস্তকোপরিস্থ উচ্চ-নীচ স্থান দেখিয়া স্থির করিতে পারেন, কাহার কোন্ বৃত্তি বলশালী, কাহার কোন্ বৃত্তি চির-সুপ্ত। মুখমণ্ডলের ভাব দেখিয়া যেমন মানুষের স্বভাব নির্ণীত হইতে পারে, মস্তকের স্থান-বিশেষ স্পর্শ করিয়াও সেইরূপ মানুষের স্বভাব পরীক্ষিত হইতে পারে।

অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, বলেন,—অমুক ব্যক্তি হৃদয়-শূন্য, অমুক লোক বড় সহৃদয়। এ হৃদয় শব্দের অর্থ কি? কোন্ কোন্ গুণ থাকিলে মানবে হৃদয়বান্ হন, এবং কি দোষেই বা তাঁহারা হৃদয়হীন হন? কুঞ্চিত বা ক্ষুদ্র বক্ষঃস্থল হইলে কি সহৃদয়তার হ্রাস হয়? প্রশস্ত স্ফীত বক্ষঃস্থল—বলবীর্য্য-পরিচায়ক বক্ষঃদেশই কি হৃদয়বত্তার পূর্ণ লক্ষণ? স্থূল শরীরের বক্ষঃস্থল হৃদয় শব্দের লক্ষ্য নহে, উহা সূক্ষ্ম শরীরের প্রত্যঙ্গ মাত্র।

পরের দুঃখ দেখিলে যে 'আহা-উহু' করে; আপন ভ্রাতাকে অবমানিত দেখিলে যে আপনাকে অবমানিত মনে করে; অপরের প্রতি অন্যায় অত্যাচার-আচরণ দেখিলে যে ব্যক্তি তৎপ্রতিকারার্থ নিজেই সচেষ্টিত হয়; তাহারই হৃদয় আছে আমরা বলিয়া থাকি। আর, যে ব্যক্তি নিজের স্বার্থান্বেষণেই অহরহঃ ব্যস্ত; সময় থাকিলেও, সুবিধা হইলেও,—নিজের স্বার্থহানি হওয়া দূরে থাকুক, স্বার্থের অসম্ভাবনা থাকিলেই—উপরোক্ত কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে চায় না; স্বার্থ-অভাবে নিজ প্রতিবেশীকে নিজ-সম্মুখে অপর-কর্ত্তৃক অন্যায়রূপে প্রহারিত বা তিরস্কৃত হইতে দেখিলেও যে ব্যক্তির ওষ্ঠকম্পনও না করে; অতুল বিভব-বিত্তের অধিপতি হইয়াও যে ব্যক্তি দারিদ্র্য-পীড়িত ব্যক্তির কষ্টকে তাহার পাপ-সম্ভূত বলিয়া উপহাস করে; সে ব্যক্তি যে নিতান্ত হৃদয়শূন্য, তাহা কে না জানেন?

অতএব, যিনি সাধুবৃত্তি-প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করেন, তিনিই সহৃদয়। আর, যে ব্যক্তির সেই বৃত্তির বিকাশ নাই, তাহার হৃদয় নাই বলিয়াই আমরা অনুমান করি। যাঁহার সাধুবৃত্তিগুলি ক্রিয়াশীল; অনুশীলন-গুণেই হউক, অথবা প্রকৃতি-বশেই হউক, সম্যক্ স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট; শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম, দয়াদাক্ষিণ্য, উপচিকীর্ষা, প্রতিবিধিৎসা, অর্জ্জনস্পৃহা, সাহস প্রভৃতি বৃত্তিসমূহ

যাঁহার ন্যায়পরতাদি বুদ্ধিবৃত্তি-অনুমোদিত হইয়া কার্য্য করে, তিনিই সহৃদয় পদবাচ্য। হৃদয়-বান ব্যক্তির চরিত্র এত স্বাভাবিক—এত অভ্যস্ত হইয়া দাঁড়ায় যে, কার্য্য-ক্ষেত্র উপস্থিত হইবামাত্র—চক্ষুর নিমিষে, তাঁহারা কার্য্য করিয়া ফেলেন; বোধ হয়, যেন তাঁহাদের বৃত্তি-উদ্দীপ্ত ইচ্ছা ন্যায়ানুগমনের অপেক্ষা না করিয়াই তৎপর কার্য্য সম্পন্ন করে। সহৃদয় ব্যক্তির সদ্‌বৃত্তিগুলি যেন একত্র হইয়া এক কোমল আধারে সর্ব্বদা জলস্তম্ভাবে অবস্থান করে। বাহিরের কার্য্য-কলাপের সংস্রবমাত্রেই সেই বৃত্তি সেই আধার হইতে উৎসরূপে উৎসারিত হইয়া কার্য্যস্থল ভাসাইয়া দিয়া যায়; আরও অক্ষম ব্যক্তির ইহা দ্বারা আশ্চর্য্য ক্ষমতা জন্মাইয়া দেয়। এই সাধুবৃত্তি-সমষ্টির আধারই হৃদয়। এই হৃদয়ের আধেয়গুলির তেজ বাড়িলেই হৃদয়ও তেজস্বী হয়। তাই হৃদয়বান্ ব্যক্তি, সমান্য বলশালী হইলেও, কার্য্যকালে তাঁহার যুগপৎ ক্ষমতা ও কার্য্যকারিতা আসিয়া পড়ে; হৃদয়ের বলে জগতে তাই কত অসাধ্য সাধন হইয়া গিয়াছে। হৃদয়ের বলে আর্য্যগণ আজিও জগতের শীর্ষস্থলে উপবিষ্ট।

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

এ আবার কি?

পরেশনাথ মিত্রের 'রত্নগৃহ'-কাণ্ডের অভিনয় এখনও শেষ হয় নাই। এ অভিনয়ের শেষ কোথায় দাঁড়াইবে, তাহাও আমরা বলিতে পারিতেছি না। কিন্তু এদিকে আবার এক

অপূর্ব্ব রত্ন-বিতরণ

আরম্ভ হইয়াছে। 'রত্নগৃহের' ব্যাপার নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ যে আবার একরূপ 'রত্ন-বিতরণ-কাণ্ড' সহসা হস্তক্ষেপ করিবে, এ ধারণা আমাদের ছিল না। আমাদের এ ধারণা থাকুক আর নাই থাকুক, 'রত্ন বিতরণ'-কাণ্ডের কর্ত্তাদের কিন্তু ঠিক তাহার বিপরীত ধারণাই আছে। এমন ধারণা না থাকিলে, তাঁহারা কি আবার সহসা এই রত্ন-বিলাইতে আসরে নামিতে পারেন?

আমরা উপরে যে 'রত্নবিতরণ'-কাণ্ডের কথা বলিলাম, সে সব "অত্যাশ্চর্য্য, অভাবনীয় ও স্বপ্নাতীত সুলভ" রত্নসমূহ প্রিন্সভিক্টরের শুভাগমন-উপলক্ষে বিতরিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে কি না, আমরা জানি না। এ 'রত্ন-বিতরণের' যে বিজ্ঞাপন—অপূর্ব্ব হইলেও, আজকাল পূর্ব্ব-পরিচিত, এবং অদ্ভুত হইলেও আজকালকার কালের ভূতগত—মফঃস্বলে বিতরিত হইয়াছে কি না, তাহাও আমরা এখনও জানিতে পারি নাই। কিন্তু বিজ্ঞাপন-দাতা শ্রীমান্ নবকুমার দত্ত মহাশয় এ-সম্বন্ধে অভিমান-ভরে 'বঙ্গবাসী'-আপিসে নিজমুখে যেরূপ বাক্য বলিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আমাদের আশঙ্কা আছে যে, এ বিজ্ঞাপন মফঃস্বলে বিতরিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আর সেই জন্যই এই "অপূর্ব্ব রত্ন-বিতরণের" বিজ্ঞাপনখানির কথা পাড়িতে হইল।

প্রথমে ইহার একটু ইতিহাস শুনুন। গত ৪ঠা পৌষ বুধবার তারিখে কলিকাতার ১০৭ নং অপার চিৎপুর রোডের শ্রীযুক্ত নবকুমার দত্ত মহাশয় বঙ্গবাসীর ক্রোড়পত্র-স্বরূপে বঙ্গবাসীর সহিত ডাকে বিলি হইবার নিমিত্ত যে ক্রোড়-পত্রের নমুনাখানি পাঠান, তাহা এই :—

"এরূপ মহাসুযোগ ও অঘটন সংঘটন আর ঘটিবে না।

একবার দেখুন! শীঘ্র লউন! নচেৎ নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইবেন।

অত্যাশ্চর্য্য অভাবনীয় ও স্বপ্নাতীত সুলভ।

প্রিন্সভিক্টরের শুভাগমন উপলক্ষে

অপূর্ব্ব রত্ন-বিতরণ।

অর্থাৎ নিম্নলিখিত সর্ব্বজন-সমাদৃত, সমালোচনে

প্রশংসিত, বঙ্গ-সাহিত্যভাণ্ডারের বিখ্যাত বিখ্যাত রত্ন-স্বরূপ মূল্যবান ৫০খানি গ্রন্থ স্বপ্নাতীত সুলভ মূল্যে লোকসান করিয়া একমাস কাল বিক্রয় করিব। প্রায় কুড়ি টাকা মূল্যের এই সকল নব-রসবিশিষ্ট সারবান গ্রন্থগুলি কেবলমাত্র দুই টাকায় পাইবেন; অধিকন্তু ডাকব্যয় দিতে হইবে না! কেবল ভিঃ পিঃ খরচা ৵০ লাগিবে। আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতেছি যে, দুই টাকায় এরূপ সারবান গ্রন্থাবলী-সহ প্রকাণ্ড প্যাকেট সাহিত্য-জগতে এই প্রথম।

দুই টাকায় ৫০ খানি রত্নসদৃশ গ্রন্থাবলী, যথা—

১। স্বর্ণবাই উপন্যাস—বৃদ্ধ বয়সে কাশীবাসী হইয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে স্বর্ণবাই নিজ-জীবনী নিজে লিখিয়া সকলকে কেমন সতর্ক করিয়াছে, দেখুন। ২। প্রেম-সঙ্গীত—ইহাতে প্রণয়-সম্বন্ধে প্রাচীন ও আধুনিক যাবতীয় কবির বিস্তর প্রণয়সঙ্গীত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩। প্রাচীন গীতাবলী—সুবিখ্যাত প্রাচীন কবিগণের উচ্চ অঙ্গের বিস্তর গীত। ৪। ভালবাসা—যুবকযুবতীর মনোমুগ্ধকারী সোহাগপূর্ণ গ্রন্থ। ৫। কাব্যসংগ্রহ—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের গ্রন্থাবলী। ৬। শৃঙ্গারশতকম্—মহাকবি ভর্তৃহরি প্রণীত বাঙ্গালা মূল। ৭। শ্রীভগবতী গীতা—ঐ শাস্ত্রীয় মহাগ্রন্থপাঠে বিস্তর শিক্ষা লাভ করিবেন। ৮। পঞ্চরং—রঙ্গরসজনক মজাদারি রহস্য-পূর্ণ গ্রন্থ। ৯। অদৃষ্ট-পরীক্ষা—ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান গণনা-শিক্ষার চূড়ান্ত পুস্তক। ১০। প্রেমকলি—প্রীতি, প্রেম, সোহাগ ও আলিঙ্গনাদির সর্ব্ববিধ চিত্র। ১১। মিস্‌ নানা—পারিসনগরস্থ সুবিখ্যাতা নানার অত্যাশ্চর্য্য ভয়ঙ্কর অদ্ভুত জীবনী। ১২। বিবি দিলজান—শিক্ষিতা রমণীও যে কাণ্ডজ্ঞানরহিত ও পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া দেশ-বিদেশস্থ অনেকের সর্ব্বস্বান্ত করিতে পারে, তাহারই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখুন। ১৩ সচিত্র রূপের হাট—অভূত-পূর্ব্ব প্রেমশিক্ষা, জ্ঞানশিক্ষা ও সমাজরক্ষার সভ্য জগতের একমাত্র অবলম্বন, বারবনিতার ইতিবৃত্ত, লম্পটের পরিণাম, বেশ্যার মোহিনীচক্র, কুলটার পাপাচার, অসহায়া নিরপরাধিনী বিক্রীতা বালিকার সর্ব্বনাশ, ভদ্রকামিনীর যন্ত্রণা, বৃদ্ধবেশ্যা তপস্বিনীর কুহক এবং ইন্দ্রিয়-পরিচালন-বিষয়ক বিবিধ উপদেশ সকলই একাধারে। ১৪। রতিবিলাস—আদিরস ও প্রেমরস সম্বলিত অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ১৫। বিনোদিনী—ইহার জন্ম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকলই রহস্যময়। পৃথিবীতে এমন কার্য্য নাই যাহা বিনোদিনী করে নাই; এক্ষন ইহার পরিণাম সকলে দেখুন। ১৬। ষটচক্র—মূল টীকা ও অনুবাদ সহ। ষটচক্র না জানিলে কি যোগশাস্ত্র, কি তন্ত্রশাস্ত্র কিছুতেই সিদ্ধি লাভ হয় না। ১৭। উত্তরগীতা মূল ও অনুবাদ। ইহা তত্ত্বজ্ঞানীর অবশ্য পাঠ্য। ১৮। নামসংগ্রহ—ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকা, ভগবতী, মহাদেব, চৈতন্য, বিষ্ণু ও শ্রীরামের সহস্র নাম একত্রে সংগৃহীত হইয়াছে।

এতদব্যতীত। ১৯। রবিন্‌সন ক্রুসোর আশ্চর্য্য ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। ২০। শকুন্তলা। ২১। সাবিত্রি-সত্যবান। ২২। সীতার বনবাস। ২৩। কামিনীকুমার। ২৪। বিজয়বসন্ত। ২৫। মেঘনাদ বধ প্রভৃতি উচ্চ-দরের নাটক। ২৬। অদ্ভুত রহস্য। ২৭। দেবী না পিশাচী। ২৮। আমার মৃণাল। ২৯। ফুলজানি বেগম। ৩০। কনোজ-কুসুম। ৩১। ভাই ভাই। ৩২। স্বামিপূজা। ৩৩। কুহুমিকা ৩৪। লক্ষটাকা প্রভৃতি উপন্যাস এবং। ৩৫। তন্ত্রসংগ্রহ। ৩৬ মোহমুদ্গার। ৩৭। জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র। ৩৮। ধন্বন্তরি-মুষ্টিযোগ। ৩৯। প্রেমের দরবার। ৪০। চাণক্য শতকম্। ৪১। কয়টী কুসুম। ৪২। ভ্যাবাচ্যাকা। ৪৩। রামগীতা। ৪৪। আত্মজ্ঞাননির্ণয়। ৪৫। আত্মাষ্টকম্। ৪৬। নির্ব্বাণাষ্টকং ৪৭। আত্মবোধ। ৪৮। সতীবাসন। ৪৯। যতিপঞ্চক এবং ৫০। জীবন্মুক্তিগীতা। স্থানাভাবে এই সকল গ্রন্থের গুণাগুণ বর্ণন করা গেল না।

প্রত্যেক গ্রাহককেই আবার একখানি বিষ-বৃক্ষ ও একখানি রাজপৌত্র প্রিন্স ভিক্টরের ছবি উপহার দিব। শ্রীনবকুমার দত্ত।

১০৭ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।"

* * * *

এ বিজ্ঞাপনখানি পড়িয়া ইহা বঙ্গবাসীর ক্রোড়-পত্রে যাইতে পারে না, এই কথাই উঠিল। কি হইলে—কিরূপ ভাবে সংশোধন করিলে এ বিজ্ঞাপন যাইতে পারে, তখন সেই কথাই উঠিল। বাদ-ছাদ দিয়া একটা নমুনা খাড়া করাও হইয়াছিল। পরদিন বৃহস্পতিবারে ইহারই পরিবর্ত্তে দুই চারিখানি বইএর অদল-বদল করিয়া এবং "একখানি বিষবৃক্ষ ও এক-খানি রাজপৌত্র প্রিন্সভিক্টরের ছবি উপহার দিব" এই স্থলে, "একখানি বিষবৃক্ষের ছবি

(পাঠক ভাষাগত অর্থে লক্ষ্য রাখিবেন) ও একখানি রাজপৌত্র প্রিন্সভিক্টরের সুন্দর ছবি উপহার দিব" ইত্যাদি সংশোধন-সহ আর একখানি বিজ্ঞাপন-ক্রোড়পত্র 'বঙ্গবাসী'-আপিসে আইসে। সেখানি উপরোক্ত খানি-রই রূপান্তর। কাজেই নমুনা দিয়া আর স্থান-নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। তবে—"নিম্ন-লিখিত সর্ব্বজনসমাদৃত সমালোচনে প্রশং-সিত বঙ্গ-সাহিত্যভাণ্ডারের বিখ্যাত বিখ্যাত রত্ন-স্বরূপ মূল্যবান পঞ্চাশখানি গ্রন্থ স্বপ্নাতীত সুলভ মূল্যে লোকসান করিয়া একমাস কাল বিক্রয় করিব। প্রায় ২০৲ টাকা মূল্যের এই সকল নবরসবিশিষ্ট সারবান গ্রন্থগুলি কেবল-মাত্র দুই টাকায় পাইবেন। অধিকন্তু ডাক ব্যয় দিতে হইবে না।"—একথা উভয় বিজ্ঞা-পনেই আছে বা ছিল।

সংশোধিত বিজ্ঞাপন দেখিয়াও 'বঙ্গবাসীর' কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের সন্দেহভঞ্জন হইল না। তাই তাঁহারা এ বিজ্ঞাপন-ক্রোড়পত্র দিবার পূর্ব্বে একবার বিজ্ঞাপনোল্লিখিত ৫০ খানি পুস্তক দেখিতে চাহিলেন। কিছুক্ষণ পরে বিজ্ঞাপনদাতা দত্ত মহাশয় স্বয়ংই পুস্তক লইয়া উপস্থিত হইলেন। পুস্তকগুলির রূপের ও গুণের পরিচয় দেওয়াই বাড়তি। তথাপি বলি, পুস্তকগুলির অধিকাংশই বট্-তলার চটি। কিন্তু এ পুস্তক-সংখ্যা গণিয়াও ২৬খণ্ড বই হইল না। তখন দত্তজাকে জিজ্ঞাসা করা হইল,—"আপনি বলিতেছেন যে, ৫০ খণ্ড বই দিবেন; কিন্তু এ যে মোটে ২৬ খণ্ড!—বাকী বই কোথায়?" তাহাতে শ্রীমান দত্তজা 'ভারত রত্নপ্রকাশ'* পুস্তকের একখণ্ড হস্তে লইয়া সদর্পে বলিলেন,—"এই রত্নপ্রকাশেই বাকী ২৫ খণ্ড পুস্তক আছে।" তখন তাঁহাকে বলা হইল,—"আপনি তবে লিখিয়া দিউন যে, এই এক খণ্ডতেই ২৫খণ্ড পুস্তক আছে।" বিজ্ঞাপন-দাতা দত্তজা বলিলেন,—"তাহা আমি দিব না।" বঙ্গবাসীর কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাহাতে উত্তর করিলেন,—"তবে আপনার এ বিজ্ঞাপন-ক্রোড়পত্র 'বঙ্গবাসীর' সহিত বিলি হইবে না।" দত্তজাকে আরও একটু অনুরোধ করা হইয়াছিল; বলা হইয়াছিল,—"আপনি ও আপনার দলস্থ ব্যক্তিরা যেন অনুগ্রহ করিয়া আর 'বঙ্গবাসীতে' বিজ্ঞাপন দিতে না আইসেন। আপনারা বিজ্ঞাপন দিতে না আসিলে, আমরা (বঙ্গবাসীর কর্ত্তৃপক্ষগণ) বড়ই কৃতার্থ হইব!" দত্তজা তখন চটিয়াছেন! বলিলেন,—"তথাস্তু!" তাহার পর তিনি সাহঙ্কারে বলিয়া গেলেন—"আপনারা বিজ্ঞাপন দিউন আর নাই দিউন, আমার এ বিজ্ঞাপন মফঃস্বলে বিলি হইতে কিছুতেই আটকাইবে না। আমি মফঃস্বলে এ বিজ্ঞা-পন বিতরণ করিব; এবং এই ব্যবসায়ই চালাইব।" দত্তজার মুখে তখনকার সেই সগর্ব্ব বাক্য শুনিয়া আমাদের প্রকৃতই বড় হাসি লাগিয়াছিল।

এই সব ব্যাপার জানিয়া শ্রীমান নবকুমার দত্তের এই 'অপূর্ব্ব রত্নবিতরণ'-কাণ্ডের তথ্য জানিতে আমরা প্রবৃত্ত হই। প্রথম দিনেই তাঁহার বিজ্ঞাপিত ২৫খানি পুস্তক আমাদের হস্তগত হয়। অবশ্য দত্তজার কথামত 'রত্নপ্রকাশে' ২৫খানি বই ধরিয়াই আমরা এই কথা বলিতেছি। এই ২৫খানি পুস্তক খরিদ করিতে আমাদিগের চারি আনা খরচ হইয়াছে। ঘরে বসিয়াই আমরা এই 'রত্ন-প্রকাশ' পুস্তক চারি আনায় পাইয়াছি; স্বয়ং বাজারে যাইয়া অনুসন্ধান করিলে বোধ হয়

* এ মহলে বুঝি রত্নেরই কেবল ছড়াছড়ি! নতুবা 'রত্নগৃহ', 'রত্নবিতরণ', 'রত্নপ্রকাশ', 'রত্নভাণ্ডার' প্রভৃতি এত রত্ন জুটিবে, কোথা হইতে? প্রকাশক ও বিক্রেতা বাবুরা জহুরী; তাই এত 'রত্ন' চিনিয়াছেন, ও এত 'রত্ন' জুটাইয়াছেন। মফঃস্বলের লোক জহুরী নহে; তাই তাহারা ঐসব রত্নের শুক্তি-আভরণ সহসা খুলিতে পারে না; রত্নও চিনিতে পারে না; কেবল বিপাকে পড়িয়া মারা যায়।

আরও দুই-চারি পয়সা সস্তায় পাইতে পারিতাম। বাকী ২৫খানি পুস্তক সংগ্রহের চেষ্টাতেও আমরা আছি। সংগ্রহ হইলেই তাহাতে মূল্য কতপড়ে তাহারও সঠিক সংবাদ আমরা পাঠকবর্গকে দিতে পারিব। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত হারেই যদি দাম পড়ে, তাহাহইলেও আমাদিগকে দত্তজার বিজ্ঞাপিত এই ৫০খানি পুস্তক সংগ্রহের জন্য বোধ হয় ৷৷০ আট আনার অধিক ব্যয় করিতে হইবে না। যদি খুব জোরই হয়, তাহাহইলেও বার আনার বেশী যে লাগিবে, এমন তো বোধ হয় না; অন্ততঃ যে আমাদিগকে পুস্তক আনিয়া দিয়াছে, সে আমাদিগকে এইরূপ ভাবের কথাই বলিয়া গিয়াছে।

"ভারত রত্নপ্রকাশ" আমরা কিনিয়াছি, চারি আনায়। কিন্তু—"১১৮ নং অপার চিৎপুর রোডস্থ আর্য্য-পুস্তকালয়াধ্যক্ষ শ্রীবৈষ্ণব চরণ বসাক"—এই "ভারত-রত্নপ্রকাশের" প্রকাশক, এই পুস্তকের "মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা মাত্র" ধার্য্য করিয়াছেন। তবে পাঁচ টাকায় এ পুস্তক এক খণ্ডও যথার্থ খরিদদারের নিকট বিক্রয় হইয়াছে কি না, আমরা জানি না। সে কথা বাবু বসাক মহাশয়ই বলিতে পারেন। কিন্তু এ পুস্তকের জন্য সরকারী তহবিল হইতে যে ১৫৲ পনের টাকা দেওয়া হইয়াছে, ইহা ঠিক। ১৮৬৭ সালের পুস্তকাদি প্রকাশ-সম্বন্ধীয় আইন-অনুসারে প্রত্যেক প্রকাশিত পুস্তকের তিন খণ্ড করিয়া সরকারী-লাইব্রেরীতে জমা দিতে হয়; সরকার হইতে এই তিন খণ্ড পুস্তকের মূল্য প্রদত্ত হয়। সম্প্রতি এই তিন খণ্ড পুস্তকের মূল্যদান-রীতি বন্ধ করিবার জন্য এক পাণ্ডুলিপি বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় পেশ হইয়াছে। পাণ্ডুলিপির প্রস্তাবক বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মান্যবর হাচিসন বাহাদুর পাণ্ডুলিপির প্রস্তাবনা-উপলক্ষে বলিয়াছেন যে,—"অনেকে ১৮৬৭ সালের আইন-বলে অন্যায়পূর্ব্বক গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রকাশিত পুস্তকের অযথা মূল্য আদায় করেন।" একথা বলিবার সময় 'রত্নপ্রকাশের' ন্যায় পুস্তকের প্রতিই তাঁহার লক্ষ্য ছিল বলিয়া বোধ হয়। এখন দেখুন, দুইচারি জনের অন্যায় কার্য্য-বশে দেশের সমস্ত প্রকাশক ও গ্রন্থকারবর্গের কি সর্ব্বনাশ হইতে বসিয়াছে? এতদিন যাঁহারা নীরবে এই সব অত্যাচার সহ্য করিয়া আসিয়াছিলেন, এখন ইহা হইতে কি সর্ব্বনাশ উত্থিত হইল তাহা তাঁহারা দেখিতেছেন। পাণ্ডুলিপির প্রতিবাদ হইবে, আমরা জানি। তাই বলিতেছি, দেশের মঙ্গলের জন্য—এই সব অন্যায় কার্য্যকারী ব্যক্তিবর্গকে দণ্ডিত করিতে দেশের হিতকারী ব্যক্তিমাত্রেরই সর্ব্বথা চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

ভারত রত্নপ্রকাশ।

'ভারত রত্নপ্রকাশের' পরিচয় উপরে সামান্য প্রদত্ত হইল। কিন্তু একটু খোলসা পরিচয় দেওয়া ভাল। কারণ যে গ্রন্থে 'তন্ত্রসংগ্রহ', 'ষট্‌চক্রনিরূপণ', 'উত্তরগীতা', 'নামসংগ্রহ', 'মোহমুদ্গর', 'জ্ঞানসঙ্কলিনী-তন্ত্র', 'রামগীতা', 'আত্মজ্ঞাননির্ণয়', 'আত্মাষ্টকং', 'নির্ব্বাণাষ্টকং', 'অদৃষ্ট-পরীক্ষা', 'ধন্বন্তরী-মুষ্টিযোগ', 'ভালবাসা', 'ভ্যাবাচাকা', 'প্রেমের দরবার', 'রতিবিলাস', 'চানক্য-শতকম' এবং 'কয়টী কুসুম' একত্রে সন্নিবেশিত আছে, সে গ্রন্থ কি এক অপূর্ব্ব ব্যাপার ইহা জানিবার জন্য অনেকেরই ঔৎসুক্য হইতে পারে। তাই পুস্তকখানির কথা একটু খুলিয়া বলিতেছি। 'ভারত রত্নপ্রকাশের' সম্মুখের মলাটে লেখা আছে,—"প্রথম সংস্করণ, ১২৯৬ সাল।" মলাটের পর-পৃষ্ঠাতেই এইরূপ লেখা,—

"সটীকং সানুবাদঃ
ষট্‌চক্রনিরূপণং।
তৃতীয় সংস্করণ।
১২৯৬।"

তৃতীয় পৃষ্ঠায় মুখবন্ধ। ৯ম পৃষ্ঠায় শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ গোস্বামী কৃত (১) ষটচক্রনিরূপণং সটীক সানুবাদঃ আরম্ভঃ। ৬৪ পৃষ্ঠায় ইহার শেষ। তাহার পরে (২) মূলানুবাদ উত্তরগীতা আরম্ভ। শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক ইহার অনুবাদক ও প্রকাশক উভয়ই। এখানি প্রথম সংস্করণ। মূল্যের কোন উল্লেখই নাই। ৪৬ পৃষ্ঠায় এ পুস্তক শেষ হইয়াছে। তাহার পর (৩) মূলানুবাদ আত্মজ্ঞাননির্ণয় আরম্ভ। এ খানির অনুবাদক ও প্রকাশকও বসাক বাবু। এখানিরও মূল্য লিখিত নাই, অথচ প্রথম সংস্করণ। ১৬ পৃষ্ঠায় এ পুস্তক সমাপ্ত। তাহার পর (৪) মূলানুবাদ নির্ব্বাণাষ্টকম্। পুস্তক সাড়ে তিন পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। তাহার পর (৫) জ্যোতিপঞ্চক পুস্তক পৌনে তিন পাতায় সমাপ্ত। (৬) মূলানুবাদ আত্মষ্টকম্, তিন পৃষ্ঠার কিছু অধিক। (৭) মূলানুবাদ জীবন-মুক্তিগীতা সাড়ে বার পৃষ্ঠা। (৮) মূলানুবাদ রামগীতা ২৪ পৃষ্ঠা। (৯) মূলানুবাদ আত্মবোধ দু'পৃষ্ঠারও কিছু কম। শ্লোকসংখ্যা ৪টি। পুস্তকের শেষ নাই। ৪র্থ পৃষ্ঠায় শ্লোকের অর্দ্ধেক অনুবাদ হইতে হইতেই গ্রন্থকার পুস্তক শেষ করিয়াছেন। বাহাদুরী আছে! এমন করিয়া শেষ না করিলে কি এই সামান্য পুস্তকে এত বৃহৎ ব্যাপার শেষ করিতে পারা যায়? (১০) মূলানুবাদ জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র। এখানি দ্বিতীয় সংস্করণ। সাড়ে পঁচিশ পৃষ্ঠায় শেষ। (১১) মোহমুদ্গর (মায়ামুগ্ধ জীবের প্রতি তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ) কিঞ্চিৎ অধিক ৭পৃষ্ঠায় শেষ। (১২) নামসংগ্রহ অর্থাৎ ভগবতী, মহাদেব, শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকা, গোপাল, বিষ্ণু এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর নামাবলী একত্রে সংগ্রহ। এখানি ১১৯ পৃষ্ঠা। (১৩) অদৃষ্টপরীক্ষা বা অদৃষ্টদর্শন। এখানির সংগ্রহকার ও প্রকাশক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন সেট; ঠিকানা কিন্তু সেই বসাক বাবুর আড্ডা। ইংলিশ অক্ষরে ডিমাই ফর্ম্মায় পুস্তকখানি ১২ পৃষ্ঠায় শেষ। (১৪) ধন্বন্তরী বা সরল মুষ্টিযোগ। প্রথম খণ্ড, পরিশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত। শ্রীপূর্ণচন্দ্র গুপ্ত সঙ্কলিত ও ৬ নং ঝামাপুকুর লেন হইতে বসন্তকুমার রায় বি এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। All Rights Reserved. ১৮৮৫। বৈষ্ণব বাবু বোধ হয় ইহার সত্ব কিনিয়া লইয়াছেন। নতুবা তাঁহার 'ভারত-রত্নপ্রকাশে' গুপ্তজার 'মুষ্টিযোগ' স্থান পাইবে কেন? পুস্তকখানি ৫২ পৃষ্ঠা। (১৫) ভালবাসা। শ্রীগোপালচন্দ্র মিত্র প্রণীত, পদ্যগ্রন্থ। সাড়ে আঠার পৃষ্ঠা। (১৬) ভ্যাবাচ্যাকা,—কাহার প্রকাশিত বা কাহার প্রণীত জানিবার উপায় নাই। এখানিও পদ্য; ১২ পৃষ্ঠা। মফঃস্বলের পাঠকদিগকে ভ্যাবাচাকা লাগাইবার জন্যই বুঝি প্রকাশক মহাশয় আপনার এ পুস্তকে এ বেনামী 'ভ্যাবাচাকা' পদ্য সন্নিবেশিত করিয়াছেন। কবি শেষ দুই ছত্রে বলিয়াছেন,—

"কবি বলে, এমন হলে, লাগ্‌বে ভ্যাবাচাকা।
টেরডা পাবে, জব্দ হবে, হবে তখন ন্যাকা॥"

বিজ্ঞাপনদাতা দত্তজা মহাশয় এবং প্রকাশক বসাক বাবু ন্যাকা হইবার জন্যই এই দুই ছত্র উঠাইয়াছেন নাকি? পাঠকগণও এই দুই ছত্র একটু মনোযোগ দিয়া পাঠ করেন, ইহাও আমাদের অনুরোধ। (১৭) প্রেমের দরবার—শ্রীযোগী প্রেমানন্দ প্রণীত। এখানি নাটক; ৪র্থ সংস্করণ। ৫ অঙ্কে ৪৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থ-শেষে সকলে ডাকিতেছেন,—

"আয়রে নগরবাসী সবাই তোরা কিন্‌বিরে।
আয়রে, আয়রে নেচে, মেতে মেতে আয়রে॥"

কিন্তু কয়জন গ্রন্থকারের কথা-মত কাজ করিয়াছেন, তাহা প্রকাশক মহাশয় বলিতে পারেন। আর, এবারকার বিজ্ঞাপনদাতা দত্তজার এইরূপ ভাবের কথায় কয় জন কিনিতে প্রস্তুত আছেন, তাহা ভগবানই

জানেন। (১২) রতি-বিলাস। গ্রন্থকার বা প্রকাশকের নাম নাই। কেন? 'পিনাল কোডের' ভয়ে নাকি? কিন্তু এ ভয় কি ইহাতে এড়াইতে পারা যাইবে? পুস্তকখানি ১২ পৃষ্ঠা। (১৯) চানক্যশতক। ৩২ পৃষ্ঠা। তাহার আবার এক পাতার একখানি উৎসর্গ পত্র। (২০) ইহার পরই কয়টি কুসুম। ইহাতেও তো ২৫ কুলাইল না? তবে 'কুসুম' কএকটীকে বৃন্ত ছাড়াইয়া আলাহিদা আলাহিদা করিয়া লইব নাকি? ইহাতেই বা যদি সংখ্যা পুরণ হয়! দেখি, কুসুমের সৌরভ, আর আমাদের হাতযশঃ। এক পাতা অবতরণিকাটুকু বাদ দিব, না ধরিব? আচ্ছা, বাদ দিয়াই দেখি না কেন? (২০ ক) সীতা—পৌণে ছয় পৃষ্ঠা। (২০ খ) সাবিত্রী—সাড়ে ছয় পৃষ্ঠা। (২০ গ) সতী—দু'পৃষ্ঠার কিছু অধিক। এখানেই তো সমাপ্ত লেখা! এই (ক), (খ), (গ), ধরিলেও তো ২৩ ছাড়ায় না! পঁচিশ কোথা হইতে হইল? এ কি নবকুমারের নূতন 'ভানুমতী-বাজী' নাকি?

যাহাই হউক, আমরা নাচার হইয়াছি। ফলতঃ বটতলার এই সব কেতাবের লেখা ছাই-ভস্ম,—কিছুই নয়,—কেবল ভুয়াবাজী। পয়সা রোজগারের একটী বড় ফাঁদ মাত্র।

পরেশনাথ মিত্রের

রত্নগৃহের জুয়াচুরী কাণ্ড।

আমাদের নামে নালিস।

পরেশনাথের জুয়াচুরী-সম্বন্ধে সাধারণকে সতর্ক করিয়া 'বঙ্গবাসী' সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়ায়, পরেশনাথ কলিকাতার পুলিসকোর্টে আমাদের শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ীর নামে এবং বঙ্গবাসীর ম্যানেজার ও প্রিণ্টারের নামে মানহানির নালিশ আনেন। সে নালিশে আমরা বড়ই আশা করিয়াছিলাম যে, নিজ পরেশনাথের মুখে তাঁহারই নিজকৃত জুয়াচুরী কাহিনী আমরা শুনিতে পাইব; এবং সাধারণেও তাহাতে দেখিতে পাইবেন যে, জুয়াচোরদের ফন্দি কি ভয়ানক! কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, বিধাতার লীলায়, আমাদের সে আশা মিটিল না। বেচারী পরেশনাথ যখন কাতরকণ্ঠে, মলিনমুখে, সাশ্রুনয়নে, রাজদ্বারে—রাজপ্রতিনিধি-সমক্ষে আমাদের নিকট তাঁহার নিজকৃত এই অপরাধের জন্য বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; যখন তিনি বারবার সাশ্রুনয়নে বলিতে লাগিলেন,—'পরের বুদ্ধিতে মজিয়া আপনাদের নামে নালিশ করিয়া আমি যে গর্হিত কার্য্য করিয়াছি, তজ্জন্য আপনারা আমায় ক্ষমা করুণ,—আপনাদের নামে আমি যে মানহানির মকর্দ্দমা আনিয়াছি, তাহা আমাকে তুলিয়া লইতে আদেশ দিউন—নতুবা আমি ধনে প্রানে মারা গেলাম;' তখন পরেশনাথের সেই ম্লানমুখ দেখিয়া কোন্ পাষাণ-হৃদয় তাঁহাকে দয়া না করিয়া থাকিতে পারে? তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রক্তমাংসের শরীর আমরাই বা কি করিতে পারি? কাজেই মনের আশা মনেই লুকাইয়া, আমরাও তখন পরেশনাথকে সেজন্য ক্ষম' না করিয়া, থাকিতে পারিলাম না। আমরা তাঁহাকে অনুমতি দিলাম,—'আচ্ছা, এমন কর্ম্ম আর কখনও করিবেন না বলিয়া নাকে-কানে খত দিয়া আপনি মকর্দ্দমা তুলিয়া লউন, আমরা মকর্দ্দমা তুলিয়া লইতে আপনাকে আর কোন বাধা দিবনা।' পরেশনাথও তখন রাজ-প্রতিনিধি মহোদয়কে ঐ সমস্ত কথা বলিয়া মকর্দ্দমা তুলিয়া লইলেন। বলা বাহুল্য, রাজপ্রতিনিধি মহোদয়ও তাহাতে হাস্য-সম্বরণ করিতে পারিলেন না। মানহানির মকর্দ্দমায় ফরিয়াদী স্বয়ং আসামীর নিকট ক্ষমা চাহিয়া মকর্দ্দমা তুলিয়া লয়—এ দৃষ্টান্ত আদালতে এই-ই প্রথম। কাজেই বিচারক মহোদয় চমকিত হইলেন; আর আদালত শুদ্ধ সকলেই হাস্য-সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

এখন, আমরা পরেশনাথের কাতরোক্তিতে দয়ার্দ্র হইয়া যাহা করিয়াছি, সহৃদয় পাঠকগণ, তজ্জন্য আমাদিগের কর্ত্তব্যে যদি ত্রুটী দেখিতে পান, তাহাহইলে সে ত্রুটীর জন্য আপনাদের নিকট আমরা ক্ষমা-প্রার্থনা করিতেছি। সময় ও অবস্থায় পড়িয়া, পরেশনাথকে মকর্দ্দমা তুলিয়া লইতে অনুমতি না দিয়া, আমরা কোনক্রমেই থাকিতে পারি নাই। শুধু আমরাই বা বলি কেন, যদি কাহারও সহিত পরেশনাথের মহা-শত্রুতাও থাকে, তাহাহইলেও, এত ক্রন্দনে —এত পরিতাপে তিনিও সে অবস্থায় পরেশনাথকে ক্ষমা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। আমরা তো কোন্ ছার!

পরেশনাথের নামে নালিশ।

আমাদের নামের মানহানির মকর্দ্দমা তুলিয়া লইয়াও পরেশনাথ কিন্তু নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহার এ 'রত্নগৃহের' জুয়াচুরী-ব্যাপার আরও অনেক দূর গড়াইয়াছে। এমন কি, ব্যাপার দেখিয়া, উহার শেষ যে কোথায় মিটিবে, তাহাও আমরা এ-পর্য্যন্ত স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। পরেশনাথ আমাদের নামে মানহানির নালিশ করিবার পূর্ব্বেই, আমাদের শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রভৃতি, 'আসাম'-প্রদেশের 'ধুবড়ী'-নগরে যাইয়া, তথাকার বাবু আনন্দচন্দ্র দত্ত নামীয় এক ব্যক্তির দ্বারায় পরেশনাথের নামে এক প্রতারণার অভিযোগ উপস্থিত করান। পরেশনাথের 'রত্নগৃহ'-কাণ্ডে প্রতারিত হইয়া—টাকা দিয়া পুস্তক না পাইয়া, বাবু আনন্দচন্দ্র দত্ত মহাশয় 'অনুসন্ধান-সমিতিতে' প্রথমে এক পত্র দেন; এবং সেই পত্র-মতই ইহাঁরা তথায় যাইয়া তত্রত্য ফৌজদারী-আদালতে পরেশের নামে নালিশ রুজু করিয়াছেন। আর, তদনুযায়ী, আমাদের নামের মানহানির মকর্দ্দমা তুলিয়া লইবার পূর্ব্বেই, ধুবড়ী হইতে এক ওয়ারেণ্ট আসিয়া পরেশকে গ্রেপ্তার করে; এবং অদ্যাবধিও ৫০০৲ শত টাকার জামিনে পরেশনাথ তাহা হইতে খালাস আছেন। এখনও সেই মকর্দ্দমা চলিতেছে। গত ১৬ই ডিসেম্বর আসামী ও ফরিয়াদী উভয়েই হাজির থাকিয়া মকর্দ্দমা চলিতে থাকে। পাঠক দেখুন, সে মকর্দ্দমার বিবরণ এইরূপ।—

ধুবড়ীর ফৌজদারী আদালত।

বাদী।	আসামী
শ্রীআনন্দচন্দ্র দত্ত।	শ্রীপরেশনাথ মিত্র।
সাং ধুবড়ী।	১৬৯ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মকর্দ্দমা—৪১৭ ধারা অনুযায়ী।

বাদী শ্রীআনন্দচন্দ্র দত্তের এজাহার।

আমার নাম শ্রীআনন্দচন্দ্র দত্ত। বয়স আন্দাজ ২৬ বৎসর। পিতার নাম হরিশচন্দ্র দত্ত। নিবাস আপাততঃ মৌজা ধুবড়ি। ধুবড়িতে আমি কেরাণিগিরি চাকরি করি।

গত অক্টোবর মাহার শেষে আমার নিকট "রত্নগৃহের" কতকগুলি হ্যাণ্ডবিল ডাকযোগে আইসে। সেই এক মোড়কে অনেকগুলা হ্যাণ্ডবিল ছিল। এই হ্যাণ্ডবিল পাইয়া আমি হ্যাণ্ডবিলের লিখিত শ্রীপরেশনাথ মিত্রকে ১৬৯ নম্বর মানিকতলা ষ্ট্রীটে পত্র লিখি। পত্রে লিখিয়াছিলাম যে, পরেশ বাবু যেন আমাকে পাঁচ টাকায় হ্যাণ্ডবিলের লিখিত সমস্ত একশত পুস্তক ও উপহার একবারে এক সঙ্গে পাঠাইয়া দেন। এই পত্র লেখার কিছু দিন পরে আমার নামে একটী ভ্যালুপেএবল প্যাকেট আইসে। আমি সেই প্যাকেট গ্রহণ করি। উহাতে এই এই দ্রব্য ছিল—১ম, এক খণ্ড পুস্তক। এই পুস্তকের মলাটে 'সঙ্গীত-সুধা' এই নাম লেখা; কিন্তু ভিতরে 'সঙ্গীত-হার' এইরূপ লেখা। ২য়, এক ছবির বই উহাতে সামান্য রকমের ছবি। ৩য়, একসেট

বোতাম। এই প্যাকেটের দরুণ আমার নিকট হইতে ২৶০ দুই টাকা দুই আনা আদায় করিয়া লওয়া হয়। বিজ্ঞাপন-স্যরকুলারের লিখিত পুস্তক আমি পাই নাই। আদালতে উপরোক্ত এই সব দ্রব্য আমি হাজির করিয়াছি। এই দ্রব্যত্রয় পাইবার পর, আমি পুস্তক পাইবার জন্য ক্রমে ক্রমে পরেশনাথ মিত্রকে দুইখানি পত্র লিখি। এই দুই পত্রের এক খানিরও কোন উত্তর আমি পাই নাই। 'সঙ্গীত-সুধা' বাহিরে, আর ভিতরে 'সঙ্গীত-হার'—এই পুস্তক দেখিয়া, বিজ্ঞাপনদাতা পরেশনাথ মিত্রের উপর আমার সন্দেহ হয়। তাহার পর পত্রের উত্তর না পাওয়ায় সন্দেহ আরও দৃঢ় হয়। সন্দেহ হওয়ায়, কলিকাতা ৫৮ নং কলেজ ষ্ট্রীটের অনুসন্ধান-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ীকে "রত্নগৃহের ব্যাপারখানা কি, পুস্তক ছাপা হইয়াছে কিনা?'—এই সব জানিতে পত্র লিখি। আন্দাজ ৮।৯ই নবেম্বর তাঁহাকে এই পত্র লিখি। অনুসন্ধান-সমিতির সম্পাদক আমার পত্রের উত্তর না দিয়া স্বয়ং এখানে আইসেন; এবং আমাকে জানান যে,—রত্নগৃহের উল্লিখিত পুস্তক ছাপা হয় নাই। দুর্গাদাস বাবুর সহিত এই কথাবার্ত্তা হইবার ৫।৬ দিন পরে, আমি বিজ্ঞাপনদাতা পরেশনাথ মিত্রের নামে এই নালিস রুজু করিয়াছি। রত্নগৃহের বিজ্ঞাপনে-লিখিত পুস্তকগুলি পাইবার আশাতেই আমি ২৶০ দুই টাকা দুই আনা দিয়া ভ্যালুপেএবল প্যাকেট গ্রহণ করি। হ্যাণ্ডবিলের লিখিত একশত পুস্তক পাইব বলিয়াই আমি টাকা দিয়াছিলাম। হ্যাণ্ডবিল দেখিয়াই একশত পুস্তক পাইব এই বিশ্বাস জন্মায়। অন্য কেহ কিছু আমাকে বলে নাই। হ্যাণ্ডবিলের লেখাই আমার বিশ্বাসের মূল। এইটুটিন ক্যারেট সোণার ব্রোতাম পাইব, এই আশাই আমি করিয়াছিলাম। পুস্তক পাইবার জন্যই আমি টাকা দিই—উপহার পাইবার জন্য নহে। উপহার তো বাড়তির ভাগ—উহা বিনা মূল্যে পাওয়া যাইবে। প্যাকেটের দ্রব্যাদি এই মোড়কে পাঠান হইয়াছিল। এই মোড়কে অন্য কোন দ্রব্য ছিল না।

জেরা-সওয়াল।—এই মকর্দ্দমার ব্যয়-ভার সমস্ত অনুসন্ধান-সমিতি নির্ব্বাহ করিতেছেন। আমি এজন্য কিছু খরচপত্র করি নাই। অনুসন্ধান-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ীকে আমি ইতিপূর্ব্বে চাক্ষুষ চিনিতাম না। তিনি এখানে আসিলে তাঁহার সহিত আমার চাক্ষুষ পরিচয় হইয়াছে। তাঁহার সহিত বঙ্গবাসীর ম্যানেজার ব্রজরাজ বাবুও এখানে আসিয়াছিলেন। এই মকর্দ্দমা আনিতে তাঁহারাই আমাকে উপদেশ দেন। তাঁহাদের সাহায্য-ব্যতীত আমি এ মকর্দ্দমা করিতে পারিতাম না। দুর্গাদাস বাবুকে এখানে আসিতে আমি পত্র লিখি নাই। তাঁহাদের সহিত প্রথমে এখানকার রাস্তায় দেখা হয়। কোন্ স্থানে দেখা হইয়াছিল আজ ঠিক বলিতে পারি না। আমি প্রথমে নালিশ করিবার উপদেশ পাই। সে সময়ে কে কে উপস্থিত ছিল, তাহা আমার স্মরণ নাই। অনেক কথা হইয়াছিল। কি কি কথা হইয়াছিল, আমি অবিকল সেই সেই কথা এখন বলিতে পারি না। যে ভ্যালুপেএবল প্যাকেট আসিয়াছিল, তাহার উপরে প্যাকেটে কি কি ছিল, লেখা ছিল। (এখন সেই মোড়ক সকলকে দেখান হইল।) ইহা আমার নামেই পাঠান হইয়াছিল। এইসব দ্রব্য পাওয়ার পর আমি পুস্তকগুলি এবং উপহার-সমূহ একত্রে পাইবার নিমিত্ত আসামীকে চিঠি লিখিয়াছিলাম। বিজ্ঞাপন-স্যরকুলারের যে প্যারাগ্রাফে তিন কিস্তিতে দ্রব্যাদি দিবার কথা আছে, তাহা আমি পড়িয়াছিলাম। কিন্তু এই স্যরকুলারে আরও একটী প্যারাগ্রাফ আছে যাহাতে লেখা আছে যে, বিশেষ করিয়া

লিখিলে পর, দ্রব্য ও পুস্তকাদি একসঙ্গে পাওয়া যায়।

আমি প্রথমেই সমস্ত পুস্তক এবং উপহারাদি একসঙ্গেই পাঠাইতে লিখিয়াছিলাম। কারণ, সেই সময়ে আমার হাতে টাকা ছিল। ভ্যালুপেয়েবেল প্যাকেটে দ্রব্য পাঠান হইয়াছিল বলিয়াই আমি লইয়াছিলাম। 'রত্নগৃহে' একশত বিভিন্ন পুস্তকে থাকিবে, ইহাই আমি বুঝিয়াছিলাম। পুস্তক ও দ্রব্যাদি পাইবার জন্য চিঠি লিখিবার পূর্ব্বে আমি 'রত্নগৃহের' বিজ্ঞাপন-স্যরকুলারখানি বিশেষ মনোযোগের সহিত পড়িয়াছিলাম।

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ীর সাক্ষ্য।

আমার নাম শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী। বয়স আন্দাজ ৩০ বৎসর। আমার পিতার নাম শ্রীযুক্ত সুধারাম লাহিড়ী। জাতি ব্রাহ্মণ। কলিকাতায় ৫৮ নং কলেজ ষ্ট্রীটে আমার বর্ত্তমান বাস। আমি অনুসন্ধান-সমিতির সম্পাদক। সন্দেহজনক জুয়াচুরী-ব্যাপারের অনুসন্ধান-জন্যই অনুসন্ধান-সমিতির প্রতিষ্ঠা। এই মকর্দ্দমার বাদী ও প্রতিবাদী উভয়কেই আমি জানি। ফরিয়াদী শ্রীআনন্দ চন্দ্র দত্তের নিকট হইতে আমি এই রত্নগৃহ-ব্যাপার-সম্বন্ধে একখানি পত্র পাই। এই পত্র আমি কলিকাতার ডেপুটী-কমিশনর বাহাদুরকে অনুসন্ধানার্থ দিয়াছি। আমি প্রথমে ১৬৯ নং মানিকতলা ষ্ট্রীটে একবার এ ব্যাপারের অনুসন্ধান করিতে গিয়াছিলাম। অনুসন্ধান-সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত কালিদাস লাহিড়ীও আমার সঙ্গে গিয়াছিলেন। বিজ্ঞাপিত পুস্তকগুলি প্রস্তুত হইয়াছে কি না, ইহাই দেখিতে গিয়াছিলাম। আমি আর একবার কলিকাতার ডিটেকটিভ-পুলিসের শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র ও শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত ঐ ১৬৯ নং মানিকতলা ষ্ট্রীটে গিয়াছিলাম। আসামী পরেশনাথ মিত্রকে সেখানে দেখিতে পাই; এবং রত্নগৃহের বিজ্ঞাপিত পুস্তকসমূহ প্রস্তুত হইয়াছে কি না, একথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি। পুলিশ-কর্ম্মচারীদ্বয় আমার আগে সেখানে গিয়াছিলেন। তাঁহারা আসামীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, এমন সময় আমি সেই ঘরে প্রবেশ করিলাম। আমি পরেশের সহিত কথা কহিলাম। আমি পরেশ বাবুকে বলিলাম,—'আমার একটী বন্ধু 'রত্নগৃহের' পুস্তকসমূহ পাইবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন। পুস্তকসমূহ কি প্রস্তুত হইয়াছে?' পরেশনাথ উত্তর দিলেন,—'পুস্তকসমূহ আজিও প্রস্তুত হয় নাই।' ছাপাখানার প্রিণ্টারও ঐ কথা বলিল। প্রিণ্টার ও আসামী পরেশনাথ উভয়েই বলিলেন,—'পৌষ মাসে পুস্তক-সমূহ প্রকাশিত হইবে।' যে সময়ে আমার সহিত পরেশনাথের এই সব কথা হইতেছিল, সেই সময় পুলিশ-কর্ম্মচারীদ্বয় তথায় উপস্থিত ছিলেন। 'রত্নগৃহ'-সম্বন্ধে আমি অন্যান্য অনেক পত্র পাইয়াছি (১৬ খানি দাখিল করা হইল)। কলিকাতা-পুলিসের ডেপুটী কমিশনারের নিকটও আমি তিনখানি পত্র দিয়াছি। এ ঘটনা অগ্রহায়ণ মাসের ৯ই। ১০ই (ইংরাজী ২৪এ নবেম্বর) হইয়াছিল। ইহার পরে আমি ধুবড়ী যাই; এবং বর্ত্তমান মকর্দ্দমার ফরিয়াদীর সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করি। এই বিজ্ঞাপন আমি পড়িয়াছি। আমার নিকট যে সকল পত্র আছে, ইহার কতকগুলি পত্র আমি 'বঙ্গবাসী'-আপিস হইতে পাইয়াছি। (বঙ্গবাসী-আপিস হইতে প্রাপ্ত দুইখানি চিঠি ফেরত লইয়া তৎপরিবর্ত্তে আরও দুইখানি পত্র দাখিল করা হইল)

জেরা-সওয়াল।—এজেণ্টস্বরূপ লোকের দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া দিব বলিয়া আমি কখনও কোন বিজ্ঞাপন দিই নাই। এই

মকর্দ্দমা দায়ের হইবার ৬।৭ দিবস পূর্ব্বে আমি এই মকর্দ্দমার ফরিয়াদীকে মতিলাল লাহিড়ীর বাসায় প্রথমে দেখি। আমরা ফরিয়াদীর পূর্ব্বে সেখানে গিয়াছিলাম। আমরা তাঁহাকে সেখানে ডাকাইয়াছিলাম। আমরা তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, আপনি মকর্দ্দমা করুন; খরচ-পত্র আমরা দিব। সে সময়ে ব্রজরাজ বাবুও সেখানে ছিলেন। ডিটেক্‌টিভের হস্তে আমি কতক কাগজ দেখিয়াছিলাম; সে কিসের কাগজ, তাহা আমি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই। উহা যে রত্নগৃহের অংশ, ফরিয়াদী একথা বলিয়াছেন, আমি শুনি নাই।

পুনঃ-সওয়াল।—৯ই অগ্রহায়ণের বঙ্গবাসীতে আমি 'রত্নগৃহ'-সম্বন্ধে এক সতর্কতার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করি (৯ই অগ্রহায়ণের বঙ্গবাসী দাখিল হইল।) এই বিজ্ঞাপন-প্রকাশের জন্য বর্ত্তমান মকর্দ্দমার আসামী পরেশ আমার নামে এবং বঙ্গবাসীর প্রিণ্টার ও ম্যানেজারের নামে কলিকাতার পুলিশ আদালতে মানহানির মকর্দ্দমা আনিয়াছিল। আমাদের নিকট ক্ষমা চাহিয়া সে মকর্দ্দমা এখন সে উঠাইয়া লইয়াছে। আমি ধুবড়ী আসিলে পর কলিকাতায় সে মকর্দ্দমা দায়ের হয়।

জেরা-সওয়াল।—বঙ্গবাসীর সহকারী-সম্পাদক কৃষ্ণ বাবুকে আমি চিনি। তিনি বর্ত্তমান মকর্দ্দমার আসামীকে মকর্দ্দমা উঠাইয়া লইতে বলেন নাই। লাইবেল মকর্দ্দমা তুলিয়া লইবার পূর্ব্বে কৃষ্ণ বাবুর বাসায় আসামীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। লাইবেল মকর্দ্দমার কথা সেখানে কিছু হয় নাই। ধুবড়ীর মকর্দ্দমা আপোষে নিষ্পত্তি হওয়া আবশ্যক, পরেশনাথ এই কথা বলিয়াছিলেন। কৃষ্ণ বাবুকে তিনি এই কথা বলেন। কৃষ্ণ বাবু তাঁহাকে বলিলেন,—ধুবড়ীর মকর্দ্দমার কিছুই করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। সম্ভবতঃ পরেশ সেখানে দোষী প্রমাণিত হইবেন; এবং তাঁহার দুই এক মাস কারাদণ্ড হইতে পারে। অতএব ধুবড়ী যাইবার পূর্ব্বে পরেশ যেন তাঁহার ছাপাখানার বন্দোবস্ত করিয়া যান। যদু বাবু আসামীকে ডাকিয়া আনেন নাই। তথায় এই কথোপকথনের সময় যদু বাবু উপস্থিত ছিলেন। আমি কিম্বা কৃষ্ণ বাবু কেহই এমন কথা বলি নাই যে, তুমি লাইবেল মকর্দ্দমা উঠাইয়া লও—আমরা ধুবড়ীর মকর্দ্দমা তুলিয়া লইব।

বাবু অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষ্য।

আমার নাম শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বয়স আন্দাজ ৩০ বৎসর। পিতার নাম শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়। নিবাস, কলিকাতার পটলডাঙ্গায়। পেশা, বাণিজ্য-ব্যবসায়।

আমি বর্ত্তমান মকর্দ্দমার আসামীকে চিনি। 'রত্নগৃহের' বিজ্ঞাপন-স্যরকুলার আমি এক খণ্ড পাইয়াছিলাম; এবং সেই বিজ্ঞাপন-স্যরকুলার লইয়া আমি ২৪এ নবেম্বর রবিবার সন্ধ্যাকালে বিজ্ঞাপনোল্লিখিত পুস্তক পাইবার জন্য গিয়াছিলাম। পরেশ বাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমি পুস্তক কিনিবার জন্য পাঁচ টাকা সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম। আমি আসামীকে বলিয়াছিলাম যে, আমার একজন বন্ধুর জন্য আমি বিজ্ঞাপনোল্লিখিত একশত পুস্তক, এবং বোতাম কিরূপ সোণার, তাহা দেখিতে চাই। আসামী উত্তর করেন যে, পুস্তক আজিও মুদ্রিত হয় নাই। আমি বোতাম দেখিয়াছিলাম। উহা আদালতে দাখিলী বোতামের ন্যায়। আসামী ইহাকে 'এইট্‌টিন ক্যারেট সোণার বোতাম' বলিয়াছিল। লোকে কিন্তু ইহাকে গিল্‌টির বোতাম বলে! বাজারে ইহার এক সেটের দাম ।৵০ আনা ॥০ আট আনা হইবে।

জেরা-সওয়াল।—বাজারের বোতাম সেটও একখণ্ড তাসে আঁটা। সেই তাসের উপর 'এইট্‌টিন ক্যারেট গোল্ড্ প্লেট' লেখা থাকে। এইরূপ ধরণের প্রকৃত সোণার বোতাম এক সেটের দাম ২৪৲ টাকা হইতে ৩০৲ টাকা। আমি ভাবিয়াছিলাম যে, ৫৲ টাকায় সোণার বোতাম পাওয়া যাইতে পারে না।

পুনঃ-সওয়াল।—বিজ্ঞাপন পড়িয়া বুঝিয়াছিলাম যে, সোণার বোতামই পাওয়া যাইবে। কিন্তু কথাটা আমি বিশ্বাস করি নাই।

শ্রীযুক্ত রজনীনাথ গুহের সাক্ষ্য।

আমার নাম শ্রীরজনীনাথ গুহ। বয়স আন্দাজ * * বৎসর। আমি এখন ধুবড়ীতে বাস করি। আমি ধুবড়ীর পোষ্টমাষ্টার। কলিকাতা হইতে ১৮৬ নং ভ্যালুপেয়েবল পার্শেল আমি পাইয়াছিলাম। কলিকাতা ১৬৯ নম্বর মানিকতলা ষ্ট্রীটের পরেশনাথ মিত্র ইহার প্রেরক। ৫ই নবেম্বর তারিখে এই প্যাকেট আমার নিকট আসিয়া পৌঁছে। ঐ ৫ই নবেম্বর তারিখেই বিতরণের জন্য আমি উহা পিওনের জিম্মা করিয়া দিই। উহার রসিদ এখন একজামিনার আফিসে জমা আছে। উহা আনন্দচন্দ্র দত্তের নামে আসিয়াছিল। ডাকমাশুল-সমেত এই প্যাকেটে দুইটাকা দুই আনা দিবার কথা। তন্মধ্যে ইহার প্রেরককে ১৸০ দিতে হইবে। ঐ টাকা আমি ১৮৮১ সালের ১১ই নবেম্বর তারিখে ১৭২৪ নং মনিঅর্ডারের দ্বারা পাঠাইয়া দিয়াছি। কলিকাতা হইতে রসিদ ফেরত আসে নাই। ঐ প্যাকেট বেয়ারিং আসিয়াছিল। ২ নং পোষ্ট-পিওন রামকানাই এই পার্শেল বিলি করিয়াছিল। আমার দস্তখত এই, (খাতায় আপন নাম-দস্তখত দেখাইয়া দিলেন।)

রামকানাই পিওনের সাক্ষ্য।

আমার নাম রামকানাই। আমার পিতার নাম পঞ্চানন্দ পাল। আমি জাতিতে তেলি। আমি এখন ধুবড়ীর পোষ্ট আফিসে ডেলিভারী পিওন। এই ধুবড়ীতেই বাস করি। ১৮৬ নং ভ্যালুপেয়েবল পার্শেলের টাকা আমি আনন্দচন্দ্র দত্তের নিকট হইতে আদায় করিয়াছি। ২৸০ দুই টাকা দুই আনা তাঁহার নিকট হইতে আদায় করিয়াছি। এই টাকা এবং রসিদ আমি হেড ক্লার্ক বাবুকে আনিয়া দিই। এই খাতায় আমার নাম আছে। (খাতায় সহি দেখাইল)।

এই সকল ব্যক্তির সাক্ষ্য লওয়ার পর, বিচারক মহাশয় কলিকাতার পুলিশ-কমিশনর শ্রীযুক্ত ল্যাম্বার্ট সাহেব বাহাদুরের নিকট হইতে প্রাপ্ত এক পত্রের কথা সংক্ষেপে তুলিয়া বলেন যে,—কলিকাতার ডিটেকটিভ-পুলিশ সন্ধানার্থ পরেশনাথের ঠিকানায় গিয়া যাহা যাহা জানিয়াছেন, কমিশন-দ্বারায় কলিকাতায় তাঁহাদের সাক্ষ্য লওয়া হউক। এই বলিয়া বিচারক মহাশয় ২৭এ ডিসেম্বর কলিকাতায় 'কমিশনে' সাক্ষ্য লওয়ার আদেশ দেন; এবং সে কমিসনের সাক্ষ্য কলিকাতা হইতে যাইলে, ৩০এ ডিসেম্বর ধুবড়ীতে আবার মকর্দ্দমা চলিতে থাকিবে, বলেন। কলিকাতায় যে সকল ব্যক্তির সাক্ষ্য লওয়া হয়, তাহার বিবরণ এই ঃ—

বিডনস্কয়ারের পোষ্টমাষ্টারের সাক্ষ্য।

আমার নাম শ্রীরঘুবর বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি কলিকাতা বিডন-স্কয়ার পোষ্ট-আফিসের পোষ্টমাষ্টার। ১৮৬ নং ভ্যালুপেয়েবল প্যাকেট উক্ত পোষ্ট-আফিস হইতেই রওনা হইয়াছিল। পরেশনাথ মিত্র উহার প্রেরক; এবং আনন্দচন্দ্র দত্ত, টেজারী-আফিস, ধুবড়ি ঠিকানাতেই উহা প্রেরিত হয়। ধুবড়ীর ডাকঘর হইতে ১৭২৪ নং মনি-অর্ডার ঐ ১৮৬ নং প্যাকেটের পরিবর্ত্তেই আসে; ধুবড়ীর আনন্দচন্দ্র দত্তের

প্রদত্ত টাকাতেই উহা প্রেরিত হয়। পরেশনাথ মিত্রকেই ঐ টাকা দেওয়া হইয়াছে। আমার পিওন —— চৌবে ঐ টাকা পরেশনাথকে প্রদান করে। মনি-অর্ডারের রসিদে সে পরেশনাথের সহি লইয়াছে।

পিওনের সাক্ষ্য।

আমার নাম —— চৌবে। আমি বিডনস্কয়ার পোষ্ট-আফিসের একজন পিওন। আমি এই মকর্দ্দমার আসামী পরেশনাথ মিত্রকে(আসামীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া) বিশেষরূপ চিনি। ১৭২৪নং মনি-অর্ডারের টাকা আমি এই পরেশনাথ মিত্রকেই প্রদান করিয়াছি। পরেশনাথ সহি দিয়া ঐ মনি-অর্ডারের লিখিত ১৸০ এক টাকা বার আনা লইয়াছে। পরেশনাথকে অন্যান্য আরও অনেক মনি-অর্ডার আমি দিয়াছি।

বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষ্য।

আমার নাম শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়। বয়স আন্দাজ ৪০।৪৫ বৎসর। আমি কলিকাতা ডিটেকটিভ-পুলিসের সব্ ইনস্পেক্টারী কাজ করি। বৌবাজারের কেণ্ডারডাইন লেনের ১০নং বাটী-ডিটেকটিভ-পুলিসের আফিসেই থাকি।

(পোষ্ট-মাষ্টার ও পিওনের সাক্ষ্য শুনিয়া এবং প্রিয় বাবুর এই পরিচয় পাইয়া, এই মকর্দ্দমার সমস্ত ঘটনা জানিবার জন্য মাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের বড়ই কৌতূহল জন্মিল। তিনি প্রথমে একবার প্রিয়নাথ বাবুকে, এ রত্নগৃহ-কাণ্ডের আদ্যোপান্ত যতটুকু তিনি জানেন, বলিতে বলিলেন। আর, তখন, পুলিসের ডেপুটি-কমিসনর বার্ডনার্ড সাহেবের আদেশ-প্রাপ্তি হইতে আরম্ভ করিয়া পরেশনাথ-সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপার তিনি বিবৃত করিলেন। অর্থাৎ গত ১৫ই অগ্রহায়ণের অনুসন্ধানে 'ডিটেকটিভের তদারক' শীর্ষক যে প্রস্তাব বাহির হইয়াছিল, প্রিয় বাবু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সেই সকলই বলিলেন। বিচারক মাজিষ্ট্রেট বাহাদুর তো তাহা শুনিয়াই চমকিয়া উঠিলেন; বলিলেন,—'ইহার সকল কথাই তো ছত্রে ছত্রে বাক্যে বাক্যে আসামীর দোষ-প্রমাণক।' অমনি অসামীর পক্ষের উকিল মোজেস্ সাহেব আপত্তি করিলেন যে,—পুলিসের নিকট ঐ সকল দোষ-স্বীকার প্রমাণস্বরূপ গ্রহণীয় হইতে পারে না। ইহার পরই মাজিষ্ট্রেট বাহাদুর 'টিফিন' খাইতে গমন করেন; এবং অর্দ্ধঘণ্টা পরে তিনি আসিয়া বসিলে, আসামীগণের অভিপ্রায়ানুযায়ীই প্রিয় বাবুকে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে দেওয়া হয়। সে প্রশ্নোত্তরেরও মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আমি এবং ডিটেকটিভ-পুলিসের ইনস্পেক্টার বাবু যোগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়—দুই জনেই, গত ৯ই কি ১০ই অগ্রহায়ণ উক্ত ১৬৯নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটে গমন করি। পুলিসের ডেপুটি-কমিশনার বাহাদুরের নিকট হইতে এই যে হ্যাণ্ডবিলখানি পাই, পরেশ বাবুকেও ইহা দেখাই; এবং জিজ্ঞাসা করিয়া জানি যে,—উহা পরেশ বাবুরই প্রচারিত হ্যাণ্ডবিল। উহাঁর নিকট হইতেও আমি এই (আর একখানি হ্যাণ্ডবিল পকেট হইতে বাহির করিয়া) হ্যাণ্ডবিলখানি পাই। উহাঁর প্রিণ্টারও স্বীকার করিয়াছেন যে,ঐ হ্যাণ্ডবিল উহাঁদেরই প্রচারিত 'রত্নগৃহ' পুস্তক দেখিতে চাহিলে, উহাঁরা তাহা দেখাইতে পারেন নাই। পুস্তক প্রস্তুত হয় নাই, বলিয়াছিলেন। তবে ডিমাই ১২পৃষ্ঠা এক ফর্ম্মা মাত্র উহাঁরা দেখাইয়াছিলেন। তাহাতেই সমগ্র সাতকাণ্ড 'রামায়ণ' শেষ করিয়া আর এক খানা কি বই ধরিয়াছেন। আর এক গেলী বাঙ্গালা প্রুফ দেখিয়াছিলাম; পরেশ বাবু বলেন, তাহাই মিলটনের প্যারাডাইস লষ্ট—'রত্নগৃহে'থাকিবে। 'সঙ্গীতহার' পুস্তক উপহার

দেওয়া হয়, তাহার দাম কিন্তু বাজারে অর্দ্ধ আনা। ঘড়ি, যাহা উহাঁরা উপহার দিতে চান, তাহার দামও ১৲ টাকা হইতে ১৷০ পাঁচ সিকা মাত্র। বোতাম 'এইট্টিন ক্যারেট' নহে; উহা গিল্টি করা। উহার দাম বাজারে জোর ৷৷০ আট আনা হইতে পারে।

জেরা-সওয়াল।—'অনুসন্ধানের' সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই; কেবল কখনও কখনও আমি 'অনুসন্ধানে' দুই একটী প্রবন্ধ লিখিতাম মাত্র। আমি নিজে আমার পুস্তকের কোন বিজ্ঞাপন 'অনুসন্ধানে' দিই নাই। কালিদাস বাবু আমার পুস্তকের বিক্রেতা-মাত্র। কমিশন পাইয়া তিনি উহা বিক্রয় করেন। বিজ্ঞাপন তিনিই কাগজে দেন। 'বঙ্গবাসী' প্রভৃতি কাগজেও তিনি বিজ্ঞাপন দিয়া থাকেন। আমার পুস্তকের বিজ্ঞাপন দিবার ক্ষমতা তাঁহাকে দিয়াছি বটে। কৃষ্ণ বাবুকে আমি চিনি। তিনি 'বঙ্গবাসীর' সহকারী সম্পাদক কি না, জানি না। তবে 'বঙ্গবাসী'-আপিসের সহিত তাঁহার যে কোন কোন সম্বন্ধ আছে, তাহা আমি জানি।

পুনঃ-সওয়াল।—জুয়াচোর ও নানারূপের জুয়াচুরী হইতে সাধারণকে সতর্ক করিতেই 'অনুসন্ধানের' সৃষ্টি। ইহাতে আরও নানা বিষয়ক প্রবন্ধ থাকে।

বাবু রামদয়াল ভট্টাচার্য্যের সাক্ষ্য।

আমার নাম রামদয়াল ভট্টাচার্য্য। হাঃ সাঃ নাটুদহ। সেখানে আমি কম্পাউণ্ডারী কার্য্য করি। 'রত্নগৃহের' বিজ্ঞাপন আমি পড়িয়াছি। পড়িয়া বুঝিয়াছি যে, ১০০ খণ্ড প্রসিদ্ধ গ্রন্থই পাওয়া যাইবে; এবং ঘড়ি প্রভৃতি নানা উপহারও পাইব। এই বিজ্ঞাপনে মুগ্ধ হইয়া আমিও ৫৲ পাঁচ টাকা পাঠাইয়া দিই। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন পুস্তক বা উপহার পাই নাই। এজন্য আমি পরেশনাথকে দুই তিন খানা পত্র লিখিয়াছিলাম; কিন্তু কোন উত্তরই পাই নাই। তারপর, আমি স্বয়ং একবার কলিকাতায় গিয়া উহাঁদের প্রেসে—১৬৯ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটের বাষ্পিকী যন্ত্রালয়ে যাই; এবং পরেশ বাবুর নিকট ঐ ১০০ শত পুস্তক চাই। এই ঘটনা নবেম্বরের শেষাশেষিরই হইবে। পরেশনাথ কিন্তু আমাকে পুস্তক দিতে পারেন না; পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাঁহার বিজ্ঞাপনে এরূপ লেখা থাকিলেও, তিনি বলেন,—এখনও বহি ছাপা হয় নাই। এই বলিয়া এক সেট গিল্টির বোতাম, 'সঙ্গীত-সুধা' উপরে ও ভিতরে 'সঙ্গীত-হার' নামক পুস্তক,ও ছোট ছোট পাঁচ খানা ছবি সহিত এক টুকুরা কাগজ এবং একটী টাইমপিস আমায় দিতে আসেন। কিন্তু আমি পাঁচ টাকা ১০০ এক শত পুস্তকের জন্য দিয়াছিলাম--কেবলমাত্র ঐ যৎকিঞ্চিৎ উপহার লইয়া আমি কি করিব? সুতরাং আমি তাহা লই নাই।

জেরা-সওয়াল।—'বঙ্গবাসীর' ম্যানেজার ব্রজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত আমার কোন সম্পর্কই নাই। তাঁহাদের গ্রামের নিকটেও আমার বাস নহে। ঐ উপহারের দ্রব্য পরে ডাকে গিয়াছে বটে; কিন্তু আমি লই নাই—ফেরত দিয়াছি।

এই পর্য্যন্ত এখন দাঁড়াইয়াছে। ইহার পর ৩০এ ডিসেম্বর যাহা দাঁড়ায়, তাহার বিবরণও পরে পাঠকগণকে জানাইব।

চুটকি-বিজ্ঞান।

প্রথম প্রকার।

১। নীলবর্ণ জলকে রক্তিমাবর্ণ করণ।—লিটমস্ (Litmus) বৃক্ষের পত্রের অথবা নীলবর্ণ কপিশাকের ক্বাথ একটী পাত্রে রাখিয়া তাহাতে ২।১ ফোটা নাইট্রিক কিম্বা সলফিউরিক য়্যাসিড সংযোগ করিলেই ঐ নীলবর্ণ ক্বাথ

রক্তিমাবর্ণ হইবে। য়্যাসিড পরীক্ষা করিবারও ইহা একটী নূতন উদাহরণ।

২। রক্তিমাবর্ণ জলকে নীল ও বেগুনি-বর্ণ করণ।—রক্তিমাবর্ণের কপিশাকের ক্বাথ দুইটি পৃথক্ মৃত্তিকা কিম্বা কাচ-পাত্রে রাখিয়া প্রথম পাত্রে কিঞ্চিৎ পোটাস্ ও দ্বিতীয় পাত্রে সল্-ফেট্ অব এলস্ এবং সল্ফেট্ অব পোটাস্ গুলিয়া দিবে। ইহাতে প্রথম পাত্রের বর্ণ নীল এবং দ্বিতীয় পাত্রের বর্ণ বেগুনি হইবে।

৩। বিনা অগ্নিতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করণ।—

(ক) একটী কাচপাত্রে সমভাগ তার্পিন তৈল এবং সলফিউরিক য়্যাসিড ঢালিয়া যৎ-কিঞ্চিৎ ক্লোরেট অব পোটাস অতি সাবধানে সংযোগ করিলেই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবে।

(খ) একটী পাত্রে কিঞ্চিৎ ম্যাগ্নিসিয়া রাখিয়া তাহাতে দ্বিগুণ পরিমাণ সলফিউরিক য়্যাসিড ঢালিলেই অগ্নি জলিয়া উঠিবে।

(গ) অল্প পরিমাণ চিনিতে কিঞ্চিৎ ক্লোরেট অব পোটস্ (Cholerate of potash) মিশ্রিত করিয়া ২।৪ ফোঁটা সল্ফিউরিক য়্যাসিড (Strong Sulphuric Acid) সংযোগ করিলে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবে; এবং চিনি পুড়িয়া অঙ্গার হইয়া যাইবে।

৪। দুইটী ভিন্ন প্রকার চূর্ণ একত্র পেষন করিলে জ্বলিয়া শব্দ হয়।—একটী পাত্রে কিঞ্চিৎ পরিমাণ গন্ধক ও ক্লোরেট অব পোটাস্ চূর্ণ একত্র পেষণ করিলে জ্বলিয়া উঠিবে, এবং শব্দ হইবে।

উপর্য্যুক্ত পরীক্ষাগুলি দৃষ্টিভ্রমজনক এবং সাধারণ লোকে দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ করিবে। কিন্তু রসায়ন-শাস্ত্রবিৎ লোকের নিকট ইহা কিছুই আশ্চর্য্যজনক নহে। কারণ, ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের সংযোগে রাসায়নিক শক্তি ও আকর্ষণ প্রভাবেই এইরূপ হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় প্রকার।

কর্ণে পূঁজ হইলে আরোগ্য হইবার উপায়।—গরম জলে সাবান গুলিয়া পিচকারী দ্বারা কান অগ্রে উত্তমরূপে ধৌত করিবে। পরে জল মুছিয়া গ্লিসিরিণ অব টানিক এসিড (Glycerine of Tannic acid) ফোটা ফোটা করিয়া ঢালিয়া দিবে। এইরূপে প্রতিদিন ধৌত করিয়া এই ঔষধ দিলে শীঘ্র আরাম হইয়া যাইবে।

কর্ণের মধ্যে বারম্বার ফোড়া হইলে, তাহা নিবারণের উপায়।—সলফাইড় অব ক্যাল্-সিয়ম (Sulphide of Calcium) এক গ্রেণের সহিত ত্রিশ গ্রেণ সুগার অব মিল্ক (Sugar of Milk) বা তাহার অভাবে পরিষ্কার চিনি মিশ্রিত করিয়া ত্রিশটী পুরিয়া প্রস্তুত করিয়া দিবসে তিনবার ৩টী পুরিয়া মুখে জল দিয়া সেবন করিবে। এইরূপ কিছু দিন সেবন করিলে আর ফোড়া হইবে না।

সূতার বস্ত্রাদিতে পাকা রং করিবার উপায়।—কাপড়ে লাল, হরিদ্রা, সবুজ এবং বেগুনে রং করিতে হইলে প্রথমতঃ খানিকটা জলে ফট-কিরি গুলিয়া গরম করিবে এবং ঐ গরম জলে কাপড়খানি ভিজাইবে। পরে শুষ্ক হইলে ঐ সকল রংয়ে কাপড় রং করিলে রং পাকা হইবে অর্থাৎ সহজে ধুইয়া বা উঠিয়া যাইবে না। ফটকিরির পরিবর্ত্তে এসিটেট অব এলম্ (Acetate of Alum) দিলে ভাল হয়। এসিটেট অব এলম্ ডাক্তারখানায় কিনিতে পাওয়া যায়। কাপড়ে কাল, কটা কিম্বা ভাও-লেট রং করিতে হইলে খানিকটা হিরাকস জলে গুলিয়া ঐ জল গরম করিবে। ঐ গরম জলে কাপড় ভিজাইয়া পূর্ব্ববৎ শুকাইবে এবং ঐ সকল রংয়ে রং করিবে। তাহা হইলে ঐ সকল রং পাকা হইবে। হিরাকসের পরিবর্ত্তে এসি-টেট অব আইরণ (Acetate of Iron) দিলে ভাল হয়। এসিটেট অব আইরণ ডাক্তার-খানায় কিনিতে পাওয়া যায়।

রাজপৌত্র প্রিন্স ভিক্টর।

আগামী ৩রা জানুয়ারী শুক্রবার, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ পৌত্র—ভারতের ভাবী অধীশ্বর প্রিন্স ভিক্টর কলিকাতায় শুভাগমন করিবেন। আজি হইতেই, তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায়, মহানগরী শশব্যস্ত; কি দিয়া, কি উপচারে রাজপৌত্রের সম্বর্দ্ধনা করিবে, রাজ-ভক্ত ভারতবাসীর মনে সদাই সেই চিন্তা। দেশ বিদেশ হইতে—নগর-উপনগর হইতে, কলি-কাতায় লোক-সমাগম আরম্ভ হইয়াছে; প্রতি সমাজ হইতে—প্রতি পল্লীর লোকই, কি দিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিবে, সেই জন্য প্রস্তুত হইতেছে। আর এই কয় দিন পরেই মহানগরী শোভিতা হইবে; রাজপৌত্রের সম্বর্দ্ধনা-জন্য নানা লোক-প্রতিকর অনুষ্ঠানের সূচনা হইবে। রাজপৌত্রের শুভদর্শন পাইয়াও আমরা পরম পরিতৃপ্ত হইব।

মহারাণী ভারতেশ্বরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স অব্ ওয়েল্স'—'প্রিন্স ভিক্টর' তাঁহারই জ্যেষ্ঠ তনয়। ইহাঁর বয়স এখন প্রায় ২৫ বৎসর। ইনি ১৮৬৪ সালের ৮ই জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। বালক বয়সে প্রথমে গৃহে কিঞ্চিৎ বিদ্যালাভ করিয়াই, ইনি ইহাঁর ভ্রাতা প্রিন্স জর্জ্জের সহিত রণপোতের কার্য্য শিক্ষা করেন। ১৮৭৯ অব্দে ইনি একবার দেশ-ভ্রমণে বাহির হন; এবং ইহার তিন বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া আবার কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠা-ভ্যাসে রত হন। ১৮৮৮ সালে ইনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এল, এল, ডি উপাধি প্রাপ্ত হন। বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া ইনি আবার সৈনিক বৃত্তি শিক্ষা করেন; এবং এখন ইনি 'ইয়র্ক-সায়রের' লেফ্টেনাণ্ট। ১৮৮৩ সালে প্রিন্স ভিক্টর গার্টার উপাধি প্রাপ্ত হন। প্রিন্সের এখনও বিবাহ হয় নাই।

গত ৯ই নবেম্বর রাজপৌত্র ভারতে প্রথম পদার্পণ করিয়াছেন; এবং এযাবৎ দাক্ষিণাত্য প্রদেশ ও ব্রহ্মদেশ ভ্রমণ করিয়া কলিকাতায় আসিতেছেন। রাজভক্ত বাঙ্গালীও তাঁহার সেই রাজমূর্ত্তি দর্শন করিবার জন্য পথ-পানে চাহিয়া রহিয়াছে; ভক্তিভরে রাজদর্শন করিয়া কৃতার্থ হইব, এই সকলের অভিলাষ।

এম এ পরীক্ষার ফল।

ইংরেজী সাহিত্য।—প্রথম বিভাগ।—হিরেন্দ্র-নাথ দত্ত প্রেসিডেন্সি কলেজ, যোগেন্দ্র কুমার ঘোষ ঢাকা কলেজ, হেমেন্দ্রলাল খাস্তগির প্রেসিঃ কলেজ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সিটি কলেজ, মহম্মদ আব্বাস আলি প্রেসিঃ কলেজ, যতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিঃ কলেজ, সুরেন্দ্র চন্দ্র বল প্রেসিঃ কলেজ। দ্বিতীয় বিভাগ।—প্রমথচন্দ্র কর প্রেসিঃ কলেজ, হরিদাস মৈত্র ঐ, গোপীনাথ পুরো-হিত আগ্রা কলেজ, কালী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ফ্রি চর্চ্চ, অবিনাশচন্দ্র দাস প্রেসিঃ কলেজ, তেজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ঐ, নৃত্যগোপাল কুমার ঐ। তৃতীয় বিভাগ।—বিপিনবিহারী ঘোষ প্রেসিঃ কলেজ, গোপালচন্দ্র মুখো-পাধ্যায় মেট্রোপলিটন, নৃত্যকৃষ্ণ বসু ঐ, নিবারণচন্দ্র সেঠ প্রেসিঃ কলেজ, পূর্ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় জেনারেল এসেম্বি, সুরেশচন্দ্র সরকার সিটি কলেজ, অক্ষয়কুমার সেন ঢাকা কলেজ, দেবকিশোর মুখোপাধ্যায় মেট্রো-পলিটন, হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ফ্রি চর্চ্চ ইনস্।

গণিত।—প্রথদ বিভাগ—উপেন্দ্রলাল মজুমদার প্রেসিঃ কলেজ, হারাণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ঐ। দ্বিতীয় বিভাগ—অশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রেসি কলেজ, মতি-লাল মল্লিক ঐ, যতিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ঐ, মৃণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ঐ। তৃতীয় বিভাগ—রাখালমোহন বন্দ্যো-পাধ্যায় ঐ, সারদাপ্রসাদ বন্দ্যো, জেনারল এসেম্বি।

লাটীন।—প্রথম বিভাগ—ই, এম, হুইলার বিশপ কলেজ।

সংস্কৃত সাহিত্য।—দ্বিতীয় বিভাগ—সতীশ-চন্দ্র রায় সংস্কৃত কলেজ, সাতকড়ি অধিকারী ঐ। তৃতীয় বিভাগ।—শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সংস্কৃত কলেজ, পরেশনাথ লাহিড়ী ঐ।

পারসী সাহিত্য।—প্রথম বিভাগ—জহন্দর রহিম জাহির প্রাইভেট। দ্বিতীয় বিভাগ—সৈয়দ সম্‌সেল হুদা প্রাইভেট।

মনোবিজ্ঞান।—প্রথম বিভাগ—রাখালদাস চট্টোপাধ্যায় প্রেসিঃকলেজ, মোহিতচন্দ্র সেন ঐ, জ্ঞানেন্দ্র নাথ গুপ্ত ঐ। দ্বিতীয় বিভাগ—বীরচন্দ্র সিংহ শিক্ষক, গোপীকৃষ্ণ কুণ্ডু মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টিটসন। তৃতীয় বিভাগ—হরিপদ বসু মেট্রো ইনস্‌।

রাসায়ন।—প্রথম বিভাগ—কুলভূষণ ভাদুড়ী প্রাইভেট, মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিঃ কলেজ, হরিপদ ভট্টাচার্য্য ঐ। দ্বিতীয় বিভাগ—বসন্তকুমার বসু প্রেসিঃ কলেজ, শ্যামলাল সরকার ঐ, ক্ষিরোদ প্রসাদ ভট্টাচার্য্য ঐ, অন্নদামোহন রায় ঐ, দেবেন্দ্রনাথ দত্ত ঐ। তৃতীয় বিভাগ—শ্রীশচন্দ্র দত্ত প্রেসি কলেজ।

পদার্থ বিদ্যা।—দ্বিতীয় বিভাগ—মোহিনী-মোহন রায় প্রেসিডেন্সি, কলেজ, সতীশচন্দ্র রায় ঐ, রসিক লাল ঘোষ ঐ।

নরদেহ-তত্ত্ব ও প্রাণী-বিদ্যা।—দ্বিতীয় বিভাগ—নীলরতন সরকার এম্‌ বি, ভূপেন্দ্রশ্রী ঘোষ প্রেসিঃ কলেজ। তৃতীয় বিভাগ—নরেশচন্দ্র মিত্র জেনা-রল এসেম বি।

ভূ-তত্ত্ব।—তৃতীয় বিভাগ—শশীভূষণ বসু সিটি কলেজ।

ইতিহাস।—প্রথম বিভাগ—বিনয়েন্দ্রনাথ সেন জেনারেল এসেম্‌ বি। তৃতীয় বিভাগ—অতুলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সিটি কলেজ, রাজেন্দ্র চন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজ, নেহালচাঁদ আগরা কলেজ।

সংবাদ।

—২রা জানুয়ারী আমীর আলি সাহেব শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্রের পদে হাইকোর্টের বিচারাসনে বসিবেন।

—এবার কংগ্রেসে মেয়ে-প্রতিনিধিও প্রেরিত হইবে। সংবাদপত্রে দেখিলাম, অম্বালা হইতে এক জন মুসলমান ও একটী কুমারী যাইবেন। এই মেয়ে প্রতিনিধির নাম মিস কারলিটন, এম ডি!

—পুরী জেলায় এক ব্যক্তি চুরি করিতেগিয়া গৃহ-স্বামীকে খুন করে। গৃহস্বামী তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, হতভাগা মুক্তি পাইবার জন্যই অস্ত্র-প্রয়োগ করিয়া-ছিল। বিচারে তাহার ফাঁসীর আদেশ হইয়াছিল। হাইকোর্ট এখন তাহাকে আমরণ দ্বীপান্তরে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

—রবারের বেলুন অনেকে দেখিয়াছেন। কিছুদিন হইল, আমেরিকায় এইরূপ বাষ্পপূরিত একটী বেলুন লইয়া একব্যক্তি বিক্রয় করিতে আসে। সে একজনকে উহা দেখাইতেছে; এমন সময়ে বেলুনের পুঞ্ছ যে দড়ীতে আটকান ছিল, সেই দড়ী একটা দুই বৎসরের মেয়ের কোমরে গলায় ও চুলে জড়াইয়া গেল। বেলুনের পুঞ্ছ উড়িল—বালিকাও উড়িয়া গেল। সম্মুখে হ্রদ, বালিকা হ্রদের উপর উড়িতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ জন দুই লোক নৌকা করিয়া হ্রদে নামিল। বেলুন উড়ি-তেছে—বালিকা ঝুলিতেছে,—বায় যায়! তখন একজন ভাল নিশানদার গুলি করিয়া বেলুন ফুটাইয়া দিলেন। বালিকা হ্রদে পড়িল—নৌকার লোকে লুফিয়া লইল; তাহার প্রাণরক্ষা হইল। আমেরিকায় আরও একবার ঠিক এইরূপ একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল।"

—এক ব্যক্তি এক জোড়া জুতা চুরি করিয়াছিল। কলিকাতা পুলিশের প্রধান বিচারপতি মার্সডেন সাহে-বের বিচারে তাহার এক পাটীর জন্য এক মাস করিয়া মেয়াদ হইয়া গিয়াছে।

—কাশীমিত্রের ঘাটে এক যোগিনী আসিয়াছে। এই যোগিনী নাকি ত্রিশূল দ্বারা চিতা হইতে অর্দ্ধদগ্ধ নরমাংস লইয়া এক বিল্ববৃক্ষে বসিয়া ভক্ষণ করিয়াছিল।

—লণ্ডনে এক মজার মকর্দ্দমা হইয়া গিয়াছে। এক জন সৈনিক লেপ্টনাণ্ট আপন স্ত্রীকে অসতী বলিয়া পরিত্যাগ করিবার জন্য নালিশ করেন। স্ত্রীও উল্টা চাপ দেয়। বিচারে রমণীরই জয় হইয়াছে। সাহেব বোকা বনিয়া গিয়াছেন।

—নিউজিলণ্ডে বিষ-প্রয়োগ দ্বারা জঙ্গল সাফ করার এক নূতন উপায় বাহির হইয়াছে। বৃক্ষের গোড়ায় একটী সরু ছিদ্র করিয়া তাহার মধ্যে এক প্রকার বিষ বিষ প্রবেশ করিয়া দিলে ২। ৩ মাসের মধ্যে বৃক্ষ শুষ্ক হইয়া মরিয়া যায়। সম্প্রতি এই উপায়ে প্রায় ৭০০ একার জমির জঙ্গল সাফ করান হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে বৃক্ষ একেবারে নষ্ট হইয়া যায়, তাহার কাষ্ঠ কোন কার্য্যে লাগে না।

—দমদমার নিকট গৌরীপুর নামক গ্রামে যে চারি জন গোরা এক মুসলমান চাষাকে জলে ফেলিয়া কুকুর-মারা করিয়াছিল, আগামী সেশনে তাহাদিগের অপরাধের বিচার হইবে।

—নিজামের রাজধানী হায়দরাবাদে শিশু সন্তান চুরির বড়ই প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। পুলিস তাহা নিবারণ করিতে অসমর্থ হইয়া ঢেঁড়া পিটিয়া নগরবাসীদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। লোকের বিশ্বাস, তথায় সম্প্রতি যে "ক্লোরাফরম কমিসন" বসিয়াছে, তাহারই এই শিশু সন্তানদের নিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখে।

—গিবন নামে এক জাতীয় বানর আছে, তাহারা গান করিয়া থাকে। পরিব্রাজক ওয়াটরহাউস্‌ গিবনের সঙ্গীত শুনিয়াছিলেন। তিনি বলেন, ইহার স্বর কিছু কর্কশ বটে, কিন্তু ইহার গীত অতি সুশ্রাব্য।

অনুসন্ধান।

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

৩য় খণ্ড] ২৯এ পৌষ, ১২৯৯ সাল। [১১শ সংখ্যা।

ঈশ-আবাহন।

বেহাগ—আড়াঠেকা।

"বিমল রজত ভাসে, পূর্ণ করি নীলাকাশে,
চন্দ্রমা আরতি করে সহস্র কিরণে,
সেই সত্য সনাতনে।
অগণ্য তারকাবলী, চৌদিকে রয়েছে জ্বলি,
মঙ্গল কনক-দীপ গগনে গগনে।
কুলের সুরভি-শ্বাস, উঠিছে ধূপের বাস,
কানন কুসুম-ভার অর্পিছি চরণে;
পর্ব্বত-কন্দরে গিয়া, শুভশঙ্খ বাজাইয়া,
পবন হরষে তাঁরে চামর ব্যজনে।
অমৃতের অধিকারী, আছ যত নরনারী
তোমরাও আরতি কর প্রকৃতির সনে;
জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালি, প্রেমের সৌরভ ঢালি,
শতকণ্ঠে কর গান, সুমধুর তানে॥"

ভারতে ধর্ম্মের আধুনিক অবস্থা ও ভাবী ফল।

অনেকে বলিয়া থাকেন, ভারতের ইতিহাস নাই। পুস্তকাকারে ভারতের ইতিহাস নাইও সত্য; কিন্তু যাহাকে যথার্থ ইতিহাস বলে, তাহা সভ্যজাতি-মাত্রেই কোন-না-কোনরূপে রক্ষা করিয়া থাকেন। ভারতের সাহিত্যই ভারতের ইতিহাস। ইহা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন শতাব্দিতে মানব-মন কিরূপে কর্ষিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সাহিত্য-দ্বারা জাতীয় উন্নতি বা অবনতি জ্ঞাত হওয়া যায়। মানব-মন কোন্ সময়ে কিরূপ চিন্তা করিয়াছে, তাহা জানিতে পারিলেই, আমরা উন্নতি-অবনতি জানিতে পারি। যখন দেশে উন্নত চিন্তা—উন্নত ভাব পরিলক্ষিত হয়, তখন সাহিত্যে সেই সমস্ত চিন্তা প্রবিষ্ট হয়। অন্যপক্ষে, অবনতির সময়ে আবার অবনত ভাব সাহিত্য-জগতে প্রবেশ করিয়া থাকে। রাজা কোন্ সময়ে কাহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কোন্ যুদ্ধে কত সৈন্য হত বা আহত হইল, ইহা লিপিবদ্ধ

করাই ইতিহাসের একমাত্র কার্য্য নহে। জাতির প্রকৃত অবস্থা আলোচনা করাই ইতিহাসের মুখ্য উদ্দেশ্য। যদি আমরা সাহিত্য-দ্বারা জাতির ভাব বা জাতির চিন্তার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি, তবে সাহিত্যকেই এক প্রকারে ইতিহাস বলা যাইতে পারে। ভারতে সাহিত্য চিরদিন রহিয়াছে। পূর্ব্বে সংস্কৃত ছিল। তৎপরে অর্দ্ধ-বাঙ্গালায় অর্দ্ধ-সংস্কৃতময় সাহিত্য সৃজিত হয়। চণ্ডিদাস, জয়দেব, বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিগণ এইরূপ ভাষায় ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও এইরূপ। সাহিত্য এবং Tradition আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে ধর্ম্মভাব কখনও একবারে বিলুপ্ত হয় নাই। অনন্ত আকাশের সমস্ত তারকাগুলির যেমন এককালিন অদৃশ্য হওয়া অসম্ভব, সেইরূপ এই বিশাল রাজ্যে, ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝাবাতের সময়েও, দূরাকাশে-বিশ্লিষ্ট নক্ষত্রের মতও, দুই একটী ধর্ম্মাত্মা বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিতি করিতেন। আজ ভারতবর্ষের যেরূপ দুঃসময়, বোধ হয়, আর কখন ভারতবর্ষ এরূপ ভয়ঙ্কর অবস্থায় উপনীত হয় নাই। যদিও মধ্যে মধ্যে প্রকৃত ধার্ম্মিকের কথা শুনিতে পাই, তথাপি এই অবস্থাকেই আমরা প্রকৃত ধর্ম্মাভাব বলি। কারণ, সমস্ত জাতির অধিকাংশেরই মধ্যে ধর্ম্মের চিহ্ন দৃষ্ট হয় না; বালক বৃদ্ধ,যুবক যুবতী যেন ধর্ম্ম-বন্ধন হইতে বিচ্যুত—সমাজ ধর্ম্মবহির্ভূত। দুই একটী প্রকৃত ধার্ম্মিক যাঁহারা আছেন, তাঁহারা শত চেষ্টা করিয়াও লোকের মনে ধর্ম্মভাব প্রবেশ করাইতে পারিতেছেন না। লোকে ক্ষণকালের জন্য তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করে সত্য; কিন্তু শত সহস্র সন্দেহ, কুভাব, কুযুক্তি আসিয়া ধর্ম্মের ক্ষীণালোক তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাপিত করিয়া দেয়। ফলতঃ সমাজের অবস্থা আলোচনা করিলে পরিলক্ষিত হয়, যেন একটী মূর্ত্তিমান অশান্তি সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছে। আমাদের দেশে ধর্ম্মাত্মা মহাজনেরা যে সমস্ত শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাহা রক্ষিত হইতেছে না। পিতা, পুত্র, গুরু, শিষ্য, স্বামী, স্ত্রী, সধবা, বিধবা সর্ব্বত্রই বিকৃত ভাব দৃষ্ট হয়। আর ইহাই জাতীয় ধর্ম্মাভাবের লক্ষণ।

এক্ষণে সাধারণের অন্তর হইতে বিশ্বাস একেবারেই যেন অন্তর্হৃত হইয়াছে। যুক্তির পরিপক্বতা দৃষ্ট হয় না, অথচ সকলেই তর্ক করিয়া থাকে—সকলেই যুক্তি দেখাইতে চেষ্টা করে। তবে এ অবস্থাও একরূপ নিন্দার নহে। নির্জ্জীব ভাব অপেক্ষা এ অবস্থায় ধর্ম্মভাবের সূচনাও অন্ততঃ বর্ত্তিতে পারে। অধিক কি, আমরা নিম্নে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, ইহাই ধর্ম্মাগমের পূর্ব্বাবস্থা।

বিংশ বর্ষ পূর্ব্বে ভারতবাসীর মনে এই আন্দোলন অবধি পরিলক্ষিত হইত না। তখন সাধারণের মন ইষ্টক-প্রস্তরের মত কঠিন ও নিশ্চল ছিল। মুখে ধর্ম্মকথা উচ্চারিত হইত, কিন্তু অন্তরে ধর্ম্মের ছায়া-মাত্রও পড়িত না। মনের কর্ষণ অবরুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে সেই অন্ততঃ অবস্থারও পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়।

ঘাত-প্রতিঘাত জগতের একটি অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়ম। আমাদের আধুনিক অবস্থার অনুরূপ অবস্থাও এক সময়ে ছিল,ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। অনুমান করা যাইতে পারে, এক সময়ে সাধারণে কোন বস্তুর অভাব অনুভব করিত; মনে নানাবিধ সন্দেহ উত্থিত হইত—কাহারও শান্তি ছিল না। যখন জাতির মধ্যে এইরূপ বিষন্ন-ভাব দেখা যায়, অথচ সকলে যেন কোন বস্তুর অনুসন্ধান করিতেছে বোধ হয়; তখন আমরা বুঝিতে পারি, যেন কোন নূতন পদার্থ উদ্গমের জন্য প্রকৃতি কার্য্য করিতেছে। সন্তান-প্রসবের প্রাক্কালে জননী যেরূপ বেদনা অনুভব করেন, কোন মহাপুরুষের জন্মগ্রহণ সময়েও সমস্ত জাতির মধ্যে সেইরূপ একটা যন্ত্রণা অনুভূত হয়।

ইতিহাস প্রমাণ দিতেছে, লুথার, খৃষ্ট, গৌরাঙ্গ চৈতন্য জন্মাইবার পূর্ব্বে জাতির মধ্যে এইরূপ একটা যাতনাই দেখা গিয়াছিল

এইরূপে যুক্তি প্রতি-মনে কার্য্য করিতে করিতে যখন মানব অস্থির হয়, অথচ তত্ত্বান্বেষণ ঠিক হয় না, যখন যুক্তির কার্য্য পর্য্যন্ত আরম্ভ হয়; তখন সকলের সমষ্টিস্বরূপ কোন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন।

অধুনা হিন্দু-সমাজের প্রতিঘাতের সময়। লোকে যেরূপে চিন্তা করুক না কেন, এক সময়ে কুচিন্তা দূরীভূত হইবে। তখন লোকের মনে বিশ্বাস আসিবে। বিশ্বাস যুক্তির শেষ ফল। জাতির সমষ্টিস্বরূপ যে মহাত্মা ঐ বিশ্বাস-সময়ে জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনি চক্ষে চক্ষে সমস্ত সত্য দেখিতে পাইবেন; সমস্ত জগতের রহস্য তাঁহার চক্ষে পরিষ্কার হইবে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মনে এতকাল যে সমস্ত যুক্তি কার্য্য করিয়াছে, ঐ মহাপুরুষের মন তখন সকল মনের সমষ্টিস্বরূপ হইবে—তাঁহার আত্মাই যেন তখন সকল আত্মার সমষ্টি! আমাদের মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যও সেইরূপ একজন মহাত্মা।

যখন সেইরূপ চৈতন্য আবার জন্মগ্রহণ করিবেন, তখন আবার লোকে সত্য দেখিতে পাইবে। চৈতন্য কাহাকেও যুক্তি দিয়া বুঝাইতেন না। তিনি সত্যসমূহ চক্ষে চক্ষেই দেখিতে পান; অন্যকে দেখাইতে হইলে, তাঁহার কথাই অন্যের যুক্তি এবং যুক্তিই সত্য। বহুকাল হইতে অন্যে যাহা অস্পষ্ট দেখিতেছিল, আজ সেই মহাপুরুষের সাহায্যে সকলে তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে; তাঁহার বাক্য সকলের প্রাণে লাগিয়াছে; সকলের বুভুক্ষিত পরিশ্রান্ত আত্মা প্রকৃত খাদ্য পাইয়াছে; সকলে সত্য চক্ষে চক্ষে দেখিতেছে। তখন আর যুক্তির আবশ্যকতা কি? যুক্তি তখন পলায়ন করিয়াছে—রাজ্য তখন বিশ্বাসের। দলে দলে লোকে যেই ধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছে; সেই ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইতেছে। তখনই প্রকৃত দেশ-সংস্কার হইল; বৃদ্ধ জাতি গিয়া নূতন জাতি আসিল। আবার নূতন জীবন সৃষ্টি হইল।

যখন সেই মহাপুরুষোদ্ভূত সত্য এইরূপে বহুকাল লোকের মনে কার্য্য করিবে, তখন লোকে আর যুক্তি চাহিবে না। লোকের মন ক্রমেই অলস হইয়া পড়িবে। কর্ষণ রহিত হইবে; সমাজ অবনত হইবে। তখন পূর্ব্বোদ্ভাবিত সত্য লোকের নিকট বিকৃত হইয়া দাঁড়াইবে। সে সত্য তখন পুস্তকে-আবদ্ধ মাত্র হইবে—প্রাণে লাগিবে না। কারণ, আত্মায় আবরণ পড়িয়াছে। মনুষ্য সেই অবস্থায় ভয়ানক অশান্তি অনুভব করিবে। তখন বোধ হইবে, কি যেন গিয়াছে—কাহার যেন অভাব অনুভব করিতেছি! সেই অবস্থায় উন্নত জাতীয় লোকে যাহা বলিবে, তাহার উপর অধিক বিশ্বাস হইবে।

বিশ্বের নিয়ম-অনুসারে দিবা-রাত্রির পরিবর্ত্তন মত জাতিরও পরিবর্ত্তন হইতেছে। সুতরাং আমরা আবার আশা করিতে পারি, যদি আমাদের পুরুষকার অক্ষুন্ন থাকে, তবে আবার মুনি-ঋষির তপোবল—আবার রামরাজত্ব আসিবে।

জুয়াচুরীর একশেষ।

(১)

রাধাগোবিন্দ মুখোপাধ্যায় একজন নিরীহ ভদ্র গৃহস্থ ব্যক্তি। কলিকাতা সহরের কোন পল্লীতে বাস করেন। ইনি নিঃসন্তান। একমাত্র ভাগিনেয়কে পুত্রবৎ প্রতিপালন করেন। ব্রাহ্মণের উপযুক্ত বিদ্যা নাই; গৃহে তাঁর বিধবা মাতা, বিধবা ভগিনী ও বিধবা পিতৃশ্বসা প্রভৃতি পোষ্যও অনেকগুলি। আয়ের উপায়—বড়বাজারের একখানি ছোটখাট মনিহারী দোকান-মাত্র। যাহা হউক, কায়-ক্লেশে ব্রাহ্মণ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। ভাগিনেয়-

টীকে দোকানে লইয়া গিয়া কাজকর্ম্ম শিখাইয়া থাকেন। ভাগিনাটীও বড় শিষ্ট-শান্ত, মামার আজ্ঞাকারী।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় একদিন দোকান খুলিয়া বসিয়া আছেন। ভাগিনেয় বাজারে—স্থানান্তরে কোন প্রয়োজনে গমন করিয়াছে। এমন সময়ে, একটী সুন্দর অশ্ব-শকটারোহী বাবু, যাইতে যাইতে, রাধাগোবিন্দের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিতে চাহিতে চলিয়াছেন। ক্রমে তাঁহার দিকে দোকানদার রাধাগোবিন্দ বাবুর দৃষ্টি পতিত হওয়াতে বলিলেন,—"মহাশয়, আসুন। কি দ্রব্য প্রয়োজন আছে, বলুন। একবার না হয় জিনিষটাই দেখিয়া যান।" কথা শেষ হইতে না হইতেই, গাড়ীর বাবুটী গাড়ি থামাইয়া মুখোপাধ্যায়ের দোকানের সম্মুখে আসিয়া শশব্যস্তে বলিতে লাগিলেন,—"একি গুরুপুত্র! আপনি এখানে কেন? আমরা বর্ত্তমান থাকিতে, পিতৃহীন হইলেও, আপনার এরূপভাবে জীবিকা-নির্ব্বাহ করা ও আমাদের অপমান করা একই কথা। আপনি স্বর্গীয় রামেশ্বর চূড়ামণির (এই স্থানে রাধাগোবিন্দ বাবুর পিতার যথার্থ নাম বলিলেন) পুত্র হইয়া ও সেই সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া এরূপ উঞ্ছ-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন! ইহাতে সমাজে আমাদিগকে মস্তক অবনত করিতে হইয়াছে। যাহা হউক, আপনি অবিলম্বে এ দোকান পরিত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে আসুন। আমি আপনার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের উপায় করিয়া দিব। আপনার কোন ওজর-আপত্তি আজ আর শুনিব না।"

রাধাগোবিন্দ বাবু ঐ সব কথা শুনিয়া একেবারে হতবুদ্ধির ন্যায় নির্ব্বাক হইয়া গেলেন। তাঁহার মস্তকের ভিতর কি যেন আলোড়িত হইয়া উঠিল; সর্ব্বশরীরের ধমনী যেন একেবারে তাড়িতবেগে চালিত হইতে লাগিল। কতকগুলি অসম্বদ্ধ বাক্য তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইল,—"আজ্ঞে!—আমি অমুক স্থানে—আজ্ঞে আমার ভাগ্নে ভিন্ন সংসারে। আমাদের তো শিষ্য যজমান আছে জানি—আমার পিতা।" তিনি এইরূপ কিছু বলিতে যাইলেই, কথায় বাধা দিয়া বাবুটী কিন্তু বলিলেন,—"না, আপনি না চিনুন, আমি কিন্তু বেশ চিনিয়াছি। আপনার শৈশবাবস্থায় আপনার পিতার মৃত্যু হয়। আপনি আপনার মাতাঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করিলে, জানিতে পারিবেন। আমার নামই শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র দেব। আমিই সেই নবগ্রামের দেববংশের বর্ত্তমান অধিকারী। সে যাহাই হউক, আমি আজ আপনাকে ছাড়িতেছি না। আপনি এইক্ষণেই দোকান ত্যাগ করুন। আমি আর আপনাকে এ কষ্ট করিতে দিব না।" দোকানদার বলিলেন,—"আজ্ঞে, আমি দোকান ছাড়িয়া কোথায় যাইব, কি করিব?" বাবু বলিলেন,—"আমার সঙ্গে আসুন। যাহা করিতে হয়, আমি করিতেছি। আগে দোকান বন্ধ করুন।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় তাঁহার ভাগিনেয় আসিয়া উপস্থিত হইল। বাবু বলিতে লাগিলেন,—"এইটী বুঝি আপনার ভাগিনেয়?" কোন উত্তর না পাইয়াই, ভাগিনেয়কে বলিলেন,—"দেখ বাপু, তুমিও দোকান বন্ধ করিয়া বাড়ী যাও। তোমার মাতামহীকে বলিও, অদ্য তাঁহাদের শিষ্য—নবগ্রামের সেই দেবেরা গুরুপুত্রকে তাঁহাদের বাড়ীতে লইয়া গিয়াছে। তোমাদের কোন ভাবনা নাই। কাল যথেষ্ট টাকা-কড়ি লইয়া তোমার মাতুল বাড়ী যাইবেন।"—এই বলিয়া, বাবুটী দোকানদারের পায়ে ধরিয়া বলিতে লাগিলেন,—"ঠাকুর! আর আমাকে কষ্ট দিবেন না। আসুন, আমার সঙ্গে। তারপর যেরূপ যাহা হয়, করা যাইবে।"

রাধাগোবিন্দ বাবু আর কি করিবেন? অগত্যা অনুরোধে-উপরোধে পড়িয়া, কতকটা

কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া এবং অনেকটা বা লোভে পড়িয়া, তাঁহাকে শিষ্য মহাশয়ের সহিত যাইতে হইল। তাঁহারা দুই জনেই অতঃপর গাড়ীতে উঠিলেন।

যাইবার সময়, কথায় কথায়, শিষ্য মহাশয় বলিলেন,—"চলুন, একবার গরদ-তসরের দোকানের দিকটা হইয়া যাই। যদি বুঝি, সুবিধামত না হয় দুই এক জোড়া কেনা যাইবে।" এই বলিয়া তাঁহারা একটী গরদ কাপড়ের দোকানে গমন করিলেন; এবং তথা হইতে পছন্দ করিয়া নগদ টাকায়, জোড়া দুই গরদ ক্রয় করিলেন। বলা বাহুল্য, তাহার একজোড়া তৎক্ষণাৎ গুরু-পুত্রকে দান করা হইল; এবং বাকী জোড়াটী গুরু-পত্নীর জন্য বলিয়া, বাবুর নিজের নিকটই রক্ষিত হইল। বাবু মহাশয় বলিলেন,—"অনেক দিন আপনাদের কিছু দিতে পারি নাই। এবার সাক্ষাৎ হওয়ায়, তবু যৎকিঞ্চিৎ যা'দিতে পারি, লউন।" এইরূপ বলিয়া, বাবু এক জোড়া শীত-বস্ত্রও প্রদান করিবেন, এইরূপ ভাব দেখাইলেন। কাজেই গুরুপুত্র বড়ই উৎফুল্ল—তাঁহার অদৃষ্ট যেন সুপ্রসন্ন! তিনি ভাবিলেন,—"শিষ্যের নিকট গরদ পাইয়াছি; এখন বোধ হয়, একজোড়া ভাল শালও পাইব।" ক্রমে কাজেও গড়াইতে লাগিল, তদ্রূপ। ক্রমে বাবু গুরুপুত্রকে সঙ্গে করিয়া, এক শালওয়ালার দোকানে গিয়াই উপস্থিত হইলেন। সেখানেও গুরুপুত্রের পছন্দ-সই একজোড়া শাল তাঁহাকে প্রদান করা হইল। অধিকন্তু, সেখান হইতে নিজেদের বাড়ীর ব্যবহারের জন্য, আরও জোড়া দুই শাল গ্রহণ করিয়া বাবু দোকানদারকে বলিলেন,—"এই দুই জোড়া আমি আমার দাদাকে দেখাইয়া আসি। আর, সঙ্গে টাকাও কিছু কম আছে;—লইয়া আসিতেছি। গুরুপুত্র ও তাঁহার শাল জোড়াটি রহিল। আমি সত্বর আসিতেছি।"

দোকানদার রাধাগোবিন্দ বাবুকে চিনিত। কলিকাতায় তাঁহার বাড়ী আছে; বড়বাজারে যেমন হউক এক রকম দোকানও আছে। সুতরাং অনেকটা রাধাগোবিন্দ বাবুকেই দেখিয়া, দোকানদারও আর কোন সন্দেহ করিল না। বিশেষতঃ তাঁহার শিষ্য বাবুরও চাল-চলন খুব উঁচুদরের। কাজেই এক হাত খুব দাঁও মারিব ভাবিয়াই দোকানদার আর আপত্তিটি করিল না। গুরুপুত্রকে দোকানে বসাইয়াই, অতঃপর শিষ্য মহাশয় দুই জোড়া শাল লইয়া দেখাইতে গেলেন।

* * * * *

শালওয়ালার দোকান হইতে বহির্গত হইয়া, সেই গাড়ী করিয়াই, বাবুটি আর একবার গুরুপুত্র মহাশয়ের সেই পূর্ব্বোক্ত দোকান-সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; এবং ভাগিনেয়কে বলিলেন,—"তোমার মামা আমাদের ঘোড়া-সাঁকোর বাসায় গিয়াছেন। সেখান হইতে আহারাদি-অন্তে তিনি বাড়ী ফিরিয়া যাইবেন। তুমিও দোকান বন্ধ করিয়া আমার সঙ্গে গাড়ী করিয়া সেখানে চল। তিনি তোমাকেও যাইতে বলিয়া দিয়াছেন।"—এই বলিয়া দোকান হইতে কতকগুলি দ্রব্য চাহিয়া লইয়া, বলিলেন,—"ইহার দাম কত?" ছোক্‌রা যাহা বলিল, বাবুও তাহাতে দ্বিরুক্তি না করিয়া একটা টাকা ফেলিয়া দিলেন; এবং তাহাকে শীঘ্র শীঘ্র দোকান বন্ধ করিতে বলিলেন। ভাগিনেয় হতবুদ্ধি হইয়া, কতকটা বা বাবুর তাড়নায়, দোকান বন্ধ করিয়া তহবিলের থলিটী দৃঢ়রূপে কোমরে বন্ধ করিল। অতঃপর দুই জনেই গাড়ী চড়িয়া চলিলেন।

যাইবার সময় বাবুটী ও ছোকরাটীতে নানা গল্প করিতে করিতে চলিলেন। তাঁহার গুরুর বাটীর সংবাদ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; এবং নানারূপে, সাহায্যের স্তোক দিলেন। ভাগিনেয়কে একটী বড় দোকান

করিয়া দিবেন, বলিলেন। দেখিতে দেখিতে গাড়ী, ঘোড়াসাঁকোর একটী গলি-রাস্তার ধারে একটী প্রকাণ্ড দ্বিতল বাটীর সম্মুখে থামিল। বাবু গাড়ী হইতে দ্রুত নামিয়া, বালকটীকে নামিতে বলিলেন। বালক নামিতে নামিতে বলিল,—"এই বাড়ীতেই কি মামা আসিয়াছেন? আমি এ কোথায় যাইতেছি?" বাবু বলিলেন,—"এই বাড়ীই আমার। কলিকাতায় আসিলে আমি এই বাড়ীতে থাকিমাত্র। সুতরাং ইহা ততদূর বড় ও পরিপাটী নয়। কলিকাতায় এবার যে জন্য আসিয়াছি, সে সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া দিয়া, তোমাদিগকে একবার দেশের বাড়ীতেও লইয়া যাইব। এখন এস, এই বাড়ীর ভিতর খানিক বিশ্রাম কর। তোমার মামা এখনই আসিতেছেন।"

কি জানি কেন, এ কথা শুনিয়া, বালকের মনে বড় ভয় হইল। সে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতেও সে যেন নারাজ হইল। কিন্তু কি করিবে? বাবুর কৌশলে তাহাকে বাড়ীতে প্রবেশ করিতেই হইল। যদিও সে আরও একবার বলিল,—"না মশায়!" আমি বাড়ী যাই। মামাকে সঙ্গে করিয়া আমি এই বাড়ীতে আসিব। বাড়ী তো চিনিয়া গেলাম!" কিন্তু বাবু তাহাকে বলিলেন,—"দোকানের তহবিল আনিয়াছ; তাহা তোমার সঙ্গে আছে। সুতরাং কেমন করিয়া তাহা লইয়া একা তোমাকে বাড়ী যাইতে দিব? সেটী তবে এখানে রাখিয়া যাও।"

বালক তো অবাক! কিন্তু তখন একেবারে বাড়ীর উপরতলায়! কাজেই আর কথাটি কহিবার যো নাই! বিশেষতঃ বালক ভাবিল, মামাকে এখন সংবাদ দেওয়াই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। যাইহোক, তথাপিও সে না-হুঁ না-হুঁ করিল; বলিল,—"টাকা রাখিয়া গেলে মামা বকিবেন। তা' আপনাদের ভয় নাই; আমিই তো নিত্য টাকা বাড়ী লইয়া গিয়া থাকি।"

"না, তা' আমরা পারি না।"—তখন বাবু গম্ভীরস্বরে এইরূপ উত্তর দিয়াই যেন অন্দরে প্রবেশের ভান করিলেন। বালক বড়ই ব্যস্ত হইল; আত্মীয়-স্বজন কাহাকেও নিকটে না পাইয়া সে একরূপ হতভম্ব হইয়া গেল। অবশেষে তাহার চপল বুদ্ধিতে এইরূপই সে সিদ্ধান্ত করিল,—"যাওয়াই ভাল। বাড়ী গিয়া বরং সংবাদ দিলে মামা প্রভৃতি সকলে উপায় করিতে পারিবেন।" কাজেই সে তখন, টাকার তোড়াটি গচ্ছিত রাখিয়া, বলিল,—"আচ্ছা, তবে আমার তোড়াটি থাকিল। আমি আসিতেছি।"

শিষ্য মহাশয়েরাও তো তাই চাহেন! তাঁহারাই বরং সহায় হইয়া,বালকটীকে রাস্তায় বাহির করিয়া দিবার জন্য লোক দিলেন। বালক ক্রমে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। গোলকধাঁধায় পড়িয়া সে তখনও তত তলাইয়া বুঝিতে পারিল না।

নারী।

জগত-সংসারে বিধাতার সৃষ্টি-সৌন্দর্য্যের মধ্যে নারী এক অপূর্ব্ব সামগ্রী। যে বিস্তৃত কল্পনায়, যে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে এই বিশ্ব-সংসার সৃষ্ট হইয়াছে, সেই উপাদানেই বিধাতা এই স্বর্ণ-প্রতিমা নারী-মূর্ত্তি সৃজন করিয়াছেন। কিন্তু এই স্বর্গীয় মাধুরী-সম্পন্ন অপূর্ব্ব সৃষ্টি বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্যকে দূরে পরাস্ত করিয়াছে। আদ্যাশক্তি-অংশ-সম্ভূতা নারী জগতের শ্রেষ্ঠ ও সৃষ্টির বৈচিত্র। এমন সুন্দর পদার্থ কি আর জগতে আছে? সায়াহ্ন-গগণের কোমলতা, বসন্তের বনশোভা, শিশুর সুহাস-চন্দ্রের বিমল রশ্মি, উষার কনক-স্রোত প্রভৃতি পৃথিবীতে যত কিছু স্বভাবের সৌন্দর্য্য আছে, সকল সৌন্দর্য্যের প্রতিভাই সেই নারী-হৃদয়ে গিয়া প্রতিফলিত হইয়াছে। প্রেমের প্রীতিময়ী প্রতিভা, মুখের আনন্দ-লহরী, সর্ব্ব-কামনা-

বিবর্জ্জিতা ভক্তি-প্রবাহের সেই তো একমাত্র স্থল! নারী-হৃদয় জগতের কেন্দ্র! এই স্থানেই তো বিশ্বের সৌন্দর্য্য, লীলাময়ী কল্পনা, পার্থিব সুষমার একাধারে সমাবেশ, অপূর্ব্ব শ্রী-সম্পন্না নারী জগতের শীর্ষস্থানীয়া, পূজার সামগ্রী—সে হৃদয় প্রেমের নির্ঝরিণী, সরলতার প্রস্রবণ। এমন সুন্দর দুর্ল্লভ সামগ্রী বোধ হয় আর ত্রিজগতে নাই। ভগবান মর্ত্তের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া এ দেব-দুর্ল্লভ সামগ্রী সৃষ্টি করিয়াছেন।

জগতে সকল শ্রীই বিকৃত হয়, সকল সৌন্দর্য্যই বিনষ্ট হয়। প্রেম-সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য-অহঙ্কার, মনুষ্যত্ব সকলই কালে বিলুপ্ত হইবে; কিন্তু নারী-হৃদয়ের মহত্ত্বের বিনাশ নাই। দয়া, ক্ষমা, ভক্তি, সৌজন্য ইহাই নারীর অঙ্গ-ভূষণ। এই সকল সদ্গুণ নারীর কায়ায় একত্রে পর্য্যবসিত। তাই নারী-হৃদয় এত কোমল—নারীর প্রকৃতি, এত স্থির। নারী-হৃদয় কোন্ উপাদানে সৃষ্ট,তাহা মনুষ্যের জ্ঞানের অতীত—নারী-হৃদয়ের মহত্ত্ব সমালোচনা করিতে লেখনী পরাস্ত। যে রমণীর মূর্ত্তি স্বয়ং পঞ্চানন স্তীমিত নেত্রে ধ্যান করিয়া, পঞ্চমুখে বর্ণনা করিয়া, শেষ করিতে পারেন নাই,তাহা মনুষ্যের কল্পনায় কতদূর আসিতে পারে জানি না। বর্ণনা ও সীমানার অতীত, অর্থ করিতে হইলে যেরূপ "অনন্ত" বলিয়াই ভাষা চুপ করিয়া যায়—কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আইসে; সেইরূপ নারী-হৃদয়ের মহত্ত্ব প্রাণে অনুভব করিয়া, জগতের শ্রেষ্ঠ-গরিমার পরাকাষ্ঠা প্রেমময়ী সরলা নারীমূর্ত্তি বর্ণনা করিতে গিয়া, শতবার বলিতে হইয়াছে,—

"প্রেমের প্রতিমা, স্নেহের আধার
করুণা নির্ঝর, দয়ার নদী।
হ'ত মরুময় বিশ্ব-চরাচর
জগতে নারী না থাকিত যদি।"

কবির এ গীতিকায় বোধ হয়, এ জগতে নারীর সৃষ্টি না হইলে পৃথিবী থাকিত না। এ বিশ্বের এই যে সৃষ্টি-নৈপুণ্য, রচনা-পারিপাট্য, স্বভাবের শোভা, এই যে এতটা কাণ্ড-কারখানা, বোধ হয়, সকলি বিফল হইয়া যাইত।

নারী হইতেই জগতের সৃষ্টি, নারীর স্নেহেই বিশ্ব জীবিত, নারীই বিশ্বের আরাধ্যা, নারীর সাহায্য-ব্যতীত বিধাতা বিশ্ব-সৃজনে সমর্থ হইতেন কি না সন্দেহ। প্রকৃতি-পুরুষ একই সামগ্রী, শিব-শক্তি একই সম্পূর্ণ পদার্থ, এক অঙ্গেই উভয় সমন্বিত। কিন্তু দুর্ভাগ্য, শিব হইতে শক্তি প্রভেদ করিলে শব ব্যতীত আর কিছুই নয়। তাই বলিতেছি, নারীই বিশ্বের প্রাণ, সৃষ্টির মূল, ভবিষ্যৎ অন্ধকারের শুখ-তারা। বঙ্গ-গৃহে হিন্দু-সমাজে যে সংসারে নারী নাই, সে সংসার কুক্কুর-শৃগালের বাস, অরণ্য হইয়াছে; সে সংসার সুখ-আশা-হীন, জীবনে মৃত—সে সংসার লক্ষ্মীছাড়া। কাহিনী নহে; পুরাণ, ইতিহাস, ইতিবৃত্ত, জীবনী পাঠ কর—দেখিবে, সৃষ্টির আদর্শ সামগ্রী নারী কি পদার্থ! সরল-প্রাণা কোমল-প্রকৃতি নারী-হৃদয়ের গরিমা কতদূর! মানবের কঠিন প্রাণে এ সাম্য-বিচারের স্থান ধরে না।

মানব চক্ষু থাকিতে অন্ধ, কর্ণ থাকিতে বধির, হৃদয় থাকিতে পাষাণ। নতুবা এই পুণ্য ভূমি ভারতবর্ষে গৃহে গৃহে নারীপূজা প্রচলিত হইত। রাধিকার বিরহিনী মূর্ত্তি, সীতার বিষাদ মূর্ত্তি,দময়ন্তীর পতি-শোক-বিধুরা কাতরা মূর্ত্তি, সাবিত্রীর সতীমূর্ত্তি যে একবার প্রাণে অনুভব করিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে,এ পৃথিবীতে নশ্বর-সংসারে নারী দেবী না মানবী! নারী সৃষ্টির যেরূপ শ্রেষ্ঠ পদার্থ, অপার্থিব সামগ্রী তাহার প্রতি আদর ততদূর ঘটে না।

বৎসর-শতাব্দী-যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনও সীতার বিষাদ-মূর্ত্তি, দময়ন্তীর রোরুদ্যমানা কাতরমূর্ত্তি, রাধিকার বিরহিনী-মূর্ত্তি, সাবিত্রীর সতী-মূর্ত্তি চক্ষের সমক্ষে

দেখিতে পাওয়া যায়। এ জীবনে সে প্রতিমা কি ভুলিবার? বিশ্বের সৃষ্টি হইতে জগতের বিলয় পর্য্যন্ত নারীর এ গরিমা-গীতির বুঝিবা শেষ হইবেনা। যতদিন এই অনন্ত-নীল-নভোস্থলে চন্দ্র-সূর্য্য-তারা, নিম্নে পর্ব্বত-নদী-নির্ঝরিণী, মর্ত্তে মানব বর্ত্তমান থাকিবে; ততদিন পৃথিবীতে রমণীর আদর থাকিবেই।

সংসারের ভীষণ কোলাহল—জীবনের এই যে মহা-সংগ্রাম চলিয়াছে; ইহা হইতে নারী আপনাকে অতি ধীরে—অতি সন্তর্পণে রক্ষা করিতেছে। এ কঠিন সংসার হইতে যেন সে হৃদয় সম্পূর্ণ পৃথক। নারীর প্রাণ অতি কোমল, কোমলতার আবরণে সে অঙ্গ আবৃত। তাই রমণী মায়ার প্রতিমা। এ সংসার নারীর স্থান নহে—নারী-হৃদয়ের মহত্ত্ব প্রকাশের ইহা উপযুক্ত ক্ষেত্র নহে। মনুষ্য সংসারের দাবানলে পুড়িয়া আত্ম-বিস্মৃত ঘটাইয়াছে; অহর্নিশি কলহ, আত্মীয় বন্ধু-বিচ্ছেদ, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি নানা দোষে সে হৃদয় বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে; সে হৃদয় নারীর মাহাত্ম্য কি বুঝিবে? পুরুষ-হৃদয়ে হৃদয় নাই—পুরুষ-দেহে প্রাণ নাই। নতুবা এরূপ সর্ব্বনাশ ঘটিবে কেন?

মানব বিষয়-মোহে আচ্ছন্ন, আত্ম-শ্লাঘায় স্ফীতবক্ষ, সংসারের পথে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট, চক্ষু থাকিতে অন্ধ। যাহাদিগের চক্ষে নারী ভোগের পদার্থ ব্যতিত আর কিছুই নয়, তাহাদিগের নিকট আর নারীর গৌরব কি? তাই কবি অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইয়া, জগতের দুঃখে—প্রাণের যন্ত্রণায়, একদিন গাহিয়াছিলেন,—

"বিষয়-মদিরাপানে মত্ত চিত যার,
তারে কি পারিব বুঝাইতে,
ধাতার করুণা মর্ত্তে নারী অবতার
নর-হৃদি বেদনা বারিতে!"

যথার্থই এ জগতে নারী অবতার—বিধাতার করুণায় মর্ত্তে নারীর সৃষ্টি। সে হৃদয় মানবের দুঃখ দূর করিতেই সতত তৎপর; অন্য চিন্তা অন্য আকাঙ্ক্ষা বুঝি তাহার ত্রিজগতে আর নাই। বিষয়-মদিরা পানে যে হৃদয় সতত উন্মত্ত, তাহার নিকট এ সকল কথা কি স্থান পায়?

এ কঠিন সংসার হইতে নারীর প্রকৃতি কিছু স্বতন্ত্র। সে হৃদয় স্নেহ-মমতার আধার। জগতের উপকারের নিমিত্তই নারীর সৃষ্টি। তথাপি এ সংসার সে রত্ন কিন্তু চিনিল না। বালিকার লজ্জাবরুদ্ধ কুমারীমূর্ত্তি, সতীর সাবিত্রীমূর্ত্তি, জননীর স্নেহময়ী মূর্ত্তির ন্যায় সুন্দর নিঃস্বার্থ, প্রেমদানে তৎপর, কোমলে কঠোর মূর্ত্তি, কি আর জগতে আছে? জননীর স্নেহময়ী মূর্ত্তি, সর্ব্ব-সুখ-বিহীনা ধরিত্রীর বিষাদময়ী ক্ষেমঙ্করী মূর্ত্তি এ উভয় যেন এ সংসারেরই নহে! জানি না, কোন্ পাপে দেবী হইয়াও তাঁহাদের দাসীরূপে সতত সংসার-কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে হয়! পরহিতে সে জীবন উৎসর্গীকৃত, পরদুঃখে সে হৃদয় তন্ময়। বালিকার হৃদয় অকপট, স্বচ্ছ, বিমল ঊষার ন্যায়--সে হৃদয় সততই হাসিতে থাকে। সেই সরল প্রফুল্ল মুখচ্ছবির কি আর তুলনা আছে? সতীর সর্ব্বস্বধন পতির চরণ সেবাই নারী জীবনের স্বর্গ-সুখ—সে হৃদয়ে অন্য আশা, অন্য আকাঙ্ক্ষা স্থান পায় না। এই তো প্রেমের চিত্র! এই তো অসামান্যা নারী-চরিত্রের উৎকর্ষ!

এ নারী-হৃদয়ের মহত্ত্ব বুঝিবে কে? নারী-সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্যে জগতের একমাত্র উদাহরণ স্থল—কল্পনার অতীত, চিন্তার বহির্ভূত। নারী-হৃদয় দুঃখ-শোকে পৃথিবীর ন্যায় সহনশীলা, কার্য্যে পাষাণের ন্যায় কঠোর, মমতায় কুসুমের ন্যায় কোমল। এ নারী-হৃদয়ের মহত্ত্ব এক দিবস শ্রীকৃষ্ণ বুঝিয়াছিলেন। তাই বিশ্বের আরাধ্যা দেবী, আদর্শনারী, প্রেমময়ী রাধিকাকে বলিয়াছিলেন,—

"সঙ্গের সঙ্গিনী তুমি সুখময় ঠাম।
পাশরিব কেমনে জীবনে রাধানাম॥
গলে বনমালা তুমি, মোর কলেবর।
রায় বসন্ত কহে, প্রাণের গুরুতর॥"

তাই বলিতেছি, নারী জগতের অতুলনীয়া। আকাশ যেরূপ অনন্ত, সমুদ্র যেরূপ গভীর, জগত যেরূপ বিস্তৃত, নারী-হৃদয়ও সেইরূপ অনন্ত, গভীর ও বিস্তারিত। যুগ-যুগান্তর রহিয়া ভারতের একমাত্র গৌরব—এই নারী-নারী-হৃদয়ের মহিমা জগতে কীর্ত্তিত হইবে।

মাহেশ।

মাহেশ অতি প্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ স্থান। তিন শতাব্দীর পূর্ব্বেও এই গ্রামটির অস্তিত্বের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। অনেকের এইরূপ বিশ্বাস এবং প্রাচীন লোকদিগের মুখেও শুনা যায় যে, পূর্ব্বে মাহেশ যে স্থলের উপর ছিল তাহা এক্ষণে ভাগীরথীর গর্ভে নিহিত। ফলতঃ উক্ত গ্রামটি ক্রমে পশ্চিমে সরিয়া গিয়াছে। লং সাহেব বলেন যে,—"মোগল-বংশীয়দিগের রাজত্বের প্রারম্ভকালে, হুগলী-নগরের উপরিভাগে ভাগীরথী-তীরে যে সকল গ্রাম সন্নিবেশিত ছিল, তাহার মধ্যে কোন কোন গ্রাম এক্ষণে উক্ত স্থান হইতে দুই অথবা আড়াইক্রোশ অন্তরে সন্নিবেশিত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কলিকাতা ও হুগলী-নগরীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে ভাগীরথীর তীরে যে সকল গ্রাম সন্নিবেশিত রহিয়াছে, মানচিত্র এবং ভ্রমণকারীদিগের কৃত পুস্তকের সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মিলাইয়া দেখিয়া আমাদের এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, ঐ সকল গ্রাম তিন শতাব্দী পূর্ব্বেও ঠিক ঐ স্থানে সন্নিবেশিত ছিল।" সে যাহাই হউক, ঐ বিষয় আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের গবেষণার বহির্ভূত; সুতরাং এক্ষণে আর আমরা ঐ বিষয়-সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। তবে ঐ সকল গ্রামের স্থান-পরিবর্ত্তন হওয়ার অদ্যাপিও যে প্রমাণ পাওয়া যায়, সে বিষয়ের আমরা উল্লেখ পশ্চাৎ করিব।

সাধারণ গ্রাম্যদৃশ্য হইতে এই গ্রামের বিশেষ কিছু বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় না। অন্যান্য গ্রামের ন্যায় এই সকল গ্রামেরও গৃহাদি শাখা-পল্লব-পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষাদি-মধ্যে লুক্কায়িত। ঐ সকল গৃহাদির মধ্যে অনেকগুলি আবার অত্যন্ত প্রাচীন; পথিকগণ যে সময় বৃক্ষসমষ্টি ভেদ করিয়া গ্রাম্য-পথাবলম্বনপূর্ব্বক চলিতে থাকে, গৃহাদির মধ্যে যে গুলি প্রাচীন, সেই গুলির প্রাচীনত্বও তখন উহাদিগের মনে সহজেই উপলব্ধি হইয়া থাকে।

এইস্থানে একটি সুবৃহৎ মন্দির আছে, তন্মধ্যে জগন্নাথ-দেবের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। জগন্নাথ-দেবের অবস্থানেই এই স্থানের খ্যাতি দেশময় পরিব্যাপ্ত। যে যে স্থানে জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, পুরীস্থ আদি জগন্নাথদেব ব্যতীত ইহাঁর সমকক্ষ আর কেহ নহেন। সেই দেবমূর্ত্তি এবং মন্দির সম্বন্ধে এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে প্রবাদ আছে যে, ন্যূনাধিক তিন শতাব্দী কাল বিগত হইল, ধ্রুবানন্দ নামক জনৈক ব্রহ্মচারী এই অদ্ভুত দারুময় জগন্নাথদেবের প্রতিমূর্ত্তি এই গ্রামে স্থাপিত করেন। জগন্নাথ-সম্বন্ধে একটী সাধারণ প্রবাদ আছে; সেইটী এ স্থলে বিবৃত করা গেল। একদা জগন্নাথ-দেব ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বৈদ্যবাটিতে আসিয়া উপস্থিত হয়েন; এবং সে স্থানে নিমাই-তীর্থের ঘাটে স্নান করেন। স্নান-সমাপনান্তে শঙ্কর নামক জনৈক ময়রার দোকানে উপনীত হইয়া সুবর্ণ বলয় বন্ধক রাখিয়া, চিনি ও সন্দেশ প্রভৃতি জলযোগ করেন। ঐ সময়ে পুরীর জগন্নাথ-দেবের হস্তস্থ বলয় হারাইয়া যায়। পাণ্ডাগণ তাঁহার হস্তে বলয় দেখিতে না পাইয়া অন্বেষণ করেন। কিন্তু কোন অনুসন্ধান না পাওয়াতে তাঁহারা 'হত্যা' দেন। তাহাতে এই প্রত্যাদেশ হয় যে,—"আমি ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে নিমাই-তীর্থের ঘাটে স্নান করিয়া, শঙ্কর ময়রার

দোকানে বালা বাঁধা দিয়া জল খাইয়াছিলাম। সেই স্থানের নিদর্শন নিমগাছে চম্পক-পুষ্প দেখিতে পাইবে।" পরে পাণ্ডাগণ ঐ নিদর্শন দেখিয়া, উক্ত ময়রাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে,--"কাহারও দোকানে কোন ব্রাহ্মণ বলয় বাঁধা দিয়া কিছু কি খাইয়াছিলেন?" ময়রা তাহা স্বীকার করাতে, পাণ্ডাগণ সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন। তখন শঙ্কর ক্রন্দন করিতে করিতে কহিল,—"প্রভু আমাকে ছলনা করিয়া গিয়াছেন; আমি তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম না। হায়, আমি কি দুর্ভাগা! সে যাহাই হউক, আগামী কল্য আমি আপনাদিগের সহিত গমন করিব; এবং স্বহস্তে সেই শ্রীকরে এই বালা পরাইয়া দিয়া জীবন সার্থক করিব। কিন্তু সেই দিবস রজনীযোগে শঙ্করের প্রতি আবার প্রত্যাদেশ হইল যে,—"তোমার সেখানে যাইবার আবশ্যক নাই। মাহেশ গমন করিলেই জগন্নাথে যাইবার ফল হইবে। ঐ বলয় পাণ্ডাদিগের নিকট অর্পণ করিবে।" শঙ্কর ময়রা তাহাই করিল।

কথায় কথায় আমরা অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে মূল প্রস্তাবের আলোচনা করা যাউক। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ধ্রুবানন্দ নামক জনৈক ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক দারুময় একটী জগন্নাথমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালে এই প্রতিমূর্ত্তি একটী পর্ণ-কুটীরাভ্যন্তরে স্থাপিত ছিল। এই অবস্থায় উক্ত ব্রহ্মচারী কিয়ৎকাল দেবার্চ্চনা করিতে থাকেন। ঐ সময়ে কমলাকর পিপলাই ও নিধিপতি পিপলাই নামক দুই সহোদর দক্ষিণদেশ (উড়িষ্যা) হইতে আগমন করেন। সেই দুই ভ্রাতা ব্রহ্মচারীর অধীনে জগন্নাথদেবের সেবানুষ্ঠানে নিযুক্ত হয়েন। অল্প কাল-মধ্যে ধ্রুবানন্দের দেহাবসান হইলে, উক্ত ভ্রাতাদ্বয়ই জগন্নাথদেবের সেবাইত-পদাভিষিক্ত হইলেন। তৎকালে মাহেশ-গ্রাম বনময় ও একপ্রকার জনশূন্য ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঐ ভ্রাতাদ্বয়ের প্রযত্নে এই গ্রামে লোকের বসতি হইতে আরম্ভ হয়। জগন্নাথদেব এবং তাঁহার সেবাইতদ্বয়কে কিছুকাল এইরূপ হীনাবস্থায় অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল। কথিত আছে যে, শঙ্কর ময়রার ঘটনার পর হইতে মাহেশস্থ জগন্নাথদেবের খ্যাতি ক্রমশঃই দেশময় পরিব্যাপ্ত হইতে থাকে।

পরে কলিকাতাস্থ ধনাঢ্য বৈষ্ণব-সাম্প্রদায়িক মৃত নয়নচাঁদ মল্লিক জগন্নাথদেবের প্রীতি-লাভার্থ তাঁহার একটী আবাস-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ভাগীরথী-প্রবাহের ভীষণাঘাতে—ভাঙ্গনে ঐ মন্দির ভাগীরথীর অতল গর্ভে নিহিত হয়। এই ঘটনার অব্যবহিত পরে কলিকাতা-নিবাসী গৌরাঙ্গভক্ত গতায়ু গৌরচরণ মল্লিক নিজব্যয়ে বর্ত্তমান মন্দির ও পুরী নির্ম্মাণ করিয়া দেন। মৃত নিমাইচরণ মল্লিক জগন্নাথের সেবার জন্য মাসিক ষষ্টি মুদ্রা করিয়া বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। এই বৃত্তি এবং ভূম্যাদির উপস্বত্ব (পশ্চাতে আমরা সে বিষয়ের উল্লেখ করিব) হইতে জগন্নাথদেবের নিত্য সেবা হইয়া থাকে। মৃত কৃষ্ণচন্দ্র বসু জগন্নাথের বার্ষিক আরোহণের জন্য রথ, এবং রথের গমনাগমনের জন্য নিজব্যয়ে ভূমি ক্রয় করিয়া পথ প্রস্তুত করিয়া দেন। এক্ষণেও সে প্রশস্ত পথ দেখিতে পাওয়া যায়। কিছু দিন পরে এই রথ ভগ্ন হইলে, উক্ত বসু মহাশয়ের উত্তরাধিকারী মৃত গুরুপ্রসাদ বসু দ্বিতীয় একখানি রথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। ১২৬০ সালে ঐ রথখানি সর্ব্বভুক কর্ত্তৃক ভস্মীভূত হওয়ায়, গুরুপ্রসাদ বসুর উত্তরাধিকারীগণ পুনরায় নূতন রথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। মৃত কৃষ্ণ বসু কর্ত্তৃক রথ প্রদত্ত হইবার পূর্ব্বে অপরাপর অনেকেও শ্রীজগন্নাথের আরোহণের জন্য রথ দিয়াছিলেন; কিন্তু সে সকল এরূপ বৃহদাকার ছিল না। তৎকালে রথ গঙ্গাতীরের পথে চলিত।

এক্ষণে ঐ পথের আর চিহ্ন নাই; উহা ভাগীরথীর কুক্ষিগত হইয়াছে। এইহেতু কৃষ্ণ বসুকে ভূমি ক্রয় করিয়া পথ প্রস্তুত করিয়া দিতে হইয়াছিল। শ্রীরামপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকাপ্রসাদ দের স্ত্রী, জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার জন্য দেড় সের পাকা সোনার সুন্দর মুকুট প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। কলিকাতাস্থ রাইচরণ দত্ত চাঁদনীসহ একটী বাঁধাঘাট নির্ম্মাণ করিয়া দেন; এবং ঐ ঘাট হইতে জগন্নাথদেবের মন্দির-পর্য্যন্ত একটী রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ ঘাটটী "জগন্নাথের ঘাট" নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

রথযাত্রা-উপলক্ষে এই গ্রামে বড় ধুমধামে মেলা হইয়া থাকে। সেই মেলা এবং স্নানযাত্রা-উপলক্ষে যে মেলা হয়, উভয়তেই পূর্ব্বকথিত কমলাকর পিপলাইয়ের উত্তরাধিকারীগণ (যাঁহারা এক্ষণে জগন্নাথের অধিকারী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন) প্রচুর লাভ করিয়া থাকেন। কমলাকরের ভ্রাতা নিধিপতি পিপলাইয়ের উত্তরাধিকারীগণ জগন্নাথের সেবা কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অধ্যাপনা-ব্যবসায় অবলম্বনে চতুষ্পাঠী করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেছেন।

জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-উপলক্ষে মাহেশে বিলক্ষণ ধুমধাম হইয়া থাকে। কথিত আছে যে, পুরীতে যাইবার পথে জগন্নাথদেব এই স্থানে স্নান করেন; এবং তৎপরে পুরীতে গিয়া আহার করেন। তাহারই স্মরণার্থ জ্যৈষ্ঠ মাসের পৌর্ণমাসীতে এই উৎসব হইয়া থাকে। প্রায় ষষ্টি বৎসর বিগত হইল, কোন বিশেষ ঘটনা সংঘটনে এই উৎসব বিশেষ স্মরণীয় হইয়াছে। এই বিষয় উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে যাঁহাদিগের সহিত এই ঘটনার সংস্রব, তাঁহাদিগের বিষয় কিছু আমরা এ স্থলে বলিব। শ্রীরামপুরের উত্তরে সেওড়াফুলি নামক একটী গ্রাম আছে। উক্ত স্থানের ভূম্যধিকারীগণ (সাধারণে যাঁহাদিগকে সেওড়াফুলির রাজা বলিয়া থাকে) বাঙ্গালার একটী প্রাচীন ও মাননীয় বংশোদ্ভূত; এবং উক্ত বংশ বহুকাল হইতে 'মুদ্রমুনি' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কাটোয়া হইতে অনতিদূরে পাটুলি নামক স্থানে এই বংশের আদি বাসস্থান ছিল। মোগল-প্রতিনিধিদিগের রাজস্বের তালিকায় পাটুলির নাম সন্নিবেশিত দেখিতে পাওয়া যায়। তৎকালে এই স্থানের বার্ষিক রাজস্ব বাহান্ন সহস্র মুদ্রা ছিল। ফলতঃ আমরা এইরূপ স্থির করিতে পারি যে, বাঙ্গালার যে সকল ভূম্যধিকারী-বংশ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ অংশে বিখ্যাত হইয়া উঠেন, সেই সকলের মধ্যে ইহাও একটী। কৃষক এবং রাজার মধ্যবর্ত্তী কোন একটী শ্রেণী থাকিতে না দেওয়াই সম্রাট আকবরের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ঐ প্রথা ক্রমে শিথিল হইয়া আসিয়াছিল। যাঁহারা রাজস্ব-সংগ্রহ করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই ঐ সময়ে এই পদটীকে পৈত্রিক করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। অর্থাৎ ঐ পদটিই রাজস্ব সংগ্রাহক হইতে ক্রমশঃ ভূম্যাধিকারীতে পরিণত হইতেছিল। জমিদারী-প্রথা বাঙ্গালার নবাব মুরসেদকুলি খাঁ কর্ত্তৃক পূর্ণাবয়বে গঠিত হয়। লক্ষ লক্ষ প্রজাদিগের নিকট অপেক্ষা অল্প সংখ্যক বৃহৎ ভূম্যধিকারীদিগের নিকট হইতে পীড়ন অথবা যে কোন উপায়ে হউক সহজে রাজস্ব আদায় হইতে পারিবে, মুরসেদকুলি খাঁ এইটি সহজ উপায় স্থির করিয়া ভূম্যধিকারী-প্রথা প্রচলিত করেন। তিনি ভূম্যধিকারীদিগের নিকট হইতে যেরূপে রাজস্ব আদায় করিতেন, তাহা বাঙ্গালা-ইতিহাস-পাঠকদিগের অবিদিত নাই। তিনি কোন কোন সময়ে রাজস্ব-দানে অনিচ্ছুক কোন কোন ভূম্যাধিকারীর নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিবার জন্য, তাঁহাকে বিষ্ঠা প্রভৃতি ঘৃণিত দ্রব্যপূর্ণ পুষ্করিণীর উপর দিয়া টানাইতেন। এই উপায়ে তিনি ভূম্যধিকারিদিগের সঞ্চিত ধনভাণ্ডারের দ্বার

উদ্ঘাটনে কৃতকার্য্য হইতেন। কথিত আছে, কোন সময়ে কোন ব্রাহ্মণ ভূম্যধিকারীর রাজস্ব বাকি পড়াতে, তাঁহাকে ঐ বৈকুণ্ঠে (কথিত পুষ্করিণী উপহাসচ্ছলে এইরূপ অভিহিত হইত) প্রেরণ করিবার উদ্যোগ হইতেছিল; এমন সময়ে পাটুলির ভূম্যধিকারী মনোহর রায় অগ্রসর হইয়া, সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া, উক্ত ব্রাহ্মণকে এই ভয়ানক বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। মনোহর রায়ের এবম্প্রকার বদান্যতায় নবাব অতীব প্রীত হইয়া উহাঁকে 'মুদ্রা-মুনি' উপাধি প্রদান করিলেন। প্রায় দুই শতাব্দী হইল, উক্ত ভূম্যধিকারীর বংশ ঐ নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। সাধারণ দানশীলতায় এবং দেব-সেবায় মুক্ত-হস্ততা প্রযুক্ত, বহুকাল পর্য্যন্ত উক্ত বংশীয়েরা তাঁহাদিগের বংশের মর্য্যাদা ও বংশীয় উপাধির সার্থকতা করিয়াছিলেন। এইরূপ কথিত আছে যে, বঙ্গদেশ-মধ্যে অতি অল্পই খ্যাতনামা দেবালয় দেখিতে পাওয়া যায়, যেখানে উহাঁদের দেবভক্তির উপহার এবং দানশীলতার পরিচয় প্রদত্ত হয় নাই।

মাহেশস্থ জগন্নাথ-দেবের সেবার জন্য তাঁহারা প্রচুর পরিমাণে দান করিয়াছেন; এমন কি, তাঁহাদিগের প্রদত্ত ভূম্যাদিই জগন্নাথদেবের ব্যয়ভার-নির্ব্বাহের জন্য প্রধান উৎপাদক সম্পত্তি। মাহেশ, জগন্নাথপুর এবং অন্যান্য গ্রাম দেবত্তর-স্বরূপ প্রদান করা হয়; এবং ঐ সকল সম্পত্তির আয়ে জগন্নাথদেবের ব্যয় হইয়া থাকে, ও অধিকারীগণেরও ভরণ-পোষণ হইয়া থাকে। এই কারণে এবং জগন্নাথদেবের মন্দির উক্ত ভূম্যধিকারীদিগের জমীদারী-মধ্যে স্থাপিত বলিয়াই, প্রত্যেক বৎসরে জগন্নাথ-দেবের স্নানযাত্রা-উৎসবের সময়, যে পর্য্যন্ত না সেই বংশীয় প্রধান ব্যক্তি আসিয়া আজ্ঞা দেন, সে পর্য্যন্ত ঐ উৎসব বন্ধ থাকে। উক্ত বংশীয় রাজা হরিশ্চন্দ্র তাঁহার এই বংশীয় সম্মানের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। আর সেইহেতু, এই উপলক্ষে, নানা দিগ্‌দিগান্ত হইতে সমাগত লোকারণ্যের মধ্য দিয়া নিয়মিতরূপে ছয় জন ঘোড়-সওয়ার ও বহুসংখ্যক লোকজন পশ্চাতে করিয়া, তিনি অশ্বারোহণে আগমন করিতেন।

জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার বিষয় বলিতে গেলে, আর একটী বংশের ইতিহাস সন্নিবেশিত না করিলে বিবরণটী অসম্পূর্ণ থাকে। সেই জন্যই এস্থলে আমরা তদ্বংশের ইতিহাসটিও বিবৃত করিতে বাধ্য হইলাম। প্রায় অশীতি অথবা নবতি বৎসর বিগত হইল, কোম্পানির অধীনে লবণের ব্যবসায়ের একচেটিয়া কার্য্যে শ্রীরামপুরস্থ একটী তিলিবংশ অত্যন্ত সামান্য অবস্থা হইতে অগাধ ধনের অধীশ্বর হইয়া উঠে। ঐ গ্রামস্থ কোন ব্যক্তির নিকট শুনা যায় যে, তাঁহাদিগের পিতামহগণ তদ্বংশীয় ধনাধিকারীর পিতামহকে সূতাপূর্ণ বাজরা মাথায় করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে, এবং উক্ত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া মাসে চারি পাঁচ মুদ্রা উপায় করিয়া আনন্দিতচিত্তে কালযাপন করিতে দেখিয়াছেন। ইহারা দুই একবার যদিও আঢ্যভাব দেখাইয়াছিল বটে; কিন্তু সাধারণতঃ বলিতে গেলে অবিরোধিতা, সজ্জনতা এবং নম্রতা-স্বভাব হেতু ইহাদিগের উত্থান-বশতঃ ইহাদিগের প্রতি লোকের যে হিংসাভাব ছিল, এক্ষণে ক্রমশঃ তাহার লোপ হইয়া আসিয়াছে। কালক্রমে সেওড়াফুলির রাজাদিগের বৃহৎ জমীদারী বিভাগ হইয়া যায়। তাঁহাদের যে শাখা বালিগ্রামে আসিয়া বসতি করেন, তাঁহারা ঐ বিভক্ত জমিদারীর মধ্যে এক অংশ প্রাপ্ত হয়েন। এই শাখার স্বত্বাধিকারের এক অংশ জমীদারী উপরোক্ত তিলিদিগের নিকট বন্ধক দেওয়া হয়। অন্যান্য দেশের ন্যায় এতদ্দেশেও প্রাচীন-অভিজাত ধনীদিগের অপব্যয়িতা-প্রযুক্ত, তাহাদিগের সম্পত্তি ক্রমশঃ বাণিজ্য-ব্যবসায় দ্বারায়

সমাজের নিম্নোস্তরোত্থিত আধুনিক ধনীদিগের হস্তগত হইতেছে, ইহা কাহারও অবিদিত নাই। সেই নিয়মানুসারে সেই বন্ধকী সম্পত্তি এককালীন তিলিদিগের স্বত্বাধিকারে আইসে। যে ভূমি জগন্নাথদেবকে প্রদত্ত হয়, তাহাও ঐ অংশভুক্ত থাকায়, তিলিরাই উহার জমীদার হইল। তিলিরা বিপুল ধনের অধিকারী হইলেও, উহাদিগের সামাজিক নিম্নপদ-বশতঃ সেওড়াফুলির প্রাচীন বংশাপেক্ষা সাধারণ কর্ত্তৃক উহারা মান্যে-গণ্যে বহু পরিমাণে নীচ বলিয়া পরিগণিত হইত। একদা কুক্ষণে ঐ তিলিরা আপনাদিগকে জমীদার ভাবিয়া, ধৃষ্টতা-সহ জগন্নাথদেবের স্নানের আজ্ঞা দিতে কৃতসঙ্কল্প হয়; এবং অধিকারীদিগকে কিঞ্চিৎ উৎকোচ প্রদান করিয়া, এই ব্যাপারে তাঁহাদিগের মত করে। অধিক কি, এই তিলিদিগের কর্ত্তা জাঁকজমক-সহ স্নানাজ্ঞা প্রদানে অগ্রসরও হন; এবং তাঁহার আজ্ঞা প্রদানমাত্রই অধিকারীগণ জগন্নাথদেবের মস্তকে বারিধারা বর্ষণ করে। কিন্তু এই ব্যাপার দর্শনে সমাগত জনস্রোত সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। এই সময়ে সেওড়াফুলি-রাজবংশীয় রাজা হরিশ্চন্দ্র তাঁহার সহকারী ব্যক্তিগণ-সহ মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন; পথিমধ্যে প্রস্থানোন্মুখ লোকস্রোতের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, সমস্ত বিষয় অবগত হইলেন। তাঁহার বংশের অংশাধিকারে সূতা-বিক্রেতার পুত্র ধৃষ্টতা-সহ হস্তক্ষেপ করিয়াছে শুনিয়া তিনি যৎপরোনাস্তি কোপাবিষ্ট হইলেন; এবং তৎক্ষণাৎ তিনি মন্দিরে উপস্থিত হইয়া প্রধান পুরোহিতদিগের পদ বন্ধন করিয়া নিজালয়ে লইয়া গেলেন ও তথায় তাঁহাদিগকে তিন দিবস কাল আবদ্ধ রাখিয়া যথোচিত অপমান করিলেন। এই ব্যাপার শুনিয়া নিকটস্থ অন্যান্য ভূম্যধিকারীগণ এবং শ্রীরামপুরস্থ ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ উক্ত রাজার সমীপে উপস্থিত হইয়া বিশেষ অনুনয়-বিনয় করাতে, তাঁহার ক্রোধের শান্তি হইল। তদনন্তর এরূপ কার্য্য ভবিষ্যতে আর কখন তাহারা করিবে না—অঙ্গীকার করিলে, তিনি পুরোহিতদিগকে অব্যাহতি দিলেন। সেই সময় হইতে অদ্যাবধি ঐ অঙ্গীকার আর ভঙ্গ হয় নাই।

বাঙ্গালা ১২৫৭ সালে মাহেশের শ্রীজগন্নাথ ও বল্লভপুরের শ্রীরাধা-বল্লভ উভয় দেবমূর্ত্তির অধিকারীগণের মধ্যে উপস্বত্ব লইয়া বিলক্ষণ বিসম্বাদ উপস্থিত হয়। ঐ বিরোধ উপস্থিত হওয়া প্রযুক্ত জগন্নাথের রথের মেলায় সমারোহের অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের স্নানযাত্রার ও আষাঢ় মাসের রথের মেলায় প্রায় বিংশতি সহস্র লোক বহু দূরদেশ হইতে জগন্নাথ-দর্শনাভিলাষে মাহেশে সমাগত হইয়া থাকে। এই উপলক্ষদ্বয়ের মধ্যে স্নানযাত্রায় অধিক জনতা হইয়া থাকে। জগন্নাথের অধিকারীগণ স্নানযাত্রার দিবসে সহস্র সহস্র মুদ্রা কেবল প্রণামীতে লাভ করিয়া থাকেন। রথযাত্রার মেলা যদিও এক সপ্তাহকাল ব্যাপিয়া থাকে, এবং নানা জাতীয় দ্রব্যাদি সমাগত লোকেরা ক্রয় করিয়া থাকে, তথাপি স্নানযাত্রা অপেক্ষা উহা লাভকর নহে।

পরিশেষে জগন্নাথদেবের সেবাইত পূর্ব্বোক্ত কমলাকর পিপলাইয়ের বংশ-সম্বন্ধীয় দুই একটী কথা বলিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, কমলাকর পিপলাইয়ের এক কন্যা থাকে; এবং ঐ কন্যা বিবাহোপযোগী হওয়াতে তিনি বিশেষ চিন্তিত হন। একে কষ্ট শ্রোত্রিয় তাহাতে সেবাইত ব্রাহ্মণ, কেহই বিবাহ করিতে চাহে না। এই চিন্তায় তিনি অন্তরে অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, জগন্নাথদেবের নিকট 'হত্যা' দিলেন। ইহাতে এই প্রত্যাদেশ হইল যে,

স্বয়ং যজ্ঞেশ্বর পণ্ডিত আসিয়া তোমার কন্যাকে বিবাহ করিবেন। এই সময়ে যজ্ঞেশ্বর পণ্ডিত গঙ্গাস্নান-মানসে আগমন করিতেছিলেন; পথি-মধ্যে তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ হইল যে,তোমার আর অধিক দূরে যাইবার প্রয়োজন নাই, নিকটস্থ মাহেশ-ঘাটে যাইয়া কমলাকর পিপ-লাইয়ের কন্যাকে বিবাহ করিবে। তিনি নিকটস্থ গ্রামে আসিয়া কমলাকরের সন্ধান করিতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে কমলাকরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল; পরিচয় হওয়াতে উভয়ের প্রত্যাদেশ একই হইল। এদিকে আবার ঘটকচূড়ামণির প্রতি উক্ত বিবাহ সংঘটন করিয়া দিবারও প্রত্যাদেশ হইয়াছিল। এইরূপে বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। সেই অবধি উক্ত পিপলাইবংশ শুদ্ধ শ্রোত্রিয়-বর্ণ মধ্যে গণিত হইল; এবং কুলীনগণ অদ্যাবধি তাঁহাদিগের গৃহে বিবাহ করিতেছেন। ঐ পিপলাইবংশকে শুদ্ধ শ্রোত্রিয় মধ্যে গণ্য করিবার জন্য ঘটককেও প্রত্যাদেশ হইয়াছিল।

রেসমের চাষ।

রেসমের ন্যায় লাভকর ব্যবসা দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। দরিদ্র কৃষক শ্রেণীর পক্ষে তুঁতের চাষ করা, মধ্যবর্ত্তী লোকের পক্ষে কোয়া উৎপন্ন করিয়া বিক্রয় করা, অপেক্ষাকৃত ধনীগণের পক্ষে কোয়া খরিদ করিয়া তাহা হইতে সূতা প্রস্তুত করা, এবং বড় বড় ধনী-দিগের পক্ষে কল আনয়নপূর্ব্বক বস্ত্রাদি প্রস্তুত করা বা স্থানে স্থানে সূত্রাদি যোগান দেওয়া প্রভৃতি উপযুক্ত। দশজন শিক্ষিত ভদ্র মিলিয়া যৌথ-কারবারে এই ব্যবসা করিলে কোন স্থানে,কিরূপ প্রণালীতে, কত টাকা লাভ হইতে পারে, ইত্যাদির একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নেদিতেছি।

প্রথমতঃ।—কোন্ কোন্ স্থানে এই ব্যবসায় উপযুক্ত? রেসম-কীটের খাদ্য তুঁতপাত যে যে স্থানে জন্মাইতে পারে,সেই স্থানেই এউ ব্যবসা চলে। বঙ্গের ২।১টী জেলা ব্যতীত প্রায় সর্ব্ব-ত্রই উহা জন্মিতে পারে। তন্মধ্যে বর্দ্ধমান, বীরভূম, মালদহ, মুরশিদাবাদ, বগুড়া এবং রাজসাহীতেই অপেক্ষাকৃত অধিক জন্মে। যে জমিতে বৃষ্টির জল অধিকক্ষণ আবদ্ধ হইয়া থাকিতে না পারে এবং যাহার মৃত্তিকা দোয়াঁস, তাহাতেই ইহা উত্তমরূপে জন্মায়। এই কয়ে-কটী জেলার মধ্যে যেখানে এইরূপ জমি পাওয়া যায়, তথায় এই কারবার খুলিলেই বেশ চলিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ।—কিরূপ প্রণালীতে, কত টাকা মূলধন লইলে কিরূপ লাভ হইতে পারে? ১০০০৲। এক হাজার টাকা মূলধনে কারবার স্থাপন করিলে,ইহা ৫৲ টাকা করিয়া ২০০ অংশে বিভক্ত হইতে পারে। যদি কুড়ি বিঘা জমীতে তুঁতের চাষ করা হয়,তাহা হইলে উহাতে ব্যয় হইবে এইরূপ:—জমীর খাজনা (খারাপ জমী-তেও তুঁত হইতে পারে) ২০৲ টাকা,লাঙ্গল ২০৲ রোপণের জন্য তুঁতের জল ২০৲ রোপণ-কালীন কৃষাণের মজুরী ২০৲, জমীতে সার প্রভৃতি দেওয়ার ২০৲; মোট ১০০৲ টাকা। রেসম-কীট পালনের ঘর ১০০৲টাকা তাহার আসবাব ডালা প্রভৃতিতে ৪০৲টাকা। অর্থাৎ এই ২৪০৲ টাকায় আপাততঃ কারবারের ভিত্তি স্থাপন হইতে পারে এই ব্যবসা বার মাস চলিবে, এবং এক বৎসরে ১২ ক্ষেপ কোয়া প্রস্তুত হইবে। ২০ বিঘা জমীর পাতা খাইয়া ২০ ঘরা কীট স্বচ্ছন্দে রক্ষা হইতে পারে। কিন্তু তাহা না করিয়া ১০ বিঘা মজুদ রাখিয়া, ১০ ঘরা কীট পালন করা কর্ত্তব্য। কারণ, প্রথম ক্ষেপে ১০ বিঘার পাত নিঃশেষ হইলে, দ্বিতীয় মাসে অপর ১০ বিঘার কাজ চলিতে পারে; এবং তৃতীয় মাসে প্রথম মাসে যে জমীর পাত খরচ হইয়াছিল, তাহাতে পুনরায় পাত পাওয়া যাইবে। সুতরাং কারবার বন্ধ হইবে না। জমী ও আসবাবে যে ২৪০৲ টাকা খরচ হইল,ইহাও বার বার হইবে না; এক-বার জমী প্রস্তুত হইলে মধ্যে মধ্যে ঘাস পরি-ষ্কার ও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সার দেওয়া ব্যতীত আর কিছুই করিতে হইবে না। আসবাব-আদি যাহা প্রথমে প্রস্তুত হইবে, তাহাতেই অনেক দিন যাইবে। কার্য্য চালাইবার জন্য একজন শিক্ষিত লোক এবং ৫ জন মজুরের আবশ্যক। একজন শিক্ষিতের মাসিক বেতন ২০৲ টাকা এবং মজুরদের বেতন ৩০৲ টাকা হিসাবে, বৎসরে একুনে ৬০০৲ টাকা পড়িবে। যদিও ২৪০৲ টাকা প্রতি বৎসরের খরচ ধরা হয়, তাহা হই-লেও ৮৪০ টাকা মাত্র এক বৎসরের ব্যয় পড়িবে; এবং তাহাতে বার ক্ষেপ কোয়া প্রস্তুত হইবে।

এক্ষণে আয় কিরূপ হয়, দেখা যাউক। ১০ ঘরা পলুতে অন্ততঃ ১০ মণ কোয়া উৎপন্ন হইবে। সুতরাং বৎসরে ১২০ মণ কোয়া যে হইবে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহার মূল্য ন্যূনকল্পে ৪০৲ টাকা হিসাবে (সময়ে সময়ে ৬০৲ পর্য্যন্তও হয়) ৪৮০০৲ চারি হাজার আট শত টাকা হইবে। দুই এক ক্ষেপ পোকা নষ্টও হইতে পারে। যদি ১২ ক্ষেপের মধ্যে ৬ ক্ষেপ বাদ দিয়া (এরূপ কখনও হইতেই পারে না) ৬ ক্ষেপের লাভ ধরা হয়, তাহা হইলেও ২৫০০ আড়াই হাজার টাকা হইবে। ৮০০৲ আট শত টাকা ব্যয় করিয়া ২৫০০৲ আড়াই হাজার টাকা পাওয়া—এরূপ লাভকর ব্যবসা অতি অল্পই আছে বলিয়া বোধ হয়। অধিকন্তু ইহাতে যেরূপ হিসাব ধরা হইল, তাহাতে ইহা অপেক্ষা অধিক হইবারই সম্ভাবনা বই কখনই কম হইবে না। আর কেবল কোয়া বিক্রয় করা-তেই এইরূপ; সূতা প্রস্তুত করিলে আরও প্রচুর লাভ হইতে পারে। ফলতঃ এরূপ আশাতীত লাভজনক ব্যবসায়ে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ একান্ত প্রার্থনীয়।

অনুকরণ।

অনুকরণ অনেক সময় উন্নতির মূল। আমরা যদি একটি উন্নত জীবনের অনুকরণ করিতে পারি, তবে সে অনুকরণে আমাদেরও জীবন উন্নত হইবে। এই কারণে একব্যক্তিকে, অন্য ব্যক্তির গুণের অনুকরণে নিজে গুণী, জ্ঞানের অনুকরণে নিজে জ্ঞানী, বিদ্যার অনু-করণে নিজে বিদ্বান প্রভৃতি গুণসম্পন্ন হইতে দেখিতে পাই। আবার অনুকরণ অনেক সময় অবনতিরও মূল। কারণ, যেরূপ গুণের অনুকরণ করিলে গুণী হওয়া যায়, সেইরূপ দোষের অনুকরণ করিলেই দোষী হইতে হয়। এক ব্যক্তির গুণের অনুকরণ করা তত সহজ নহে; কিন্তু দোষের অনুকরণটি সহজেই অভ্যস্থ হইতে পারে। কবিবর লং ফেলোর—

"Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime;
And, departing, leave behind us
Foot-prints on the sands of time!—"

এই মহান উপদেশ কয়জন পালন করিতে সমর্থ? সেই foot-prints কয়জন অনুকরণ বা অনুসরণ করিতে সক্ষম হন? আর, একজন চরিত্রবিহীন বিলাসী বাবুর অনুকরণ করা কত অনায়াসলব্ধ! কোন কষ্ট নাই, বিরক্তি নাই, দেখিতে দেখিতে—হাসিতে হাসিতে সে অনুকরণ অভ্যস্থ হইয়া যায়! তাই বলিতে-ছিলাম যে, অনুকরণ উন্নতি ও অবনতি এই উভয়েরই মূল।

কোন বিষয় অনুকরণ করার পূর্ব্বে তাহা অনুকরণীয় কি না, তাহা বিশেষরূপে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই যে, অনুকরণশীল ব্যক্তির সে হিতাহিত-জ্ঞান প্রায়ই থাকে না। মনুষ্য-চরিত্র নিষ্কলঙ্ক নহে; গুণ ও দোষ উভয়ই মনুষ্যে মিশ্রিত। কিন্তু অনুকরণশীল ব্যক্তি যখন সেই চরিত্র অনুকরণ করিতে যায়, তখন প্রথমেই

দোষের ভাগ অনুকরণ করিয়া বসে। কারণ, গুণ অপেক্ষা দোষের ভাগ অনুকরণ করা সহজ। আর এক কারণ, অনুকরণ-উন্মত্ততা জন্মাইলে দোষগুণ বিচার করিবার ক্ষমতা তখন থাকে না।

মনুষ্য-চরিত্র-সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, জাতীয় চরিত্র-সম্বন্ধেও তাহা বলা যাইতে পারে। আমরা ইংরাজজাতির অনুকরণ করিতে গিয়া, প্রথমেই তাহাদের দোষের ভাগ অনুকরণ করিয়া ফেলিয়াছি। আবার অনেক স্থলেই সেই দোষের ভাগকে দোষ বলিয়াও স্বীকার করি না। ইংরাজজাতির যে সকল মহৎ গুণ আছে, তাহা দেশীয়দিগের মধ্যে কয় জন ব্যক্তি অনুকরণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন? ইংরাজের ন্যায় উন্নতিশীল, সৎসাহসী, স্বদেশহিতৈষী, স্বার্থত্যাগী, সমদর্শী, বাঙ্গালিদিগের মধ্যে কয় জন দেখিতে পাওয়া যায়? কিন্তু ইংরাজ যে সর্ব্বভুক্, মদ্যপায়ী, ম্লেচ্ছাচারী, স্ত্রীপুরুষ-ভেদাভেদ-বিধ্বংশী; সেই কারণ আমাদের অনুকরণশীল বাঙ্গালী বাবুরাও প্রায় সকলেই সর্ব্বভুক, মদ্যপায়ী, ম্লেচ্ছাচারী ও স্ত্রীপুরুষ-ভেদাভেদ-বিধ্বংশী। বাস্তবিকই এই অনুকরণ-চক্রে পড়িয়া এ দেশের যে কি সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা ভাবিতে গেলে শরীরের রক্ত শুকাইয়া যায়। ক্রমে ক্রমে আমরা জাতীয় জীবন, জাতীয় ভাব, জাতীয় আচার-ব্যবহার—রীতি-নীতি, সকলই হারাইতে বসিয়াছি। আর যে জাতির এই সকল অমূল্য সম্পত্তি অপহৃত হয়, সে জাতির আর থাকে কি? সে জাতির যে অস্তিত্ব পর্য্যন্ত থাকে না, এ কথাই কি সর্ব্ববাদীসম্মত নহে?

আমাদের যাহা কিছু আছে, সে সকলই যে ভাল, তাহা আমরা স্বীকার না করিতে পারি। হইতে পারে, তাহার কোন কোনটী এ কালোচিত নহে। কিন্তু সেগুলি যে আমাদের জাতীয় লক্ষণ (Characteristics), তাহাতে কোন সন্দেহ আছে কি? সেগুলি রক্ষা করিতে পারিলে যে আমাদের জাতীয় জীবন রক্ষা করা হয়, সে বিষয় কি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে?

মনে করুন, মানুষের ল্যাজ নাই; কিন্তু হনুমানের ল্যাজ আছে। সুতরাং ল্যাজই হনুমানের বিশেষত্ব। এখন মানুষ যদি এই ল্যাজ ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করে, অথবা কেহ যদি সেই ল্যাজ ছিঁড়িয়া আনিয়া আপনার অঙ্গের যথাস্থানে লাগাইয়া দেয়; তবে তাহাদিগকে মানুষ বলিব, না হনুমান বলিব? ল্যাজযুক্ত মানুষ যেমন মানুষ নামের অযোগ্য, সেইরূপ স্বজাতীয় আচার-ব্যবহার-হীন মানুষও জাতীয় নামের সম্পূর্ণ অযোগ্য। আমরা W. Rooder Esqr.কে, Mr. Bonerjiকে, কিম্বা F. B. Chandorকে কিরূপে বাঙ্গালির সন্তান বলিয়া স্বীকার করিতে পারি? যাহারা জাতীয় আচার-ব্যবহার-বিহীন, তাহারা কি স্বজাতিদ্রোহী নহে? এরূপ স্বজাতিদ্রোহীই জাতির কলঙ্ক। আর, অনুকরণই এইরূপ কলঙ্কের ফল। এরূপ অনুকরণের আর এক ফল আবার বড়ই রহস্যজনক; যাহারা ভিন্ন জাতীয় আচার-ব্যবহার অনুকরণ করিয়া জাতীয় জীবন নষ্ট করিবার চেষ্টা করে, তাহাদের স্বতঃই "দাঁড়কাক ও ময়ূরপুচ্ছের" দশা ঘটে।

আর এক প্রকার অনুকরণ এদেশে বড়ই প্রবল। সে অনুকরণ ব্যবসায়ে। তাহার নামান্তর জুয়াচুরি। যখন 'অনুসন্ধানের' জন্য এই প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে, তখন এস্থলে আমরা সে কথাও উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। যাহার যে জিনিসের কাট্‌তি অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, জুয়াচোর লোকে সেই জিনিসেরই অনুকরণ করিয়া জুয়াচুরি করে। 'অনুসন্ধানের' পাঠকের নিকট সেরূপ অনুকরণের দৃষ্টান্তও অনেক দেখান হইয়াছে। এই এক 'সুধাসিন্ধু' প্রভৃতি ঔষধের কাট্‌তি দেখিয়া জুয়াচোরগণ কিরূপ শত শত অনুকরণ করিয়া

করিতেছে, তাহা আমরা 'অনুসন্ধানের' পাঠকগণকে সেদিন স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছি। কেবল প্যাটেণ্ট ঔষধে নহে; এইরূপ শত শত অনুকরণ সকল ব্যবসাতেই চলিতেছে। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, এরূপ অনুকরণ সহজে দমন করিবার উপযুক্ত আইন এখনও এ দেশে হয় নাই। আর কেবল দণ্ডবিধি আইনের সাহায্যে এই সকল অনুকরণ নিবারণ করাও তত সহজ নহে। সম্প্রতি Merchandice Act নামে যে আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে বিলাতি জিনিসের বিলাতি অনুকরণের প্রতিই বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। দেশীয় জিনিষের দেশীয় অনুকরণ নিবারণের কোন সহজ উপায় গবর্ণমেণ্টের বিধান করা এখন বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। তাহা না করিলে দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্য-রক্ষা বড়ই দুষ্কর হইবে।

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

নূতন জুয়াচুরি-ফন্দি।

শ্রীদেবেন্দ্র লালা, ১০ নং ডিহি ইটালি রোড, পোষ্টাফিস নাপিতবাজার, কলিকাতা—এই নাম ও ঠিকানা হইতে "ডামর-তন্ত্র-সারসংগ্রহ" কুমার দেবেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ, ১২।৬ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, সিমলা, কলিকাতা—এইনাম ও ঠিকানা হইতে "ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডার বা তন্ত্রমন্ত্রসংগ্রহ"; এবং শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ দাস ঘোষ, ১০ নং ডিহি ইটালী রোড, পোষ্টাফিস নাপিতবাজার, কলিকাতা,—এই নাম ও ঠিকানা হইতে "ইন্দ্রজাল-কল্পতরু";—এই তিন রকমের বিজ্ঞাপন আজকাল মফঃস্বলে বিতরিত হইতেছে। তিনখানি বিজ্ঞাপনেরই উপরে লেখা,—

"সত্য বিজ্ঞাপন! সত্য বিজ্ঞাপন!!
সত্য বিজ্ঞাপন!!!"

ব্যাপারটা কিন্তু পূরা জুয়াচুরীতেই পূর্ণ। আমরা এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়াও অনেক তথ্য অবগত হইয়াছি। অদ্য সমস্ত বিষয় খুলিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। পাঠককে সাবধান করিবার জন্য সংক্ষেপে দুই এক কথা বলিয়া রাখি। প্রথমেই এ সম্বন্ধে একখানি পত্র দেখুন। পত্রখানি এই ঃ—

শ্রীশ্রীদুর্গা। বেহালা,
১লা জানুয়ারী, ১৮৯০।

শ্রীযুক্ত 'অনুসন্ধান' পত্রিকার সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

আজকাল সভ্যতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কত প্রকার নূতন নূতন প্রতারণার কৌশল আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহার গণনা করা যায় না। আপনার পত্রিকার মধ্যে মধ্যে প্রতারকগণের যথার্থ পরিচয় দিয়া লোক সাধারণের মহোপকার সাধন করিতেছেন; সেজন্য আপনি আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র। সম্প্রতি এইরূপ একটী ঘটনায় বেহালার নিকটবর্ত্তী মুরাদপুরগ্রামবাসী ননিলাল ঘোষ নামক। আপনি ও আপনার গ্রাহকগণ অবগত আছেন যে, কিছুদিন পূর্ব্বে "ইন্দ্রজাল" নামদিয়া এক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা নামেও "ইন্দ্রজাল" এবং কার্য্যেও গ্রাহকগণকে ইন্দ্রজালে বদ্ধ করিয়াছিল। ইহার প্রকাশক কে, আপনি কি জানিতে চান? ইনি, ঐ পূর্ব্বোল্লিখিত ননিলাল ঘোষ; কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, ইহাঁর কল্পিত নাম। ইহাঁর ভ্রাতা রাজেন্দ্রলাল ঘোষ 'রাজকন্যার গুপ্তকথার' সম্পাদক। সম্প্রতি উক্ত ননিলাল ঘোষ "উড্ডীশ রত্ন-ভাণ্ডার" বা "বিজয়ী তন্ত্রমন্ত্রসারসংগ্রহ" নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন; সে পুস্তকখানি আর কিছুই নহে; কেবলমাত্র সেই 'ইন্দ্রজালের' টাইটেল-পত্রটী পরিবর্ত্তিত। বড় দুঃখের বিষয় যে, আজও এরূপ জুয়াচুরি পুলিশ বা ম্যাজিষ্ট্রেটের গোচর হয় নাই।

এই ননিলাল কখন গোবিন্দলাল, কখন পূর্ণানন্দস্বামী, কখন উপেন্দ্রকৃষ্ণ, কখন বা কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ প্রভৃতি নাম গ্রহণ-পূর্ব্বক নানাপ্রকার প্রতারণার জাল বিস্তার করিতেছেন। পাছে কোন নিরীহ গ্রাহক না জানিয়া এই জালে পড়েন, সেইজন্য আমার বিশেষ অনুরোধ, আপনি এই পত্রখানি আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এই ননিলালের কলিকাতার ঠিকানা—১৬১ নং অপার সার্কুলার রোড, বাগবাজার পোঃ অঃ, কলিকাতা; কিন্তু সেখানে কোন গোপনীয় কারণ-বশতঃ চিঠিপত্র লইতে সাহস না করিয়া সেগুলি "বেহালা" পোঃ অঃ হইতে বিলি করিতে বলেন। সম্প্রতি একটী গ্রাহক বাগবাজার পোঃ অফিসে সন্ধান লইয়া বেহালাতে তাহার অনুসন্ধানে আইসেন; এখানে শুনিলেন যে, ঐ কয়টী কল্পিত নামের লোক মুরাদপুরগ্রামে নাই। এখান-

কার পোষ্ট মাষ্টার বাবু বেহালানিবাসী। মুরাদপুর বেহালার অন্তর্গত একটী গ্রাম, সুতরাং সেখানকার সকল লোককেই তিনি চিনেন। তিনি বলিলেন যে, ঐ সকল নাম আমি কখনও শুনি নাই। তৎপরে তিনি সবিশেষ অনুসন্ধান করতঃ সন্দেহপ্রযুক্ত কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ নামধারী ব্যক্তির অপর যে দুই নাম অর্থাৎ গোবিন্দ লাল ও পূর্ণানন্দ স্বামী এই দুই নামের পত্রাদি বিলি করিতে না পারিয়া পোঃ অফিসের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের অনুমতি চাহিয়াছেন। সে যাহা হউক, ম্যাজিষ্ট্রেট বা পুলিস এ বিষয় বিশেষ অনুসন্ধান করতঃ এক্ষণে দোষীকে শাস্তি দিয়া সাধারণের মহোপকার সাধন করুন।

বশম্বদ

শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ রায়,
শিক্ষক, বেহালা ইংরাজি-বিদ্যালয়।

উপরোক্ত 'ইন্দ্রজাল-কল্পতরুর' বিজ্ঞাপন-দাতা উপেন্দ্রকৃষ্ণ দাস ঘোষ মহাশয় কে, পত্রে তাহার কতকটা পরিচয় পাইলেন; আর দাস ঘোষ মহাশয়ের ঠিকানা ধরিলে "ডামর তন্ত্র-মন্ত্র-সার-সংগ্রহের" বিজ্ঞাপন-দাতা 'শ্রীদেবেন্দ্র লালা' যে কে, তাহাও জানিতে পারিবেন। আবার আমরা বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে, "ডামর তন্ত্র-মন্ত্র সার-সংগ্রহের" বিজ্ঞাপনের সহিত 'ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডার বা মন্ত্র-তন্ত্র সংগ্রহের' বিজ্ঞাপনের একটী বর্ণেরও তফাৎ নাই। অর্থাৎ এ উভয় বিজ্ঞাপনেই পুস্তকের নাম ভিন্ন সকল বিষয়েরই সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। ইহাতেই বুঝা যায় যে, নাপিতবাজার পোষ্টাফিস, ১০নং ডিহি ইটালি রোডের শ্রীদেবেন্দ্র লালাও যে ব্যক্তি, আর ১২।৬ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, সিমলা হইতে "ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডার বা তন্ত্র-মন্ত্র-সার-সংগ্রহের" বিজ্ঞাপনদাতা কুমার দেবেন্দ্রনাথ দাস ঘোষও সেই ব্যক্তি। এ ব্যক্তি কে, তাহা কি এখন আর বলিতে হইবে?

আমরা ইতিপূর্ব্বে 'অনুসন্ধানে' কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণের বহু জুয়াচুরী-লীলার পরিচয় দিয়াছি। ভাবিয়াছিলাম, জুয়াচোর উপেন্দ্রকৃষ্ণ জুয়াচুরী ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, জুয়াচুরী ত্যাগ করা দূরে যাউক, তিনি পুরাদেমেই এই কাজ চালাইতেছেন; এবং মফঃস্বলের নিরীহ লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছেন।

গভর্ণমেণ্ট কেমন করিয়া এ সমস্ত জুয়াচুরী জানিয়া-শুনিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, আমরা জানিতে পারি না। ভারতীয় দণ্ডবিধি-আইনে ৪১৭ ধারার প্রতারণার অপরাধে মকর্দ্দমাগুলির ভার গভর্ণমেণ্টের নিজের হস্তেই লওয়া উচিত। নতুবা এখন যে ভাবে এ জুয়াচুরী-কাণ্ড সব চলিতেছে, তাহাতে সত্বরেই দেশের ঘোর সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে।

আন্দুলবেড়িয়ার আর এক কীর্ত্তি।

গত ২রা পৌষের 'বঙ্গবাসীতে' এই বিজ্ঞাপনটী বাহির হইয়াছে,—

"বিনামূলে ও বিনা ডাকলাশুলে

যিনি পোষ্টকার্ডে সমালোচক পত্রিকার গ্রাহক হইবেন, তাঁহাকে অগ্রে 'রাজকন্যার গুপ্তকথা' বিনামূল্যে পাঠাইব। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, অধ্যক্ষ, কৃষ্ণগঞ্জ পোঃ, নদীয়া।

বিজ্ঞাপনটী পড়িয়া আমাদের বড়ই কৌতূহল জন্মিল। পোষ্টকার্ড লিখিলেই একখানি পুস্তক পাওয়া যায়—তাহাও আবার 'রাজকন্যার গুপ্ত কথা'—মন্দ তামাসা নহে! 'রাজকন্যার গুপ্ত কথার' কথা আমরাও যে নেহাত জানি না, এমন নহে। এক 'রাজকন্যার গুপ্ত কথার' পরিচয় জুয়াচোর রাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষের জুয়াচুরীতে কতক তো 'অনুসন্ধান নেই' প্রকাশ হইয়াছে! আর এক 'রাজকন্যার গুপ্তকথা' নদীয়া জেলার আন্দুলবেড়িয়ার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জুয়াচুরী-কাণ্ড আমাদের জানা আছে। তা' এ রাজকন্যাটি কার? জানিতে সহজেই আমরা উৎসুক হইলাম। একদিন মাত্র আমরা অনুসন্ধানের সময় পাইয়াছি। কারণ, শনিবারে 'বঙ্গবাসী' বাহির হইয়াছে; আর পরদিন রবিবারেই 'অনুসন্ধান' বাহির হইবে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা জানিতে পারিতেছি যে সতীশচন্দ্র বসুর এই বিজ্ঞাপন-কাণ্ডে 'আন্দুল

বেড়িয়ার' মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই এক প্রধান অঙ্গ-বিশেষ। আন্দুলবেড়িয়ার নামটা জুয়াচুরীর অভিধানে পরিচিত হইয়া গিয়াছে। তাই বুঝি, আন্দুলবেড়িয়ার ছাপাখানা কৃষ্ণগঞ্জে উঠাইয়া আনিয়া নূতন অভিনয়ের সূত্রপাত হইতেছে? ছাপাখানা আজিও উঠিয়া আসে নাই; কিন্তু বিজ্ঞাপন ইহার মধ্যেই বাহির হইয়াছে। চিঠিপত্রও কিন্তু কৃষ্ণগঞ্জ-ষ্টেসনে বিলি হইতেছে না; তাহা আজিও আন্দুলবেড়িয়াতেই যাইতেছে। উপরোক্ত বিজ্ঞাপনে স্পষ্টতঃ কোন জুয়াচুরীর কথা প্রকাশ না থাকিলেও, ইহার তলে তলে কোন কু-অভিসন্ধির অভিপ্রায় থাকিবার সম্ভাবনা—এই বিবেচনাতেই, আমরা পাঠকগণকে দিন থাকিতেই সতর্ক করিতেছি। তাঁহারা যেন এ-সম্বন্ধে একটু বুঝিয়া-সুঝিয়া কার্য্য করেন, এই আমাদের অভিপ্রায়।

পরেশনাথ মিত্রের

রত্নগৃহের জুয়াচুরী-কাণ্ড।

আসাম—ধুবড়ীতে 'রত্নগৃহের' বিজ্ঞাপন-দাতা পরেশনাথ মিত্রের বিচার আজিও শেষ হয় নাই। গতবারে আমরা ফরিয়াদী-পক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দীর মোটামুটি বিবরণ পাঠকগণকে জানাইয়াছি। সে বিবরণ তাড়াতাড়িতে ছাপাইতে হইয়াছিল বলিয়া, তাহার দুই এক স্থানে সামান্য এক-আদটু ভুল আছে। কিন্তু তাহাতে মূল বিষয়ের কোন ক্ষতি হয় নাই।

সাক্ষীর এই সকল জবানবন্দী গ্রহণের পর, গত ৩১এ ডিসেম্বর ধুবড়ীর এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার মিঃ ষ্টাইনবরা বাহাদুরের আদালতে আবার এ মকর্দ্দমা উঠে। কলিকাতা-পুলিস-আদালত হইতে কমিশনে-গৃহীত সাক্ষীর জবানবন্দী সেই দিন পেশ হয়। অধিকন্তু, এই মকর্দ্দমা আরম্ভের পূর্ব্বে, শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র দত্ত আমাদিগকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, অর্থাৎ অনুসন্ধানার্থ আমরা কলিকাতা-পুলিসের ডেপুটি-কমিশনারের নিকট যে পত্র প্রদান করিয়াছিলাম; বর্ত্তমান মকর্দ্দমার বিচারক শ্রীযুক্ত এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার বাহাদুরের পত্র-অনুসারে কলিকাতা-পুলিসের ডেপুটি-কমিশনার বাহাদুর সে পত্রও ধুবড়ীতে পাঠাইয়া দেন; আর, সেদিন আদালতে ফরিয়াদী আনন্দচন্দ্র দত্ত সেই পত্রখানি তাঁহারই প্রেরিত পত্র বলিয়া নিশান-দিহি করেন।

ইহার পর হাকিম বাহাদুর ফরিয়াদী-পক্ষের উকীল মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে,—"আপনি আর কোন বিষয়ে কোনরূপ সাক্ষ্য-প্রমাণ দাখিল করিতে ইচ্ছা করেন কি?" তাহাতে ফরিয়াদী-পক্ষের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু বিষ্ণুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে,—"উপহার-দত্ত দাখিলী বোতাম যে গিল্‌টি করা পিতলের—সোণার নহে, ইহা সকলেই দেখিতেছেন ও আদালতও বুঝিতেছেন। কিন্তু আসামী যদি ইহাকে সোণার বোতাম বলিতে চাহেন, তাহা হইলে বোতাম-সম্বন্ধে একজন যাচাইকর সেকরার সাক্ষী দেওয়ার প্রয়োজন হইবে। তবে আসামী উহাকে পিতল বলিয়া মানিয়া লইলে, আর কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ দাখিল করিবার নাই।" তখন আদালতের উভয় পক্ষের উকীল, হাকিম এবং স্বয়ং আসামীও দাখিলী বোতামকে পিতলের গিল্‌টি বোতাম বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। কাজেই ফরিয়াদী-পক্ষ হইতে মকর্দ্দমা শেষ করা হইল।

এই সব সাক্ষী ও পত্রাদি দাখিল শেষ হইলে পরে, বিচারক এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার বাহাদুর আসামী পরেশনাথ মিত্রের জবাব গ্রহণ করিলেন। পরেশনাথ মিত্রের সে জবাবের অবিকল নকল এই ঃ—

পরেশনাথ বলিলেন,—"আমার নাম পরেশ-

নাথ মিত্র। আমার পিতার নাম বিনোদ-বিহারী মিত্র। আমি জাতিতে কায়স্থ। আমার ব্যবসা ছাপাখানার কাজ। হুগলী-জেলায় হরিপাল-থানার আটপুর-মৌজায় আমার বাটী। আমি এখন কলিকাতাতেই থাকি।" ইহার পর বিচারক এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার বাহাদুরের সহিত তাঁহার এইরূপ প্রশ্নোত্তর চলিল।

বিচারক।—এই "এ" চিহ্নিত হ্যাণ্ডবিল (রত্নগৃহের হ্যাণ্ডবিল) জারি করিয়াছ?

আসামী পরেশ।—হাঁ, করিয়াছি।

বিচারক।—আনন্দচন্দ্র দত্ত হইতে পোষ্টাপিস-যোগে টাকা পাইয়াছ?

আসামী পরেশ।—হাঁ পাইয়াছি।

বিচারক।—আনন্দ 'রত্নগৃহ' পাঠাইবার জন্য কোন চিঠি দিয়াছিল?

আসামী পরেশ।—হাঁ, দিয়াছিল। প্রথমে যে চিঠি।

বিচারক।—কেন 'রত্নগৃহ' পাঠাও নাই?

আসামী পরেশ।—রত্নগৃহ ছাপা হচ্ছিল।

বিচারক।—আর কোন কথা আছে?

আসামী পরেশ।—আর কোন কথা নাই।

আসামী পরেশনাথ মিত্রের নিকট হইতে এইরূপ জবাব গ্রহণ করিয়া বিচারক ষ্টাইনবরা বাহাদুর আসামীকে চার্জ্জ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন আসামীর পক্ষের উকীল শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস দাস তাহাতে দুই-একটী আপত্তি তুলিয়াছিলেন। কিন্তু সে সব অকা-আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া বিচারক বাহাদুর পরেশনাথকে এইরূপ চার্জ্জ করিলেন,—

"I, Alfred F. Stienberg, Magistrate 1st. class, hereby charge you Pares Nath Mitra as follows:—

That you on or about the 5th day of November, 1889, at Dhubri, District Goalpara, dishonestly induced Ananda Chandra Dutta to order of you the *Ratna-griha* and presents according to the handbill (A) and dishonestly induced him to pay you Re1-12 through the Post Office in part payment there-of and thereby cheated the said Ananda Chandra Dutt and thereby committed an offence punishible under Section 417 of the *Indian Penal Code* and within my cognizance and I hereby direct that you be tried on the said charge.

Dated at Dhubri, the 31*st of December*, 1889. } (Sd.) *A. F. Steinberg*, Magistrate."

ইহার ভাবার্থ এইরূপঃ—"আমি আলফ্রেড এফ. ষ্টাইনবরা, প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাপন্ন ম্যাজিষ্ট্রেট, এতদ্বারা তুমি—পরেশনাথ মিত্রকে নিম্নলিখিতরূপে চার্জ্জ করিতেছি।

যে, তুমি ১৮৮৯ সালের ৫ই নবেম্বর বা তন্নিকটবর্ত্তী কোন তারিখে গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত ধুবড়ী মোকামের আনন্দচন্দ্র দত্তকে অসদ্-অভিপ্রায়ে তোমার নিকট 'রত্নগৃহ' এবং উপহারাদি (এ)-চিহ্নিত হ্যাণ্ডবিল-অনুসারে পাঠাইতে প্রলোভিত করিয়াছ; এবং অসদ্ অভিপ্রায়ে তজ্জন্য আংশিকরূপে ডাকঘর-মারফতে তাহাকে ১৸০ এক টাকা বার আনা দিতে লওয়াইয়াছ; এবং এইরূপে সেই আনন্দচন্দ্র দত্তকে প্রতারণা-পূর্ব্বক ঠকাইয়াছ; এবং এইরূপে আমার এলাকা-মধ্যে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪১৭ ধারা-অধীন অপরাধ করিয়াছ; এবং এক্ষণে আমি তোমাকে উপরোক্ত অপরাধ-অনুসারে বিচারিত হইবার জন্য আদেশ করিতেছি।

তারিখ ধুবড়ী, ৩১এ ডিসেম্বর, ১৮৮৯। } (স্বাক্ষর) আলফেড এফ. ষ্টাইনবরা ম্যাজিষ্ট্রেট।"

আসামী পরেশনাথ মিত্র জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এক শত পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। কিন্তু বিচারক ম্যাজিষ্ট্রেটের ইংরাজি চার্জ্জটুকু বুঝিতে পারেন নাই। তাই তাঁহাকে বাঙ্গালায় চার্জ্জ বুঝাইয়া দেওয়া হইল। প্রথমতঃ পরেশনাথকে জিজ্ঞাসা করা হইল,—"তুমি এ অপরাধে অপরাধী কি না?" পরেশনাথ বলিলেন,—"আমি নির্দ্দোষী।"

তখন পরেশনাথের সাফাই তলব হইল। পরেশনাথ সেদিন এই সকল ব্যক্তিকে সাফাই সাক্ষ্য মানিলেন।—

১ম। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ পাল।
২য়। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।
৩য়। শ্রীরামচন্দ্র মল্লিক।
৪র্থ। শ্রীবিনোদবিহারী বসু।
৫ম। শ্রীযদুনাথ সান্যাল।
৬ষ্ঠ। শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায়।
৭ম। শ্রীভূতনাথ উকীল।
৮ম। শ্রীহরলাল সেঠ।
৯ম। শ্রীনারায়ণচন্দ্র দাস।

এই সকল সাক্ষীর জবানবন্দী কমিশনে কলিকাতায় লইবার জন্য পরেশনাথ দরখাস্ত করেন। তিনি যে সকল হেতুবাদ দেখাইয়া এই দরখাস্ত করেন, সেই হেতুবাদের কারণ আছে বুঝিয়া, ম্যাজিষ্ট্রেটও দরখাস্ত মঞ্জুর করেন।

সেদিন আদালতে আসামী পরেশনাথ রত্নগৃহের কতকাংশ দাখিল করিয়াছিলেন। সেই অংশটুকুর বিবরণ এই। সে অংশটুকু মোটে ডিমাই বার পেজী ৭ ফর্ম্মা। ঘেটে কাগজে ছাপা। কিন্তু পরেশনাথ অতি উৎকৃষ্ট সুন্দর কাগজে পুস্তক ছাপিয়া অতি উত্তমরূপে মুদ্রন-কার্য্য শেষ করিয়াছেন বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। তা' সে কথা এখন যাউক; আদালতেই সে কথার বিচার হইবে। আমরা পূর্ব্ব হইতে কোন মীমাংসা করিতে চাহি না।

এখন এই ৭ ফর্ম্মায় কি আছে, শুনুন। ইহার প্রথম হইতে ২৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত 'রামায়ণ।' ২৭ পৃষ্ঠা হইতে ৩৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত 'প্যারাডাইস লষ্ট।' ৪০ হইতে ৪৯ পর্য্যন্ত মাইকেলের 'মেঘনাদবধ কাব্য।' ৫০ হইতে ৬১ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত হোমারের "ইলিয়ড।' তাহার পর আবার নূতন ফর্ম্মায় ১ হইতে ১২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত 'উদ্ভিদ্ বিদ্যা।' তাহার পর আবার এক ফর্ম্মায় ১ হইতে ১২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'বিষবৃক্ষ।' এ ১২পৃষ্ঠাতেও 'বিষবৃক্ষ' শেষ হয় নাই। উপরোক্ত কয়খানি পুস্তকের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ-বধ' কাব্যের এবং শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বিষবৃক্ষ' পুস্তকের 'কপি-রাইট' পরেশনাথের নাই, তাহা আমরা জানি। শ্রীযুক্ত বঙ্কিম বাবু এমন কথাও বলিয়াছেন যে, তাঁহার প্রণীত পুস্তকের অংশ বা সার-সংগ্রহ কেহ ছাপিলে, তিনি সে প্রকাশকের নামে নালিশ করিবেন। এখন কার্য্যে তাঁহার 'বিষ-বৃক্ষ' অপরের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে; কি করিতে হইবে, তিনিই জানেন। আমাদের কথার সত্যাসত্য জানিতেঁ শ্রীযুক্ত বঙ্কিম বাবুর যদি প্রবৃত্তি হয়, তাহাহইলে তিনি এই 'রত্ন-গৃহের' জুয়াচুরী-মকর্দ্দমার দাখিলী কাগজ-পত্রের মধ্যে সিডিউল "এল" দেখিলেই সমস্ত বুঝিতে পারিবেন।

গত শনিবারে কলিকাতা-পুলিশ-আদালতে কমিশনে আসামীর পক্ষের সাফাই সাক্ষী লইবার জন্য দিনধার্য্য ছিল। কিন্তু সেদিন মকর্দ্দমা হয় নাই। আগামী মঙ্গলবারে মকর্দ্দমা হইবার কথা আছে। সেদিন যাহা হয়, পাঠক ক্রমে জানিতে পারিবেন। আগামী ১৭ই জানুয়ারী তারিখে ধুবড়ীতে মকর্দ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবার দিন ধার্য্য আছে। তাহার ফলাফলও আগামীবারে জানান যাইবে।

এই মকর্দ্দমায় শ্রীমান ধীরেন্দ্রনাথ পাল, রামচন্দ্র মল্লিক প্রভৃতিকে সাক্ষীর শ্রেণীতে পাইয়া আমাদের মনে মনে একটু আহ্লাদ হইয়াছে। জেরা-সওয়ালে ইহাঁদের পরিচয়

যদি কতক পরিমাণে পাঠকবর্গকে দিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের শ্রম কতকটা সার্থক হইবে। আর এই চেষ্টাতেই আমরা আজ-কাল ফিরিতেছি।

তোমায়-আমায়।

তোমায় আমায় ফুটিব বিজনে,
রচিব মধুর বিজন-গেহ।
বিজনে হাসিব, বিজনে শুখাব
জগতে জানিতে নারিবে কেহ।
জগতের ভাষা, যাবে না সেথায়,
ফুটিবে না সেথা কপট-গান।
নিশীথ আকাশ, তারকা-আঁখিতে
নারিবে দেখিতে একটী প্রাণ।
বিমল মলয়, নীরবে বহিবে,
স্বরগ-সুষমা ঝরিবে তথা।
বিমল আনন্দে, হইব বিভোর,
অস্ফুটে আমরা কহিব কথা।
জগতের দুখে, দুজনে কাঁদিব,
এখানে য'দিন ফুটিয়া থাকি।
ক্ষুদ্র মানবের আশাটুকু ছিঁড়ে
দেখাবো না তারে কঠিন আঁখি।
সরসীর তীরে তরুলতা-রাশ,
শিশির যেমন তাদের পাতে,
মলয়ের ঘায়ে ভয়ে ভয়ে শেষে
মিশায় জীবন সরসী-মাথে;
সেইরূপ হায় মরণের তীরে
শিশিরের সম মোদের প্রাণ!
প্রকৃতি-আঘাতে ঝরিয়া পড়িলে
মরণ-সাগরে ছুটাব বান!
জগতের মোরা থাকিবো না আর
শুখাবে তখন প্রভাত-আশা।
আবার আমরা জগতের পারে
দু'জনে মিলিয়ে বাঁধিব বাসা।
মোদের জীবন মিশিবে অনন্তে
আতঙ্ক উঠিবে অনন্ত-স্তরে।
ক্ষুদ্র দু'টী প্রাণ, শত-প্রাণ হবে,
মরণ মোদের জীবন-তরে!

কান্না।

এই আলোকান্ধকারময় জগতে, এই সুখ-দুঃখময়, হাসিকান্নাময় সংসারে সকলেই হাসে; সকলেই কাঁদে। কিন্তু মানুষের অদৃষ্টে কান্নার ভাগটা কিছু বেশী। মানুষ হর্ষে কাঁদে, বিষাদে কাঁদে, শোকে কাঁদে, সুখে কাঁদে, আপনার দুঃখে কাঁদে, পরের বেদনায় কাঁদে, ভালবাসায় কাঁদে, ভাবনায় কাঁদে, প্রেমে কাঁদে। সুতরাং মানুষের অদৃষ্টে কাঁদিবার ভাগই অধিক। এত অধিক যে, অনেক সময় ঠিক বোধ হয়, যেন কান্নাই মনুষ্যত্বের লক্ষণ। যে মানুষ কাঁদে না, কাঁদিতে জানে না, সে পাষাণ হৃদয়, সে মানুষ নয়। আবার অনেক সময় মনে হয়, ঈশ্বর কান্নার সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়াই আমরা বাঁচিয়া আছি। বাস্তবিকই যে কাঁদে না, হয় সে আহ্লাদে আটখানা হইয়া মরিয়া যায়; না হয়, শোকে জর্জ্জরিত হইয়া জীবনে জলাঞ্জলি দেয়। আজ আমাদের একজন প্রতিবেশী মৃত্যু-শয্যায় শায়িত। এক মাস হইল, তাঁহার পূর্ণবয়স্ক সচ্চরিত্র সুশিক্ষিত সর্ব্বপ্রশংসিত প্রিয় পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে। পুত্রশোকে জননী হাহাকার করিয়া রাত্রিদিন কাঁদিতেছেন; কাঁদিয়া-কাঁদিয়া বাঁচিয়া আছেন। কিন্তু অভাগা পিতা কাঁদিতে জানেন না; তাই গুমরে গুমরে অন্তর্দাহ সহ্য করিয়া, বোধ করি, অবশেষে তনু-ত্যাগ করেন। সুতরাং কান্না শোকের প্রধান সহচরী। যে শোকসন্তপ্ত হইয়া কাঁদিতে না পারে, তাহার প্রাণের আশা কম। আর যে পুরুষাবতার শোকের সময় না কাঁদিয়া অমনি অমনি সকলই সহ্য করিলেন, তিনি দেবতা কি পিশাচ, জানি না! হয় তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা আছে, না হয় ভিতর মানুষের হৃদয় নাই। মানুষ আহ্লাদে কাঁদে, একথা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে; হঠাৎ একটা বড় আনন্দের সংবাদ পাইলে মানুষের

কোমল প্রাণ সহসা গলিয়া যায়, চক্ষু দিয়া জল পড়ে। ইহাকেই আমরা হর্ষের কান্না বলি। এইরূপ যাহাতে হৃদয়ে আঘাত লাগে, তাহাতেই মানুষে কাঁদে। ভালবাসায় প্রাণ গলিয়া গিয়া প্রণয়ীর ভিতর অশ্রুপাত দেখা গিয়াছে। এই প্রণয়ের কান্নার পরাকাষ্ঠা—ঈশ্বর-প্রেমে। যে প্রেমিক, সেই জানে, কত সময় তাঁহাকে কাঁদিতে হয়,—কাঁদিয়া কত আনন্দ অনুভব হয়; আবার কতবার কাঁদিতে ইচ্ছা হয়! এইরূপ বঙ্গভূমে চৈতন্যদেব একদিন হরিনাম করিয়া কাঁদিয়াছিলেন; কাঁদিয়া নদিয়া ভাসাইয়াছিলেন, বক্ষে ধর্ম্মের স্রোত উজান বহাইয়াছিলেন। আজও যিনি যথার্থ ভক্ত, তিনি ভাবে বিভোর হইয়া কেবলই কাঁদেন; তাঁহার অসন-বসনে স্পৃহা নাই, ভোগবিলাসে অনুরাগ নাই, অন্য কোন বৃত্তিরই উদ্রেক নাই। আছে কেবল ধর্ম্মে প্রবৃত্তি, আর কাঁদিতে আনুরক্তি। কান্নার কি সুখ, তাঁহারাই বুঝিয়াছেন।

কান্নার কি সুখ সকলেই একটু-আধটু বুঝেন। মানুষের হৃদয় খুঁজিলে শোকের স্মৃতি কার নাই? একবার সেই শোকময়ী স্মৃতির অনুবর্ত্তী হইয়া কাঁদিতে কে না সময়ে সময়ে চেষ্টা করেন? আর সেই নিভৃতে—অন্যের অলক্ষ্যে বসিয়া অকারণে, অসময়ে দুই ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিতে কেমন আনন্দ অনুভব হয়! আনন্দ না হইলে চেষ্টা করিয়া মানুষ এমন কাজ করিবে কেন? সময়ে সময়ে কাঁদিয়া আমরা যে সুখ পাই; হাসিয়া তাহা পাই না। হাসির সুখ ভাসা-ভাসা—হালকা রকমের; এই আছে, এই নাই। কিন্তু কান্নার সুখ স্থির, গম্ভীর, অনেকক্ষণ-স্থায়ী। শরীরের স্থান-বিশেষে স্পর্শমাত্রে মানুষ হাসিয়া ফেলে; কিন্তু কে বল মর্ম্মস্পৃষ্ট না হইয়া কাঁদিয়াছে?

কেহ কখন চেষ্টা করিয়া হাসেন কি? কিন্তু চেষ্টা করিয়া আমরা কত সময় কাঁদিয়া থাকি! একাকী বসিয়া মনে মনে কোন বিষয় স্মরণ বা কল্পনা করিয়া কেহ কখন হাসে না। যদি কেহ হাসে, সে পাগল। কিন্তু মনে মনে সময়ে সময়ে কত বিষয় ইচ্ছা-পূর্ব্বক স্মরণ বা কল্পনা করিয়া, আমরা কত কাঁদি কেন? কাঁদিয়া সুখ যদি না পাইব, তবে তাহার জন্য চেষ্টা করিব কেন? যেদিক দিয়া যে ভাবে দেখুন, কান্না আমাদের জীবনের এক অতি প্রধান সম্বল, কান্নাতেই আমাদের সুখ, কান্নাতেই আমাদের প্রীতি, কান্নাতেই আমাদের তৃপ্তি।

অনেক সভ্যসমাজে কান্না দুর্ব্বল-হৃদয়ের পরিচায়ক বলিয়া পরিজ্ঞাত। হৃদয়ের বল-বীর্য্যের বিষয় আমরা কিছু বুঝি না। তবে আমাদের মোটা বুদ্ধিতে এই মাত্র বুঝি, সকল জিনিসই সরল ভাল নহে। পাথর শক্ত হওয়াই ভাল; কিন্তু কাঠিন্য নবনীতের গুণ নহে। শরীর কঠিন হওয়া ভাল বলিয়া, হৃদয় পাষাণ করা ভাল নহে। হৃদয় কোমল জিনিস; তাহাকে যত কোমল করিবে, মনুষ্যত্ব ততই বাড়িবে। এস্থলে একটী গল্প না বলিয় থাকিতে পারিলাম না। একদিন জনৈক পূজ্যপাদ মহাত্মা আমাদের দেশীয় নীচশ্রেণী-বিশেষের দীনাবস্থার বিষয় বর্ণনা করিতে করিতে ছলছল নেত্রে অশ্রুপাত করিলেন, ; দেখিয়া আমার চক্ষেও জল আসিল। আমি দুঃখীর দুঃখের কথায় কাঁদি নাই, আমি বক্তার সহৃদয়তায় কাঁদিলাম। ভাবিলাম, ইনি প্রকৃত মহাত্মা, যথার্থ হৃদয়বান ব্যক্তি, ভক্তির প্রকৃত পাত্র। হৃদয়ের বলের কথা যাহা বলিতেছি-লাম, আমার বোধ হয়, অনেকে মনের মধ্যে হৃদয়ের কথা মিশাইয়া থাকেন। মনের বল থাকা বড় আবশ্যক; তাহাতে কার্য্যে একাগ্রতা হয়। আমাদের মনে বল থাকা ভাল, কিন্তু হৃদয় যেন সর্ব্বদা কোমল থাকে। মানসিক বলের ধাঁদায় পড়িয়া কখনও কেহ হৃদয়ের কোমলতা হারাইবেন না; তাহাতে মনুষ্যত্বে আঘাত পড়ে। পরের দুঃখ নিবারণ করিতে

পার, ভালই ; নিতান্ত পক্ষে পরের দুঃখ দেখিয়া দুই ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিবার মতও হৃদয় কোমল রাখিবে।

কান্নার যে সুখ তাহাতে স্থৈর্য্য আছে, গাম্ভীর্য্য আছে,স্থায়িত্ব আছে বলিয়াছি। কিন্তু একটী কথা এখনও স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। কান্নার সুখ বড় পবিত্র সুখ। রিপু-পরবশ ব্যক্তি রিপু-চরিতার্থ করিয়া যে সুখ উপলব্ধি করেন,তাহাতে তাঁহার কান্না আইসে না। কিন্তু যখন কৃতকার্য্যের অবৈধতা বা অপবি ত্রতা উপলব্ধি করিয়া অনুতাপ করেন, তখন তিনি কাঁদেন, ; কাঁদিয়া হৃদয়ের ভার লাঘব করেন। সুতরাং একটু সুখ অনুভব করেন, তৃপ্তি পান।

ভগবান আমাদিগকে কাঁদিতে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় যাহাই হউক, আমাদের অদৃষ্টের বশীভূত হইয়া তাহাতেই সুখবোধ করিতে হউক। আর সেইজন্যই বোধ হয়, কান্নাতেই আমরা সুখ পাই। কান্না-অসহায়ের সহায়, দুর্ব্বলের বল, প্রেমিকের প্রাণ ; আর আমাদের সর্ব্বস্ব ধন।

সংবাদ।

—বেচিয়া সিং নামক একজন কনষ্টেবোল অপর একজন কনেষ্টবোলের পোষাক চুরি করিয়াছিল বলিয়া আলিপুরে ফৌজদারীতে তাহার নামে নালিস হয়। সে দোষ স্বীকার পায়। বিচারে তাহার কঠিন পরিশ্রম-সহিত এক মাসের জন্য মেয়াদ হইয়াছে।

—কি ভয়ানক কথা ! দিনের বেলায়, পুলিসের সম্মুখে, সম্প্রতি এক ভয়ানক ডাকতি ও তৎসহ খুন হইয়া গিয়াছে ! ডায়মণ্ড হারবরে 'ছরা-কোর্ট' ও আদালতের সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে নৌকা বাঁধিয়া কতকগুলি ব্যক্তি খড় কিনিবার জন্য গমন করে। নৌকায় তাহাদের-একজন মাত্র থাকে। ইতিমধ্যে একদল ডাকাইত তাহাদের নৌকায় পড়িয়া নৌকা লুট আরম্ভ করিতে থাকে ; এবং সম্ভবতঃ তাহাতে বাধা দিতে যাওয়ায় দস্যুগণ নৌকার লোকটীকে হত্যা করিয়া পলায়ন করে। এই সময় আর একখানি নৌকা বুঝি সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হয় ; এবং তাহার মাঝি পূর্ব্বোক্ত নৌকা রক্তমাখা ও তাহার মধ্যে একটী মনুষ্য মরিয়া পড়িয়া আছে দেখিয়া পুলিসে গিয়া সংবাদ দেয়। পুলিস কিন্তু সেই সংবাদ-দাতা মাঝিকেই সন্দেহ করিয়া হাজতে রাখিয়াছেন। এখন দেখা যাউক, বিচারে কি হয়। ফলতঃ কাণ্ডটী বড় ভয়ানক ! দিনে-দুপুরে খুন, ডাকাতি কি লোমহর্ষণ ব্যাপার !

—রাজপৌত্রের অভ্যর্থনার জন্য সেদিন গড়ের মাঠে যে আলোকমালা প্রদত্ত হইয়াছিল, তন্মধ্য হইতে গুটিকতক ফুকাশিশি খুলিয়া লওয়া অপরাধে চারিজন মুসলমানের মধ্যে একজনের ৫, টাকা ও অপর তিন জনের ৩ তিন টাকা করিয়া জরিমানা হইয়াছে। সামান্য দুই এক পয়সার ফুকা শিশির জন্য ৫, টাকা জরিমানা ; তবুও তো চোর-চোর কমি নাই ?

—গত ২১ এ ডিসেম্বর পাণ্ডুয়াতে আর এক ভয়ানক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরীর বাড়ীতে পড়িয়া ডাকাইতগণ প্রায় ৪হাজার টাকার সম্পত্তি লুট করিয়া লইয়া গিয়াছে ; এবং বাড়ীর কর্ত্রীকে বড়ই গুরুতর আঘাত করিয়া গিয়াছে। গ্রামের চৌকিদারগণ কোথায় প্রতিকার করিবে; কিন্তু ডাকাইতগণ তাহাদিগকেও হাত-পা বাঁধিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিল ! অধিকন্তু গ্রামের লোক একজনও তাহাদের সম্মুখীন হইতে সাহস ও সুবিধা পায় নাই। পুলিশের লোকজন গাড়ি করিয়া যাইতেছিলেন ; কিন্তু রাস্তাতেই তাঁহাদিগকেও ডাকাইতেরা আটকাইয়াছিল।

—বিলাতের একজন পাদরী কোন কার্য্যোপলক্ষে নরওয়ে যান। তথায় একদিন এক ষ্টেসনে অজ্ঞাতসারে এক উঁই-ঢিবির উপর বসিয়াছিলেন ; তাহাতে তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রে বড়ই উঁই লাগে। গাড়িতে উঠিয়া তিনি তাহা দেখিতে পান ; এবং গাড়ির সে কামরায় আর কোন লোক না থাকায়, পরিধেয় বস্ত্র খুলিয়া ঝাড়িতে থাকেন। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য ! ঝাড়িবার সময় টেলিগ্রাফের তারে কাপড় আটকাইয়া গেল, ও তাঁহার হাত ছাড়িয়া তাহাতে উহা ঝুলিতে লাগিল। গাড়ি তখন চলিতেছে ! মহা বিপদ ! কাজেই পাদরী সাহেবকে তখনকার মত গাড়িতে উলঙ্গই থাকিতে হইল। পরে পরবর্ত্তী এক ষ্টেসনে আসিয়া গাড়ি থামিলেই, তিনি তো দৌড়িয়া বিশ্রাম-ঘরে প্রবেশ করিয়া দুয়ার দিলেন; চেঁচাইয়া সকলকে কাপড়ের কথা বলিতে লাগিলেন! কিন্তু সে নরওয়ে দেশ—সেখানে তাঁহার ইংরাজী ভাষা কে বুঝিবে ? ষ্টেসন-মাষ্টার তখন অনেক কষ্টে ইংরাজী-জানা এক মেমকে খুঁজিয়া-পাড়িয়া তথায় হাজির করিলেন ! মেম সাহেব তথায় উপস্থিত হইলে, সাহেব তখন একপাটি দরজা খুলিয়া, মুখ বাহির করিয়া সকল বলিয়া বাঁচেন। যাইহোক, কাপড় ছাড়িয়া অবশেষে কি অপ্রস্তুত !

অনুসন্ধান

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

৩য় খণ্ড] ১৫ই মাঘ. ১২৯৬ সাল। [১২শ সংখ্যা।

প্রার্থনা।

রাগিণী আলাহিয়া—তাল ঝাঁপতাল।

নাথ ! সহেনা সহেনা প্রাণে. তব অদর্শন।
করুণা নয়নে দীনে আজি কর দরশন ॥
আঁধারে হয়েছি হারা,
নয়নে বহিছে ধারা,
পাপ-হলাহল পানে জর জর এ জীবন।
বিষয়-মোহের ঘোরে অবসন্ন প্রাণ-মন ॥
হৃদয়ে বহেনা শ্বাস,
ধূলায় মলিন বাস,
কি দশা হয়েছে নাথ ! কর, কর দরশন।
অনাথ অতুর জনে কর প্রেম-বরিষণ ॥
ভুলেছি তোমার স্নেহ,
তোমা বই নাহি কেহ,
পিতা, মাতা, বন্ধু তুমি, জীবন-সর্ব্বস্বধন।
সংসার-মরুভূ মাঝে তুমি দেব-নিরঞ্জন ॥
রেখো নাথ !—রেখো রেখো ;
দেখো নাথ !—দেখো দেখো ;
কর নাথ ! আশীর্ব্বাদ,—অন্তে দিও শ্রীচরণ ॥

ভারতবর্ষের জাতীয় দুর্ব্বলতার কারণ।

(জাতীয় একতার অভাব)

ভারত-ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, প্রাচীন কাল হইতেই লুণ্ঠন অথবা বিজয়াভিলাষে ভারতবর্ষ বারম্বার ভিন্ন ভিন্ন বৈদেশিক জাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া আসিতেছে। ইহার কারণানুসন্ধানেও আমাদিগকে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হয় না। দুর্ভাগ্য অথবা সৌভাগ্য-বশতঃই হউক, ভারতভূমি 'উর্ব্বরা' বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। আর সেই উর্ব্বরতাই ভারতের বারম্বার বিদেশীয়দিগের দ্বারায় আক্রান্ত হইবার কারণ, এবং সেই উর্ব্বরতাই ভারতের সমস্ত অনিষ্টপাতের মূল। ভারতের ভূমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি হইবার কয়েকটী কারণ আছে *। প্রথমতঃ এই দেশ

* নিম্নবঙ্গ, সিন্ধুপ্রদেশ, দোয়াব (গঙ্গা ও যমুনার মধ্যস্থ ভূমি) এবং পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানসমূহের মৃত্তিকা জলদ্বারা সঞ্চিত বা পলিযুক্ত। মধ্যপ্রদেশ (Central Provinces) এবং বোম্বাইপ্রদেশ প্রভৃতি ভূমি এঁটেল-মাটিযুক্ত। উভয়প্রকার মৃত্তিকারই প্রভূত উৎপাদিকা শক্তি আছে। প্রথমোক্ত মৃত্তিকাতে চাউল প্রভৃতি শস্যাদি হইয়া থাকে; এবং শেষোক্ত মৃত্তিকাতে যথেষ্টরূপ তুলা প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বিস্তর মহতী নদীসমূহে পরিবৃত। দ্বিতীয়তঃ ইহার জলবায়ু একাধারে উষ্ণ ও আর্দ্র-গুণাত্মক। উপরোক্ত কারণে ভারতবর্ষ অসাধারণরূপে শস্যশালী, এবং তাহাই ভারতে প্রধান সম্পত্তি বা ধনভাণ্ডার। কিন্তু তাহা হইলেও, ইহা কোনরূপেই ভারতের সৌভাগ্যের কারণ বলিয়া গণনা করা যায় না। যেহেতু, প্রাচীন কাল হইতে এই আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া নানা বিদেশীয় জাতি, অভাবের প্রখর তাড়নে নিজ মাতৃভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়া, দলে দলে পঙ্গপালের ন্যায় ভারতে আসিতে লাগিল; অথচ দুর্ব্বলতা-হেতু ভারত উহাদিগের আগমনে বাধা প্রদান করিতে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ ছিলেন।

ভারতবর্ষ দুর্ব্বল হইবার নৈসর্গিক, শারীরিক এবং চিরন্তন-প্রথা প্রভৃতি অনেকগুলি কারণ আছে। যে সকল স্বাভাবিক (ভূমি, জল, বায়ু এবং স্বভাবের দৃশ্য প্রভৃতি কর্ত্তৃক মনুষ্যজাতির প্রতি যে পরিমাণে ক্ষমতা বিস্তৃত হয়) এবং অন্যান্য কারণে ভারতবর্ষ দুর্ব্বল, আপাততঃ আমরা ঐ সকল বিষয়ের অনুসন্ধান হইতে বিরত রহিলাম। বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমরা জাতীয় একতার অভাবের কারণ-সমূহের আলোচনাতেই কেবল প্রবৃত্ত হইব।

পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি যে, ভারতবর্ষ প্রভূত শস্যশালী হইলেও দুর্ব্বল। এই দুর্ব্বলতার কারণ, প্রধানতঃ জাতীয় * একতার অভাব। আর, এই জাতীয় একতার অভাবের বিষয় পৃথক পৃথকরূপে পর্য্যালোচনা করিতে গেলে, যে সকল উপাদানে জাতীয় একতা গঠিত হয়, আমরা সেই সকলের সম্পূর্ণ অভাব স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই।

প্রথমতঃ।—ভারতবর্ষ বিভিন্ন জাতির আবাস-ভূমি।

দ্বিতীয়তঃ।—ভারতবর্ষে বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত।

তৃতীয়তঃ।—ভারতবাসীগণ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী।

চতুর্থতঃ।—ভারতের জাতি-নিচয়ের রাজনৈতিক পূর্ব্বাবস্থার বিভিন্নতা।

ভারতীয় জাতি-নিচয়ের অনৈক্যতা-বশতঃ দুর্ব্বলতার যে কয়েকটী কারণ প্রদর্শিত হইল, আমরা এ সকল কারণের যাথার্থ্য প্রমাণ করিতে চেষ্টিত হইব। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"অল্পানামপি বস্তুনাং সংহতি কার্য্যসাধিকা।
তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্ত দন্তিনঃ॥"

যদ্যপি স্বীকার করা যায় যে, 'একতাই বল', তাহাহইলে তদভাবই যে 'দুর্ব্বলতা', সে বিষয় স্বতঃই প্রতিপন্ন। ভারতবর্ষে 'জাতীয় একতা' বলিয়া কোন একটী পদার্থের অস্তিত্ব নাই বলিলেও অত্যুক্তি-দোষে দূষিত হইতে হয় না। জাতি, ভাষা, ধর্ম্ম এবং রাজনৈতিক অবস্থা প্রভৃতি যে সকল উপাদানে সমতা-হেতু একটী জাতীয় ভাব গঠিত হয়, দুর্ভাগ্যবশতঃ এই 'সংক্ষিপ্ত-জগতে' অর্থাৎ ভারতবর্ষে তাহা দুর্ল্লভ।

জাতীয় একতার অভাবের কারণ-নির্ণয়ে প্রথমতঃ উক্ত হইয়াছে যে,—ভারতবর্ষ বিভিন্ন জাতির আবাসভূমি। সুতরাং এক্ষণে দেখা যাউক, ভারতবর্ষে কত বিভিন্ন জাতির বসতি! প্রথমতঃ, পার্ব্বতীয় জাতি-নিচয় এবং দ্রাবিড়ী জাতি-নিচয় এই উভয়ই অনার্য্য-জাতি। ইহারা যে ভারতের আদিম জাতি, তাহা ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নাই। দ্বিতীয়তঃ, ইতিহাসাতীত-কাল বহির্দ্দেশ হইতে একটী লোকস্রোত ভারতবর্ষে প্রবেশ, করে। ভাষা বিজ্ঞান প্রভৃতি পাঠে যতদূর অবগত হইতে পারা যায়, তাহাতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ইহার পূর্ব্বে কোন জাতি বহির্দ্দেশ হইতে ভারতে প্র

* এস্থলে 'জাতীয়' শব্দার্থে ভারতীয় সমগ্র জাতি-নিচয় বিবেচনা করিতে হইবে।

করে নাই। ফলে, ইহারাই ভারতের প্রথম ঔপনিবেশিক, এবং ইহারাই নির্ম্মল আর্য্য-জাতি। তদনন্তর পরে পরে হেলেনো বা গ্রীকো-আর্য্য ও ইরাণো-আর্য্য প্রভৃতি আর্য্য-জাতির অন্যান্য শাখা ভারতে আগমন করেন।* তৎপরে আর্য্য, তুরাণী এবং সেমেটিক এই তিনটী বিমিশ্রিত জাতি-নিচয় কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ আক্রান্ত হয়।† ইহারাই ভারতবর্ষের মুসলমান-বিজেতা। পরিশেষে অন্যান্য ইয়ুরোপীয় জাতির সমাগম হইয়াছে। দেখা যাইতেছে যে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতিস্রোত ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ সকল জাতিসমূহের বিভিন্নতা রক্ষা করিবার জন্য, বিশেষতঃ ঐ সকল মনুষ্যজাতিগত বিভিন্ন উপাদানসমূহকে দ্রবীভূত করিয়া এক-জাতিত্বে পরিণত করিবার পক্ষে দুরুহতা বৃদ্ধি করিবার জন্যই, যেন জাতি-ব্যবস্থার (Caste-system) সৃষ্টি হইয়াছে; এবং ঐ রীত্যনুসারেই বহুকাল হইতে ভারতে জাতি-বিভাগ হইয়া সহস্র সহস্র বৎসর অবাধে চলিয়া আসিতেছে। অনেক সময়ে আবার লোকদিগের কার্য্য এবং ব্যবসায় হইতেও কোন কোন জাতি উদ্ভূত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। যেরূপ পুষ্প-ব্যবসায়ী হইতে মালাকার, কাষ্ঠাদি প্রস্তুত ব্যবসায় হইতে সূত্রধর, এবং বস্ত্র-বয়ন কার্য্য হইতে তন্তুবায় প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে।

কখনও কখনও এক একটী জাতি আবার অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণীতে বিভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এই এক ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে আবার বহু শ্রেণী আছে; এবং তৎপ্রযুক্ত তাহাদিগের মধ্যে পরস্পর আদান-প্রদান প্রচলিত নাই। এতদঞ্চলের প্রকৃষ্ট ব্রাহ্মণশ্রেণীর কথা পরিত্যাগ করিয়া, কেবল গুজরাটী ব্রাহ্মণের বিষয় অনুসন্ধান করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহারা চারিটী শাখায় বিভক্ত; এবং ঐ বিভিন্ন শাখার মধ্যেও পরস্পর আদান-প্রদান হয় না। হিন্দুদিগের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর জাতির কথা দূরে থাকুক (কারণ উহাঁদিগের মধ্যে জাত্যভিমান থাকা অনেকটা সম্ভব); কিন্তু নীচ জাতিদিগের যাহারা মধ্যে অধিকাংশ পার্ব্বত্য ও অন্যান্য অনার্য্য-বংশোদ্ভব, তাহাদের মধ্যেও বিলক্ষণ জাত্যভিমানের প্রাবল্য লক্ষিত হয়। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন মান্দ্রাজীয় 'মাহার-জাতি' কোন 'মঙ্গো-জাতির' সহিত এবং বঙ্গদেশীয় 'কারপুত্র'(কাওরা)কোন 'ডোম বা চণ্ডালের' সহিত কখনও আহারাদি করে না।

এইরূপ জাত্যভিমান মুসলমানদিগের মধ্যেও হস্তপ্রসারণে ত্রুটী করে নাই। মুসলমান-জাতির মধ্যে যে বিভাগ পরিলক্ষিত হয়, উহা যদিও প্রকৃত জাতিবিভাগ না হইতে পারে; কিন্তু উহা যে শ্রেণীবিভাগ, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নাই যে, যখন ইস্‌লাম-ধর্ম্ম প্রথম প্রচারিত হয়, তৎকালে উক্ত ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহম্মদ তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে এক-জাতিত্বে পরিণত করিতেই প্রধান উদ্যোগী হইয়াছিলেন। জগতে ধর্ম্মের ভাগ্যে যেরূপ ঘটিয়া থাকে; ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের যে সকল উদ্দেশ্যে ধর্ম্ম প্রথম গঠিত হয়, কাল-সহকারে ঐ সকলের যে কত পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হয়; তাঁহার অনেক দৃষ্টান্ত এ-জগতে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। এইরূপে ইস্‌লাম-ধর্ম্মের মৌলিক উদ্দেশ্যেরও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এরূপ মুসলমান কে আছেন যে, তাঁহার শরীরে 'লালখানি' পাঠানের রক্ত প্রবাহিত

* হেলেনো বা গ্রীকো-আর্য্য আলেকজাণ্ডারের আগমনে আসিয়াছিলেন। আর ইরাণো-আর্য্যদিগের পারশীদিগের মধ্যে কতকগুলি বোম্বাই-প্রদেশের পার্শী, এবং কতক অন্যান্য জাতির সহিত বিমিশ্রিত হইয়া গিয়াছে।

† তুরাণী অনার্য্য-জাতি। যথা—মোঙ্গলীয় ও চীন-দেশ বাসী এবং ইহুদী সেমিটিক জাতি প্রভৃতি।

থাকিতে তিনি তাঁহার কন্যাকে এক জন 'জোলাহার'-পুত্রের সহিত বিবাহ দিতে সম্মত হইবেন ?

বিভিন্ন জাতিত্বের কথা পরিত্যাগ করিলে, ভারতের একতার অভাবের দ্বিতীয় কারণ দেখা যায়,--ভারতবর্ষে বিবিধপ্রকার ভাষা প্রচলিত। হিন্দি, বাঙ্গালা, উৎকল, আসামি, মহারাষ্ট্রীয়, গুজরাটী, পঞ্জাবী, সৈন্ধবী, কাশ্মীরী, প্রভৃতি ভাষাগুলি সংস্কৃতমূলক; এবং তামিল, তৈলঙ্গী,কর্ণাটী এবং মালয়ালম প্রভৃতি দ্রাবিড়ী ভাষা। গণ্ড প্রভৃতি ভাষা ভারতের আদিম পার্ব্বতীয় জাতিদিগের দ্বারায় কথিত হয়। ইহা ছাড়া আরও দুইটী ভাষা প্রচলিত আছে,—যথা, উর্দ্দু ও অধুনা ইংরাজী। প্রথমটী,—হিন্দি ও পারস্যভাষার অপভ্রংশ বা উভয়ের বিমিশ্রিত ভাষা; এবং উহা মুসলমান কর্ত্তৃক ভারত-বিজয় হইতে সৃষ্ট হইয়া ভারতে মুসলমান-সাম্রাজ্যের উন্নতির সহিত পরিবর্দ্ধিত ও বিস্তৃত হয়। দ্বিতীয়টী,—ভারত ইংরেজাধিকৃত হইবার পর হইতে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমান্বয়ে ভারত-ভূমে পরিব্যাপ্ত হইতেছে। ইয়ুরোপে ফরাসিস্ ভাষা যেরূপ, ভারতে উর্দ্দু ভাষাও কতক পরিমাণে সেইরূপ। ফলতঃ ইরাজী ও উর্দ্দু এই উভয়ের মধ্যে কোনটীকেও ভারতের জাতীয় ভাষা বলা যাইতে পারে না। ইয়ুরোপে ফরাসিস্ ভাষাকে লিঙ্গোয়া ফ্রাঙ্কা (Lingua Franca) বলিয়া থাকে। এই ভাষাটী ইয়ুরোপের অধিকাংশ লোক (বিশেষতঃ ভদ্রলোকমাত্রেই) অবগত আছেন। যদ্যপি কোন ইংরাজের সহিত কোন জর্ম্মাণের, স্পেনীয়ের সঙ্গে ইতালীয়ের এবং দিনেমারের সহিত কোন অষ্ট্রীয়ের কথাবার্ত্তা কহিবার আবশ্যক হয়,তাহাহইলে ফরাসিস্ ভাষাতেই কথোপকথন হইয়া থাকে। সেইরূপ ভারতে যদ্যপি কোন পঞ্জাবীর সহিত বাঙ্গালীর, পার্শির সহিত বেহারীর, অথবা গুজরাটীর সহিত তৈলঙ্গীর কথা কহিতে হয়, তাহাহইলে পূর্ব্বে এবং এখনও অনেক সময় উর্দ্দু ভাষায় কথাবার্ত্তা হইয়া থাকে। কিন্তু ইদানীন্তন ইংরাজী-ভাষার বিস্তৃতির সহিত অনেক ভারতবাসী (বিশেষতঃ ইংরাজীভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ) উর্দ্দুর পরিবর্ত্তে ইংরাজী-ভাষায় বাক্যালাপ করিয়া থাকেন। নিশ্চয় বলা যায় না। কিন্তু ইংরাজী যেরূপ দিন দিন বিস্তৃত হইতেছে, তাহাতে হয় তো ইংরাজীই ভারতের লিঙ্গোয়া ফ্রাঙ্কার (Lingua Franca) পদ প্রাপ্ত হইতে পারে। যদিও অনেক ইংরাজী-ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ উর্দ্দুর পরিবর্ত্তে ইংরাজী-ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন, তথাচ দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভারতের বিভিন্ন দেশের সাধারণ লোকে পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণেও উর্দ্দু ভাষা অধিক পরিমাণে বুঝিতে পারে; এবং ক্রমশঃ পারিতেছেও। ইহার কারণ অনুসন্ধানে অধিক প্রয়াস পাইতে হয় না। পূর্ব্বে সকল স্থানের লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে গমনাগমন করিতে পারিত না। কিন্তু অধুনা প্রায় সমগ্র ভারতে বাষ্পীয়-যানের বিস্তৃতি-সহকারে বিভিন্ন স্থানের সকলপ্রকার লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমনাগমন করিতেছে; এবং তাহাতে ভারতীয় সমগ্র জাতি-নিচয়ের মধ্যে সম্মিলন হইতেছে। ইহা ব্যতীত রাজপুরুষগণ ভারতীয় যে কোন প্রদেশের লোক হউক না কেন, তাহার সহিত ইংরাজী-ব্যতীত দেশীয় ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতে হইলে, সচরাচর উর্দ্দু বা হিন্দিভাষায় কথোপকথন করিয়া থাকেন। উর্দ্দু বা হিন্দি-ভাষাটী যে সমগ্র ভারতবাসীদিগের মধ্যবর্ত্তী ভাষা অর্থাৎ 'লিঙ্গোয়া-ফ্রাঙ্কা' তাহার আর একটী দৃষ্টান্ত আমরা পাঠকগণকে দেখাইতেছি। ইহা অনেকেই বিদিত আছেন যে, সিপাহী-বিদ্রোহের পর হইতে ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট এক-একটী দেশীয় সৈন্যদল পূর্ব্বের ন্যায় এক-জাতিতে পূর্ণ করেন না। এক্ষণে বিভিন্ন জাতি মিশ্রিত করিয়া এক-একটী দেশীয় সৈনিকদল রক্ষিত হয়। ঐ সকল সিপাহীদিগের বিভিন্ন ভাষা থাকা-প্রযুক্ত উহারা উর্দ্দু বা হিন্দিভাষাতেই কথোপকথন করিয়া থাকে।

এইরূপ একতা অভাবের তৃতীয় কারণ, ভারতবাসীগণ বিভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী। ভারতবর্ষে ধর্ম্ম-সম্বন্ধেও একতার অভাব বিলক্ষণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ভারতে নানাপ্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত আছে। যথা, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, পার্শি, শিখ এবং পার্ব্বতীয় জাতিনিচয়ের নীচ-ধর্ম্ম। ইহা ব্যতীত খৃষ্টীয় ধর্ম্ম এক্ষণে ভারতের রাজকীয় ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত। এই সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তৎপরে মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা সমগ্র ভারতবর্ষের লোক-সংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ হইবে। বুদ্ধ ভারতের যে একজন উচ্চ-শ্রেণীর শিক্ষাগুরু ছিলেন, ইহা কে অস্বীকার করিবেন? এক সময়ে তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের বিজয়-পতাকা প্রায় সমগ্র ভারতে উড্ডীন হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এক্ষণে সেই ধর্ম্ম ভারত হইতে বিলুপ্তপ্রায়; কেবল সিংহল প্রভৃতি কতিপয় স্থানে উহার গৌরবের ভগ্নাবশেষ চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। তবে ভারতে যে জৈন-ধর্ম্ম রহিয়াছে, বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্ম্মের ব্যবস্থা (System) উক্ত ধর্ম্ম-মধ্যে নিহিত রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। গুরু নানক কর্ত্তৃক শিখ-ধর্ম্ম উদ্ভূত হয়। সময়ে সময়ে ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকগণ আবির্ভূত হইয়া ভারতে এক-ধর্ম্ম স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরিশেষে এইরূপ মানসে চৈতন্য একটী নূতন ধর্ম্মের প্রচার করিয়া অধিকতর গোলযোগ বাধাইয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ভারতের রাজকীয় ধর্ম্ম। বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই ধর্ম্ম এদেশের নীচজাতির মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে যদিও প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু শিক্ষিত চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যদিও হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার সংখ্যা,বলিতে গেলে অঙ্গুলি-পর্ব্ব অতিক্রম করে না। ফলতঃ ভারতবাসীদিগের মধ্যে এই ধর্ম্মের প্রতিপত্তি-লাভ করার আশাও বড়ই অল্প। যাহাহউক, এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, ভারতে নানা-জাতীয় ধর্ম্ম প্রচলিত রহিয়াছে; এবং উহার মধ্যে কোনটীকেও ভারতের জাতীয় ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে না। আর, ভবিষ্যতেও ভারতের একটী জাতীয় ধর্ম্ম হইবে কি না; এবং যদ্যপি হয়, তাহাহইলে সেটি কি, এই প্রবন্ধে সে বিষয়ের পর্য্যালোচনা করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। কেবল ভারতে কত প্রকার বিভিন্ন ধর্ম্ম থাকা-প্রযুক্ত ভারতের জাতীয় একতার অভাব, তাহাই দেখান আমাদিগের এস্থলে উদ্দেশ্য ছিল।

উপসংহারে একতা-অভাবের চতুর্থ কারণ, ভারতের জাতিনিচয়ের রাজ-নৈতিক পূর্ব্বাবস্থার বিভিন্নতা। পূর্ব্বে সমগ্র ভারতবাসীর একরূপ অবস্থা ছিল না। সময়ে সময়ে যদিও এক একটী ঘটনায় এক একটী জাতির গৌরবের বিষয় হইত; কিন্তু উহা অপরের পক্ষে লজ্জার কারণ বলিয়া পরিগণিত হইত। যথা, মহারাষ্ট্র-জাতি অথবা বর্গী যখন বঙ্গদেশ লুণ্ঠন করিত, তখন উহা মহারাষ্ট্র-জাতির গৌরবের বিষয় হইত; কিন্তু বঙ্গবাসীর পক্ষে লজ্জার কারণ হইত। সেইরূপ মানসিংহ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পিঞ্জরাবদ্ধ-অবস্থায়, প্রতাপাদিত্য সম্রাটের নিকট যে আগরায় প্রেরিত হইয়াছিলেন তাহাও বাঙ্গালীর গৌরবের বিষয় ছিল না। ভারত-ইতিহাসে এরূপ ঘটনা প্রচুররূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাচীন ভারত কোন প্রকৃত ইতিহাস রাখিয়া যায় নাই। ভারতে মুসলমানদিগের ইতিহাস আছে সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া সাধারণ হিন্দু-জাতি মুসলমান রাজত্বকে ভারতীয় জাতীয় গৌরবের সময় বলিয়া কখনই ভাবিতে পারেন না; এবং ব্রিটিশ জাতি কর্ত্তৃক ভারতাধিকৃত হওয়াতে কেহই আনন্দাশ্রু বরিষণ করিতে পারে না।

এক্ষণে মূল বিষয়ের অনুসরণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভারতবর্ষ অদ্যাপিও দুর্ব্বল রহিয়াছে। জাতীয় একতা-সম্বন্ধে ভারতবর্ষ প্রাচীনকালে দুর্ব্বল ছিল; এবং ঐ দুর্ব্বলতাই ক্রমশঃ চলিয়া আসিতেছে। যে অভিন্ন ঐতিহাসিক বিষয়ে বাঙ্গালী এবং মহারাষ্ট্রীয়, শিখ এবং রাজপুত সমভাবে গর্ব্বিত হইতে পারে, এরূপ বিষয় অতি বিরল। যে প্রকৃতি দেবী বর্ষে বর্ষে অপরিমেয় শস্যাদি উৎপাদন করতঃ নানারূপে রাষ্ট্রবিভ্রাট ঘটাইয়াছেন, সেই কর্ম্ম-লতা-রূপিণী প্রকৃতি দেবীর সম্পূর্ণ অনুগ্রহ-সত্ত্বেও, ভারত পূর্ব্বোল্লিখিত অভাব বশতঃ বাস্তবিকই দরিদ্র-পদবাচ্য। যদি আমরা দরিদ্র হইতাম, এবং পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইতাম, তাহা হইলে ঐ সকল দুর্ঘটনা পরিহার করা যাইত।

অভাগিনী।

(১)

একটি বিধবার একমাত্র কন্যা ছিল। স্বামীর পরলোক-যাত্রার পর, তাঁহার হস্তে যৎকিঞ্চিৎ যাহা ছিল কন্যার লালন-পালনে তাহা ব্যয় করিয়া তিনি এক প্রকার নিঃস্ব হইয়া পড়েন। তাহার উপর কন্যার বিবাহের সময় গায়ের কয়খানি গহনা-পর্য্যন্তও বিক্রীত হইয়া যায়। কন্যার নাম মনোরমা।

মনোরমা দেখিতে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ; কিন্তু মুখশ্রী অতি সুন্দর। সামান্য গৃহস্থের ঘরেই তাহার বিবাহ হইয়াছিল। যতদিন পর্য্যন্ত কন্যার বিবাহ হয় নাই, ততদিন বিধবা আপনার অবস্থা কাহাকেও জানিতে দেন নাই; বুদ্ধিমতী আপনার বুদ্ধিবলে সে সকল যতদূর সাধ্য ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু কন্যার বিবাহের দু'দশ দিন পর হইতেই তাঁহার অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল। এমন কি, দুই চারি মাসের মধ্যেই তাঁহার এমন অবস্থা ঘটিল যে, প্রতিদিনান্তে তাঁহার আহার জুটিত কিনা, সন্দেহ। এই সকল দেখিয়া-শুনিয়া, বৈবাহিক মহাশয়ের কৃপাদৃষ্টি কমিয়া আসিতে লাগিল; ভয়—পাছে বিধবা পর্য্যন্ত তাঁহার গলগ্রহ হইয়া পড়েন! সুতরাং বিবাহের পর দুইবার ব্যতীত, মনোরমার অদৃষ্টে আর পিত্রালয়ে আসা ঘটিয়া উঠে নাই। দুরবস্থায় পড়িয়াও, বিধবা একবার কন্যাকে আনয়ণ করিবার জন্য লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু বৈবাহিক মহাশয় সে লোককে বাড়ীর দরজা হইতেই বিদায় করেন। আর বলিয়া দেন যে,—"বিয়ানকে বলিও যে, তাঁহার কন্যা এখানে বেশ সুখে আছে; তাঁহার কাছে তাহাকে কেন অসুখী করিতে পাঠাইব? তিনি নিজে ভিখারিণী। কন্যাকে লইয়া গিয়াও কি আবার ভিখারিণী করিবেন? তাঁহার নিজের এক বেলার অন্ন-সংস্থান নাই; তিনি কন্যাকে লইয়া গিয়া খাওয়াইবেন কি?"

বিধবা যখন লোকমুখে এই কথা শুনিলেন, তখন তিনি আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া কহিতে লাগিলেন,—"হা অদৃষ্ট! অর্থহীনা হইলে লোকে এমন করিয়াই অনাদর করে বটে! আমি এককালে রাজরাণী ছিলাম, আজ 'ভিখারিণী' হইয়াছি; লোকে তো বলিবেই! সকলি আমার অদৃষ্টের দোষ!"

এইরূপে কন্যা-দর্শনে নিরাশ হইয়া তিনি আকুল-নয়নে রোদন করিতে লাগিলেন। পাড়া-প্রতিবেশী অপর দুই একজন বিধবা স্ত্রী তাঁহাকে কত বুঝাইলেন। কেহ বা মনোরমার শ্বশুর-শাশুড়ী ধরিয়া কত গালি দিলেন; কেহ বা কত উদাহরণ দিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না—বিধবার অশ্রুজল থামিল না। যাঁহারা প্রবোধ-বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদিকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি কহিলেন, —"মিছা আমায় বুঝাইতেছ বোন! পেটের একটা ছেলে নেই যে, আবার একদিন ভগবান মুখ তুলে চাইবেন! আমার এ দুঃখের অবস্থা এই রকমেই কেটে যাবে। কেউ দেখ্‌বে না—শুনবে না, এইরকম ক'রেই মাটীর দেহ মাটিতে মিশিয়ে যা'বে। আহা! মনু আমার ভাল থাকুক্—ভগবান করুন্, তাই দেখে যেন মর্‌তে পারি!"

(২)

মনোরমার একজন দূরসম্পর্কীয়া কাকা ছিলেন। তাঁহার স্বভাব অতি লম্পট। মদ এবং বেশ্যায় তাঁহার বিষয় অর্দ্ধেক ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। যাহা বাকি ছিল, তাহার আয়ও অন্ততঃ শালিয়ানা ২০০০৲ সহস্র মুদ্রা। সুতরাং পল্লীগ্রামে তিনি একজন 'ধনী, মানী, গুণী ও সম্ভ্রান্ত লোক' বলিয়া গণ্য ছিলেন। পূর্ব্বে তাঁহার স্বভাব ভাল ছিল; কিন্তু স্ত্রী-বিয়োগ হওয়া অবধি সে নির্ম্মল চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শে। শেষে তাঁহার এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, পাড়া-প্রতিবেশী যুবতী স্ত্রীলোকমাত্রেই, তাঁহাকে দর্শন করিলেই, পলায়ণ বা লুক্কায়িত হওনের ব্যবস্থা করিত। মনোরমার বিবাহের পর, তিনি মনোরমার মাতাকে আপন বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন; কিন্তু প্রথমে বিধবা তথায় যাইতে স্বীকৃতা হন নাই। পরে ক্রমে তাঁহার অবস্থা যখন অত্যন্ত খারাপ হইয়া আসিল, তখন এক দিন মনোরমার কাকা (রামরতন বাবু) নিজে আসিয়া বিধবাকে আপন বাটীতে লইয়া যান।

রামরতন বাবুর, বিধবাকে লইয়া যাইবার অন্য উদ্দেশ্য ছিল। তিনি লম্পট, ব্যাভিচারী, সদুদ্দেশ্য যে তাঁহার ছিল না, একথা সকলেই বিশ্বাস করিবে।

মনোরমার মাতার বয়ঃক্রম চতুর্ব্বিংশতি বৎসর—তিনি পরমা সুন্দরী। এই রূপই তাঁহার কাল। এই রূপের জন্যই দুষ্টাভিসন্ধি-পূর্ণ রামরতন তাঁহাকে সাদরে আপন বাটীতে লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মনে বড় আশা ছিল যে, বিধবাকে আপনার হস্তগত করিবেন।

বিধবা ক্রমে ক্রমে এ সকলই বুঝিতে পারিলেন। নির্জ্জনে, নীরবে কত অশ্রুজল ফেলিলেন। কিন্তু কি করিবেন—কোন উপায় নাই! সে স্থান হইতে বহির্গত হইলে, বৃক্ষতল ভিন্ন আর গতি নাই! তাই যতদিন সহ্য করিতে পারিলেন, ততদিন তথায় বাস করিলেন।

কিন্তু একদিন রামরতন বাবু তাঁহাকে স্পষ্টই বলিলেন—যদি তুমি আত্মসমর্পন না কর, তবে আমার বাটী হইতে দূর হও; আমি কেন তোমার পালন-ভার বহন করিব?"

বিধবা সে সময়ে কোন কথা কহিলেন না —নীরবে সকলই সহ্য করিলেন। কিন্তু শেষে গভীরা রজনীযোগে রামরতন বাবুর আশ্রয় পরিত্যাগ করিলেন। দুইদিন অনাহারে—অনিদ্রায়, ক্রমাগতঃ চলিয়া, আপনার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। পাড়া-প্রতিবাসী, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কোন কথা কহিলেন না। নীরবে—প্রাণের দুঃখ প্রাণে চাপিয়া, আপনার গৃহে শয়ন করিলেন।

(৩)

রামরতন বাবু পরদিন প্রাতঃকালে যখন শুনিলেন যে, পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী পলায়ণ করিয়াছে, তখন তিনি ক্রোধে—হিংসায় জ্বলিয়া উঠিলেন। এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন যে,—যেমন করিয়া পারেন, বিধবার সর্ব্বনাশ করিবেন। দিগ্বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইলেন। চারি

দিকে প্রচার করিয়া দিলেন যে,—মনোরমার মাতা তাঁহার আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া কুপথে গমন করিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শিয়াছে।

বিধবা যখন একথা শুনিলেন, তখন তাঁহার যে কি অবস্থা ঘটিল, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন কে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে? ভাবিয়া ভাবিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, তিনি শয্যাশায়ী হইলেন। পাড়া-প্রতিবাসী ঘৃণায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। দিনে দিনে, সেবা ও চিকিৎসা বিহনে, তাঁহার রোগ পূর্ণমাত্রায় বাড়িয়া উঠিল—তথাপি তাঁহার মুখে একটু জল তুলিয়া দিবার লোকটি জুটিল না।

মনোরমার শ্বশুরালয়ে পূর্ব্বে তাঁহার নামে মিথ্যাপবাদ রাষ্ট্র হইয়াছিল। এখন আবার এই অন্তিম-অবস্থার কথাও পঁহুছিল। বৃদ্ধ বৈবাহিক তথাপি পুত্রবধূকে একবারও প্রেরণ করিলেন না।

মনোরমা সকল দিকে নিরুপায় হইয়া স্বামীর পায়ে হাতে ধরিল। বলিল,—"আমায় উনি না পাঠান, তুমি একবার গিয়া দেখিয়া আইস! মা আমার কেমন আছে, একবার তুমিই না হয় জানিয়া আইস!" সুরেশচন্দ্র (মনোরমার স্বামী) মনোরমাকে বড় ভাল বাসিতেন—তিনি একথা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। লুকাইয়া শাশুড়ীকে দেখিয়া আসিলেন। যখন বুঝিলেন, শ্বাশুড়ীর অন্তিম সময় উপস্থিত, তখন পিতার বিনা-অনুমতিতেই, মনোরমাকেও লইয়া গিয়া তাহার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করাইলেন।

বিধবা তখন কথা কহিতে পারিতেছেন না, তাঁহার বাঙ্‌নিষ্পত্তি রহিত হইয়াছে। মনোরমার কোলে মাথা রাখিয়া, মনোরমার মুখের দিকে অবিরল চাহিয়া, অশ্রুধারা প্রবাহিত করিতেছেন।

রামরতন বাবু এই সকল সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, একবার বিধবাকে দেখিতে আসিলেন। অনুতাপানলে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। বিধবা তাঁহাকে দেখিয়া অতি ক্ষীণস্বরে কহিলেন,—"তুমিই আমার মৃত্যুর কারণ। তুমি আমার নামে মিথ্যাপবাদ না রটাইলে আমি মরিতাম না। এখনও তুমি পাঁচজনের সাক্ষাতে স্বীকার কর যে, আমার নামে মিথ্যাপবাদ দিয়াছিলে। নহিলে জানিও, নরকেও তোমার স্থান হইবে না—এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।

অনুতাপানলে রামরতন বাবুর হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে সকল কথাই স্বীকার করিলেন। বিধবা ওতখন—"আ! মনু! সুখে থাক—ঐ কথা শোনবার জন্যেই আমি বেঁচেছিলাম—এমন সুখে মরতে—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

কাঁদিব না কেন?

যেদিন হইতে এ-জগতে আশ্রয় লইয়াছি, সেইদিন হইতেই কাঁদিতেছি। এখানে আসিয়া অবধি কোন দিনই কান্না হইতে বিরত হই নাই। তবে আজ কাঁদিব না কেন?

আমি কাঁদি; কিন্তু কেহই আমায় সান্ত্বনা করে না, কেহই ডাকিয়া জিজ্ঞাসাও করে না যে, কেন কাঁদিতেছি! আমি সান্ত্বনার আশায়—দু'টা মিষ্ট কথার আশায়, যেদিকে চাই, সেইদিকেই দেখি, সকলেই আমার মত কাঁদিয়া অস্থির! আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই কাঁদিতেছে! কাজেই সান্ত্বনা করে কে? নিজের কান্নার বিরাম নাই, আর চারিদিকে কাহাকেও কান্নায় বিরত হইতে দেখি না। সুতরাং বুঝিয়াছি, এ জগতে সান্ত্বনা নাই—শান্তি নাই। তবে লোকে কাঁদিবে না কেন?

জগতে আসিয়া অবধি আমি হাসি নাই; আর যাহাদের মধ্যে আছি, তাহাদের কাহাকেও হাসিতে দেখি নাই। সুতরাং একরকমে ছিলাম বেশ। সহসা একদিন হাসির ধ্বনি শুনিলাম

কে যেন হাসিয়া হাসিয়া বলিতেছে,—"তোমরাও যা লইয়া আছ, আমিও তাই লইয়া আছি। তবে আমি সকল বিষয়েই হাসি, আর তোমরা কাঁদ কেন? তোমরা যা' দেখিয়া কাঁদিয়া অস্থির হও, আমি তাই দেখিয়া হাসিয়া আকুল হই। * * * * * এসকল ব্যাপার দেখিয়া হাসিতে হাসিতে অবসন্ন হইয়া পড়ি! হায়! তবু তোমরা এক বিন্দু হাস না? কেবল কাঁদিয়া মরিতেছ!"

শুনিলাম,—যাহা পৃথিবীতে আসিয়া শুনিতে পাই নাই, তাহাই শুনিলাম। হাসি শুনিলাম, হাসিবার অনুরোধ শুনিলাম, আর হাসিনা দিয়া অনুযোগও শুনিলাম! কিন্তু হাসি কিসের? জগৎ শোক-দুঃখে ভরা,—হাসি কি দেখিয়া?

শুনিলাম,—যে হাসে, সে জগতে শোকের ঘটনা—দুঃখের ব্যাপার দেখিতে পায় না। তাহার কাছে সবই আশ্চর্য্য!—সবই তামাসা! তাহাতেই সে হাসে!—যে হাসে, সে তামাসা দেখিয়া হাসে! কিন্তু যাহাদের লইয়া তামাসা করা, তাহারা হাসিবে কেন?—তাহাদের হাসি আসিবে কেন? জগৎ আমাকে লইয়া খেলা করিতেছে—তামাসা দেখাইতেছে; তবে আমি জগতের ব্যাপার—জগতের তামাসা দেখিয়া হাসিব কেন? জগৎ আমায় কাঁদাইতেছে; আমি না কাঁদিব কেন?

জগতে আসিয়া অবধি আমার সব গিয়াছে। যাহা কিছু সম্বল—যাহা কিছু ভরসা ছিল, সবই নষ্ট হইয়াছে। এমন কি, নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছি, আমার নিজের একটা অস্তিত্ব আছে তাহাও ভুলিয়া গিয়াছি—স্রোতের তৃণের মত যেদিকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে, সেই দিকেই ভাসিয়া যাইতেছি। নিজের এতটুকু সত্তা নাই যে, স্থির হইয়া এক নিমিষের জন্য ভাবি! তবে কাঁদিব না কেন? যে পরাধীন, যাহার নিজের নিজত্ব নাই, যাহার সর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াছে, সে কাঁদিবে না তো কাঁদিবে কে?

যাহার মন—যাহার ক্ষমতা তাহার নিজের বশে নাই; তাহার প্রাণে কি বাসন্তী-নিশীথে, পূর্ণচন্দ্রালোকধৌত তরঙ্গায়িত গঙ্গার উপকূলে, পুষ্পগন্ধহারী মলয়চারী সমীরণের সেবায় শান্তি আসে? তবে সুখ পাইব কিসে?—সুখ না পাইলে হাসিব কিরূপে? যাহার প্রাণে শান্তি আছে—সুখ আছে, সেই ঋতু-পরিবর্ত্তনের আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া হাসিতে পারে। কিন্তু যে পৃথিবীর কবলে কবলিত রহিয়াছে; সে কি বাসন্তী-শোভা, নিদাঘের ভীষণতা, বর্ষার জলদমালার গম্ভীরতা, শীতের দুরন্ত প্রভাব উপলব্ধি করিতে পারে? সে কি এ সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে পড়িয়া, প্রাণের জ্বালায় জ্বলিতে জ্বলিতে হাসিতে পারে?

আমার হাসিবার ক্ষমতা কই? আমি কি? যখন দেখি,—যাহা জীবনের সার বলিয়া স্থির করিয়াছি, জীবনের কর্ত্তব্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছি; হঠাৎ কি ঘটনা ঘটিয়া গেল, আর সে সমস্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিল; তখন কি হাসি থাকে? যখন দেখি,—যে পথে চলিতেছিলাম, তাহা হইতে শতক্রোশ দূরে সরিয়া গেলাম; যাহা করিতেছিলাম তাহাও নষ্ট হইয়া গেল; তখন কি হাসি আসে? যখন দেখি,—যাহাকে জীবনের একমাত্র অবলম্বন ভাবিয়াছিলাম, যাহার মুখে হাসি দেখিলে প্রাণটা জুড়াইয়া যাইত, যাহার জন্য নিজের প্রাণটী পর্য্যন্ত দিতে কাতর হইতাম না; হঠাৎ তাহাকে লইয়া শ্মশানে উপস্থিত হইতে হইল, তাহাকে চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জন দিতে হইল, তখন কি মনে হয়?—তখন কি হাসিতে পারা যায়? যখন দেখি,—আমি মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য লালায়িত হই, আর আমার পার্শ্বে বালক্রীড়নক বস্তুতে শত-সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইতেছে; তখন কি নিজের মান নিজের উপর ঘৃণা হয়

না ? যখন দেখি,—আমি যাহার জন্য লালায়িত, যাহার বিন্দুমাত্র হাসি দেখিলে প্রাণের জ্বালা জুড়াইয়া যায়, যাহার জন্য স্বচ্ছন্দে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে পারি, সে অপরের প্রণয়াসক্ত ; তখন কি হাসিতে পারা যায় ?

আর কত বলিব ? প্রতিপদে আমাকে লইয়া বালকের হস্তের ভাঁটার মত যেদিকে ইচ্ছা গড়াইয়া দিতেছে, আর আমি গড়াইয়া যাইতেছি—হাত-পা থাকিতে প্রতিবিধান করিতে পারিতেছি না ! বুদ্ধি, বিবেচনা, ইন্দ্রিয় সমস্তই আছে—সকলেরই কার্য্য হইতেছে ; কিন্তু কিছুতেই আপনাকে স্থির রাখিতে পারিতেছি না কেন ? এ দেখিয়াও কি মনে হয় না যে, কেন আমি আছি,—আমার থাকিবার কি প্রয়োজন ? তখন কি মনে হয় না যে, কেন আমি এরূপ ভ্রমে পড়ি—কেনই বা আমার মনে এত সুখের স্বপ্ন এতদিন পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকে ; আর কিসের জন্যই বা এক নিমিষে সমস্ত শেষ হইয়া যায় ? এতে হাসি কার আসে ? যে এই তামাসা দেখে, তাহারই হাসি আসে। কিন্তু যাহাদের লইয়া তামাসা দেখায়, তাহারা কি হাসিতে পারে ? ব্যাল-ক্রীড়ক সর্পকে ধরিয়া খেলাইতে থাকে ; কিন্তু তাহাতে সর্পের কি সুখ হয় ?—সে যে সুবিধা পাইলেই ক্রীড়ককে দংশন করিতে যায় ! আমাকে লইয়া খেলাইবে, আর আমি হাসিব ? যাহাদেব লইয়া এইরূপে খেলায়, তাঁরাই কাঁদে। তাই জগতের চারিদিকে চাহিলেই দেখা যায়,—'লোকগুলা কাঁদিয়া অস্থির !'

জগতের মধ্যে আসিবার আগে আমার কি না ছিল ? আমার 'আমি' ছিল ; 'আমি' কি, তাহা আমি বুঝিতাম; আমার 'আমিত্ব' রাখিয়া চলিতে পারিতাম। কিন্তু যেদিন হইতে জগতে আসিয়াছি, সেইদিনই 'আমি' হারাইয়া এই অবস্থায় পড়িয়াছি। জগৎ আমাকে বানরের ন্যায় নাচাইয়া লইতেছে, অথচ আমি কিছুই করিতে পারিতেছি না। আমি মানব ; আমার হিতাহিত জ্ঞান আছে ; আমার বিবেচনা আছে ; আমার হাত-পা আছে ; আমার আত্মপর জ্ঞান আছে ; দয়া, ধর্ম্ম, পরোপকার, সার্ব্বজনীনতা, দেশহিতৈষীতা প্রভৃতি কাহাকে বলে, কিরূপে করিতে হয়, তাহাও আমি জানি ; আমার সে সকলের সঙ্গে দ্বেষ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতির সঙ্গে কি প্রভেদ তাহাও জানি ; কি বল দেখি, তবে কেন আমায় প্রতিপদে বিফল মনোরথ হইয়া কাঁদিতে হয় ?—কেন আমি সকল-সত্ত্বেও কোন উপায় দেখিতে পাই না এসকল বুঝিয়া কি প্রাণ ফাটিয়া চোখের জ বুক ভাসিয়া যায় না ? এ সকল বুঝি হাসিবে কে ?

যে হাসে, সে হাসুক। কিন্তু একটা ক বলি,—আমি কাঁদি, জগতের ভাব বুঝিয় ইহারই মধ্যে আছি বলিয়া। আর তুমি হা জগতের ভাব বুঝিয়া, তাহা হইতে দূরে আ বলিয়া। তুমি অনেক দিন ভাবিয়াছ,—"আমি কাঁদি কেন ?" কিন্তু বুঝিতে পার নাই। আ তোমাকে তাহাই বুঝাইব। কিন্তু তুমি বুঝি কিসে ? তুমি জগতে থাকিয়াও যে জগতের দূরে তবে জগতের রহস্যে তোমার হাসি আসিবে কেন ? "মানুষ এত বুদ্ধিমান হইয়াও, এ বুঝিয়াও, একথাটি বুঝিতে পারে না যে,—যাঁহ ইচ্ছার বিরুদ্ধে দূর্ব্বার পাতাটিও কাঁপে ন তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কীটানুকীট মা —আমি চেষ্টা করিয়া কি করিব ?" কে বলি মানুষ নিজের চেষ্টা সফল হয় না বলিয়াই কাঁ তাহার কাঁদিবার কি অন্য কারণ নাই সে কাঁদে এই ভাবিয়া যে,—যদি আমার চে তেও কোন ফলোদয় না হয়, তবে আম মনে সে নিরর্থক চেষ্টার চেষ্টাই বা হয় কে 'চেষ্টা করিলে সিদ্ধ হইব"—এ ভাবই জাগিয়া উঠে কেন ? আবার এই ভাবনা

শেষে নিরাশ-মনে পরিশ্রান্ত-হৃদয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িতে হয় কেন ? চেষ্টায় যখন ফল হয় না, তখন চেষ্টাটাও না হইলেই গোল তো চুকিয়া যাইত—মানুষও সুখী হইত ! তখন তোমার মত প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারিতাম, আর আমাদের কাঁদিতে দেখিতে না ! তখন তুমি যাহা চাহিতেছ, তাহাই হইত—পৃথিবী হাসিয়া পাগল হইত !

তুমি জগতের অনেক দূরে ; তাই হাসিতে পারিতেছ ! হাসিবে, হাস ! কিন্তু আমরা ভিতরে আছি—কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়াছি, যতদিন থাকিব, ততদিন কাঁদিব। তুমি অনুযোগ করিতেছ বলিয়া কাঁদিব না কেন ? কান্না ভিন্ন পৃথিবীতে আর কি আছে ?

"জনম সবার শুধু সহিতে যাতনা।
জীবন ফুরায়ে যাবে আঁখি-জল ফুরাবে না ॥"

গিরিবালা।

(সত্যঘটনা-মূলক অপূর্ব্ব কাহিনী)

১৮৬৬ সাল। বাঙ্গালায় ঘোর দুর্ভিক্ষ। ঘরে ঘরে অন্নকষ্টের জ্বালায় লোক অস্থির হইয়াছে। দিন দিন সহস্র সহস্র লোক অন্নাভাবে উড়িষ্যা-অঞ্চলে মারা যাইতেছে। পেটের দায়ে ভদ্র গৃহস্থ-সন্তানকে নৃশংস ডাকাইতি-বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে।

বর্দ্ধমান জেলা। রাঢ় অঞ্চল। এখানকার 'কাতলামারার' কথা অনেকেই জানেন। ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষে এ 'কাতলামারার' প্রাদুর্ভাবটা কিছু বেশী বেশী হইয়াছে।

সুরেশবাবুর নিবাস নদীয়া জেলার কোন এক সামান্য পল্লীগ্রামে। ইহাঁর পূরা নাম, শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। চাকরী উপলক্ষে তিনি কলিকাতাতেই থাকেন। চাকরীও ভাল, মাসে দুই শত টাকা মাহিনা। তাহার উপর দশ টাকা উপরি-পাওনাও আছে। অবস্থা ভাল ; বাবুটীও বেশ ফিটফাট বাবু গোছের।

বর্দ্ধমান-জেলার মেমারী-ষ্টেসনের চারি ক্রোশ দূরে সুরেশবাবুর বিবাহ হইয়াছিল। সুরেশবাবুর শ্বশুর গ্রামের মধ্যে বেশ বর্দ্ধিষ্ণু লোক। অবস্থা ভাল। চাসবাস আছে ; তেজারতী-মহাজনীও আছে। শ্বশুর মহাশয়ের নাম শ্রীরামসেবক চট্টোপাধ্যায়। তাঁহার সাত পুত্র ও এক কন্যা। কন্যাটী বড় আদরের বলিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, অনেক তত্ত্ব-তল্লাস করিয়া, খুঁজিয়া পাতিয়া, সুরেশবাবুর ন্যায় সুপাত্রের হস্তে তাহাকে দান করিয়াছেন।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রগণ বিশেষ কিছু লেখাপড়া শিখেন নাই। তাঁহারা গ্রামে থাকিয়াই চাসবাস করিতেন ; এবং নিজ পৈতৃক বিষয়-বৈভব আদির তত্ত্বাবধান করিতেন।

সুরেশবাবুর স্ত্রী শ্রীমতী গিরিবালা বড়ই স্বামী-সোহাগিনী। অধিকাংশ সময়েই তিনি কলিকাতায় স্বামীর নিকট থাকিতেন। এবার কিন্তু অনেক অভিমান-আবদার করিয়া পিত্রালয়ে গিয়াছেন।

কাল শনিবার। আজ শুক্রবার রাত্রে সুরেশবাবু নিজ-শয়ন-কক্ষে একাকী শয়ন করিয়া আছেন। কিছুতেই নিদ্রা হইতেছে না। শ্রীমতী গিরিবালার জন্য তাঁহার মন আজ বড়ই উচাটন হইয়াছে। মনে মনে গিরিবালার কতই বিপদাশঙ্কা করিতেছেন। একবার ভাবিতেছেন যে,—গিরিবালার জ্বর হইয়াছিল—সুচিকিৎসা হয় নাই—গিরিবালা মারা গিয়াছে ;—আর মরিবার সময় বলিয়াছে যে,—'মরণকালেও তোমার চরণযুগল দেখিতে পাইলাম না, এই দুঃখ রহিল।' আবার মনকে প্রবোধ দিতেছেন,—না, জ্বর হইবে কেন ? তাহাহইলে তো শ্বশুর বাড়ী হইতে সংবাদ আসিত ? আবার ভাবিতেছেন,—জ্বর হয় নাই, বুঝিবা তাহার ওলাউঠা হইয়াছে। এইরূপ নানা দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনায়

সুরেশবাবুর সেই দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যা তাঁহার নিকট সেদিন কঠিন কণ্টকবৎ বোধ হইতে লাগিল। কাটা কই মৎস্যের ন্যায় সুরেশবাবু শয্যায় পড়িয়া এইরূপ ছট্‌ফট্ করিতেছেন এমন সময়ে ভোরের তোপ হইল। পাঠক মনে রাখিবেন যে, আমরা ১৮৬৬ সালের কথা বলিতেছি। সন্ধ্যার ন্যায় ভোরেও তখন কলিকাতার কেল্লায় তোপ হইত।

শয্যা হইতে উঠিয়া সুরেশবাবু ভৃত্য উদ্ধবরামকে ডাকিয়া বলিলেন,—"উদো, কাপড়-পত্র গুছাইয়া পোর্টম্যাণ্টে রাখ্, আজ দু'পুরের গাড়িতে —পুর যাইতে হইবে।" —পুরই সুরেশবাবুর শ্বশুর-বাড়ী।

বেলা আড়াইটার সময় সুরেশবাবু মেমারী-ষ্টেসনে নামিলেন। সঙ্গে ভৃত্য উদ্ধবরাম পোর্ট্‌ম্যাণ্ট সঙ্গে হাজির। পূর্ব্বে কোন সংবাদ ছিল না; তাই শ্বশুর-বাড়ী হইতে পাল্কী-বেহারা আসে নাই। আর, তখন, এখনকার মত মেমারী-ষ্টেসনে ঘোড়ার গাড়ি বা গরুর গাড়ী মিলিত না। তাই বলিয়া কিন্তু সুরেশবাবু স্থির থাকিতে পারিলেন না। ঘোর কষ্ট হইবে জানিয়াও,পথে আশঙ্কা আছে বুঝিয়াও, তিনি পদব্রজে গমনই সাব্যস্থ করিলেন। সঙ্গে কেবল আর একজন মুটে নিলেন। তাঁহার শুনা ছিল যে, বেশী লোক দেখিলে 'কাতলা-মারা' ডাকাইতেরা সহজে নিকটে ঘেঁসে না।

তাঁহারা প্রাণপণে হাঁটিয়া যাইয়াও, শীতের বেলা বলিয়া, সন্ধ্যার পূর্ব্বে গ্রামে পৌঁছিতে পারিলেন না। বলা ভাল যে, পৌষমাসে সুরেশবাবু শ্বশুর-বাড়ী যাইতেছিলেন; নতুবা তাঁহার পোর্টমেণ্টের ভিতর কমলা-লেবু, ফুলকপি থাকিবে কেন? গ্রামের তিন পোয়া আন্দাজ বাকি থাকিতে ঘুলি ঘুলি সন্ধ্যা হইল।

সুরেশচন্দ্র মনের ব্যগ্রতায় এবং কতক ভয়েও একটু বেগে ছুটিতেছেন। কাজেই চাকর ও মুটে কিছু পিছাইয়া পড়িয়াছে। পথে সুরেশবাবু সর্ব্বাগ্রে, তাঁহার ৩০।৪০ হাত পিছানে ভৃত্য, এবং তাহার প্রায় রশিখানেক পশ্চাতে মুটে। গ্রামে পৌঁছিবার আর এক পোয়া মাত্র বাকী।—সম্মুখেই ঐ কেওরাপাড়া! এমন সময়, হঠাৎ পিছানদিক হইতে "মাগো" বলিয়া চীৎকার হইল। সুরেশবাবু এবং উদ্ধবরামের মুখ হঠাৎ পশ্চাৎদিকে ফিরিল। তাঁহারা দেখিলেন,—মুটের মস্তকে কাহার ভীষণ লাঠি পড়িল; আর সেও ভূতলে পড়িল। ইহা দেখিয়াই তাঁহারা দু'জনে—"মা গো, মলেম গো!—আমাদিগকে মারিয়া ফেলিল গো!—কে কোথায় আছ!"—এই বলিয়া ছুট দিলেন। সুরেশ বাবু ছুটিলেন, সম্মুখে শ্বশুর-গ্রামের কেওরাপাড়ার দিকে; আর উদ্ধবরাম ছুটিল মাঠের দিকে।

ক্রমে ৫।৬ মিনিট পরে, দৌড়িতে দৌড়িতে সুরেশবাবু এক কেওরাবাড়ীর উঠানে—"মারিয়া ফেলিল"—এই কথা বলিতে বলিতে গিয়া আছাড়িয়া পড়িলেন। যেই পড়া, সেই মূর্চ্ছা!

ক্রমে কেওরাপাড়ায় লোকজড় হইল। নেত্য কেওরাণী আসিল, বামা কেওরাণী আসিল; আরও কত কে আসিল। তাহাদের অনেক সেবা সুশ্রূষায় ক্রমে সুরেশবাবুর মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল—চৈতন্য হইল। তাঁহার মুখে, তিনি গ্রামের চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জামাতা,—এই সংবাদ পাইয়া,কেওরারা অতি যত্ন করিয়া তাঁহাকে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে লইয়া গেল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও জামাইকে দেখিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলেন। বাটীর ভিতর সংবাদ গেল; সকলেই মহা উল্লাসিত হইলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জামাতা শ্রীমান সুরেশচন্দ্রের মুখে পথের দুর্ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত শুনিয়া কতই দুঃখ করিতে লাগিলেন। তবে এ সময় তাঁহার মুখশ্রী একটু বিমর্ষ হইয়াছিল। জামাই বাপাজী কিন্তু সে ভাব বুঝিতে পারেন নাই।

জামাতা বাড়ীর ভিতর গেলেন। শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী আদরের ধন জামাই-রতনকে পাইয়া কতই আদর-আপ্যায়িত করিলেন; এবং তাঁহার পথের কষ্টের দরুণ কতই আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। উদ্ধবরামের অনুসন্ধানেও বাড়ীর দুই জন কৃষাণকে পাঠান হইল।

শ্বশুর-বাড়ী আসা-পর্য্যন্ত সুরেশবাবু একজন সম্বন্ধীকেও বাড়ীতে দেখিতে পান নাই। তাঁহারা কোথায়, শ্বশুর মহাশয়ের নিকট একথা জিজ্ঞাসাও করিয়াছিলেন। কিন্তু উত্তর পাইয়াছিলেন,—"কেহ মাঠে চাসবাস দেখিতে, কেহবা গ্রামান্তরে তাগাদাপত্র করিতে গিয়াছে; সত্বরই বাটী ফিরিবে।"

ক্রমে পৌষের রাত্রি ৯টা বাজিয়া গেল। জামাতা সুরেশচন্দ্র,জলযোগের পর,বাটীর ভিতর শয়ন-কক্ষে যাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। বাড়ীর মেয়েরা জামাতার জন্য অন্ন-ব্যঞ্জন ও পিষ্টকান্নের জন্য ব্যস্ত রহিলেন। কর্ত্তা চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কেবল একাকী সদরবাটীতে বৈঠকখানা ঘরে গুড়ুক ফুঁকিতে লাগিলেন।

কর্ত্তা অন্যমনে গুড়ুক ফুঁকিতেছেন, এমন সময়—রাত্রি আন্দাজ ১০টার পর, তাঁহার পুত্রগণ একত্রে তাঁহার নিকট উপস্থিত। কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সংবাদ কি?" পুত্রেরা উত্তর করিল,—"সর্ব্বনাশ হইয়াছে! আর রক্ষা নাই! আজ শীকার পলাইয়াছে। হয় তো আমরা সকলেই কাল মারা যাইব!" কর্ত্তার অন্যমনস্ক ভাব আরও তখন বেশী হইল। তিনি তখন আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত শুনিবার জন্য পুত্রাদিগকে অনুরোধ করিলেন। তাহাতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তখন বলিতে লাগিলেন,—"গ্রামের কেওরাপাড়ার মাঠে তিনটা লোক আসিতেছিল। দুইটাকে আমরা 'খাল' করিয়াছি; সমস্ত জিনিস পত্রও পাইয়াছি। কিন্তু আগের শীকারটা পলাইয়াছে। তাহার গায়ের শাল রাস্তায় কুড়াইয়া পাইয়াছি। কিন্তু লোকটার সন্ধান পাইতেছি না। তাহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে এত রাত্রি হইয়াছে। আপনাকে সংবাদ দিয়াই, আবার তাহাকে খুঁজিতে বাহির হইব। যেমন করিয়া হউক, তাহাকে রাত্রির মধ্যে শীকার করা চাই-ই! নতুবা তো আর কোন মতেই রক্ষা নাই?" এই কথা বলিয়া পুত্রেরা উঠিবার চেষ্টা করিল। কর্ত্তা নিবারণ করিলেন। বাধা পাইয়া পুত্রেরা বিরক্ত হইল; কিন্তু আজ্ঞা অমান্য করিল না। কর্ত্তা তখন অতি মৃদুভাবে পুত্রদিগকে বলিলেন,—"সে লোকের অনুসন্ধানে আর দরকার নাই। সে আমাদের সুরেশ। তোমার আসিবার পূর্ব্বেই, তাহার নিকট সমস্ত কথা শুনিয়াই আমি সব বুঝিয়াছি। সে এখন বাটীর ভিতর শুইয়াছে। দ্রব্যাদি গাপ করিয়া তোমরাও যাইয়া এখন হাত-পা ধুইয়া বিশ্রাম কর। দেখা হইলে বলিও যে, "আমরা কার্য্যান্তরে ব্যস্ত ছিলাম; তাই আসিতে দেরী হইয়াছে।" এই কথা শুনিয়া সর্দ্দার জ্যেষ্ঠপুত্র কর্ত্তাকে বলিলেন,—"এ আপনার কেমন কথা? তাহাকে না মারিয়া আমরা তো আজি জলগ্রহণ করিব না! ভগ্নীপতি হইলে কি হয়? সে কলিকাতায় গিয়া এ বিষয়ে মহা হুলস্থুল বাধাইবে; এবং আমাদের সাত ভাইকে সাত সাত বৎসর করিয়া জেলে পাঠাইবে বা ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলাইবে। কারে পাইয়া তাহাকে কি আর ছাড়িতে আছে? আপনার হুকুম পাইলে,বলুন, আগে তাহাকে আমারা মারিয়া আসি।" কর্ত্তা বড়ই বিপাকে পড়িলেন; বলিলেন,—"বুঝি সব; কিন্তু সে যে জামাই! বিশেষ আপন ঘরে রহিয়াছে! আর, তা'হ'লে তোদের একমাত্র বোন গিরি যে বিধবা হ'বে! তা' আমি এ কার্য্যে অনুমতি দিতে পারিব না।"

জ্যেষ্ঠপুত্র আবার উত্তর করিলেন,—"আমরা সাত জনে জাহান্নমে যাইব, সে ভাল; না, গিরির একার একটু কষ্ট ভাল? আর

তার এমন কষ্টই বা কি? আমরা কি সাত ভাইয়ে তাহাকে পুষিতে পারিব না? তা' শীকার আজ ছাড়া হইতেছে না।" কর্ত্তা বলিলেন,—"সে আজ অনেক দিনের পরে এসেছে; আজ আর কিছু বলে কাজ নেই। যা' হয়, যা বার দিনই পথে করিস্। আজ এ কাজ বন্ধ থাক্।" জ্যেষ্ঠপুত্র আবার বলিলেন,—"তাও কি কখনও হয়? সে যে কাল সকালেই এখানকার থানায় গিয়েই একটা হুলস্থূল বাধাবে? জালের শীকার ছাড়তে নেই।" কর্ত্তা নেহাত বিপাকে পড়িয়া বলিলেন,—"তবে বাটীর ভিতর গিন্নিকে না হয় একবার জিজ্ঞাসা করিয়া আসি!" কর্ত্তা বাটীর ভিতর গেলেন; জ্যেষ্ঠপুত্রও সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। ব্যাপার শুনিয়া গিন্নি তারাকালী কান্না ধরিলেন। কত কাঁদিলেন-কাটিলেন, গলায় দড়ি দিতে চাহিলেন, পুকুরে ডুবিতে চাহিলেন, বিষ খাইতে চাহিলেন। কিন্তু পাষণ্ড পুত্র অঘোরচন্দ্রের মন কিছুতেই গলিল না। তাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, ভগ্নীপতি সুরেশচন্দ্রকে সেই রাত্রেই যমালয়ে পাঠাইতে হইবে।

মাতার মত করিতে পারিলেন না দেখিয়া, অঘোরচন্দ্র একটু ফাঁপরে পড়িলেন। তিনি ভাবিলেন যে—'গিরিবালা বালিকা, তত বোঝে-সোঝে না। স্বামীর অপেক্ষা ভ্রাতাদের প্রতিই তাহার মায়া বেশী। অতএব তাহাকে দিয়াই এ-কার্য্য উদ্ধার করিতে হইবে।" তখন তিনি গিরিবালার নিকটে গেলেন। অনেক ভূমিকা করিয়া, আপনাদের আসন্ন বিপদের কথা জানাইলেন। কাহার কর্ত্তৃক এ বিপদ হইতেছে, তাহা কিন্তু খুলিয়া বলিলেন না। গিরিবালার দ্বারা এ বিপদের কি উপকার হইবে, তাহাও সে বুঝিতে পাইল না। এইরূপে ভ্রাতাদের দুঃখে যখন গিরিবালার মন গলিল, যখন সে বড়দাদাকে বলিল যে,—'আমার প্রাণ দিয়াও যদি তোমাদের এ বিপদের উপকার হয়, বল, আমি তাহা করিতেছি।' তখন পাষণ্ড ভ্রাতা অঘোরচন্দ্র তাহাকে এই কথায় তিন বার শপথ লওয়াইলেন; এবং শপথ লওয়াইয়া, সন্ধ্যাকালের ব্যাপার বর্ণনা করিয়া, স্বামী-হত্যার সেই নৃশংস কথা তাহাকে শুনাইয়া দিলেন। কথা শুনিয়াই গিরিবালা কাষ্ঠ-পুত্তলিকাবৎ হতভম্ব হইল। গিরিবালার মুখেই আমরা শুনিয়াছি যে, এই কথা শুনার পর ১০।১৫ মিনিট তাহার চৈতন্য ছিল না। চৈতন্য-লাভের পর, গিরিবালা গুণের বড়দাদাকে কি বলিবে, সহসা কিছুই স্থির করিতে পারিল না; তাহার চক্ষে অবিরত জলধারা পড়িতে লাগিল। সে মৌনভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল। তখন বড়দাদা আবার বলিতে লাগিলেন,—"দ্যাখ গিরি, আমরা তোর সাত ভাই বাঁচিয়া থাকিলে তোর দুঃখ কি? তোর অন্ন-বস্ত্রের কিছু কষ্ট থাকিবে না। আমরা যেমন সাত ভাই আছি, তুইও তা'র মধ্যে সেইরূপ একজন হ'য়ে থাক্‌বি। তোর কোন কষ্টই হইবে না। আর আমরা যদি সাত ভাই এককালে মারা যাই, তা হ'লে তোর বাপের বংশ নির্ব্বংশ হইবে—ভিটেয় প্রদীপও জ্বলিবে না! এমন সর্ব্বনাশ কি তুই দেখিতে পারিবি? তোর স্বামী যে সব গহনা দিত, তাহাও নয় আমরা দিব। ভাত-কাপড় পাইবি, গহনা পাইবি; তোর আর কষ্ট কিসের? তোয় এক কাজ করিতেই হইবে?"

গিরিবালা বুদ্ধিমতী। সহসা তাহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ঘটিল। সে ভ্রাতার কথায় স্বীকৃত হইয়া বলিল,—"আচ্ছা, তাহাই হইবে! তোমরা একখানা খাঁড়া দিবে। সকলে নিদ্রিত হইলে, আমি স্বহস্তেই একাজ সমাধা করিব।" অঘোরচন্দ্র মহা আহ্লাদে বাহিরে গেলেন।

আহারান্তে সকলেই শয়ন করিলেন। গিরিবালাও স্বামীর কক্ষে। স্বামী-পার্শ্বে বসিয়া গিরিবালা অতি মৃদুস্বরে কানে কানে

স্বামীকে সকল কথাই খুলিয়া বলিতেছে। এমন সময়, বাহির হইতে অঘোরচন্দ্র গিরিকে ডাকিলেন। উদ্বেগে অঘোরের সেদিন আর নিদ্রা নাই। অঘোর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন কাজ ফরসা হইয়াছে?" গিরি উত্তর করিল,—"না, এখনও ঘুমোয়-নি! ঘুমাইলেই কাজ শেষ করিব। তোমরা নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাওগে; আমার উপরই সকল ভার রহিল—কোন ভাবনা নাই।"

ঘরে ফিরিয়া আসিয়া গিরিবালা স্বামীকে আবার সকল কথা শুনাইল। ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া পলায়ণ ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই, এ কথা বলিল। কিন্তু ডাকাইতের গ্রামে, ডাকাইতের চক্র ভেদ করিয়া, পলাইবার যে উপায় নাই, গিরিবালা তাহাও জানিত। তাই গিরিবালা সুরেশচন্দ্রকে বলিল,—"অদূরে ঐ নারিকেল-গাছে উঠিয়া তোমাকে রাত্রি কাটাইতে হইবে। নতুবা প্রাণরক্ষার আর কোন উপায় নাই।" সুরেশচন্দ্র কখনও নারিকেল-গাছে উঠেন নাই। সুতরাং তিনি গাছে উঠিতে পারিবেন না, বলিলেন। কিন্তু না উঠিলে তো আর উপায়ান্তর নাই! কাজেই প্রাণের দায়ে সুরেশচন্দ্র নারিকেল-গাছে উঠিতে লাগিলেন। বুক-হাতে হিঁচড়িয়া তাঁহাকে নারিকেল-গাছে উঠিতে হইল।

স্বামীকে কতকটা নিরাপদ দেখিয়া গিরিবালা তখন কতকটা আশ্বস্ত হইয়াছেন। তিনি কিন্তু নিজে এখন পাষাণী। নিজের প্রাণের মায়া এখন আর তাঁহার বিন্দুমাত্র নাই। অবিলম্বে ভ্রাতারা আসিয়া ব্যাপার জানিতে পারিলে, তাঁহাকে যে বধ করিবে, ইহা নিশ্চয়। আর, তিনি মারা গেলে, তাঁহার স্বামীর উদ্ধারও সম্পন্ন হইবে না, তাহাও নিশ্চয়। তাই ধ্রুব-মৃত্যু জানিয়া, তিনি সম্পূর্ণ শঙ্কাহীন। বুদ্ধি কিন্তু তখনও স্থির আছে। তখন সেই গম্ভীর নিশীথে ষোড়শী যুবতী গিরিবালা স্বামীহত্যা-অছিলায় সংগৃহীত সেই শাণিত-খড়্গ হস্তে করিয়া আপনার শয়ন-কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন। গ্রামের এক ক্রোশ দূরে পুলিশ-ফাঁড়ি। সেইখানে যাওয়াই গিরিবালার সেই বহির্গমনের উদ্দেশ্য। গিরিবালা বাহির হইলেন বটে, কিন্তু পথ দিয়া চলিলেন না। ভয়, পাছে কেহ দেখিতে পায়; আর, তাহা হইলেই যে সকল পরিশ্রম ব্যর্থ হইবে! আপথ-কুপথ দিয়া, বন-জঙ্গল ভেদ করিয়া, পুষ্করিণী পাহাড় লঙ্ঘিয়া, তিনি ফাঁড়ির দিকে গমন করিতে লাগিলেন।

রাত্রি যখন তৃতীয় প্রহর, তখন গিরিবালা ফাঁড়িতে গিয়া উপস্থিত হন। ফাঁড়িদার জমাদার সেই অসিহস্তা রমণীকে দেখিয়া প্রথমে বড়ই ভীত হইলেন। তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া, ফাঁড়িদারের মনে প্রকৃতই বড় আশঙ্কা হইল। কিন্তু ব্যাপার বুঝিতেও বড় বেশীক্ষণ লাগিল না। গিরিবালা সত্বরে অথচ সংক্ষেপে ফাঁড়িদারকে সকল অবস্থাই বুঝাইয়া বলিলেন; এবং অবিলম্বে সদল-বলে যাইয়া তাহার স্বামীকে রক্ষা করিবার জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয়ে অনুরোধ করিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই ফাঁড়িতে প্রায় ৫০ জন চৌকিদার-কনষ্টেবল সমাগত হইল। তখন সেই ভীমা রমণী তাহাদের অগ্রণী হইয়া স্ব-গ্রামাভিমুখে চলিলেন। প্রায় রাত্রি-শেষ তাঁহারা গ্রামে গিয়া পৌঁছিলেন।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সপ্ত পুত্র গ্রেপ্তার হইল। সুরেশচন্দ্রকে অতি কষ্টে সেই নারিকেল বৃক্ষ হইতে নামান হইল। আসামীরা সদরে চালান গেল। বর্দ্ধমানের দায়রায় ইহাদের বিচার হইয়াছিল। অঘোরনাথেরা সাত ভাই চিরজীবনের জন্য দ্বীপান্তরে প্রেরিত হয়। আর সেই পর্য্যন্ত এ অঞ্চলে 'কাতলা-মারার' প্রাদুর্ভাব কমিয়া আইসে। এইরূপে এক গিরিবালার বুদ্ধি-কৌশলে তাহার স্বামীর

জীবন রক্ষা হইল, দেশেও শান্তি স্থাপিত হইল।

শশাঙ্ক-শেখর।

(আত্ম-কাহিনী)

শিরিশকুমারের এজেহার শেষ হইলে, হুগ্‌লী এবং বারাসতের দুই জন দরওয়ানের ডাক হইল। বারাসতের দরওয়ান স্বীকার করিল,—"আমি অর্থলোভে, দশ বৎসর পূর্ব্বে যখন মেজোবাবু শিরিশকুমারের বন্দীভাবে রক্ষণাবেক্ষণের ভার আমার উপর অর্পণ করিয়াছিলেন তখন, উক্ত কার্য্যের ভার লইয়াছিলাম। কিন্তু পরে যথেষ্ট অনুতাপ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, শিরিশকুমার বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে উদ্ধার করিব। আরও, যদি তখন উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিতাম তাহাহইলে মেজোবাবুর কৌশল-চক্রে পড়িয়া, আমার এবং শিরিশবাবুর উভয়েরই প্রাণহানির সম্ভাবনা ছিল।"

হুগ্‌লীর দরওয়ান স্বীকার করিল,—"আমি সমস্ত কাজই অর্থলোভে আর নিজ-প্রাণ-হানির আশঙ্কায় করিয়াছি। কারণ, মেজোবাবু যে প্রকার দুর্দ্দান্ত লোক—যিনি কথায় কথায় মানুষ খুন করেন, যাঁহার গুপ্তহত্যায় আজিও কত মানব-কঙ্কাল ভাগিরথী-তীরে অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় পাওয়া যাইতে পারে—তাঁহার কাছে আমার প্রাণ কোন ছার! যদি তাঁহার মনের কথা জানিয়া তাঁহার কথায় অস্বীকার করি, তাহাহইলে আর আমার বাঁচিবার আশা নাই—যে কোন প্রকারেই হউক না কেন, তিনি আমায় হত্যা করিবেন,—এই ভাবিয়া-চিন্তিয়া এবং অর্থের লোভে পড়িয়া, আমি উক্ত ব্যাপারে অস্বীকৃত হইতে পারি নাই। অধিকন্তু, মুখ ফুটিয়াও কাহাকে বলিতে সাহসী হই নাই; কারণ, মেজোবাবুর অর্থে পরিপুষ্ট এত গোরে দা ফিরিত যে, যদি আমি কখনও কাহারও নিকট এ কথা বলিতাম, তাহাহইলে নিশ্চয় আমার গর্দ্দান যাইত। একথা কেবলমাত্র আমার মামাতোভাই বারাসতের দরওয়ানকে আমি বলিয়াছিলাম। কারণ, মেজোবাবুর অত্যাচারের চোটে আমার এত দুঃখ হইত যে, আমি হয় নিজে খুব অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়া অথবা কাহাকেও সে দুঃখের কথা শুনাইয়া, তবে কিছু স্থির হইতে পারিতাম।"

তা'রপর শিরিশকুমারের মাতার ডাক হইল। তিনি একটী ঘরের ভিতর থাকিয়া শিরিশকুমারকে যাহা বলিতে লাগিলেন, শিরিশকুমার আবার তাহা কৃষ্ণদাসবাবুকে বলিতে লাগিলেন; এবং কৃষ্ণদাসবাবু ইংরাজী করিয়া তাহাই ইন্‌স্পেক্টার মহাশয়কে শুনাইতে লাগিলেন।

শিরিশকুমারের মাতা বলিলেন,—"আমি সিমলার দত্তবংশের কুলবধূ। ধনবান শ্বশুর দেখিয়া আমার পিতা আমার বিবাহ দেন। আমার স্বামী শ্বশুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র; তাঁহারা দুই সহোদর। একজন পাপাত্মা-পিশাচ হরিদাস দত্ত—যাহার নাম করিতেও আমার যথেষ্ট ঘৃণা হয়; আর একজনের নাম গোবিন্দদাস দত্ত। আমার স্বামী স্বকৃত উপার্জ্জনে তিন লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া যান। মৃত্যুকালে তিনি উইল করেন যে,—তাঁহার অবর্ত্তমানে আমি তাঁহার বিষয়ের তত্ত্বাবধারিণী হইব; এবং আমার নাবালক পুত্র শিরিশকুমার বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে উক্ত বিষয় এবং পৈতৃক অন্যান্য বিষয় যাহা তাঁহার অংশে পড়িবে, তাহার সমস্তই পাইবেন। আমার দেবর হরিদাস দত্ত—যিনি এখন আপনাদিগের আসামী, পূর্ব্বে আমায় যথেষ্ট ভক্তি করিতেন; এবং আমিও তাঁহাকে নিজ ভ্রাতার ন্যায় ভাল বাসিতাম। তিনি একদিন আমার পুত্রকে নৌকা-ভ্রমণচ্ছলে লইয়া যান। তা'র পরে এই দশ বৎসর আমার পুত্রকে তিনি কোথায় রাখিয়াছিলেন, তাহা আমি জানিতাম না। এতদিন আমি জানিতাম, আমার পুত্র নৌকাডুবি হইয়া ভাগিরথী-সলিলে নিমগ্ন হইয়াছে। কিন্তু ভগবান আবার আমার নীলমণি আমায় আনিয়া দিয়াছেন। যাহা হউক, পুত্রকে নৌকা-ভ্রমণচ্ছলে লইয়া গিয়া যেদিন কর্দ্দমাক্ত কলেবরে ও সিক্তবসনে কপট-ক্রন্দন করিতে করিতে দেবর বাটী ফিরিয়া আসিলেন, সেদিন কেহই তাঁহার উপর সন্দেহ করেন নাই। আমি ও সন্দেহ করি নাই। কিন্তু সেই অবধি দেবর আমার অনিষ্ট-চেষ্টায় রত হন; একদিন আমি কোন আত্মীয়ের বাড়ী নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিতে যাই। আসিবার সময়ে তাঁহার শিক্ষিত কচুয়ান আমায় বাটীতে না লইয়া গিয়া বরাবর উল্‌টা-ডিঙ্গির বাগানে লইয়া যায়। তথা হইতে আমায় ঔষধের দ্বারা অজ্ঞান করিয়া হুগ্‌লীর বাগানে আনিয়া বন্দিনী করিয়া রাখা হয়। তা'রপর যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা বোধ হয়, আপনারা শুনিয়াছেন। আমার বলা বাহুল্য।"

এইবার হরিদাস দত্তের এজেহার লওয়া হইল। তিনি স্থির-গম্ভীরভাবে আপন দোষ স্বীকার করিলেন। ইন্‌স্পেক্টার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভবানীপুরে তোমার সরকার যে লোককে তোমার অনুমতিতে খুন করিয়াছে, সে কে?"

হরিদাস।—"সে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দদাস দত্ত।"

যে মুহূর্ত্তে হরিদাসবাবু নিজমুখে স্বীকার করিলেন,—"সে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দদাস দত্ত"; সেই মুহূর্ত্তে সেই ঘরে যে যে ছিল, সকলেই শিহরিত হইয়া উঠিল। শিরিশকুমারের বদন আরক্তিম ভাব ধারণ করিল; সে একবার দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিল, তার পর ক্রন্দন করিয়া ফেলিল। শিরিশকুমারের মাতা—"পামর! পিশাচ!—নরপশু!"—ইত্যাদি কথা বলিতে বলিতে, ক্রোধে কম্পান্বিত কলেবরে সেইখানে বসিয়া পড়িলেন।

হল্-ঘরের এক পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র ঘর ছিল। হরিদাস দত্তকে তখন সেই ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। যখন হরিদাস দত্তকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য সেই ঘরে লইয়া যাওয়া হয়, তখন তিনি একজন সাহেব ইন্‌স্পেক্টারকে চুপি চুপি কি বলিলেন। ইন্‌স্পেক্টারও তখন তাঁহার সহচরকে চুপি চুপি কি বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বলছে? আর ঘণ্টা দুই মাত্র রাত্রি অবশিষ্ট আছে। হাত পায়ের বেড়ী খুলিয়া দিলে হানি কি? এখান থেকে তো আর পালাতে পারবে না—ঘর তো বন্ধই থাকবে?" সহচর তাহাতে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিল। হরিদাসবাবুর হাতের হাতকড়ি উন্মুক্ত হইল। একজন ইন্‌স্পেক্টার সেই ক্ষুদ্র গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া, একখানি চেয়ার লইয়া তথায় উপবেশন করিলেন। আর, অপর একজন বাহির্দ্দিকে হল্-ঘরের একটী দরজার সাম্‌নে দর-দালানে এক খানি কৌচের উপর শয়ন করিলেন। তদ্ভিন্ন, পাঁচ জন পাহারওয়ালা হল্-ঘরের অন্যান্য দরজায় দণ্ডায়মান রহিল; এবং দশ জন এদিক-ওদিক চৌকি দিতে লাগিল।

ইহার পরই এ ঘটনার অন্তিম দৃশ্য। তাহার বিস্তারিত বিবরণ আর বলা বাহুল্য। পাপের উচিত শাস্তি জগতে চিরদিনই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং উপসংহার এখন এইখানেই রাখিলাম।

সম্পূর্ণ।

পরেশনাথ মিত্রের

রত্নগৃহের জুয়াচুরি-কাণ্ড।

সাফাই সাক্ষী।

গতবারের 'অনুসন্ধানে' পাঠক জানিতে পারিয়াছেন যে, পরেশনাথ মিত্র, ধীরেন্দ্রনাথ পাল প্রভৃতি ৯ জনকে আপনার পক্ষে সাফাই-সাক্ষ্য মান্য করিয়াছিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ পাল, রামচন্দ্র মল্লিক প্রভৃতি পাকা জুয়াচোরকে

এইরূপে সাক্ষ্য-শ্রেণীতে পাইয়া আমাদের মনে বড়ই আশা হইয়াছিল যে, ইহাদের নিজ-মুখে ইহাদের জুয়াচুরি-কাণ্ডটা জেরা-সওয়ালের উত্তরে একবার প্রকাশ করিয়া, সাধারণকে পরিতৃপ্ত করিব। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, আমাদের সে আশা মিটে নাই। মকর্দ্দমার ধার্য্য-দিনে পরেশনাথের এই সব গুণধর বন্ধুগণ, আদালতে যদিও উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু সাহস করিয়া সাক্ষ্য-শ্রেণীতে দাঁড়াইতে পারেন নাই। পরেশনাথও সাহস-ভরে ইহাঁদিগকে সাফাই-সাক্ষ্যরূপে হাজির করিতে পারেন নাই। কাজেই আমাদের এ আশা বিফল হইয়াছে।

এ কাণ্ডে ধীরেনের ব্যবহার।

প্রথম অনুসন্ধান-কালে পরেশনাথ নিজ-মুখে ধীরেন্দ্রনাথ-সম্বন্ধে পুলিশ-কর্ম্মচারীর নিকট যাহা বলিয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ কথা মকর্দ্দমার সময়ে ধীরেন-সম্বন্ধে প্রকাশ হয় নাই।

ধীরেনকে কিন্তু আমরা এ মকর্দ্দমার প্রধান তদ্বিরকারক দেখিয়াছি। ধীরেন মকর্দ্দমার তদ্বির করিতে পরেশনাথের সঙ্গে দুই বার ধুবড়ী গিয়াছিলেন। সাক্ষীর যে তালিকা দেওয়া হয়, তাহাও যে ধীরেনের দত্ত, আমাদের এইরূপই বিশ্বাস। পরেশকে চার্জ্জ করা হইল দেখিয়া ধীরেন হয় তো একটু চঞ্চল হইয়াছিলেন; তাই আপনার নামটাও সাক্ষী-শ্রেণীতে দিয়াছিলেন। অন্যান্য সাক্ষীর কলিকাতায় কমিশনে সাক্ষ্য লওয়ার যখন বন্দোবস্ত হয়, তখন ধীরেন ধুবড়ীর আদালতেই উপস্থিত ছিলেন। তাই ম্যাজিষ্ট্রেট ধীরেনের সাক্ষ্য ধুবড়ীতেই লওয়া হইবে তাহাই সাব্যস্থ করেন; এবং তজ্জন্য ১৭ই জানুয়ারী ধুবড়ী উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিবার সর্ত্তে ধীরেনের নিকট হইতে এক মুচলেখাও লওয়া হয়। ইহার কিছুক্ষণ পরেই বোধ হয় তাঁহার চৈতন্য হয়। সাক্ষী-শ্রেণীতে দাঁড়াইলে নিজের কিরূপ বিপদ, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন। তাই তখন আপনাকে এ দায় হইতে এড়াইবার জন্য কৌশল-জাল-বিস্তারের ফাঁদ পাতিলেন। ৩১এ ডিসেম্বর মকর্দ্দমা হয়; ১লা জানুয়ারী বন্ধের দিন। সেই বন্ধের দিনই ধীরেন্দ্রনাথ বিচারক এ্যাসিষ্টাণ্ট কমিশনর বাহাদুরের নিকট তাঁহার সাক্ষ্য কলিকাতায় কমিশনে লইবার জন্য কতকগুলি মিথ্যা হেতুবাদ দেখাইয়া এক দরখাস্ত করেন। তাঁহার সে দরখাস্তের তিনটী হেতুবাদ এই;—

"(2) That he is a resident of Calcutta and the Editor of a vernacular weekly news-paper; that he came to Dhubri to report the case in his paper, as a rival paper sent a representative to watch the case.

(3) That it would be very inconvenient for him to come again to Dhubri, leaving behind his editorial works, as he intended to send a representative next hearing day.

(4) That your honour's petitioner's business will seriously be harmed, if he has to come again to Dhubri."

ইংরাজী অনভিজ্ঞ পাঠকের জন্য, ইহার মর্ম্মার্থটুকও নিম্নে দিলাম। দরখাস্তে ধীরেন্দ্রনাথ বলিতেছেন যে,—"তাঁহার নিবাস কলিকাতায় এবং তিনি একখানি বাঙ্গালা সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের সম্পাদক। আপনার কাগজে এ মকর্দ্দমা-বিবরণ প্রকাশ করিবার জন্য তিনি ধুবড়ী আসিয়াছেন। সম্পাদকীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আবার তাঁহার ধুবড়ী আসা বড়ই অসুবিধা হইবে। সেজন্য তিনি তাঁহার কাগজে, মকর্দ্দমা-বিবরণ লিখিবার জন্য, আপনার একজন প্রতিনিধি পাঠাইতে চান। আবার ধুবড়ী আসিলে তাঁহার কার্য্যের গুরুতর ক্ষতি হইবে।"

ম্যাজিষ্ট্রেট অবশ্য এইসব হেতুবাদ সত্য-জ্ঞানে ধীরেন্দ্রনাথের আবেদন মঞ্জুর করেন। কিন্তু আমরা জানি, এ হেতুবাদের একটী বর্ণও সত্য নহে। ধীরেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ মিথ্যা বর্ণনা করিয়া, ম্যাজিষ্ট্রেটকে ভ্রমে ফেলিয়াছেন। যাইহোক, ম্যাজিষ্ট্রেট যদি একবার একথা জানিতে পারেন, তাহা হইলে আদালতের সহিত মিথ্যা প্রবঞ্চনা করার দরুণ তাঁহাকে অবশ্য দণ্ডিত হইতে হইবে। কথাটা মিথ্যা কিরূপ, তাহা একটু খুলিয়া বলি।

ধীরেন্দ্রনাথ 'শান্তি' সংবাদ-পত্রের সম্পাদক ও সত্বাধিকারী ছিলেন। পূজার কিছুদিন পর হইতেই 'শান্তি' উঠিয়া গিয়াছে। অতএব পূজার কিছুদিন পর হইতেই তিনিও কোন সাপ্তাহিক বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সম্পাদক নহেন। কাগজেরই যখন অস্তিত্ব নাই, তখন তাহার জন্য আবার রিপোর্ট প্রকাশ কি? বিশেষ, সকলেই জানে যে, ধীরেন্দ্রনাথ এ 'রত্নগৃহ'-কাণ্ডে ঘনিষ্টরূপে সংলিপ্ত। পরেশনাথের চাল-চলনে বা ব্যবহার-দোষে পাছে একান্তে তাঁহাকে কোনরূপে বিপাকে পড়িতে হয়,—এই ভয়ে, পরেশনাথের পক্ষ হইয়া—বন্ধুরূপে তাঁহার মকর্দ্দমার তদ্বির করিতেই, তিনি বার বার দুইবার ধুবড়ী গিয়াছিলেন। ফলতঃ তাঁহার সম্পাদকীয় কাজের কথা সম্পূর্ণ ভুয়াবাজী।

যাহাই হউক, ধীরেন্দ্রনাথকে লইয়া আর আমরা আজকাল কিছু নাড়া-চাড়া করিতে চাহি না। শুনিয়াছি, পরেশের কঠোর দণ্ড দেখিয়া ধীরেন্দ্রনাথ দুঃখিত ও সন্তাপিত হইয়াছেন। তিনি নাকি জুয়াচোরদিগের সংসর্গ ত্যাগ করিয়া, জুয়াচুরী-ব্যবসায় ত্যাগ করিবেন বলিয়া, প্রতিজ্ঞাবদ্ধও হইয়াছেন। কিন্তু সহজে তো একথায় বিশ্বাস হয় না? জুয়াচুরী যে ধীরেন্দ্রনাথের স্বভাবজ রোগ! তবে ভগবানের কৃপায় তিনি যদি এ রোগ হইতে পরিত্রাণ পান, তাহাহইলে আমরা প্রকৃতই সুখী হইব।

সাফাই—কমিশনে।

গত ১৪ই জানুয়ারী মঙ্গলবার তারিখে কলিকাতার পুলিশ আদালতে আসামীর পক্ষের নয়জন সাক্ষীর মধ্যে দুইজন-মাত্র সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হয়। বক্রী সাতজন সাক্ষীকে পরেশনাথের পক্ষ হইতে 'এব্‌রা' করা হইয়াছিল। যে দুইজনের সাক্ষী গৃহীত হইয়াছে, তাহাদের সাক্ষীর জবানবন্দী এই:—

ভূতনাথ উকীলের সাক্ষ্য।

১৬৯ নম্বর মানিকতলা-ষ্ট্রীটের 'নূতন বাল্মীকি-যন্ত্রালয়ের' আমি 'হেড কম্পোজিটর'। গত ৫।৬ বৎসর হইতে আমি ঐ কার্য্যে নিযুক্ত আছি। গত কার্ত্তিক মাসে 'রত্নগৃহের' জন্য আমাদের প্রেসে কাজ আসিয়াছিল। 'রত্নগৃহ' ছাপারও বন্দোবস্ত হইতেছিল। ডিমাই ১২-পেজী ফর্ম্মার ৩০ ফর্ম্মা, প্রতি ফর্ম্মা আবার দুই হাজার কাপী করিয়া, ছাপা হইয়াছিল। গত ৩রা কিম্বা ৪ঠা অগ্রহায়ণ আমার শরীর অসুস্থ হয়; এবং আমি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বাড়ী যাই। সেই সময়ই উক্ত ফর্ম্মাগুলির ছাপা শেষ হইয়াছিল। ১৫।১৬ দিন হইল, আমি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছি। আমি ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, ছাপা আরও হইয়াছে; এবং তখনও ছাপা চলিতেছে। এক্ষণে 'রত্নগৃহ' শেষ হইয়াছে। ৮৫-ফর্ম্মা পরিমিত প্রতি খণ্ড, এইরূপ দুই হাজার খণ্ড পুস্তক এক্ষণে প্রস্তুত। তাহার এই এক খণ্ড আমি আদালতে দাখিল করিতেছি। (ঐ খণ্ড তখন ডিফেন্স নং ১ এইরূপ চিহ্নিত হইল)। আর, আমি দুইখানি গরুর গাড়ি বোঝাই করিয়া ঐ দুই হাজার 'রত্নগৃহও' আনিয়াছি। ৮।১০ ফর্ম্মা পুস্তক, প্রতি ফর্ম্মা দুই হাজার করিয়া, ছাপা হওয়ার পর, হাণ্ড বিল ছাপান হইয়াছিল।

জেরা-সওয়াল।—গত কার্ত্তিক মাসে আমি প্রিণ্টার ছিলাম না। উদয়চন্দ্র পাল প্রিণ্টার ছিলেন। আমি এখনও প্রিণ্টার নই। প্রিণ্টারের উপরই ছাপাই-কার্য্যের যাবতীয় ভার থাকে। তিনি আমার উপরে। গত কার্ত্তিক মাসের প্রথমে প্রেসে কাগজ লওয়া হইয়াছিল। আমি বলিতে পারি না, কতবার কাগজ লওয়া হইয়াছিল। প্রিণ্টারই কাগজ লইতেন। আমিও কখনও কখনও, তাঁহার অনুপস্থিতি-সময়ে, কাগজ লইয়াছিলাম। প্রিণ্টার উদয়চন্দ্র পালের হুকুম-মতই আমি ছাপাই-কার্য্য করিতাম। আমি তাঁহারই হুকুম বাহাল রাখিতাম। কখনও কখনও আমি তাঁহার হুকুম-ব্যতীতও ছাপাইতাম। প্রিণ্টারের হুকুম-ব্যতীত ছাপান বে-আইনী কাজ। গত কার্ত্তিক মাসে প্রেসে কত কাগজ আসে, তাহাও আমি বলিতে পারি না। গত কার্ত্তিক মাসে প্রায় ৬০।৭০ রিম কাগজ আমি 'রত্নগৃহ'

ছাপার জন্য পাইয়াছিলাম। উহার বেশী ৩।৪ রিমও পাওয়া সম্ভব। ১৫।১৬ দিন পূর্ব্বে, আমি যখন কলিকাতায় আসিলাম, তখন দেখিলাম,—প্রায় ৫০ ফর্ম্মা ছাপা হইয়াছে। আমার স্মরণ হয় না, আসামী কলিকাতা হইতে ধুবড়ী গিয়াছিলেন কি না! অগ্রহায়ণ মাসে আমি যখন কলিকাতা হইতে যাই, তখন প্রেসে পাঁচ জন মাত্র কম্পোজিটার ছিল। সমগ্র পুস্তকখানি 'বাল্মীকি-যন্ত্রে' ছাপা হয় নাই। 'ভিক্টোরিয়া-প্রেসে,' 'রামায়ণ-যন্ত্রে', এবং 'নূতন কলিকাতা-যন্ত্রেও' উহা ছাপা হইয়াছিল। 'কহিনুর-প্রেসে' উহা ছাপা হয় নাই। প্রায় ৮।১০ দিন পূর্ব্বে পুস্তক উক্ত তিন প্রেসে ছাপাইতে দেওয়া হইয়াছিল। আমি ছাপিবার জন্য কাপি দিয়াছিলাম; এবং তাহাতে ঐ ফর্ম্মা সকল ছাপা হইয়াছিল। ঐ পুস্তকের (দাখিলী ডিফেন্স ১-চিহ্নিত পুস্তক) সমগ্র অংশ 'নূতন বাল্মিকী-যন্ত্রে' ছাপা হয় নাই। পুস্তকের মলাটের উপর প্রেসের প্রিণ্টারের নাম না-ছাপান বে-আইনি কাজ। একমাসের মধ্যে পুস্তক ছাপাইয়া দিব, আমার সহিত এইরূপ সর্ত্ত ছিল। কিন্তু আমার শরীর অসুস্থ হওয়ায়, আমি অন্য প্রেস হইতে উহা ছাপাইয়াছি। সর্ত্ত মুখে-মুখেই ছিল। এই পুস্তক উৎকৃষ্ট কাগজে ও সুন্দররূপে মুদ্রিত হয় নাই।

পুনঃ-সওয়াল।—প্রিণ্টারের অনুপস্থিতিতে ছাপাইবার ক্ষমতা আমার ছিল।

অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষ্য।

আমি একজন 'হোলসেল' কাগজ-বিক্রেতা। ১৪১ নং পুরাতন চিনাবাজারে আমার কাগজের দোকান। 'নূতন বাল্মিকী-প্রেসের' সত্বাধিকারী পরেশনাথ মিত্রের সহিত আমার কারবার আছে। আমি গত কার্ত্তিক মাসে তাঁহাকে কাগজ দিয়াছিলাম। পূজার পর আমি তাঁহাকে এক বেল অর্থাৎ কুড়ি রিম কাগজ দিই; এবং তাহার পরও সময়ে সময়ে প্রায় ১০০ রিম কাগজ তাঁহাকে দিয়াছি। আসামী বলিয়াছিলেন যে, তিনি 'রত্নগৃহের' জন্য কাগজ লইয়াছিলেন।

জেরা-সওয়াল।—আমার হিসাব-বহি আছে। খাতায় পরেশনাথের হিসাবে কাগজ-বিক্রির হিসাব আছে। নগদ-মূল্যে যে কাগজ বিক্রয় করিয়াছি, তাহা আসামীর হিসাবে লেখা নাই। আমি নগদ-মূল্যে প্রায় ৫৭।৫৮ রিম কাগজ পরেশনাথকে বিক্রয় করিয়াছি। আমি আমার খাতা আনি নাই; কারণ, আমাকে সেজন্য সমন করা হয় নাই। গত কার্ত্তিক মাসের পূর্ব্বেও আসামীর সহিত আমার কারবার ছিল। সে সময় তিনি কোন মাসে ৫ রিম এবং কোন মাসে ১০ রিম এই হিসাবে কাগজ কিনিতেন। কার্ত্তিক মাস হইতে আমি তাঁহাকে 'কৃষ্ণ-মার্কা' 'অনগ্লেজ' কোয়ালিটির কাগজ দিয়াছি। এই কাগজ (ডিফেন্স ১-চিহ্নিত পুস্তক সাক্ষীকে দেখান হইলে) সকল কাগজের শ্রেষ্ঠ নহে। তিন রকম 'গ্লেজ' কাগজ ইহার উপরে আছে। আমার একখানি পুস্তকের দোকান আছে; এবং আমি পুস্তক-বিক্রয়ের জন্য কোন কোন বাঙ্গালা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া থাকি। আমি খুজরা কাগজও বিক্রয় করি। আমি 'হোলসেল' (পাইকিরী) ও খুজরা দুই রকমেরই কাগজ-বিক্রেতা। 'অনুসন্ধান' নামক পত্রের কথা আমি শুনিয়াছি। আমি জানি না যে, ঐ কাগজে আমার বিরুদ্ধে কিছু লেখা হইয়াছিল কি না!

পুনঃ-সওয়াল।—'অনগ্লেজ' কাগজের মধ্যে ইহাই (ডিফেন্স ১-চিহ্নিত পুস্তক দেখাইয়া) ভাল। নগদ-মূল্যে যে সকল কাগজ বিক্রয় করি, তাহার হিসাব ক্রেতাদের নামে রাখি না।

নোট।—আসামীর পক্ষের উকীল মিঃ মোজেস্ সাহেব ইহার পর আর কোন সাক্ষীকে ডাকিলেন না।

সওয়াল-জবাব।

২০এ জানুয়ারী সোমবার ধুবড়ীর এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার মিঃ ষ্টাইনবার এজলাসে এ মকর্দ্দমার সওয়াল-জবাব হয়। আসামী পরেশনাথের পক্ষের উকীল বাবু দুর্গাদাস দাস প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন যে,—"আসামী পরেশনাথ ব্যবসা করিয়া দু'টাকা লাভ করিতে

বসিয়াছিলেন; লোককে ফাকি দিয়া জুয়াচুরী করা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না। পুস্তক ছাপাইবার জন্য, তিনি চেষ্টা-যত্নও করিয়াছিলেন।" এই বলিয়া তিনি পরেশনাথের মনোমত একখানি 'রত্নগৃহ' পুস্তক আদালতে দাখিল করিয়া, আবার বলিলেন যে,—'এই তো পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে! জুয়াচুরী করিয়া লোকঠকান পরেশনাথের অভিপ্রায় নহে।"

ফরিয়াদীর পক্ষীয় উকীল শ্রীযুক্ত শশীকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রত্যুত্তরে বলেন যে,—"পরেশনাথের পক্ষ হইতে যে 'রত্নগৃহ' পুস্তক দাখিল করা হইয়াছে, উহা বিজ্ঞাপনোল্লিখিত পুস্তক নহে। বিজ্ঞাপনে একশতখানি স্বতন্ত্র পুস্তক দিবার কথা, সাতটী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ আছে। কিন্তু একশত পুস্তকের সংক্ষিপ্ত-সার দিবার কথা, স্পষ্ট করিয়া একটী স্থানেও উল্লেখ নাই। ইহাতে প্রতারণা ভিন্ন আর কি বুঝিব?" উকীল মহাশয় আবার পরেশনাথের প্রদত্ত একশত পুস্তকের সংক্ষিপ্ত সার 'রত্নগৃহ' নামক পুস্তক দেখাইয়া বলেন যে,—"এই পুস্তকে 'পাঁচসপ্তাহ বেলুনে' নামক পুস্তকখানি পৌনে-চারি ছত্রে শেষ করা হইয়াছে। ইহা কি সংক্ষিপ্তসার?" বিচারক ম্যাজিষ্ট্রেট এই 'সংক্ষিপ্তসার' পড়িয়া হাসিয়াই আকুল! তখন আবার দেখান হইল যে,—কুকের 'পৃথিবী-ভ্রমণ' পুস্তক সাড়ে চৌদ্দ ছত্রে সমাপ্ত। এ পুস্তকখানিও এক মিনিটের মধ্যে আদালতে পাঠিত হইল। তখন 'কলম্বসের আমেরিকা-আবিষ্কার' পাঠ আরম্ভ হইল। এ পুস্তক 'রত্নগৃহে' সাড়ে একুশ ছত্রে সম্পূর্ণ হইয়াছে। এইরূপে দেখা গেল যে,—হিন্দুর 'অথর্ব্ববেদ' চৌদ্দ ছত্রে, যজুর্ব্বেদ তের ছত্রে, 'সামবেদ' চৌদ্দ ছত্রে শেষ হইয়াছে; মুসলমানের ধর্ম্মগ্রন্থ' কোরাণও' ষোল ছত্রের বেশী স্থান পায় নাই। রোমের সম্পূর্ণ ইতিহাসের স্থান হইয়াছে, সাড়ে-ঊণিশ ছত্রে; চীন-দর্শন 'কনফিউসস্' শেষ হইয়াছে, সাড়ে-চৌদ্দ ছত্রে। 'সক্রেটিসের' পরমায়ু ফুরাইয়াছে, স'চৌদ্দ ছত্রে। এরিষ্টটলের অপমৃত্যু হইয়াছে, সাড়ে-সাত ছত্রে। 'কান্ত-দর্শন' সাত ছত্রে এবং 'কমতিও' সাত ছত্রে এ 'রত্নগৃহ' পুস্তকে শোভা পাইয়াছে। এই সব দেখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট আর পুস্তক দেখিতে চাহিলেন না। তখন পুস্তকের কথা ছাড়িয়া, উকীল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দেখাইতে লাগিলেন যে—"পরেশনাথের বিজ্ঞাপনের আরও স্থানে স্থানে প্রতারণা আছে। পরেশনাথের সাক্ষী ভূতনাথ বলিতেছেন যে, পুস্তক আট-দশ ফর্ম্মা ছাপান পরে বিজ্ঞাপন বাহির হয়; বিজ্ঞাপনে কিন্তু বলা হইয়াছে যে 'পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।' ইহা এক প্রতারণা। আবার দেখুন, বিজ্ঞাপনে বলা হইয়াছে যে,এই একশত পুস্তক 'অতি উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়াছে।' কিন্তু পরেশনাথের সাক্ষাই সাক্ষী দু'জনেই বলিতেছেন যে,—দাখিলী 'রত্নগৃহ' পুস্তকের কাগজ ও ছাপা উভয়ই উৎকৃষ্ট নহে। আবার দেখুন, পরেশনাথ বিজ্ঞাপনে বলিতেছেন যে,—এই একশত পুস্তকের মূল্য অতি কম হইল দুই শত টাকার কম নহে। কিন্তু অত্যধিক বিক্রয়-আশায় বহু পুস্তক ছাপাইয়াছি এবং বিলাতী নিয়মে মুদ্রণকার্য্য শেষ করিয়াছি বলিয়া, আমরা সাধারণের সুবিধার জন্য, ইহার মূল্য পাঁচ টাকা ধার্য্য করিলাম।' কিন্তু দেখুন, (দাখিলী পুস্তক দেখাইয়া) পুস্তকের মূল্য দুই শত টাকা দূরে যাউক, দুই টাকাও এ দাখিলী হইবে কিনা সন্দেহ।"

ইহার পরেও আসামীর উকীল দুই এক কথায় বাদীর উকীল মহাশয়ের কথার প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন। তাহার উদ্দেশ্য এই যে,—বাদী 'সারসংগ্রহ' দিব, বিজ্ঞাপনের মধ্যে আভাষে দুই এক স্থানে এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন।

এইরূপ সওয়াল-জবাব হওয়ার পর, ম্যাজিষ্ট্রেট পরদিন রায় দিবেন, প্রকাশ করিলেন।

আসামীর দণ্ড।

পরদিন ২১এ জানুয়ারী মঙ্গলবার বিচারক এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার মিঃ ষ্টাইনবরা বাহাদুর রায় প্রকাশ করিয়া আজ্ঞা দেন যে,—প্রতারণার অপরাধে আসামী পরেশনাথ মিত্রের ছয় মাস কঠিন পরিশ্রম-সহ কারাদণ্ড হইল।

উপসংহার।

বেচারী পরেশনাথের জন্য এখন আমরাও দুঃখিত। ভদ্র-লোকের ছেলে সঙ্গ-দোষে মন্দকাজ করিয়া আজ বড়ই বিপদগ্রস্ত। কিন্তু চারা নাই! বিজ্ঞাপনের জুয়াচুরীর আজকাল যেরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে দুই-একজনের এইরূপ দণ্ড না হইলে এ জুয়াচুরীর দমন হইবে না। আর, এই কারণেই,আমরা সমিতির পক্ষ হইতে পরেশনাথকে দণ্ড দিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলাম। নতুবা পরেশনাথের প্রতি আমাদের কোন রাগ-দ্বেষ কখনও ছিল না; কিম্বা এখনও নাই। আমাদের আশা, পরেশনাথের এ দণ্ডে জুয়াচোর-দলের যেন শিক্ষা হয়! আর, তাহাহইলে, তাঁহাদের কলঙ্ককাহিনী লিখিয়া আমাদিগকেও 'অনুসন্ধানের' অঙ্ক কলঙ্কিত করিতে হইবে না; এবং তাঁহারাও সুখে থাকিবেন। ভগবান এমন সুমতি তাঁহাদিগকে দিবেন কি?

শুনিতেছি, পরেশনাথ এসিষ্টাণ্ট কমিশনর বাহাদুরের এই আজ্ঞার বিরুদ্ধে আসাম-প্রদেশের জুডিসিয়াল কমিশনার বাহাদুরের নিকট আপিল করিবেন। আপিলে তাঁহার দণ্ডের কথঞ্চিৎ লাঘব হইল আমরাও সুখী হইব।

কৃতজ্ঞতা।

এ মকর্দ্দমায় অনেক সদাশয় ব্যক্তির নিকট আমরা সবিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। তাঁহাদের সাহায্য না পাইলে আমরা এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম কি না, সন্দেহ। যাঁহারা এ বিষয়ে 'অনুসন্ধান-সমিতিকে' সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটে সমিতির সদস্যগণ চির-কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ থাকিবেন। এ মকর্দ্দমায় অনেকে অর্থ-সাহায্য করিতে চাহিয়াছিলেন; এবং তন্মধ্যে কলিকাতা বড়-বাজার, দয়েহাটার শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এককালীন একশত টাকা দান করিয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। আসাম—ধুবড়ীর উকীল শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শশীকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ দাস মহাশয়েরা সাধারণের উপকার বুঝিয়া, সমিতির সাহায্যার্থ জুয়াচোরকে জব্দ করিবার জন্য, উপরোক্ত মকর্দ্দমায় বাদী আনন্দচন্দ্র দত্তের পক্ষে ওকালতী গ্রহণ করেন। নিজের স্বার্থ ক্ষতি করিয়া, নিস্বার্থ-ভাবে—দশের উপকারের জন্য, তাঁহারা এ মকর্দ্দমার জন্য সবিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। আর,তাঁহাদের সমবেত যত্ন-চেষ্টা এবং পরিশ্রম-ফলেই আমরা এ-ব্যাপারে কৃতকার্য্য হইয়াছি। তজন্য তাঁহারা আমাদের অগণ্য ধন্যবাদের পাত্র। কলিকাতা-পুলিশ-আদালতের উকীল শ্রীযুক্ত কানাইলাল মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়-দ্বয়ও, কলিকাতায় কমিশনে সাক্ষ্য-গ্রহণ-কালে, যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাদের নিকটও আমরা কৃতজ্ঞ। ধুবড়ীর এবং কলিকাতা-পুলিশ-আদালতের আমলাবর্গের সদ্ব্যবহারেও আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট আছি। এসকল ভিন্ন, সর্ব্বাপেক্ষা সবিশেষ সাহায্য আমরা পাইয়াছি, 'বঙ্গবাসী'-আপিস হইতে। 'বঙ্গবাসী'-আপিসের কর্ত্তৃপক্ষগণ আমাদিগকে এ ব্যাপারে অর্থ, পরিশ্রম, যত্ন, উদ্যোগ সকল বিষয়েই সবিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। ইহাঁদের সকলের নিকটই আমরা চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, 'অনুসন্ধান-সমিতির' প্রতি ইহাঁদের সহানুভূতি যেন চিরকালই রহিয়া যায়। আর, তাহা হইলে, অনুসন্ধানের বল-বৃদ্ধি এবং দশের উপকার উভয়ই হইবে।

পরিশেষে এও বলা বোধ হয় অসঙ্গত নহে যে, এই মকর্দ্দমায় আমাদের যে বিপুল অর্থ-ব্যয় হইয়াছে, আমাদের অনেক মেম্বর ও বন্ধুবান্ধবগণ আমাদিগকে সে সম্বন্ধেও সাহায্য করিবেন বলিয়া আশ্বস্ত করিয়াছেন ও করিতেছেন। ফলতঃ যদি তাঁহারা প্রকৃতই আমাদিগকে সেরূপ কোন সহায়তা করেন, তাহা হইলে সে বিবরণও পরে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

---

* ধুবড়ী হইতে রায়ের নকল এখানে কিছু বিলম্বে পৌঁছিয়াছে। সুতরাং এবারের 'অনুসন্ধানে' ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের রায়টি প্রকাশ করিতে পারিলাম না। সম্ভবতঃ আগামী বারে তাহা প্রকাশিত হইবে।

ডুবে থাকি।

থাকি—থাকি; ডুবে থাকি নয়ন-নীরে।
হেলা-ফেলা নানা জ্বালা সদা বাহিরে!
তপন-কিরণ-ধারে
শিশির ফুটিতে নারে;
মরুতে লুকায় নদী—বালুকা চিরে।
হেলা-ফেলা নানা জ্বালা সদা বাহিরে!
ফুলের বাহির হয়ে,
পরিমল মরে ভয়ে;
জোছনা—চাঁদের বা'রে কাঁদিয়া ফিরে।
হেলা-ফেলা নানা জ্বালা সদা বাহিরে!
নিভুক আশার আলো,
দুখে দুখ রবো ভালো;
বরষার নিশা-সম আপনা ঘিরে—
থাকি থাকি—ডুবে থাকি নয়ন নীরে।
পিরীতি কুয়াসা-সম
লয়ে নিজ তম-ভ্রম,
এ আঁধার জলা-ভূমি হৃদয়-তীরে—
লুটুক টুটুক একা নীরবে ধীরে।

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

শ্রীফকিরচন্দ্র সরকার।

ফকিরচন্দ্র সরকারের নানাবিধ কীর্ত্তি-কাহিনীর কথা ইতিপূর্ব্বে অনেকবার 'অনুসন্ধান-সমিতির' বিবরণীতে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আজ প্রায় দেড় বৎসরের উপর কাল গা-ঢাকা দিয়া তিনি আবার সাধারণের সমক্ষে বাহির হইয়াছেন। ফকিরচন্দ্র এবার কলিকাতা ৪৬ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটে 'মনোরঞ্জন-পুস্তকালয়' স্থাপিত করিয়া, মফঃস্বলে নানা-রকমের হ্যাণ্ডবিল জারি করিতেছেন। এই বিজ্ঞাপনের দুই চারিখানি বিজ্ঞাপনও আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এবার স্থানাভাব বলিয়া সে সব বিজ্ঞাপনের বিশেষ বিবরণ আমরা দিতে পারিলাম না। তবে মোটামুটি বলিয়া রাখি যে, তাঁহারা যেন একটু সাবধানে এবং বিশেষ সতর্কতার সহিত ফকিরচন্দ্র সরকারের সহিত ব্যবহার করেন। আমরা সময়ান্তরে তাঁহার বিজ্ঞাপনের নমুনা দিয়া পাঠকগণকে সকল কথা সবিশেষ জানাইতে চেষ্টা করিব।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

ব্রহ্মচারী মহাশয় অবশ্য প্রকৃত ব্রহ্মচারী নহেন। ইনি যে কোন কপট সন্ন্যাসী, তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্রহ্মচারী মহাশয়ের জুয়াচুরীর কথাও আমাদিগকে ইতিপূর্ব্বে দুই-একবার লিখিতে হইয়াছে। সম্প্রতি আবার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণচন্দ্র মূল ও অনুবাদ সমেত 'মায়া-মরীচিকার' বিজ্ঞাপন দিয়া মফঃস্বলে ছুটাছুটি-দৌড়াদৌড়ি করিতেছেন। এ বিজ্ঞাপনখানিও বড় মনোমুগ্ধকর। আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, উপরের লিখিত ফকিরচন্দ্র সরকার নিজের 'ভ্রান্তি'ও বিলাতী গুপ্তকথার বিজ্ঞাপনের সহিত একই প্যাকেটে এই 'মায়া-মরীচিকা' বিলি করিতেছেন। ইহাতে অনুমান হয় যে, কৃষ্ণচন্দ্র ব্রহ্মচারীও বা বুঝি ফকিরচন্দ্রের নামান্তর বা রূপান্তর হইবেন। তাই বুঝি ব্রহ্মচারী মহাশয় তাঁহার বিজ্ঞাপনে বলিতেছেন,—"এই গ্রন্থ (মায়া-মরীচিকা) কেবল কলিকাতা, ৪৬ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র সরকারের 'মনোরঞ্জন' পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। আমি সর্ব্বদা এক স্থানে থাকি না বলিয়াই শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র সরকারকে পুস্তক-বিক্রয়ের একমাত্র এজেণ্ট নিযুক্ত করিলাম।" যাহাই হউক, আমাদের মনে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। 'অনুসন্ধানের' গ্রাহক অনুগ্রাহকবর্গ সবিশেষ জানিয়া শুনিয়া, ব্রহ্মচারী ও সরকার মহাশয়ের সহিত কারবার করেন, ইহাই আমাদের একান্ত ইচ্ছা।

সংবাদ।

—লণ্ডনের মিউনিসিপাল আইনানুসারে ইনস্পেক্টর-গণ বাড়ীতে ঢুকিয়া জলের কল নর্দ্দামা প্রভৃতি পরীক্ষা করিতে পারেন। সেই সুযোগে তথাকার চোরেরাও আজকাল আবার ঐরূপ ইনস্পেক্টার সাজিয়া বাড়ীতে ঢুকিতে আরম্ভ করিয়াছে; এবং যা পায়, তাই লইয়া পলায়ন করে। তজ্জন্য লণ্ডনের পুলিস-কমিশনার বিজ্ঞাপন দিয়াছেন যে, ইন্স্পেক্টরেরা ঘরে ঢুকিলে তাহাদিগকে তালা দিয়া বন্ধ করিয়া, সকলে যেন পুলিসে খবর দেন। আজকাল কলিকাতাতেও বাড়ীর ভিতর পরীক্ষা করিবার নিয়ম হইয়াছে। সুতরাং আগে হইতে সকলের সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

—রুষিয়া ও ফরাসী দেশে এক রকম যুদ্ধ জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই জাহাজ জলের নীচে দিয়া যায়,ও ভাসমান জাহাজের তলায় যাইয়া তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে পারে। এই জাহাজ এত তাড়াতাড়ি চলে যে, ২৬ ঘণ্টায় ইউরোপ হইতে আমেরিকায় গিয়াছিল।

—নারিকেলের দুধ হইতে জর্ম্মণীতে মাখন প্রস্তুত হইতেছে। এই মাখন অতি উৎকৃষ্ট ও পুষ্টিকর বলিয়া আদৃত হইতেছে। মাখন প্রস্তুতের জন্য ভারতবর্ষ হইতে বহুসংখ্যক নারিকেল জর্ম্মণীতে যাইতেছে।

—আহাম্মদ-নগরের কেল্লার মাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী গাড়ী হাঁকাইয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় বিপরীত দিক হইতে একখানি ভাড়াটীয়া গাড়ী আইসে। সেই গাড়ী দেখিয়া মাজিষ্ট্রেটের গৃহিণীর ঘোড়া চমকিয়া উঠে। মাজিষ্ট্রেট এই অপরাধে গাড়োয়ানের ২০৲ টাকা জরিমানা করেন।

—'ইণ্ডিয়ান ষ্টীম নেভিগেসন কোম্পানীর' ষ্টীমার গত ১১ই জানুয়ারী সুন্দরবনে আসিয়া পঁহুছিলে, উহার কাপ্তেন তাঁহার বাবুর্চি দ্বয়কে ১০টার সময় খানা দেওয়ার জন্য আদেশ করেন। কিন্তু খানা পাক করিতে বিলম্ব হওয়াতে, ১১টার সময় তাহারা খানা লইয়া কেবিনে উপস্থিত হয়। ইহাতে সাহেব অত্যন্ত রাগান্ধ হইয়া তাহাদিগকে গালি দিতে আরম্ভ করিলে, বাবুর্চি-দ্বয় একে অন্যের ত্রুটির কথা উল্লেখ করিয়া পরস্পর তর্ক করে। তৎকালে সাহেব বাহাদুর নাকি কেবিনের বাহির হইতে হটাৎ কেবিনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একজনকে এক ঘুসা মারেন; এবং ঘুসা খাইয়া, সে কেবিন হইতে প্রস্থান করে। তৎপরে অপর বাবুর্চির নাকের উপর সাহেব অত্যন্ত চোটে ঘুসি মারেন; এবং তাহাতেই সে জাহাজের লৌহ তক্তার উপরে পাড়য়া মূর্চ্ছিত হয়। তখন জাহাজের খালাসীগণ তাহাকে তাড়াতাড়ি স্থানান্তরে শুয়াইয়া রাখে,ও তাহার চৈতন্যের জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুতেই তাহার আর চৈতন্য হইল না; সেই আঘাতেই দুরন্ত কাল তাহাকে গ্রাস করিল। এই ঘটনার এক দিবস পরে কাপ্তান বাহাদুর লাশ সুন্দরবনের চাম্পাই নামক স্থানে প্রোথিত করিয়া আইসেন; ও জাহাজ গন্তব্য পথে চলিয়া বরিশাল নগরে বিগত ১৪ই তারিখে উপনীত হয়। পরে পুলিশের তদন্তে এইরূপ ঘটনার কতকাংশ প্রমাণও হইয়াছে। যাহারা এই ঘটনা দেখিয়াছিল, তাহারা সাক্ষী দিয়াছে; এবং লাশের জন্য খুলনায় পুলিস প্রেরিত হইয়াছে। আমরা এই মকদ্দমার ফল জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিলাম।

—কলিকাতা চিৎপুর রোডের এক জন কসাই, কাটিবার আগে জীবন্তাবস্থাতেই, ছাগলের গায়ের চামড়া খুলিয়া লইত বলিয়া অভিযুক্ত হয়। সে স্বমুখে অপরাধ স্বীকার করায়, তাহার ১০৲ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। জীবন্ত ছাগলের চর্ম্ম খুলিতে আরম্ভ করা, কি ভয়ানক নিষ্ঠুরতা! এরূপ অপরাধীর বিশেষ গুরুতর দণ্ড হওয়া উচিত ছিল।

—ইংলণ্ডের "উণবিংশ শতাব্দী" প্রভৃতি পত্রে গ্লাডষ্টোন সাহেব মধ্যে মধ্যে লিখিয়া থাকেন; এবং প্রত্যেক প্রবন্ধের জন্য ৫।৬ শত টাকার ন্যূন পান না। আরও, তিনি একখানি আমেরিকার সংবাদপত্রে ১৫০০ কথার পূর্ণ এক একটী প্রবন্ধের জন্য ১৫০০৲ টাকা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন; অর্থাৎ প্রতি কথার ১৲ এক টাকা।

—ইউনাইটেড ষ্টেট্সের অধিবাসী-সংখ্যা প্রতি মিনিটে ৩। জন করিয়া, প্রতি ঘণ্টায় ১৯৫ জন করিয়া অর্থাৎ প্রতি বর্ষে ১৭,০০,০০০ জন করিয়া বাড়িতেছে।

—শ্যামরাজের ৩০০ শত স্ত্রী ও ৮৭টী পুত্র আছে। তিনি ২০,০০,০০ টাকা মূল্যের হীরা-জহরতে ভূষিত হইয়া দরবার করিয়া থাকেন।

—গণেশচন্দ্র যোগীর বাস শাঁকড়াইলে। তাহার কন্যা যুবতী, বয়ঃক্রম ১৫ বৎসর। একদল বদমাইশ তাহাকে বাহির করিবার চেষ্টা পায়। কিন্তু যুবতী তাহাদের অসৎ প্রস্তাবে সম্মত হয় না। তাহারা ব্যর্থ মনোরথ হইয়া, ঘরে সিঁদ কাটাইয়া যুবতাকে ধরিয়া লইয়া যাইবার ষড়যন্ত্র করে। যুবতী কিন্তু তাহাদের দেখিতে পাইয়া একস্থানে লুক্কায়িত হইয়া থাকে। ইত্যবসরে তাহারা এক বৃদ্ধাকে নিদ্রাভিভূতা পাইয়া, সেই যুবতী-বোধে মুখ বাঁধিয়া নৌকায় লইয়া গিয়া হাজির করে। কিন্তু তথায় তাহারা মুখ খুলিয়া দেখে, যুবতীর বদলে তাহারা এক বৃদ্ধাকে ধরিয়া আনিয়াছে। যাইহোক, পরদিনই কিন্তু দুষ্টেরা পুলিশ-কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছে।

—বেলুনবাজ স্পেন্সর সাহেব আবার কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এবার তিনি এত বড় বেলুন লইয়া আসিয়াছেন যে, তাহাতে ৮জন লোক এক সঙ্গে উঠিতে পারে তদ্ভিন্ন একটা সাগ্নিক বেলুনও এবার সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। শীঘ্রই তিনি নূতন বেলুনে উড়িয়া সকলকে চমকিত করিবেন।

অনুসন্ধান

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

৩য় খণ্ড] ৩০এ মাঘ, ১২৯৬ সাল। [১৩শ সংখ্যা।

বিষয়-বিকারের চিকিৎসা।*

হরিভক্তি নিরবধি, জীবনের মহৌষধি,
বিষয়-বিকারে করে গ্রাস।
মায়া কপ্ লোভ বাই, হিংসা পিত্ততুল্য নাই,
এইত ত্রিদোষ ইথে নাশ॥
আশা-রূপ তৃষ্ণা অতি, কুপথ্য কুপথে গতি,
মোহরূপ প্রলাপ যথেষ্ট।
তন্দ্রা ক্রোধ তমবর্গ, এই সব উপসর্গ,
রসরূপ টোট্‌কাতেই নষ্ট॥
বিজ্ঞান পোল্টাই পরে, ভাবনা ক্ষীণতা হরে,
এ রোগের এই প্রতিকার।
...রূপেতে এ ঔষধি, সেবনের সার বিধি,
শুন উদাহরণ তাহার॥

একদা নারদ ক্ষিতি ভ্রমিয়া ভ্রমিত।
কোন এক ঋষির আশ্রমে উপনীত॥
দেখিলেন আশ্রমে নাহিক ঋষিবর।
ফলে-ফুলে উপবন শোভিছে সুন্দর॥
ঋষি নাই আশ্রমে কুটীর শূন্য তা'য়।
দেখিয়া নারদ ভ্রমে যথায় তথায়॥
সম্মুখেতে দেখি ভগ্ন কুটীর তখন।
সন্ধ্যা-উপস্থিতে ঋষি উপস্থিত হন॥
দেখেন কুটীরে এক প্রবীণ ব্রাহ্মণ।
ধ্যানেতে আছেন রত মুদিয়া নয়ন॥
ভার্য্যা তাঁর নবীনা যৌবনী সুরূপসী।
পতির সুশ্রুষা-হেতু রয়েছেন বসি॥
হেনকালে নারদ হইয়া ত্বরান্বিত।
বলে মা আতিথ্য কর হয়েছি ক্ষুধিত॥
পাদ্য-অর্ঘ দিয়া সতী বসাইয়া তাঁ'য়।
বলেন কি আছে ঘরে কি দিব তোমায়॥
এই বৃদ্ধ পতির সেবায় নিত্য থাকি।
দিন আনি দিন খাই সঞ্চয় না রাখি॥
দুটী মাত্র হরিতকী আছয়ে সঞ্চিত।
অন্বেষণ করি যদি বৈসেন কিঞ্চিৎ॥
নারদ বলেন তাই যথেষ্ট আমার।
রন্ধন করিয়া দেহ করিব আহার॥
ভক্তিভাবে ব্রাহ্মণী রন্ধন করি দিল।
আনন্দে নারদ তবে ভোজনে বসিল॥
হর্ষেতে ব্রাহ্মণী দেয় হরিতকী-চূর্ণ।
বিন্দুমাত্র আহারে উদর হল পূর্ণ॥

* সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ কবি রসিকচন্দ্র রায় মহাশয়ের এ ...বিতাটি এই স্থানেই সন্নিবিষ্ট হইল। কবিতাটি সুবৃহৎ ...লেও ইহার রচনা-পারিপাট্য ও সদুপদেশময় ঘটনায় ...লেই ইহাতে আনন্দ পাইবেন, এই ভরসা।

নারদ বলেন এত হরিতকী নয়।
সুধা হতে অধিক সুস্বাদু সুধাময়॥
মা তুমি সামান্যা নও বলিয়া সে মুনি।
বিষ্ণুকে জানাতে যান বৈকুণ্ঠে অমনি॥

বৈকুণ্ঠ-ভবনে, কমলার সনে,
কমলাপতির কথা।
পুরী সুখময়, এমন সময়,
নারদ উত্তীর্ণ তথা॥
গিয়া কন বার্তা, হে জগৎভর্ত্তা,
বন্দি তব পাদপদ্ম।
সন্ধ্যা-আগমনে, কাম্যক-কাননে,
আশ্চর্য্য দেখিনু অদ্য॥
একই ব্রাহ্মণ, যোগেতে মগণ,
একই ভগ্ন আশ্রমে।
ব্রাহ্মণী নবীনা, পতিসেবা বিনা,
অপর না জানে ভ্রমে॥
বাঁধি ধর্ম্ম-সেতু, পতিসেবা-হেতু,
বসিয়া আছেন যথা।
অদ্য কুতূহলে, সন্ধ্যাগত হলে,
অতিথি হ'লাম তথা॥
শূন্য দেখি ঘর, ব্রাহ্মণী তৎপর,
বড়ই দুঃখে দহিল।
আছিল সঞ্চয়, হরিতকীদ্বয়,
রন্ধন করিয়া দিল॥
বিন্দুমাত্র তার করিতে আহার,
উদর পূরিল মম।
সন্তুষ্ট হইনু, যে রস খাইনু,
সুধা নহে তার সম॥

শুনিয়া পরমানন্দে চিদানন্দ কন।
সে সুধা খাইতে ইচ্ছা আমার এখন॥
চল কালি সেই বনে দুইজনে যাই।
ঋষি কন যে আজ্ঞা বিলম্বে কাজ নাই॥
এইরূপ কথোপকথনে নিশিশেষ।
প্রভাতে বৈকুণ্ঠে এল দেবতা অশেষ॥
বরুণেরে আজ্ঞা দেন ত্রৈলোক্য-ঈশ্বর।
আজি সে রজনিযোগে বর্ষ নিরন্তর॥
পবনে কহেন তুমি সঘনে বহিবে।
বিদ্যুতে কহেন তুমি স্থির না রহিবে॥
বাসবে কহেন বজ্র হানিতে বিস্তর
খণ্ড লয় হয় যেন অবনী-ভিতর॥
আজ্ঞা পেয়ে সুরবর্গে চলিল ত্বরিত।
এখানে ক্রমেতে আসি সন্ধা উপস্থিত॥
নারদে লইয়া হরি পুলকিত মনে।
দুই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশেতে যান বনে॥
তৈল বিনা গায়ে খড়ি ধূলা উড়ে বাসে।
পক্ক চুল যেন কাশকুসুম বিকাশে॥
কোঠরেতে চক্ষু দুটী মিটির মিটির।
আপাশিরঃ গণনীয় লক্ষ লক্ষ শির॥
লুণ্ঠিত হয়েছে ভুরু গণ্ডের উপর।
বিলম্বিত দাড়ি-গোঁপে প্রচ্ছন্ন উদর॥
হাতে যষ্টি বাতে কটি আন্দোলিত ঘন।
মলিন অধর-ওষ্ঠ যেন ঘন ঘন॥
যেমন হইল হেথা সন্ধ্যা অবসান।
অতিথি বলিয়া দ্বারে দুজনে দাঁড়ান॥
হেন কালে নভস্তল নীরদে ঘেরিল।
দুর্জ্জয় পবন বেগে বহিতে লাগিল॥
বিদ্যুতের চকমকি মেঘের গর্জ্জন।
কড় কড় মহাশব্দে বজ্রের পতন॥
তড় তড় বৃষ্টির নির্ঘোষ ঘোরতর।
নির্ঝরিণী-প্রবাহে তরঙ্গ তর তর॥
তরঙ্গিত সিন্ধুবারি উচ্ছলিত ত্বরা।
কুল কুল জল-বেগ টল্ টল্ ধরা॥
বৃক্ষ করে মড় মড় পর্ণ সন্ সন্।
বৃষ্টির সঙ্গেতে ঘন করকা-বর্ষণ॥
বৃহৎ বৃক্ষের শির ভূমে ঠেকাঠেকি।
ফম্ ফম্ ফণীর ভেকের মেকা-মেকি॥

এরূপ দুর্য্যোগ একে, আশ্রমে অতিথি দেখে,
ত্রাসিত সে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী।
বলে রক্ষ দীননাথ, জানে না অনাথনাথ,
দীননাথ অতিথি আপনি॥
নারদ বলেন বিপ্র, আয়োজন কর ক্ষিপ্র,
অভুক্ত অতিথি তব কাছে।
দ্বিজ কন হে ব্রাহ্মণি, কি করিবে এ-রজনী,
অতিথি বিমুখ হয় পাছে॥
অতিথি সন্তুষ্ট যায়, বিষ্ণু হন তুষ্ট তায়,
সে অতিথি আজ যান ফিরে।
কি করি ভাবি হে তাই, সঞ্চিত কিঞ্চিৎ নাই,
নয়ন ভাসিল তাই নীরে॥
ব্রাহ্মণী বলেন ছাই, কান্দ কেন চেষ্টা চাই,
বিষ্ণু কন এই যুক্তি বটে।
ব্রাহ্মণী কোমর বাঁধি, অঞ্চলে সর্ব্বাঙ্গ ছাঁদি,
বেরুলেন সেই সে সঙ্কটে॥

শ্রীহরি বলিয়া বনে বেরুলনে সতী।
বলে রক্ষ দীননাথ অগতির গতি॥
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশচিহ্নে চিহ্নিত চরণ।
দাসীর বক্ষেতে দেহ আসি নারায়ণ॥
এই কর চিদানন্দ জগতের সার।
অতিথি বিমুখ যেন না হয় আমার॥
সৌভাগ্যক্রমেতে ঘটে অতিথি-সেবন।
এই ইচ্ছা পূরাও মম ইচ্ছাময় ধন॥
পতি আর অতিথির সুশ্রূষা সদাই।
এভিন্ন সতীর গতি কিছুমাত্র নাই॥
না করি দুর্য্যোগ-জ্ঞান এ দুর্য্যোগ-ভোগ।
অতিথি বিমুখ হবে সেইত দুর্য্যোগ॥
এরূপ বলিয়া সতী ভ্রমেণ বিস্তর।
সম্মুখে দেখেন বনে অট্টালিকাম্বর॥
সারি সারি বাতি জ্বলে গলিতে গলিতে।
সতী যান রক্ষা কর বলিতে বলিতে॥
দেখিল ঘরের মধ্যে নব্য বাবু সব।
ঘোরতর লেগে গেছে মদের উৎসব॥
মাংস-মদ লয়ে সবে আনন্দে মেতেছে।
উথলি আনন্দ-সিন্ধু গড়ায়ে যেতেছে।

এইরূপ নানা জাতি, একপাতে মাতামাতি,
কত রঙ্গ রাতারাতি, বলা কভু যায় না।
ঘোরতর ঢলাঢলি, ভাবে প্রেমে গলাগলি,
গুরু আড্ডা রয় গুলি, কোন কাল বয় না॥
উদরে মদের ঢেউ, কেহ বা তুলিছে হেউ,
আনন্দে নাচিছে কেউ, সুস্থ কভু রয় না।
মদে লক্ লক্ লোলা, ভাবের কপাট খোলা,
এমন আনন্দে ভোলা, ভোলানাথ হয় না॥

এইরূপ মত্ত আছে বাবুরা যথায়।
সেইকালে উপনীত ব্রাহ্মণী তথায়॥
ডেকে বলে ভিক্ষা দিয়া রক্ষা কর বাপ।
অভুক্ত অতিথি ঘরে সহেনা সে তাপ॥
সারাদিন উপবাসী ব্রাহ্মণ দুজন।
অতিথি বিমুখ হলে অনিত্য জীবন॥
সংসারের সারকার্য্য অতিথি-সৎকার।
সে অতিথি উপস্থিত আশ্রমে আমার॥
তোমাদের পুণ্য হবে ভিক্ষা কিছু দিলে!
নতুবা বিপদ মোর অতিথি ফিরিলে॥
এরূপ ব্রাহ্মণী গিয়া জানায় যখন।
ভিক্ষা থাক্, রূপ দেখে বাবুরা মগন॥
বলে এস এস প্রিয়ে ও-চন্দ্রবদনি।
কি ভিক্ষা চাহিছ কার প্রেমভিখারিণী॥
প্রেমের ভিখারী তব আমরা সুন্দরি।
প্রাণ-ভিক্ষা চাহ যদি তাও দিতে পারি॥
দেখালে কি মুখখানি হাসিয়া হাসিয়া।
গগণের চন্দ্র যেন পড়েছে খসিয়া॥
চূর্ণ করে মৃগমদ তোমার নয়ন।
নয়নের চঞ্চলতা তাড়ায় খঞ্জন॥
কটিদেশ বন হৈতে কেশরী খেদায়।
রাখ না তমোর তম লাবণ্য ছটায়॥
তোমার নাসিকা করে খগদর্পচুর।
ভুরু ভাঙ্গে মদনের ধনুকের ভুর॥
কে বলে সে ঝড়ে ভাঙ্গে রামরম্ভাতরু।
সে তরু আপনি ভাঙ্গে হেরে তব উরু॥
কুন্তলেতে জলধরে দেখাইয়া ডর।
সৌদামিনী লয়ে হাসি সাজাও সুন্দর॥
কিবা দুটী পয়োধর বক্ষেতে সম্ভবে।
ঐ দুটি ভিক্ষা দিলে ভিক্ষা দিই তবে॥
সতী বলে আতিথ্য যদ্যপি রক্ষা পায়।
অবশ্য এ পয়োধর সঁপিব তোমায়॥
এত বলি অস্ত্রেতে কাটিয়া পয়োধর।
লও বলি ফেলে দিল মেজের উপর॥
বাবুরা আশ্চর্য্য দেখি চমকিয়া উঠে।
মনোমত ভিক্ষা দিয়া চরণেতে লুটে॥

ব্রাহ্মণী কৌতুকে, বাস বান্ধি বুকে,
বাসে আসি যথাসাধ্য।
রন্ধন করিয়া, [illegible] ধরিয়া,
অতিথি-সম্মুখে খাদ্য॥
অমৃত ভোজন, করেন দুজন,
বিঘ্ন কিছু নাই তাতে
ব্রাহ্মণীর স্তন, হইতে তখন,
রুধীর পড়িল পাতে॥
নারদ রোষেণ, শ্রীহরি তোষেণ,
যা ভাব তা নয় ঋষি।
করেছে যে কর্ম্ম, এ নারীর মর্ম্ম,
গিয়াছে নির্ব্বাণে মিশি॥
নিজ পয়োধর, কাটিয়া সত্বর,
সঁপিয়া লম্পট-করে।
তবে ভিক্ষা লয়ে, পুলকিত হয়ে,
অতিথি সেবন করে॥
সেই স্তনশির, হইতে রুধীর,
গলিত ভূমে আমরি!

বলিয়া তখন, খুলিয়া বসন,
নারদে দেখান হরি ॥
নারদ চমকি, ক্ষণেক থমকি,
বলে প্রভু একি মেয়ে!
এনারীর আগে, ধ্রুব কোথা লাগে,
প্রহ্লাদ দেখুন চেয়ে ॥
একি সাধ্বী সতী, একি পুণ্যবতী,
মুক্তিমাখা মতি ধন্যা।
কে আছে উপমা, পুণ্যের প্রতিমা,
ধরামধ্যে অগ্রগণ্যা ॥

এইরূপ নারদ মোহিত একবারে।
বিষ্ণু তবে কৃষ্ণরূপে দেখা দেন তারে ॥
শ্রীকরে কি শোভা করে মোহনীয় বাঁশী।
অধরেতে মন্দ মন্দ সুমধুর হাসি ॥
বিলম্বিত বনমালা গলেতে শোভন।
কটিতটে পীতধরা ভুবনমোহন ॥
মস্তকে মোহনচূড়া গুঞ্জবেড়া তায়।
উচ্চ শিখিপুচ্ছ যাতে জগৎ ভুলায় ॥
ললিত ত্রিভঙ্গঠাম চরণে নূপুর।
রুণু রুণু শব্দ তায় মধুর মধুর ॥
মনোহর কালরূপে জগৎ উজলে।
ভক্তিমাখা দেহখানি মুক্তিপদতলে ॥
নিজমূর্ত্তি ধরিয়া নারদ পড়ে পায়।
ব্রাহ্মণ অবাক হয়ে গড়াগড়ি যায় ॥
ব্রাহ্মণী কান্দিয়া বলে আয়রে গোপাল।
বহুদিন ভাঙ্গিয়াছে আমার কপাল ॥
মা বলিয়া আয় কোলে জুড়াক জীবন।
অমনি কোলেতে উঠে ভক্তের জীবন ॥
বিষ্ণুর পরশে স্তন পূর্ণমত হয়।
রুধীর মুছিয়া ক্ষীর হৈল সমুদায় ॥
মা বলিয়া স্তনপান করেন শ্রীহরি।
নারদ বলেন প্রভু এই কোন্ নারী ॥
বিষ্ণু কন কৃষ্ণরূপ গোকুলে যখন।
মা-যশোদা পিতা-নন্দ এঁরাই দুজন ॥
তাই বাল্য কৃষ্ণরূপে দেখা দিনু অদ্য।
কে আছে এমন ভক্ত জগৎ-আরাধ্য ॥
বৈকুণ্ঠে তোমারে কব সেসব বিধান।
এত বলি সবে লয়ে পুষ্পরথে যান ॥
কৃষ্ণরূপ ত্যজি হরি বিষ্ণুরূপ হন।
সবে বল জয় জয় যশোদানন্দন ॥

নূতনতর জুয়াচুরী।

"এই যায়, ঐ আসে—ঐ আসে, এই যায়!"

রামগোবিন্দ বিশ্বাস একজন বেশ বিষয়ী লোক। তাঁহার বিষয়-কর্ম্মাদির মধ্যে, বিষয়-বন্ধক রাখা, পার্টি বুঝিয়া দাঁও-মাফিক হ্যাণ্ড-নোটে টাকা ধার দেওয়া, মধ্যে মধ্যে সেয়ার ও কোম্পানির কাগজের কেনা-বেচাটাও আছে। লোকটা চারিদিকে চৌকোশ, উপার্জ্জন-বিষয়ে খুব ফন্দিবাজ। কিন্তু এমনই পয়সা-প্রয়াশী যে, সৎ বা অসৎ যে কোন উপায়ে হউক না কেন, অর্থটা হস্তগত করিতে পারিলেই হইল। ফলতঃ অর্থ যে কেমন করিয়া উপার্জ্জন করিতে হয়, বিশ্বাস মহাশয় তাহা বেশ জানিতেন।

এক দিন সন্ধ্যার পর, তিনি তাঁহার বৈঠকখানা-গৃহে বসিয়া ধুমপান করিতেছেন, আর কি ভাবিতেছেন; কাহার জন্য আগ্রহের সহিত যেন অপেক্ষা করিতেছেন। মনটা কিছু চঞ্চল; যেন কি একটা দাঁও ফস্‌কে গেল। এমন সময়, একটী বাবু—ফিট্ বাবু তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যাঁহার জন্য বিশ্বাস মহাশয় অপেক্ষা করিতেছিলেন, এ তিনি নন—এঁটি বিশ্বাস মহাশয়ের অপরিচিত। বাবুটীর বয়স বড় বেশী নয়। যুবাপুরুষ—বয়স আন্দাজ ত্রিশের ভিতর। চেহারায় চটক খুব; পরিধানে একখানি সিমলার কালা কিতেপেড়ে ধুতি; গায়ে লিনেন্-প্লেট্ পাট-ভাঙ্গা কামিজ। ত'ার উপর আবার এক ছড়া ষ্টার্-প্যাটার্ণ সোনার চেন ঝুলিতেছে। পায়ে এক-জোড়া বার্ণিস-করা ডসনের বাড়ীর ডবল্-স্প্রিং বিনামা; মাথায় সোজা সিঁতে! প্রথমে পরস্পর পরিচয় জিজ্ঞাসার পর, আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হইলে, বাবুটী বসিলেন। তখন বিশ্বাস মহাশয়, কোথা হইতে বা কি প্রয়োজনে তাঁহার নিকট আসা হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিলেন। বাবুটী বলিলেন,—"মহাশয়ের কাছেই আসা হইয়াছে। হলধর চক্রবর্ত্তী নামে একটী দালাল আপনার কাছে আসিয়াছিল কি?" বিশ্বাস মহাশয় তখন ঔৎসুক্য-সহকারে বলিয়া উঠিলেন,—"হাঁ-হাঁ—কেন বলুন দেখি? একখানা বাড়ি রেখে দশ হাজার টাকার কা'র দরকার; সেইজন্য, সে আজ কয়েক দিন ধ'রেই আমার কাছে আনা-গোনা কচ্ছে। টাকা মজুত,—আমাদের কারবারি লোকের টাকা অমন সুদ-বন্ধ ক'রে কি ফেলে রাখা চলে?"

বাবু বলিলেন,—"মহাশয়, সে টাকা আমারই প্রয়োজন। পঁচিশ হাজার টাকার একটী হুণ্ডির ডিউ আছে; পরশু তা' মিট্ কর্ত্তেই হ'বে—নহিলেই নয়। মহাশয়, বল্‌বো কি দুঃখের কথা, আমার হাতে ছিল ১৫ হাজার টাকা. আর ১০ হাজার টাকা হলেই হতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে একটা আহাম্মকি করে সে ১৫ হাজার টাকাটীতেও জল দিয়ে বসেছি।"

বিশ্বাস।—তবে এখন আপনার পুরো ২৫ হাজারেরই প্রয়োজন নাকি?

বাবু।—আজ্ঞে, সেই জন্যই আসা হয়েছে। মহাশয়, যদ্যপি অনুগ্রহ করেন, তবে আমি বড়ই উপকৃত হই।

বিশ্বাস মহাশয়, তা'র পর, বিষয়াদি কিরূপ, তদন্তে সমস্ত অবগত হইয়া, টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন; স্থির হইল,—"কল্যই লেখা পড়া করিয়া সমস্ত টাকা পেমেণ্ট করা হইবে।" এইরূপে কাযের কথা শেষ হইলে পর, বাবু তখন আপনার কথা পাড়িয়া বসিলেন; অর্থাৎ যে ১৫ হাজার টাকাটা তিনি অকারণে জলে দিয়াছেন, তাহারই জন্য বার বার আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বিশ্বাস মহাশয়ও অনেক বুঝাইলেন; বলিলেন,—"যা' হবার তা' হ'য়ে গিয়েছে, গ্রহের ফল। গতানুশোচনায় আর ফল কি? বিষয়-কারবার করিতে গেলেই লাভ-লোকসান আছে। তা'র জন্য আর বার বার হায়-হুতাস কল্লে হবে কি?" বাবু তাহাতে বলিলেন,—"মহাশয়, টাকাটা যদ্যপি আমার কারবারে লোকসান হ'তো, তজ্জন্য আমি এক তিলও চিন্তা করিতাম না। কিন্তু এযে অনর্থক একটা আহাম্মকি করে মারা গেলাম!" "আহাম্মকিটা কি?"—বিশ্বাস মহাশয় তখন তাহাই জিজ্ঞাসা করিলেন। আর বাবুও তো তাহাই চাহেন! এতক্ষণ তিনিও ভাবিতেছিলেন,—"একবার জিজ্ঞাসা করিলে হয়!" সুতরাং এক্ষণে, নানারূপে সুর ভাঁজিয়া, তিনি আরম্ভ করিলেন,—"মহাশয়, বলিব কি আহাম্মকির কথা!—কথায় বলে,—'সেয়ানায় ঠক্‌লে কাউকে বলে না।' কিন্তু আপনি হচ্ছেন,—বিজ্ঞ, বহুদর্শী; আপনার কাছে সে কথা বলিব না তো বলিব কাহার কাছে? এই কোথা থেকে এক দল খেলোয়াড় এসেছে—এমন বিট্‌কেল খেলা তো কখনও দেখি নাই। জিতিতে পারিলে চতুর্গুণ লাভ, আর হারিলে যা ধরিবে তাই গেল।"

বিশ্বাস।—পাগল, অমন আহাম্মকিও করে! জান না কি, ঐ জুয়াখেলা করে কত লোক সর্ব্বস্বান্ত হয়ে গেল!

বাবু।—আজ্ঞে, সে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জুয়া নয়। অথচ তা'কে জুয়া বলিলেও বলা যাইতে পারে।

ইহার পরই খেলাটা কি, তাহাই বুঝাইয়া দিতে বাবুটি প্রয়াশ পাইলেন। পাঠক! এই অবসরে আপনিও শুনিয়া রাখুন, খেলাটা কি?

বাবু বলিতে লাগিলেন,—"মহাশয়, এখেলায় কেবল সহিষ্ণুতার প্রয়োজন। কত লোক যে এই খেলা খেলে বড় মানুষ হয়ে গেল, তা' আর বল্‌বে কি? খেলাটা এই;—একটা পিত্তলের হাতরে এক গাছা রেসমের দড়ি বাঁধা আছে; সেই দড়িগাছটী ধ'রে ঠিক এক ঘণ্টা-কাল হান্দরটীকে হাতে ক'রে ঝুলিয়ে রাখ্‌তে হয়!"

বিশ্বাস।—হান্দরটী ভারী কত?

বাবু।—তা' বড় বেশী নয়। পাঁচ পাউণ্ড —প্রায় আড়াই সের।

বিশ্বাস।—আড়াই সের? এ আর তুমি এক ঘণ্টাকাল হাতে ক'রে ঝুলিয়ে রাখ্‌তে পাল্লে না?

বাবু।—মহাশয়,তবে শুনুন। শুধু ঝুলিয়ে রাখ্‌লেই হবে না; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেইটীকে দোলাইতে হইবে; আর দোলার সঙ্গে সঙ্গে মুখে বলিতে হইবে,—'এই যায়, ঐ আসে—ঐ আসে, এই যায়।' ক্রমান্বয়ে এই কথা বলিতে হইবে; একবার থামিতে পাইবেন না বা এক পাও নড়িতে পারিবেন না।

বিশ্বাস।—তা হলোই বা!—এ আর তুমি পাল্লেনা?

বাবু।—মহাশয়, আপনি তো বলিতেছেন; কিন্তু সে কি সহজ ব্যাপার? আমি তো প্রায় জিতেছিলুম; কেবল পাঁচ মিনিটের জন্যে সব মাটি হলো বইত নয়!

বিশ্বাস।—আহা-হা! পাঁচ মিনিট কাল আর মরে-পিটে থাকতে পাল্লেনা গা? দশ দশ হাজার টাকা—আবার জিতিতে পারিলে তা'র চতুর্গুণ চল্লিশ হাজার— এক দমে মেরে দিতে পার্ত্তে! ছি! এমনও হয়!

বাবু।—অদৃষ্টে নাই, কি কর্‌বো, বলুন?

বিশ্বাস।—আরে রেখে দেও তোমার অদৃষ্ট! তোমার মতন এমন আহাম্মক লোক তো আমি কখনও দেখি নাই! তুমি বড় বোকা—তুমি বড় বোকা!

বাবু।—মহাশয়, তা'র উপর যে আবার বিভীষিকা!

বিশ্বাস।—বিভীষিকা আবার কি?

বাবু।—সে আবার আরও ভয়ানক! এই মার্ত্তে আস্‌বে—এই কাট্‌তে আস্‌বে! এক বার বা তোড়াটা নিয়ে পালাবে, আবার এসে হুক্কি দেখাবে! এইরূপ নানান রকম উৎপাৎ কর্‌বে।

বিশ্বাস।—সত্য সত্যই তো আর মার্‌বে না?

রাম।—রাম! তা' গা'য়ে হাতটী পর্য্যন্ত দেবে না!—কেবল কাছে থেকে, কখনও বা অন্তর থেকে, হুক্কি দেখাবে এইমাত্র! তবে সে নানান রকমের উৎপাৎ; তাইতেই যে আপনাকে ভড়কে যেতে হবে!

বিশ্বাস।—তোমার মতন তো আমরা আর নাবালক নই যে, তাই দেখে ভড়কে যাব? ছি-ছি-ছি! তুমি বড় ছেলেমানুষ—তুমি বড় বোকা—বড় বোকা!

বাবু।—মহাশয়,আমি আধ ঘণ্টাকাল পর্য্যন্ত বেশ ছিলুম; কিন্তু তার পরই হাত ভেরে যেতে লাগলো—যত কাছাকাছি হয়ে এলো, হাত ক্রমেই তত অসাড় হয়ে এলো! তবুও প্রাণপন যত্নে ধ'রে ছিলাম; কিন্তু শেষ পাঁচমিনিট কিছুতেই আর থাকৃতে পাল্লেম না।

বিশ্বাস।—আহা-হা-হা! হাতটা না হয় ছিঁড়েই যেত ছাই!—ছেড়ে দিলে কেন? ছি-ছি-ছি! তুমি বড় ছেলেমানুষ! তুমি বড় বোকা—বড় বোকা; তোমার মতন এমন আহাম্মক লোক তো আমি কখনও দেখি নাই।

বাবু।—আর মহাশয়, ছিল কপালে লোক-সান, তা'র আর করিব কি! যাইহোক, এখন আপনি অনুগ্রহ ক'রে ২৫-হাজার টাকাটী দিলে তবে বজায় থাকি!

বিশ্বাস।—আরে আমি শুনে যে হাতে কান্‌ড়ে মাচ্ছি! দশহাজার টাকা গেল বলে তো আমি দুখে করিই না; বিষয়-কর্ম্ম কর্ত্তে গেলে অমন লাভ-লোকসান আছে। কিন্তু মেরে দিতে যে চল্লিশ হাজার টাকা একদমে! আহা-হা-হা!—এমন সুযোগও খোয়ায়! তুমি আমার কাছে কোন্ একবার তখন এলে? বুঝে নিতুম্, সে কেমন খেলোয়াড়! পেয়েছিল, সুখী লোক—ছেলে মানুষ; তাই অমন ক'রে ঠকিয়েছে! বোধ হয়, তা'রা ঐ রকম ছেলে-

মানুষ দেখেই খেল্‌তে যায়; আর হ-য-ব-র-ল করে টাকাটা ফাকি দিয়ে ন্যায়।

বাবু।—সে কি বলেন? কেন?—আপনারও একবার দেখ্‌বার ইচ্ছাটা আছে-নাকি?

বিশ্বাস।—ইচ্ছা থাক্‌লে কি হবে? তারা কি আর আমাদের কাছে এগোয়?

বাবু।—এগোবে না কেন মহাশয়? তাদের তো ঐ কাযই! যে ইচ্ছে করে, সেই খেল্‌তে পারে।

বিশ্বাস।—এগোবে বটে; কিন্তু ছেলেমানুষ দেখে—আমাদের কাছে নয়।

বাবু।—মহাশয়, ডোমটুলির জেরাব সাহেব কি ছেলেমানুষ?

বিশ্বাস।—সে কি খেলেছিল নাকি? হেরে গেল, না জিত্‌লে?

বাবু।—আজ্ঞে, জিতেওছে, হেরেওছে। প্রথমে খেলে জিতেছিল, প্রায় দেড় লক্ষ টাকা; আর, তা'র ফিরে ক্ষেপে খেলতে গিয়ে হেরে ছেল, ৫০ হাজার। তার পর গোলমাল হয়ে পড়্‌লো—যে যেমনে সব সরে পড়লো। খেলাটা কিন্তু বড় গোপনীয়; পুলিস জান্তে পাল্লেই বিপদ।

বিশ্বাস।—তা'বেশই! এত আরো সুবিধারই কথা! আচ্ছা, তুমি একবার দেখ দেখি চেষ্টা ক'রে; আমি একবার তা'দের দেখ্‌তে ইচ্ছা করি। প্রথম একহাত খেলে কিছু জিতে নেওয়া যাবে; তার পর পীড়াপীড়ি করে তো দেও, পুলিস ডেকে।

বাবু।—না মহাশয়, আমি আপনাকে ও-বিষয়ে প্রবৃত্ত হতে পরামর্শ দিই না।

বিশ্বাস।—পরামর্শ তোমায় আর আমাকে দিতে হবে না! এখন, দেখ দেখি, পাও যদি তাদের! বিশেষ, এখানে যদি আন্‌তে পার, তবে কোন্ বেটা ঠকিয়ে যায়!

বাবু।—আজ্ঞে, শুন্‌ছিলুম, আবার তা'রা এরই মধ্যে বম্বে চলে যা'বে। যদি না গিয়ে থাকে, তবে আমি নিশ্চয়ই আন্‌তে পারি।

বিশ্বাস।—তাই যাও; দেখ—দেখ।

বাবু।—এখুনি?

বিশ্বাস।—এখুনি বই কি! শুভকার্য্যে বিলম্ব কর্ত্তে আছে?

ইহার পরই বাবু কর্ত্তার কথামত, খেলোয়াড়দিগকে ডাকিয়া আনিবার জন্য, নিষ্ক্রান্ত হইলেন। যাইবার কালীন বিশ্বাস মহাশয় আবারও জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কত দেরি হবে?"

"বেশী নয়; পাই যদি তাদের নিয়ে রাত্রি ১০টার মধ্যেই ফিরে আসবো।"—এই বলিয়া বাবুটী ঘণ্টা-খানেকের তরে অন্তর্ধান হইলেন।

এদিকে বিশ্বাস মহাশয় এমনই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছেন যে, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। কতক্ষণে আসে, একবার রাস্তায় গিয়া দেখিয়া আসিতেছেন; আবার ঘরে আসিয়া বসিতেছেন। কখনও ভাবিতেছেন,—"যদি না আসে?—দল যদি বম্বেই চলে গিয়ে থাকে?" আবার পরক্ষণেই মনকে আশ্বস্ত করিতেছেন,—"না,এখনো চলে যায় নাই! যদি চলে না গিয়ে থাকে, মা কালী এমন করেন, তা' হলে যা মনে আছে——" এইরূপ ভাবিয়াই, তিনি কালী ঘাটের মা-কালীর পূজার তরে আবার জোড়া পাঁঠাও মানসিক করিতেছেন।

* * * *

দেখিতে দেখিতে একখানা গাড়ি সদর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। সেই বাবুটী দলবল লইয়া উপস্থিত হইলে, ক্রমে খেলা আরম্ভ হইল। বিশ্বাস মহাশয় প্রথমে দশ হাজার টাকা (যাহা তাঁহার কাছে তখন ছিল) ধরিলেন। তাঁহার প্রদত্ত নগদ দশ হাজার টাকার নোটের তোড়াটী সম্মুখে রাখা হইল। জুয়ারীরাও তাহার চতুর্গুণ চল্লিশ হাজার টাকার একটী নোটের তোড়া রাখিয়া দিল। খেলা সুরু হইল। ৫ মিনিট, ১০ মিনিট, ১৫

মিনিট অম্‌নি অম্‌নি গেল। জুয়ারীগণ তখন উঠিল; নানা রকম ভয় দেখাইতে লাগিল। কেহ মারিতে যায়; কেহ কাটিতে যায়; কেহ বা টাকার তোড়াটা নিয়ে একবার দৌড় মারে, আবার আসে; আবার নানান রকম উৎপাৎ করে। এইরূপ বার বার নানা রকমের কার্য্য করিয়া আবার একবার তাহাদের একজন সেই দশ হাজার টাকার তোড়াটী হাতে লইয়া বলিল,—"মহাশয়,তবে চলিলাম।" বিশ্বাস মহাশয় কিন্তু কিছুতেই ভড়কাইবার লোক নন্। তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া খেলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি অচল অটল ভাবে দাঁড়াইয়া কেবল সেই—"এই যায়,ঐ আসে—ঐ আসে, এই যায়!"—বলিয়া হান্দর দোলাইতে লাগিলেন; আর, এক একবার ঘড়ির প্রতি লক্ষ করিতেছেন, কতক্ষণে সময় হয়! এদিকে জুয়ারীগণও একে একে যে যার সরিয়া পড়িল!—দেখিতে দেখিতে সব ফাঁক! কেবল জুয়ারীদিগের নোটের তাড়াটী পড়িয়া রহিল-মাত্র। কর্ত্তার সেই একই ভাব! হান্দর দোলাইতে দোলাইতে তিনি কেবলই—"এই যায়, ঐ আসে—ঐ আসে, এই যায়"—এইরূপ করিতেছেন। মনে ভরসা, ঐ চল্লিশ হাজার টাকার তোড়াটি আমারই হইল।

রাত্রি হইল; অথচ কর্ত্তা বাড়ির ভিতর যাইলেন না দেখিয়া, কর্ত্তার বড় কন্যা ক্রমে তাঁহাকে ডাকিতে বাহিরে গেলেন। কিন্তু কর্ত্তা তখনও সেই তোড়া দোলাইতেছেন, আর বলিতেছেন, —"এই যায় ঐ আসে—ঐ আসে; এই যায়।" কন্যার কথার উত্তর দিবারও অবসর নাই! নড়িলে বা অন্য কোন কথা কহিলে বা হান্দর ছাড়িলে পাছে হার হয়, এই তাঁহার ভাবনা। কাজেই কন্যা "বাবা বাবা" করিয়া যতই নিকটে আসে, তিনিও ততই জোরে হান্দর দোলাইতে দোলাইতে ঐ কথা বলেন; আর মুখ বিকৃত ও দন্ত কিড়িমিড়ি করিয়া কন্যার দিকে তাকাইতে লাগিলেন। কাজেই কন্যা জানিল,—"বাবা পাগল হইয়া গিয়াছে; নহিলে অমন করে কামড়াইতে আসিবে কেন?" সে তখন,—"বাবার আমার কি হলো! তোমরা দেখ্‌বে এসো গো—ওগো, কি হবে গো!"—বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। তখন বাড়িশুদ্ধ সকলেই আসিয়া দেখিল.—কর্ত্তা খেপিয়া গিয়াছেন। কর্ত্তার বৃদ্ধা পিসি তো ডাক পাড়িয়া কাঁদিতেই লাগিলেন।

এইরূপে বাড়িশুদ্ধ কান্নাহাটি পড়িয়া গেল, বাড়ি লোকে লোকারণ্য হইল। প্রতিবেশীদিগের মধ্যে একটী ডাক্তার বাবু (সম্প্রতি যিনি Fifth year এ পাস হইয়া Practice করিতে বেরিয়েছেন, তিনি) অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিয়া-দেখিয়া শেষে ঠাওরাইয়া-ঠাওরাইয়া বলিলেন, "এ ব্যায়রামকে আমাদের Medical Science এ *Clepto-Munia* বলে। Operation (অস্ত্র করার) দরকার। ঘাড়েই এ রোগ জমিয়াছে।"

ইতিমধ্যেই কিন্তু একঘণ্টা সময় পূর্ণ হইয়া আসিল। কর্ত্তা তখন হান্দর ফেলিয়া আহ্লাদে বলিয়া উঠিলেন,—"এই এস তো বাবা! বাজি তো মেরে দিয়েছি—নিয়ে এসো এখন চল্লিশ হাজার টাকা!" এই বলিয়া জুয়ারিদের রক্ষিত যে চল্লিশ হাজার টাকার নোটের তোড়াটী পড়িয়াছিল, তাহাই তিনি তুলিয়া লইলেন। ঘরের ভিতর যে সকল লোক ছিল, তাহারা সহসা কর্ত্তার ভাব-পরিবর্ত্তন দেখিয়া ভাবিল,—বুঝি বা রোগের এও এক লক্ষণ। যাইহোক, ক্রমে কর্ত্তা মহাশয় সেই চল্লিশ হাজার টাকার সেই তোড়া-বন্দি নোটগুলি খুলিলেন। খুলিয়াই কিন্তু চক্ষুস্থির! দেখেন,—সর্ব্বনাশ! তখন চারিদিকে ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিতে লাগিলেন। কিন্তু খেলোয়াড়ীগণের মধ্যে জনপ্রাণিকেও আর দেখিতে পাইলেন না; তাঁহার নিজের যে দশহাজার টাকার নোটের তোড়াটি ছিল, সেইগুলি হস্তগত করিয়া জুয়াচোর মহাশয়েরা তখন সরিয়াছেন।

পাঠক! যে চল্লিশ হাজার টাকার নোটের তাড়াটী জুয়াচোরগণ অনুগ্রহ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, এখন সেটী কি জানিতে চান? তাহার উপরে কেবলমাত্র একখানি ২০৲ টাকার নোট, আর ভিতরে সেই নোটের মাপে কতকগুলি কাটা কাগজ।

বিশ্বাস মহাশয় তখন হতাশ হইয়া—"হায়, আমার কি সর্ব্বনাশ!"—বলিয়া হায়-হুতাশ করিতে লাগিলেন। তারপর, ব্যাপার খানা কি, সকলে শুনিল। পুলিসে সংবাদ দেওয়া হইল; জুয়াচোরদের ধরিবার জন্য অনেক অনুসন্ধান করা হইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। বিশ্বাস মহাশয় টাকার শোকে 'মূর্চ্ছাভিঙ্গ' হইয়া পড়িলেন। রাত্রদিনই ভাবেন—ভাবিয়া ভাবিয়া শেষে প্রকৃতই একরূপ পাগল হইয়া পড়িলেন। আরও তখন তাঁহার মনে এই হইতে লাগিল,—"আমার এ পাপের কড়ি আর সহিল না! অনেক লোককে ঠকাইয়াছি, অনেক বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছি; তাই আমার এই হইল।" যাইহোক, এই অবধি আজি পর্য্যন্ত বিশ্বাস মহাশয়ের খুলিই হইল,—"এই যায়,ঐ আসে—ঐ আসে, এই যায়!"

জুয়ারীর ফাঁদে।

শ্রাবণমাস। অমাবস্যা রাত্রি। প্রায় দশটা বাজে। আকাশ মহা মেঘাচ্ছন্ন, গাঢ় তিমিরে আবৃত। মূষলধারে বৃষ্টি পতিত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতালোকে চক্ষু ঝলসিয়া যাইতেছে। একটী যুবক, মস্তকে ছত্র ধারণ করিয়াও, বৃষ্টি-জলের হস্ত হইতে পরিচ্ছদাদি রক্ষা করিতে পারেন নাই। যুবকের পদদেশের নাগরা জুতা ও পরিধানের বস্ত্র বহিয়া বৃষ্টি-

ধারার প্রায় অবিরল জল বহির্গত হইতেছে; মস্তকের কেশরাশি ছাঁকা বৃষ্টিজলে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। যুবক সদরপথের পার্শ্বস্থ আমাদের বৈঠকখানার সম্মুখ-রোয়াকে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমরা গৃহের ভিতর হইতে সার্সি-কাচের মধ্যদিয়া, সিক্ত-পরিচ্ছদ-গাত্র একটী ভদ্রলোককে দেখিতে পাইয়া, এই দুর্য্যোগে তাঁহাকে আশ্রয় প্রদানার্থ, ভিতরে আসিবার জন্য ডাকিলাম। তিনি গৃহে প্রবিষ্ট হইলেই কিন্তু দেখিলাম, আগন্তুক আমাদেরই পল্লীবাসী 'হরি মাষ্টার।'

হরি-মাষ্টার ঘরের ভিতর আসিয়া হাত-পা মুছিয়া, আমাদের প্রদত্ত কাপড় পরিয়া, উপবেশন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে মাষ্টার আমাদের বাটীতে কখনও কখনও আসিতেন। তখন নিত্যই তাঁহার সহাস্য বদন, আনন্দপূর্ণ ভাবভঙ্গী, রহস্যব্যঞ্জক কথাবার্ত্তায় আমরা বড়ই প্রীত হইতাম। সুতরাং তাঁহাকে আজিও পূর্ব্ববৎ সসম্মানে বসাইলাম। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আজি আর মাষ্টার মহাশয়ের সে প্রসন্ন ভাব দেখা গেল না। আজ যেন তাঁহার মুখশ্রী মলিন—তিনি যেন ঘোর চিন্তায় অবসন্ন।

যাহা হউক, এই ভয়ানক দুর্দ্দিনে মাষ্টার কোথা হইতে আসিতেছেন, আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম। মাষ্টার বলিলেন,—"আর মহাশয়! দুঃখ-ধান্ধার চেষ্টাতেই আমাদিগকে বেড়াইতে হয়। তেমন ভাল কাজকর্ম্মও তো জোটেনা! এই প্রায় মাসখানেক হইতে চলিল, বড়বাজারে একটী খোট্টা-বাবুর বাড়ীতে ছেলে-পড়ান জুটিয়াছিল। আমি সেইখান থেকেই এখন আসিতেছি। সারাপথ ভিজিয়া ঝাপটে আর বাসায় যাইতে পারিলাম না। তাই আপনাদের রোয়াকে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম।"

আমরা বলিলাম,—"সেখানে কত বেতন নির্দ্ধারিত হইয়াছে?" মাষ্টার বলিলেন,—"মাসিক ষোল টাকা, আর উপরিও আছে!"

আমরা বলিলাম,—"তবে আপনার হ'বে ভাল। আপনি তাঁহার সুপারিশ লইয়া বোধ হয় কোন সওদাগরের আফিসেও কাজ লইতে পারিবেন।" মাষ্টার বলিলেন,—"তাহার আশাও পাইয়াছিলাম বটে! যিনি আমাকে লইয়া কর্ত্তাবাবুর সহিত আলাপ করিয়া দেন, তিনি বলিয়াছিলেন,যাহাতে আমার ভাল হয়, আমার বাবার মানসম্ভ্রম বজায় থাকে, তাহাই করিবেন। কিন্তু আমার অদৃষ্ট কি তেমন? বলিব কি মহাশয়, এই কএক দিনের মধ্যেই অদ্য আমার সে আশায় ছাই পড়িল। হায়! —হায়! এত জানিলে কি আর আমি চাকরী খুঁজিতাম!"—এই বলিতে বলিতে মাষ্টার মহাশয়ের চক্ষু যেন ছলছল হইয়া আসিল।

আমরা তাঁহার সে ভাব দেখিয়া বড়ই কৌতূহলাক্রান্ত হইলাম; জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কেন—কেন! কি হইয়াছে? আপনার এ কথা ত ভাল নয়!" মাষ্টার তখন,একরূপ কাঁদিতে কাঁদিতেই,ক্রমে পূর্ব্বাবধি অদ্যকার ঘটনা পর্য্যন্ত সমস্তই আমাদের সাক্ষাতে যথাযথ বর্ণনা করিতে লাগিলেন;মধ্যে মধ্যে আমরাও প্রশ্ন করিতে লাগিলাম। পাঠক মহাশয়দিগের সে সকল আনুপূর্ব্বিক কথাবার্ত্তায় বিরক্তি বোধ হইতে পারে; সেইজন্য আমরা গল্পচ্ছলে তাহার সারসংগ্রহ করিয়া লিখিতেছি। সে বিবরণ এই,—

একদিন মাষ্টার মহাশয় চাকরির প্রত্যাশায় এক আফিসে গিয়াছিলেন। কিন্তু আফিসে গিয়া শুনিলেন যে সে খালি-পদে লোক নিযুক্ত হইয়া গিয়াছে। কাজেই বিমর্ষ-মনে ভাবিতে ভাবিতে মাষ্টার মহাশয় গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন; এমন সময় একখানি টেলিগ্রাম-হস্তে একটী পশ্চিম দেশীয় ভদ্রলোক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া, তাহা পড়িয়া দিবার জন্য, অনুরোধ করিলেন। মাষ্টারও তাহা পড়িয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন; এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ কারবার আপনারা কতদিন করিতেছেন,আর কোথায়ই বা আপনাদের কর্ম্মস্থান?" পশ্চিম-দেশীয় ভদ্রলোকটী তাহাতে উত্তর দিয়া বলিলেন,—"এ কারবারটী একজন প্রসিদ্ধ ধনীর, আমরা তাঁহার গোমস্তা মাত্র। তবে কাজকর্ম্ম আমরাই করিয়া থাকি, তাঁহাকে বড় দেখিতে হয় না। তিনি অতি সদাশয় লোক।"

মাষ্টার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনাদের কোন ইংরাজ-সওদাগরের সহিত কারবার আছে?" আগন্তুক বলিলেন,—"হাঁ, আছে বইকি! কলিকাতা, বম্বে, রেঙ্গুন এবং বিলাতের অনেক বড় বড় সওদাগরের সহিত আমাদের কারবার চলে।" মাষ্টার তখন বিনয়নম্রবচনে বলিলেন,—"তবে যদি আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক, কলিকাতার কোন সওদাগরের আফিসে বলিয়া দিয়া,আমার একটী কর্ম্ম করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে আমি আপনাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব; এবং আমার দ্বারা আপনাদের যদি কিছু কাজ হইতে পারে, আমি তাহাতেও প্রস্তুত আছি।" পশ্চিম দেশীয় বাবুটী বলিলেন,—"আমাদের বাবু আপনার মত ভদ্রলোক পাইলে বড়ই সন্তুষ্ট হন। তা' আপনি কিরূপ কাজ করিতে পারেন? জানিলে, সেইরূপ কাজ যে অফিসে যোগাড় হইতে পারে, আমাদের বাবুকে বলিয়া তাহার যোগাড়ও করিয়া দিতে পারি।"

মাষ্টার।—মহাশয়! আমি এল্,এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলাম। চিঠিপত্র লেখা, হিসাব রাখা, প্রভৃতি কেরাণীগিরির সমস্ত কাজ করিতে পারিব। আর টাকা জমা রাখিয়া কেশিয়ারের কাজও করিতে পারি। তবে বেশী টাকা জমা রাখিতে পারিব না।

হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকটী তাহা শুনিয়া আগ্রহসহকারে বলিলেন,—"তা'ভাল ভাল। আপনার কথা শুনিয়া আমার মনে হইল, দুইচারি দিবস পূর্ব্বে বাবুর মুখে শুনিতেছিলাম যে কোন আফিসের খাতাঞ্চীর অপর অফিসে অধিক মাহিনায় কাজ হওয়াতে সে পদ খালি আছে। শুনিয়াছিলাম, তাহার জন্য যেন দশহাজার টাকা জমার প্রয়োজন।"

মাষ্টার সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কি জানেন, তাহাতে এখনও লোক ভর্ত্তি হইয়াছে কি না? আমি যোগাড় করিয়া দশহাজার টাকা দিতে পারিব। আপনি যদি অনুগ্রহ ক'রে——"

হিন্দুস্থানী।—তার আর অনুগ্রহ কি? আপনি বড়লোকের সন্তান; আপনার যে কষ্ট হইয়াছে, তাহাও তো দেখিতে পাইতেছি। আমাদের মুখের একটা কথা-খসান বইত নয়? তাহাতে যদি আপনার সুবিধা হয়, তবে কেন না বলিয়া দিব? আর, আমাদের বাবুও বড় উঁচুদরের লোক—তিনি বড় পরোপকারী।

মাষ্টার।—তবে অনুগ্রহ ক'রে আপনার বাবুর নিকট আমার এই নিবেদন জানাইবেন। আপনার ঠিকানা জানিলে, আমি আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি।"

ইত্যবসরে সম্মুখ দিয়া একখানি খালি ভাড়াটিয়া গাড়ি চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া, হিন্দুস্থানী লোকটী তাহা ভাড়া করিলেন; এবং মাষ্টারকে বলিলেন,—"আপনার সুবিধা হইলে আমার সহিত আসিতে পারেন। আমি বাড়ীতেই যাইতেছি।"

মাষ্টার দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। গাড়ী বড়বাজারের দিকে যাইতে লাগিল। গাড়ির ভিতরও উভয়ের নানা কথা হইতে লাগিল।

* * * *

দেখিতে দেখিতে উক্ত আরোহীদ্বয়ের সহিত গাড়ীখানি বড়বাজারের ভিতর একটী ক্ষুদ্র গলির ধারে একখানি প্রকাণ্ড ত্রিতল বাটীর সম্মুখে আসিয়া থামিল। আরোহীদ্বয় অবরোহণ করিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

মাষ্টার বাড়ির দেউড়ি হইতে ক্রমে ক্রমে গলিপথ, দালান ও প্রত্যেক ঘরের সাজসজ্জা প্রভৃতি দেখিয়া নিশ্চয় বুঝিতে পারিলেন যে, উহা একজন সমৃদ্ধিশালী মহাজনের বাড়ী। যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত হিন্দুস্থানী ভদ্রবাবুটী তাঁহাকে একটী গৃহে বিশ্রাম করিতে বলিয়া কহিলেন,—"আপনি একটু অপেক্ষা করুন, বাবুকে সংবাদ দিই।" বাবুটী চলিয়া গেলেন। মাষ্টার মহাশয় তখন গৃহের ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; এবং বুঝিলেন, সেটী পড়িবার ঘর।

কিয়ৎক্ষণ পরে পূর্ব্বোক্ত বাবুটী মাষ্টারকে লইয়া পার্শ্বস্থ একটী প্রশস্ত সজ্জিত বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। মাষ্টার দেখিলেন,—সম্মুখে একটী উচ্চ গদির উপর একজন সুগৌরাঙ্গ প্রৌঢ় পুরুষ উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার মুখমণ্ডল গম্ভীর তেজোব্যঞ্জক; দৃষ্টি স্থির ও তীক্ষ্ণ; কপোলদেশ প্রবীণত্বের পরিচায়ক, উষ্ণীষবিহীন মস্তক শিখা-শোভিত; গাত্রে একটী বেনিয়ান; পরিধান পরিষ্কার থানফাড়া ধুতি। ফলতঃ তাঁহাকে দেখিলেই একজন সম্ভ্রান্ত হিন্দুস্থানী ব্যক্তি বলিয়া প্রতীতি হয়। তাঁহার চারিপার্শ্বে কয়েকজন হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী বাবুও বসিয়াছিলেন। মাষ্টার মহাশয় মাথা নোয়াইয়া সেলাম করিলেন।

পথপ্রদর্শক ভদ্রলোকটী তখন বাবুর সহিত কি কথা কহিয়া মাষ্টারকে আসিয়া বলিলেন,—"আমি যাঁহার কথা বলিয়াছিলাম, ইনিই তিনি।" তৎপরে কর্ত্তাবাবু মাষ্টারকে ইঙ্গিতে নিজের নিকট ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আমি আপনার কথা শুনিয়াছি। আপনার পিতার সহিত আমার অল্প আলাপ ছিল, বোধ হইতেছে। যাহা হউক, আমি আপনার চাকরীর চেষ্টা করিব। তবে আপাততঃ টাকা জমা দিয়া কাজ করিবার প্রয়োজন

নাই; কারণ, আপনি নূতন এবং সংসারের কাজকর্ম্মের বিষয়ে আপনাকে অনভিজ্ঞ বলিলেও হয়। সুতরাং টাকাগুলি নষ্ট করিতে আমি পরামর্শ দিই না। সুবিধা-মত আমি আপনার চাকরি দেখিয়া দিব। আপনি আপাততঃ কাল হইতে আমার ছেলেটীকে পড়াইবেন। আমি মাসিক ১৬৲ করিয়া দিব।" মাষ্টার মহাশয়ও তাহাতে নম্রতা-সহকারে অনেক শিষ্টাচার দেখাইতে লাগিলেন। কর্ত্তা কিন্তু তাহাতে বাধা দিয়া আপনার ছেলেটীকে ডাকাইয়া মাষ্টারকে দেখাইয়া দিলেন। কিয়ৎক্ষণ কথা-বার্ত্তার পর মাষ্টার গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

* * * *

বড়-মানুষের ছেলে, বয়স দশ বৎসর, তাহাতে আবার হিন্দুস্থানী; লেখা-পড়ায়ও আস্থা নাই; বিশেষতঃ ছেলেটী বড় আদুরে। কোন দিন পড়ে, কোন দিন পড়ে না; কোন দিন শরীর অসুখ, কোন দিন প্রয়োজন পড়ে। মাষ্টার কিন্তু প্রত্যহই বৈকালে পড়াইতে যান।

একদিন পড়াইয়া বাড়ী আসিবার সময়, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে দেখিয়া, মাষ্টার বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া ভাবিতেছেন,—"ছাতি আনি নাই, কিরূপে বাড়ী যাইব?" এমন সময়, সেই বাড়ীরই অপর একজন ভদ্রলোক মাষ্টারকে বলিলেন,—"আরে মাষ্টার ম'শায় যে!—কি ভাবিতেছেন? এখন বৃষ্টি হইতেছে, বাড়ী যাবেন কেমন করিয়া! খানিক অপেক্ষা ক'রে যান। চলুন, ঐ ঘরে বসিবেন!" মাষ্টার মহাশয় কাজেই তাঁহার অনুগামী হইলেন।

গৃহে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন যে,—সেই ঘরে কর্ত্তা অপর লোকের সহিত বাজি রাখিয়া তাস খেলিতেছেন। মধ্যে মধ্যে খেলার ন্যায়ান্যায় বিচার লইয়া তর্ক ও বকাবকি উঠিতেছে। মাষ্টার প্রত্যহ পড়িবার ঘর হইতে সেই গোলমাল শুনিতে পাইতেন। কিন্তু অদ্য তাহা স্বচক্ষে দেখিলেন। যাহা হউক, কিছুক্ষণের পর, পূর্ব্বকথিত ভদ্রলোকটী মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়! আপনার খেলা আসে?"

মাষ্টার।—অন্য খেলা জানি বটে, কিন্তু ইহা কিরূপ জানি না।

ভদ্রলোক।—এ খেলা অতি সহজ। আমি এই খেলা খেলিয়া অনেক টাকা লাভ করিয়াছি।

মাষ্টার।—আপনি কত দিন শিখিয়াছেন?

ভদ্রব্যক্তি।—অতি অল্প দিনই হইল। আপনি শিখিতে ইচ্ছা করেন?

মাষ্টার।—না, আমি উহা শিখিয়া কি করিব? আমার শিখিবার ইচ্ছা নাই।

ভদ্রব্যক্তি।—না, শিখিবার প্রয়োজনের কথা বলিতেছি না। তবে এ খেলায় বড় আমোদ আছে। আপনি বলিলেন, অন্য খেলা জানেন; তাই একথা বলিলাম। তাহাতেও যেরূপ আমোদ পাইয়া থাকেন, এও সেইরূপ সখ করিয়া খেলা। বেশীর ভাগ, ইহাতে উপরি লাভ, টাকা উপায়। যদি অদৃষ্ট খোলে, সখ করিতে গিয়া—আমোদের সঙ্গে সঙ্গে, ইহাতে বড়-মানুষও হইতে পারা যায়!

মাষ্টার।—তা' ভাল বটে! তবে আপনাকে কষ্ট করিয়া আর আমায় শিখাইতে হইবে না। আমি দেখিয়া নিজেই শিখিতে পারিব।

কথা শেষ হইতে না হইতে, ভদ্র-বাবুটী তখন কিন্তু কর্ত্তার গোচরে অপর একজন খেলোয়াড়কে ডাকিয়া বলিলেন,—"আপনারা মাষ্টারকে সঙ্গে নিন। ইনি খেলা শিখিতে ইচ্ছা করিতেছেন।" কথা শুনিয়া কর্ত্তা নিজে যত্ন করিয়া মাষ্টারকে ডাকিয়া লইলেন; এবং নিজেদের খেলা বন্ধ করিয়া মাষ্টারকে শিখাইতে উদ্যোগ করিলেন। মাষ্টার লজ্জায় পড়িয়া কোন দ্বিরুক্তি করিলেন না। আর, নিজে বুদ্ধিমান বলিয়া একবার দেখিয়াই শিখিয়া লইলেন।

কর্ত্তা তখন বলিলেন,—"আচ্ছা, মাষ্টার মহাশয় কেমন শিখিয়াছেন, এইবার পরীক্ষা হউক। আমি উহাঁর হইয়া টাকা দিতেছি; বাজী ফেল!"

রীতিমত খেলা আরম্ভ হইল। এবার মাষ্টার জিতিলেন। কর্ত্তা মহা খুসি; প্রশংসা আর মুখে ধরে না,—"বাহবা মাষ্টার, আপনি খুব বুদ্ধিমান্! আচ্ছা, আজ যে টাকা জিতিলেন, এই টাকায় আপনি কল্য খেলিবেন। আমি ও টাকা আর চাই না।"

এইরূপে মাষ্টার মহাশয় দুই একবার সে টাকা লইতে চাহিলেন না। অবশেষে কর্ত্তার জেদাজেদিতে লইলেন; এবং রাত্রি অধিক হইয়াছে বলিয়া বাড়ী যাইতে চাহিলেন। কর্ত্তা একটা নূতন ছাতা তখন মাষ্টারকে দিলেন; এবং মাষ্টারও তাহা মাথায় দিয়া, সে দিনের মত, সেই টাকার তোড়াটি লইয়া বাড়ী ফিরিলেন। পর দিনও মাষ্টারের সহিত খেলা হইল। সেদিনও মাষ্টার জিতিলেন। অধিকন্তু সেদিন কর্ত্তা আবার পূর্ব্বদিনের প্রদত্ত তাহার সেই দামী ছাতাটাও ফেরত লইলেন না। মাষ্টার মহাশয় তাহা ফেরত দিতে যাইলে বলিলেন,—"ও আপনাকে একেবারেই দিয়াছি।" মাষ্টার কর্ত্তার ব্যবহারে বড়ই আপ্যায়িত হইলেন; এবং তখন হইতে কর্ত্তার প্রতি সৎলোক বলিয়া দৃঢ়-বিশ্বাস হওয়ায় আরও সোৎসাহে প্রত্যহ খেলিতে লাগিলেন। এইরূপ প্রত্যহ খেলিতে-খেলিতে হারিতে-জিতিতে মাষ্টারের লোভ বৃদ্ধি হইল।

এক একদিন তিনি পাঁচ শত টাকা নগদ লইয়া খেলিতে লাগিলেন। মহোৎসাহে খেলা চলিল; দেখিতে দেখিতে মাষ্টার হাজার টাকা হারিলেন। কিন্তু সঙ্গে পাঁচ শত টাকা ভিন্ন সম্বল নাই; অপর পাঁচ শত টাকা তিনি কোথা হইতে দিবেন? যাহাহোক, মাষ্টার মহাশয় কিন্তু বলিলেন,—"কাল আসিয়া দিব।" জুয়ারিরা তাহাতে বলিল,—"হার-জিত কি ধারে চলে?"

মাষ্টার।—তবে কি উপায়ে আপনারা টাকা লইবেন?

জুয়ারীরা।—হয় নগদ টাকা, নয় কোন জিনিস বন্ধক রাখিয়া এইখানে টাকা ধার করুন।

মাষ্টার।—আমার সঙ্গে কি জিনিষ আছে যে বাঁধা রাখিয়া পাঁচ শত টাকা ধার করি? আর এখানে ধার দিবেই বা কে?

জুয়ারীরা।—জিনিস থাক্‌লে ধার দেবার লোক অনেক আছে। কেন বাড়ী বাঁধা রাখুন না? তারপর, কাল প্রাতেই টাকা দিয়া খালাস করিয়া লইবেন!

মাষ্টার।—দুই হাজার টাকার বাড়ী পাঁচশত টাকায় বাঁধা দিব?

জুয়ারীরা।—গরজ পড়্‌লে তাই কর্ত্তে হয়। আবার কাল্‌কের খেলায় যখন এই পাঁচ শত টাকার পরিবর্ত্তে দুই হাজার টাকা জিতিবেন, তখন কি আমরা ভাগ লইব?—না, টাকা না দিয়া থাকিতে পারিব?

কর্ত্তা এতক্ষণ কিছুই কথা কহেন নাই। মাষ্টার মহাশয়ের আশা ছিল, তিনি মাঝা হইতে মিটাইয়া দিবেন। কিন্তু মাষ্টারের সে আশায়ও ছাই পড়িল। কর্ত্তার বাড়ীর ভিতর ডাক পড়িল; তিনি চলিয়া গেলেন। জুয়ারীগণ তখন পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিয়া, আপনাদের মধ্যেরই দুই তিন জনকে সাক্ষীস্বরূপ রাখিয়া, মাষ্টারের নিকট হইতে বাড়ীবন্ধক লিখাইয়া লইল।

ইহার পরই সেই দুর্য্যোগে ভিজিতে-ভিজিতে কাঁদিতে-কাঁদিতে মাষ্টার বাটী প্রত্যাগত হন; সেই সময়ই, আমাদের বৈঠকখানায় আসিয়া তিনি তাঁহার এই শোচনীয় পরিণামের কথা বলিলেন। আমরা তো শুনিয়া অবাক!

পরেশনাথ মিত্রের

'রত্নগৃহের' জুয়াচুরী-কাণ্ড।

'রত্নগৃহের' উপসংহার।

'রত্নগৃহ'-কাণ্ড লইয়া পাঠককে আমরা বড়ই বিরক্ত করিয়াছি। কিন্তু তাঁহাদিগকে এ-সম্বন্ধে আর বিরক্ত করিতে চাহি না। এখন কেবল বিচারক ম্যাজিষ্ট্রেট ষ্টাইনবরা বাহাদুরের রায় ও তাহারই অনুবাদ দিয়া আমরা এবিষয় হইতে একরূপ ক্ষান্ত হইব।

সহসা এবিষয় হইতে ক্ষান্ত হইবার ইচ্ছা আমাদের ছিল না। মনে মনে বড় ভরসা ছিল যে, যাঁহারা পরেশনাথ মিত্রের 'রত্নগৃহের' বিজ্ঞাপনে প্রলোভিত হইয়া তাহার নিকট 'রত্নগৃহের' জন্য অর্থ পাঠাইয়াছেন, তাহাদের প্রেরিত সেই অর্থ আদায়-পক্ষে আমরা যথাসাধ্য সাহায্য-চেষ্টা করিব। কিন্তু যেরূপ শুনিতেছি, তাহাতে আপাততঃ সে আশা আমাদিগকে ছাড়িতে হইতেছে। শুনিতেছি, পরেশনাথের ছাপাখানার আর্থিক অবস্থাও এবার শোচনীয়। পরেশনাথ ইতিপূর্ব্বেই ১৮৮৬ সালের জুলাই মাসে, জানিনা কাহাকে ফাকি দিবার জন্য ছাপাখানা বেনামী করিয়াছিলেন। এবার বেনামীদারও এ ছাপাখানা আবার কট-কবলায় বন্ধক দিয়াছেন। অন্য অন্য সামান্য ঋণও পরেশনাথের এখন বিস্তর। ব্যাচারী এখন বিপাকে পড়িয়া জেলে পচিতেছে; অথচ তাহার পরিবারদিগের অন্নসংস্থানেরও কোন উপায় নাই,—এ সংবাদ আরও কষ্টকর। শুদ্ধ অর্থাভাবের জন্য, পরেশনাথ নাকি আজিও এ্যাসিষ্টাণ্ট কমিশনার বাহাদুরের আজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল করিয়া উঠিতে পারে নাই। এসব বড়ই দুখের কথা! এই সব নানা কারণেই, আমরা 'রত্নগৃহের' গ্রাহকগণের অর্থ-আদায়ের অভিলাষ আপাততঃ ত্যাগ করিয়াছি। তবে ভগবান যদি দিন দেন, পরেশনাথ যদি জেলমুক্ত হইয়া আসিয়া আবার ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইয়া দু'দশ টাকা উপার্জ্জন করেন, তখন না হয় তাঁহাদের অর্থ আদায়ের চেষ্টা করা যাইবে। কিন্তু আপাততঃ এ বিষয়ে ক্ষান্ত থাকাই ভাল।

এ মকর্দ্দমার রায়।

IN THE COURT OF
THE ASSISTANT COMMISSIONER
DHUBRI.

Present. ALFRED F. STEINBERG Esqr. C.S.
MAGISTRATE 1st *Class*
DHUBRI.

CASE NO 342C OF 1889.

ANANDA CHURN DUTTA
VERSUS
PORESH NATH MITTRA,

Case Under Sec. 417 I. P. C

Towards the end of October last the prosecutor Ananda Charan Datta, a treasury clerk at Dhubri, got an advertisement in which the accused Poreshnath Mitra of 169 Maniktola Street Calcutta (and proprietor of the New Balmiki Press) stated that he had ready for sale the "*Ratnagriha*"—a translation or abstract (this is a point in dispute) of a hundred principal books of the world, for Rs 5. Subscribers were also to get "prize" or "presents" (উপহার) consisting of an "album" of theatrical portraits, a set of 18 Carat gold-studs, a book of Bengali verse called "*Sangit-sudha*" and a "timepiece". The handbill offered various terms of payment, partly in advance and all through the value-payable parcel Post. We are chiefly concerned with the third set of terms, according to which subscribers were to get in a first instalment, the studs, the *Sangit-sudha* and the album, in the second instalment the timepiece, and in the third the *Ratnagriha* itself, each through V. P. P. Post. In conclusion the publisher offered to vary the terms to suit the convenience of customers. Ananda Charan accordingly wrote for the *Ratnagriha* and prizes. On Novr. 5 he received the first instalment, for which he paid Rs. 2-2-0 of which Re 1-12-0 was remitted through the post-office to the accused, the rest going in postal charges. The "album" proved a set of 5, 6 inch oliographs one of which may stands for Norma, the studs were of bone with their gilt plates and the *Sangit-sudha* was a chap-book the *Sangit-har* with an extra cover and title outside. The prosecutor wrote twice, he says, for the rest of the things, getting no answer he wrote to Durga Charan Lahiri the Secretary of the *Anusandhana-Samiti*—a Calcutta vigilance Committee against dishonest traders. This witness communicated the business to the Deputy Commissioner of Police who lent him two detectives to investigate the matter. They went to the accused's premises. This was on Novr. 24. To Durga Charan the accused said the book would be ready in Poush and in three or four weeks time. To the police-officers he shewed the presents and galley-proof of an abstract of the Ramayan and of part of Paradise Lost. He failed to produce the original "hundred books" and more particularly the *Athorva Veda*, which according to tradition does not exist in Bengal and has, I believe, never been printed.

It should be mentioned here that the *Bangabasi* of the previous day contained an advertisement signed by Durga Lahiri warning the public against the *Ratnagriha* business and promising further exposures in the next number of the *Anusandhana*. When Ananda supported by the managers of the *Bangabasi* and the *Anusandhana*, brought his case here on Novr. 30. Poreshnath made this paragraph the subject of a defamation case before the Presidency magistrate which he afterwards withdrew.

On the above facts, which are not disputed the prosecution ground their complaint. They argue that it never was contemplated to prepare and issue the *Ratnagriha* which he said was ready, that the printing of a few sheets after numerous enquiries was a mere pretence, and that Poreshnath was cheating the public by holding out the expectation of receiving it, when his real object was to induce them to pay Rs 4-0-0 for the "presents" which are worth Re 1-12-0 to Rs 2-0-0 in the retail market.

The answer of the accused is that he acted in good faith and took proper steps to prepare the *Ratnagriha*. He obtained a Commission for the examination at Calcutta of a number of witnesses who were said to be under contract to him to aid in the production of the work. These, however, were not examined and I have no evidence before me as to what the literary arrangement were, nor, what is more importants, when they were made. The only witnesses called before the Presidency magistrate are (1) a paper-dealer who says that since the end of September he supplied the accused with about 120 reams of printing papers partly for cash and partly on credit. Not having brought his books he cannot give dates. He understood the paper to be for the *Ratnagriha*. He identifies exhibit 'I' as printed on paper of the quality he supplied. This is a copy prepared for the binder—one of 2000 said to be ready on January 14 when this evidence was taken.

The other witness is the Head-Compositor of the Balmiki Press. He states that the *Ratnagriha* was taken in hand in Kartik (October-November). He further says that the advertisement was issued after about a tenth of the book was printed. Unfortunately he was not asked whether he meant proofs or sheets for the binder. His evidence contains no explanation of the stoppage of the work. According to him the work was given out to three other presses for completion only after the formal charge in this case had been drawn up. He is not asked at what stage the work was then, but the exhibit 'L' put in the day the charge was framed is not a tenth of the book. It is finally argued for the prosecution that the advertisement promised not an abstract but a translation of the 100 books and subjects. It is true that the *Ratnagriha* is now here called an abstract in so many words but looking to the promises in the advertisement of small size, low price and easy language no other interpritation is rationally possible. Strictly speaking this moderate promise is not carried out, when Cook the circumnavigator is confounded with Cook the tourist agent and when Aristotle is fobbed off with 10 lines and the categories are to be tooked for under Kant, but the badness of the book concerns me only as a possible sign of haste and so as an indication that it was taken in hand only after this prosecution commenced. Leaving this, however, out of account the prosecutor has signally failed to account for the non-production of the book before January 20/90 which he advertised as ready three months previously. It has been argued in his favour that his intentions must have been honest because the sale of the book would have paid him better than the profits of cheating. Honesty might have been the best policy, but it certainly was the harder and longer way of making money. The point is merely mentioned because some stress was laid on it. This case is really a test case. The swindle was largely advertised and is one of a numerous class. Under the circumstances a severe punishment is necessary. Under sec. 147 I. P. C I sentence Poreshnath Mittra to six months rigorous imprisonment.

DHUBRI. 21-1-90 3 } (*Sd.*) *Alfred. F. Steinberg.* A. C.

'অনুসন্ধানের' সকল পাঠক ইংরাজী জানেন না; সুতরাং ইংরাজী রায়ে তাঁহাদের তৃপ্তি হইবে না; বরং বিরক্তিই জন্মিবে। তাই তাঁহাদের অবগতির জন্য আমরা উপরোক্ত রায়ের বাঙ্গালা অনুবাদও নিম্নে করিয়া দিতেছি। সে বাঙ্গালা এই,—

ধুবড়ীর এ্যাসিষ্টাণ্ট কমিশনার
বাহাদুরের আদালত।

উপস্থিত।—এ্যালফ্রেড এফ্ ষ্টাইনবর্গ সি. এস.
প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্টেট,
ধুবড়ী।

১৮৮৯ সালের ৩৪২-সি নং মকর্দ্দমা।
আনন্দচন্দ্র দত্ত
বনাম
পরেশনাথ মিত্র।
ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪১৭-ধারা
অনুসারে মকর্দ্দমা।

রায়।

আনন্দচন্দ্র দত্ত, ধুবড়ীর ট্রেজারী-ক্লার্ক। গত অক্টোবর মাসের শেষে আনন্দ একখানি বিজ্ঞাপন পায়। এই বিজ্ঞাপন-পত্রে কলিকাতা ১৬৯ নং মানিকতলা ষ্ট্রীটের (নূতন বাল্মিকী যন্ত্রের সত্ত্বাধিকারী) আসামী পরেশনাথ মিত্র লিখিয়াছিল যে,—'রত্নগৃহ' পুস্তক তাহার নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। এই 'রত্নগৃহ' পুস্তক জগতের প্রধান প্রধান একশত পুস্তকের অনুবাদ বা সারসংগ্রহ ('রত্নগৃহ' অনুবাদ কি সারসংগ্রহ, ইহা বিবাদীয় বিষয়)। পরেশনাথ ৫৲ পাঁচ টাকায় এই পুস্তক দিতে চাহেন; এবং ঐ মূল্যেই, গায়িকা ও অভিনেত্রীগণের ছবির 'এলবাম', একপ্রস্ত এইট্ টেন্ ক্যারেট সোনার বোতাম, 'সঙ্গীত-সুধা' নামক একখানি বাঙ্গালা গানের পুস্তক এবং একটা 'টাইমপিস ঘড়ি' উপহার দিতে চাহেন। এই হাণ্ডবিল-বিজ্ঞাপনে নানা উপায়ে টাকা আদায়ের প্রস্তাব ছিল। কতক সম্পূর্ণ অগ্রিম, ও কতক আংশিকরূপে অগ্রিম। কিন্তু সকল টাকাই ভ্যালুপেয়েবেল পার্শ্বেলে আদায় করিবার কথা। এইসব সর্ত্তের মধ্যে তৃতীয় সর্ত্তগুলি লইয়াই আমরা এখন প্রধানতঃ সংলিপ্ত। এই সর্ত্ত-অনুসারে গ্রাহকগণ প্রথম কিস্তিতে এক প্রস্ত বোতাম, 'সঙ্গীতসুধা' পুস্তক এবং ছবির এলবাম পাইবে; দ্বিতীয় কিস্তিতে 'টাইমপিস ঘড়ি' পাইবে, এবং তৃতীয় কিস্তিতে নিজ 'রত্নগৃহ' পাইবে। এ সকলই ভ্যালুপেয়েবেল পার্শ্বেল-পোষ্টে পাইবে। সকলের শেষে গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য প্রকাশক এই সকল সর্ত্তের পরিবর্ত্তন করিতেও চাহিয়াছিলেন। এইজন্যই আনন্দচন্দ্র 'রত্নগৃহ' এবং উপহার সম্পূর্ণ পাইবার জন্য পত্র লেখে। নবেম্বর মাসের ৫ই তারিখে সে প্রথম কিস্তির দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হয়। এই জন্য সে ২৷৴০ দেয়। এই ২৷৴০ আনার মধ্যে পোষ্টাপিস-যোগে ১৷৴০ আনা আসামীকে পাঠান হয়, এবং বাকী ডাক-খরচায় খরচ হয়। এই 'এলবাম' ছবির পুস্তক ৫।৬ ইঞ্চি লম্বা খান-কএক 'অলিও-গ্রাফ'। ইহাকে 'অলিও-গ্রাফের' নমুনা বলা যাইতে পারে। বোতাম-গুলি হাড়ের নির্ম্মিত। উহার উপরে গিল্টির কাজ। 'সঙ্গীতসুধা' একখানি বটতলার পুস্তক।

এখানি 'সঙ্গীতহার' পুস্তক; উপরে কেবল একখানি বাড়তি মলাট, এবং সেই মলাটের বাহিরের দিকে 'সঙ্গীতসুধা' লেখা। ফরিয়াদী বক্রী দ্রব্যাদি পাইবার জন্য আসামীকে দুইবার পত্র লিখিয়াছিলেন। এই দুই পত্রের কোন উত্তর না পাইয়া 'অনুসন্ধান সমিতির' সম্পাদক শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়িকে পত্র লেখেন। অসৎ ব্যবসায়ীগণের প্রতারণা হইতে সাধারণকে সতর্ক করিবার জন্যই এই সমিতির সৃষ্টি। এই সাক্ষী (সমিতির সম্পাদক) এই বিষয় কলিকাতার পুলিসের ডেপুটি-কমিশনারকে জানান। ডেপুটি-কমিশনার এই বিষয় অনুসন্ধান করিবার জন্য তাঁহাকে দুইজন ডিটেক্টিভ কর্ম্মচারী দেন। তাঁহারা আসামীর গৃহে গমন করেন। নবেম্বর মাসের ২৪ এ তাঁহারা সেখানে গিয়াছিলেন। আসামী দুর্গাদাসকে বলে যে,—৩।৪ সপ্তাহ মধ্যে পৌষমাসে পুস্তক প্রস্তুত হইবে। পুলিস-অফিসারদিগকে আসামী উপহারসমূহ এবং রামায়ণের সংক্ষিপ্তসার এবং 'প্যারাডাইস লষ্টের' গেলিপ্রুফে খানিক অংশ দেখাইয়াছিল। মূল একশত পুস্তক, বিশেষতঃ 'অথর্ব্ব-বেদ,' আসামী তাঁহাদিগকে দেখাইতে পারে নাই। এইরূপ জনশ্রুতি যে, 'অথর্ব্ব-বেদ' এই বাঙ্গালা-দেশে পাওয়া যায় না; এবং আমার বিশ্বাস, ইহা কখনও ছাপা হয় নাই।

এক্ষণে ইহাও বলা ভাল যে, ইহার (২৩এ নবেম্বরের) পূর্ব্ব-দিনের 'বঙ্গবাসীতে' 'রত্নগৃহ' ব্যাপার হইতে সাধারণকে সতর্ক করিবার জন্য এবং আগামী-সংখ্যক 'অনুসন্ধানে' এ ব্যাপার-সম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যাপার প্রকাশ করিবার সম্পূর্ণ আভাস দিয়া শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী এক বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। আনন্দ যখন বঙ্গবাসীর এবং অনুসন্ধান-সমিতির কার্য্যাধ্যক্ষের সাহায্য পাইয়া নবেম্বর মাসের ৩০এ তারিখে এখানে এই মকর্দ্দমা রজু করে, তখন পরেশনাথ এই

বিজ্ঞাপনসূত্রে ইহাঁদের নামে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে এক মানহানির মকর্দ্দমা উপস্থিত করে। সে ইহার পর কিন্তু এ মকর্দ্দমা উঠাইয়া লয়।

উপরোক্ত ঘটনাসমূহে কোনরূপ আপত্তি উত্থাপিত হয় নাই। এবং বাদীপক্ষ এই সকল অবলম্বনেই এ মকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। বাদীর-পক্ষ বলেন যে,—পরেশনাথ 'রত্নগৃহ' প্রস্তুত আছে বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন; কিন্তু উক্ত পুস্তক প্রস্তুতের অভিপ্রায় তাঁহার কখনই ছিল না। বারবার অনুসন্ধানের পর, কএক পাত মুদ্রণ করা তাঁহার একটা আছিলা মাত্র; এবং প্রস্তুত পুস্তক দিব বলিয়া লোককে আশা দিয়া তিনি প্রতারণা করিয়া-আছেন। তাঁহার মূল অভিপ্রায় কিন্তু ঐ উপহার-সমূহের জন্য লোকের নিকট হইতে লোভ দেখাইয়া ৪৲ চারি টাকা গ্রহণ করা। বাজারের খরচা দরেও কিন্তু এই উপহারের প্রকৃত মূল্য ১৸০ হইতে জোর দুই টাকা।

আসামীর পক্ষের জবাব এই যে,—আসামী সরল বিশ্বাসে এই কাজ করিয়াছে; এবং 'রত্ন-গৃহ' পুস্তক প্রস্তুত করিবার জন্য উপযুক্ত উপায় গ্রহণ করিয়াছিল। এই পুস্তকের প্রস্তুত-সম্বন্ধে আসামীকে সাহায্য করিবার জন্য যাহাদের সহিত চুক্তিনামা বা কণ্ট্রাক্ট হইয়াছিল, সেই সকল ব্যক্তির সাফাই সাক্ষী গ্রহণের জন্য আসামী এই আদালত হইতে কলি-কাতায় এক কমিশন গ্রহণ করে। এই সকলেরও সাক্ষী কিন্তু গৃহীত হয় নাই। এবং পুস্তকের লেখার বন্দোবস্ত-সম্বন্ধে আসামী কি আয়োজন করিয়াছিল তাহারও কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ আমার সমুখে উপস্থিত নাই। কিম্বা এই সকল যখন হইয়াছিল তৎসম্বন্ধীয় প্রমাণ অতি আবশ্যক হইলেও, তাহা দেওয়া হয় নাই। কলিকাতার প্রেসিডেন্সি-ম্যাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে যে সাফাই দেওয়া হয়, তাহার (১) একজন কাগজ-বিক্রেতা। সে বলিয়াছে যে,—সেপ্টেম্বর মাসের শেষ হইতে সে আসামীকে ১২০ রিম ছাপি-বার কাগজ যুগাইয়াছে। ইহার কতক ধারে, এবং কতক নগদে। খাতা আনে নাই বলিয়া সে কাগজ-বিক্রয়ের তারিখ বলিতে পারে নাই। 'রত্নগৃহের' জন্য কাগজের আবশ্যক সে একথা বুঝিয়াছিল। দাখিলী 'এক্‌জিবিট আই' দেখিয়া সে বলে যে,—তাহার দত্তা কাগজের মত কাগজেই এ পুস্তক ছাপা হইয়াছে। এই পুস্তক-খণ্ডখানি দপ্তরীর জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। জানুয়ারী মাসের ১৪ই যখন এই সাক্ষ্য লওয়া হয়, তখন এইরূপ দুই-হাজার পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে, এইরূপ বলা হইয়াছে।

অন্য সাক্ষী 'বাল্মিকী-যন্ত্রালয়ের' হেড-কম্পোজিটার। সে বলে যে,—'রত্নগৃহের' ছাপা কার্ত্তিক মাসে (অক্টোবর-নবেম্বরে) আরম্ভ হইয়াছিল। সে আরও বলে যে —পুস্তকের আন্দাজ এক-দশমাংশ ছাপা হওয়ার পর, পুস্তকের বিজ্ঞাপন বিলি হই-য়াছে। এই এক দশমাংশ প্রুফ কিম্বা দপ্তরীকে দিবারমত ছাপা কাগজ, একথা দুর্ভাগ্যক্রমে কেহই তাহাকে জিজ্ঞাসা করে নাই। 'রত্নগৃহের' কাজ কেন বন্ধ হইল, তাহার সাক্ষ্যতে এ বিষয়েরও কোন কৈফিয়ৎ পাওয়া যায় নাই। তাহার কথামত জানা যায় যে,—এই মকর্দ্দমায় আসামীকে দস্তুরমত চার্য্য করার পর, পুস্তক শেষ করিবার জন্য, আরও অন্যান্য তিনটী প্রেসে ছাপিতে দেওয়া হইয়াছিল। সে সময়ে পুস্তকের কতখানি অংশ তৈয়ার হইয়াছিল একথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। কিন্তু চার্য্য করিবার তারিখে 'এক্‌জিবিট এ' চিহ্ন দিয়া পুস্তকের যে অংশ দাখিল করা হয়, তাহা সমগ্র পুস্তকের এক-দশমাংশও নহে।

বাদীপক্ষ পরিশেষে বলেন যে,—বিজ্ঞাপনে সংক্ষিপ্তসার দিবার কোন কথাই নাই। ইহাতে একশত পুস্তক এবং বিষয়ের তর্জ্জমা দিবার কথা। ইহা সত্য যে, 'রত্নগৃহ' সংক্ষিপ্তসার, ঠিক একথা বলা হয় নাই। কিন্তু বিজ্ঞাপনের স্বল্পকায়, স্বল্প মূল্য, সরল ভাষা প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহা সংক্ষিপ্তসার ভিন্ন ইহার অন্য কোন অর্থ সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। যথার্থ কথা বলিতে গেলে, সংক্ষিপ্ত-সারের এ সামান্য আশাও কিন্তু কার্য্যে পরি-ণত হয় নাই। কারণ, এ পুস্তকে পৃথিবী-পর্য্যটনকারী 'কুকের' সহিত যাত্রীদের পাণ্ডা 'কুককে' লইয়া গোলমাল করা হইয়াছে। 'এরিষ্টটল্‌কে' ১০ ছত্রে নিহত করা হইয়াছে; এবং 'কান্তের' নামে কএকটী দর্শনবিষয়ের নামমাত্র করা হইয়াছে। পুস্তকের এই কদর্য্য-ভাব দেখিয়া ইহা যে অতি তাড়াতাড়িতে সম্পন্ন হইয়াছে, ইহাই বোধ হয়। আর, তাহাতে ইহাই বুঝা যায় যে,—এই মকর্দ্দমা রুজু হইবার পরই এই পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু এ সকল কথাও ছাড়িয়া দিলে, আসামী ১৮৯০ সালের ২০ জানুয়ারীর তিন মাস পূর্ব্বে পুস্তক প্রস্তুত আছে বলিয়া বিজ্ঞাপন দিলেও, ২০এ জানুয়ারীর পূর্ব্বে পুস্তক কেন প্রস্তুত হয় নাই, ইহারও কোন কারণ বা প্রমাণ দর্শাইতে অপারক হইয়াছে। তাহার পরে এই কথা বলা হইয়াছে যে—সে সদভিপ্রায়ে এই কাজ করিয়াছে। কেন না, প্রতারণার কাজ অপেক্ষা পুস্তক-বিক্রয়ে তাহার অধিক টাকা লাভ হওয়ার সম্ভব। সততা সদুপায় হইতে পারে; কিন্তু সদুপায়ে ভরণ-পোষণ চলা বড়ই কঠিন, এবং ইহাতে বড়ই বিলম্ব ঘটে। আসামীর পক্ষ হইতে এই কথায় বড় জোরদেওয়া হইয়াছিল বলিয়াই একথা এখানে উল্লেখ করা গেল। এইরূপ প্রতারকদিগের বিচারে কিরূপ দণ্ড হয়, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্যই এ মকর্দ্দমা রুজু হইয়াছে। এইরূপ জুয়াচুরীও আজকাল অনেক চলি-তেছে। অনেকগুলি জুয়াচুরীর মধ্যে উপ-স্থিত ব্যাপার একটী মাত্র; এবং এই ব্যাপার বহু-লোকের নিকট বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। এমন অবস্থায় অপরাপর জুয়াচোরদিগের শিক্ষার জন্য এ মকর্দ্দমায় কঠোর শাস্তিরই প্রয়োজন। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪১৭ ধারা মতে পরেশনাথ মিত্রের ছয় মাস কঠিন পরিশ্রমসহ কারাদণ্ডের আজ্ঞা আমি প্রদান করিলাম।

(স্বাক্ষর) এ্যালফ্রেড, এফ, ষ্টাইনবরা।
২১।১।৯০ এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার।"

———

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

বড়ই বিষম সমস্যা! জুয়াচোরদের কাণ্ড-কারখানা দেখিয়া, আমরা অবাক হইয়াছি। এই ১৫ দিনের মধ্যে আমরা ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে নানা-রকমের বহু ছাণ্ডবিল পাইয়াছি। এক একখানি এক এক অদ্ভুত কাণ্ড! এমন প্রলোভন-ময় ভাষা, এমন মন-প্রাণ-ভুলান ভাব, এমন লোভজনক উপহার-কাহিনীর কথা, আমরা আর কখনও দেখি নাই; ইহা বলিলেও বড় অত্যুক্তি হইবে না। যাঁহারা অভিজ্ঞ, তাঁহারা এ মন-প্রাণ-মুগ্ধকর বিজ্ঞাপন পড়িলে ইহার ফাঁদ এড়াইতে পারেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু যাঁহারা নেহাত ভাল-মানুষ, কলিকাতার এ জুয়াচুরীর বিন্দুবিসর্গ জানেন না, সভ্যতার এ চাতুরী বুঝেন না, তাঁহারা এই সব বঞ্চক-দিগের চাতুরীজালে পড়িয়া অহরহ যে প্রতারিত হইবেন, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? প্রকৃতপক্ষে জুয়াচোরদের বিজ্ঞাপন-বাগুরার ফাঁদে পড়িয়া মফঃস্বলের অনেক নিরীহ ভদ্রলোকই মারা যাইতেছেন। ইহাঁদিগকে এই বিজ্ঞাপনের চাতুরী হইতে রক্ষা করিবার জন্য—তাহাদের এ কৌশল-জাল ভেদ করিয়া দিবার জন্য, এ সকল রকমেরই বিজ্ঞাপন 'অনুসন্ধানে' প্রকাশ করিতে আমাদের ইচ্ছা হয়। এবার এই ইচ্ছারই বশবর্ত্তী হইয়া, সেই সব বিজ্ঞাপনের তাড়া লইয়া আমরা লিখিতে বসিয়াছিলাম। একে একে ২৫ খানি বিজ্ঞা-পন উল্টাইলাম। সরকার মহাশয়, দত্তজা, বসাক-জী, ঢোল-পুত্র, মহান্ত-বাবাজী, মিত্রজা, মুখুজ্যে মহাশয়, ব্রহ্মচারী ব্যাচারী, ভট্টা-চার্য্যের বেটা, কত রঞ্জন-বেরঞ্জন কোম্পানী, কত লালা-ঘোষজা, কত মান্না-গোঁসাই, কত কুমার-বাবু প্রভৃতি দালাল-কম্পোজিটার, ভিক্ষুক-বৈরাগী, মহান্ত-ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী-উদাসীন প্রভৃতির বিজ্ঞাপন দেখিলাম; কিন্তু কাহার বিজ্ঞাপন এবার পাঠকের সম্মুখে নমুনা ধরিব, কিছুই যে ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলাম না! যেখানি হাতে করিয়া লই, সেইখানিই তো ছাপিতে ইচ্ছা হয়। কাজেই বড় বিভ্রাট!

যাহা হউক, চোখ বুজিয়া একখানি বিজ্ঞা-পন তুলিয়া লই। এই যে, হাতে ৩১নং রাম-

বিজ্ঞাপনসূত্রে ইহাঁদের নামে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে এক মানহানির মকর্দ্দমা উপস্থিত করে। সে ইহার পর কিন্তু এ মকর্দ্দমা উঠাইয়া লয়।

উপরোক্ত ঘটনাসমূহে কোনরূপ আপত্তি উত্থাপিত হয় নাই। এবং বাদীপক্ষ এই সকল অবলম্বনেই এ মকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। বাদীর-পক্ষ বলেন যে,—পরেশনাথ 'রত্নগৃহ' প্রস্তুত আছে বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন; কিন্তু উক্ত পুস্তক প্রস্তুতের অভিপ্রায় তাঁহার কখনই ছিল না। বারবার অনুসন্ধানের পর, কএক পাত মুদ্রণ করা তাঁহার একটা আছিলা মাত্র; এবং প্রস্তুত পুস্তক দিব বলিয়া লোককে আশা দিয়া তিনি প্রতারণা করিয়া-আছেন। তাঁহার মূল অভিপ্রায় কিন্তু ঐ উপহার-সমূহের জন্য লোকের নিকট হইতে লোভ দেখাইয়া ৪৲ চারি টাকা গ্রহণ করা। বাজারের খরচা দরেও কিন্তু এই উপহারের প্রকৃত মূল্য ১৸০ হইতে জোর দুই টাকা।

আসামীর পক্ষের জবাব এই যে,—আসামী সরল বিশ্বাসে এই কাজ করিয়াছে; এবং 'রত্ন-গৃহ' পুস্তক প্রস্তুত করিবার জন্য উপযুক্ত উপায় গ্রহণ করিয়াছিল। এই পুস্তকের প্রস্তুত-সম্বন্ধে আসামীকে সাহায্য করিবার জন্য যাহাদের সহিত চুক্তিনামা বা কণ্ট্রাক্ট হইয়াছিল, সেই সকল ব্যক্তির সাফাই সাক্ষী গ্রহণের জন্য আসামী এই আদালত হইতে কলি-কাতায় এক কমিশন গ্রহণ করে। এই সকলেরও সাক্ষী কিন্তু গৃহীত হয় নাই। এবং পুস্তকের লেখার বন্দোবস্ত-সম্বন্ধে আসামী কি আয়োজন করিয়াছিল তাহারও কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ আমার সমুখে উপস্থিত নাই। কিম্বা এই সকল যখন হইয়াছিল তৎসম্বন্ধীয় প্রমাণ অতি আবশ্যক হইলেও, তাহা দেওয়া হয় নাই। কলিকাতার প্রেসিডেন্সি-ম্যাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে যে সাফাই দেওয়া হয়, তাহার (১) একজন কাগজ-বিক্রেতা। সে বলিয়াছে যে,—সেপ্টেম্বর মাসের শেষ হইতে সে আসামীকে ১২০ রিম ছাপি-বার কাগজ যুগাইয়াছে। ইহার কতক ধারে, এবং কতক নগদে। খাতা আনে নাই বলিয়া সে কাগজ-বিক্রয়ের তারিখ বলিতে পারে নাই। 'রত্নগৃহের' জন্য কাগজের আবশ্যক সে একথা বুঝিয়াছিল। দাখিলী 'এক্‌জিবিট আই' দেখিয়া সে বলে যে,—তাহার দত্তা কাগজের মত কাগজেই এ পুস্তক ছাপা হইয়াছে। এই পুস্তক-খণ্ডখানি দপ্তরীর জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। জানুয়ারী মাসের ১৪ই যখন এই সাক্ষ্য লওয়া হয়, তখন এইরূপ দুই-হাজার পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে, এইরূপ বলা হইয়াছে।

অন্য সাক্ষী 'বাল্মিকী-যন্ত্রালয়ের' হেড-কম্পোজিটার। সে বলে যে,—'রত্নগৃহের' ছাপা কার্ত্তিক মাসে (অক্টোবর-নবেম্বরে) আরম্ভ হইয়াছিল। সে আরও বলে যে —পুস্তকের আন্দাজ এক-দশমাংশ ছাপা হওয়ার পর, পুস্তকের বিজ্ঞাপন বিলি হই-য়াছে। এই এক দশমাংশ প্রুফ কিম্বা দপ্তরীকে দিবারমত ছাপা কাগজ, একথা দুর্ভাগ্যক্রমে কেহই তাহাকে জিজ্ঞাসা করে নাই। 'রত্নগৃহের' কাজ কেন বন্ধ হইল, তাহার সাক্ষ্যতে এ বিষয়েরও কোন কৈফিয়ৎ পাওয়া যায় নাই। তাহার কথামত জানা যায় যে,—এই মকর্দ্দমায় আসামীকে দস্তুরমত চার্য্য করার পর, পুস্তক শেষ করিবার জন্য, আরও অন্যান্য তিনটী প্রেসে ছাপিতে দেওয়া হইয়াছিল। সে সময়ে পুস্তকের কতখানি অংশ তৈয়ার হইয়াছিল একথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। কিন্তু চার্য্য করিবার তারিখে 'এক্‌জিবিট এ' চিহ্ন দিয়া পুস্তকের যে অংশ দাখিল করা হয়, তাহা সমগ্র পুস্তকের এক-দশমাংশও নহে।

বাদীপক্ষ পরিশেষে বলেন যে,—বিজ্ঞাপনে সংক্ষিপ্তসার দিবার কোন কথাই নাই। ইহাতে একশত পুস্তক এবং বিষয়ের তর্জ্জমা দিবার কথা। ইহা সত্য যে, 'রত্নগৃহ' সংক্ষিপ্তসার, ঠিক একথা বলা হয় নাই। কিন্তু বিজ্ঞাপনের স্বল্পকায়, স্বল্প মূল্য, সরল ভাষা প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহা সংক্ষিপ্তসার ভিন্ন ইহার অন্য কোন অর্থ সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। যথার্থ কথা বলিতে গেলে, সংক্ষিপ্ত-সারের এ সামান্য আশাও কিন্তু কার্য্যে পরি-ণত হয় নাই। কারণ, এ পুস্তকে পৃথিবী-পর্য্যটনকারী 'কুকের' সহিত যাত্রীদের পাণ্ডা 'কুককে' লইয়া গোলমাল করা হইয়াছে। 'এরিষ্টটল্‌কে' ১০ ছত্রে নিহত করা হইয়াছে; এবং 'কান্তের' নামে কএকটী দর্শনবিষয়ের নামমাত্র করা হইয়াছে। পুস্তকের এই কদর্য্য-ভাব দেখিয়া ইহা যে অতি তাড়াতাড়িতে সম্পন্ন হইয়াছে, ইহাই বোধ হয়। আর, তাহাতে ইহাই বুঝা যায় যে,—এই মকর্দ্দমা রুজু হইবার পরই এই পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু এ সকল কথাও ছাড়িয়া দিলে, আসামী ১৮৯০ সালের ২০ জানুয়ারীর তিন মাস পূর্ব্বে পুস্তক প্রস্তুত আছে বলিয়া বিজ্ঞাপন দিলেও, ২০এ জানুয়ারীর পূর্ব্বে পুস্তক কেন প্রস্তুত হয় নাই, ইহারও কোন কারণ বা প্রমাণ দর্শাইতে অপারক হইয়াছে। তাহার পরে এই কথা বলা হইয়াছে যে—সে সদভিপ্রায়ে এই কাজ করিয়াছে। কেন না, প্রতারণার কাজ অপেক্ষা পুস্তক-বিক্রয়ে তাহার অধিক টাকা লাভ হওয়ার সম্ভব। সততা সদুপায় হইতে পারে; কিন্তু সদুপায়ে ভরণ-পোষণ চলা বড়ই কঠিন, এবং ইহাতে বড়ই বিলম্ব ঘটে। আসামীর পক্ষ হইতে এই কথায় বড় জোরদেওয়া হইয়াছিল বলিয়াই একথা এখানে উল্লেখ করা গেল। এইরূপ প্রতারকদিগের বিচারে কিরূপ দণ্ড হয়, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্যই এ মকর্দ্দমা রুজু হইয়াছে। এইরূপ জুয়াচুরীও আজকাল অনেক চলি-তেছে। অনেকগুলি জুয়াচুরীর মধ্যে উপ-স্থিত ব্যাপার একটী মাত্র; এবং এই ব্যাপার বহু-লোকের নিকট বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। এমন অবস্থায় অপরাপর জুয়াচোরদিগের শিক্ষার জন্য এ মকর্দ্দমায় কঠোর শাস্তিরই প্রয়োজন। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪১৭ ধারা মতে পরেশনাথ মিত্রের ছয় মাস কঠিন পরিশ্রমসহ কারাদণ্ডের আজ্ঞা আমি প্রদান করিলাম।

(স্বাক্ষর) এ্যালফ্রেড, এফ, ষ্টাইনবরা।
২১।১।৯০ এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার।"

———

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

বড়ই বিষম সমস্যা! জুয়াচোরদের কাণ্ড-কারখানা দেখিয়া, আমরা অবাক হইয়াছি। এই ১৫ দিনের মধ্যে আমরা ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে নানা-রকমের বহু ছাণ্ডবিল পাইয়াছি। এক একখানি এক এক অদ্ভুত কাণ্ড! এমন প্রলোভন-ময় ভাষা, এমন মন-প্রাণ-ভুলান ভাব, এমন লোভজনক উপহার-কাহিনীর কথা, আমরা আর কখনও দেখি নাই; ইহা বলিলেও বড় অত্যুক্তি হইবে না। যাঁহারা অভিজ্ঞ, তাঁহারা এ মন-প্রাণ-মুগ্ধকর বিজ্ঞাপন পড়িলে ইহার ফাঁদ এড়াইতে পারেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু যাঁহারা নেহাত ভাল-মানুষ, কলিকাতার এ জুয়াচুরীর বিন্দুবিসর্গ জানেন না, সভ্যতার এ চাতুরী বুঝেন না, তাঁহারা এই সব বঞ্চক-দিগের চাতুরীজালে পড়িয়া অহরহ যে প্রতারিত হইবেন, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? প্রকৃতপক্ষে জুয়াচোরদের বিজ্ঞাপন-বাগুরার ফাঁদে পড়িয়া মফঃস্বলের অনেক নিরীহ ভদ্রলোকই মারা যাইতেছেন। ইহাঁদিগকে এই বিজ্ঞাপনের চাতুরী হইতে রক্ষা করিবার জন্য—তাহাদের এ কৌশল-জাল ভেদ করিয়া দিবার জন্য, এ সকল রকমেরই বিজ্ঞাপন 'অনুসন্ধানে' প্রকাশ করিতে আমাদের ইচ্ছা হয়। এবার এই ইচ্ছারই বশবর্ত্তী হইয়া, সেই সব বিজ্ঞাপনের তাড়া লইয়া আমরা লিখিতে বসিয়াছিলাম। একে একে ২৫ খানি বিজ্ঞা-পন উল্টাইলাম। সরকার মহাশয়, দত্তজা, বসাক-জী, ঢোল-পুত্র, মহান্ত-বাবাজী, মিত্রজা, মুখুজ্যে মহাশয়, ব্রহ্মচারী ব্যাচারী, ভট্টা-চার্য্যের বেটা, কত রঞ্জন-বেরঞ্জন কোম্পানী, কত লালা-ঘোষজা, কত মান্না-গোঁসাই, কত কুমার-বাবু প্রভৃতি দালাল-কম্পোজিটার, ভিক্ষুক-বৈরাগী, মহান্ত-ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী-উদাসীন প্রভৃতির বিজ্ঞাপন দেখিলাম; কিন্তু কাহার বিজ্ঞাপন এবার পাঠকের সম্মুখে নমুনা ধরিব, কিছুই যে ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলাম না! যেখানি হাতে করিয়া লই, সেইখানিই তো ছাপিতে ইচ্ছা হয়। কাজেই বড় বিভ্রাট!

যাহা হউক, চোখ বুজিয়া একখানি বিজ্ঞা-পন তুলিয়া লই। এই যে, হাতে ৩১নং রাম-

তাঁহাদের প্রথম বৎসর কিরূপ লাভ, কতদূর সুযোগ, কিরূপ আশাতীত সুবিধা দেখুন!—

পঞ্চাশ রকমের উপহার!

১ম। মনের কথা, ২য়। জ্যোতিষ, ৩য়। যোগতত্ত্ব, ৪র্থ। যোগমাহাত্ম্য, ৫ম। মুগ্ধ করণ বিধি, ৬ষ্ঠ। গৃহস্থের কারখানা, ৭ম। ভারতে কোম্পানির লীলা, ৮ম। গরীবের কথা, ৯ম। সমালোচনা বিভ্রাট, ১০ম। রামায়ণ রহস্য, ১১শ। যাদুবিদ্যা, ১২শ। বিলাসিনী, ১৩শ। নূতনবৌ, ১৪শ। গুল-বাহার, ১৫শ। কাজির বিচার, ১৬শ। পাঁচ-ফুলের সাজি, ১৭শ। বিজ্ঞাপন vs বিশ্বকর্ম্মা, ১৮শ। ইন্দ্রজাল, ১৯শ। ভৈষজ্যতত্ত্ব, ২০শ। ছিনিয়ারি চাটনী, ২১শ। সাহেবীলীলা, ২২শ। পরমায়ুপ্রহরী, ২৩শ। পাগলের কথা, ২৪শ। আদিমসঙ্গীতশাস্ত্র। ২৫শ। হর-পার্ব্বতীসংবাদ, ২৬শ। হরিদাসজীর কথা, ২৭শ। তানসেন চরিত, ২৮শ। রাগরাগিণী সংবাদ, ২৯শ। সাধকচরিত, ৩০শ। স্বর-গ্রামসাধন, ৩১শ। হিন্দুস্থানী খেয়াল, ৩২শ। হিন্দী টপ্পা, ৩৩শ। বাঙ্গালাসঙ্গীত।

আরও দেখুন—

৩৪শ। সতরঞ্চের সুন্দর ছক, ৩৫শ। দশপঁচিশের সুন্দর ঘর, ৩৬শ। খেলিবার মনোহর তাস ৩৭শ। সচিত্র চিঠির কাগজ, ৩৮শ। সুন্দর ছবিযুক্ত খাম, ৩৯শ। উত্তম বাঁধান একসাইজ বুক, ৪০শ। সচিত্র গোলক-ধাম, ৪১শ হইতে ৫০শ। ঘরে টাঙ্গাইবার উপযুক্ত দশরকমের দশখানি মনোহর বিলাতী ছবি!

এমন মূল্যবান সুন্দর বিলাতি ছবি এপর্য্যন্ত কেহ কখন উপহার দেন নাই!

বিজ্ঞাপনের ব্যয়বাহুল্য ভয়ে এই পঞ্চাশ রকমের বিরাট উপহারের সমস্ত বিবরণ বিশেষ করিয়া বর্ণনা করিতে পারিলাম না. কেবলমাত্র নামগুলি দেওয়া গেল। আপনারা ইহার নাম দেখিয়াই সমস্ত বুঝিতে পারিবেন যে, কিরূপ সুন্দর উপাদেয় ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী উপহার দেওয়া যাইতেছে।

তারপর আবার—অদৃষ্টচক্রের উপহার।

যাঁহারা এই অপূর্ব্ব ভারত-কল্পদ্রুমের গ্রাহক হইবেন, তাঁহারা উপরিলিখিত পঞ্চাশ রকমের উপহারত পাইবেনই, তদ্ভিন্ন তাঁহাদের নাম গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইলে নম্বর অনুসারে ঘড়ি, চেন, আংটী, টাইমপিস, বিলাতী মনো-হর ছবি, প্রভৃতি উপহার পাইবেন। অদৃষ্ট-চক্রের পুরস্কার বলিয়া ইহাতে ও কেহই বঞ্চিত হইবেন না, সকলেই একটী না একটী নূতন রকমারী দ্রব্য নিশ্চয়ই পাইবেন। তবে নম্বর অনুসারে কেহ বা মূল্যবান ঘড়ি কেহ বা তদ-পেক্ষা অল্পমূল্যের দ্রব্য পাইবেন। আর যাঁহারা একত্রে পাঁচজন গ্রাহক হইবেন, তাঁহা-দের মধ্যে একজন অবশ্যই ঘড়ি পাইবেন, বাকী চারিজন অপর চারিটী জিনিষ পাইবেন।

এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন—

উপহারগুলির মূল্য খুব কম করিয়া এক পয়সা দুই পয়সা হিসাবে ধরিলেও পঞ্চাশ রকমের দেড় টাকার অধিক হয়। তারপর এক বৎসরের অপূর্ব্ব ভারত-কল্পদ্রুমের মূল্য ডাকমাশুল-সমেত মাসিক ৵০ এক আনা হিসাবে ধরিলেও ৸০ আনা হয়। তার পর আবার অদৃষ্টচক্রের উপহার! ইহাতে কেহ বা মূল্যবান ঘড়ি পাইবেন কেহবা রকমারী অন্য কোন দ্রব্য পাইবেন। তবে আপনারা হিসাব করিয়া দেখুন যে, আমাদের নিজের খরচ-খরচা ছাড়িয়া দিলেও দাম কত পড়ে? এবং তাহা হইলেও আপনাদের লাভ আছে কিনা? তবে এরূপভাবে বিতরণ করিবার কারণ কি? আমরা কি নিঃস্বার্থ দান করিতে বসিয়াছি? তাই বা কেমন করিয়া বলিব? তবে কি ইহার কোন কারণ নাই? আছে বৈকি! ইহা এক পক্ষে চূড়ান্ত ব্যবসাবুদ্ধি, অপর পক্ষে বিপুল অর্থব্যয়! ভাবিয়া দেখুন— এবৎসরে এইরূপ বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া উপ-যুক্ত গ্রাহক সংগ্রহ হইবার পরে তাঁহারা যখন দেখিবেন যে অপূর্ব্ব ভারত-কল্পদ্রুম কিরূপ উপাদেয় সামগ্রী, কিরূপ নিত্য প্রয়োজনীয় পুস্তক, কিরূপ হিতকর পত্রিকা, তখন তাঁহারা অবশ্যই ভাল জিনিসের আদর করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না; তখন পর বৎসরে আর উপহারের অপেক্ষা না করিয়াই আমাদিগকে ন্যায্য মূল্য প্রদান করিতে সম্মত হইবেন। তখন বঙ্গে প্রকৃত ভাল জিনিষের আদর হইবে, আমা-দেরও আশা পূর্ণ হইবে। ইহাই আমাদের বাসনা, ইহাই আমাদের কল্পনা। এখন আপনারা বুঝিয়া দেখুন, এই সরল সত্য বিজ্ঞা-পনের প্রকৃত মর্ম্ম কি?

মূল্য।

কাহাকেও মূল্য অগ্রিম দিতে হইবে না। ১৫ই অগ্রহায়ণের মধ্যে যাঁহারা একখানি পোষ্টকার্ডে নাম ও ঠিকানা লিখিয়া পাঠাই-বেন, আমরা তাঁহাদিগকে এই পঞ্চাশ রকমের উপহারসহ অপূর্ব্ব ভারত-কল্পদ্রুম পাঠাইয়া দিব। তাঁহারা কেবল মাত্র ২ দুইটী টাকা দিয়া তাহা গ্রহণ করিবেন। পরে অদৃষ্টচক্রের উপহার প্রেরিত হইবে এবং এক বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি মাসে অপূর্ব্ব ভারত-কল্পদ্রুম পাইবেন।

যিনি পাঁচজন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া একত্রে পাঁচখানি লইবেন, তাঁহাকে একখানি অপূর্ব্ব ভারত-কল্পদ্রুম পঞ্চাশ রকমের উপহার-সহ বিনামূল্যে প্রদান করিব।

(এইখানে নাম ও ঠিকানা)

পুরস্কার।

যিনি এই বিজ্ঞাপন তাঁহার নিকটবর্ত্তী গ্রামস্থ ভদ্রলোকের নিকট প্রচার করিবেন, এবং যাঁহাদিগকে এই বিজ্ঞাপন দিবেন বা দেখাইবেন তাঁহাদিগের মধ্যে অন্ততঃ দশ-জনের নাম স্বাক্ষর করাইয়া তাঁহাদের ঠিকানা সহ আমাদিগের নিকট একখানি পত্র লিখিবেন আমরা তাঁহাকে 'পরমায়ু-প্রহরী' নামক গৃহ-স্থের নিত্য-প্রয়োজনীয় একখানি পুস্তক বিনা-মূল্যে ও বিনা ডাকমাশুলে পুরস্কার দিব।"

পাঠক! 'অপূর্ব্ব ভারত-কল্পদ্রুমের অপূর্ব্ব বিজ্ঞাপন দেখিলেন! এখন ইহাকে সাধুর সাধুত্বের পরিচয়ই বলুন, আর ব্যবসাদারের ব্যবসাই বলুন, আর জুয়াচোরের জুয়াচুরীই বলুন, সে সকলই আপনাদের বুদ্ধি-বিবেচনার উপরই নির্ভর। আমরা কেবল মতামত প্রকাশ করিতে চাহি না। আমরা যেমন দেখিয়াছি যেমন শুনিয়াছি, অবিকল সেই সব কথাই আপনাদের নিকট নিবেদন করিলাম বিচারের ভার, আপনাদের উপর। তবে আপনারা যদি এতবড় জাঁকাল বিজ্ঞাপনের 'অপূর্ব্ব ভারত-কল্প-দ্রুমের' একটু নমুনা দেখিতে চান, তাহা হইলে না হয় চাটনিস্বরূপ 'তাহাও আপনা-দিগকে একটু উপহার দিই। 'অপূর্ব্ব ভারত কল্প-দ্রুম' ঠিক 'অনুসন্ধানের' আকার; মলা-টের উপরও 'অনুসন্ধানের' মত কোনা কোনি ছত্রে লেখা। না পড়িলে যেন 'অনুসন্ধান' বলিয়াই ভ্রম হয়! তবে 'অনুসন্ধানের' আকার চারি ফর্ম্মা, আর ইহার আকার দুই ফর্ম্মা; অর্থাৎ ইহা 'অনুসন্ধানের' অর্দ্ধেক এই যা' প্রভেদ! আরও প্রভেদ এই যে,—'অনুসন্ধান' মাসে দুইবার এবং 'অপূর্ব্ব ভারতকল্প-দ্রুম' মাসে একবার প্রকাশ হয়। অর্থাৎ বার্ষিক আকারে ধরিতে গেলে, 'অপূর্ব্ব ভারত-কল্পদ্রুম' 'অনুসন্ধানের' সিকি। এদিকে 'অনুসন্ধানের' বার্ষিক মূল্যে মায় ডাকমাশুল দেড় টাকা মাত্র; আর 'অপূর্ব্ব ভারত কল্প-দ্রুমের' বার্ষিক মূল্য দুই টাকা। 'অপূর্ব্ব 'ভারত কল্প-দ্রুম' কোন্ প্রেসে ছাপা হয়, কাহার দ্বারা প্রকাশিত হয়, এসব জানিবার কোন উপায়ই নাই। কাগজ-খানি কেন এ বে-আইনি ভাবে ছাপা হইতেছে, তাহা কি এখনও বলিতে হইবে? 'অপূর্ব্ব ভারত' কল্প-দ্রুম' প্রকাশক আইনের অমর্য্যাদা করিয়া এ কাজ করুন, তাহাতে দুঃখ নাই; কিন্তু দুঃখ এই যে, 'অপূর্ব্ব ভারত-কল্পদ্রুম' প্রকাশক ডিটেক্‌টিভ পুলিসের কৌন্সিলের হাত এড়া-ইতে পারিলেন না। পারিবেন নাই বা বলি কেন, এ-অপূর্ব্ব 'ভারতকল্পদ্রুম' কোথায় ছাপা হইতেছে, ডিটেক্‌টিভ পুলিস তো ডিটেক্‌টিভ পুলিশ, আমরা পর্য্যন্তও তাহা জানিতে পারিয়াছি।

কিন্তু যাউক ও-কথা। পুলিসের কাজ পুলিসে করিবে; আমরা সে কথা লইয়া টানা-পাড়া করিতে যাইব কেন? এখন, এই 'ভারত-কল্পদ্রুমে' কি আছে, তাই একটু শুনুন। প্রবন্ধ গুলি অবশ্য সম্পাদক যদি যদি কেহ থাকেন—নিজে লিখিয়াছেন কি না, সন্দেহ। অন্য কাগজ হইতে চুরী করিয়াছেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। চুরী করিয়াছেন বলি-লাম; ইহাতে যেন রাগ না করেন! কারণ, চুরী তো বটেই! আমাদেরই যে 'অনুসন্ধান' হইতে প্রবন্ধ চুরী হইয়াছে! ইহাতেও আমা-দের দুঃখ হইত না, যদি কোথা হইতে কি চুরী করিয়াছেন, 'অপূর্ব্ব ভারত-কল্পদ্রুমের' প্রকা-শক এই কথাটীও বলিয়া দিতেন! তা' যে প্রকা-শকই নাই; বলিয়া দিবে কে? 'অনুসন্ধানের' অপরাপর পত্র হইতেও প্রবন্ধ চুরী দেখিলাম। সে সকলেরও কোন উল্লেখ কিন্তু নাই। ইহাই হইতেছে,—"ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র, বাল-সাহিত্যের শিক্ষাগুরু স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়, তরঙ্গময়ী ভাষার সৃষ্টিকর্ত্তা বাবু বঙ্কিমচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়, শ্রদ্ধাস্পদ ৺ অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি মহাত্মাগণের নিয়ত উদ্যোগ-সম্পন্ন কার্য্যের ন্যায় সুমহৎ কার্য্য। পাঠক! "এ রহস্যময় জগতের বিচিত্র নক্সা" আজ কি আরও দেখিতে চান?

শ্রীফকিরচন্দ্র সরকার।

ফকিরচন্দ্র সরকারের কথা গতবারে আমরা বলিয়াছি। তাঁহার প্রকাশিত বিজ্ঞাপনাদি প্রকাশ করিব বলিয়া আমরা কতকটা আভাসও দিয়াছিলাম। কিন্তু গতবারের সে লেখার পর, ফকির বাবু স্বয়ং আমাদের আপিসে আসিয়াছিলেন; আসিয়া বলিলেন,—"ইন্দ্রজাল-সম্বন্ধে বিপাকে পড়িয়া এককালে কি-একটা কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, তাহা লইয়া চিরকাল টানাটানি করা কি আর ভাল? আমি এখন প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি,—আর কোন নোংরা কাজে আমি প্রাণান্তেও হাত দিব না। আপনারা মার্জ্জনা করুন; 'অনুসন্ধানে' আমার বিজ্ঞাপনাদি প্রকাশ করিয়া আর আমায় মাটি করিবেন না। আমি 'ভ্রান্তি' পুস্তকের যে বিজ্ঞাপন আদি জারি করিয়াছি, তাহাতে গ্রাহকগণকে প্রলোভিত করিবার জন্য নানা উপহার দিবার কথা আছে; সেটীও আমার সম্পূর্ণ বুদ্ধির দোষ। আমি এও প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে,—আমি আর উপহার দিব না। যাঁহারা উপহার-লোভে গ্রাহক হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি বরং সুলভমূল্যে পুস্তক দিব। আমার নামে যদি কাহারও কোন অভিযোগ থাকে, তিনি সে সকল আপনাদিগকে লিখিলে বা বলিলে, আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তাহা জানাইবেন; আমি তৎক্ষণাৎই তাহার প্রতিকার করিব। তাহা যখন না করি, তখন আপনাদের মনে যাহা আছে, তাহাই করিবেন। এখন ক্ষান্ত হউন।" সরকারজীর কথায় ও ব্যবহারে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। তিনি যদি আপন কথামত কাজ করিতে পারেন, তাহা হইলে তো বড় ভালই কথা! এমন করিয়া যদি সকলকেই আমরা সৎপথে আনিতে পারি, তাহাহইলে 'অনুসন্ধানের' জন্য আমাদের শ্রম সার্থক হইল; ভগবানের কৃপায় 'অনুসন্ধানের' জন্ম সফল হইল।

ফকির বাবু তাঁহার 'বিলাতিরহস্য' ও 'মায়া-মরীচিকা' দিয়াছেন। সাবকাশ মতে, সুবিধা বোধ হইলে আমরা তাহার সমালোচনা করিব।

সংবাদ।

--গত সপ্তাহে নারায়ণগঞ্জে পাটের গুদামে আগুন লাগিয়া প্রায় ৪ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। পাটের বাজার কিছু চড়িবার সম্ভাবনা।

—সম্প্রতি ২৪ পরগণার ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের বাটীতে চুরী হইয়া গিয়াছে। পুলিসের কর্ত্তার বাড়ী চুরী, বড়ই ভয়ানক সংবাদ!

—দিল্লীর নিকটবর্ত্তী স্থানে ইতিমধ্যে ডাকগাড়ীতে এক ভয়ানক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। ২০ জন ডাকাইত হঠাৎ আসিয়া ডাকগাড়ি আক্রমণ করে; এবং দ্রব্যাদি লুট করিয়া পলায়ণ করে।

—গড়ের মাঠে রাজপৌত্রের সমক্ষে অভিনয় করিয়া 'বেঙ্গল থিয়েটার কোম্পানী' বড়ই যশঃ-খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাজদরবার হইতে কোম্পানীকে নানা প্রশংসাবাদ প্রদত্ত হইতেছে।

—মাদ্রাজের ত্রিপতির মহান্ত মঠের টাকা তছরূপ করাতে তিনমাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। মহান্ত মনে করিয়াছিলেন, মঠের টাকা তাঁহার নিজের সম্পত্তি; কিন্তু এখন তাঁহার মোহ বোধ হয় ভাঙ্গিল। আমাদের তারকেশ্বরের মহান্ত কি এ দোষে দোষী নন? ইহার কি প্রতিকার নাই।

—'ষ্টেটস্‌ম্যানের' সম্পাদক রবার্ট নইটের মৃত্যু হইয়াছে। বাঙ্গালীর শোকে আজকাল 'ষ্টেটস্‌ম্যানের' অঙ্গভরা। শোক তো করিতেছেন অনেকেই, কিন্তু ইহাঁরা সকলেই নাইট সাহেবকে চিনিতেন কি?

—সংশোধিনীর সম্পাদক মানহানির অভিযোগে কারাদণ্ডে দণ্ডিত। চট্টগ্রামের হাকিমরা সংবাদপত্রের উপর এত চটা কেন? ঝালের কালীতে কি চট্টগ্রামে সংবাদপত্র ছাপা হয়?

—শুনিলাম পুরীক্ষেত্রে একটী বেদ-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। উদ্যোগী ব্রাহ্মণ কি? কলিকাল বলিয়াই এ প্রশ্ন!

—কাপ্তেন হিয়ার্সের নালিসে পাইওনিয়ারের এডেন সাহেব সেসন-সোপর্দ্দ হইলেন। ওদিকে আবার ৫০ হাজার টাকার ক্ষতিপূরণের নালিশ হইয়াছে। হিয়ার্সে বড়ই নাছোড়বান্দা!

—উত্তর-পশ্চিম রেলওয়ের মূলতান-ষ্টেষণ হইতে জনৈক দেশীয়া রমণী বিনা-টিকিটে ট্রেণে চড়িয়া ছাঙ্গাভাঙ্গা নামক ষ্টেষণের নিকটবর্ত্তী একস্থানে হইতে লাফাইয়া পড়ে। বলা বাহুল্য, ট্রেণ তখন চলিতেছিল। রমণীর ঐরূপ লাফাইবার কারণ, রেলওয়ে-কোম্পানীকে ফাঁকি দেওয়া। কিন্তু রমণীর এ উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। গার্ড তখনই ট্রেণ থামাইয়া রমণীকে গাড়ীতে তুলিয়া লয়; এবং লাহোরে আসিয়া পুলীসের হস্তে সমর্পণ করে। ইহার মোকর্দ্দমা এখনও হয় নাই। পাহাড়ে মেয়ে নাকি!

অনুসন্ধান।

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

৩য় খণ্ড] ১৫ই ফাল্গুন, ১২৯৬ সাল। [১৪শ সংখ্যা

ভক্তের গান।

ঝিঁঝিট।—ঠুংরি।

১।

"কর তাঁর নাম গান, যতদিন দেহে রহে প্রাণ।
যাঁর মহিমা জ্বলন্ত জ্যোতি,জগত করে হে আলো,
স্রোত বহে প্রেম-পীযূষবারি, সকল জীব-
সুখকারী হে;
করুণা স্মরিয়ে তনু হয় পুলকিত,
বাক্যে বলিতে কি পারি।
যাঁর প্রসাদে এক মুহূর্ত্তে সকল শোক অপসারি হে।
উচ্চে নীচে দেশ দেশান্তে জলগর্ভে কি আকাশে,
অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর,
এই সদা সবে জিজ্ঞাসে হে।
চেতন নিকেতন, পরশ রতন, সেই নয়ন অনিমেষ।
নিরঞ্জন সেই, যার দরশনে, নাহি রহে দুঃখ-লেশ।"

২।

হাম্বির—আড়াঠেকা।

"বিষয়-মৃগতৃষ্ণায় ক্রমে আয়ু হয় ক্ষীণ,
আমি কৃতী, আমি ধনী, এই দর্পে যায় দিন।
হয়ে আশা-বশীভূত, কুসঙ্গে কুপথে রত,
সতত আত্ম-বিস্মৃত, হারাইয়া তত্ত্বধন।
ক্ষুধা আদি চতুষ্টয়, কাম আদি রিপু ছয়,
বলেতে হরিয়া লয়, পরম পদার্থ মন।
যারে বল পরমার্থ, না ভাবিলে সে পদার্থ,
সংসার সকল ব্যর্থ, সার সত্যের সাধন।"

বাটপাড়ের উপর ধড়িবাজ।

কলিকাতা চিৎপুর-রোডের উপর রসিক পোদ্দারের রোকড়ের দোকান। কোন কারণবশতঃ পোদ্দার মহাশয়ের প্রকৃত নামটী গোপন রাখিয়া, আমরা তাঁহাকে রসিক নামেই অভিহিত করিলাম। অনেকেই পরের ধনে পেদ্দারী করিয়া থাকেন; কিন্তু রসিক-সম্বন্ধে সে দোষ স্পর্শিয়াছিল কি না, জানি না। বিষয়-কার্য্য-সম্বন্ধে রসিক একজন পাকা লোক। পসার বেশ, পয়সাও করিয়াছেন,—অনেক। বাজারে গুজব, রসিক বড়মানুষ—গাঁতের মাল কিনিয়া। পুলিসের সহিত তাঁহার দহরম-মহরম খুব! তবে গোপনে যত, প্রকাশ্যে তত নয়। রসিক পুলিসকে অনেক সময় অনেক বিষয়ে 'মদৎ' দিয়া থাকেন। পুলিসও তাঁহার নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী। রসিক বড় সুচতুর, স্বার্থ না থাকিলে সহসা কাহারও সহায়তা করিতে অগ্রসর হন না। নিজের দায়-দফা পড়িলে, তিনি পুলিসের নিকট হইতে সে ঋণ মায় সুদ-সমেত পরিশোধ করিয়া লয়েন। এই তো গেল রসিকের চরিত্রগত ভাব; তা'র পর আমাদের বক্তব্য বিষয় বলি।

এক দিন গ্রীষ্মকালে। বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময়। একটী ভদ্রলোক—অন্ততঃ

তাঁহার পরিচ্ছদ ও প্রকৃতি দর্শনে তাঁহাকে ভদ্রলোক বলিয়াই প্রতীয়মান হয়—একখানি ২০৲ টাকার আন্‌কোরা নূতন নোট পোদ্দার মহাশয়ের দোকানে ভাঙ্গাইতে আসেন। পাঠককে বলিয়া রাখি যে, এই সময় জাল নোটের বড় ধুম পড়িয়াছে। ২০ টাকার নোট জাল!—জাল নোটের জ্বালায় বাজার শশঙ্কিত!—চারিদিকে ডিটেক্‌টিভ্ ফিরিতেছে। বড় সাহেবের বড় তন্বি!—অনুসন্ধানের ত্রুটি নাই! কিন্তু জালিয়াতের কোন 'পাতা' পাওয়া যাইতেছে না। যখন ঐ ভদ্রলোকটী ঐ ২০৲ টাকার নোটখানি রসিকের দোকানে ভাঙ্গাইতে আইসেন, রসিক তখন কোন কার্য্যোপলক্ষে বাহিরে গিয়াছিলেন। দোকানে তাঁহার সরকার ও অন্যান্য লোকজন ছিল। সরকার নোটখানি হাতে করিয়া লইয়া দেখিল, আন্‌কোরা নূতন নোট। নোটখানি দেখিয়া, কি জানি কেন, তাহার মনে কিছু সন্দেহের উদয় হইল। সে ভাবিল,—"টাকা দিই কি না!" একবার ভাবিল, "দিই"; আবার তখনই তাহার মনে হইল,—"না, যদি জাল নোট হয়, তাহা হইলেই তো বড় বিপদের কথা!" এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া সরকার সেই ভদ্রলোকটিকে বলিল,—"না মহাশয়, আমি নোটের টাকা দিতে পারিব না। আমার মনিবের হুকুম নাই।" কথা শুনিয়া, বাবুটী বলিলেন,—"সে কি বাপু! বাটা পাবে, দেবে না কেন? সকলেই যদি এই কথা বল্‌বে, তবে আমি এ নোট ভাঙ্গাই কোথায়?" সরকার তখন বলিল,—"আচ্ছা, আপনি কি বাটা দিতে পারেন?"

"যা দস্তুর আছে, তাই পাবে।"

"সে দস্তুর আর এখন চলে না—এখন কেমন বাজারটী দেখিতেছেন তো! গোটা দুই টাকা দিতে পারেন?"

বাবু বলিলেন,—"দুইটী টাকা পারি না—আমি একটী টাকা বাটা দিতে পারি।"

একখানা ২০৲ টাকার নোট ভাঙ্গাইতে এক টাকা বাটা দিতে স্বীকৃত হওয়ায়, সরকারের মনে সন্দেহ আরও দৃঢ়ীভূত হইল। সে আরও দেখিল, একটু পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিয়া বসিলে, চাই কি দুই টাকা পূরাই পাইতে পারি। সুতরাং স্বতঃই তাহার মনে উদয় হইল,—"এইটুকু গিয়া করেন্সি-আপিস হইতে নোটখানি ভাঙ্গাইয়া আনিলেই বিনা-বাটায় বাবুটী ভাঙ্গাইতে পারেন। কিন্তু ইনি তাহা না করিয়া এরূপ অত্যধিক বাটা দিতে স্বীকৃত কেন? ইহার ভিতর নিশ্চয়ই কোন 'গলদ্' আছে।"—এই ভাবিয়া সরকার বাবুটীকে বলিল,—"না মহাশয়, আমি টাকা দিতে পারিব না—আপনি অন্য কোথাও দেখুন।"

ইত্যবসরে পোদ্দার স্বয়ং আসিয়া দোকানে উপস্থিত হইলেন, সকল কথা শুনিলেন; শুনিয়া নোটখানি হাতে করিয়া লইলেন; এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিলেন। দেখিয়া, খানিক কি ভাবিলেন; ভাবিয়া, বলিলেন,—"আচ্ছা, এ টাকা আপনাকে দিতে পারি! কিন্তু আপনাকে কিছুক্ষণ এইখানে অপেক্ষা করিতে হইবে।" বাবুটী তাহাই করিতে স্বীকৃত হইলেন। তখন পোদ্দার মহাশয় গোপনে সেই নোটখানি করেন্সী-আপিস হইতে ভাঙ্গাইয়া আনিবার জন্য একটী সুচতুর লোককে পাঠাইয়া দিলেন। বাবুটী দোকানে বসিয়া রহিলেন।

ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই, সেই লোক করেন্সী-আপিস হইতে টাকা আনিয়া উপস্থিত হইল, ও ২০টী টাকা গণিয়া পোদ্দার মহাশয়ের হাতে দিল। তিনি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন;—"ভাবিলেন,—তাই তো! তবে কি এ নোট জাল নয়?" যাহাই হউক, একটী টাকা তাহা হইতে বাটার স্বরূপ কাটিয়া রাখিয়া বাবুটীকে ১৯৲ টাকা তিনি প্রদান

করিলেন। বাবুটীও টাকাগুলি গণিয়া লইয়া হৃষ্টচিত্তে চলিয়া গেলেন।

ব্যাপার দেখুন! পরদিবস আবার সেই লোক আর একখানি তেমনি আনকোরা নূতন নোট পোদ্দার মহাশয়ের নিকট ভাঙ্গাইতে আসিলেন। আবার পোদ্দার মহাশয় বিনা বাক্যব্যয়ে নোট-খানি রাখিয়া টাকাগুলি গণিয়া দিলেন। অবশ্য তাহার বাটা-স্বরূপ এবারও একটি টাকা কাটিয়া লওয়া হইল। সেদিনও বাবু টাকাগুলি লইয়া চলিয়া গেলেন। আবার তার পরদিন—সেই বাবুটি আবার একখানি তেমনি নূতন ২০৲ টাকার নোট আনিয়া হাজির করিলেন। সেদিনও পূর্ব্বমত টাকা পাইলেন। তারপর দিনও আবার সেইরূপ! পোদ্দার মহাশয়ের মনে তখন কিছু নূতন সন্দেহের উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন,—"তাই তো! ব্যাপারখানা কি? প্রত্যহ এ লোক যে এক একখানি করিয়া নূতন নোট আনে—পায় কোথা? আমার বেশ বিশ্বাস হচ্ছে, এ নোট কখনই আসল নয়—জাল! জাল, কিন্তু, করেন্সী-আপিসেও তো ঠিক নম্বরে মেলে! যাহাই হউক, এ নোট-সম্বন্ধে কিছু রহস্য আছে।"—এইরূপ অনেক রকম তর্ক-বিতর্ক করিয়া শেষে মনে মনে তিনি একটী মৎলব আঁটিয়া রাখিলেন।

আবার তার পর দিবস! সেই বাবুটী সেই রূপ একখানি ২০৲ টাকার নোট লইয়া উপস্থিত হইলেন। এ দিবস পোদ্দার মহাশয় তাঁহাকে আর টাকা না দিয়া গোপনে আপন বাটিতে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। বাটীতে গিয়া, একটী নিভৃত কক্ষে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়, বলুন দেখি, এ নোটগুলি জাল কি না?" কথা শুনিয়া বাবুটী এরূপ ভাব দেখাইলেন, যেন তিনি বিশেষ ভীত হইয়াছেন। কিন্তু পোদ্দার মহাশয় পাকা লোক—সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন—পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিয়া বসিলেন। বাবুটী তখন আমতা আমতা করিতে লাগিলেন। পোদ্দার মহাশয় বলিলেন—"আর আমতা আমতা করিলে চলিবেনা;—আমি সমস্তই জানিতে পারিয়াছি। এ নোট আসল নয়—প্রকৃতই জাল।—অনেক 'হপ্ত-কলুমে' আছে যে, তাহারা হুবহু করেন্সী-নোট প্রস্তুত করিতে পারে। আপনিও পারেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু আপনাকে একটা বিষয়ে বিশেষ বাহাদুরী দিই। আচ্ছা, আপনি নম্বরে মিল রাখেন কি করে? এতে আমার নিশ্চয় বিশ্বাস হয়, করেন্সীর সহিত আপনার যোগাযোগ আছে। কেমন, ঠিক কি না, বলুন দেখি?" বাবুটী তখন একটু মুচ্‌কি হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"আর বলিব কি, আপনি তো সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছেন,—কিন্তু দেখিবেন মহাশয়!"—এই বলিয়া বাবু পোদ্দার মহাশয়ের পা' দু'খানি জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন,—"দেখিবেন মহাশয়, আমার সর্ব্বনাশ করিবেন না!" পোদ্দার মহাশয় তখন সপথ করিয়া বলিলেন,—"এ কথা পুলিসের কাছে কেন, এমন কি, কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকটও প্রকাশ করিব না।"

বাবুটী যেন আশ্বস্ত হইলেন। তখন পোদ্দার মহাশয়ের মনে বড়ই আনন্দ হইল; ভাবিলেন,—"কি ছার চোরাই মালে লাভ! তার ত' খরচাতেই তো বেরিয়ে যায়, অর্দ্ধেক; আবার সে অর্দ্ধেকের ভিতর কাক-চিল-শকুনী—ভূচর-খেচর-জলচর প্রভৃতিও কত কে আছেন!"—এইরূপ ভাবিয়া, পোদ্দার মহাশয় তখন বাবুটীকে আপনার প্রাণের কথা খুলিয়া বলিলেন,—"ভাই হে! তুমি যে মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ, এ অতি প্রশংসনীয়। তবে এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—সেই যদি ও-কার্য্যে প্রবৃত্তই হইয়াছ, আর এরকম ক্ষমতাই তোমার আছে, তবে কেন তুমি ও খুচরা ১০৲। ২০৲ টাকার নোটে হাত দিলে?

একবারে কেন ১০০০৲ হাজার টাকার নোট কর না!—একখানায় এক দমে হাজার!" বাবু বলিলেন,—"মহাশয় তা তো বুঝি; পারিও সব। কিন্তু একখানা দেখে তো ঠিক অবিকল সেইরূপ নকল কর্‌তে হ'বে! এখন, হাজার টাকার একখানি নোট পাই কোথায়? সেই নোট দেখে-দেখে একখানি 'ব্লকের স্কেচ' করে নিতেও তো অন্ততঃ ৫। ৭ দিন লাগিবে। এখন আসল-খানি পাই কোথা?"

"আসল পাইলেই পার?"—এই বলিয়া পোদ্দার মহাশয় আধা-আধি বখ্‌রা চুক্তি করিয়া একখানি ১০০০৲ হাজার টাকার নোট দিতে স্বীকৃত হইলেন; এবং কার্য্য-সিদ্ধ হইলে, সেই আসল নোটখানি ফিরাইয়া পাইবার কথা রহিল। তা'র পর, বাবুটী যখন চলিয়া যান, পোদ্দার মহাশয়ও কথা কহিতে কহিতে বাবুটীর বাসা-পর্য্যন্ত যাইতে চাহিলেন—উদ্দেশ্য, বাবুর বাড়িটী কোথায় তাই দেখিয়া লয়েন। বাবুও বড় ধড়িবাজ; পোদ্দার মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া বাড়ীতে তো লইয়া যাইলেনই; অধিকন্তু আদর-অভ্যর্থনায় তাঁহাকে আপ্যায়িত করিয়া দিলেন। অধিক কি, শুনা গিয়াছে, সেদিন পোদ্দার মহাশয়কে নাকি কিঞ্চিৎ জলযোগ-পর্য্যন্তও করান হইয়াছিল! যাইহোক, ফিরিয়া আসিবার সময়, পোদ্দার মহাশয় বাবুটীকে বলিলেন,—"ভায়া হে, কাল যেন আবার সাক্ষাৎ হয়!"

বাবুও বলিলেন,—"খুব হবে!"

সংসারে মনুষ্য-মাত্রেই মনে মনে অহঙ্কার করিয়া থাকেন যে,—আমি বড় বুদ্ধিমান। পোদ্দার মহাশয়ও মনে মনে ভাবিতেন,—"চোরে চুরি করে, আমি তা'র উপর বাটপাড়ি করি; আমার চেয়ে বুদ্ধিমান আর কে আছে?" ঠাকুর বলিলেন,—"বটে!—তুমি যেমন চোরের উপর বাটপাড়ি কর, তোমার উপরও আবার তেমনিই ধড়িবাজ আছে; সে আবার বাটপাড়ের ধন লোপাট করে।"

পরদিন প্রাতঃকালে বাবুটীর প্রথম কার্য্য, করেন্সী-আপিসে গিয়া পোদ্দার মহাশয়ের প্রদত্ত সেই হাজার টাকার নোটখানি ভাঙ্গাইয়া আনা। তার পর নোটখানি ভাঙ্গাইয়া আনিয়া তিনি পোদ্দার মহাশয়ের সহিতও একবার শেষ সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। এবং সাক্ষাৎ হইলে, পোদ্দার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন ভায়া, কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে তো?" বাবু বলিলেন,—"সে কথা আর জিজ্ঞাসা করিতে হ'বে কেন?"

তা'র পরেই একদমে গা-ঢাকা! একদিন দুইদিন তিনদিন কাটিয়া গেল—বাবুর আর দেখা নাই। পোদ্দার মহাশয়ের মনে তখন একটু সন্দেহ হইল; তিনি বাবুর বাসায় দৌড়াইলেন। কিন্তু সেখানে গিয়া দেখেন, কোথায় বা কে! সর্ব্বনাশ—সব ফাঁক—ষোল আনাই ফাকি! যাইহোক, ইহার পর পোদ্দার মহাশয় কারেন্সী-আপিসে গিয়া তত্ত্ব লইলেন। কিন্তু সেখানে গিয়া যাহা শুনিলেন, শুনিয়াই তো তাঁহার চক্ষুস্থির!

তা'র পর, সাধারণ পুলিস-এস্তাহারে লোকে পড়িল,—"রসিকলাল পোদ্দারের এক কেতা এত নং—হাজার টাকার গভর্ণমেণ্ট-করেন্সী নোট চুরি গিয়াছে; যে কেহ লোক সেই লোককে ধৃত করিয়া দিতে পারিবেক, তাহাকে নগদ একশত টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবেক।" কিন্তু সে সেই পর্য্যন্তই! প্রকৃত ঘটনাটা কি, আর কেহ বড় জানিতে পারিল না। তবে পোদ্দার মহাশয় যাঁহার নিকট গোপনে গল্প করিয়াছিলেন, তাঁহারই নিকট হইতে এই বিষয়টী শুনিয়া আমরা পত্রস্থ করিতেছি।

———

কর্ম্ম।

বিচিত্রতাময়ী বিশাল পৃথিবীর মধ্যে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত কর,—দেখিবে, জড়-অজড় সকলেই কর্ম্মে ব্যস্ত—সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত, সকলেই দিবারাত্রি একপ্রাণে একমনে কর্ম্ম করিতেছে। বিন্দুমাত্র কাহারও বিরতি নাই, বিরক্তি নাই!—সকলেই যেন এক সূত্রে আবদ্ধ, এক ঈঙ্গিতে ক্রীয়াশীল! আরও একটু স্থিরভাবে লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারিবে, যেন সকলেই স্বীয় স্বীয় কর্ম্মপরায়ণতা দেখাইয়া তোমাকে বলিতেছে,—"পৃথিবীতে আসিয়াছে—কর্ম্মভূমিতে প্রবেশ করিয়াছ, দাঁড়াইয়া কেন? কর্ম্ম কর—কর্ম্ম করিয়া চলিয়া যাও। ফল কি হইবে, তাহা তোমার দেখিবার, ভাবিবার বা শুনিবার আবশ্যক করে না।" ঐ দেখ, ভগবান মরিচীমালী সহস্র সহস্র কিরণমালায় চতুর্দ্দিক দগ্ধ করিতে করিতে পশ্চিমাভিমুখে চলিয়াছেন—আলোক দিতে হয় দিতেছেন—তাহাতে জগৎ জ্বলিয়া যায় যাউক, জগতের জীব শস্যাভাবে মৃত্যুগ্রাসে পড়ে পড়ুক, উঁহার সে দিকে লক্ষ্য নাই; আপন কার্য্যেই উনি ব্যস্ত—কিরণ দিতে হয়, দিয়া যাইতেছেন, আলোক দিবার ভার তাঁহার উপর—তিনি তাহাই বিতরণ করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছেন—তুমি ঘোর তমসাবৃত গিরিগুহার মধ্যে সে আলোক পাইলে কি না, তাহা তিনি দেখিতেছেন না!—কার্য্য করিতে হয় করিয়া যাইতেছেন! তাঁহার এ কর্ম্মৈকাগ্রতা দেখিলে কি বোধ হয় না যে, তিনি যেন তোমায় ডাকিয়া বলিতেছেন,—"জীব! কাজ করিতে আসিয়াছ অদ্বৈধ মনে তাহাই করিয়া যাও—ফলের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার আবশ্যক নাই।" আবার উত্তাল তরঙ্গাকুল মহাসাগরের প্রতি চাহিয়া দেখ,—সেই একভাবে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তরঙ্গমালা বিস্তার করিতেছে। কত শত দেশ সে আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে—স্বীয় বক্ষের উপরেও প্রতিদিন কত অত্যহিত ঘটিতেছে; আবার বাণিজ্যের বিস্তারে কত কত দেশের কত মহদুপকারও হইতেছে! কিন্তু বল দেখি, কে তাহার প্রতি দৃক্‌পাত করে? সাগর সাগরই আছে; সে কেবল নিজের কাজ করিয়া যাইতেছে, আর তোমায় দেখাইতেছে,—"দেখ, আমার ফলের প্রতি লক্ষ্য নাই। করিতে হয়, তাহাই করিয়া চলিয়াছি। তুমিই বা দাঁড়াইয়া কেন?—ভাবিতেছ কেন? কাজ করিতে হইবে—করিয়া যাও।" শীতল মলয় মারুত বহিয়া গেল, তুমি আরামে বসিয়াছিলে, আর কল্পনায় স্বর্গসুখের আস্বাদন করিতেছিলে—সে বাতাসে তোমার শরীর জুড়াইয়া গেল! আর ঐ বিরহিনী!—সে যে নায়কাভাবে বসিয়া কাঁদিতেছিল; বিধাতা, চন্দ্রমা, ফুলকুল আর কোকিলের উপর প্রাণের সহিত অভিসম্পাত করিতেছিল; সে যে বাতাসে আরও জ্বলিয়া উঠিল—আরও গালি দিতে লাগিল! কিন্তু সমীরণ কি তাই লক্ষ্য করিয়া রহিয়াছিল? তাহার কাজ—প্রবাহিত হওয়া; সে কাজ করিয়া গেল, আর তোমাকে দেখাইয়া গেল,—"দেখ, আমার মত কাজ করিয়া যাও, ফলের প্রতি লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন কি?"

তাই বলি জীব! তুমিও কাজ কর, কিন্তু ফলের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার আবশ্যক নাই। তুমি কর্ম্মভূমিতে আসিয়াছ—কর্ম্ম করিতে; কর্ম্মই করিয়া যাও—ফল কি হইবে, তাহা ভাবিবে কেন? তুমি বাণিজ্য করিতে আইস নাই যে, ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতি বুঝিয়া ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিবে! আর, এখানে নিষ্কর্ম্মা হইয়াও থাকিতে পারিবে না; তুমি যে ভাবিতেছ,—"এইত এখানে এত বিলাসের সামগ্রী—এত ভোগের বস্তু রহিয়াছে, আসিয়াছি যখন, তখন দুই দিন এ সকল ভোগ করিয়া যাই!" কিন্তু তাহা হইবে না—সুধু ভোগ পৃথিবীতে নাই।

যে অপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় শক্তিতে সমস্ত চেতনাচেতনময়ী পৃথিবী কর্ম্মপ্রাণ হইয়া কর্ম্ম-স্রোতে ভাসিতেছে, সেই শক্তিতেই তোমাকে কর্ম্ম করাইবে—তুমি করিব না বলিলে কে শুনিবে ? তবে তোমায় অনুরোধ,—তুমি ফলের দিকে চাহিও না—জড়জগতের ন্যায় "কাজ করিতে হয়—করিব" এই ভাবিয়াই কাজ করিয়া যাও। তুমি ভাবিতেছ,—"আমি দীন, আমার দ্বারা কি কার্য্য হইবে!" কিন্তু সে ভাবনা করিতে হইবে না—কর্ম্মস্রোতে পড়িলে দেখিবে, দীনেরও দীন আছে—আর তোমার দ্বারাই তাহাদের চক্ষুজল নিবারিত হইবে! তুমি ভাবিতেছ,—তোমার ক্ষমতা কোথা যে, তুমি কোন কার্য্য করিবে ? কিন্তু সে ভাবনা ভাবিবার আবশ্যক কি ? কার্য্যস্রোতে পড়িলে ক্ষমতা আপনিই জুটিয়া যাইবে; তখন দেখিবে, যাহার যেমন ক্ষমতা, তাহার জন্য তেমনি কর্ম্মও নির্দ্দিষ্ট আছে। তাই বলি, তুমি তোমার দীনতা, অক্ষমতা, অসহায়তা প্রভৃতির জন্য ভাবিও না; শুধু কাজ করিয়া যাও, কেবল ফলের প্রতি লক্ষ্য করিও না, এইমাত্র অনুরোধ।

শাস্ত্রে উপদেশ দেয়,—

"কর্ম্মকারী যেইজন ফলাকাঙ্ক্ষী হয়,
বণিকের মত সেই বাণিজ্য করয়।"

অর্থাৎ কর্ম্ম নিষ্কাম হইয়াই করা উচিত। কিন্তু কামনার হাত এড়াইতে পারে কে ? যাঁহারা কর্ম্ম করিয়া তৎফল গ্রহণ করিবেন না বলিয়া "ব্রহ্মার্পণমস্তু"* বলিয়া ঈশ্বরে ফলার্পণ করেন; বাস্তবিক কি তাঁহাদের তাহাতেই কামনা নষ্ট হয় ?—না। হয় তো হইতে পারে, তাঁহারা কর্ম্মফলের আশা করেন না; কিন্তু কর্ম্মের ফলের যে ফল অর্থাৎ পুণ্যলাভ, দেব-প্রীতি † পিতৃলোকের সন্তোষ ইত্যাদির কামনা কি ত্যাগ করিতে পারেন ? বোধ হয় না! তাই বলি, জীব! নিষ্কাম কর্ম্ম করিবার কল্পনা ত্যাগ কর। কেবল ফলের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া—ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া, আত্ম-ক্ষমতাকে অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করিয়া, কর্ম্ম করিয়া যাও—ফল যাহা হয় তাহা হউক, তোমার দেখিবার আবশ্যক নাই। জগতে আসিয়াছ, কর্ম্ম কর—কর্ম্মস্রোতে গা ঢালিয়া দাও—যেদিকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, সেই দিকে চলিয়া যাও। তাহা হইলেই তোমার পৃথিবীতে আগমনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। কিন্তু কেবল একটা কথা মনে রাখিও—"আমি এই কাজটা করিব," "আমি ইহা করিলে এই হইবে" "আমি এই করিয়াছিলাম তাই এই হইয়াছে" এরূপ ভাবনা ত্যাগ কর। তোমার সাধ্য কি যে তুমি কোন কর্ম্ম হইতে বিরত থাক বা কর্ম্মস্রোতে পড়িয়া যাহা করিতে হইবে, তদ্ব্যতীত আর এক বিন্দু অন্য কাজ কর ? জীবের যদি কর্ম্ম-স্রোতাধীনতা কাটাইবার উপায় থাকিত, তাহা হইলে জীব শিব হইয়া যাইত। কিন্তু তাহা নাই। তাই বলি, শক্তি সেই কর্ম্মস্রোতের নিয়ামক; সুতরাং তাহাতে নির্ভর করিয়া জড়-জগতের ন্যায় আত্মবিস্মৃত হইয়া কার্য্য করিয়া যাও—ফলাপেক্ষা করিও না; বিফলতায় ম্রিয়মান ও সফলতায় হর্ষিত হইও না।

কবিবর শিহ্লন কর্ম্মের এই মহিমাটুকু বুঝিয়াই শান্তিশতকের আদিতে বলিয়াছেন,—

"নমস্যামো দেবান্ননু হতবিধেস্তেঽপিবশগাঃ,
বিধির্ব্বন্দ্যঃ সোঽপি প্রতিনিয়ত কর্ম্মৈক ফলদঃ।
ফলং কর্ম্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চবিধিনা,
নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি॥"

* শ্রাদ্ধ, বিবাহ, দান, প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি কর্ম্ম করিয়া কর্ত্তাকে একটী মন্ত্র আবৃত্তি করিতে হয়—

"নমো এতৎ কর্ম্মফলং নমো ব্রহ্মার্পণমস্তু,"

শাস্ত্র বলেন, এই বচনের দ্বারা জীবকে কর্ম্মফল ভোগের জন্য আর জন্ম লইতে হয় না।

† ঐ সকল কর্ম্মাদির জন্য ও পূজাকালে "নমো, শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকামঃ অমুককর্ম্মং বা অমুক দেবতা পূজাং করিষ্যে।'—এইরূপ সংকল্প করিতে হয়।

অর্থাৎ আমি দেবতাদিগকে প্রণাম করি। কিন্তু দেবতারাও পোড়া বিধাতার বশীভূত, সুতরাং তাঁহাদের প্রণাম করিয়া কি হইবে ? তবে বিধাতাই বন্দনীয়! কিন্তু তিনিও নিজে কোন ক্ষমতাই রাখেন না—জীবে যে সকল কার্য্য করে, তিনি কেবল তাহারই ফল প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব সেই কর্ম্মফলকেই নমস্কার করি! কিন্তু তাহাতেই বা কি হইল ? ফলও কর্ম্মায়ত্ত। সুতরাং কি দেবতা, কি বিধাতা, কি কর্ম্মফল কাহাকেও প্রণাম করিবার আবশ্যক নাই। সকলের মূলীভূত কর্ম্মকেই নমস্কার করি। কারণ, এই কর্ম্মের প্রভাব স্বয়ং বিধাতাও এড়াইতে পারেন না।" তাই বলি, জীব, ফল দেখিবার আবশ্যক নাই। ফল যাহার আয়ত্ত সেই কর্ম্ম করিয়া যাও—কর্ম্মকেই প্রণাম কর। কর্ম্মে ও ঈশ্বরের প্রভেদ কি, তাহা শিহ্লনের কথায় বুঝিয়াছ। কর্ম্মও যা' ঈশ্বরও তা'। কর্ম্মই জগতের নিয়ামক—কর্ম্মের মূলেই ঈশ্বর। তাই বলি, জীব, ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া কর্ম্ম করিয়া যাও—ফল দেখিবার আবশ্যক নাই।

অমরনাথ।

(১)

আমরা বহির্জগৎটি যেরূপ সহজে প্রত্যক্ষ করিতে পারি, অন্তর্জগৎটি সেরূপ পারি না। যদি পারিতাম, তবে বুঝি, বহির্জগতের অনন্ত অপরূপ সৃষ্টির ন্যায় অন্তর্জগতেরও অনন্ত অপরূপ সৃষ্টি দেখিয়া সবিস্ময়ে বিমোহিত হইতাম। বহির্জগতে যেরূপ অনন্ত জড় পদার্থের অপূর্ব্ব দর্শন—নীলিমাব্যাপ্ত নভোমণ্ডল, দিগন্তব্যাপী কান্তার-প্রদেশ, প্রখর দিবাকর, চিত্তহারী চন্দ্রমা, পবিত্র প্রসূনরাজী, পূতসলিলা প্রবাহিনী—অন্তর্জগতেও বুঝি এইরূপ বিবিধ রম্যোদ্ভাবিনী অপরূপ সৃষ্টি বিরাজিত রহিয়াছে। শুনিয়াছি, জড়বৎ-পতিত চিত্তপটে অসংখ্য ভাবরাজী এইরূপই চিত্র আঁকিয়া থাকে। আবার বহির্জগতে যেরূপ অসংখ্য মানব অনন্ত কার্য্যে রাত্রিদিন নিয়োজিত থাকিয়া অবিরাম চলিতেছে, ফিরিতেছে, ঘুরিতেছে, ভাবিতেছে; অন্তর্জগতেও সেইরূপ অসংখ্য ভাবরাজী অসংখ্য অপরূপ মিশ্রণোৎপন্ন অসংখ্য অপরূপ আকার ধারণ করিয়া মানুষকে ঐরূপ চলাইতেছে, ফিরাইতেছে, ঘুরাইতেছে, ভাবাইতেছে। মানুষের একটি প্রাণ সত্য; কিন্তু মানুষের কার্য্যাবলীর অসংখ্য প্রাণ। যদি বলিতে পারা যাইত, তবে বলিতাম, সমষ্টি প্রাণ বা চৈতন্য যেরূপ সমগ্র মানবের কর্ত্তা—ব্যষ্টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবগুলিও সেইরূপ মানুষের কার্য্যাবলীর কর্ত্তা। একে স্থূল ভাবগুলিই অনন্ত, তারপর আবার তাহাদের মিশ্রণ বড়ই সহজ ও স্বাভাবিক। এই অসংখ্য স্থূল ভাবরাজির অসংখ্য অপরূপ Permulation and Combination যে কিরূপ অদ্ভুত, তাহা বলিয়া উঠা যায় না। তাই বলিতেছিলাম, এই বহির্জগৎটি আমরা যেরূপ দেখিতে পাই, অন্তর্জগৎটিও যদি সেইরূপ দেখিতে পাইতাম, ভগবানের এই যুগল সদৃশ (Duplicate) চিত্র দেখিয়া না জানি প্রেমানন্দে কতই প্রহ্লাদিত হইতাম।

আর বহির্জগতই কি আমরা সকলে ভাল করিয়া দেখিতে পাই ? ঐযে সম্মুখে পত্রপুঞ্জ পড়িয়া রহিয়াছে, উহা কি আমরা সকলে ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছি ?—ঐ কবি, ঐ উদ্ভিদ্‌বিৎ, ঐ বৈজ্ঞানিকের ন্যায় ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছি ? তাই যাঁহারা দেখিতে পান, তাঁহারা আমাদিগকে দেখাইবার চেষ্টা করেন। তাই কবির প্রকৃতি-বর্ণনা—তাই বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান-রচনা! এই ত বলিলাম আমাদের দৃষ্ট পদার্থের অসম্পূর্ণ দর্শনের কথা। অদৃষ্ট পদার্থেরই কি অভাব আছে ? ঐ যে অনন্ত আকাশে অসংখ্য জীবাণু সূর্য্যালোকে নাচিয়া বেড়া-

ইতেছে, তাহা কি তোমরা-আমরা দেখিতে পাই? ঐ যে ধবল দিবালোকে মনোহর বর্ণরাজী অপরূপভাবে মিশ্রিত রহিয়াছে, তাহা কি তোমরা-আমরা দেখিয়া থাকি? কখনই না!—বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্য ভিন্ন নয়! বিজ্ঞানে বলে, আবার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রে দেখায়, তাই জানিতে ও দেখিতে সমর্থ হই। তাই বলিতেছিলাম, বহির্জগতই কি আমরা সকলে ভাল করিয়া দেখিতে পাই?—অন্তর্জগৎ তো দূরের কথা! এ জগৎ দার্শনিক কবির দৃষ্ট; তোমার-আমার নহে। যদি তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া দেখান, তাই মাত্র তুমি আমি দেখিতে পাই। বহির্জগৎ-সম্বন্ধে যেরূপ দূরবীক্ষণ, অনুবীক্ষণ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র—অন্তর্জগৎ-সম্বন্ধেও সেইরূপ বহুদর্শী দার্শনিকের ও উপন্যাসকারের চরিত্র-লিখন। কোন এক প্রসিদ্ধ সমালোচক এক স্থলে লিখিয়াছেন—'কবি ভগবানের অনুকরণেও তাঁহার জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন।' আমাদিগের তাহাই বিশ্বাস। উপন্যাসকার সাধারণের অদৃষ্ট ভগবানের সৃষ্টি, অনুকরণ করিয়া, আমাদিগের দৃষ্টিপথে আনয়ন করেন।

বলা বাহুল্য, বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস ঐরূপ অন্তর্চক্ষুবিহীন অন্ধ আমাদিগের জন্য দূরবীক্ষণ ও অনুবীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্রাদিরই ন্যায় সৃজিত হইয়াছে। আজি সেই যন্ত্র-সাহায্যে আমরা মানবের অন্তরের একটি অদ্ভুত প্রদর্শন দেখিতে চেষ্টা করিব। সেই প্রদর্শন "অমরনাথ" বা শিক্ষিত প্রেম-প্রবণ হৃদয়ের অপরূপ প্রেমোন্মাদ ও প্রেমবৈরাগ্য।

প্রেম কি, একথা বুঝি কেহই ভাল করিয়া বুঝেন না। ইহার অনন্তরূপ, অদ্ভুত প্রকৃতি, কই কাহাকেও তো ভাল করিয়া বুঝাইতে দেখিলাম না! এ এমনই বহুরূপী যে সকলের চক্ষে—সকল বয়সের চক্ষে, ইহা সমভাবে দৃষ্ট হয় না। কেবল যে তুমি আমি ইহাকে সমভাবে দেখি না, এরূপ নহে—তুমিই ভিন্ন ভিন্ন বয়সে ইহাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখিবে। এমন যে বহুরূপী অদ্ভুত পদার্থ, তাহার সর্ব্বরূপ পরিজ্ঞাত হওয়া তোমার-আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। বঙ্কিম বাবু ইহার অনেক রূপ আমাদিগকে দেখাইয়াছেন—বর্ত্তমানের আলোচ্য "অমরনাথ"ও তাহার এক রূপ প্রদর্শন করিতেছে।

অমরনাথের প্রথম পরিচয়েই আমরা দেখিলাম,—অমরনাথ একটি সুশিক্ষিত ও চিন্তাহীন যুবক। তাঁহার নিজের কথা তিনি নিজেই বলিতেছেন। সে কথায় তাঁহার শিক্ষা, তাঁহার চিন্তাহীনতার সহিত,—তাঁহার আর দুইটি আন্তরিক ভাবও প্রকাশিত রহিয়াছে। একটি তাঁহার অভিলষিত প্রণয়পাত্রীর প্রণয়ে নৈরাশ্য—আর একটি তজ্জন্য তাঁহার সংসার-বিরক্তি। প্রথমটির কথা তিনি প্রকাশ্যভাবেই বলিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয়টির কথাও স্পষ্ট বটে—কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা একটু ঘোরান। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম;—

"কোথাও স্থায়ী হই নাই, কিন্তু মনে করিলেই স্থায়ী হইতে পারিতাম। মনে করিলে কুলীন ব্রাহ্মণের অপেক্ষা অধিক বিবাহ করিতে পারিতাম। আমার সব ছিল—ধন, সম্পদ, বয়স, বিদ্যা, বাহুবল—কিছুরই অভাব ছিল না; অদৃষ্ট-দোষে একদিনের দুর্ব্বুদ্ধি-দোষে, সকল ত্যাগ করিয়া, আমি এই সুখময় গৃহ—এই উদ্যানতুল্য পুষ্পময় সংসার ত্যাগ করিয়া, বাত্যা-তাড়িত পতঙ্গের মত দেশে দেশে বেড়াইলাম। আমি মনে করিলে আমার সেই জন্মভূমিতে রম্য গৃহ রম্য সজ্জায় সাজাইয়া, রঙ্গের পবনে সুখের নিশান উড়াইয়া দিয়া, হাসির বাণে দুঃখ রাক্ষসকে বধ করিতে পারিতাম। কিন্তু——

"এখন তাই ভাবি, কেন করিলাম না। সুখ-দুঃখের বিধান পরের হাতে, কিন্তু মন ত আমার! তরঙ্গে নৌকা ডুবিল বলিয়া, কেন ডুবিয়া রহিলাম—সাঁতার দিয়া ত কূল পাওয়া যায়! আর দুঃখ—দুঃখ কি? মনের অবস্থা, সেত নিজের আয়ত্ত। সুখ-দুঃখ পরের হাত, না আমার নিজের হাত? পর, কেবল বহির্জগতের কর্ত্তা—অন্তর্জগতে আমি একা কর্ত্তা। আমার রাজ্য লইয়া আমি সুখী হইতে পারিব না কেন? জড়-জগৎ জগৎ, অন্তর্জগৎ কি জগৎ নয়? আপনার মন লইয়া কি থাকা যায় না? তোমার বাহ্য-জগতে কয়টী সামগ্রী আছে, আমার অন্তরে কিবা নাই? আমার অন্তরে যাহা আছে, তাহা তোমার বাহ্য-জগৎ দেখাইবে, সাধ্য কি? যে কুসুম এ মৃত্তিকায় ফুটে, যে বায়ু এ আকাশে বয়, যে চাঁদ এ গগণে উঠে, যে সাগর এ অন্ধকারে আপনি মাতে, তোমার বাহ্য জগতে তেমন কোথায়?

"তবে কেন, সেই নিশীথ-কালে, সুষুপ্তা সুন্দরীর সৌন্দর্য্য প্রভা—দূর হৌক!—এক দিন নিশীথ কালে এই অসীম পৃথিবী সহসা আমার চক্ষে শুষ্ক বদরীর মত ক্ষুদ্র হইয়া গেল—আমি লুকাইবার স্থান পাইলাম না! দেশে দেশে ফিরিলাম।"

উপরোক্ত কথা কয়েকটি শুনিয়াই যেন আমরা অমরনাথকে চিত্তে গড়িয়া এরূপ খাড়া করিলাম। অমরনাথের প্রথম প্রতিবিম্ব বাহিরে এইরূপে প্রতিফলিত করা যায়:—

শিক্ষিত প্রেমিক অমরনাথ লবঙ্গলতার প্রণয়ে নিরাশ হইয়া এক একবার সংসারের প্রতি বীতরাগ হইয়া উঠিতেছেন। দারুণ শিক্ষার অভিমানে সংসারের সর্ব্ব-স্বীকার্য্য অনুভবনীয় জীবন্ত ঘটনা অবহেলা করিয়া নিজ চিত্তমধ্যেই তাঁহার মনোমত সংসার গড়িতে চাহিতেছেন। বাহিরের অনায়ত্ত সাধারণের সুখদুঃখের বিষয়কে অবহেলা করিয়া, অন্তরেই স্বায়ত্তাধীন সুখদুঃখের বিষয় গড়িতে চাহিতেছেন। ইহাতে তাঁহার শিক্ষার তেজ—বৈজ্ঞানিকের ন্যায়ই আমাদিগের সম্মুখে যেন জ্বলিয়া

উঠিতেছে। তিনি বলিতেছেন,—"আর দুঃখ কি?.....তেমন কোথায়?" আবার সংসারের অগণ্য সুখদুঃখের বিষয়ের নিকট মস্তক অবনত করিয়া তিনি যেন ঈষৎ অনুতপ্ত হৃদয়ে ভাবিতেছেন,—"মনে করিলে.....পারিতাম।" এই দুইয়ে বিরোধ চলিতেছে। একদিকে বাহিরের সুখদুঃখে অভিলাষ, আর অন্যদিকে মানসিক শিক্ষাবলে বাহিরের সুখদুঃখ। এমন সময়ে উভয় দিকই রক্ষা করিয়া লবঙ্গলতা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। অমরনাথ বলিলেন,—"তবে কেন" ইত্যাদি। তিনের সমবায় কারণে ফল উৎপত্তি হইল,—অমরনাথের সংসার-বৈরাগ্য। সংসারের সুখদুঃখে আসক্তি ত সংসারের অনুকূলেই—সংসারের সুখদুঃখে অনাশক্তিও সংসারের প্রতিকূলে নহে। তবে এ সংসার-বৈরাগ্য আসিল কোথা হইতে? অবশ্যই বলিতে হইবে,—লবঙ্গলতাই ইহার কারণ। লবঙ্গলতা আসিয়া সংসারের অন্য সুখদুঃখেও লিপ্ত হইতে দিল না—মনকে একবারে অনাসক্ত হইতেও দিল না—নিজে চিত্তখানি অধিকার করিয়া বসিল। আর কোথায় সংসার? অমরনাথ দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

পাঠক, এখন একবার অমরনাথের ঐ তিন স্তম্ভের তিন কথায় তাঁহার অন্তরটি পর্য্যবেক্ষণ কর। অমরনাথ-সম্বন্ধে উপন্যাসকারের ইহাই প্রথম পরিচয়।

লবঙ্গলতার প্রণয়ে নিরাশ হইয়া অমরনাথ সংসারবিরাগী হইয়াছেন, ইহা আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখিলাম। এখন সে বিরাগের প্রকৃতি কিরূপ, দেখা যাউক।

সংসারের প্রতি বিরক্তি সময়ে সময়ে অনেকেরই হয়। কিন্তু সে বিরক্তি ক্ষণস্থায়ী। সে বিরক্তি ক্ষণপরেই আবার প্রবল আসক্তিতে পরিবর্ত্তিত বা পরিণত হইয়া থাকে। অমরনাথের সংসার-বিরাগ সে প্রকৃতির নহে। আর এক প্রকার সংসার-বিরক্তি সাধুলোকের জীব-

নীতে পরিদৃষ্ট হয়। সে বিরক্তি চৈতন্যের সংসার-বিরক্তি, বুদ্ধের সংসার-বিরক্তি। তাহাতে সংসার ছাড়া অন্য বস্তুতে ভয়ানক প্রসক্তি থাকে। প্রবল ধর্ম্মানুরাগ—ভগবানে ভক্তিই এপ্রকার সংসার-বিরক্তির কারণ। অমরনাথের বৈরাগ্য এ প্রকৃতিরও নহে। তাঁহার বৈরাগ্য, লক্ষবিহীন। অমরনাথ নিজেই বলিয়াছেন,—

"বুঝিয়াছি। আমার কাম্যবস্তুর প্রভাবই আমার দুঃখ। আমি বুঝিয়াছি যে, সকলই আমার। তাই আমার কেবল দুঃখ সার।"

সংসারে একমাত্র লবঙ্গলতাই অমরনাথের কাম্যবস্তু। কিন্তু এ কাম্যবস্তু প্রাপ্তির জন্য যখন তাঁহার যত্ন-চেষ্টা সব ফুরাইল, অমরনাথের আর কার্য্য রহিল না। কার্য্য ফুরাইল বলিয়া সংসারও বিরক্তিজনক হইয়া উঠিল।

কিন্তু এভাবে মানুষ থাকিতে পারে না। এ জীবন মানুষে বহিতে পারে না। তাই অমরনাথ কার্য্যাভাবে শীঘ্রই আবার উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি বুঝিলেন যে, কার্য্য চাই—জীবনের লক্ষ্য চাই।

কার্য্য—অমরনাথ কি কার্য্য করিবেন? সংসার-ধর্ম্ম? ছি—তাহা তো লবঙ্গলতা-বিহনে হইতেই পারে না! তবে কার্য্য কি—নিস্বার্থ পরোপকার! শিক্ষিতের, শিক্ষাভিমানীর উপযুক্ত কার্য্য।

এইরূপ অবস্থায় এইরূপ শিক্ষিত প্রকৃতির এইরূপ মনোভাবই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। যাঁহারা শিক্ষিত, প্রেমাভিমানীর হৃদয়োপরি নিরাশ-প্রণয়ের বল ও ফল দেখিয়াছেন, তাঁহারা অমরনাথের চিত্তের স্বাভাবিকতা দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। কথাটি আরও একটু পরিস্কার করিতে চেষ্টা করিতেছি।

পৃথিবীতে অভিমান বড় একটা ভয়ানক জিনিস। ইহা ভাল বিষয়-সম্বন্ধেও হয়, মন্দ বিষয়-সম্বন্ধেও হয়। রূপের অভিমানও আছে —আবার ধর্ম্মের অভিমানও আছে। অমরনাথেরও বড় অভিমান ছিল। "আমি শিক্ষিত —আমার প্রণয় মার্জ্জিত—ইহা কি সামান্য কারণে লুপ্ত হইবে? এ প্রণয়ের নিকট আমার জীবনও তুচ্ছ"—এইরূপ একটি অভিমান অমরনাথের হৃদয়েও ছিল। আমরা যে অশিক্ষিত, তবু আমাদিগের মনেও এরূপ অভিমান হইয়া থাকে। এই অভিমানে পৃথিবীতে সময়ে সময়ে বড়ই উচ্চদরের কার্য্য করিয়া থাকে। যিনি নিরাশ-প্রণয়ীর চরিত্র ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন; যিনি শিক্ষিত, প্রেমাভিমানী নিরাশ-প্রণয়ীর প্রণয়-পান-সম্বন্ধীয় কার্য্য পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন; তিনিই বলিবেন যে, এ শ্রেণীর কার্য্য সময়ে সময়ে অতি উচ্চশ্রেণীর ধার্ম্মিকের কার্য্যকেও পরাজিত করিতে সমর্থ হয়। প্রণয়ীর মত আত্মত্যাগ কয়জনে করিতে পারে? যাহা হউক, একথা অন্য একস্থলে একদিন বলা হইয়াছে—অতিরিক্ত বলিতে ইচ্ছা নাই।

অমরনাথ এহেন দুর্জ্জয় প্রেমাভিমানে সংসারের স্বর্গসুখ পরিত্যাগ করিলেন। পরিত্যাগ করিয়া পরোপকার-ব্রতে আপনাকে দীক্ষিত করিলেন। ইহা সকলই সেই নিরাশ-প্রণয়ের ফল। শিক্ষিত হৃদয়ের প্রেম-নৈরাশ্য প্রথমে এইরূপে লোককে চালিত করে।

এই পরোপকার করিতে গিয়া আর একটি গোল উপস্থিত হইল। "রজনী" নাম্নী একটি যুবতী স্ত্রীলোক অমরনাথের চক্ষে পড়িল। অমরনাথ প্রথমেই আমাদিগকে বলিয়া লইলেন,—

"বস্তুতঃ এই অন্ধ স্ত্রীলোকের বুদ্ধি, বিবেচনা, এবং সরলতায় আমি বিশেষ প্রীত হইয়াছিলাম। তাহাকে কোনপ্রকার ক্লেশ দিবার আমার ইচ্ছা ছিল না।"

আমরা অন্য এক স্থানে বলিয়া গিয়াছি যে, এরূপ যুবতী স্ত্রীলোকের প্রতি প্রীতি, স্নেহ বা সহানুভূতি বড় সহজ জিনিস নহে। বলা ত সহজ। কিন্তু বলা কি সঙ্গত? বলা কি যৌক্তিক? স্থায়ীত্বের সহিত সব জিনিষের কি অকৃত্রিমত্ব সংযুক্ত থাকে? আজ একজন দরিদ্র দেখিয়া তৎপ্রতি আমার দয়া হইল—সে দয়া তার পর দিন রহিল না বলিয়া কি তাহাকে প্রকৃত দয়া বলিব না? প্রণয়েই বরং রূপোন্মাদ আছে—দয়ায়, ধর্ম্মভাবে তো রূপোন্মাদ নাই? আজ একটী গান শুনিয়া আমার ধর্ম্মভাব উদ্রিক্ত হইল, কিছু কাল তাহা রহিল না—এইজন্য কি সেই দিনকার ধর্ম্মভাব অপ্রকৃত বলিব? যে বলে বলুক—আমরা তাহা বলিব না। ভালবাসার স্থায়িত্বের সঙ্গে তাহার অকৃত্রিমত্বের কোন সম্বন্ধ নাই।

বিশ্লেষণ করিলে, শেষে উহাতে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

যেরূপ ঘটা সম্ভব, সেইরূপই ঘটিল। অমরনাথ ধীরে ধীরে রজনীর প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িলেন। আমরা একদিন অমরনাথের নিজ-মুখেই শুনিলাম,—

"——রমণীকুলে, অন্ধ রজনী অদ্বিতীয় রত্ন! লবঙ্গলতার প্রোজ্জ্বল জ্যোতিও তাহার কাছে ম্লান হইল। আমি ইতিপূর্ব্বে রজনীর অন্ধ নয়নে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম—আজি তাহার কাছে বিনামূল্যে বিক্রীত হইলাম। এই অমূল্য রত্নে আমার অন্ধকার পুরী প্রভাসিত করিয়া, এ জীবন সুখে কাটাইব।"

হরি বোল হরি—এই কি সেই অমরনাথ? যে অমরনাথ লবঙ্গলতাকে একদিন পৃথিবীর একমাত্র কাম্যবস্তু জ্ঞান করিয়াছিলেন, এই কি সেই অমরনাথ? যে অমরনাথ একদিন লবঙ্গলতাকে না পাইয়া সংসারের স্বর্গসুখে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন, এই কি সেই অমরনাথ? যে অমরনাথ চিন্তা করিতে করিতেও লবঙ্গলতাকে সম্মুখে দেখিতে পাইতেন, এই কি সেই অমরনাথ? ভালবাসা—প্রণয়—তোমার নিটক মস্তক অবনত করিয়া তোমার এ অপূর্ব্ব রহস্যের মর্ম্ম কে উদ্ঘাটন করিবে?

কে বলিয়াছে যে, ভালবাসা প্রকৃত হইলে তাহা স্থায়ীত্ব হইবে? কে বলিয়াছে যে, এক জনকে ভালবাসিলে অপরকে ভালবাসিতে পারে না? আমি তাহাকে আহ্বান করি—সে আসিয়া বলুক যে, ঐ অমরনাথের লবঙ্গলতা-প্রেম রূপোন্মাদ, কিন্তু প্রকৃত ভালবাসা নহে! সে আসিয়া বলুক যে, এই রজনীর প্রতি অমরনাথের এই প্রণয় রূপোন্মাদ, কিন্তু প্রকৃত ভালবাসা নহে।

বলিতে কি পারিবে না? পারিবে। বলা অতি সহজ। প্রকৃত ভালবাসা স্থায়ী—অতএব যাহা স্থায়ী নয়, তাহা প্রকৃত ভালবাসাও নহে। বলা ত সহজ। কিন্তু বলা কি সঙ্গত? বলা কি যৌক্তিক? স্থায়ীত্বের সহিত সব জিনিষের কি অকৃত্রিমত্ব সংযুক্ত থাকে? আজ একজন দরিদ্র দেখিয়া তৎপ্রতি আমার দয়া হইল—সে দয়া তার পর দিন রহিল না বলিয়া কি তাহাকে প্রকৃত দয়া বলিব না? প্রণয়েই বরং রূপোন্মাদ আছে—দয়ায়, ধর্ম্মভাবে তো রূপোন্মাদ নাই? আজ একটী গান শুনিয়া আমার ধর্ম্মভাব উদ্রিক্ত হইল, কিছু কাল তাহা রহিল না—এইজন্য কি সেই দিনকার ধর্ম্মভাব অপ্রকৃত বলিব? যে বলে বলুক—আমরা তাহা বলিব না। ভালবাসার স্থায়িত্বের সঙ্গে তাহার অকৃত্রিমত্বের কোন সম্বন্ধ নাই।

অমরনাথের এ ভালবাসায় নিন্দার কোন পদার্থ নাই। এতদিন যে রজনী মিলে নাই! সেই তাহার শিক্ষার বলে—প্রেমাভিমানে। নচেৎ প্রকৃতির সহজ রীতি অন্যরূপ। তাহা অশিক্ষিত চরিত্র পর্য্যালোচনা করিলেই দেখা যায়। অশিক্ষিতের অল্পকালস্থায়ী ভালবাসাও ভালবাসা—ঐরূপই অকৃত্রিম ভালবাসা।

স্বভাবের নিয়মে অমরনাথের হৃদয়ে রজনী অনায়াসে প্রবেশলাভ করিল। তখনও লবঙ্গলতা হৃদয় হইতে একেবারে বিদূরিত হয় নাই। অতি সঙ্কুচিত অবস্থায় অন্তরের কোন লুক্কায়িত স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল। ইহার কিছু পূর্ব্বেও অমরনাথকে বলিতে শুনিয়াছি,—

"আমার এক বাঞ্ছনীয় পদার্থ ছিল—আজিও আছে। কিন্তু সে বাসনা পূর্ণ হইবার নহে। পূর্ণ হইবার নহে বলিয়া তাহা হৃদয় হইতে অনেকদিন হইল উন্মূলিত করিয়াছি।"

অন্যত্র——"——আর কিছু দুঃখ নাই—লবঙ্গলতার হস্তনিপি ভুলিয়া যাইতেছি।"

কিন্তু কালক্রমে সে প্রণয় সঙ্কুচিত হইয়া রজনীর প্রতি প্রণয় প্রবল হইতে লাগিল। এই কথাটি কবি অতি সুন্দররূপে একস্থানে দেখাইয়াছেন। একত্র লবঙ্গ ও রজনী দুইজনকেই

আনিয়া এ ভাবটি বড়ই সুন্দর প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা পুস্তক হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া তাহা পাঠকগণকে দেখাইব। অমরনাথ বলিতেছেন,—

"আমি রজনীর সন্ধানে তাহার ঘরে গিয়া তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। ফিরিয়া আসিতেছি, এমন সময়ে দেখিতে পাইলাম, রজনী আর একটী স্ত্রীলোকের সঙ্গে উপরে উঠিতেছে। সে স্ত্রীলোককে দেখিয়াই চিনিলাম—অনেকদিন দেখি নাই, কিন্তু দেখিয়াই চিনিলাম যে, এই গজেন্দ্রগামিনী, ললিত লবঙ্গলতা!

"রজনী ইচ্ছা-পূর্ব্বক জীর্ণবস্ত্র পরিয়াছিল,—লজ্জায় সে লবঙ্গলতার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহিতেছিল না। লবঙ্গলতা, হাসিতে উছলিয়া পড়িতেছিল—রাগ বা বিদ্বেষের কিছুমাত্র লক্ষণ দেখা গেল না।

"সে হাসি অনেকদিন শুনি নাই। সে হাসি তেমনই ছিল—পূর্ণিমার সমুদ্রে ক্ষুদ্র তরঙ্গের তুল্য, সপুষ্প বসন্তলতার আন্দোলন তুল্য—তাহা হইতে সুখ, ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া, ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল।

"আমি অবাক্ হইয়া নিস্পন্দ শরীরে সশঙ্কচিত্তে, এই বিচিত্র-চরিত্রা রমণীর মানসিক শক্তির আলোচনা করিতেছিলাম। ললিত লবঙ্গলতা কিছুতেই টলে না। লবঙ্গলতা মহান্ ঐশ্বর্য্য হইতে দারিদ্র্যে পড়িয়াছে—তবু সেই সুখময় হাসি; যে রজনী হইতে এই ঘোর বিপদ ঘটিয়াছে, তাহারই গৃহে উঠিতেছে, তবু তাহার সঙ্গে আলাপ করিতেছে, তবু সেই সুখময় হাসি! আমি সম্মুখে—তবু সেই সুখময় হাসি! অথচ আমি জানি, লবঙ্গ কোন কথাই ভুলে নাই।

"আমি সরিয়া পার্শ্বের ঘরে গেলাম—লবঙ্গলতা প্রথমে সেই ঘরে প্রবেশ করিল—নিঃশঙ্কচিত্তে, আজ্ঞাদায়িনী রাজরাজেশ্বরীর ন্যায়, রজনীকে বলিল,—"রজনী, তুই এখন আর কোথাও যা! তোর বরের সঙ্গে আমার গোপনে কিছু কথা আছে। ভয় নাই। তোর বর সুন্দর হলেও আমার বৃদ্ধ স্বামীর অপেক্ষা সুন্দর নহে।" রজনী অপ্রতিভ হইয়া, কি ভাবিতে ভাবিতে সরিয়া গেল।

"ললিত লবঙ্গলতা, ভ্রূকুটি কুটিল করিয়া সেই মধুর হাসি হাসিয়া, ইন্দ্রাণীর মত আমার সম্মুখে দাঁড়াইল। একবার বৈ কেহ অমরনাথকে আত্মবিস্মৃত দেখে নাই। আবার আত্মবিস্মৃত হইলাম। সেবারও ললিত লবঙ্গলতা—এবারও ললিত লবঙ্গলতা।

* * * * *

"দর্পিতা লবঙ্গলতা ভ্রূভঙ্গী করিল—কি সুন্দর ভ্রূভঙ্গী! বলিল,—"আমি কি ঠক! যে তোমার স্ত্রী হইবে, তাহার কাছে তোমার নামে ঠকাম করিবার জন্য কি আমি তাহার বাড়ীতে আসিয়াছি!"

"এই বলিয়া লবঙ্গলতা হাসিল। তাহার হাসির মর্ম্ম আমি কিছু কখন বুঝিতে পারি না। লবঙ্গ বিলক্ষণ রাগিয়া উঠিয়াছিল—কিন্তু হাসিতে সব রাগ ভাসিয়া গেল। যেন জলের উপর হইতে মেঘের ছায়া সরিয়া গেল, তাহার উপর মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। আমি লবঙ্গলতার মর্ম্ম কখন বুঝিতে পারিলাম না।

"হাসিয়া লবঙ্গ বলিল,—"তবে আমি রজনীর কাছে যাই।"

"যাও।"

"ললিত লবঙ্গলতা, ললিত লবঙ্গলতার মত দুলিতে দুলিতে চলিল। ক্ষণেক পরে, আমাকে ডাকিয়া পাঠাইল। গিয়া দেখিলাম, লবঙ্গলতা দাঁড়াইয়া আছে। রজনী তাহার পায়ে হাত দিয়া কাঁদিতেছে। আমি গেলে লবঙ্গলতা বলিল,—'শুন, তোমার ভবিষ্যৎ ভার্য্যা কি বলিতেছে! তোমার সম্মুখে নহিলে এমন কথা আমি কাণে শুনিব না।' আমি বিস্মিত হইয়া

জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কি?' লবঙ্গলতা রজনীকে বলিল,—'বন, তোমার বর আসিয়াছেন——' রজনী সকাতরে অশ্রুপূর্ণ লোচনে ললিত লবঙ্গলতার চরণ স্পর্শ করিয়া বলিল,—'আমার এই ভিক্ষা, আমার যে কিছু সম্পত্তি আছে, এই বাবুর যত্নে আমার যে সম্পত্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, আমি লেখা-পড়া করিয়া আপনাকে দান করিব; আপনি গ্রহণ করিবেন না কি?'

"আহ্লাদে আমার সর্ব্বান্তঃকরণ প্লাবিত হইল। আমি রজনীর জন্য যে যত্ন করিয়াছিলাম—যে ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলাম, তাহা সার্থক বোধ হইল। আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম, তখন আরও পরিষ্কার বুঝিলাম, যে, রমণীকুলে অন্ধ রজনী অদ্বিতীয় রত্ন! লবঙ্গলতার প্রোজ্জ্বল জ্যোতিও তাহার কাছে ম্লান হইল। আমি ইতিপূর্ব্বেই রজনীর অন্ধ নয়নে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম—আজি তাহার কাছে বিনামূল্যে বিক্রীত হইলাম। এই অমূল্য রত্নে আমার অন্ধকার পুরী প্রভাসিত করিয়া, এ জীবন সুখে কাটাইব। বিধাতা আমার কি সেদিন করিবেন না!"

এই অধ্যায়ে গ্রন্থকার অমরনাথের প্রেমিক হৃদয়—তাঁহার গুণগ্রহণশক্তি এবং তাঁহার-চিত্তস্থ লবঙ্গ-রজনীর পূর্ণ প্রতিবিম্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। কথাটি বিস্তৃত করিয়াই বলিব।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, লবঙ্গলতার প্রতি অমরনাথের প্রণয় ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছিল। ইহার কারণ অমরনাথই ভগ্নান্তরে একস্থানে বলিয়াছেন,——"কালের শীতল প্রলেপে সেই হৃদয়-ক্ষত, ক্রমে পুরিয়া উঠিতে লাগিল।" ইহা যে স্বাভাবিক—ইহাও আমরা বলিয়াছি—আবারও বলিব। ইহাতে যে প্রণয়ের কোন কলঙ্ক প্রমাণিত হয় না, তাহাও আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

যেমন লবঙ্গলতা অমরনাথের হৃদয় হইতে সঙ্কুচিত হইয়া একপার্শ্বে সরিয়া যাইতেছিল, তেমনই রজনী আসিয়া ধীরে ধীরে সেই স্থান অধিকার করিতে লাগিল। বর্ত্তমান সময়ে—অমরনাথের হৃদয়ের অধিকাংশই রজনী ও অল্পাংশ লবঙ্গ-পূর্ণ ছিল।

হৃদয়ের যখন এইরূপ অবস্থা—বাহিরে লবঙ্গ আসিয়া অমরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ধীরে ধীরে ভিতরের লবঙ্গ প্রসারিত হইতে লাগিল। লবঙ্গ ত অমরের হৃদয় হইতে লুপ্ত হয় নাই? সঙ্কুচিত মাত্রই ত ছিল! বাহিরের কার্য্যে আবার তাহা প্রসারিত হইতে লাগিল। অমরনাথের নিজের কথায় তাহাকে পরিষ্কার করিয়াছে। নিজের কথা নিজের সময়-মতই হয়—তাই অমরনাথের কথায় তাহার মন পরিষ্কারই বুঝিলাম। আমরা ধীরে ধীরে দেখিতে লাগিলাম—লবঙ্গলতা আস্তে আস্তে রজনীকে সরাইয়া অমরের হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছে। এইরূপে আস্তে আস্তে রজনীকে তাড়াইয়া যখন, অমরনাথের কথায়ই বলি, লবঙ্গলতা,—"ভ্রূকুটি কুটিল করিয়া সেই মধুর হাসি হাসিয়া ইন্দ্রাণীর মত সম্মুখে দাঁড়াইল"—অমরনাথ আত্মবিস্মৃত হইলেন। রজনীকে ভুলিয়া গেলেন। রজনী কি হৃদয় হইতে তখন অপসারিত হইল? তাহা নহে। রজনী তখন লবঙ্গের ন্যায় আবার সঙ্কুচিতাস্থায় অমরের হৃদয়ের এক প্রান্তে স্থান লাভ করিল। স্প্রীংয়ের মত তখন লবঙ্গলতা বিস্তারিত হইয়া রজনীকে ঢাকিয়া বসিল।

কিন্তু লবঙ্গলতার এ বিস্তৃতি দীর্ঘকালের জন্য স্থায়ী হইতে পারিল না। লবঙ্গলতার সহিত অমরনাথের কথাবার্ত্তায় অমরনাথ প্রকৃতিস্থ হইতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার সব কথা মনে হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল,—লবঙ্গলতা অপ্রাপনীয়া—তাহার জন্য বাসনা উন্মূলনই আবশ্যক। যেমন ইহা মনে হইতে লাগিল, রজনী আসিয়া আস্তে আস্তে

তখনই লবঙ্গকে সঙ্কুচিত করিয়া অমরনাথের হৃদয়ে বিস্তৃত হইতে লাগিল।

পরে যখন লবঙ্গলতাকে ডাকাইয়া রজনীর নিকটে লইয়া গেলেন, বাহিরে আবার রজনী দেখা দিল। সেই রজনী আবার তাহার যথাসর্ব্বস্ব লবঙ্গলতাকে দান করিতেছে। গুণগ্রাহী, উদার অমরনাথের হৃদয়ে আবার এক বিপ্লব ঘটিল—চকিতের ন্যায় রজনী লবঙ্গকে পূর্ব্বাবস্থায় রাখিয়া অমরনাথের হৃদয় যুড়িয়া রহিল।

পাঠক—কেমন সুন্দর সংঘর্ষণ দেখিলে? কেমন সুন্দর বর্ণনা দেখিলে?

অমরনাথের হৃদয়ই কি ইহাতে কম খুলিয়াছে! তাঁহার প্রশস্ত অকপট গুণগ্রাহী হৃদয়ের এতদপেক্ষা সুন্দর চিত্র আর কি হইতে পারে?

অমরনাথ যখন রজনীর প্রতি এইরূপে একান্ত আসক্ত হইয়া পড়িলেন, তখন তিনি আমাদিগকে বলিতেছেন,—

"এই অন্ধ পুষ্পনারী কি মোহিনী জানে, তাহা বলিতে পারি না। চক্ষে কটাক্ষ নাই; অথচ আমার মত সাহসীকেও মোহিত করিল। আমি মনে করিয়াছিলাম, লবঙ্গলতার পর আর কখন কাহাকে ভাল বাসিব না। মনুষ্যের সকলই অনর্থক দম্ভ। (বৃহদক্ষরে আমারই মুদ্রিত করিয়াছি)। অন্য দূরে থাক, সহজেই এই অন্ধ পুষ্পনারী কর্ত্তৃক মোহিত হইলাম।

"মনে করিয়াছিলাম,—এ জীবন অমাবস্যার রাত্রির স্বরূপ—অন্ধকারেই কাটিবে—সহসা চন্দ্রোদয় হইল। মনে করিয়াছিলাম,—এ জীবনসিন্ধু সাঁতারিয়াই আমাকে পার হইতে হইবে—সহসা সম্মুখে সুবর্ণসেতু দেখিলাম। মনে করিয়াছিলাম,—এ মরুভূমি চিরকাল এমনই দগ্ধক্ষেত্র থাকিবে, রজনী সহসা সেখানে নন্দনকানন আনিয়া বসাইল! আমার এ সুখের আর সীমা নাই। চিরকাল যে অন্ধকার গুহা মধ্যে বাস করিয়াছে, সহসা সে যদি এই সূর্য্যকিরণ-সমুজ্জল তরুপল্লব-কুসুম-সুশোভিত মনুষ্যলোকে স্থাপিত হয়, তাহার যে আনন্দ, আমার সেই আনন্দ! রজনীর মত যে জন্মান্ধ, হঠাৎ তাহার চক্ষু ফুটিলে যে আনন্দ, রজনীকে ভালবাসিয়া আমার সেই আনন্দ!"

রজনী তখন প্রাপণীয়া। আমরা অন্যত্র বলিয়াছি, ও ইচ্ছা আছে এ প্রবন্ধের উপসংহারেও বলিব যে,—প্রকৃত প্রস্তাবে নিরাশ-প্রণয় কখন চিরস্থায়ী থাকিতে পারে না। যেরূপ জড়জগতে কোন বস্তুই শূন্য থাকা স্বাভাবিক নহে, সেইরূপ অন্তর্জ্জগতেও হৃদয় প্রণয়শূন্য হইয়া বর্ত্তমান থাকা স্বাভাবিক নহে। যাই লবঙ্গলতার সহিত অমরনাথের মিলন-কামনা—কোনপ্রকারের মিলনকামনা তিরোহিত হইতে লাগিল, অমনি লবঙ্গ-প্রতি অমরনাথের প্রণয় সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। আবার সেই শূন্য স্থলটুকু আসিয়া রজনী পুরিতে লাগিল। এখন রজনীর প্রতি কামনা বলবতী—তাহার সহিত মিলনের সম্যক আশা অমরনাথের হৃদয়ে বর্ত্তমান! তাই রজনী তখন অমরনাথের হৃদয়েশ্বরী। (ক্রমশঃ)

ঠগী-কাহিনী।

(ঠগের নিজের মুখে শুনিয়া)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি!
তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।"

সঙ্গীত-পুস্তক।

"আমাদিগের গ্রামের প্রধান শত্রু—সেই ভয়ানক ব্যাঘ্র যে দিবস হত হইল, তাহার পর দিবস প্রত্যূষে পিতার সহিত গ্রাম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া শিবপুর গ্রামাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম।

শিবপুর নিতান্ত নিকটবর্ত্তী স্থান নহে; কাজেই স্থানে স্থানে আহার ও বিশ্রাম করিয়া ক্রমিক গমন করিয়া চতুর্থ দিবসের পূর্ব্বাহ্নে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, নানা স্থান হইতে দলে দলে ঠগগণ দলাধিকারীর সহিত আসিয়া উপনীত হইয়াছে ও হইতেছে; এবং আপন-আপন নির্দ্দিষ্ট বিশ্রাম-স্থান অধিকার করিতেছে। 'মহিদিনের' বাটীতে আমাদিগের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। সেই স্থানে আরও অনেক-গুলি লোক অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহারা আমার পিতাকে দেখিবামাত্র বিশেষ সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন; আমাকেও বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। ইহাঁরা সকলেই ঠগ-সর্দ্দার বা এক একজন এক এক দলের নেতা। আমরা 'দশহরার' দুই দিবস পূর্ব্বে শিবপুরে উপনীত হইলাম। ঠগদিগের পক্ষে দশহারার ন্যায় শুভদিবস আর নাই। বৎসরের মধ্যে এই দিবস সমস্ত ঠগ এই শিবপুর গ্রামে উপনীত হয়; ও সেই বৎসরের তাহাদিগের শুভাশুভের ফলাফল পূর্ব্বেই অবগত হইয়া, কায়-মনোবাক্যে ভবানীর পূজা করিয়া নানাদিকে আপন আপন ঠগীবৃত্তি সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত প্রস্থান করে। যে বৎসরে দশহরার দিবস বৃষ্টিপতন হয়, সেই বৎসরই ঠগগণের পক্ষে ধ্রুব-যোগ; আর যে বৎসর বৃষ্টি না হয়, সেই বৎসরই তাহাদিগের বিপদের বৎসর।

"আমরা কিছুক্ষণ সেই স্থানে বিশ্রাম করিলাম। সর্দ্দারগণও পিতার নিকট ক্রমে ক্রমে আমার পরিচয় পাইলেন; এবং আমার বীরত্ব-সূচক ব্যাঘ্র-হত্যা-কাহিনী শ্রবণ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, পিতা আমাকে সঙ্গে লইয়া, ১০ জন জমাদারের সহিত সেই স্থান হইতে বহির্গত হইলেন। এই দশ জনের পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া, ও অন্যান্য সকলের নিকট তাঁহারা যেরূপভাবে সমাদৃত হইলেন তাহা দেখিয়া, আমি স্থির করিলাম যে,—তাঁহারা অন্যান্য সর্দ্দারগণেরও সর্দ্দার; এবং তাঁহাদের সহিত আবার পিতার ব্যবহার দেখিয়া ইহাও জানিতে পারিলাম,—তাঁহাদের সকলের সর্দ্দার—আমার পিতা।

"সেই স্থান হইতে বহির্গত হইয়া পিতা কয়েকস্থানে গমন করিলেন; এবং সেই সেই স্থানের ঠগ ও ঠগ-সর্দ্দারগণের সহিত দেখা-শুনা ও বাক্যালাপ করিয়া পরিশেষে প্রত্যাগমন করিলেন।

"আমরা মুসলমান হইয়া কেন হিন্দুদিগের দশহারায় যোগ দিতেছি, হিন্দু-দিগের সহিত মিলিত হইয়া কেন তাহাদিগের আরাধ্য দেবতা ভবানী বা কালীর পূজা করিতেছি, এই ভাবনা হঠাৎ আমার মনে আসিল। সন্দেহ দূর করিবার মানসে, আমার মনের ভাব পিতাকে কহিলাম। পিতা আমার কথা শুনিয়া একটু হাসিলেন, ও কহিলেন,—'বৎস, আমরা যদিও মুসলমান সত্য, কিন্তু আমাদিগের মুসলমান-ধর্ম্ম অপেক্ষা হিন্দুদিগের ধর্ম্ম উৎকৃষ্ট ও প্রাচীন ধর্ম্ম। আধুনিক ধর্ম্ম অপেক্ষা প্রাচীন ধর্ম্ম যে প্রশংসনীয়, তাহা মহাজন-মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। তাহার উপর ঠগ-ধর্ম্ম অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ-ধর্ম্ম নাই। এই ধর্ম্ম যে নিতান্ত প্রাচীন ধর্ম্ম, আমি তাহার উৎপত্তির কারণ সংক্ষেপে বলিতেছি; শুনিলেই সকল জানিতে পারিবে। যখন পৃথিবীর প্রথম সৃষ্টি হয়, তখন ভগবান ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্যে ব্রতী হইয়া কেবল সৃষ্টিই করিতে থাকেন। আর বিষ্ণু উহাদিগকে পালন করিতে নিযুক্ত হন। যখন কেবল সৃষ্টি ও পালন হইতে লাগিল, তখন দেখিতে দেখিতে সমস্ত পৃথিবী প্রাণী দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া গেল।—কিন্তু সৃষ্টির নিবৃত্তি নাই; পালনেরও ত্রুটি নাই!—আর স্থান-সঙ্কুলান হয় না! তখন প্রলয় না হইলে আর রক্ষা নাই। কাজেই সে ভার মহাদেব

স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইলে গৃহিণীর পরামর্শ ও সাহায্য শীঘ্র প্রয়োজন হয়; সুতরাং ভবানী-ব্যতিরেকে শুম্ভ-সংহার-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিলেন না। শূলপানীকে সাহায্য অর্থাৎ প্রাণাবিনাশ-কার্য্যের সম্যকরূপ সহায়তা করিবার নিমিত্তই ভবানী বা কালী এই ঠগ-ধর্ম্মের সৃষ্টি করেন। যে ধর্ম্ম স্বয়ং ঈশ্বরী সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর কি হইতে পারে? পুত্র, ঈশ্বরী স্বহস্তে আমাদিগকে দেখাইয়া গিয়াছেন যে, সামান্য উপায়ে রাশি রাশি মনুষ্য কিরূপে হত্যা করিতে হয়। তিনিই আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন যে, জীবিত কালের পারিতোষিক-স্বরূপ আমরা আমাদিগের কর্ত্তৃক হত ব্যক্তির নিকটস্থিত সমস্ত দ্রব্য লইবার অধিকারী ও মৃত্যুর পর আমরাই কেবল স্বর্গসুখ ভোগ করিতে সমর্থ হই। ভবানী সতত আমাদিগের উপর দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। পৃথিবীর কোনরূপ বিপদে যদি আমরা কেহ পতিত হই, তাহা হইলে তিনি যে কোথা হইতে আসিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন, তাহা আর কেহই অবগত হইতে পারে না; কেবল সেই ভয়ানক বিপদ সুদূরে পলায়ন করে। যাহা হউক, পুত্র! যে কার্য্য আমি ভাল বুঝিয়াছি ও এই বৃদ্ধ কাল পর্য্যন্ত যাহার পরিচর্য্যা করিয়া আসিতেছি, তাহা ভাল বলিয়াই তোমাকে অর্পণ করিতেছি; তুমি আর কোনরূপ সন্দেহ করিও না। দশহরার দিনই তুমি এই অমূল্য ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবে।' এই বলিয়া পিতা নিরস্ত হইলেন। আমার মনের ভিতর যে অল্পমাত্র সন্দেহ ছিল, তাহাও দূর হইল।

"পবিত্র দশহরার দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি পিতার উপদেশ-মত প্রত্যূষে স্নান করিয়া পিতার সহিত একটি প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই স্থানে একটী সুরঞ্জিত চন্দ্রাতপের নিম্নে দুগ্ধ-ফেননিভ একটী বিস্তৃত বিছানা বিস্তৃত ছিল; এবং অসংখ্য ঠগগণ সেই স্থানে উপবেশন-পূর্ব্বক আমার পিতার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, নিয়মিত কার্য্যগুলি সম্পন্ন-পূর্ব্বক, সকলের সহিত একত্রে মিলিত হইয়া, পিতা ভবানীর আরাধনা করিলেন। সহস্র সহস্র লোকের মুখ হইতে একত্রে—"জয় কালীমায়ি কি জয়!" "জয় ভবানীকি জয়!"—শব্দ নির্গত হইয়া চারিদিক শব্দিত হইতে লাগিল। সেই ভয়ানক শব্দে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হওয়ায়, আরও ভয়ানক বোধ হইতে লাগিল। পরিশেষে, পিতা সকলের অনুমোদন-অনুসারে আমাকে ঠগ-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার নিমিত্ত আমার হস্তে একখানি তীক্ষ্ণধার কুঠারি প্রদান-পূর্ব্বক আমাকে সকলের মধ্যে দাঁড় করাইলেন; ও নানারূপ কঠোর শপথ করাইয়া আমাকে ঠগধর্ম্মে দীক্ষিত-পূর্ব্বক তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ঊর্দ্ধে উত্থিত করিয়া ভয়ানক চীৎকার শব্দে ভবানীর উদ্দেশে কহিলেন.—"জগজ্জননী, আজ তোমার আর একটী পুত্র আসিয়া তোমার অপর কৃতী পুত্রগণের সহিত মিলিত হইল; তাহার উপর কৃপা দৃষ্টি কর।" এই বলিয়া পিতা নিস্তব্ধ হইলেন। তখন অন্যান্য সকলে ভবানীর অভিপ্রায় জানিবার নিমিত্ত একাগ্রমনে ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে নিকটস্থিত বৃক্ষাবলীর উপর দিয়া শন্ শন্ শব্দে বায়ু বহিল। ইহা দেখিয়া সকলে ভবানীর অভিপ্রায় বুঝিলেন; এবং তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন জানিয়া, পুনরায় সকলে মিলিয়া "জয় জয়" শব্দে দিঙ্‌মণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া তুলিলেন।

"এইরূপে আমি ঠগধর্ম্মে দীক্ষিত হইলাম। পিতা মন্ত্রপূত করিয়া কিয়ৎপরিমাণ গুড় আমার হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন,—'তুমি ইহার কতক অংশ ভক্ষণ কর।' আমি তাহাই করিলাম। আর অবশিষ্টাংশ সকলে মিলিয়া বণ্টন পূর্ব্বক ভক্ষণ করিলেন। এইরূপে সে দিন কাটিয়া গেল।

দস্যু-বীর

গোবর্দ্ধন দিক্‌পতি।

(১)

১৭৬০ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে এই মেদিনীপুর জেলা মুসলমান রাজত্বের অন্তর্ভূত, বাঙ্গালার নবাবের শাসনাধীন ছিল। মুসলমান-প্রভুতা নামে মাত্র ছিল; কিন্তু কোন সময়ে বদ্ধমূল হয় নাই। তৎকালে কয়েকজন রাজোপাধিধারী জমিদার এই জেলায় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে প্রকৃতরূপ স্বাধীন-শক্তিতে শান্তি-রক্ষা করিতেন। এই সকল জমিদারদিগের রীতিমত সৈন্য, যুদ্ধোপকরণ, এবং স্ব স্ব বাস-ভবনের চতুষ্পার্শ্বে গড়খাইর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। স্ব স্ব অধিকৃত বিভাগের দেওয়ানি-ফৌজদারি প্রভৃতি মকর্দ্দমা জমিদারগণ যাহা নিষ্পত্তি করিতেন, তাহার প্রতিও কোন আপত্তি-প্রদর্শনের উপায় ছিল না। জমিদারদিগের রীতিমত কারাগার পর্য্যন্তও ছিল। এ অঞ্চলে অদ্যাপি অনেক গড়ের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়; এবং অনেক জমিদারদিগের পুরাতন-কালীন নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রাদিও, অকর্ম্মণ্যাবস্থায় ভগ্নাবশেষ স্বরূপ বর্ত্তমান থাকিতে, দেখিতে পাওয়া যায়।

মেদিনীপুরের বর্ত্তমান জমিদার রাজা মহেন্দ্রলাল খাঁর গৃহে অদ্যাপি অনেক অকর্ম্মণ্য ভগ্ন অস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাতন অনেক অস্ত্রাদি আছে, যাহা এইক্ষণ আমাদিগের দেশে প্রচলিত নাই, কিম্বা যাহার ব্যবহারাদিরও নিদান এক্ষণে লোকে জানে না। উল্লিখিত সময়ে এদেশে "জোর যার মুল্লুক তার" এই রূপ নীতি অবলম্বন করিয়াই অনেকে প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা করিতেন। এক এক বার মহারাষ্ট্রীয়গণ এ-প্রদেশে আসিয়া স্থানে স্থানে লুণ্ঠন করিত; এবং কোন কোন সময়ে এক প্রদেশের জমিদার অপরের অধিকৃত বিভাগ আক্রমণ করিয়া আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করিতেন। কখনও কখনও বা কোন পরাক্রান্ত দস্যু-তস্করেও সাধারণের ধন-সম্পত্তি আক্রমণ করিয়া অধিকার করিত।

এইরূপ অরাজক সময়ে 'দিকপতি' এ-প্রদেশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইংরাজ-রাজত্বের অব্যবহিত পূর্ব্বে ও ইংরাজ-রাজত্বের প্রথমাবস্থায় উক্ত ব্যক্তি বিপুল বিক্রমের সহিত এদেশে দস্যুবৃত্তি করিতেন। অনেক বলিতে পারেন, এতদিনের পরে একজন দস্যুর জীবন-বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া লাভ কি? কিন্তু সেজন্য আমি প্রথমেই বলিতেছি যে, গোবর্দ্ধন দিক্‌পতি-সম্বন্ধে যে সকল জনশ্রুতি অদ্যাপি এদেশে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহাকে এক-সময় সামান্য দস্যু বলিয়া মনে হয় না। যে সকল সদ্‌গুণ থাকায় দস্যু-বীর 'তান্তিয়া ভীলকে' লইয়া এত আন্দোলন-আলোচনা এবং সহানুভূতি চলিতেছে, দিক্‌প্রতিতে তদ্রূপ গুণাবলী অনেক ছিল। দিক্‌পতি দুর্ব্বল, অক্ষম, অনুগত ও শরণাপন্ন এবং স্ত্রী ও বালক প্রভৃতির উপর কোনরূপ অত্যাচার করিতেন না। কিন্তু অপরদিকে তিনি যে ধনী ও অবাধ্য লোকের যমস্বরূপ ছিলেন, তাহা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

মেদিনীপুর-জেলার মধ্যে নিজ মেদিনীপুর ও কর্ণগড় রাজবংশে লালা রামসিংহ, রাজা যশোমন্ত সিংহ প্রভৃতি বিখ্যাত বিখ্যাত ভূপতিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অদ্যাপি এই সকল রাজাদিগের প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্ত্তি, সুবৃহৎ সরোবর এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রাজ-প্রসাদের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই রাজবংশীয় রাজা যশোমন্ত সিংহ ভারত-ইতিহাসে বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। কবিবর রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী তৎপ্রণীত 'শিবায়ণ' গ্রন্থে রাজা যশোমন্তের সুমহান

চরিত্র, প্রভূত বীরত্ব এবং দাতৃত্ব-গুণের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালার ইতিহাস-লেখক মেঃ মার্শমেন সাহেব ঢাকার শাসনকর্ত্তা খালিপ আলির দেওয়ান রাজা যশোমন্তের নামোল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই। এই যশোমন্তের শাসন-সময়ে ঢাকার সুখ-সৌভাগ্য পূর্ণ-মাত্রায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ঢাকার পূর্ব্বতন শাসনকর্ত্তা নবাব সায়েস্তা খাঁর আমলে এপ্রদেশের সুখ সৌভাগ্য বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়; এমন কি সে সময় টাকায় ৮মণ করিয়া তণ্ডুল বিক্রয় হইয়াছিল। সায়েস্তা খাঁ ঢাকা নগরীর যে গেট অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন, রাজা যশোমন্তের সময়ে সেই গেট পুনরায় খোলা হইয়াছিল।

যৎকালে দস্যুবীর গোবর্দ্ধন দিক্‌পতি এ প্রদেশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তৎকালে যশোমন্তের পুত্র রাজা অজিত সিংহ মেদিনীপুরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। রাজা অজিতের মৃত্যু হইলে তাঁহার বিধবা মহিষী রাণী ভবানী অত্যল্প দিন মাত্র এ প্রদেশের শাসন করিয়াছিলেন। তৎপরে অজিতের কনিষ্ঠা মহিষী রাণী শিরোমণী মেদিনীপুরের শাসন-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। রাণী শিরোমণী বহুদিন পর্য্যন্ত এ প্রদেশে শাসন করিয়াছিলেন। এ প্রদেশে সর্ব্বসাধারণের নিকটে তিনি 'রাণী শিরোমণী সিংহ' নামে বিখ্যাত ছিলেন।

রাণী শিরোমণী যৎকালে মেদিনীপুরের শাসনকর্ত্রী ছিলেন, তৎকালে গোবর্দ্ধন দিক্‌পতি তাঁহার অধিকৃত প্রদেশে অনেকবার দস্যুবৃত্তি করিয়া অনেক লোকের সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়াছিলেন। রাণী ক্রমশঃ দিক্‌পতির ব্যবহারে বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলেন। রাণীর অধীনে প্রায় পাঁচ হাজারের অধিক জায়গীরদার ছিল। রাণী শিরোমণী কয়েকজন প্রধান প্রধান জায়গীরদারকে আদেশ করিয়াছিলেন,—যে ব্যক্তি এই দস্যুকে ধৃত করিয়া দিবে, তাহাকে বিপুল অর্থ প্রদান করিব। জায়গীরদারগণ রাণীর অধীনে সৈন্য-শ্রেণীতে নিযুক্ত ছিল। উহারা বেতনের পরিবর্ত্তে জায়গীর জমি উপভোগ করিত। অদ্যাপিও মেদিনীপুর জেলার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ জায়গীর জমি আছে। ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টও অনেক জায়গীর জমি বাহাল রাখিয়াছেন। অদ্যাপি পাইকগণ জায়গীর ভোগ করিতেছে। উহারা বিনা বেতনে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করিয়া থাকে। রাণী শিরোমণী এই জায়গীরদারগণকে আদেশ করিয়াছিলেন,—যে ব্যক্তি দস্যুদিগকে ধৃত করিয়া দিবে, তাহাকেই বিপুল অর্থ প্রদান করিব।

দিক্‌পতি দিনের বেলায় কখনও যোগী, কখনও সন্ন্যাসী, কখনও উদাসীন, কখনও ফকীর, কখনও বা গ্রাম্য-কৃষক বেশে ভ্রমণ করিতেন। যে সময়ে রাণীর সৈন্যগণ দিক্‌পতিকে অনুসন্ধান করিতেন, হয় তো দিক্‌পতিই সেই সৈন্যসহ পরিভ্রমণ করিতেন। একদিন প্রায় একশত সন্ন্যাসী কর্ণগড় রাজভবনে আতিথ্য গ্রহণ করে। রাণীর সৈন্যগণও সেদিন রাজভবন রক্ষা করিতেছিল। সন্ন্যাসীগণ রাজভবনে আহারাদি করিতেছে, এমন সময় সন্ধ্যার পরেই কিন্তু রাজভবন লুণ্ঠন করিয়া দিক্‌পতি প্রায় ১০ সহস্র মুদ্রা আত্মসাৎ করিয়া প্রস্থান করিলেন। একশত লোক দিক্‌পতির বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইল, কিন্তু একাই তিনি সেই সকল লোককে পরাজয় করিয়া রাজভবন লুণ্ঠন করিলেন।

একবার দিক্‌পতি প্রায় ৫০ জন সহচর-সহ শ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। এই তীর্থ-যাত্রায় তিনি প্রায় ১০ হাজার টাকার অধিক ব্যয় করিয়াছিলেন। গোবর্দ্ধন দিক্‌পতি মেদিনীপুর জেলার বগড়ি-পরগণার অন্তর্গত ঘোষ-পল্লী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি সেই পল্লীগ্রামে জলাশয় খনন ও শিবমন্দির আদি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। দিক্‌পতি দুর্ব্বল নিরাশ্রয়ের সহায় ও আশ্রয় দিলেন।

বনের ফুল।

ফুল,—বল্ না শুনি, বিজন বনে,
ফুটেছিস্ কার তরে?
তুই,—একলা হেথা, বল্ দেখিরে
থাকিস্ কেমন ক'রে?
তোর,—চা'রটী দিকে, গরব ভরে,
দাঁড়িয়ে গাছের সা'র;
তা'দের,—কঠোর হৃদি, বিশাল দেহ,
সমান ভিতর বা'র।
তা'দের,—আশয় বড়, উধাও শিরে,
গগন ভেদি ধায়;
তা'রা,—না হয় নীচু, সদাই উচু,
উচের দিকেই চায়!
অতি—যতন ক'রে, জগৎ খুঁজে,
পাইনে এদের যোড়া;
এরা,—সতত ধায়, উচের দিকে,
নীচেয় কিন্তু গোড়া!
এরা,—আঁধার ক'রে, জন্মস্থলটী,
যাবৎ জীবন রাখে;
এদের,—ফলে কে পায়, দেখি ত' খায়,
শালিক, শকুন, কাকে!
মরি,—তোর ত' এরা, সুহৃৎ সখা,
থাকিস্ এদের কাছে;
মরি,—এদের মত, সুখবিলাসী,
আর কি কোথাও আছে!

আবার,——

বুঝি,—এ ঘোর বনে ভুলেও কভু,
বয় না বাতাস ধারে;
বুঝি,—গায় না হেথা, পিক্ পাপিয়া,
মোহন মধুরস্বরে!
বুঝি,—গায় না হেথা, ভ্রমর যত,
প্রেম্ সোহাগের গান!
মরি,—ভাবিলে তোর; দুখের কথা,
আকুল হয় রে প্রাণ।
কভু,—সকাল-সাঁঝে, রবির ছবি,
হয় কি রে তোর দেখা?
যেটী—ভবের পুঁথি, ভাব্-আখরে—
স্বভাবের ভাব লেখা?
কভু,—দুখ্-পাশরা, তারায় ঘেরা,
দেখিস্ নিশির চাঁদ?
সেই,—ভয়-ভুলানো, মোহন তনু,
মন মজাবার ফাঁদ?
হায় রে,——
দেখি,—এই জগতে, সবাই সুখী,
সুখের আশায় ভোর;
দেখি,—জনম শুধু, দুখের তরে,—
দুখের কপাল তোর!
তোরে,—আপন্ ব'লে, জগৎ মাঝে
আর কি রে কেউ আছে?
তোর,—মরম-ব্যথা, দুখের কথা,
বলিস্ বা ক'র কাছে?
তুই,—ঘোর বিপিনে, আপ্‌নি ফুটে,
আপ্‌নি যাইবি ঝ'রে!
ফুল,—বল্‌না শুনি, বিজন বনে
ফুটেছিস্ ক'র তরে?

শ্রীকা

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

শ্রীমন্ত সওদাগরের বাবু চন্দ্রকিশোর রায়ের নামে আমরা এ পর্য্যন্ত নানা অভিযোগ পাইতেছি। এক-আদ খানি নহে, এক-আদ রকমের নহে, কত রকমের কত অভিযোগ যে তাঁহাদের নামে আমরা পাইতেছি, তাহা বলিবার নহে। কেহ তাঁহাদের এজেন্সীতে কোন দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে পাঠাইয়া দ্রব্য বিক্রয় হইয়াছে সংবাদ পাইয়াও, তাহার দাম পাইতেছেন না; কেহ কোন দ্রব্য কিনিতে টাকা পাঠাইয়া 'মুলেই হাবাত' হইতেছেন; কেহ বা তাঁহাদের প্রকাশিত

কাগজের গ্রাহক হইয়া কাগজও পাইতেছেন না। আমরাও এ-সম্বন্ধে বার বার তাঁহাদের জানাইয়াছিলাম। কিন্তু এ পর্য্যন্তও তাঁহারা সে সকল অভিযোগের কোনই মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। এতদিন চুপ করিয়া ছিলাম; তাঁহাদিগকে সময় দিয়াছিলাম যে, যদি তাঁহারা সময় পাইয়াও সাধারণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কোনরূপ কোন উপায় নির্দ্ধারণ করেন। কিন্তু এতদিনেও তাঁহারা কিছুরই কিছুই কিনারা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অথচ লোকে এখনও নিত্যই তাঁহাদের কুহক-জালে পতিত হইয়া প্রবঞ্চিত হইতেছেন! কাজেই, আমরাও আর সাধারণকে তাঁহাদের পরিচয় না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না। এতদিন নীরবে থাকাতেই লোকে আমাদিগকে দূষিতেছে; সুতরাং আরও কিছুদিন চুপ করিয়া থাকিলে না-জানি লোকে আমাদিগকে আরও কত কি বলিবে? যাইহোক, তাঁহাদের কার্য্য-কলাপ ও সাধারণের সহিত ব্যবহার সম্বন্ধে রাশি রাশি যে সকল অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে, তাহার দুই-একখানির নমুনা পাঠকগণ দেখুন, এইরূপ:——

১ম পত্র।

"প্রায় একবৎসর হইতে চলিল, আমরা শ্রীমন্ত সওদাগর পত্রিকার তিন সংস্করণের গ্রাহক-শ্রেণিভুক্ত হইয়াছি; এবং মনিঅর্ডার-যোগে অগ্রিম টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য, যে সময়ে গ্রাহকভুক্ত হই, তৎকালে উপহারের লোভানিও ছিল। তৎদৃষ্টে আমরা উক্ত উপহার-সহ পত্রিকা পাঠাইতে লিখিয়াছিলাম। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, টাকা অগ্রিম পাঠাইয়াও একখণ্ড নমুনাস্বরূপ পত্রিকা পাইলাম না। উপহার পাওয়া দূরে থাক, পত্র লিখিলে উত্তর পর্য্যন্ত দেয় নাই। পরে অতি বিনীতভাবে আমরা এক পত্র রেজেষ্টারি ডাক-যোগে প্রেরণ করিয়াছিলাম; তাহারও কোন প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হই নাই। তৎপরে ৫।৭ দিন অতিবাহিত হইলে উত্তরের আশায় নৈরাশ হইয়া, পুনরায় রিপ্লাই-কার্ড প্রেরণ করিয়াছিলাম; তদুত্তরে সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছিলেন,—'একে চৈত্রমাস, আখের সময়, তাহাতে নানাবিধ কার্য্যের ব্যস্ততা-নিবন্ধন পত্রিকা পাঠাইতে পারি নাই। আগামী বৈশাখ মাসে উপহার-সহ নিয়মিতরূপে কাগজ পাঠাইব।' কিন্তু বৈশাখ নাগাদ মাঘ মাস তক অতিবাহিত হইয়া গেল; তত্রাচ পত্রিকা কিম্বা উপহার কিছুমাত্র প্রাপ্ত হইলাম না।

আমরা পুনরায় বিগত মাঘ মাহায় রেজেষ্টারি-যোগে এক পত্র পাঠাইয়াছিলাম। ঐ পত্রে আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ এবং 'দৈনিক','পাক্ষিক' 'সাপ্তাহিক' পত্রিকা উপহার-সহ পাঠাইতে লিখিয়াছিলাম। কিন্তু আমাদের সে আশাতেও ছাই পড়িল। তাহাতে মাত্র 'বাঙ্গালা এক্সচেঞ্জ-গেজেটের' সম্পাদক মহাশয় নমুনা-স্বরূপ কএক খণ্ড কাগজ পাঠাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু অদ্য প্রায় দেড়মাস গত হইল, এপর্য্যন্ত সে পত্রের উত্তর এবং উপহার পুস্তক কিছুমাত্র পাইলাম না। তবে মাঘ মাহা হইতে 'বাঙ্গলা এক্সচেঞ্জ গেজেট' এবং সাপ্তাহিক কাগজ 'শ্রীমন্ত-সওদাগর' পাইতেছি। পাক্ষিক সংস্করণ 'শ্রীমন্ত-সওদাগর' পাইতেছি না এবং উপহারও প্রাপ্ত হইলাম না। এক্ষণে আমরা আপনাদিগকে সমস্ত বিবরণ বিস্তারিতরূপে লিখিলাম; প্রতিকারের আশায় এ সংবাদ প্রেরণ করিলাম।"

কাগজ না পাওয়া-সম্বন্ধে এইরূপ পত্র আরও আমরা অনেক পাইয়াছি। কিন্তু সকল প্রকাশের স্থান নাই। তার-পর আর এক রকমের পত্রের মর্ম্ম দেখুন;—

২নং পত্র।

"মহাশয়,—আমার একটী বিজ্ঞাপন ছাপাইবার জন্য ৩৲ তিন টাকা পাঠাইয়াছিলাম। কিন্তু তাহা ছাপাইয়া পাইলাম না। টাকা

ফেরতের জন্যও বার বার পত্র দিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাও পাইলাম না।"

প্রেসের কাজ-সম্বন্ধে তো এই! তার পর দেখুন, আর এক রকমের পত্রের মর্ম্মাংশ এই,—

৩নং পত্র।

"মহাশয়,—চন্দ্রকিশোর রায় মহাশয়ের এজেন্সীতে কতকগুলি দ্রব্য কিনিবার জন্য অগ্রিম ২৫৲ টাকা পাঠাইয়া দিই। কিন্তু এপর্য্যন্ত দ্রব্যাদি কিছুই পাইলাম না। অধিকন্তু, টাকাগুলিও ফেরত পাইতেছি না। পত্র লিখিলেও উত্তর নাই। আপনাদের নিকট রসিদ পাঠাই; যদি আদায় করিতে পারেন, তবে বাধিত হইব।"

এরূপ পত্র আরও বিস্তর আছে। যাইহোক, এই পত্রখানি দেখাইয়া চন্দ্রকিশোর বাবুকে কিছু কিছু করিয়াও টাকা দিতে বলিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি "আজ-কাল—আজ-কাল" করিয়া প্রায় বৎসরেক কাটাইয়া দিলেন। সুতরাং পাঠকগণ আমাদের অপরাধ বুঝুন।

তার পর লোকের দ্রব্য বিক্রয় করিতে লইয়া তাহার টাকা না দেওয়া। এসম্বন্ধে অধিক আর কি বলিব? সম্প্রতি এসম্বন্ধে এক মকর্দ্দমাই রুজু হইয়াছে। দেখুন পাঠক তাহার বিবরণ এই:—

নালিশ।

"শ্রীমন্ত সওদাগর সংবাদপত্রের চন্দ্রকিশোর রায়ের নামে রংপুরবাসী পরীক্ষিৎ কবিরাজ মাল বিক্রয়ের টাকার জন্য নালিশ করিয়াছেন। সম্পাদক জামিনে খালাস আছেন।"

আর অধিক বলায় আবশ্যক নাই। কিন্তু এক্ষণেও আমাদের ভরসা, চন্দ্রকিশোর বাবুর যদি প্রকৃতই সদিচ্ছা থাকে, তবে তিনি এখনও সকলকে তুষ্ট করিতে পারিবেন। আর, সুপরামর্শ মত তিনি যদি সকলকে তুষ্ট করেন, তাহাহইলে এখনও আমরা সন্তুষ্ট হইব। নতুবা কি করিব? এ সকলের পরও লোকে যে মজিবে, তাহা আর কোন্ চক্ষে দেখিয়া থাকিতে পারি।

পরেশনাথের আপিল।

ধুবড়ীর মকর্দ্দমায় রত্নগৃহের বিজ্ঞাপনদাতা পরেশনাথ মিত্র ছয় মাস কঠিন পরিশ্রম-সহ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন, এ কথা কাহারও অবিদিত নাই। ইতিপূর্ব্বেই আমরা আরও সংবাদ দিয়াছিলাম যে, পরেশ-নাথের পক্ষগণ একবার আপিল করিয়াও দেখিবেন—যদি তাহাতেও দণ্ডের কিছু লাঘব হয়। বলা বাহুল্য, তদনুযায়ী পরেশের পক্ষ হইতে গোহাটী—কামরূপ মোকামে আপীলও করা হইয়াছিল। কিন্তু বড়ই দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, পরেশ-নাথের সে আপিল মঞ্জুর হয় নাই। পরেশনাথকে সেই ছয় মাসই কারাযন্ত্রনা ভুগিতে হইল। দণ্ডের কিছু লাঘব হইলে, আমরাও সুখী হইতাম। ব্যাচারার কষ্টের কথা শুনিয়া আমাদেরও প্রকৃতই কষ্ট হইতেছে।

———

মতামত।

পুস্তক-সম্বন্ধে।

কবিতা-মুকুল।—শ্রীতারিণীচরণ সেন প্রণীত। "অল্পবয়স্ক কোমলমতি বালক-বালিকাগণের নীতিপূর্ণ পদ্যপাঠে অনুরাগ বৃদ্ধি হইবে, এই উদ্দেশ্যে 'মুকুলের' প্রচার।" পুস্তকখানির ভাষা সরল। স্থানে স্থানে কবিত্বের উচ্ছ্বাসও পরিলক্ষিত হয়। যাহার মুকুলে এত সৌগন্ধ, ফুটিয়া উঠিলে তাহার অবস্থার কতদূর পরিবর্ত্তন ঘটিবে, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। আমরা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি।

মানস-কুসুম।—শ্রীকালিদাস মিত্র বিরচিত। এ কুসুম ফুটে নাই,—সৌরভের আশায় গ্রন্থকার মুকুলাবস্থাতেই জোর করিয়া ফুটাইয়া-

ছেন। আমাদের মতে তাঁহার 'মানস-কুসুম' আর কিছুদিন মনে মনে থাকিলে আপনা-আপনিই ফুটিয়া উঠিত, এবং চারিদিকে মধুর সুবাস ছড়াইতে পারিত। তবে স্থানে স্থানে ভাবের সমাবেশ ও ভাষার লালিত্যও পরিদৃষ্ট হয়। চেষ্টা থাকিলে, কালিবাবু পরে ভাল লিখিতে পারেন, এরূপ আশা করা যায়।

মাধুরী।—নাটিকা।—৺কেশবমোহিনী দাসী বিরচিত, ও সিদ্ধেশ্বর দে "বি, এ" সম্পাদিত। কাগজ ভাল—ছাপা পরিষ্কার—লেখাও স্থানে স্থানে বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় লিখিত। কিন্তু এত জঘন্য পুস্তক বাঙ্গালায় আছে কি না, সন্দেহ। কিছু নমুনা দিই;—

হরলাল বাবু অতুল সম্পত্তির অধিকারী, বড় একটি আফিসের মুচ্ছুদ্দী। 'মাধুরী' নাম্নী তাঁহার একটি রূপবতী স্ত্রী ছিল। সে আবার লেখা-পড়াও জানিত; এমন কি, মনোভাব প্রকাশক পদ্য লিখিয়া পদ্যের উত্তর দিতেও পারিত। সংবাদপত্র সম্পাদক নির্ম্মল চরিত্র বনমালী বাবুর খণ্ড-কবিতা পাঠ করিয়া মাধুরী তাঁহাকে অন্তরে অন্তরে ভালবাসে। কালে সে ভালবাসা বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বিষবৃক্ষে পরিণত হইল। সে বিষবৃক্ষের ফলও বড় বিষময় হইয়া উঠিল। মাধুরী বনমালী বাবুর শ্রীপদে মনপ্রাণ বিকাইতে চায়—তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিতে অগ্রসর হয়,—এক কথায় হিতাহিত বিবেচনাশূন্য হইয়া কুলটার ন্যায় বনমালী বাবুকে আপনার করিতে চায়। পাপ কথা চিরদিন অপ্রকাশিত থাকে না। হরলাল বাবুর নিকটেও এ কথা অপ্রকাশিত রহিল না। তিনি মাধুরীকে বড় ভাল বাসিতেন; তাই, তাহার এ বিশ্বাসঘাতকতায় মর্ম্মাহত হইলেন। একদিন রজনী-যোগে নিদ্রিতা মাধুরীকে গুলি করিয়া আপনি আত্মহত্যা করিলেন। তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু মাধুরী মরিল না। সে আরও পাপকার্য্য সাধনের জন্য যেন জীবিত রহিল। একে একে বিষ-প্রয়োগে আরও দুই তিন জনকে হত্যা করিল।

পুস্তকখানি স্ত্রীলোকের কোমল হস্ত-প্রসূত বলিয়া তো বোধই হইল না। তবে আজকাল স্ত্রীলোকের নাম দিয়া অনেকে পুস্তক প্রকাশ করিয়া থাকেন; ইহা যদি তাহাই হয়—বলিতে পারি না! সিদ্ধেশ্বর বাবু পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বি, এ' উপাধিধারী—কেমন করিয়া ইহা সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিলেন, জানি না। এ কুনীতি, এ কুশিক্ষা—পাপের এ ভীষণ বিকৃত চিত্র বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকার হস্তে, কি শুভ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাও বলিতে পারি না। বঙ্গ ভাষায় যাহাতে এরূপ পুস্তক আর প্রকাশিত না হয়, তজ্জন্যই অনুসন্ধানের এতখানি স্থান অপব্যয়িত করিলাম। নহিলে এক কথায় "সমালোচনের যোগ্য নহে"—এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইত। "বি, এ" মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের কথায় কর্ণপাত করিবেন কি?

গণিত প্রবেশিকা।—প্রথম ভাগ—শ্রীসিদ্ধেশ্বর দাস সঙ্কলিত। গ্রন্থকার পাঠশালার ছাত্রদের উপযোগী করিয়া এবং বাঙ্গালা-স্কুলের নিম্ন-শ্রেণীর ছাত্রদিগের জন্য, এই অঙ্ক পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে ধারাপাত-সম্বন্ধীয় সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ের সহিত মিশ্র-ভাগহার পর্য্যন্ত লিখিত আছে। পুস্তকখানি যাহাদের জন্য রচিত, প্রকৃতই তাহাদের উপযোগী হইয়াছে। গ্রন্থকার এ পুস্তক-সংগ্রহে যে যথেষ্ট শ্রম ও যত্ন করিয়াছেন তাহাও দেখা যাইল। তাঁহার সফলতা প্রার্থনীয়।

কাপ্তেন বাবু।—(সামাজিক নাট্য-রঙ্গ)। শ্রীকালীচরণ মিত্র প্রণীত। বাপের অনেক বিষয়, নরেন্দ্র তাঁহার একমাত্র ছেলে; হ্যাণ্ডনোট কাটে—বারবনিতার পদপ্রান্তে ঢালিয়া দেয়। সেই, মা' বাপ্‌কে Stupid

father বলন, সেই ইংরাজী চলন, শ্বশুরাদি সকলকে Don't care করণ, সকলি সেই চর্ব্বিত চর্ব্বণ। পুস্তকখানি এত উত্তম হইয়াছে যে, ওজনদরে বিক্রয় করিলেও ইহার সম্মান রক্ষা করা হয়।

সাধুরহস্য। —শ্রীমহম্মদ রওসন আলি প্রণীত। পুস্তকখানি উর্দ্দু "মকাসাদেস্ছালেহিন্" নামক পুস্তকের অনুবাদ। কতিপয় ধর্ম্মপরায়ণ সাধুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি।

প্রেম-বন্ধন বা কবিতার বিবাহ।—শ্রীনটেন্দ্রভূষণ মজুমদার প্রণীত। পুস্তকখানি একবার নয়, দুই তিন বার পাঠ করিয়াছি। গ্রন্থকার এক জন 'কবি' বটেন! তাঁহার লেখায় সৌন্দর্য্য ও লালিত্য আছে; ভাষা সরল ও ভাব মাধুর্য্যময়। কল্পনায় তিনি যে তরঙ্গ তুলিয়াছেন, তাহা অতি প্রশংসনীয়। কবিতার বিবাহ দিতে গিয়া তিনি তৎসঙ্গে আনুসঙ্গিক অনেক বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। কবিতা, কল্পনা, প্রকৃতি, পূর্ণিমা, গদ্য, কন্দর্প, বসন্ত, প্রেম, গীতি, রজনী, নিদ্রা, অলিকুল, ফুলকুল, আকাশ, সাগর প্রভৃতি সমস্তই তাঁহার কবিত্বের পরিচায়ক।

সবই ভাল, দোষ কি তবে নাই? আছে। কিন্তু তাহাও যৎসামান্য। যথা, স্থানে স্থানে ভাষার দোষ আছে। কিন্তু সে দোষ অপেক্ষাও একটি মহৎ দোষ পরিলক্ষিত হয়। যদি গ্রন্থকার পুস্তকখানি 'নাটকে' না লিখিয়া 'কাব্যে' রচনা করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় আরও সুন্দর হইত। তাঁহার লিখিবার ক্ষমতা আছে; কল্পনায় তিনি অনন্ত অসীম ব্রহ্মাণ্ড এক পলকের মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে পারেন। তবে ঐ সামান্য কার্য্য তাঁহার দ্বারা হইত না, ইহা বিশ্বাস করা যায় না।

পদ্যশিক্ষা।—শ্রীমোজাম্মেল হক কর্ত্তৃক বিরচিত। সরল ভাষায় বালক-বালিকাদিগের শিক্ষার্থে গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন; এবং যাহাতে ইহা একখানি পাঠ্য-পুস্তকরূপে পরিগৃহীত হয়, তজ্জন্য তিনি বিজ্ঞাপনে শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের উপরও অনেক অনুরোধ-উপরোধ করিয়াছেন। পুস্তকখানি নেহাত মন্দও হয় নাই বটে; কিন্তু পাঠ্যপুস্তক-স্বরূপে নির্ব্বাচিত হইবার যোগ্য নহে। আজকাল অনেকেই এইরূপ পুস্তক লিখিয়া পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচিত হইবে আশা করিয়া থাকেন; কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের কি কি গুণ থাকা আবশ্যক, তাহা তাঁহারা বোধ হয় একবারও ভাবিয়া দেখেন না।

শশীমুখী বা যৌবনে-যোগিনী। শ্রীসিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় বিরচিত। সমালোচনার যোগ্য নহে। এ পুস্তক ছাপাইয়া টাকা জলে ফেলা ও লোকের বিরাগভাজন হওয়ায় কি লাভ বলিতে পারি না। গ্রন্থকার বলেন, এখানি তাঁহার—"নূতন ধরণের সামাজিক নাট্য-গীতি!" কিন্তু অনেক কষ্টে ধৈর্য্যধারণ করতঃ আগাগোড়া পাঠ করিয়াও ইহার অন্ত পাইলাম না। শেষে মনে হইল,—"এখানি কি বাঙ্গলা বহি?"

অভিনয়-সম্বন্ধে।

পার্শি-থিয়েটারে মজিলপুরের 'লীলা-নাট্য-সমাজ' কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত বাবু প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিরচিত 'আধ্যাত্মিক ছবি বা পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ' ও কলিকাতার 'ভারত নাট্যসমাজ' সম্প্রদায় কর্ত্তৃক 'দেবযানী' নামক পুস্তক অভিনীত হয়। প্রথমে 'পরীক্ষিত', তার পর দেবযানী অভিনীত হইয়াছিল। পরীক্ষিতের অংশ ব্যতীত 'লীলা নাট্যসমাজ' সম্প্রদায়ের মধ্যে আর কেহই বড় প্রশংসার যোগ্য অভিনয় করিতে পারেন নাই। 'ভারত নাট্যসমাজ' সম্প্রদায় অনেক বিষয়ে জয়লাভ করিয়াছিলেন। ঐক্যতান-বাদন শ্রবণে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম।

সংবাদ।

—দুইজন জুয়াচোর রেলে যাইবেন ;—মতলব, অন্ততঃ রেলকোম্পানীকে একজনের ভাড়াও ফাকি দিতে হইবে! একজন একটী বাক্সের মধ্যে প্রবেশ করিলেন ; এবং অপর ব্যক্তি সেইটী মাথায় করিয়া রেলে চড়িলেন। বলা উচিত, বাক্সটীও মতলব-সই ; তাহার উপরে নিশ্বাস-প্রশ্বাস বাহিরের ছিদ্র ছিল, এবং পাছে ওলট-পালট হয়—এই আশঙ্কায় বাক্সের উপরদিকটী মন্দিরের ন্যায় ছুঁচলা করিয়া গঠিত হইয়াছিল। অধিকন্তু খাবার পাঁউরুটী ও জলও বাক্সে দেওয়া ছিল। এইরূপে জুয়াচোরদ্বয় বার্লিন হইতে পারিসে যাইতেছিলেন। যাইহোক, শেষে তাঁহারা ধরা পড়িয়াছেন। ধরা পড়ুন, জুয়াচোর বাবাজীদের ধন্য সাহস ও চতুরতা কিন্তু!

—পারিসের এক 'বিক্রিওয়ালার' দোকানে একজন 'শিশি-বোতল' বিক্রয় করিতে প্রবেশ করে ; এবং কিছুক্ষণ দরদস্তুর হওয়ার পরই, সে তাহা হইতে কএক বোতল মদ বাহির করিয়া বলে যে,—"সস্তায় ভাল মদ, কিনিবেন?" দোকানদার মদ দেখিতে চাহিলেন ; এবং একটু একটু করিয়া কএকটী বোতলের মদ চাকিতে লাগিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, চাকিতেই তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন!—আর যেই তিনি অজ্ঞান-প্রায়, অমনি সেই জুয়াচোর তাঁহার তহবিল-বাক্স লুট করিতে আরম্ভ করিল ; টাকাকড়ি যা' পাইল, লইয়া চম্পট দিতে অগ্রসর হইল! সৌভাগ্য যে, পলাইবার সময়ই, কেমন করিয়া, পুলিসের তাহাতে নজর পড়ে ; এবং প্রতারক ধৃত হয়। কি ভয়ানক জুয়াচুরী-ফন্দি!

—পারিশের কোন থিয়েটার-কোম্পানি তত্রত্য বড়বড় লোকের বাড়িতে 'টেলিফোঁর' তার লইয়া গিয়া তাঁহাদিগকে প্রথমতঃ অভিনয়ের নমুনা শুনাইবার কল্পনা আঁটিয়াছেন। তাহাতে যদি অভিনয় পছন্দ হয়, তবে টিকিট কিনিয়া যেন থিয়েটার দেখেন,—এই কোম্পানীর মতলব!

—মূলতান-জেলের এক কয়েদী তত্রত্য জেল-রক্ষকের নাক কাটিয়া দিয়া পলায়ন করিয়াছে।

—মিরাটের কাছে ঝুন্দা নামক জনৈক দস্যুসর্দ্দার বড়ই উৎপাৎ আরম্ভ করিয়াছে। ঝুন্দার সহিত শতাবধি দস্যু আছে। ঝুন্দাকে ধরিবার জন্য পুলীস নানারূপে চেষ্টা করিতেছেন ; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতেছেন না। ঝুন্দা সে দিবস বড় ও ছোট পুলিস সাহেবকে যাইয়া বলে যে,—সে ঝুন্দাকে ধরিয়া দিতে পারে। সাহেবেরা তাহাতে ৫ জন অশ্বারোহী প্রহরীসহ ঝুন্দাকে ধরিতে যান। ঘটনা-স্থলে যাইয়া ঝুন্দা অদৃশ্য হয়। তখন পুলিস সাহেবগণকে লজ্জিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। ঝুন্দা দ্বিতীয় তান্তিয়া নাকি?

—পূর্ব্ব-সপ্তাহে ভবানীপুরের একটী ভদ্রলোকের বাটীতে তিন জন চোর ছোরা-ছুরী লইয়া প্রবেশ করে ; এবং যে ঘরে কর্ত্তার স্ত্রী শুইয়াছিলেন, ইহারা সেই ঘরে যাইয়া ঘরের প্রদীপ নিবাইয়া দেয়, ও গৃহিণীর গলা টিপিয়া ধরিয়া গায়ের সমস্ত গহনা খুলিয়া সরিয়া যায়। সহরের ভিতর এরূপ ভয়ানক দুঃসাহসিক কাণ্ড শুনিয়া আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়াছি।

—হাইকোর্টের সেসনে প্রধান বিচারপতি-সমীপে হির্ষাসে ও পাইওনিয়ার-ঘটিত মকর্দ্দমার বিচার হইয়া গিয়াছে। বিচারে পাইওনিয়ারের সহকারী সম্পাদক ও অন্যতম সত্বাধিকারী এলেন সাহেবের ৩০০০৲ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

—বহুবাজারে ৪ জন ব্রাহ্মণ এক শুঁড়িকে কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত করিয়া অন্য দ্বার দিয়া ১৯০ টাকার নোট ও জিনিস পত্র লইয়া সরিয়াছিল। ইহারা ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ। খাদ্যের যাচ ঞা করিয়া দয়ালু সাহাকে তফাতে পাঠাইয়া দিয়াছিল। সে ফিরিয়া আসিয়া দেখে, টাকা সমেত ব্রাহ্মণেরা অন্তর্ধান হইয়াছে। পুলিশ পরে তাহাদের গ্রেপ্তার করেন।

—সম্প্রতি কাশীতে এক অভিনব কাণ্ড ঘটিয়াছে। এক গোরা, মল্লিক-কোম্পানীর বাটীতে একটী ঘড়ি ক্রয় করিতে যায়। দোকানদারেরা একটী ঘড়ি বাহির করিয়া তাহার হস্তে দেয়। ক্রেতা উহা ভাল করিয়া দেখিবার ব্যাপদেশে একটু বাহিরে আসিয়া ছুট দেয়। সকলে ধর ধর করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়ায়, কিন্তু কেহই তাহাকে ধরিতে পারে না। পরদিন প্যারেডের সময় লোকটাকে ধরাইয়া দেওয়া হয়।

—দক্ষিণ ভারতবর্ষ রেল লাইনের একজন গার্ড এক বাক্স চুরট চুরি করিয়া আট মাস জেলে গিয়াছে। এরূপ কঠোর দণ্ড না হইলে গার্ডেরা শিক্ষা পায় না।

—এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ৫৩০৭ জন, এফ এ পরীক্ষায় ২৪৭২ জন, ও বি এ পরীক্ষায় ১০৪৯ জন ছাত্র উপস্থিত হইবে।

—চুনারের একজন জুতার চোটে নাকি এক অধমর্ণের প্রাণ বাহির করিয়া দিয়াছে। প্রহারকের নাম দামোদর দাস। প্রহারিত ব্যক্তি একজন নীচ জাতীয় কায়স্থ। মুজাপুরের ফৌজদারী আদালতে এই মকর্দ্দমার বিচার চলিতেছে।

অনুসন্ধান।

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

৩য় খণ্ড] ২৯এ ফাল্গুন, ১২৯৬ সাল। [১৫শ সংখ্যা

ভক্তের গান।

রাগিণী কালাংড়া—তাল আড়া।

"হরিপদ-পঙ্কজে মজরে মন, নহে বিলম্ব-সহন।
দেখ রবি দিনে দিনে করিছে আয়ুহরণ॥
জীবন নিধনকালে, কণ্ঠাবরোধ হইলে,
কেমনে হইবে কৃষ্ণ নামেরি স্মরণ;
ভ্রমে মত্ত হয়ে, কুসাধনে কাল খোয়াইলে,
যা' করিলে হিত বাক্য শুনরে এখন;
কহে অকিঞ্চন, দৃঢ়ভাবে ভজ নারায়ণ,
তবেরে হইবে যমভয়-নিবারণ।"

অমরনাথ।

(২)

শিক্ষিত প্রথম প্রেমিকের আর একটী স্বাভাবিক Eccentricity আছে। ইহা প্রেমোচ্ছ্বাসের প্রাবল্য জন্যই বোধ হয় সঞ্জাত হইয়া থাকে। এরূপ লোক প্রণয়িনীর নিকট সর্ব্বাংশে অকপট থাকিতে চাহে। হৃদয়ের ভবিষ্যৎ কথা ত পরে বলিতে হইবেই—ভূত কথা না বলিলেও ত চলে না। তাহা হইলে প্রণয়িনীর নিকট প্রকৃত মনুষ্যটিকে স্থাপনা করা হয় কই? আমি কি, তাহা তাহাকে জানান ত আবশ্যক—অমরনাথ এখন ইহাই ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার লবঙ্গ-প্রণয়-কথা যদি রজনীকে না জানান হয়, তবে যেমন অধর্ম্ম, তেমনই পরিণামে অনিষ্টের আশঙ্কা। অমরনাথ তাই ভাবিতেছেন,—

"যাহাকে অবলম্বন করিয়া আমি সংসারে সুখী হইতে চাহিতেছি, তাহাকে আবার প্রতারণা করিব?"

শিক্ষিত প্রথম প্রেমিকের এ ভাব বড়ই সুন্দর ও স্বাভাবিক। লেখক এ-সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত অবগত আছেন। ইহা সে ইতিহাসের সঙ্গে এত মিলিয়াছে যে, লেখক এ কথাটি পাঠকবর্গ-সমীপে না বলিয়াই থাকিতে পারিলেন না। ভরসা করি, এ সাক্ষ্য পাঠকবর্গ মাপ করিবেন।

অমরনাথ স্বীয় সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিলেন। রজনীর নিকট লবঙ্গের প্রণয়কাহিনী বিবৃত করিলেন। রজনী তাহা মনোযোগ দিয়া শুনিল। শুনিয়া কৃতজ্ঞচিত্তে সেও তাহার মনখানি অমরনাথকে খুলিয়া দেখাইল। কিন্তু অমরনাথ কি দেখিলেন?—দেখিলেন যে, তথায় অমরনাথ নাই—অন্য কে একজন অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। সে সময়ের কথা অমরনাথ এইরূপ বলিয়াছেন,—

"আমি তখনই, মিত্রদিগের গৃহে গেলাম।

যে প্রকারে লবঙ্গের সাক্ষাৎ পাইলাম, তাহা লিখিয়া ক্ষুদ্র বিষয়ে কালক্ষেপ করিব না। দেখিলাম, লবঙ্গলতা, ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইয়া, শচীন্দ্রের জন্য কাঁদিতেছে। যাইবামাত্র লবঙ্গলতা আমার গা জড়াইয়া আরও কাঁদিতে লাগিল; বলিল,—'ক্ষমা কর! অমরনাথ, ক্ষমা কর! তোমার উপর আমি এত অত্যাচার করিয়াছিলাম বলিয়া বিধাতা আমাকে দণ্ডিত করিতেছেন। আমার গর্ভজ পুত্রের অধিক প্রিয় পুত্র শচীন্দ্র বুঝি আমারই দোষে প্রাণ হারায়! আমি বিষ খাইয়া মরিব! আজি তোমার সম্মুখে বিষ খাইয়া মরিব!'

"আমার বুক ভাঙ্গিয়া গেল। রজনী কাঁদিতেছে, লবঙ্গ কাঁদিতেছে। ইহারা স্ত্রীলোক, চক্ষের জল ফেলে; আমার চক্ষের জল পড়িতেছিল না—কিন্তু রজনীর কথায় আমার হৃদয়ের ভিতর হইতে রোদনধ্বনি উঠিতেছিল। লবঙ্গ কাঁদিতেছে, রজনী কাঁদিতেছে, আমি কাঁদিতেছি—আর শচীন্দ্রের এই দশা! কে বলে সংসার সুখের? সংসার অন্ধকার!

"আপনার দুঃখ রাখিয়া আগে লবঙ্গের দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। লবঙ্গ তখন কাঁদিতে কাঁদিতে শচীন্দ্রের পীড়ার বৃত্তান্ত সমুদয় বলিল। সন্ন্যাসীর বিদ্যাপরীক্ষা হইতে রুগ্ন শয্যায় রজনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত লবঙ্গ সকল বলিল।

"তার পর রজনীর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। বলিলাম, রজনী সকল কথা বলিতে বলিয়াছে—বল। লবঙ্গ তখন, রজনীর কাছে যাহা যাহা শুনিয়াছিল, অকপটে সকল বলিল।

"রজনী শচীন্দ্রের, শচীন্দ্র রজনীর; মাঝখানে আমি কে?

"এবার বস্ত্রে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আমি ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।"

অমরনাথের এ আশাও ফুরাইল। পৃথিবীতে রমণী-প্রণয়ই যুবজনের প্রধান কাম্য বস্তু। অমরনাথ যে দুইটি রমণীকে ভালবাসিলেন, তাহার কাহারও সহিত তাঁহার মিলন ঘটিল না। এইরূপ অবস্থায় যাহা ঘটিবার, তাহাই ঘটিল। অমরনাথ প্রথমবারের ন্যায় এবারও ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। সংসার-সুখে জলাঞ্জলি দিলেন। সংসার তাহার নিকট অন্ধকার বোধ হইল। "রজনী শচীন্দ্রের, শচীন্দ্র রজনীর; মাঝখানে আমি কে?"—এই ধ্বনি তাঁহার অন্তরে বারম্বার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অমরনাথ সংসার ছাড়িলেন। যাহাকে ইংরাজীতে Eccentricity বলে, বৃদ্ধগণ বলিয়া থাকেন,—প্রণয়ীর তাহা অল্পাধিক পরিমাণে থাকিবেই। বিশেষতঃ যখন প্রণয়ে প্রতি-প্রণয় লাভ করিতে না পারে। বৃদ্ধগণের মতানুসারে অমরনাথ লবঙ্গের জন্য প্রথম যেরূপ উচ্ছ্বাস বা Eccentricity দেখাইয়াছিলেন, এবারও তাহাই দেখাইলেন। তা বুড়ারা যাহাই বলুন, আমরা ইহাকে Eccentricity বলিতে কিছু কুণ্ঠিত হই। তা' Eccentricityর জন্যই হউক, কি অন্য কারণেই হউক—অমরনাথ ভবের হাট হইতে দোকান-পাট উঠাইলেন। এস্থলে তিনি আমাদিগকে এইরূপ বলিয়াছেন,—

"এ ভবের হাট হইতে আমার দোকান-পাঠ উঠাইতে হইল। আমার অদৃষ্টে সুখ বিধাতা লিখেন নাই—পরের সুখ কাড়িয়া লইব কেন? শচীন্দ্রের রজনী শচীন্দ্রকে দিয়া আমি এ সংসার ত্যাগ করিব। এ হাট ভাঙ্গিব, এ হৃদয়কে শাসিত করিব—যিনি সুখদুঃখের অতীত, তাঁহারই চরণে সকল সমর্পণ করিব।

"প্রভো, তোমায় অনেক সন্ধান করিয়াছি, কই তুমি? দর্শনে, বিজ্ঞানে তুমি নাই। জ্ঞানীর জ্ঞানে, ধ্যানীর ধ্যানে তুমি নাই। তুমি অপ্রমেয়, এজন্য তোমার পক্ষে প্রমাণ নাই। এই স্ফুটিতোন্মুখ হৃদ্‌পদ্মই তোমার প্রমাণ—ইহাতে তুমি আবোহণ কর। আমি অঙ্ক পুষ্প-

নারীকে পরিত্যাগ করিয়া, তোমার ছায়া সেখানে স্থাপন করি।

"তুমি নাই? না থাক, তোমার নামে আমি সকল উৎসর্গ করিব। অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং তস্মৈ নমঃ বলিয়া, এ কলঙ্কলাঞ্ছিত দেহ উৎসর্গ করিব। তুমি যাহা দিয়াছ, তুমি কি তাহা লইবে না? তুমি লইবে, নহিলে এ কলঙ্কের ভার আর কে পবিত্র করিবে?

"প্রভো! আপনার কাছে একটা নিবেদন আছে। এ দেহ কলঙ্কিত করাইল কে, তুমি না আমি? আমি যে অসৎ, অসার, দোষ আমার না তোমার? আমার এ মনিহারি দোকান সাজাইল কে, তুমি না আমি? যাহা তুমি সাজাইয়াছ, তাহা তোমাকেই দিব। আমি এ ব্যবসা আর রাখিব না।

"সুখ! তোমাকে সর্ব্বত্র খুঁজিলাম—পাইলাম না। সুখ নাই, তবে আশায় কাজ কি? যে দেশে অগ্নি নাই, সে দেশে ইন্ধন আহরণ করিয়া কি হইবে? প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সব বিসর্জ্জন দিব।"

প্রণয় চরম সীমায় উপনীত হইল। অমরনাথ আবার সংসারবিরাগী হইলেন। কিন্তু এ সংসার-বিরাগ ও পূর্ব্বের সংসার-বিরাগে প্রভেদ বিস্তর। সেবারে বৈরাগ্যই বৈরাগ্যের চরম লক্ষ্য ছিল, অথবা বৈরাগ্যের কোন লক্ষ্যই ছিল না; কিন্তু এবারে ভগবান বৈরাগ্যের লক্ষ্য হইলেন। ধীরে ধীরে অমরনাথ ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিলেন।

এ আত্মসমর্পণ বড়ই সুন্দর ও স্বাভাবিক। অমরনাথের ন্যায় সংসারীর এই চরম স্তর। এ অবস্থায় পতিত হইলে, ঘোর নাস্তিকও বুঝি ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতে চাহে। কেন চাহে? প্রশ্ন গুরুতর, কিন্তু তবু উত্তর করা যায়। মানুষ প্রথম নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া বিবিধ উপায়ে সুখের অন্বেষণে বেড়াইয়া বেড়ায়—যখন তাহার সকল সুখাশা, বিধাতার নিয়মেই বল আর যে কারণেই বল, অমরনাথের ন্যায় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়—তখন সে শক্তিহীন হইয়া পড়ে। তখন আর নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিতে তাহার প্রবৃত্তি ও সাধ্য থাকে না। কিন্তু তবু তাহার সুখাশা যায় না। মানুষ চিরকালই সুখের সেবক—সুখের আশার সহিত তাহার জীবনের অবিচ্ছেদী সম্বন্ধ। তাই সে শক্তিহীন হইয়া সুখেচ্ছায় পরম শক্তিমানের সাহায্য গ্রহণ করে।

অমরনাথেরও তাহাই হইল। যে অমরনাথ পূর্ব্বে এক দিন সুখকে আপনার আয়ত্ত করিয়া রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, আজি সেই অমরনাথ নিজের শক্তিকে অবিশ্বাস করিয়া নিঃশঙ্কে জগদীশ্বর-চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। এরূপ নিজের শক্তিকে কয় জনে অবিশ্বাস করিতে পারে।

ভগবানও তাঁহাকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন। হায়—এহেন অমরনাথ আবার দুঃখী বলিয়া বিলাপ করে? এজগতে কে এমন আছে যে, তাহার এই চরম স্তরে উপনীত হইতে চাহে না?

এই আত্মসমর্পণের পরও কবি আমাদিগকে পুনরায় অমরনাথকে দেখাইয়াছেন।

সে স্থলটি পাঠকবর্গকে সম্পূর্ণ পড়িতে অনুরোধ করিয়া, আমরা তন্মধ্য হইতে কোন কোন কথা উদ্ধৃত করিলাম।

অমরনাথ কলিকাতা যাইতেছেন। যাইবার কালে লবঙ্গ আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল; বলিল,—

"তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা করিয়াছ কেন? তুমি নাকি কলিকাতা যাইতেছ?

অ।—যাইব।

ল।—কেন?

অ।—যাইব না কেন? আমাকে যাইতে বারণ করিবার ত কেহ নাই!

(এই কথা অমরনাথের কেবলমাত্র নৈরাশ্য-ব্যঞ্জকও নহে—ইহাতে তাঁহার লবঙ্গের মন জানিবার একটু অভিসন্ধিও আছে।)

ল।—যদি আমি বারণ করি?

অ।—আমি তোমার কে, যে বারণ করিবে! (অভিসন্ধি আরও পরিষ্কার।)

ল।—তুমি আমার কে? তা'ত জানি না। এ পৃথিবীতে তুমি আমার কেহ নও। কিন্তু যদি লোকান্তর থাকে——

অ।—যদি লোকান্তর থাকে তবে?——

(অমরনাথ একথায়ও সন্তুষ্ট নহেন। আরও পরিষ্কারভাবে কিছু বলা চাই। সহজে বিশ্বাস এখন অমরনাথের হওয়া অসম্ভব।)

ল।—আমি স্ত্রীলোক—সহজে দুর্ব্বলা। আমার কত বল, দেখিয়া তোমার কি হইবে? আমি ইহাই বলিতে পারি, আমি তোমার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।"

একথায় অমরনাথের পূর্ব্বকামনা আরও বর্দ্ধিত হইল। অমরনাথ বিচলিত হইলেন—কিছু উচ্ছ্বাসের সহিত অন্যান্য কথার পরে বলিলেন,—

"কিন্তু যদি তুমি কখন ইহার পরে শোন যে, অমরনাথ কুচরিত্র নহে; তবে তুমি আমার প্রতি একটু—অনুমাত্র স্নেহ করিবে?"

হরি-হরি! আবার সেই কামনা?

আর অধিক তুলিবার আবশ্যক নাই। ইহাতেই জানিতে পারা গেল,—লবঙ্গের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, অমরনাথের পূর্ব্বকামনা এখনও উপস্থিত হয়। অমরনাথ এখনও তাহা ভগবানে সমর্পণ করিতে পারেন নাই। প্রণয়ীর নিকট ইহা অত্যাজ্যও বটে। কিন্তু জ্ঞানীগণ বলিবেন,—অতি সহজে যদি বাসনা দূর করা যায়, তবে আর জগতে সংযমের আবশ্যক কি? অমরনাথ সাধনার পথে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন সত্য—প্রেমবৃত্তির বিকাশে ভগবানে তাঁহার আনুরক্তি জন্মিয়াছে সত্য, কিন্তু তখনও ভগবান অনেক দূরে। পাঠকগণ, কঠোরবাদী জ্ঞানীগণের একথা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন কি?

এই গেল লবঙ্গ-সম্বন্ধে। রজনী-সম্বন্ধে কি হইল, দেখা যাউক।

ইহার দুই বৎসর পরে অমরনাথ রজনীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রজনীর তখন চক্ষু ফুটিয়াছে। তাহার একটি পুত্র সন্তানও জন্মিয়াছে। সেইটি দেখিয়া অমরনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কে এটি?"

শচীন্দ্র।—আমার ছেলে।

অমর।—ইহার নাম কি রাখিয়াছেন?

শচী।—অমরপ্রসাদ।

অমরনাথ আর সেখানে না দাঁড়াইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। কেন প্রস্থান করিলেন? ঐ নামের সঙ্গে তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি জাগরূক হইল। রজনীকে মনে পড়িল—শচীন্দ্রকে রজনীদানের কথা মনে পড়িল। অমরনাথ সবে এখন সন্ন্যাসী হইয়াছেন। সে স্মৃতি ভুলিতে বা তাহা আয়ত্তাধীন করিতে পারেন নাই।

এক্ষণে উপসংহারে আর কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক।

শিক্ষিতের মার্জ্জিত ভালবাসার একদিক—শিক্ষিতের নিরাশ-প্রণয়ই অমরনাথ-চরিত্রের জীবন-স্বরূপ।

এতৎ সম্বন্ধে আমাদিগকে "আয়েষা" শীর্ষক প্রবন্ধ-লিখিত কতকাংশ উদ্ধৃত করিতে হইল। কথাগুলি প্রথমে অপ্রাসঙ্গিক বলিয়াই বোধ হইতে পারে। কিন্তু পাঠকগণ একটু ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিলে শেষে ইহার প্রাসঙ্গিকতা বুঝিতে পারিবেন। এক কথা একবার লিখিলে, পুনরায় আর তাহা লিখিতে ইচ্ছা হয় না। তাই অংশটি উদ্ধৃত করিলাম,—

"ভালবাসিয়া ভালবাসা পায় নাই, এরূপ লোক জগতে সংখ্যাতীত। আমরা যাহাকে চলিত কথায় নিরাশ-প্রণয় বলি, সে প্রণয়ের

ফল পৃথিবীর অনেক লোকেই আস্বাদন করিয়াছেন। কেহ বা বাল্যকালে কোন বাল্যসখার নিকট, কেহ বা কৈশোরে কোন কিশোরীর নিকট, কেহ বা যৌবনে কোন ভাবিনীর নিকট, অধিক কি প্রৌঢ়-বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই, অল্পাধিক পরিমাণে এ প্রণয়ে ভুক্তভোগী হইয়াছেন। সকলেই অবগত আছেন,—সুবর্ণের কষ্টি-পাথরের ন্যায় প্রণয়েরও ইহা প্রথম পরীক্ষা—এইখান হইতেই বিভিন্ন শ্রেণীর প্রণয় বিভিন্ন পথে ধাবিত হইতে থাকে। এই শঙ্কটে পড়িয়াই কেহ বা অপ্রাপণীয় প্রণয়পাত্রকে সম্যক বিস্মৃত হইয়া প্রাপণীয় প্রণয়পাত্রে মনোনিবেশ করেন; কেহ বা দুর্জ্জয় অভিমান ও ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া অন্য-প্রণয়লোলুপ সেই প্রণয়পাত্রকে নির্য্যাতন করিতে অভিলাষী ও সচেষ্ট হয়েন; কেহ বা প্রতিদানে ভালবাসা না পাইয়া চক্ষের জলে সে ভালবাসার কলঙ্কিত অংশ প্রক্ষালন করিয়া স্বর্গীয় আনন্দে তাহার পুষ্টিসাধন করেন; আর কেহ বা প্রকৃত প্রণয় দেখাইতে পারিলে, অবশ্যই একদিন না একদিন অদ্যকার এই বিরূপ প্রণয়ীর ভালবাসা প্রাপ্ত হইবেন এই আকাঙ্ক্ষায় প্রণয়কে স্বার্থমুক্ত ও নিষ্কাম প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করেন। কত আর লিখিব—যেরূপ মনুষ্য অসংখ্য—বোধ হয় প্রণয়ের শ্রেণীও সেইরূপই অনন্ত। তবে সচরাচর আমাদিগের যাহা চক্ষে পড়ে, তাহাই লিখিলাম।

"যাহাকে আমরা নিরাশ-প্রণয় বলিয়া অভিহিত করি, বাস্তবিক তাহা "নিরাশ" সংজ্ঞা পাইবার যোগ্য কি না, তদ্বিষয়ে আমাদের ঘোর সন্দেহ আছে। একেবারে মিলনের আশা—কি ঐহিক, কি পারত্রিক কোন কালেই কোন প্রকারেরই মিলনের আশা না থাকিলে সে প্রণয় স্থায়ী থাকিতে পারে, এরূপ সংস্কার এখনও আমরা সুদৃঢ় করিতে পারি নাই। পূর্ব্বোক্ত প্রণয়ীর কার্য্যকলাপ স্থূল দৃষ্টিতে দেখিলে, তাহা একেবারেই কামনা-শূন্য বলিয়া অনেক স্থলেই অনুমান হয় সত্য; কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিলে যেন সেই অন্তরের ভিতর বিলক্ষণ একটি কামনা দেখিতে পাওয়া যায়। সে কথা বুঝাইতে অনেক লিখিতে হয়—তাহা লিখিবার স্থল এ নহে। নাই হউক, কিছু না লিখিয়াও থাকিতে পারিলাম না। এরূপ সুযোগ ছাড়িতে নাই।

"আমরা জানি, অনেক নিরাশ-প্রণয়ীর নিষ্কাম-অভিহিত কার্য্যে প্রণয়-পাত্রকে বলিয়া থাকে,—"দেখ দেখ, আমার এই প্রণয় কেমন উচ্চ, কেমন পবিত্র, কেমন প্রগাঢ়—এই প্রণয় তুমি তুচ্ছ করিয়াছ।" যেরূপ কার্য্যের কথা বলিলাম, বাস্তবিকই সে কার্য্য সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে—সেরূপ পূর্ণ স্বার্থত্যাগ, কষ্টস্বীকার প্রায় এই শ্রেণীর প্রণয়ীগণই করিতে সক্ষম। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়—তাহা ত প্রদর্শনের জন্য—যাহার "জন্য" সহজে বলিতে পারি, তাহাকে নিষ্কাম বলিতে পারি কিরূপে?

"নিষ্কাম ভালবাসা আছে, স্বীকার করি। কিন্তু একবার যাহার ভালবাসার মূলে কামনা ছিল—প্রতিদানের আশা ছিল—তাহার প্রণয় প্রতিদান না পাইয়া নিষ্কাম ও স্থায়ী থাকিতে পারে, এরূপ বিশ্বাস আমাদের নাই। এরূপ ভালবাসা সম্যক পুষ্ট হয়, তাহাও স্বীকার করি; এরূপ ভালবাসায় জগতের অসাধ্য ব্যাপারও সাধন করিতে পারে, তাহাও স্বীকার করি; কিন্তু সে ভালবাসা যে সম্যক আশা-শূন্য ও কামনা-শূন্য হইয়া স্থায়ী থাকিতে পারে, এরূপ স্বীকার করি না। বিরহেই প্রণয়ের পুষ্টি বটে, কিন্তু কোন প্রকারের মিলনাশা-শূন্য চিরবিরহ বুঝি প্রণয়ের বিনাশই সাধন করে।

"নিরাশ-প্রণয় যাহার পরীক্ষাস্থল উত্তীর্ণ হইয়াও বর্ত্তমান থাকে, তাহার হৃদয় সেই প্রণয়ে পরিপ্লুত হইয়া যায়। থাকুক তাহাতে কামনা, থাকুক তাহাতে মিলনেচ্ছা, থাকুক তাহাতে

প্রদানাভিলাষ—সে প্রণয় তিল হইতে তাল হইবেই—সে প্রণয় ছায়া-দানে প্রণয়ীকে শীতল করিবেই। সে প্রণয়ীর চক্ষের জলে মন্দাকিনী-প্রবাহ—দীর্ঘশ্বাসে স্বর্গীয় সৌরভ—অরুদ্ধ মর্ম্ম-বেদনায় অনির্ব্বচনীয় সুখ লুক্কায়িত থাকিবে।"

এখন অমরনাথের চরিত্র পরীক্ষা করিয়া ইহার সত্যাসত্য নিদ্ধারণ করা যাউক। অমরনাথের জীবনীকে পাঁচভাগে বিভক্ত করা যায়। নিম্নে সেই ভাগগুলি ও তৎসময়ের কার্য্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

প্রথম ভাগ—লবঙ্গের সহিত বাল্যপ্রণয় সঞ্চারের কারণ—তাহার বিকাশ; লবঙ্গের সহিত বিবাহের সম্বন্ধে মিলনাশায় তাহার পরিবৃদ্ধি—বিবাহের ভঙ্গে সে মিলনে নৈরাশ্য। মিলন-আশা-বিরহিত হইয়া অমরনাথের কার্য্য।

দ্বিতীয় ভাগ—অমরনাথের লক্ষ্যবিহীন অবস্থায় সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ—তাহাতে মানসিক অশান্তি ও কষ্টভোগ। প্রকৃতির শাসনে তাঁহার কার্য্য-অন্বেষণ—কার্য্য-প্রাপ্তি।

তৃতীয় ভাগ—কার্য্য-সাধনে চেষ্টা ও সফলতা। তৎসঙ্গে রজনীর প্রতি আসক্তির সঞ্চার ও বিবিধ কারণে তাহার বিকাশ। রজনীর সহিত তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ-স্থির। অমরনাথের পুনঃ সুখেচ্ছার প্রাবল্য।

চতুর্থ ভাগ—রজনীর প্রণয়-প্রাপ্তিতে নৈরাশ্য। পুনঃ সংসারে বীতরাগ হইয়া ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ। রজনী-ত্যাগ—বিষয়-ত্যাগ—সর্ব্বস্ব ত্যাগ।

পঞ্চম ভাগ—জীবনের উপসংহার। তাঁহার লবঙ্গ-রজনীর প্রতি আসক্তির পরিণাম ইত্যাদি।

ইহার মধ্যে প্রথম ভাগের কথা-সম্বন্ধে আমাদের বলিবার কথা অতি অল্পই আছে। গ্রন্থকারও ইহা উপক্রমণিকা-ভাবেই লিখিয়া গিয়াছেন। মূল গ্রন্থারম্ভ অমরনাথের জীবনের দ্বিতীয় ভাগ হইতে। চলিত কথায়—অমরনাথের লবঙ্গ-মিলন-নৈরাশ্য হইতে।

এতাগে আমরা দেখিলাম,—অমরনাথ লবঙ্গকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন; লবঙ্গ কিন্তু সে ভালবাসা ফিরাইয়া দেন নাই। এইখানেই অমরনাথের প্রণয়ের পরীক্ষা আরম্ভ হইল। অমরনাথ কি করিলেন? আমাদের পূর্ব্ব-বর্ণিত পন্থাগুলির মধ্যে কোন পন্থা অবলম্বন করিলেন,—না, তিনি শিক্ষিত প্রেমিকের ন্যায় তাঁহার প্রণয়ের কলঙ্কিত অংশ চক্ষের জলে ধৌত করিয়া তাহা নির্ম্মলভাবে পরিপুষ্ট করিতে চেষ্টা করিলেন? কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—কোন প্রকারের মিলনাশা-বিবাহিত প্রণয় দীর্ঘকাল স্থায়ী থাকিতে পারে না। তাই যে পরিমাণে অমরনাথের হৃদয়ে মিলনাশা—কি শারীরিক, কি মানসিক, কি ঐহিক, কি পারত্রিক—মিলনাশা অন্তর্হিত হইতে লাগিল, সেই পরিমাণে লবঙ্গলতা হৃদয়মধ্যে সঙ্কুচিতা হইতে লাগিলেন। যেরূপ মিলনাশা—সেইরূপই প্রণয়ের প্রাবল্য। এই সময়ে অমরনাথের কিরূপ মিলনাশা ছিল, একথা পাঠকবর্গ জানিতে চাহেন কি? অমরনাথ তখনও লবঙ্গের ভালবাসাটা পাইবেন, এ আশা ছাড়েন নাই। বিবাহ নাই বা হউক, মুখে যদি লবঙ্গ একবার তৎপ্রতি প্রণয়ের কথা বলে—কার্য্যে যদি তাহা কিঞ্চিৎমাত্রও প্রকাশিত হয়—অমরনাথ চরিতার্থ হইয়া যান। এই আশা—ইহাকে যাহাই বল, এই আশাই লবঙ্গলতাকে অমরনাথের হৃদয়-মধ্যে সঞ্জীবিত রাখিয়াছিল। কালক্রমে যেমন এই আশা তজ্জন্য চেষ্টাভাবে সঙ্কুচিত হইতে লাগিল, কালক্রমে সেইরূপই লবঙ্গলতা হৃদয়ের অন্ন হইতে অন্নতর স্থান অধিকার করিতে লাগিলেন। বাকী স্থান যত শূন্য হইতে লাগিল, ততই অন্য কার্য্যের জন্য তাঁহার

ঐকান্তিক ব্যগ্রতা জন্মিতে লাগিল। ইহা প্রকৃতিরই নিয়ম।

অমরনাথের সংসার-ত্যাগে আমরা আমাদিগের পূর্ব্ববর্ণিত একটী অনন্যসাধ্য কার্য্য দেখিলাম। তুমি আমি কি এইরূপ সংসারের অন্য সুখ ত্যাগ করিতে পারি? ইহা প্রণয়েরই উগ্রতা বা Eccentricity নিবন্ধন। ইহা শিক্ষিত প্রেমিকের প্রথম প্রেমোচ্ছ্বাস জন্য।

তা'র পরে অমরের জীবনের তৃতীয় ভাগের প্রথমে তাঁহাকে আমরা কার্য্যে লিপ্ত দেখিতে পাই। এই কার্য্য করিতে করিতে আবার রজনীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। রজনীর রূপে, রজনীর গুণে তিনি মুগ্ধ হইলেন। ইহাও স্বাভাবিক। একথা আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি।

রজনীর প্রতি ভালবাসা-সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কার্য্যও বাড়িতে লাগিল। রজনী তখনও অবিবাহিতা। রজনীর মিলনেচ্ছায় অমরনাথ ঘোর সংসারী হইয়া পড়িলেন।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, তখন লবঙ্গ কোথায়? লবঙ্গ তখনও অমরনাথের হৃদয়-মধ্যে। একথাও আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। লবঙ্গকে দেখিবামাত্র যাই অমরনাথের তৎসহিত আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত মিলনাশা সঞ্চার হইতে লাগিল, অমনি লবঙ্গ হৃদয়ে প্রসারিত হইয়া পড়িল। আবার যখন সে আশা ক্ষীণ হইল, লবঙ্গও ক্ষীণ হইল। রজনীর আশা তখন মিলিতায়তন—রজনী তখন হৃদয়ের অধিকাংশ স্থান অধিকার করিল।

চতুর্থ ভাগে—রজনীর প্রণয়েও নৈরাশ্য উপস্থিত হইল। একবার, দুইবার—আর অমরনাথের সংসার ভাল লাগিল না। তিনি ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিলেন। বিষয়াদি পরিত্যাগ করিলেন—রজনী শচীন্দ্রকে প্রদান করিলেন। এ সমস্তই শিক্ষিত প্রণয়ীর অনন্যসাধ্য কার্য্য।

পঞ্চম ভাগে—অমরনাথের চিত্তের শেষাবস্থা দেখিলাম। কি দেখিলাম? দেখিলাম যে, তখনও লবঙ্গলতার প্রণয় পাইবার আশা বিদূরিত হয় নাই—দেখিলাম যে, তখনও রজনী পূর্ব্বস্মৃতি উদ্রিক্ত করিতে সক্ষম। ইহাতে বুঝিলাম কি? বুঝিলাম যে, একেবারে আশা-পরিত্যাগ—মানুষের সহজ ব্যাপার নহে। প্রণয়ে নিরাশ হইলাম বলিয়া ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিলেই কিছু বাসনা সহজে বিদূরিত করা যায় না। তাহাতে আরও শিক্ষা, দীক্ষা, সংযম আবশ্যক। আর দেখিলাম,—সংসারের প্রলোভনের ভয়ানকত্ব। পরিশেষে আমরা আমাদের পূর্ব্ব-লিখিত কথাটি স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইলাম। দেখিতে পাইলাম, অমরনাথের প্রণয় নিরাশ-প্রণয় হউক, তাহা সুখেই পরিপূর্ণ।

এই অমরনাথের চরিত্র দেখিয়া আমরা শিখিলাম কি? এই শিখিলাম যে, ভালবাসা কখন বিফল হয় না। ভালবাসার পরিণাম সুখ—দুঃখ নহে। শিখিলাম যে, এই প্রণয়বৃত্তির বিকাশে ভগবানে আনুরক্তি জন্মে—শিখিলাম, সকাম ভালবাসা পরিণামে নিষ্কাম প্রণয়ে পরিণত হয়।

তবে যাও অমরনাথ—প্রতাপের ন্যায় অমরধামেই গমন কর। তোমার ভালবাসায় জ্ঞানীগণ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে কামনা দেখুন; তোমার আত্মসমর্পণে জ্ঞানীগণ ভগবানে স্থিরাশক্তির স্থায়ীত্ব সন্দেহ করুণ। আমরা ক্ষুদ্র জীবি—তোমার পায়ে শত শত, সহস্র সহস্র নমস্কার! তুমি প্রণয়-বীর—তুমি ধার্ম্মিক, তুমি শিক্ষিত—জগতে আমরা একথা চিরদিন বলিব। যাও, তবে অমর—তুমি এ জগতে অমরত্ব লাভ করিয়া অনন্তধামে অমরপদ লাভ করিতে যাও।

ঠগী-কাহিনী।

(ঠগের নিজের মুখে শুনিয়া)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

Duke.—I am sorry for thee; thou art come to answer,
A stormy adversary, an inhuman wretch,
Incapable of pity, void and empty,
From any show of mercy.
MERCHANT OF VENICE.

"পরদিবস পুনরায় সকলে আসিয়া সেই স্থানে উপনীত হইলেন। পূর্ব্ব-দিবসের ন্যায় সমস্ত ঠগ-সর্দ্দারগণ স্বদলবলে সেই স্থানে আসিয়া উপনীত হইলে, সেই স্থানের এক অনির্ব্বচনীয় শোভা দৃষ্ট হইতে লাগিল। বীর-পদভরে কনক লঙ্কা যেমন এক দিন টলমল করিয়াছিল, আজও শিবপুর সেইরূপ ঠগ-পদ-ভরে কাঁপিতে লাগিল।

"ঠগ-মণ্ডলী নানা স্থান হইতে আগমন করিয়া যে কারণে এই স্থানে সমবেত হইয়াছিল, সেই সকল কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, পিতা পুনরায় আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"পুত্র, কল্য ভগবানের কৃপায় তুমি ঠগ-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছ, ও আমাদিগের আবশ্যকীয় কর্ত্তব্য কার্য্যের অনেক প্রকার আভাস ও উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছ। কিন্তু একটী প্রধান কথা তোমাকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। আমাদিগের প্রধান ধর্ম্মই যখন প্রাণীহত্যা করা, তখন আপন-আপন মনকে ধর্ম্ম-রজ্জু দ্বারা যে কিরূপ দৃঢ়-বন্ধনে বাঁধিতে হইবে, তাহা তুমি এখন বিশেষ বুঝিতে পারিতেছ না। কিন্তু ক্রমে পারিবে ও দেখিবে, কিরূপ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া মনের গতিরোধ করিতে হয়। প্রাণী-হত্যাই আমাদিগের ধর্ম্ম সত্য; কিন্তু সাবধান, সকল প্রাণীকে যেন হত্যা করিও না। রজক, ভাট, শিখ, নানক-সাহী, মাদারী ফকির, গায়ক, নৃত্যকারী, ভুঞ্জি, তেলি, লোহার, বারুই এবং কুষ্ঠব্যাধি গ্রস্ত ব্যক্তিকে কখনও হত্যা করিও না। ইহাদিগকে হত্যা করিলে ভবানীর অনভিপ্রেত কার্য্য হইবে; ঈশ্বরী অপ্রসন্ন হইলে আমাদিগের বিপদের আর কিছুই অবধি থাকিবে না। এই কয়েক জাতি ও ব্যাধিগ্রস্ত লোক ভিন্ন, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে হত্যা করিতে নিষেধ নাই। পুত্র, তুমি এখন ঠগ হইয়াছ, গুড় ভক্ষণ করিয়াছ; দেবীও তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছেন; তোমাকে বোধ হয় আর উপদেশ দেওয়ার প্রায়োজন হইবে না।'

'পিতার এই কথা শুনিয়া আমি কহিলাম,—পিতা, আমাকে আর কিছুই বলিতে হইবে না। আমি অকপটে আমার জীবন দান করিতে পারিব। কিন্তু ভবানীর অননুমোদিত কোন কর্ম্ম করিয়া, দেহ ও মনকে কলুষিত করিব না। আমাকে আর অধিক কিছু বলিতে হইবে না।

"আমি এইরূপে ঠগধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তাহাদিগের দলবৃদ্ধি করিলাম। যে কেহ এই ধর্ম্মে নূতন দীক্ষিত হয়, সে প্রথমে সর্ব্ব-নীচে আপনার স্থান প্রাপ্ত হয়। কিন্তু পরিশেষে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, সাহসী, বলবান, ও বুদ্ধিমান হইয়া আপনার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিলে, ক্রমে ক্রমে তাহার পদবৃদ্ধি হইয়া কালক্রমে সে এক একটী দলের নেতৃত্ব-পদ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আমাকে সেইরূপে ঠগদলে প্রবিষ্ট হইতে হইল না। যে পদ প্রথমে কেহ কখনও পায় নাই, আমি সেই নেতৃত্ব-পদ একেবারে প্রাপ্ত হইয়া একটী দলের একজন প্রধান কর্ত্তা হইলাম।

"সেই সভার অন্যান্য আবশ্যকীয় কার্য্য সমাপনান্তে কোন্ কোন্ ব্যক্তি কোন্ কোন্ দিকে গমন করিয়া ভবানীর আজ্ঞা প্রতিপালন পূর্ব্বক আপন-আপন ঠগ-ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন, ও আপন আপন পরিবারবর্গের নিমিত্ত সমস্ত বৎসরের আহারাদির সংস্থান করিবেন, তাহাই স্থির হইতে লাগিল।

"হোসেন ও অন্য আর একজন সর্দ্দার এবং অধিক সংখ্যক ঠগ-সমভিব্যবহারে পিতা 'ডুক্কণের' রাজবর্ত্ম দিয়া নাগপুর অভিমুখে গমন করিবেন, স্থির করিলেন; এবং ইহাও স্থিরীকৃত হইল যে, নাগপুর হইতে ক্রমে তিনি হায়দ্রাবাদ গমন করিবেন। আর এক দল আরাঙ্গাবাদ, খান্দেশ, বুরহানপুর ও ইন্দোর হইয়া পুনরায় শিবপুর প্রত্যাগমন করিবে। অন্য আর এক দল আরাঙ্গাবাদ হইয়া পুনা পর্য্যন্ত গমন করিবে। চতুর্থ দল হিন্দুস্থানের দিকে গমন করিয়া বেনারশ পর্য্যন্ত যাইবে, ও পরিশেষে সাগর ও নর্ম্মদা-প্রদেশীয় প্রদেশ-সকল অতিক্রম পূর্ব্বক প্রত্যাগমন করিবে। এইরূপে এক বৎসর অতিক্রম হইলে পর, পর-বৎসর দশহারার সময় পুনরায় সকলে আসিয়া এই শিবপুরে উপনীত হইবে।

"এইরূপ স্থিরীকৃত হইলে আমরা সেই স্থান হইতে বহির্গত হইলাম। আমার পিতার অধীনে এখন তিন জন সর্দ্দার; আমি, হোসেন ও গৌস খাঁ। আমার অধীনে ৬০ জন, হোসেনের অধীনে ৪৫ জন ও গৌস খাঁর অধীনে ৩০ জন—মোট ১৩৫ জন লোক সমভিব্যবহারে আমরা চলিতে লাগিলাম।

"আমরা কয়েক দিবস চলিয়া গণেশপুর গ্রামে উপনীত হইলাম। গ্রামের বহির্ভাগে একটী প্রকাণ্ড আম্রবৃক্ষের নীচে আমাদিগের ছোট ছোট শিবির-সকল সন্নিবেশিত হইল। আমরা সকলে উপাহৃত-মত আহারাদি করিয়া সেই স্থানে বিশ্রাম করিতে লাগিলাম।

"আমাদিগের দল হইতে কেবল বৈদ্যনাথ নামীয় একজন ব্রাহ্মণ ও গোপাল নামীয় একজন শূদ্র বহির্গত হইয়া গ্রামের ভিতর গমন করিল। তাহাদিগের গ্রামের ভিতর গমন করিবার প্রধান কারণ এই যে,—যদি কোন ধনশালী পথিকের সর্ব্বনাশ-সাধন করিতে পারে বা যদি কোন প্রকারে তাহাদিগকে ভুলাইয়া আনিয়া আপন-আপন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে সমর্থ হয়।

"সমস্ত দিন অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যার সময় যখন তাহারা প্রত্যাগমন করিল, তখন পিতা বিশেষ আগ্রহের সহিত তাহাদিগের নিকট তাহাদিগের সমস্ত দিবসের কার্য্যের বিবরণ শুনিতে লাগিলেন।

বৈদ্যনাথ কহিল যে, সে অদ্য সমস্ত দিবস বাজারে বাজারে ভ্রমণ-পূর্ব্বক প্রথমে কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় দেখিল, একটী বেনিয়ার দোকানে একজন ভদ্র-বেশী বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া, সেই বেনিয়ার সহিত কলহ করিতেছেন। বৈদ্যনাথ সে সুযোগ পরিত্যাগ না করিয়া সেই স্থানে গিয়া উপনীত হইল। বৃদ্ধ তাহাকে দেখিয়া তাহাকে সাক্ষ্য মান্য করিলেন, ও বেনিয়া তাঁহাকে যেরূপে প্রবঞ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহাও তাহাকে আনুপূর্ব্বিক বুঝাইয়া দিলেন; এবং নিতান্ত বিনীতভাবে বৈদ্যনাথকে কহিলেন,—তিনি কোতোয়ালের নিকট বেনিয়ার নামে নালিশ করিবেন ও বৈদ্যনাথকে সাক্ষ্য মান্য করিবেন। বৈদ্যনাথ তাহাতেই সম্মত হইল, ও পরিশেষে সেই বেনিয়াকে ভয় দেখাইল। বেনিয়া তাহাতে অতিশয় ভীত হইয়া বৃদ্ধের হাতে-পায় ধরিয়া বৃদ্ধকে সন্তুষ্ট করিল। বৈদ্যনাথের ব্যবহার দেখিয়া বৃদ্ধ অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, ও উভয়ে সেই স্থান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে কথা-প্রসঙ্গে বৈদ্যনাথ জানিয়া লইল যে, এই বৃদ্ধ একজন পারশ্য-দেশীয় মুন্সী; তিনি নাগপুরের রাজার নিকট চাকরি করিয়া থাকেন, এবং সেই স্থানে গমন করিতেছেন।

"এই কথা অবগত হইয়া তখন বৈদ্যনাথ সেই বৃদ্ধের সহিত নানারূপ গল্প আরম্ভ করিল। এই গণেশপুর গ্রাম যে কেবল দস্যু, তস্কর-ও ঠগের দ্বারায় পরিপূর্ণ, তাহা তাঁহার

মস্তকে উত্তমরূপে প্রবেশ করাইয়া দিল; এবং কহিল,—'আমরা যদিও অনেকে একত্রে দুক্ষণ-গ্রামে গমন করিতেছি, তথাপি আমরা সাহস করিয়া এই গ্রামের ভিতর আমাদিগের বিশ্রাম-স্থান স্থির করিতে পারি নাই। গ্রামের বাহিরে শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছি ও শীঘ্রই সকলে দুক্ষণে গমন করিব।'

"বৈদ্যনাথের এই কথা শুনিয়া সেই বৃদ্ধ গলিয়া গেলেন। রাস্তায় গমন করিবার সময় উপযুক্ত সঙ্গী প্রাপ্ত হইয়াছেন ভাবিয়া, আনন্দিত হইলেন। বিপদের আশঙ্কা মন হইতে দূরীভূত করিয়া, সমস্ত দ্রব্যাদির সহিত আসিয়া, বৈদ্যনাথের দলের সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বৈদ্যনাথও ইহাই তো চাহে! কাজেই বৃদ্ধের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, তাঁহার সমস্ত দ্রব্যাদির সহিত তাঁহাকে আনিবার নিমিত্ত গোপালকে রাখিয়া দিয়া, নিজে তখন চলিয়া আসিল।

"বৈদ্যনাথের এই কথা শুনিয়া পিতা অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন ও কহিলেন,—'বৈদ্যনাথের কথার ভাবে বোধ হইতেছে, এই লোকটী ধনশালী। সে যদি নিজেই গোপালের সহিত আসিয়া আমাদিগের দলের ভিতর প্রবেশ করে, তাহা হইলে তো আর কোন কথাই নাই; তাহার নিকট প্রাপ্ত অর্থের দ্বারাই আমরা বিনা-ক্লেশে নাগপুর পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিব। আর যদি সে নাই আইসে, তাহা হইলে আমরা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া রাস্তার ভিতরই তাহাকে আক্রমণ-পূর্ব্বক আমাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব।

"এইরূপ কথা-বার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় গোপালের সহিত সেই বৃদ্ধ আসিয়া উপনীত হইলেন। বৃদ্ধ একাকী নহেন; তাঁহার নানা প্রকার দ্রব্যাদি ব্যতীত একখানি শকট অতি উত্তমরূপে আবৃত। তাহার ভিতর তাঁহার স্ত্রী, আর তাঁহার সহিত সুকান্তি-সম্পন্ন একটী সুকুমার বালক। বালকের যেমন সুবর্ণ-সদৃশ বর্ণ, তেমনি সুচারু গঠন—তাহার সজল নীল চক্ষু দুইটী যেন সততই সকলের নয়নকে আকর্ষণ করিতেছে। তাঁহারা আসিয়া আমার পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। পিতাও অতিশয় যত্নের সহিত তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিয়া একটী শিবিরের ভিতর তাঁহাদিগের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

"ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। এক স্থানে একখানি সুরঞ্জিত কারপেট বিস্তৃত হইল। এক এক করিয়া সকলে সেই স্থানে আসিয়া উপবেশন-পূর্ব্বক নানা-প্রকার হাসি, ঠাট্টা ও গল্প-গুজব করিতে লাগিল। পিতাও আসিয়া সেই স্থানে উপবেশন করিলেন; আমিও তাঁহার সহিত আসিলাম। সেই বৃদ্ধের নিকট ক্রমে এই সংবাদ পৌঁছিল। তিনিও সেই পুত্রটির সহিত আসিয়া সেই স্থানে উপবেশন করিলেন। আমি সকলের ষড়যন্ত্র বুঝিলাম। সেই বৃদ্ধ ও বালকের পশ্চাৎভাগে ক্রমে ক্রমে এক এক জন রুমাল হস্তে করিয়া বসিল, দেখিলাম। আমি যদিও ঠগ, যদিও ঠগের সমস্ত কার্য্য করিতে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ সত্য, তথাপি সেই বালকের মুখের দিকে তাকাইতে আমার বিশেষ কষ্ট হইতে লাগিল; চক্ষু দিয়া দরদরবেগে জল আসিতে লাগিল।

পিতা যখন বুঝিতে পারিলেন যে, সমস্তই ঠিক হইয়াছে, তখন হঠাৎ "তাম্বাকু লে-আও" এইরূপ একটি শব্দ করিলেন। ইহা ঠগদিগের একটী সাঙ্কেতিক শব্দ। এই শব্দটী উচ্চারিত হইবামাত্র, অমনি বৃদ্ধ ও বালকের গলায় পশ্চাৎদিক হইতে একেবারে রুমাল আসিয়া তাহাদিগের গলা বেষ্টন করিল। আমি কিন্তু সে দৃশ্য আর দেখিতে পারিলাম না। ক্ষণকালের নিমিত্ত চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলাম। ক্ষণকালের নিমিত্ত চেতনা হারাইলাম। যাই-

হোক, পরক্ষণেই দেখিলাম. বৃদ্ধ ও বালকের দেহ সেই স্থানে পড়িয়া আছে। উহাদিগের চক্ষুর উপর আমার চক্ষু পড়িল। কিন্তু আমি আমার নয়নযুগলকে স্থির রাখিতে পারিলাম না। দুই হস্তে আপন চক্ষু আবৃত করিয়া সেই স্থান হইতে উঠিলাম। দুই এক পদ পশ্চাৎপদ হইতে না হইতেই পিতা আমার ভাব বুঝিলেন; এবং আমাকে ডাকিয়া সেই স্থানে বসাইলেন। কাজেই আমি সেইখানে উপবেশন করিলাম; সেই বালকের মুখের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে কত যত্ন করিলাম। কিন্তু কিছুতেই তাহা পারিলাম না। সেই বালকের মুখের ভাব এখনও আমার হৃদয়পটে সেইরূপভাবেই অঙ্কিত আছে।

অপূর্ব্ব পুরস্কার!

শ্রীমান নিকুঞ্জভূষণ আজ বড়ই চিন্তিত। আজ আর বুঝি তাঁহার মানরক্ষা হয় না! গোলাপসুন্দরী বলিয়াছেন,—"আজ টাকা না লইয়া আমার এখানে এসো না—আসিলে অপমান হইবে।" সুতরাং শ্রীমান প্রাতঃকাল হইতেই গালে হাত দিয়া ভাবিতেছেন,—"কি করি! এত করিয়াও, গোলাপকে হাতে রাখিতে পারিলাম না! শেষে সামান্য কয়টি টাকার জন্য গোলাপকে হাত-ছাড়া করিতে হইল! এ ক্ষোভ—এ যন্ত্রণা মরিলেও তো যায় না!"

শ্রীমান নিকুঞ্জভূষণ গোলাপের জন্য সর্ব্বস্ব খোয়াইয়াছেন। আজ তিন চারি বৎসরের মধ্যে, তাঁহার অতুল পিতৃ-সম্পত্তি যেন হাওয়ায় উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। সহরের সুন্দর ত্রিতল বাটীটি বিক্রয় হইয়া গিয়াছে; দেশের ভিটামাটী, সমস্ত মহাজনের নিকট বন্ধক—সুদে সুদে তাহাও বিক্রয়ের দশায় পড়িয়াছে। গৃহের পৈত্রিক আস্‌বাব্—তৈজস পত্রাদিও যাহা কিছু ছিল, তাহাও ক্রমে ক্রমে এক এক খানি করিয়া এখন গোলাপের গৃহশোভা বর্দ্ধিত করিতেছে। এক কথায় তাঁহার হস্তে এখন আর একটী কপর্দ্দকও নাই। নিজের এমন পৈত্রিক অট্টালিকা যাইয়া, থাকিবার স্থান এখন তাঁহার সেই গোলাপসুন্দরীর বাটীতে মাত্র। তাও সেখানেও আবার এক দিন ভাগে, দুইদিন বা ঠিকা! বিশেষতঃ আজ তিন চারি দিন হইতে গোলাপ বড়ই চটিয়াছে; আর পয়সা নহিলে চলিবে না—বলিয়া, পয়সার চেষ্টায় তাঁহাকে বাহিরে পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছে!

শ্রীমানও পয়সার চেষ্টায় ফিরিতেছেন! কিন্তু পয়সা কি আর গাছে ফলে? বিষয়াদির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হওয়ার পর, তিনি দুই এক মাসও গোলাপের মন যোগাইতে পারিয়াছিলেন। কারণ, যতক্ষণ তাঁহার বিধবা মাতার হস্তে একটী কপর্দ্দকও ছিল, ততক্ষণও তাঁহার ভাবনা হয় নাই। কখনও কৌশল খাটাইয়া, কখনও বা ভয় দেখাইয়া, শেষে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা করিয়াও, তিনি মাতার হাত-শূন্য করিতে পারিয়াছিলেন। তার পরও দিন-কতক তাঁহার পরিবারের গহনায় চলিয়াছিল। সে অভাগিনী—আহা সে অভাগিনী হিন্দুকুলের কুলনারী, পতি ভিন্ন অন্য কাহাকে সে ভ্রমেও কখনও ভাবিতে জানিত না—শ্রীমান তাহাকে নির্য্যাতন করিয়া, এক এক দিন প্রহার পর্য্যন্ত দিয়াও, তাহার নিকট হইতে গহনাপত্র সর্ব্বস্ব কাড়িয়া আনিয়া, গোলাপের চরণে তাহা অঞ্জলিস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন তো আর সেরূপ কোন উপায়ই নাই? বৃদ্ধ মাতাকে এখন তাঁহার মাতুলগণ লইয়া গিয়াছেন; আর পত্নীও শ্বশুরালয়ে প্রতিপালিতা হইতেছেন। সেখানে যাইবার বা তাঁহাদের দেখিবার মুখ কোথায়? সুতরাং গোলাপকে তুষ্ট করিবার কোন উপায়ই এখন আর তাঁহার নাই!

কাজেই তিনি প্রাতঃকালে মুখ মুছিতে মুছিতে গোলাপের বাড়ীর বাহিরে আসিয়াই, রাস্তায় দাঁড়াইয়া ভাবিতেছেন,—"তবে কি করি!"

শ্রীমান নিকুঞ্জভূষণ যখন গোলাপের বাড়ীর সম্মুখস্থ রাস্তায় দাঁড়াইয়া এইরূপ ভাবিতেছেন, ঠিক সেই সময়ই তাঁহার একটী পূর্ব্বতন বন্ধু সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। শ্রীমানকে দেখিয়া তিনি যেন বড়ই আপ্যায়িত হইলেন; এবং—"কিহে নিকুঞ্জ ভায়া, ভাল আছো তো" —বলিয়া করমর্দ্দন-পূর্ব্বক দাঁড়াইলেন। শ্রীমানও ক্রমে তাঁহার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। উভয়ে অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক কথা-বার্ত্তা হইল। কথাবার্ত্তার সময়, আগন্তুক বাবুটির হস্তস্থিত একখানি বাঙ্গালা সংবাদ-পত্রের প্রতি শ্রীমানের দৃষ্টি পতিত হইল। শ্রীমান বাবুটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখানি কি কাগজ!"

"এইখানিই আজকাল আমাদের সমাজের একমাত্র প্রধান মুখপত্র। ভাল কথা, এখানিকে আপনার কিন্তু Subscribe করা উচিত। এই দেখুন, কত বড় কাগজ, দামেও আবার কত সস্তা; বেশীর ভাগ আজকাল আর কোন বাঙ্গালা কাগজেরই এমন লেখা দেখা যায় না।"—এই বলিয়া বাবুটী শ্রীমানকে কাগজখানি দেখিতে দিলেন।

শ্রীমান আর কি করেন? মনের ইচ্ছা না থাকিলেও—বিশেষতঃ ভাবনায় তাঁহার মন তখন অস্থির হইলেও—কি করেন, বন্ধুবরের খাতির রাখিতেই, অগত্যা কাগজখানি হাতে লইলেন। কাগজখানি হাতে লইয়া খুলিতেই কাগজখানির প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের একটী বিজ্ঞাপনের প্রতি তাঁহার নজর পড়িল। তিনি মনে মনে পড়িলেন,—

"বিশেষ পুরস্কার!

গত ৬ই মাঘ শনিবার সন্ধ্যার সময়, চিৎপুর রোড দিয়া আমি যখন বাড়ী আসিতেছিলাম —সেই সময়, ঘোড়াসাঁকোর মোড়ের উপর আমার গাড়ির সহিত ট্রামওয়ে গাড়ির টক্কর লাগে; এবং তাহাতে আমার গাড়িশুদ্ধ উল্টাইয়া যাওয়ায়, আমি অজ্ঞান হইয়া পড়ি। শুনিলাম, তখন একজন পরোপকারী দয়ালু-স্বভাব গৌরবর্ণ যুবক আমাকে বড়ই যত্ন করিয়া পুনরায় গাড়িতে উঠাইয়া বাড়ীতে রাখিয়া যান। তিনি সে সময় সে উপকার না করিলে আমি বোধ হয় প্রাণে মারা যাইতাম। এজন্য আমি তাঁহার নিকট যে কি পর্য্যন্ত বাধিত হইয়াছি, তাহা আর বলিবার নহে। কিন্তু আমার বড়ই দুর্ভাগ্য যে, অজ্ঞান-অবস্থায় পড়িয়া সে সময় তাঁহাকে আমি চিনিতে পারি নাই। সুতরাং এই বিজ্ঞাপন দ্বারা আমি সাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে, যিনি এইরূপে আমার প্রাণদান করিয়াছেন, তিনি যদি অনুগ্রহ-পূর্ব্বক স্বয়ং আমার নিকটে আসিয়া সে দিনের সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করেন, তাহা হইলে আমি পরম বাধিত হইব; এবং আমার যতদূর সাধ্য, আমি তাঁহাকে পুরস্কৃত করিব।

কুমারী শ্রীমতী মাধবলতা।

'অবলা-আশ্রম', স্যারকুলার রোড, কলিকাতা।

* * * * *

বিজ্ঞাপনটী পড়িয়াই শ্রীমান যেন চম্‌কাইয়া উঠিলেন। ভাবিলেন,—"এও এক দাঁও বটে!" এইরূপ ভাবিয়াই তাড়াতাড়ি তিনি যেন সেই আগন্তুক বন্ধুবরকে বিদায় দিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। "আচ্ছা, আজ তবে আসি! দুই এক দিন মধ্যেই আবার দেখা হ'বে।"—এই বলিয়া শ্রীমান রাস্তার অপর দিকে চলিলেন। আগন্তুক বাবুটিও সুতরাং আর কিছু বলিবার বা কাগজখানি গছাইবার সুবিধা না পাইয়া, আপন গন্তব্য স্থানেই প্রস্থান করিলেন।

এখন, শ্রীমানের মনে এই এক নূতন ভাবনার উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন,—"এও

এক দাঁও বটে! কিন্তু যদি কোনরূপে আমায় সন্দেহ করে? গাড়ির কোচমান-সহিসেরাও তো অবশ্য লোকটাকে দেখিয়াছিল!" পর-ক্ষণেই আবার মনকে প্রবোধ দিয়া ভাবিলেন, —"তা' ইহাতে আর আসে-যায় কি? সে তো এক 'অবলা-আশ্রম!'—সেখানে মেয়ে বই পুরুষের কারবার তো না থাকিবারই কথা! যদিও দুই একজন কেউ আসে-যায় এমন হয়, কিন্তু তা'ও তো আর সকল সময় নয়? আর বাহিরের লোকের অত 'কেয়ার' না লওয়ারই সম্ভব। বিশেষ যদি কুমারীর কাছে গিয়ে বসে দু' দণ্ড কথাবার্ত্তাটাও কইতে পারি, তা' হলে নিশ্চয়ই তা'কে ভুলাতে পারবো! হাজার হোক, সে তো মেয়ে মানুষ! আমার মত চৌকোস্ পুরুষের হাতে পড়্‌লে সে এক দণ্ডেই জল্ হ'য়ে যাবে! বিশেষ, চেহারাতেই আমি মেরে রেখে দেব! এই গোলাপই ধর্‌না কেন, আজকাল তো আমি ওকে বড় কিছুই দিতে পারিনে, কিন্তু তবুও ওতো আমায় ছাড়তে চায় না! এমনই আমার চেহারাখানা বটে! এতে কি আর একটা কুমারীকে বাগাতে পারবো না! টাকা তো তাহাকে দিতেই হবে,—বেশীর ভাগ এখন আর কিছু না হ'লে বাঁচি!"

এইরূপ ভাবনার পরই শ্রীমান ফিরিলেন; আবার গোলাপের বাড়ীর ভিতরই প্রবেশ করিলেন। ভাল করিয়া কাপড় ছাড়িয়া—ফিট বাবু সাজিয়া, খানিক পরে একবার ঐ চেহারা-তেই বাহির হইবেন, স্থির করিলেন।

এই স্থলে বলা আবশ্যক যে, শ্রীমানের চেহারাটিও সুচেহারা বটে! তাঁহার গায়ের রঙ্‌টি বেশ ফুট্‌ফুটে সুন্দর—কতকটা যেন সেই অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত চাঁপার কলির ন্যায়। গণ্ডস্থল দুইটী আবার আরও মনোহর,—তাহাতে যেন গোলাপ-কমলের কতকটা আভা পড়িয়াছে। ঠোঁট-দু'খানি টুক-টুকে—পাতলা, আপনিই শোভান্বিত। পান খাইলে বরং একটু খারাপ দেখায়। তদুপরিই গোঁপ জোড়াটি—তাহাতে আবার আরও শোভা বাড়িয়াছে। সেটী যেন রক্তপদ্মের উপর মধুকর! খঞ্জন নয়ন, তিলফুল নাশা,—ইত্যাদি ইত্যাদি আর যা' কিছু সুন্দরত্বের আবশ্যক, শ্রীমানে আমাদের তার সকলই বর্ত্তমান। এককথায় শ্রীমান অতি সুন্দর পুরুষ। বিশেষতঃ যখন তিনি টেরিটি ফিরাইয়া, ভাল কালাপেড়ে সিমলার ধুতিখানি পড়িয়া, ইস্ত্রি-করা 'পাট-ভাঙ্গা' সার্টটি, গায়ে দিয়া, তদুপরি 'সেক্স-পীয়ারের ফল্‌স্ কলারটি' আঁটিয়া বাবু সাজিয়া বাহির হন, তখন তাঁ'র আবার অপূর্ব্ব বাহার! পায়ের ম্যানফিল্ডের বাড়ীর 'পম্প'-সু' জুতা-জোড়াটি, হাতের ক্যাউটের বাড়ীর কুকুর-মুখো ছড়ি-গাছটি, আর সেই গিলে-করা ফরাস-ডাঙ্গার উড়ানিখানি—এসবও বড়অঙ্গের উপর দিয়া যায় না! রাস্তা দিয়া চলিলে অনেককে শ্রীমানের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে হয়! এসকলের পরও আরও কত কি আছে, কিন্তু সে সব আর বলিতে চাহি না। এসেন্স, ল্যাভেণ্ডার, অডিকলোন, অটোডিরোজ—এসবের বিষয় আর অধিক কি বলিব; বাবু-ভায়া হইলেই এসব তো আছেই! সুতরাং আর অধিক কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

বেলা প্রায় পাঁচটার সময়। এরূপই প্রায় বাবু সাজে সাজিয়া, শ্রীমান নিকুঞ্জ বাবু গোলাপের বাটির বাহির হইলেন। উদ্দেশ্য, তিনি একবার সত্য সত্যই সংবাদপত্রে-লিখিত সেই পুরস্কারের বিষয় চেষ্টা পাইবেন। বাড়ীর বাহির হইয়াই তিনি দেখিলেন,—সম্মুখেই 'সিটি' দিতে দিতে Chitpore to Dhurumtalaর একখানি ট্রামগাড়ী আসিতেছে। আধুনিক নব্য বাবুদের মতই শ্রীমানও আর "গাড়ি বাঁধ" বলিতে অবসর না পাইয়া, তাড়াতাড়ি গাড়ির হ্যাণ্ডেল দুইটী ধরিয়া সেই ট্রামে উঠিয়া বসিলেন। কিছুক্ষণ পরেই 'কণ্ডক্টার' আসিয়া উপস্থিত হইয়া পয়সা চাহিল। শ্রীমান

পকেট হইতে চারটী পয়সা বাহির করিয়া বলিলেন,—"সেয়ালদ' ট্রান্সফার!"

এইরূপে ক্রমে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে, শ্রীমান নিকুঞ্জভূষণ ট্রাম হইতে নামিয়া স্যারকুলার রোডের সেই পূর্ব্ব-কথিত 'অবলা-আশ্রমে' গিয়া উপস্থিত হইলেন। বাটিটি পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার পরিচিত ছিল; বিশেষতঃ গেটের দু'ধারে দু'খানি পাথরে কাল কালিতে 'অবলা-আশ্রম' বলিয়া লেখা ছিল। সুতরাং তথায় যাইতে আর তাঁহার কোন কষ্টই হইল না। সটান সোজা তিনি বাড়ীর দিকে প্রবেশ করিলেন। গেটের দরোয়ানেরাও তাঁহাকে কোন বাধা দিল না। তবে উপরের বৈঠকখানার সিঁড়িতে উঠিবার সময় একটী বাবুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। শ্রীমান বাবুটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কুমারী মাধবীলতা মহাশয়ের সহিত আমি সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। তিনি কি এখন বাহিরের বৈঠকখানায় আছেন?"

"মহাশয়ের কি প্রয়োজন?'

"প্রয়োজন, আমি পুরস্কারের বিষয় বিজ্ঞাপনে দেখিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।"

"আচ্ছা, আস্‌তে আজ্ঞা হউক। আসুন—উপরে আসুন। এই সেই কথাই হইতেছিল।"

শ্রীমান যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। সেই বাবুটির সহিত উপরে গেলেন। বৈঠকখানা-ঘরে তখন তাঁহাকে বসাইয়া বাবুটি বাড়ীর ভিতর শ্রীমতীকে সংবাদ দিতে প্রবেশ করিলেন। বেহারা তামাক সাজিয়া তাঁহাকে খাইতে দিল। শ্রীমান তামাক খাইতে লাগিলেন, আর কুমারী মাধবীলতার বৈঠকখানাটীর শোভা দেখিতে লাগিলেন। এই অবসরে পাঠকগণও তাহা একটু দেখিয়া লউন।

কুমারী মাধবীলতার বৈঠকখানাটি দেখিবার জিনিস বটে। ঘরটি সমস্ত 'ম্যাটিং করা।' সার্সি-খড়খড়িগুলি সুন্দর গ্রিণ-রঙে রঞ্জিত। ভিতরের দেওয়ালও সমস্ত 'পেণ্ট করা।' তাহার উপর আবার সুন্দর সুন্দর 'অএলপেণ্টিং, ক্রমোলিথো'প্রভৃতি রঙ-বেরঙের নানা ছবিতে ঘরটী সুসজ্জিত। গৃহের মধ্যস্থলে একটী 'রাউণ্ড টেবেল্।' তাহার চতুর্পার্শ্ব আবার সুন্দর চেয়ারের দ্বারা বেষ্টিত। বলাবাহুল্য, টেবিলের উপরটিও আবার রীতিমত সজ্জিত। দুই চারিখানি ধর্ম্মপুস্তক, দুই চারখানি সেক্সপীয়র-মিণ্টনও তাহার উপর পড়িয়া আছে। টেবিলের পূর্ব্বপার্শ্বে একখানি মেহগ্‌নীর সুন্দর স্প্রিঙের সোফা'। এইরূপ আরও কত কিতে যে গৃহটি সজ্জিত, তাহা আর বলিবার নহে। পারেন তো পাঠক মহাশয়গণ এই অবসরে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লউন। আমাদের আর বর্ণনার স্থানাভাব।

শ্রীমান এইরূপে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে তাঁহার পার্শ্বস্থ কুঠারি হইতে সহসা একটি বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই তিনি বিশেষ আহ্লাদসহকারে হাসিতে হাসিতে শ্রীমানকে বলিতে লাগিলেন,—"সেদিন আপনি আমার যেরূপ উপকার করিয়াছেন, তাহাতে আমি আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ হইয়াছি। আমি অদ্য পশ্চিম হইতে আসিয়া সমস্ত ব্যাপার শুনিলাম। আপনি আমার স্ত্রীর প্রাণদাতা বলিতে হইবে। আপনার দর্শনেও আমি পরম পরিতুষ্ট হইলাম।" —এই কথা বলিতে বলিতেই, বাবুটী সহসা আপনার জামার পকেট হইতে একখানি ফটোগ্রাফ বাহির করিয়া, শ্রীমানের সম্মুখে তাহা ধরিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি এ স্ত্রীলোকটীকে কি চেনেন?"

শ্রীমান একটু চমকাইলেন। মনে মনে ভাবিলেন,—"কি করি! এই কি না! যদি না হয়, তা'হলে তো বড়ই বিপদ দেখিতেছি! এ চেহারা তো আমি কখনও দেখি নাই?"

বিশেষতঃ 'অবলা-আশ্রমে' কুমারী মাধবীলতার সহিত কথাবার্ত্তা কহিবেন আশায় আসিয়া, তাহার পরিবর্ত্তে একটী বাবুর সহিত কথা কহিতে হওয়ায় তিনি আরো সঙ্কুচিত হইলেন। যাইহোক, শ্রীমান এইরূপ একটু কি ভাবিতেছেন, এমন সময়ে সেই বাবুটী নিজেই বলিলেন,—"চিনিতে পারিতেছেন না!—ইহাঁকেই সেদিন আপনি রক্ষা করিয়াছিলেন।" শ্রীমান তখন তটস্থ হইয়া বলিলেন,—"হাঁ—হাঁ, বটে—বটে! স্ত্রীলোকের মুখ, বিশেষ সেই বিপদের সময়, আমি কি আর অত নজর ক'রে দেখেছি?"

বাবু। (ঈষৎ হাসিয়া)—"তা তো বটেই! অত কি আর মনে থাকে!"

এইরূপ বলিয়াই বাবুটি—"আপনি একটু অপেক্ষা করুন; আমি বাটির ভিতর হইতে আসিতেছি।"—বলিতে বলিতে সহসা অন্দরের দিকে প্রবেশ করিলেন। শ্রীমান ইহাতে যেন একটু আশ্বস্ত হইলেন। ভাবিলেন,—"আর কি, দাঁও তো মারিয়াছি! বাবু নিশ্চিতই পুরস্কার আনিতে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন!"

এমন সময় একি বিভ্রাট! সব বিপরীত! বাবুটী একগাছি শতমুখা হস্তে করিয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া শ্রীমানের উপর সজোরে চালাইতে লাগিলেন! আর, সেই সঙ্গে সঙ্গে মুখে বলিতে লাগিলেন,—"বদ্‌মায়েস্, এই নে পুরস্কার! তুই যেমন নীচ, তুই যেমন পাষণ্ড, তোর পুরস্কার এই-ঠিক! তুই জানিস্, তোর দ্বারা কত লোকের কত সর্ব্বনাশ হইতেছে! কত কুলনারীকে তুই মজাইয়াছিস্; তোরই প্রলোভনে পড়িয়া কত অবলা কুল হারাইয়া ধনে-প্রাণে মজিয়াছে! তোর মত পাষণ্ডের নরকেও স্থান নাই।"—এইরূপ নানা তিরস্কার-সহ বাবুটী ক্রমাগতই শ্রীমানকে প্রহার করিতে লাগিলেন। আর শ্রীমানও তখন—"মাগো, বাবাগো, গেলাম গো"—বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন; বার বার দিব্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আজ আমার নাকে-কানে খত। আমি আমার সর্ব্বস্ব ঘুচাইয়া আজ যে পুরস্কার পাইলাম, প্রাণ থাকিতে আর ইহা ভুলিব না।"

জুয়াচোরের মেয়ের বিয়ে।

পূর্ব্ব-বঙ্গ-রেলপথের সোদপুর-ষ্টেশনের প্রায় এক ক্রোশ পূর্ব্বদিকে তেঘরিয়া-গ্রামে কৃষ্ণযোগীর বাস। কৃষ্ণের বড় ছেলে কায করে—চটের কলে! ছোট ছেলে শ্যামা বাড়িতে বসিয়া পিতলের কল-কুলুপের কায করিয়া মাসে ১০।১৫৲ টাকা উপার্জ্জন করে। শ্যামার বয়স ১৬।১৭বৎসর—এখনও বিবাহ হয় নাই। কৃষ্ণ শ্যামার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক; কিন্তু পাত্রী মিলে না। কোন কারণে কৃষ্ণ যোগী-সমাজে 'একঘরে।'

একদিন সন্ধ্যার সময়, একটী বাবু-বেশধারী লোক ঐ গ্রামে গিয়া তাহার অবিবাহিতা ভ্রাতষ্পুত্রীর জন্য একটী যোগীর ছেলে (পাত্র) অন্বেষণ করে; এবং যেন ঘটনাক্রমেই, ঘুরিতে ঘুরিতে কৃষ্ণের বাড়ীতে গিয়াই উপস্থিত হয়। কৃষ্ণও এরূপ অযাচিত-সম্বন্ধে আনন্দিত হইয়া পুত্রের বিবাহের প্রস্তাবে সম্মতি দেয়। লোকটাও ভাবগতিক বুঝিয়া অতিশয় আগ্রহ জানাইয়া বলে,—"এই পাত্রের সহিতই আমার ভাইজীর বিবাহ দিতে সম্পূর্ণ মত আছে; আমার অগজেরও অমত হইবে না। কলিকাতাতে আমাদের একখানি দোকান আছে, আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর সেইখানেই থাকেন। এখানে আসিয়া পাত্র দেখিবার তাঁহার সুবিধা হইবে না। সে জন্য, যদি আপনাদের বিশেষ কোন আপত্তি না থাকে, তবে ছেলেকে সঙ্গে লইয়া আপনি যদি একবার কলিকাতায় যাইতে পারেন, তাহা হইলে সকল কথা সেইখান হইতেই শেষ হইয়া যায়। আর,

যাঁহার কন্যা, তাঁহার সহিতই সকল কথা মিটিয়া গেলেও ভাল হয়!"

এই সময়ে ঐ লোকটা আরও প্রকাশ করে, সে যেন ভারী একটা বড় কারবারী; তাহার যেন বিলক্ষণ বিষয়-সম্পত্তি আছে; বাড়ীর মধ্যে একটী মেয়ে, বড় আদরের, বয়সও বার তের; আর মেয়েটীও পরমা সুন্দরী—তাহার এমন নাক্, এমন চোক্, এমন মুখ, এমন বুক, এই চুল, এই রং—পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত নিখুঁত গড়ন! ফলতঃ এইরূপের নানা গৌরচন্দ্রিকায় কৃষ্ণকে, বিশেষতঃ তাহার ছেলেকে, একবারেই গলাইয়া ফেলে! ছেলের মা তো হাতে যেন স্বর্গ পাইল! পাছে কেহ ভাংচি দেয়—এই ভয়ে, পরদিনই কলিকাতায় গিয়া ছেলের ভাবী শ্বশুরকে ছেলে দেখাইয়া আনিবার জন্য, স্বামীকে অনুরোধ করিল। স্বামীও স্বীকার করিল। শেষে ঐ লোকের সহিত অনেক কথা-বার্ত্তার পর স্থির হইল যে, তা'র পরদিনই কৃষ্ণ ও তাহার পুত্র কলিকাতায় ভাবী বৈবাহিকের সহিত এসম্বন্ধের পাকা কথা কহিয়া আসিবে।

পরদিন তাহাই হইল। উহারা তিন জনে কলিকাতায় কৃষ্ণের ভাবী বৈবাহিকের সহিত দেখা করিল। কৃষ্ণ বৈবাহিকের দোকান ও দোকানের দ্রব্য-সামগ্রী দেখিয়া বুঝিল,—লোকটার টাকা অনেক; আরও বুঝিল, লোকটা মাটীর মানুষ!

বৈবাহিকের বয়স ৪০।৪৫ বৎসর। প্রথম বয়সের ঐ কন্যা; তাহার পর আর কোন সন্তান-সন্ততি তাঁহার হয় নাই। তিনি কৃষ্ণ-ভক্ত; অঙ্গে হরিনামের ছাপ, গলায় তুলসী-মালা। তিনি তো পাত্র দেখিয়া অতিশয় আনন্দ-প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"এই ছেলের সঙ্গেই আমার কন্যার বিবাহ দিব। আমার কন্যা যেমন সুন্দরী, জামাইও হ'বে তেমনি শ্যামসুন্দর! (বলা বাহুল্য ছেলেটী পাথুরে কাল) অপূর্ব্ব রাধাকৃষ্ণের মিলন হইবে!" —এই বলিয়া ছেলের পিরাণটি খুলিয়া পাখা লইয়া নিজহাতে তিনি বাতাস করিতে লাগিলেন।

ছেলেটীও একবারে জল! কৃষ্ণ ভাবভঙ্গি দেখিয়া আর কথা কহিবার অবসর পায় না! ক্ষণেক পরেই জলযোগের ব্যাপার! দুই জনের জলযোগের জন্য ৫।৭ জনের উপযুক্ত উত্তম-উত্তম মিষ্টান্ন আনিয়া উপস্থিত! কৃষ্ণচন্দ্র বুঝিল, কুটুম্ব ভাল হইবে। ছেলে বুঝিল,—"আর আমায় পায় কে!"

অতঃপর বিবাহের দেনা-পাওনার কথা উঠিল; কন্যার পিতা কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"তবে বেই, তোমার বৌকে কি গহনা দিবে, বল?" ব্যবসাদারী কথা-বার্ত্তায় কৃষ্ণও বড় কম নহে। ৬০।৬৫ বৎসর সে ব্যবসা করিতেছে। কথায় কৃষ্ণ ঠকিল না; বলিল,—"আপনি যে দরের লোক, আপনার সহিত কুটুম্বিতা আমাদের সাজে না; তবে আপনি দয়া করিয়া আমার ছেলের সহিত আপনার কন্যার বিবাহ দিতেছেন, এই মাত্র! আমি কিসের মানুষ যে, আমি আপনার সঙ্গে সমান দিয়া উঠিতে পারি! আর, তেমন কিছু দিয়াও যে ছেলের বিবাহ দিই, সে অবস্থাও আমার নয়!" কৃষ্ণচন্দ্রের ভাবী বৈবাহিক এই কথা শুনিয়া যেন একটু অপ্রতিভ-ভাবে বলিলেন,—"ওকি কথা, বেই! মেয়ের বাপ যত বড় লোকই হ'ক না কেন, ছেলের বাপের কাছে সে অবশ্য নীচু! সে রকম দেওয়া-নেওয়ার কথা আমি বল্‌ছিলাম না; আমার কথা এই যে, তুমি যা' কিছু দিবে, তাহাই আমি মাথায় করিয়া করিয়া লইব; এবং তাহাতেই দশ জনের কাছে আমার মুখ উজ্জ্বল হইবে! আরও দেখ, আমার একটী মেয়ে; আমার ইচ্ছা, মেয়েটীকে সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কারে আবৃত করিয়া সম্প্রদান করি। বিশেষতঃ আমার

গৃহিণীর ইচ্ছা, ভাল ঘড়ী, ঘড়ীর চেইন, হীরার আংটী, উত্তম চেলী প্রভৃতি বিবাহের সময় জামাইকে দেওয়া হয়। তদ্ভিন্ন পিতল-কাঁসা ও রূপার দানসামগ্রী—খাট্ বিছানা প্রভৃতি আজকাল যেমন রীতি আছে, তা'ত দিতেই হ'বে। তবে তা'র উপরে তুমি যা কিছু দিবে, তাহাই আমি যথেষ্ট জ্ঞান করিব।"

কৃষ্ণ ভাবিল,—"আশার অতিরিক্ত'! ইহার উপরে কিছু না দিলেও ত' ভাল দেখায় না!" কাজেই সে বলিল,—"আমি যেমন মানুষ, অবশ্য তেমনি আমাকে কিছু দিতে হবে বৈ কি! তা' আমি বৌমার অলঙ্কারের জন্য ২০০৲ টাকা দিতে পারি।"

"যথেষ্ট—যথেষ্ট!"—বলিয়া কৃষ্ণের ভাবী বৈবাহিক আনন্দ-প্রকাশ করিয়া উঠিলেন। অনেক কথা-বার্ত্তার পর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেলে, কৃষ্ণের বৈবাহিক জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা বেই, তবে তুমি গহনাগুলি কোথায় গড়াইতে ইচ্ছা কর?" কৃষ্ণ বলিল,—"যে গ্রামে আমাদের বাস, সে গ্রামে তো স্যাকরা নাই—কোন দূর গ্রাম হইতে গড়াইতে হইবে।" বৈবাহিক বলিলেন যে,—"যদি ইচ্ছা কর, তবে এই কলিকাতায় গহনা গড়াইতে দিতে পার; এখানে আমাদের জানা-শুনা ভাল দোকান আছে,। সেখানে অল্প সময়ে, কম পাইনে, কম মজুরীতে, ঠিক ফরমাজমত জিনিষ পাওয়া যাইবে। যদি তোমার অসুবিধা ও অবিশ্বাস না হয়, তবে টাকা দিলে আমিই তোমার ফরমাজ-মত গহনা গড়াইয়া দিতে পারি।" কৃষ্ণ জিহ্বা-দংশন করতঃ বলিল,—"সে কি মহাশয়, আপনি কি কথা বলেন? আপনাকে অবিশ্বাস!"

তখন কৃষ্ণের বৈবাহিক একটী দিন স্থির করিয়া বলিলেন যে,—"ঐদিনে ১১৷৷০ টার সময়ের গাড়ীতে আমার ছোট ভাই সোদপুরে যাইবে। আপনারা সেইখানে তাহার সহিত সাক্ষ্যাৎ করিয়া, যদি অসুবিধা না ঘটে তবে তাহার হাতে টাকা দিয়া, কত পরিমাণ সোনায় কি গহনা গড়াইতে হইবে, তাহা বলিয়া দিবেন।" কৃষ্ণ এইবার একটু পিছাইয়া পড়িল; বলিল,—"তা'সেই দিনে যদি টাকা সংগ্রহ করিতে পারি, তবে উঁহার হাতে টাকা দিব। যদি ঐ দিনে টাকার সুবিধা না হয়, তাহা হইলে অন্যত্রে গড়াইয়া লইব। যেরূপ করি, সে কথাও উঁহাকে বলিয়া দিব।"

এদিকে ছেলে দেখিল, যদি ঐ দিনে টাকা দেওয়া না হয়, তবে এ বিবাহ ফস্‌কাইতে পারে—সে মনে যে মনে সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিল, তাহাও ভাঙ্গিয়া যায়! এই ভাবিয়া সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা আঁটিল যে,—"বাবা যদি টাকা নাও দেয়, তবে আমিই টাকা দিব।" বলা বাহুল্য, তাহার নিজের রোজগারের গুপ্ত ৭০৲।৭৫ টাকা ছিল। ঐটাকাই গহনার জন্য অগ্রিম দিবে, স্থির করিল। অতঃপর বিদায়ের সময় ছেলেটীকে একটু সরাইয়া লইয়া গিয়া, তাহার ভাবী শ্বশুর ও খুড়-শ্বশুর তাহাকে বুঝাইয়া বলিল,—"দেখ, তোমার বাপ সেকেলে লোক, টাকা-কড়ি বড় সহজে বাহির করিতে চায় না। আর অপরের হাতে টাকা দিতেও বিশ্বাস করে না। যদি তোমার কাছে কিছু থাকে, তবে তাহাই দিও। পরে, গহনা প্রস্তুত হইলে তোমার পিতার নিকট হইতে টাকা লইয়া তোমাকে দিব।" ছেলেটী চুপ করিয়া রহিল। দেখিয়া তাহার শ্বশুর সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে কি তোমার কাছে কিছু নাই?" ছেলে বলিল,—"আছে বটে, কিন্তু সে তো বেশী নয়,—৭০।৭৫৲ টাকা মাত্র!" শ্বশুর বলিলেন,—"আপাততঃ বায়না-স্বরূপ তাহাই দিলে যথেষ্ট হইবে।" অতঃপর কৃষ্ণ ও তাহার ছেলে উভয়ে তাহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া বাটী গমন করিল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে শ্যামাও নিজের লুক্কায়িত টাকা কয়টী গোপনে লইয়া পিতার সহিত যথা-সময়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া দেখিল, তাহার ভাবী খুড়-শ্বশুর ষ্টেশনে উপস্থিত আছেন। পরস্পরে দেখা-সাক্ষাৎ হইলে কুশলাদি জিজ্ঞাসা হইল। পরে তখন কৃষ্ণকে সেইখানে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া, ছেলেটিকে সঙ্গে লইয়া কিছু দূরে গিয়া তাহার আনীত টাকা কয়েকটী গণিয়া লইয়া খুড়-শ্বশুর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আচ্ছা, তোমার পিতা টাকা কিছু আনিয়াছেন কি?" "না" বলিয়া ছেলে মাথা নাড়িল। বলিবার অবকাশ পাইয়া তখন খুড়শ্বশুর বলিল,—"দেখিলে বাপু! তা যাইহোক, তুমি যে আমাদের গহনা গড়াইতে টাকা দিলে, একথা তোমার পিতাকে এখন বলিও না! তোমার বাপ বড় লোক ভাল নয়!" ছেলে তাহাই বুঝিল; এবং স্বীকার করিল যে, সে কথা সে কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। খুড়-শ্বশুর তখন কালী, গুরু, গঙ্গা প্রভৃতির দিব্য দিয়া সেকথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিল। অতঃপর ছেলের পিতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেল যে,—একটী সুবিধা-মত দিনে তাহারা পুনর্ব্বার তেঘরিয়াতে গিয়া ছেলেকে আশীর্ব্বাদ ও বিবাহের দিন স্থির করিয়া আসিবে।

কিন্তু তারপর আর কে কোথায়? তাহারা বড় লোক, খুব একটা জাঁক-জমক করিয়া মেয়ের বিবাহ দিবে, অনেক উদ্যোগ আয়োজন করিতে হইবে—বিশেষতঃ ভাবী জামাতার নিকট টাকা লইয়াছে, অলঙ্কার প্রস্তুত করাইয়া দিতে হইবে; সুতরাং তাহাদের কি আর সেখানে দেখা পাওয়া যায়! কৃষ্ণ এখন খুঁজিতেছে, ঢের; কিন্তু আর যে সহজে তাহাদের দেখা পাওয়া যাইবে, এরূপ সম্ভব কিছুই নাই।—শ্রীকালী—

কর্ম্ম—না কর্ম্মভোগ?

ইহসংসারে কে না কার্য্যের অধীন? মনুষ্যমাত্রেই কার্য্যের দাস, কার্য্যই মনুষ্যের প্রাণ। যেদিন মনুষ্য জীব-জগতে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াছে, সেইদিন হইতেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মারম্ভ হইয়াছে। সূতিকাগৃহ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্মশানে আসিয়া সে কার্য্যের শেষ হইতেছে। শিশু জননী-জঠোর হইতে বহির্গত হইয়াই 'ট্যাঁ' করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, স্তন পান আরম্ভ করিল; এইখান হইতেই তাহার কার্য্য আরম্ভ হইল। এবং সে কার্য্য যে কি, বোধ হয়, তাহা অনেকেই বুঝিয়া থাকেন।

বিগত ১৫ই ফাল্গুনের 'অনুসন্ধানে' "কর্ম্ম" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। লেখাটী বেশ জমকাল বটে; কিন্তু তাহার উপদেশগুলি অন্যরূপ। লেখক মনুষ্যকে মাথার দিব্য দিয়া ভূয়ঃ ভূয়ঃ কর্ম্ম করিতে অনুরোধ করিতেছেন; কিন্তু আমাদিগের বিবেক তো সে অনুরোধ শুনিতেছে না! এবং কর্ম্মটা যে কি, সুকর্ম্ম কি কুকর্ম্ম, তাহাও তিনি বলিতেছেন না। অথচ কেবলই বলিতেছেন,—"কর্ম্ম কর—কর্ম্ম কর; ফল কি ফলিবে, সে কথা তোমার জানিবার, শুনিবার দেখিবার বা ভাবিবার আবশ্যক নাই।" এও তো বড় বিপদের কথা!

একদিকে এত অনুরোধ, আবার অপর দিকে বলিতেছেন,—"যে অপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় শক্তিতে সমস্ত চেতনাচেতনময়ী পৃথিবী কর্ম্মপ্রাণ হইয়া কর্ম্মস্রোতে ভাসিতেছে, সেই শক্তিতে তোমাকে কর্ম্ম করাইবে—তুমি করিব না বলিলে কে শুনিবে?" তা'ই বলি, তিনি যদি এ কথাই বেশ বুঝিয়া থাকেন যে, জীবকে সেই শক্তি কর্ম্ম করাইবে, এবং সকলকেই বাধ্য হইয়া সেই কর্ম্ম করিতে হইবে; তবে ইহার উপর তাঁহার এত অনুরোধ কেন?

আবার বলিতেছেন,—"পৃথিবীতে আসিয়াছ

—কর্ম্মভূমিতে প্রবেশ করিয়াছ, দাঁড়াইয়া কেন? কর্ম্ম কর—কর্ম্ম করিয়া চলিয়া যাও।" বলি, আমি যে দাঁড়াইয়া আছি, একি আমার আয়ত্তাধীন? এটাও কি একটা কার্য্য নয়? শক্তিই আমাকে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছেন, এবং আমিও তাই মহাশক্তির অধীনে পরিচালিত হইয়া এরূপভাবে দাঁড়াইয়া আছি। লেখক আপনিই স্বীকার করিয়া, আবার তৎক্ষণাৎ তাহা অস্বীকার করিতেছেন কেন, তাহা তো বুঝিলাম না!

ফলাফল। "ফল কি হইবে, তাহা তোমার দেখিবার, শুনিবার বা ভাবিবার আবশ্যক নাই।" লেখকের কথার প্রমাণেই প্রতীতি হইতেছে যে, তিনি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছেন যে,যাহা হয় ফল একটা না একটা ফলিবে; এবং সে ফলটী যে কি—শ্রীফলই হউক, তিন্তিড়িই হউক, বা পনসই হউক, আর কদলই হউক—তাহা তিনি জানিতে ভূয়ঃ ভূয়ঃ নিষেধ করিতেছেন। কিন্তু স্বহস্তে রোপিত উদ্যান-মধ্যস্থ খাসা বোম্বাই আম্রের বৃক্ষে কি কখনও কামরাঙ্গা ফলে?

আবার জীব-জগতের সহিত জড়-জগতের তুলনা করিয়া কেমন উদাহরণ দিয়াছেন! সূর্য্য দিকদাহ বা আলোক-বিতরণ-রূপ স্বকার্য্য সমাধা করিয়া চলিয়াছেন। মহাসমুদ্র তরঙ্গমালা বিস্তার-কার্য্যে নিযুক্ত; তাহার প্রতিঘাতে দেশ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে। শীতল মারুত-মলয় বহিয়া যাইতেছে, তাহাতে বিরহিনীর উত্তপ্ত প্রাণ বিদগ্ধ হইতেছে—সে সেই দাহনে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া গিয়া পোড়া সমীরণকে অজস্র গালাগালি পাড়িতেছে; কিন্তু স্বকার্য্য-পারদর্শী সমীরণ সে গালিতে কর্ণপাতও না করিয়া নিজের কাজ সারিয়া চলিয়া যাইতেছেন। এইরূপে লেখক সূর্য্য, সমুদ্র, সমীরণ, প্রভৃতি জড়ের কর্ম্মকলাপ প্রদর্শন করিয়া মনুষ্যকে বারম্বার বলিতেছেন যে,—"মনুষ্য! তোমরাও ঐরূপ স্থাবর-জঙ্গমাদি নির্জ্জীব জড়ের ন্যায় কার্য্য করিয়া চলিয়া যাও; তাহাতে কে মরিল, কে বাঁচিল—কে আলো পাইল, কে বা অন্ধকারে রহিল—কাহার উন্নতি হইল, কে বা উৎসন্ন গেল, সে ভাবনায় তোমার মস্তিষ্ক উত্তপ্ত করিবার প্রয়োজন নাই।

আবার দেখুন,—"জগতে আসিয়াছ, কর্ম্ম কর—কর্ম্ম স্রোতে গা ঢালিয়া দেও; যেদিকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, সেই দিকেই চলিয়া যাও," * * * "কেবল একটী কথা মনে এই রাখিও,—'আমি এই কার্য্যটা করিব,' 'আমি ইহা করিলে এই হইবে,' 'আমি করিয়াছিলাম, তাই এই হইয়াছে'—এরূপ ভাবনা ত্যাগ কর।" বলি, এও কি একটা কথা নাকি? এরূপ উপদেশানুযায়ী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে কি যথেচ্ছাচারিতার পূর্ণ প্রশ্রয় প্রদান করা হয় না? মনে করুন, রাম একজন ঐশ্বর্য্যবান ব্যক্তির সন্তান, তাহার পিতা প্রচুর অর্থ রাখিয়া গিয়াছেন। রাম কার্য্য-স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া অর্থাৎ অগ্রপশ্চাৎ কিছুই না ভাবিয়া, দেদার অর্থ অপব্যয় করিতে লাগিল। প্রথম দিন রাম 'এক সিপ্ রোজ-লিকারের' আস্বাদন গ্রহণ করিল; দ্বিতীয় দিবসে 'এক গ্লাস র—ব্র্যাণ্ডি' টানিল; তৃতীয় দিবসে বোতল সুদ্ধ 'হুইস্কি' চুমুক মারিল। তার কিছু দিন পরেই দেখি, রাম পথের ভিখারী; তাহার পিতৃ-প্রদত্ত ধন সমস্তই নিঃশেষ, এক্ষণে তাহার অর্থের বিশেষ অনাটন! রাম দেখিল, শ্যামের হস্তে অনেক অর্থ, রাম শ্যামকে খুন করিয়া অর্থগুলি আত্মসাৎ করিল। তার পরেই রাম ধরা পড়িল, বিচারে প্রাণদণ্ডের হুকুম হইল, ফাঁসি-কাষ্ঠ-আরোহণে রামের মানবলীলা শেষ হইল। তাই বলি, লেখক মনুষ্যকে যে উপদেশ প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহাকে কি বলিব? কর্ম্ম?—না কর্ম্মভোগ?

শ্রীঅ,

৺ কুমার নিত্যরঞ্জন বাহাদুর।

জন্ম—১২৭৬ সাল। মৃত্যু—১২৯৬ সালের ২৭এ অগ্রহায়ণ।

বীরভূম—হিতমপুরের রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের পুত্র কুমার নিত্যরঞ্জন বাহাদুর গত ২৭এ অগ্রহায়ণ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। কুমারের বয়ঃক্রম ১৯ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। কিন্তু এই বয়সেই ইহাঁর ধর্ম্মানুরাগ, বিদ্যোৎসাহিতা প্রভৃতির বিস্তর পরিচয় পাওয়া যায়। কুমার ১২৭৭ সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর অকাল মৃত্যুতে অনেকেই দুঃখিত।

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

হরিদাস রঘুনন্দন দত্ত

'অমৃত বাজার' পত্রিকার কার্য্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা ও ৩নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।—এই নাম ও ঠিকানা দিয়া আজকাল মফঃস্বলে নানা রকম-বেরকমের হ্যাণ্ডবিল-বিজ্ঞাপন বিলি হইতেছে। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে জানিয়াছি যে, তাহার কোন হ্যাণ্ডবিলে 'সচিত্র কবিতা সুরসুন্দরী' নামক পুস্তকের বিজ্ঞাপন, কোন হ্যাণ্ডবিলে বা 'হরিভক্তিবিলাস' পুস্তকের বিজ্ঞাপন! বিজ্ঞাপনগুলি এতই সুকৌশলে লেখা যে, যাঁহার হস্তে তাহা পড়িয়াছে, তাঁহাকেই তাহাতে মোহিত হইতে হইয়াছে। মোহিত হওয়াও সুধু নহে, অর্ডার পর্য্যন্তও অনেকে দিয়াছেন। আর সত্যসত্যই বা লোকে এ ব্যাপার কি করিয়া বুঝিতে পারিবেন? ঠিকানার কারচুপীতেই যে সকল অনর্থ ঘটাইয়াছে! বলিতে কি, এক 'অমৃতবাজার' পত্রিকার আপিস, বাগবাজার, কলিকাতা—এই ঠিকানা থাকাতেই লোকে আরও মজিয়াছেন। 'অমৃতবাজার' বাঙ্গালীর গৌরবের সামগ্রী, সে আপিস সকলেরই সুপরিচিত। সুতরাং সে আপিস হইতে প্রচারিত বিজ্ঞাপনে লোকের কি আর অনুমাত্র সংশয় হইতে পারে? আর, তাই অনেকেই সরল বিশ্বাসে উপরোক্ত পুস্তকের জন্য অর্ডার পাঠাইতেছেন। কিন্তু দেখুন পাঠক, প্রতারকের প্রতারণা কতদূর? 'অমৃতবাজার' পত্রিকার কার্য্যালয়ের ঠিকানা দিয়া বিজ্ঞাপন জারি হইতেছে, অথচ উক্ত পত্রিকার সম্পর্কীয় কোন ব্যক্তিই এ ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও অবগত নহেন। অধিক কি, উক্ত আপিসের কার্য্যকারক মহাশয় স্বয়ং আমাদিগকে ও-সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন, দেখুন,—

"অমৃতবাজার পত্রিকা-আফিশ।
২ নং আনন্দ চট্টোপাধ্যায়ের গলি,
বাগবাজার কলিকাতা।
২৩এ ফাল্গুন, ১২৯৬।

মহাশয়, পত্রমধ্যে তিনখানি পোষ্টকার্ড পাঠাইলাম। তিনখানিই 'শ্রীহরিদাস রঘুনন্দন দত্তের' নামে আসিয়াছে। ইহার দুইখানিতে 'অমৃতবাজার পত্রিকা কার্য্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা'—এই ঠিকানা লেখা আছে। অপর খানির ঠিকানা—'৩নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।' কোন জুয়াচোর মফস্বলবাসীদিগকে ঠকাইবার জন্য নিশ্চয় আমাদের ঠিকানায় কোন কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়াছে, কি হ্যাণ্ডবিল ছাপাইয়া স্থানে স্থানে পাঠাইয়া দিয়াছে। আমাদের আফিশে অবশ্য উক্ত নামধারী কেহ নাই, কিম্বা ঐ নাম দিয়াও কেহ বিজ্ঞাপন দেয় নাই। ৩ নং বাগবাজার ষ্ট্রীটে অনুসন্ধান করা গেল, সেখানেও কেহ নাই। ৩ নং বাগবাজার ষ্ট্রীটের ঠিকানায় যে কার্ডখানি আসিয়াছে, তাহাতে লেখা আছে যে,—"বঙ্গবাসীতে এবং বৈষ্ণব পত্রিকার কভারে আপনার প্রকাশ্যমান 'হরিভক্তিবিলাস' গ্রন্থের বিজ্ঞাপন দেখিলাম ইত্যাদি।" বঙ্গবাসীতে ঐ নামধারী কে বিজ্ঞাপন দিয়াছে, সেই ব্যক্তির অনুসন্ধান করিলে অবশ্যই সকল জুয়াচুরী প্রকাশ হইয়া পড়িবে। আমাদের ঠিকানায় যে দুইখানি কার্ড আসিয়াছে, তাহাতে কিন্তু 'হরিভক্তিবিলাসের' কথা লেখা নাই। সে দুইখানিতেই 'সচিত্র কবিতা-সুরসুন্দরী' নামক পুস্তক পাঠানর কথা লেখা আছে। একটু যত্ন করিয়া এই জুয়াচোরকে ধরিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করিলে আপনার একটী পরোপকার করা হয়।— একান্ত বশম্বদ

শ্রীভুবনমোহন ভট্টাচার্য্য,
অমৃতবাজারের পত্রিকা আফিসের কর্ম্মকারক।"

পত্রখানি পড়িয়া আমরা তো অবাক হই-

য়াছি। এতদূর ভয়ানক জুয়াচুরী, প্রতারকগণ এখনও করিতে সমর্থ, এই আশ্চর্য্য! যাইহোক, আমরা এ ব্যাপারের গূঢ়তত্ত্ব এখনও সন্ধান লইবার অবসর পাই নাই। কেবল এবার সাধারণকে সতর্ক করিবার জন্য—সাধারণে এখনও প্রতারকের কুহকে পড়িয়া প্রতারিত না হন—এই আশায়, এ বিবরণী প্রকাশ করিলাম মাত্র। ইহার বিস্তারিত বিবরণ আগামী সংখ্যক 'অনুসন্ধানে' সাধারণকে জানাইতে আমাদের বাসনা রহিল; এবং যদি পারা যায়, তবে প্রতারকের উচিত শাস্তির জন্যও চেষ্টা করা হইবে। তবে একথাও এক্ষণে পাঠকবর্গকে জানাইয়া রাখা মন্দ নহে যে, 'অমৃতবাজার' পত্রিকার আফিস বা ৩ নং বাগবাজার ষ্ট্রীটের ঠিকানা দিয়া, অথচ প্রতারক অন্যত্রে বসিয়া, পোষ্টাপিসের যোগে লোককে ঠকাইতেছে। অর্থাৎ ডাকঘরে তলে তলে বলিয়া রাখিয়াছে যে,—"আমার নামে উক্ত ঠিকানাদ্বয়ে যে সকল চিঠিপত্র আসিবে, তাহা অমুক স্থলে বিলি করিবেন—আমি উক্ত ঠিকানা হইতে এখন সেই স্থানে যাইতেছি।" ডাকঘরও কাজেই বুঝিয়াছেন, তাই। চিঠিপত্র-টাকাকড়ি প্রতারকের ঠিক মতলব-মতই বিলি হইতেছে। অথচ লোকে 'অমৃতবাজার' আপিসে কিম্বা ৩নং বাগবাজার ষ্টীটে টাকা পাঠাইয়া বা অর্ডার দিয়া ঠকিলাম, এইরূপই বুঝিতেছেন; এবং ঐ দুই স্থলে সন্ধান করিতে গিয়াও কাহারও সাক্ষাৎ পাইতেছেন না। যাহা হউক, ব্যাপার বড় মন্দ নহে; এরূপ দিনে ডাকাতি আর কি হইতে পারে?

সাধারণে সাবধান।

আজকাল 'তন্ত্রমন্ত্র,' 'ইন্দ্রজাল,' 'ডাকিনী-বিদ্যা,' 'ভোজবিদ্যা' প্রভৃতি পুস্তকের নানারূপ জমকাল-জমকাল বিজ্ঞাপন মফঃস্বলে বিলি হইতেছে। সে সকল বিজ্ঞাপনের কি ভড়ং—কি প্রলোভন! কিন্তু পাঠকগণ সাবধান, তাহার প্রায় সকলগুলিতেই জুয়াচুরী পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান। যে সকল কথা তাহাদের বিজ্ঞাপনে লিখিত আছে, তাহার প্রায় সকলই মিথ্যা। অর্থাৎ একখানা বাজে পুস্তকের মলাট বদলাইয়া বা বাজে কতকগুলা শ্লোক নানা স্থান হইতে তুলিয়া—অশুদ্ধ ভ্রমপূর্ণ পুস্তককে তাহারা ঐ সকল লোকহিতকর গ্রন্থ বলিয়া প্রলোভিত করিতেছে। এবার আমাদের স্থানাভাব। বারান্তরে আমরা ঐ সকল পুস্তক ও বিজ্ঞাপনের বিষয় তন্নতন্ন করিয়া সাধারণকে জানাইব, বাসনা রহিল। আপাততঃ পাঠকগণ বিজ্ঞাপনের কুহক হইতে সতর্ক থাকুন, এইমাত্র অনুরোধ।

মতামত।

পুস্তক-সম্বন্ধে।

মদনমোহন।—দৈনিক-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত। গ্রন্থকার বলেন,—এখানি তাঁহার 'উপন্যাসে সত্য ঘটনা।' অর্থাৎ একটি সত্য ঘটনাকে তিনি উপন্যাসাকারে লিখিয়াছেন। ঘটনাটিও বাস্তবিক উপন্যাসোচিত বটে। ধর্ম্মশীল মদনমোহনের সহিত নাএবের বিচ্ছেদ—সে বিচ্ছেদে মদনমোহনকে নাএবের হত্যা চেষ্টা—মদনমোহনের গৃহে ডাকাইতি ও মদনমোহন ভ্রমে তাঁহার গৃহে-অভ্যাগত তাঁহার অপর একজন আত্মীয়ের বিনাশ-সাধন—ডাকাইত-হস্তে-মৃত আত্মীয়ের হত্যাকারী বলিয়া, নাএবের ষড়যন্ত্রে, পরে মদন অভিযুক্ত—ঘুষ লইয়া পুলিসের মকর্দ্দমা-সাজান—আদালতে কাজির বিচার—দস্যুহস্তে মৃত আত্মীয়ের হত্যাকারী বলিয়া মদনের প্রাণদণ্ড—সংক্ষেপতঃ এই সকল ঘটনা লইয়াই এ পুস্তকখানি রচিত। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, পুস্তকের ঘটনাবলী কিরূপ মর্ম্মস্পর্শী—কতদূর শোকোদ্দীপক! একদিকে নিরপরাধী ধর্ম্মপরায়ণ মদনমোহন, আর অন্যদিকে নররাক্ষস

নীরয়-কীট নাএব! বাস্তবিকই এ দৃশ্য বড়ই ভয়ানক—ভাবিতে গেলে, বিশেষতঃ সত্য ঘটনা শুনিয়া, প্রাণ শিহরিয়া উঠে! মদনের অন্তিম-দৃশ্য দেখিয়া কে অশ্রু-সম্বরণ করিতে পারে? বিশেষতঃ লেখকেরও লিপিচাতুর্য্যে ঘটনাটি আরও জমকাইয়াছে, ভাল। পরোপকারিণী অবলার সত্যনিষ্ঠা—মদনমোহনের পক্ষ লইয়া উকীল মহাশয়ের নিস্বার্থ উপকার-চেষ্টা—এ সকলও বড়ই স্বাভাবিক। ফলতঃ একদিকে পাপীর পাপ-প্রবৃত্তি সাধন-চেষ্টা ও অপরদিকে ধার্ম্মিকের অকারণ তাহাতে প্রাণদানে—পাপীর হস্তে পুণ্যবানের নিধন-ক্লেশে, মনকে বড়ই ব্যথিত করে। লেখকের এক এক স্থলের বর্ণনাও বেশ প্রবীণত্বের পরিচায়ক।

এইরূপে পুস্তকখানি অনেকাংশে মনোরম্য বটে। কিন্তু তাই বলিয়াই ইহা যে সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ, এরূপও যেন কেহ মনে না করেন। প্রথমতঃ ঘটনাটি অতি ক্ষুদ্র, অথচ গ্রন্থকার তাহাতে একখানি 'পুস্তক' লিখিয়াছেন। সুতরাং তজ্জন্য অনেক স্থল অকারণ বাড়িয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, খুব তাড়াতাড়িতে লিখিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয়, অনেক বর্ণনা ও উচ্ছ্বাস অস্ফুট—হৃদয়ে তাহা অঙ্কিত হইতে হইতেই যেন তখনই বিলীন হইয়া যায়। তৃতীয়তঃ অনেক স্থলে অনেকগুলি রাজনৈতিক বাক্যের সমাবেশে ও সাধারণ পাঠকের সেসকল কথার তাৎপর্য্য সর্ব্বাংশে সুপরিচিত না থাকায়, পুস্তকখানি সাধারণ নভেলপাঠী পাঠকপাঠিকার পক্ষে তেমন সুখপাঠ্য হইবে না।

এইরূপের কয়েকটি ত্রুটী সত্ত্বেও গ্রন্থখানি কিন্তু উপাদেয়। আমরা সাধারণকে এক একবার ইহা পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

বাল্মীকি-চরিত।—বাবু শরচ্চন্দ্র সরকার প্রণীত। এখানি একখানি ক্ষুদ্র নাটক, কবিগুরু বাল্মীকির 'দস্যু-দশা হইতে কবিপদ-প্রাপ্তির ঘটনা লইয়াই এখানি রচিত। নাটকখানি পাঁচরকমে—কতক গদ্যে, কতক পদ্যে, কতক ছন্দে—এইরূপ নানা রঙে লিখিত। সকল স্থল সমান উপাদেয় না হইলেও, ইহাতে লেখকের নবীনোচিত অনেক উচ্ছ্বাস দেখা যায়।

রঙ্গরস-পঞ্চরং।—গ্রন্থকারের নাম নাই। নাম না থাকাই ভাল। এরূপ পুস্তকে কোন্ কালামুখে তিনি আর নাম প্রকাশ করিবেন?

অশ্রুবিন্দু।—শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ মজুমদার প্রণীত।—যাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইহা রচিত, তাঁহারই ভাল লাগিতে পারে। কিন্তু সাধারণের ভাল লাগিবে কি না, জানি না।

রাজভাষা।—চতুর্থ সংস্করণ।—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত। অবসরমত এখানি একবার পড়িয়া রাখিতে পারিলে, অল্প-ইংরাজী-জানা ব্যক্তিদিগের বিশেষতঃ স্কুলের ছাত্রদের ইহা অনেক উপকারে লাগিতে পারিবে।

নববিধান-সংকীর্ত্তন। শ্রীযুক্ত গণেশপ্রসাদ সাহা বিরচিত। এখানি একখানি গানের পুস্তক। মনে হরিভক্তি-উদ্দীপনার জন্য। 'ধ্রুবচরিতের' অংশ-বিশেষ লইয়া এখানি সঙ্গীতাকারে লিখিত। গীতগুলি তত মনোরম না হইলেও, ইহার উদ্দেশ্য অবশ্যই ভাল বলিতে হইবে। তবে সম্প্রদায় বিশেষের মুখপাত্র হওয়ায় সে উদ্দেশ্যে আরও একটু দোষ ঘটিতেছে। ইহার প্রথম গানটীর একটু নমুনা এই ঃ——

"বদন ভরিয়ে বল শ্রীহরি।
ওরে আমার পামর মন।
মুগ্ধ হয়ে, মোহবশে, বৃথা দিন সকলি গেল।
(দিন গেল—গেল-দিনে দিনে—বিফলে
আমায় ভুলে।)
থাকি ভব-পান্থবাসে, ষড়-রিপুর সহবাসে;
মজিয়ে বিষয়-রসে হারালি সব সম্বল।"

সংবাদ।

—দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত তিন জন কয়েদী গত নবেম্বর মাসে পোর্টব্লেয়ার হইতে পলায়ন করিয়াছিল। তাহারা যখন একটা কাঠের মাড় ধরিয়া সাগর দিয়া সাঁতারাইয়া চট্টগ্রাম হইতে কোচীনে যাইতেছিল, তখন ধরা পড়িয়াছে।

—ইব্রাহিম মাজি নৌকা করিয়া ধান বেচিতে যাইতেছিল। পথিমধ্যে দুইজন ভদ্রবেশী বাবু আসিয়া তাহাকে বলিলেন যে,—সে যদি ধান লইয়া কলিকাতায় যায়, তাহাহইলে ইংরাজ সওদাগরের নিকট অধিক দরেও তাঁহারা ধান বেচিয়া দিতে পারেন। ইব্রাহিমও সেই কথায় ভুলিয়া যায়; এবং তাঁহাদের দুইজনের সঙ্গেই ধান লইয়া কলিকাতায় আসে। বাবু দুইজন দুই একদিনে ক্রমে খরিদদার ঠিক হইয়াছে বলিয়া, ধানগুলি ওজন করিয়া গুদাম-জাত করেন, এবং আপিস হইতে সে টাকা পাইবে, স্থির হয়। তদনুযায়ী মাল তোলা হইলে, একখানি গাড়িতে করিয়া ইব্রাহিমকে লইয়া তাঁহারা কোন একটী আপিসে গমন করেন; এবং আপিসের দরজার সম্মুখে গাড়িশুদ্ধ ইব্রাহিমকে দাঁড় করাইয়া, ভিতর হইতে টাকা আনিতে যান। টাকা আনিতে যাইয়া কিন্তু বাবুরা আর ফিরিলেন না। তাঁহাদের সেই যাওয়া পর্য্যন্তই শেষ। সুতরাং সন্দেহ হওয়ায়, ইব্রাহিম সে কথা পুলিসকে জানাইল। এখন, সেই মালসহ প্রতারকদ্বয় রামকৃষ্ণপুরে ধৃত হইয়াছেন।

—কামিথ্যামোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ষ্টিফেন নামক জনৈক ইংরাজের দোকানে যাইয়া প্রায় একহাজার টাকা মুল্যের অলঙ্কারাদি ক্রয় করে; এবং টাকা চাহিলে, ‘এলায়েন্স ব্যাঙ্কের’ উপর ঐ টাকার একখানি চেক দেয়। সাহেব সেই চেক পাইয়া, কি জানি কেন, টাকা-পাওয়া-সম্বন্ধে সন্দিহান হন; এবং কামিথ্যার অজ্ঞাতে, ঐ ব্যাঙ্কে তাহার কত টাকা জমা আছে, জানিতে পাঠান। আর তাহাতে জানা যায় যে, ব্যাঙ্কে দুই টাকা মাত্র তাহার জমা আছে। সাহেব তখন কামিথ্যাকে এই কথা বলেন। কামিথ্যা কিন্তু উহা অস্বীকার করিয়া বলে,—“ব্যাঙ্কে আমার দুই হাজার টাকা জমা আছে। আমি শীঘ্রই বিলাত-যাত্রা করিব; তাই ঐ টাকা জমা রাখিয়াছি।” এই বলিয়া কামিথ্যা জাহাজের টিকিট পর্য্যন্ত দেখাইল। যাইহোক, সাহেব কিন্তু তাহাতে ভুলিবার পাত্র নহেন। তিনি তখন কামিথ্যাকে সঙ্গে লইয়া ঐ ব্যাঙ্কে গমন করিয়া তাহার কত টাকা জমা আছে, জানিতে চাহিলেন। ব্যাঙ্কওয়ালারা তখন বলিল,—“দুই টাকা।” সাহেব তখন কামিথ্যাকে পুলিস-সোপর্দ্দ করিয়া দেন। মকর্দ্দমায় আরও প্রকাশ পায় যে, কামিথ্যা ঐরূপে হ্যামিল্‌টন কোম্পানীর দোকানেও জিনিষ কিনিতে গিয়া বিতাড়িত হইয়াছিল। যাইহোক, ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে এক্ষণে কামিথ্যার ৬মাস সপরিশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

—তান্তিয়ার ন্যায় ‘ঝন্দা’ নামক আর এক দস্যুর উৎপাতেও গভর্ণমেণ্ট বড়ই বিব্রত হইয়াছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে,—ইতিমধ্যে ঝন্দার দলের সহিত পুলিসের একটি ক্ষুদ্র রকমের যুদ্ধ হয়, এবং তাহাতে গুলি খাইয়া ঝন্দা মরিয়াছে। সংবাদ সত্য হইলে সুখের বিষয়। কিন্তু আশঙ্কা হয়, তান্তিয়াও যেরূপ মধ্যেমধ্যে মরিত, ঝন্দাওতো সেরূপে মরে নাই!

—দমদমার সেই গোরার বিচার শেষ হইতে না হইতেই, আম্বালার কাছে গোরার হাতে আবার এক হত্যাকাণ্ড হইয়াছে। একজন নহে—দুই দুইটা বালক এবার মরিয়াছে। চারিজন গোরা এজন্য অভিযুক্ত। গোরারা কিন্তু বলে,—“বালক-দুইটী আমাদের বন্দুক লইয়া খেলা করিতেছিল; হঠাৎ গুলি ছুটিয়া যাওয়ায় মরিয়াছে।” কিন্তু গ্রামের লোকে বলিতেছে,—“গোরারা ইচ্ছাপূর্ব্বক জানিয়া-শুনিয়া ঠিক করিয়া গুলি মারিয়াছে।” কি ভয়ানক কথা!

—মিরাটের সৈনিক-আবাসের নিকট মহিমপুর-গ্রামে এক ভায়ানক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রায় বিশহাজার টাকা লুট! শুনা যাইতেছে, পাঞ্জাবের সেই প্রসিদ্ধ দস্যুবীর ‘ঝন্দারই’ এই কাজ!

—প্রেসের প্রিণ্টারের স্ত্রীকে একশত টাকা ঘুস দিয়া শীলচাঁদ নামক এক ব্যক্তি রুড়্‌কি-কলেজের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র চুরি করিবার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু সে ফল হাতে হাতে ফলিয়াছে। বিচারে তাহার একমাস মেয়াদ ও একশত টাকা জরিমানা হইয়াছে।

—একজন ফৌজদারী আদালতের উকীল বিবাহের পর স্ত্রীকে আর পাঠাইতে চান না। স্ত্রী কিন্তু তলে তলে বাপের বাড়ী চলিয়া আসে। এই অপরাধে উকীল বাবাজী স্ত্রীর নামে গহনা-চুরীর এক মকর্দ্দমা রুজু করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার প্রদত্ত গহনাগুলি লইয়া স্ত্রী পলায়ণ করিয়াছে, এই অভিযোগে স্ত্রীর নামে এক ওয়ারেণ্ট বাহির করেন। স্ত্রী কিন্তু এখন জামিনে খালাস আছেন। অদ্ভুত মকর্দ্দমা!

—এবারও এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় নানা গোলমাল ঘটিয়াছে। প্রশ্নগুলিও নির্দ্দোষ নহে, অধিকন্তু ছাপার ভুলও অনেক ছিল। সংস্কৃত পরীক্ষার দিন কয়েক ছত্র ইংরাজীকে আবার ইংরাজী করিতে বলা হইয়াছিল। এইরূপে আরও নানা অকাণ্ডের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের এ বড় নিন্দার কথা নহে!

—ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের নিম্নবিভাগীয় কেরাণীগিরি পরীক্ষায় বাবু হরিদাস গুপ্ত, মিঃ এফ্‌ বাউডার, বাবু প্রিয়লাল গাঙ্গুলী, দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ দে, আশুতোষ মল্লিক, শরশ্চন্দ্র বিশ্বাস, মহম্মদ সরফরাজ হোসেন, মিঃ জে ডবলিউ গন্‌সুভস্‌, ডবলিউ এইচ্‌ এম্‌ ফীঙ্ক, বাবু অক্ষয়কুমার পণ্ডিত, মিঃ এ জে হোয়াইট্‌লী, চার্লস্‌ এলেন কেমারণ, জেই ইড, বাবু অপূর্ব্বপ্রকাশ মুখোপাধ্যায়, অন্নদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ও মিঃ আর্থার ষ্টুয়ার্ট উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

অনুসন্ধান

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

৩য় খণ্ড] ১৫ই চৈত্র, ১২৯৬ সাল। [১৬শ সংখ্যা।

প্রার্থনা।

“জীবনে মরণে তব, নাথ, এ হৃদয়!
কিসের জীবন আর?
রণ-ক্লেশ শুধু সার—
তব প্রেমালোক প্রাণে না হ’লে উদয়!
ধনমান নাহি চাই,
সুস্থতায় কাজ নাই,
জীবনে মরণে নাথ, তুমি সর্ব্বময়!
* * *
রাখ’ কিম্বা মার’ নাথ! আমি ত তোমার!
এ ছার জীবন-ব্যাপি’
তব গুণ-গানে পাপী
রবে মাতোয়ারা, এই চাহে অধিকার!
দিন দিন তব পানে,
টান’ এ নিরাশ প্রাণে —
কি জীবনে, কি মরণে রব গো তোমার!”—ধঃ

ভট্‌চাযের তীর্থদর্শন।

মধ্যে-মাঝে আমাদের ভট্টাচার্য্য মহাশয় [কা]শী, গয়া প্রভৃতি তীর্থদর্শনে গমন করিয়া [থা]কেন। একদিন কথায়-কথায় তাঁহার নিকট [‘অ]নুসন্ধানের’ একটা জাল-জুয়াচুরীর গল্প বলায়, [তি]নি বিশেষ আগ্রহ-সহকারে বলিলেন,—[না]ম যদি প্রকাশ না করেন, তবে আমারও এইরূপ একটা কীর্ত্তির কথা বলিতে পারি। সেটাও আপনাদের ‘অনুসন্ধানে’ দেবারই মত। কিন্তু এ বুড়ো-বয়সে আর ওরূপ-সকল কেলেঙ্কারীর পরিচয় দিতে ইচ্ছা হয় না; তাই বলিতে কিন্তু কিন্তু হয়। বিশেষ, যেমন হোক দু’পাঁচ ঘর শিষ্য-জজমান আছে; তা’রা সে কথা শুন্‌লে কি না মনে কর্‌বে! তবে বলিতে পারি, আপনারা যদি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলেন যে, নাম ছাপাইবেন না।”

আমরা অমনি তটস্থ। ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ঝটেপটে ধরিয়া বসিলাম। বলিলাম,—“রাম-রাম! আপনি যখন বারণ করিতেছেন, তখন নাম ছাপাইব কেন? যা’তে আপনার ক্ষতি হয়, সে কি আমাদের সাধ? আপনি বলুন—আমরা গল্পটিমাত্র ছাপাইব। আপনার নামগন্ধ কিছুই করিব না।”

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তখন আরম্ভ করিলেন,—“আমার বয়স যখন ২০।২৫ বৎসর, সেই সময় পীড়িত পিতা ঠাকুরকে লইয়া আমায় একবার কাশীতে যাইতে হয়। সেই বারেই আমার প্রথম কাশী-দর্শন। এখানকার ডাক্তারেরা একরূপ জবাব দেওয়াতেই, ৬কাশী-প্রাপ্তির বাসনাতেই, পিতাকে কাশীতে লইয়া যাওয়া হয়। অধিকন্তু, সে সময়ে

আমাদের কলিকাতার একঘর বড়মানুষ শিষ্যও বিশ্বেশ্বর-দর্শন করিতে তথায় গমন করেন; তাহাতে আমাদেরও তীর্থযাত্রার বড়ই সুবিধা হইয়াছিল। একরূপ তাঁহাদের ব্যয়েতেই আমাদেরও যাওয়া ঘটিয়াছিল। বিশ্বেশ্বর-দর্শন ভিন্ন, শিষ্য মহাশয়ের কাশী-যাত্রার আরও একটী গুরুতর উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার একটী পুত্র দিন দিন বড়ই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ায় এবং ক্রমে ক্রমে সঙ্গদোষে তাহার ঘোর অধঃপতন আরম্ভ হওয়ায়, শিষ্য মহাশয় পুত্রটিকে কুসঙ্গ ছাড়াইয়া—কতকটা সুপথে আনিয়া সুমতি দিবার জন্যও, বিশ্বেশ্বর-দর্শন-অভিলাষে কাশীতে গমন করেন। কাজেই এ যাত্রায় আমারও আনন্দ ছিল। যদিও পীড়িত পিতাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছিলাম—এও এক দুঃখের কারণ; কিন্তু তথাপি সঙ্গে সঙ্গে শিষ্য-পুত্রের চরিত্র-সংশোধনের আয়োজনে সে কষ্টেরও অনেকটা উপশম হইয়াছিল। আমি যাইবার সময়, সত্য বলিতে কি, বড়ই মনের আনন্দে ছিলাম।

'কাজেই এ যাত্রায় আমারও আনন্দ ছিল',—এ কথায় অনেকেই বিস্মিত হইতে পারেন। কিন্তু বাস্তবিকই সেইরূপ। পিতার ব্যায়রামে মনে কষ্ট থাকিলেও, প্রকৃতই আমি কাশী যাওয়ায় সুখী হইয়াছিলাম। কথাটা গুরুতর—অনেকে বোধ হয় বুঝিতেই পারিবেন না। সুতরাং খোলাসা করিয়াই বলা ভাল। বিশেষ, আপনাদের কাছে, এখন আর আমার লজ্জা করিয়াই বা কি হইবে?

কথাটা বলিতে হইলে, আরও একটু আগেকার কিছু বলা প্রয়োজন। এই, ছেলেবেলা হইতে আমি আমার পিতার বড়ই আদরের ছিলাম। বিশেষতঃ আমাদের বংশে আমিই একমাত্র বংশধর জন্মগ্রহণ করায়, পিতামাতার আর আহ্লাদের সীমা ছিল না। সুতরাং আমি যাহাতে সুখে থাকি, আমায় যাহাতে মনে একটুও কষ্ট পাইতে না হয়, পিতামাতা আমার সর্ব্বদাই সেইজন্য চেষ্টিত ছিলেন। এক কথায় ছেলে-বয়স হইতে আমার যাহা ইচ্ছা হইত, আমি তাহাই করিয়া বেড়াইতাম। পিতামাতা কিছুতেই দ্বিরুক্তি না করিয়া আমায় কেবল 'আদরে-গোবরে' রাখিতেন। আমি পাঠশালে যাইব না বলিলে পিতামাতাও আর দ্বিরুক্তি করিতেন না। আমি পড়া ফেলিয়া খেলিতে যাইতে চাহিলে পিতামাতা তাহাতেও আপত্তিটি করিতেন না। আমিই যেন সর্ব্বে-সর্ব্বা—আমিই যেন তাঁদের মাথার মণি—প্রকৃতই এইরূপই হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম।

আর ইহাতেই আমার পরকালটি ঝরঝরে হইয়া পড়ে। বয়স যতই বাড়িতে থাকে, ক্রমে ক্রমে আমার ক্রিয়াকলাপও ততই ভবিষ্যৎ ইতিহাসের আলোচনার বিষয় হইয়া আসে। আমি ক্রমেই একটী 'রত্ন'-বিশেষ হইয়া পড়ি। গ্রামের লোকে—পাড়াপ্রতিবেশী সকলেই আমার জন্য শশব্যস্ত হইয়া পড়েন; গ্রামের লোকের বৌ-ঝি আর সহসা ঘাটে-মাঠে যাইতে সাহস পান না।

একদিন আমার এরূপই দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ছিল। যে সময় পিতাকে লইয়া কাশী গমন করি, তখন আমার এই প্রতাপের মাত্রা। তখন আর লোকের জানালা-খড়খড়ির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিবার আর অবসর নাই;—অথবা শ্যামের বাঁশী বাজাইয়া—'পিক কুহু' গাহিয়াও তখন আর আমায় পথ চলিতে হয় না। তখন আমারই রাজত্ব হইয়াছে—আমারই রাজ্য, রাজ-সিংহাসন জুটিয়াছে। তাহারাই আনে-নেয়, বাজে খায়। মধ্যে-মাঝে আমি তাহাতে সর্দ্দারি করি, আর রঙ্ নিই।

এমনই সময় আমাকে কাশী যাইতে হয়। কাশী যাইবার পথে-পথেই শিষ্য-পুত্র মহাশয়ের

সঙ্গেও আমার বিশেষ সম্প্রীত হইতে থাকে। আগেও তাঁহার সঙ্গে জানা-শুনা ছিল বটে; কিন্তু এবারকার মত এতটা মাখামাখি আর কখনও ঘটে নাই। তীর্থযাত্রায় আমাদের এখন সেটা কিছু গাঢ় হইয়া আসিল। রাস্তায় আমার তত জমকাইতে না পারিলেও, ৺ কাশীধামে পৌঁছিয়া দুইজনে যে একবার মন খুলিয়া আমোদ-আহ্লাদ করিব,—এইরূপই নানা কল্পনা মনে মনে আঁটিয়া রাখিলাম।

কাশীতে পৌঁছিয়া ক্রমে কার্য্যেও তাহা পরিণত হইতে লাগিল। দিনে-দু'পুরে তো কথাই নাই—কখনও দেবদর্শন করিবার অছিলায়, কখনও বা স্নানাহ্নিকের ভান করিয়া—অধিকন্তু রাত্রিতেও আমরা দুইজনে প্রত্যহই নানা আমোদ-প্রমোদ আরম্ভ করিলাম। রাত্রিতে বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখা ও গঙ্গার ধারে ভ্রমণেরও নানা সুযোগ ঘটিত। সুতরাং কিছুতেই আর আটকাইল না। বিশেষতঃ সঙ্গী মিলিয়াছে; আর ভাবনা কি? এইরূপে প্রায় সপ্তাহ কাটিয়া গেল। নিত্য নূতন রঙ্-তামাসা—নিত্য নূতন চাল-বেচাল—কিছুরই অভাব হইল না। ডুব দিয়া জল খাই, শিবের বাবার সাধ্য কি যে তা টের পান! আমাদের তো এরূপই চলে! পিতার সেবা-সুশ্রূষা শিষ্য মহাশয়ই করান। গুরুপুত্র ও শিষ্যপুত্র আমরা দুইজনে নির্ভাবনায় 'পরকালে বাতি' দিই।

এইরূপে, একদিন—রাত্রি আন্দাজ ৯ টার পর—আমরা একটী বাড়াতে (কাহাদের বাড়ী, তাহা কি আর খুলিয়া বলিতে হইবে?) প্রবেশ করিতেছি, এমন সময় তাহার পার্শ্বের একটী দ্বিতল বাড়ীর উপরকার খড়খড়ি হইতে কে যেন আমাদের ডাক দিল। আমরা উপরের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম,—দুইটী দিব্যকান্তি অপ্সরীসদৃশা যুবতী স্ত্রীলোক আমাদিগকে ইসারা করিতেছেন। আমরা যে উদ্দেশ্যে পার্শ্বস্থ বাড়ীটিতে প্রবেশ করিতেছিলাম, সেই উদ্দেশ্যের সাফল্য দানেই তাঁহারা দু'জনেও যেন আমাদিগকে ডাকিতেছেন। সুতরাং ফিরিয়া ভাল করিয়া আর একবার চাহিয়া দেখিতে হইল। আবার দেখিলাম,—আহা! এমন রূপ তো কোথাও দেখি নাই! সত্য সত্যই বলিতেছি, কি যে চমক—কি যে সুঠাম, আজিও—এ বৃদ্ধ বয়সেও তাহা মনে হইলে মনকে যেন চঞ্চল করে! পরী, অপ্সরী প্রভৃতির বর্ণনা শুনিয়াছি, কিন্তু সে সময় সে দু'জনকে দেখিয়া আমাদের যেন তদপেক্ষাও চোখে ধাঁধা লাগিল। আমরা সে রূপে মোহিত হইয়া গেলাম। বিশেষতঃ শিষ্যপুত্রের আবার আরও জিদ! যে বাড়ীতে প্রথমে প্রবেশ করিতেছিলাম, সে বাড়ী না গিয়া, তিনি ঐখানে যাইবার জন্যই আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া ধরিলেন। কি করি, অনুরোধই তবে অনিবার্য্য! তদপেক্ষা মন কিন্তু আরও অগ্রসর! কাজেই ফিরিতে হইল।

আমরা ফিরিতেছি, এমন সময় সেই বাড়ীরই একটী ঝি, যেন বাড়ীর উপর হইতে নামিয়াই, আমাদিগকে উপরে লইয়া যাইবার জন্য আসিল। আসিয়াই আমাদিগকে বলিল, "বাবুরা উপরে আসুন—বাইজী-বিবিজান ডাকিতেছেন।" আমরা তো যেন হাতে স্বর্গ পাইলাম। ঝির পাছু পাছু দু'জনেই উপরে উঠিতে লাগিলাম।

উপরে উঠিতেই—স্বপ্নের অগোচর, অভাবনীয় ঘটনা—সেই দুইটি অপ্সরীসদৃশা যুবতী আমাদের দুইজনের হাত ধরিয়া পরম আপ্যায়িত করিতে করিতে দুইটী স্বতন্ত্র ঘরে লইয়া গেলেন। এত আদর—এত যত্ন আমি আর কখনও কিন্তু কোন স্থানে পাই নাই। ফলতঃ আমি এত সন্তুষ্ট হইলাম যে, তখন মনে হইতে লাগিল,—আজ কি সুপ্রভাতে—কার মুখ দেখিয়াই উঠিয়াছিলাম!

যাইহোক, উভয়কে ভিন্ন ভিন্ন ঘরে লইয়া যাওয়ায়, পরস্পরের ব্যাপার কিন্তু পরস্পরে আর কিছুই জানিতে পারিলাম না। আমার অদৃষ্টে কি ঘটিল,তিনি তাহা জানিতে পারিলেন না; অথবা তাঁহার অদৃষ্টে কি ঘটিল, তখন আর তাহা আমিও জানিতে পারিলাম না। ইহার পর হইতেই, সুতরাং আমার সঙ্গীর কথা আর না বলিয়া, আমার নিজের কথাই বলি। আমি সেই স্ত্রীলোকটীর ঘরে একখানি দুগ্ধফেননিভ খট্টাঙ্গে বসিয়া; আর তিনি তৎপার্শ্বস্থ একখানি চৌকির উপর বসিয়া আমার সহিত নানা কথা-বার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। আমাদের বাড়ী কোথায়, কি জন্য কাশীতে আসিয়াছি, একে একে সে সমস্ত কথাই আমাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন। কথাবার্ত্তার মধ্যে মধ্যে আমায় আবার হর্‌দম পানও তামাক দিবার বন্দোবস্তও ছিল। অর্থাৎ মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পান—মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তামাক এই সময় আমায় দেওয়া হইতেছিল। মধ্যে মধ্যে গোলাপ-জলের ফোয়ারাও ছুটিতে লাগিল। আমি বড়ই খুসী!

এইরূপ ভাবেই কিছুক্ষণ কাটিতেছে, এমন সময় সুন্দরী সেই চৌকি হইতে উঠিয়া আমার খট্টাঙ্গের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আমার মনে আনন্দের আর এক লহরী উঠিল। সুন্দরী যখন খট্টাঙ্গের দিকে আসিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার হস্তে একখানি সুবাসিত রুমাল দেখা গেল। রুমালখানি দেখিতেও পরিপাটী—মূল্যবান রেশমের নির্ম্মিত বলিয়াই বোধ হইল। যাইহোক, সুন্দরী এইরূপে আমার দিকে আসিতে আসিতে বলিতে লাগিলেন, —"আপনাকে কিন্তু একটা গান করিতে হইতেছে।"

"আমি তো গান তেমন জানি না"—বলিতে বলিতেই, পরক্ষণেই সুন্দরী আসিয়া আমার গলাটী যেন জড়াইয়া ধরিলেন। অর্থাৎ সেই রুমালখানি দিয়া আমার গলায় যেন বেশ মৃদু মধুর একটি বেড় দিয়া আমাকে আপ্যায়িত করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—"না,আপনাকে আজ একটা গান কর্‌তেই হবে। না কর্‌লে আমি কিন্তু আজ ছাড়িতেছি না।" আমি ভাবিলাম,—এ বড় মন্দ আবদার নহে! বিশেষতঃ প্রকৃতই আমি যখন ভাল গান করিতে জানি না! না জানি, সুন্দরী কিন্তু আমায় যেন পাইয়া বসিলেন। আমার গলা ক্রমে আরও একটু সজোরে জড়াইয়া ধরিলেন। আমি তখনও কিন্তু ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। গলায় একটু লাগিলেও, তাহা তখনও বলিতে আমার সাহস হইল না। সুন্দরীর সুকোমল হস্ত-স্পর্শে লাগিতেছে, তাই বা কি করিয়া বলি? যাইহোক, এইরূপে অপ্রতিভ হইয়া আমি বার বার বলিতে লাগিলাম,—"আমি গান জানি না—ও-বিষয়ে আমাকে মাপ করুন। তবে আমার সঙ্গী বাবুটিকে দিয়া আর একদিন গান শুনাইব, প্রতিজ্ঞা করিতেছি।" কিন্তু সে কথা তখন শোনে কে?

আমাদের পরস্পরে এইরূপ তর্কবিতর্ক চলিতেছে; সুন্দরী বলিতেছেন,—'গাহিতেই হইবে,' আমি বলিতেছি,—'গান তো জানি না'; এমন সময়ই আমাদের পার্শ্বস্থ ঘর হইতে কে যেন হঠাৎ চেঁচাইয়া উঠিল,—"গলায় লাগে—গলা ছাড়। উহু-হু—গেলাম—গেলাম।" আমি তো তাহাতে আরও স্তম্ভিত! সুন্দরীকে তখন জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ও কি শব্দ শুনা যায়!" সুন্দরী বলিলেন,—"ও কিছু নয়!—চিন্তা নাই।" চিন্তা নাই বলিলেও, আমার মন কিন্তু সুস্থির হইল না। পার্শ্বস্থ গৃহ হইতে ক্রমে "গোঁ-গোঁয়ানি" শব্দ উত্থিত হওয়ায়, আমার মন আরও উদ্বেলিত হইল। আমি তখন বিছানা হইতে উঠিবার চেষ্টা করিলাম। উঠিতে গিয়াই কিন্তু দেখি,—আমার গলায়ও তখন একটু ফাঁস আঁটিয়াছে। সুন্দরীর হস্তের রুমালখানি ফাঁস-স্বরূপ তখন আমার গলা জড়াইয়াছে—সুন্দরী তাহা আর ছাড়িতে চাহিতেছেন না।

আমি বড়ই বিব্রতে পড়িলাম। এ কিরূপ অপ্যায়িত—ভাবিয়া, আমার শরীর শিহরিয়া উঠিল। আমি বিছানা ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিলাম। সুন্দরী আর আমায় তখন কিন্তু বসাইতে পারিলেন না। না পারুন, তিনি কিন্তু ছাড়িলেনও না। "কি চাঁদ, উঠিলে যে!" —বলিয়া তিনি আবারও আমার গলা ধরিলেন। এই সময় তাঁহার আরও একটু ভঙ্গী দেখা দেখা গেল; তিনি মৃদুমন্দস্বরে একটি শিস্ ছাড়িলেন।

পরক্ষণেই এ কি বিভ্রাট! যমসদৃশ ভীষণাকৃতি তিনজন গুণ্ডা তখন আমাদের ঘরে প্রবেশ করিল। হাসিতে হাসিতে বলিল,—"কি বাবু, ভদ্রলোকের মেয়েছেলের প্রতি আর এমন তাকাইবেন কি?" এই বলিয়াই, সুন্দরীর হস্তস্থ রুমালখানি তাহাদেরই একজন ধরিয়া বসিল। সুন্দরী অদৃশ্য হইলেন। অপর দুইজন তখন আমার পকেট-ট্যাঁক প্রভৃতি হাঁটকাইতে লাগিল। আমি মহা বিপদে পড়িলাম। বিশেষতঃ এই সময় হঠাৎ আমার মনে মধ্যপ্রদেশের সেই ঠগীদিগের হত্যাকাহিনীর বিষয় মনে পড়িল। তাহারাও এইরূপে ফাঁস দিয়া লোক মারিত—মারিয়া ফেলিয়া জিনিসপত্র কাড়িয়া লইত, তখন আমার মনে আপনা-আপনিই সেই কথা উদয় হইল।

আমি বিষম ভাবনায় পড়িলাম। কিন্তু তখন আর চুপ করিয়া থাকিলে ফল কি? প্রথমে আমি তাহাদিগকে অনেক মিনতি করিয়া দেখিলাম। শেষে যখন তাহাতে তাহারা কর্ণপাতও করিল না, কাজেই তখন যতদূর সাধ্য আত্মরক্ষায় আমাকে প্রস্তুত হইতে হইল। এসময় আমারও শরীরে শক্তি বড় অল্প ছিল না। বিশেষতঃ বিপদের সময় শক্তি যেন আরও দ্বিগুণ বাড়িল। ভাবিলাম, —"মরিবই তো, তবু একবার দেখিয়াই মরি!" এইরূপ ভাবিয়াই, সুন্দরীর হস্তস্থ সেই রুমালের ফাঁসটী গুণ্ডাদের একজনের কর্ত্তৃক ধৃত হইবার সময়েই, আমি সেই ফাঁসের মধ্যে একটী আঙুল প্রবেশ করিয়া দিলাম। তাহাতে তাহারা আমায় আর তত কাবু করিয়া উঠিতে পারিল না। বিশেষতঃ তাহাদের অপর তিন জন তখন আমার পকেট ও কাপড়-চোপড় হাঁতাড়াতেই ব্যস্ত ছিল বলিয়া, আমার আরও একটু সুবিধা হইল। যে ব্যক্তি আমার গলা ধরিয়াছিল, সজোরে আমি তখন তাহার হাতটি কামড়াইয়া ধরিলাম। রক্তাক্ত-হস্ত হইয়া সে আমার গলা ছাড়িয়া দিল। আমি পলাইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প; আর অপর দুই জন তখন জিনিসপত্র ফেলিয়া আমাকে ধরিতে চেষ্টিত।

কিন্তু তখন ধরা একটু শক্ত কথা! আমি প্রাণের দায়ে, আর তাহারা তো আহারের চেষ্টায়! যাইহোক, তাহাদের সঙ্গে হাতাহাতিতে আমার শরীরে ক্রমে রক্তধারা বহিতে লাগিল। চোখ-মুখ সর্ব্বত্রেই আমি বিষম আঘাত পাইলাম। তবে তাহারাও যে অক্ষত শরীরে রক্ষা পাইল, এমনও নহে। আমার মত তাহাদিগকেও একটু-আদটু চিহ্ন লইতে হইল। যদিও আমার অপেক্ষা তুলনায় তাহাদের কম হইতে পারে, কিন্তু তাহারাও তাহাতে একরূপ ক্লান্ত হইয়া পড়িল। আর, এই সময়ই কিন্তু সেই ঘরের খড়খড়ি দিয়া পার্শ্বস্থ ছাদে লাফাইয়া পড়িবার আমি অবসর পাইলাম। তাহারা আমার পিছু পিছু ছুটিল।

কিন্তু প্রাণের দায়ে একটা ভাঙা কাঠের সিঁড়ি বাহিয়া আমি তখন নিচের নামিয়াছি। নীচেয় নামিয়া রাস্তায় গিয়া "পাহারাওয়ালা—পাহারাওয়ালা" করিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছি। যাইহোক, তাহারাও কিন্তু না-ছোড়-বান্দা! আমার মত তাহারাও তখন—'পাহারাওয়ালা—পাহারাওয়ালা, চোর—চোর!'

বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল ; এবং আমার পার্শ্বে গোটা দুই ঘটী ও খান-দুই থাল ফেলিয়া বলিতে লাগিল,—"এই লোকটা আমাদের ঘরে চুরী করিতে ঢুকিয়া আমাদের থাল ঘটি লইয়া পলাইতেছিল । ইহাকে ধর—ধর । এই চোর—এই চোর ।"

আমি তো অবাক ! উল্টা চাপ! পাহারা-ওয়ালারাও কিন্তু আমাকেই ধরিয়া বসিল । আমার হাতেই হাতকড়ি দিল । পুলিসের হাজতে গিয়া, সে রাত্রির মত আমাকেই বিশ্রাম লইতে হইল।" (ক্রমশঃ)

উৎকল-ভ্রমণ।

চন্দ্ররেখার গড়।

আমি কোন বিশেষ প্রয়োজন-বশতঃ উৎকল-খণ্ডের কোন কোন স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলাম। উৎকলে প্রাচীন আর্য্যকীর্ত্তির অনেক নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। 'দেওরাজ-বংশ','কেশরী বংশ' এবং'গঙ্গা-বংশীয়' ভূপতিগণ বহুকাল পর্য্যন্ত উৎকল-দেশে আধিপত্য করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন উৎকলের বিভিন্ন বিভিন্ন প্রদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গ অদ্যাপিও রাজত্ব করিতেছেন। 'ঢেকানল', 'পঞ্চকোটা','ময়ূরভঞ্জ' 'অনুগুল' * প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে প্রায় ২২।২৪ জন হিন্দু রাজা অদ্যাপিও রাজত্ব করিয়া থাকেন। এই সকল প্রদেশে বর্ত্তমান কালে যদিও ইংরেজ-গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ আধিপত্য বদ্ধমূল হইয়াছে, কিন্তু তথাপিও 'গড়-জাতের' রাজবংশীয়গণ সাধারণ জমিদারদিগের অপেক্ষা ইংরেজ-রাজের নিকটে বিশেষ সম্মানিত। যৎকালে এই সকল প্রদেশ ইংরেজাধিকার ভুক্ত হয়, তৎকাল এই সকল রাজন্য-বর্গকে 'মিত্ররাজ' বলিয়াই অনেক স্থলে গৃহীত হইয়াছিল। এই সকল রাজাদিগের অধিকৃত প্রদেশ ইংরেজ-রাজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিত্ররাজ্য বলিয়াই মনে করিতেন। তবে আজকালি অধিকাংশ রাজগণ ইংরেজ-গবর্ণমেণ্টের সম্মান-রক্ষার জন্য সামান্যমাত্র রাজকর প্রদান করিতেছেন। কোন কোন রাজা ২।১ শত মুদ্রা কর-স্বরূপ প্রদান করিয়া থাকেন ; কিন্তু তাঁহার অধিকৃত বিভাগের আয় দুই লক্ষ টাকা অপেক্ষা অধিক। মেদিনীপুরের জঙ্গল-খণ্ড এবং বালেশ্বর ও কটক-প্রদেশের জঙ্গল-বিভাগে এরূপ ভূ-স্বামী অদ্যাপি অনেক আছেন। বহুকালের প্রাচীন হিন্দু-রাজবংশ ক্রমান্বয়ে এই সকল বিভাগে আধিপত্য করিতেছেন। সুতরাং এদেশে যে প্রাচীন হিন্দু-কীর্ত্তির অনেক নিদর্শন থাকিবে,ইহাতে সংশয় কি ?

ফাল্গুণ মাসের প্রারম্ভেই আমরা মেদিনীপুর হইতে বহির্গত হইলাম। শীতের শেষ, বসন্তের প্রারম্ভ-সময়টী বড়ই রমণীয়। মেদিনীপুর হইতে'কংশাবতী' নদী পার হইয়া যে রাস্তা দক্ষিণাভিমুখে গিয়াছে, এই রাস্তা পুরীর সিংহদ্বারে শেষ হইয়াছে। প্রতিদিন শত শত যোগী, সন্ন্যাসী,উদাসীন, গৃহী, স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, যুবক, যুবতী, জগদ্বন্ধুর চন্দ্রমুখ দেখিয়া জীবন সার্থক করিবে, এই মনে করিয়াই, এই পথ দিয়াই পুণ্যক্ষেত্র জগন্নাথ-ক্ষেত্রে গমন করিতেছে। রজনী জ্যোৎস্নাময়ী, আকাশে পূর্ণচন্দ্র বিরাজিত, 'ফুর ফুর' শব্দে দক্ষিণানীল প্রবাহিত হইতেছে! আমরা এই সুরম্য সময়ে জগন্নাথ রাস্তায় উপস্থিত হইলাম। বর্ত্তমান-কালে ইংরেজ-শাসনের সুবন্দোবস্তে এই পথে দস্যু-তস্করের ভয় নাই বলিলেও চলে।

জগন্নাথ-তীর্থে যাইবার রাস্তাটীও অতি মনোহর। বোধ হয়, বঙ্গদেশে এমন সুন্দর পথ অত্যল্পই দেখা যায়। আমরা ৮।১০ ক্রোশ পথ পরিভ্রমণ করিতে-রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল। প্রভাত হইতে একটু বিলম্ব আছে, এমন সময়ে একটী মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি আমাদিগের শ্রবণগোচর হইল। বিজন প্রান্তরে রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মধুর স্বরে প্রতিধ্বনিত হইল,—

"জগত-জীবন জগবন্ধু, কৃপাময় করুণাসিন্ধু,
শুনেছি পুরাণে কয়, পুনঃ জন্ম নাহি হয়,
হেরিলে তোমার মুখ-ইন্দু।
নীলাচলে অনুক্ষণ, লীলা করেন নারায়ণ
সঙ্গে ভদ্রা বলভদ্র আর সুদর্শন।"

প্রভাত হইতে একটু বিলম্ব আছে এমন সময়ে এই সুললিত মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া মনে কেমন একটু পবিত্র ভাব উপস্থিত হইল। স্বর লক্ষ্য করিয়া কিয়দ্দূর গমন করিবার পরে আমি দেখিলাম, একদল জগন্নাথ-যাত্রী বৃক্ষমূলে বিশ্রাম করিতেছে। যাত্রীদিগের মধ্যে একটী লোক এই গানটী গাহিতেছে। গানটী বৃহৎ—যে অংশ স্মরণ আছে তাহাই বলিলাম। পরদিন অতি প্রত্যূষে আমরা সুবর্ণরেখা নদীতীরে এক-বৃহৎ শাল-জঙ্গলে উপস্থিত হইলাম। এই স্থান হইতে মেঘমালার ন্যায় 'নীলগিরি' নয়নগোচর হইয়া থাকে। বসন্তকালের প্রাতঃকাল, বনস্থলী বড়ই মনোহর, শালবন কেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সমস্ত তরুরাজি নবপল্লবে সুশোভিত। আমরা যে স্থলে দণ্ডায়মান ছিলাম, উহার অদূরে একদল ময়ূর চরিতেছিল। এই সকল পক্ষীকুলের মনোহর শোভা দেখিলে, জগতের কৃত্রিম শোভায় কি নয়ন আকৃষ্ট হয় ? বন-প্রদেশে কিছুদূর পরিভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলাম, একদল হরিণ আমাদিগকে দেখিয়া গভীর বনে পলায়ন করিল। কয়েকটী মৃগশিশুও দেখিলাম। কবিরা যে হরিণ-নয়নের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে আজ তাহাই দেখিলাম। মৃগ-চক্ষু কেমন প্রীতিপদ —মনোহর—আকর্ণ-বিস্তৃত—হরিণ-নয়নে যেন মূর্ত্তিমতী সারল্য বিরাজিত! পুরাণাদি পাঠে অবগত হওয়া যায়, ঋষিদিগের তপোবনে একদিকে মৃগদল নির্ভীকচিত্তে বিচরণ করিতেছে, অপরদিকে ময়ূর-ময়ূরী কেকা-রবে নৃত্য করিতেছে। তপোবনে দ্বেষ-হিংসা নাই ; ঋষিতনয় ও ঋষিপত্নীগণ বাল-তৃণ সংগ্রহ করিয়া উহাদিগের মুখে দিতেছেন। কিন্তু আজকাল হরিণের মধ্যে সে ভাব আর নাই ; উহারা মানুষকে আর বিশ্বাস করে না ; মানুষ দেখিলে গহন বনে পলায়ন করে! এই বনমধ্যে হরিতকী, বয়ড়া, আমলকী প্রভৃতি বহুতর বন্যফল দেখিতে পাইলাম। অনেক জঙ্গলা জাতি এই সকল ফল সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে।

আমরা যে স্থলে উপস্থিত হইয়াছি, ইহার দক্ষিণ-বিভাগে ময়ূরভঞ্জ-রাজার অধিকৃত প্রদেশ; উত্তর-পূর্ব্বে বালেশ্বর জেলার কাড়েয়া-বাদ নামক পরগণা ; এবং পশ্চিমাংশে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত নয়াগ্রাম পরগণা। এই স্থান প্রায় শাল-জঙ্গলে আবৃত—মধ্যে মধ্যে ২।১০ঘর সাঁওতাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বসতি করিতেছে। এই সকল স্থান একটী একটী গ্রাম নামে অভিহিত হইয়াছে। শাল-জঙ্গলে যদি ব্যাঘ্র-ভল্লুকের ভয় না থাকিত,তাহা হইলে এমন মনোহর স্থান আর কোথাও নয়নগোচর হয় না। জঙ্গলের এক একটী স্থান এমন পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন, ঠিক যেন শান্তি-নিকেতন বলিয়া মনে হয়।

এই বন-প্রদেশে অদ্যাপি দুইটী বৃহৎ বৃহৎ গড় দেখিতে পাওয়া যায়। একটীর নাম, 'রায়-বনিয়ার গড়'; দ্বিতীয়টীর নাম—'চন্দ্ররেখার গড়'। রায়বনিয়ার গড়ের আংশিক বিবরণ আমি ইতিপূর্ব্বে 'অনুসন্ধানে' লিখিয়াছিলাম। অদ্য চন্দ্ররেখার গড়ের কিছু বৃত্তান্ত পাঠকগণের গোচর করিতে প্রবৃত্ত হইব। দুইটী গড় ৬।৭ মাইল দূরবর্ত্তী। দুইটী গড়ের অবস্থা দেখিলে এখানে যে পূর্ব্বকালে এক এক জন অতি প্রধান রাজা ছিলেন, সেই বিষয়ে

* অনুগুলের রাজা ইংরেজ-গভর্ণমেণ্টের অবাধ্য হওয়াতে এই স্থান এক্ষণে খাসে আসিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট সংপ্রতি এই রাজ্য জরিপ ও বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

আর অনুমাত্র সন্দেহ থাকে না। রায়বনিয়ার গড় সৈন্য-সামন্ত থাকিবার উপযোগী, এবং উহারই চতুস্পার্শ গড়খাই দ্বারা পরিবেষ্টিত। বিপক্ষদিগের আক্রমণ নিবারণ-জন্য উহাতে নানা প্রকার নির্ম্মাণ-কৌশলের দৃষ্টান্ত লক্ষিত হয়। কিন্তু চন্দ্ররেখার গড়ের নির্ম্মাণ-প্রণালী অন্যবিধ। একজন রাজা-বাদসাহের বাসস্থান যেরূপ হওয়া উচিত, চন্দ্ররেখার গড় তদ্রূপ। এই গড়ের চতুস্পার্শ্বে কয়েকটী বৃহৎ বৃহৎ সরোবর দেখিতে পাওয়া যায়। এই সরোবরের মধ্যে সর্ব্ব-প্রধানটির দৈর্ঘ্য এক মাইলের বেশী, প্রস্থও তদ্রূপ। অত্যন্ত প্রাচীন কালের দীঘি, এজন্য এইক্ষণ অত্যল্প-মাত্র জল আছে। কৃষকগণ ইহার মধ্যে ধান্যাদি বপন করিয়া থাকে। এই গড় ও সরোবরাদি কোন্ সময়ে কোন্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা নিরূপণ করিবার কোন উপায় নাই। কিন্তু গড়ের অবস্থাদি প্রত্যক্ষ করিলে ইহা যে হিন্দু রাজাদিগের নির্ম্মিত, অনায়াসে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে। সরোবরগুলির উত্তর-দক্ষিণে দৈর্ঘ্য ও পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রস্থ থাকাও এরূপ সিদ্ধান্তের কারণ বলিতে হইবে। বিশেষতঃ গড়ের মধ্যে দেব-মন্দির এবং দেবমূর্ত্তির ভগ্নাবশেষও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

অনেকে অনুমান করেন, এই সকল গড় মহারাষ্ট্রীয়দিগের অভ্যুদয় সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এইরূপ অনুমানও নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধহয় না। চন্দ্ররেখার গড়ের প্রাচীরের চতুস্পার্শ ভ্রমণ করিলে প্রায় ৩।৪ মাইল স্থান অতিক্রমকরিতে হয়। এই সকল প্রাচীরের উচ্চতা ১০। ১২ হাতের ন্যূন নহে। এই প্রাচীর সম-চতুষ্কোণ বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর-খণ্ড দ্বারা নির্ম্মিত। তন্মধ্যে দেব-মন্দির এবং রাজপ্রাসাদাদির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। একটী দীঘীর নাম শুনিলাম,—'রাও দীঘী'। ইহার চতুর্দ্দিক ঠিক যেন পাহাড়ের ন্যায় উচ্চ। এইক্ষণ এই সরোবর প্রায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। উহার মধ্যস্থল জঙ্গলাবৃত—সেই জঙ্গলের নিম্নে অল্প অল্প জল আছে। রায়বণিয়ার গড়ে 'জয়কালী' নামে এক পাষাণময়ী দেবী-মূর্ত্তি আছেন। চন্দ্ররেখার গড়ে 'যোগমায়া' নামে এক পাষাণময়ী কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। একখানি বৃহৎ প্রস্তর খোদিয়া এই মূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়াছিল। এমন কৃষ্ণবর্ণ মনোহর প্রস্তর অত্যল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ঠিক যেন কষ্টি-পাথরের ন্যায়। এই মূর্ত্তি প্রায় ৩হাত উচ্চ। আমাদিগের দেশীয় শিল্পকরগণের যে ভাস্কর্য্য-কার্য্যে বিশেষ নিপুণতা ছিল, এই সকল মূর্ত্তি দেখিয়া সহজেই অনুমান হয়। এই দেবী মূর্ত্তিটী ঠিক যেন একজন সুনিপুণ চিত্রকরের হস্তনির্ম্মিত চিত্রখানি। ইহার চক্ষু,কর্ণ,হস্ত,পদাঙ্গুলি যে স্থলে যেরূপ হওয়া উচিত, ঠিক যেন তুলিকা-দ্বারা সুচিত্রিত! আরও কত দেব-দেবীর কত অসংখ্য মন্দির পূর্ব্বের ভগ্নাবশেষ আছে। গড়ের মধ্যে স্থানে স্থানে অনেকগুলি বৃহৎ কূপ খনিত আছে। এক একটী কূপের পরিধি ২০ হস্তের ন্যূন নহে। ব্যাসও প্রায় ৮।৯ হস্ত পরীমিত। কূপের মধ্যে অবতরণ করিবার সিঁড়ি (সোপান) আছে। তাহা ঠিক কলিকাতার মনুমেণ্টে উঠিবার পথের তুল্য। অধিকাংশ কূপগুলি জঙ্গলপূর্ণ, কোন কোন কূপে অত্যল্পমাত্র জল আছে। এই গড়ের অদূরবর্ত্তী 'দেউলগ্রাম' নামক স্থানে একটী প্রকাণ্ড প্রস্তরের দেউল আছে। সেই দেউলের সম্মুখে একখানি সম-চতুষ্কোণ প্রস্তর (দৈর্ঘ ১৫।১৬ হস্ত, প্রস্থ ১০।১২ হস্ত) দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত প্রস্তরের উপরিভাগে দাবা-খেলার ঘরের ন্যায় অঙ্কিত আছে। উহার উভয়-পার্শ্বে প্রস্তর-লিখিত কয়েকটী মনুষ্য-মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। এইসকল মূর্ত্তিগুলিরবেশ-ভূষা মহারাষ্ট্রীয়দিগের সদৃশ।—শ্রী

ভয়ানক খুন।

প্রথম দৃশ্য।

খুনী ধৃত!

"ধর্—ধর্—ধর্!"

"পাহারওয়ালা—পাহারওয়ালা—পাহারওয়ালা—"

"খুন করিয়া পলাইল—ঐ ছুটিতেছে! ধর্—ধর্।"

শ্রীশ্রী৺শ্যামাপূজার রাত্রি। কলিকাতার সোনাগাছির গলির ভিতর। শ্যামাঙ্গিনী-সৌদামনীর বাড়ীর ঠিক সম্মুখ হইতে, রাত্রি আন্দাজ দেড় প্রহরের সময় এইরূপ এক কোলাহল উঠিল। লোকগুলা সকলে "ধর্—ধর্—পাহারওয়ালা—পাহারওয়ালা" করিতে করিতে দক্ষিণদিকের রাস্তাটি দিয়া সেইমুখে ছুটিতে আরম্ভ করিল! পাড়ায় মহা-কোলাহল—কলকল-শব্দে পার্শ্বস্থ সকল বাড়ীই প্রতিধ্বনিত! কে একজন লোক আমোদ-প্রমোদের অছিলায় আতিথ্য-গ্রহণ করিয়া,শেষে শ্যামাঙ্গিনীর গলায় ছুরি বসাইয়া—তাহার সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইয়া ছুটিয়া পলায়ন করিতেছে, এই যেন সে কোলাহলের মর্ম্ম। খুনি লোকটা যেন তখনও ছুটিতেছে। পাড়াপ্রতিবেশী সকলে তাই সে শব্দ শুনিয়াই খুনীকে ধরিতে অগ্রসর!

পুলিশ-পাহারারও অনুষ্ঠানের ত্রুটী নাই। লোকের পাছু পাছু দেখিতে দেখিতে ক্রমে দুইএকজন জমাদার-পাহারওয়ালাকেও ছুটিতে দেখা গেল। সকলেই যেন দেখিতেছে, ঐ খুনী পালায়; সকলেরই মুখে—"ঐ পালায়—ধর্—ধর্।"

"ঐ পালায়—ধর্—ধর্" বলিতেছে, অনেকেই! কিন্তু তাহারা সকলেই যে লোকটীকে পলাইয়া যাইতে দেখিতেছে, তাহাও নহে। অনেকেই গোলে-হরিবোল দিয়াই কাজ সারিতে চেষ্টিত! আর কলিকাতার গতিকই প্রায় এইরূপ! রাস্তায় একটা সরগোল তুলিতে পারিলেই—না থাকুক তার মাথা, না থাকুক ধড়স্কন্ধ—লোকে অমনই সেই দিকে জমিয়া যায়। এস্থলেও প্রায় সেরূপই হইয়া দাঁড়াইল। বিশেষতঃ শ্যামাপূজার রাত্রি বলিয়াই গণ্ডগোলটা আরও একটু জমকাইয়াছিল, ভাল। কারণ সে রাত্রে সহরের সকল পল্লী অপেক্ষা, বিলাসিনীগণের কৃপায়, এই পল্লিটিতেই বিশেষ জমজমা! রঙ-বেরঙের সকলেই এ সময়ও আমোদ-প্রমোদে মত্ত! সুতরাং হুজুগ পাইলে তো হয়! কাজেই শ্যামাঙ্গিনী-সৌদামিনীকে খুন করিয়া লোকটা পালায় শুনিয়া, সকলেই তাহাকে ধরিতে ব্যতিব্যস্ত। অথচ কেহই দেখিতে পাইতেছে না যে, লোকটা কই পালায়?

সকলে ছুটিতে ছুটিতে অনেকক্ষণ পরে কিন্তু প্রকৃতই দেখিতে পাইল, খুনী যেন ছুটিতেছে। পশ্চাতের লোকগুলাকে দেখিয়া সে যেন শশব্যস্তে পথপার্শ্বস্থ অপর একটা বেশ্যা-বাড়ীতে প্রবেশ করিতে সচেষ্টিত! এতক্ষণে লোকটার প্রতি সকলের পূর্ণদৃষ্টি পড়ায়, সকলেরই সুতরাং আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। পরক্ষণেই "খুনী ধরা পড়িয়াছে—খুনী ধরা পড়িয়াছে"—বলিয়াই একটা মহা আনন্দ-রোল উঠিল। পাহারওয়ালা-জমাদারদেরও মহা আস্ফালন—সকলেই বলে,—"হাম্ যব্ দেখা, সোই তো ওস্কো পাকড়্ কর্নে শেক্তা হ্যায়।" ফলতঃ অনেক কায়দা-কারখানায় পড়িয়া, সেই বাড়িতে ঢুকিবার প্রাক্কালেই, লোকটা ধরা পড়িল।

লোকটাকে দেখিলে ভদ্রবংশসম্ভূত বলিয়াই কিন্তু বোধ হয়। তা' তাহাতে আর আসে-যায় কি? ভদ্রবংশের গুণধরেরাই তো আজকাল এইরূপেই বংশের মুখোজ্জ্বল

করিয়া থাকেন! এ লোকটাকে দেখিয়াও তাহাই বোধ হইল। লোকটা সুচেহারারও বটে। ইয়া গালপাট্টা দাড়ী, এসা লম্বা পগাড়ে টেড়ী, কেসা পান-টুক্-টুক্ ঠোঁট দু'খানি, কেসা পরিপাটী পরণ-পরিচ্ছদটি! বিশেষতঃ লোকটা বয়সেও ছোকরা-কছমের। অর্থাৎ প্রবীণ নহে—সাধু ভাষায় যাহাকে 'ডব্‌কা ছোকরা' বলে এও তাই! তদ্ভিন্ন, খুনের চিহ্নস্বরূপ একখানি 'কাতারিও' ছোকরার হাতে এ সময় দেখা গেল। ছোকরা সেখানিকে হাতে করিয়া যে একটু দ্রুতপদে চলিতেছিল, তাহাও সকলেই ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন। বেশীরভাগ, ছোকরার হস্তস্থিত সে কাতারিখানিতে খানিকটা যেন তাজা রক্ত মাখা রহিয়াছে বলিয়াও বোধ হইল। সুতরাং এরূপ অবস্থায় খুনের প্রমাণ আর কি হইতে পারে? পুলিশের হস্তে—পশ্চাদ্বর্ত্তী লোক-কোলাহলের চেষ্টায় পরে যুবককে কিন্তু ধৃত হইতে হইল। কৌশলে যুবকের হাত-পা বাঁধিয়া, সকলে তাহাকে একখানি গাড়িতে চড়াইয়া, পুলিশে লইয়া চলিল; এবং সেই সময় যুবকের উপর দিয়া অনেক লাথি-জুতাও বহিয়া গেল। খুনী আসামী বলিয়া যুবক ধৃত, সুতরাং সেরূপ আদর-অভ্যর্থনা না হইবেই বা কেন? রীতিই তো এই!

দ্বিতীয় দৃশ্য।

এদিকে

"খুব কিন্তু বাঁচিয়া আসিয়াছি। ভাগ্যিস্ তুমি ঐ মতলবটা করেছিলে, সেই তো রক্ষা! নইলে বুড়ী যেমন চেঁচিয়ে উঠ্‌লো, অমনিই তো একেবারে 'পাকাড়াও' হ'তে হত! ভালা যা'হোক তোমার বুদ্ধি!"

"দেখ্‌লে বাবা! তখন তো আমার কথা শুন্‌তেই চাওনি। কিন্তু আমি যে কবে মর্‌বো, কেবল এইটেই বল্‌তে পারিনে: নইলে কিসে কি হয়, তা সবই আমার জানা আছে!"

রাত্রি প্রায় শেষাশেষি। একটী বাড়ীর উপরের ঘরে তিন-চারিটী বাবুতে বসিয়া আছেন; তন্মধ্যের একটী প্রবীণ বাবুর সহিত অপর একটী ষণ্ডাকৃতি যুবকের এইরূপ কথা-বার্ত্তা হইতেছে। এমন সময়, তৃতীয় একটী বাবু বলিলেন,—"বাঁচা গিয়াছে কিন্তু খুব! সেটারা অঙ্কুশেও টের পায় নাই। কাজ-কর্ম্ম করিতে এরূপই তো তোখোড় হওয়া চাই! আচ্ছা, তা' যাইহোক, নগদ টাকা-কড়িটা কত কি এলো, একবার দেখ্‌লে হয় না! খরচ-পত্তোরও তো আছে!"

প্রবীণ বাবুটি তাহাতে বলিলেন,—"নগদ আর তেমন হলো কই? গহনা-টহনাতে যা হাজার দুই টাকা হ'তে পারে! ফল কথা, কাজটায় তত লাভ তো দেখা যায় না! তবে বেটী কিন্তু যেমন নষ্ট ছিল, শাস্তিও তেমনই হয়েছে—এইমাত্রই আমাদের যা' একটু আহ্লাদের বিষয়!"

"কেন, টাকা তো বেটীর ঢের ছিল?"

"ঢের থাকিলে কি হয়, তাড়াতাড়িতে সকল সন্ধান পাওয়া গেল কৈ? বিশেষ, পোঁচটা বসাবার সময় ছুঁড়িটে চেঁচাতে না পারে আরও একটু হত ভাল। ছুঁড়িটে 'মাগো—গেলেম' ব'লে যে শেষ-চীৎকারটা ক'রে, সেইটে যদি কোন-রকমে আটকাতে পাত্তেম, তা'হলেই তো সব ফরসা হয়েছিল! কেবল ঐ চেঁচানিতে বুড়ী-মাগীটে জেগে উঠেই যত সর্ব্বনাশ বাধালে বৈত নয়? এখন ধর্ম্মে-ধর্ম্মে বাঁচা গিয়েছে, এই যথেষ্ট বলে মান! নইলে ধরা তো সব্বাই পড়েছিলে! ভাগ্যিস্ আমি 'পাহারওয়ালা—পাহারওয়ালা' ক'রে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেম—তা না হ'লে আজ কি হ'তো বল দেখিনি?"

দ্বিতীয় যুবক-বাবুটি তাহাতে বিশেষ যেন

কৃতজ্ঞ-ভাব প্রকাশ করিলেন; এবং বিনয়-নম্র-বচনে বলিতে লাগিলেন,—"সাধে কি আর আপনাকে গুরু বলিয়া মান্য করি! এমন বুদ্ধি নহিলে কি আর এরকম একটা মহৎ কাজের সর্দ্দারী করা চলে? আরও আপনার একটা বিশেষ বাহাদুরী বল্‌তে হবে যে, গলায় ছুরিটা বসাতে না বসাতেই—তদ্দণ্ডেই আপনি গহনা-গুলা হাতালেন কি করে?"

"বাপু, ঐটুকুই তো কাজ! আজ যে দু'মাস ধ'রে বেটীর চরণে তোমরা সব মুটো মুটো টাকা অঞ্জলী দিচ্ছিলে, সে সব কি আর আমি সাধ ক'রে দিতে দিয়েছিলাম? আমি যে অনেক জলের মাছ, এটা তোমরা বেশ জেনো! ঘরেও আমার স্ত্রী-পরিবার আছে; তথাপি এ-বয়সে আমি ও-বেটীর ক্রীতদাস-প্রায় কেন হয়েছিলাম? এইটুকুই বোঝা শক্ত কথা! আমি এতদিন কেবল আমোদ করিতে যাই নাই। কেবল সন্ধানে গিয়াছিলাম, কোথায় কি থাকে বা কিরূপ সুযোগে কি পাওয়া যায়! আর, শেষে কৃত-কার্য্যও হলেম তাই! আগে থেকেই আমার যে এ-মতলবটা ছিল, এটা কি আর তোমরা বুঝ্‌তে পার?"

এতদূর পর্য্যন্তও বাহাদুরীর পরিচয় গড়াইতেছে, এমন সময় উহাঁদেরই সঙ্গী অপর একটী বাবু হাসিতে২ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া এ বাবুটীকেও বড়ই চতুর বলিয়া বোধ হইল। বাবুটী দেখিতে পাতলা-মত; রঙে কালও নয়, সুন্দরও নয়—এই মাঝামাঝি! গায়ে একটী পিরিহান মাত্র। চাদরখানি কোথায় যেন ফেলিয়া আসিয়াছেন বলিয়া বোধ হইল। বাবুটীর নাম শশী বাবু। শশী বাবু পৌঁছিতেই, অমনি সকলে শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন,—"কি ভায়া, খবর কি? তারপর—তারপর?"

শশী বাবু তখন আরম্ভ করিলেম। বলিলেন,—"তার পর আর কি? তার পর মোড় ঘুরতেই, মিত্তিরদের বাড়ীর সম্মুখ-পর্য্যন্ত গিয়েই দেখি, সেই বাদুরবাগানের রেমো ছোঁড়াটা একখানা 'কাতারী' হাতে ক'রে পিত্‌মির বাড়ীর দিকে ছুট্‌ছে! ধর্ তো তাকেই ধর্! পুলিসের তো সকল কাজেই বাহাদুরী থাকা চাই? রেমো ছোঁড়াটাই শেষে, সৌদামিনীকে খুন করিয়া পলাইতেছে বলিয়া, ধরা পড়িল। ছোঁড়াটার আর কোন কথাই কেউ শুন্‌লে-না! বিশেষতঃ হাতে কাতারী—তাতেও আবার রক্ত-মাখা—দেখেই সন্দেহটা আরও দৃঢ় হইয়া আসিল। তাহাকে আর কথাটী কহিতে না দিয়া, পুলিস তাহাকে বাঁধিয়া লইয়া, সৌদামিনীর বাড়ীর দিকে চলিল।"

এই পর্য্যন্ত বলিতে বলিতেই সকলে অমনি বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল,—"আচ্ছা, রেমোটা অত রাত্রে অমন করে কাতারি নিয়ে কোথায় যাচ্ছিল? বেটার কি গ্রহ!"

"কোথায় যাচ্ছিল, তার আর কি করে বল্‌বো! তবে বেটার যে গ্রহ একান্তই, তাহা'তে কি আর সন্দেহ আছে? যাই-হোক্, রেমোকে নিয়ে যেমন সকলে সৌদামিনীর বাড়ীর দিকে চলিল, আমিও অমনি ভিড়ের পাছু পাছু চলিলাম। ব্যাপারটা কতদূর কি গড়ায়, ভাল ক'রে একবার দেখা তো চাই? রেমোটাকে হাতকড়ি-সহিত বাঁধিয়া যেমন সৌদামিনীর বাড়ীতে হাজির, সৌদামিনীর মা—সেই বুড়ীটেও কিন্তু অমনি চেঁচাইয়া কাঁদিল,—"এই—এই বেটাই আমার মেয়েকে ছোরা মেরে পালাচ্ছিল। আমি ঠিকই এই বেটাকেই দেখেছি—এই ছোরা-খানা হাতে ক'রেই বেটা পালাচ্ছিল ঠিক!" পুলিসও তো চায় তাই। পুলিসের উহা অমনি একটা Evidence হইয়া দাড়াইল। বিশেষতঃ আনুসঙ্গিক প্রমাণও (Cirmustantial

evidenceও) বড় অল্প হইল না। সুতরাং পুলিস রাম-বাবাজীকে গুঁতাইতে গুঁতাইতে চালান দিলেন। এই অবসরে আমিও একবার সৌদামিনীর তখনকার চেহারাখানা—ঘরটা-আস্‌টা ভাল করিয়া দেখিয়া লইবার অবসর পাইলাম। দেখিলাম,—গলাটা ধড় হইতে যদিও স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে নাই, তথাপি অল্পই ঠেকিয়া আছে মাত্র। চামড়াখানার যোগে তাহা ঝুলিয়া পড়িয়াছে, দেখা গেল। রক্তে রক্ত-গঙ্গা—ঘরে যেন প্রকৃতই নদী প্রবাহিতা! দেখিলাম, সে রক্তের মধ্যে আমার গায়ের চাদরখানাও মাখামাখি হইয়া রহিয়াছে। পুলিশ তো সেখানাকে রেমোর চাদর বলিয়াই স্থির করিয়া লইল। যাইহোক, পরে রেমোটাকে কএকজনে যেমন ধরিয়া থানার দিকে লইয়া যাইতে লাগিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে আমিও ক্রমে অন্তর্ধ্যান লইয়া, এই এখানে উপস্থিত!"

সকলে শুনিয়া স্তম্ভিত! বিশেষতঃ ছুঁড়িটার মা-বেটিই বা কি করিয়া রেমোটাকে সনাক্ত করিল—এই একটা ধাঁদায় সকলেই আরও চমকিত হইলেন। কিন্তু সে রহস্য আর বুঝেই বা কে?

এইরূপ কথোপকথনেই কিন্তু ভোর হইয়া আসিল। কাক ডাকিল। যে যা'র শয্যা-ত্যাগ করিবার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও তখনকার মত হাত-মুখ ধুইতে ব্যস্ত হইলাম। পাঠকগণও সুতরাং অদ্যকার-মত এইটুকুই জানিয়া রাখুন। শেষ কোথায় দাঁড়ায়, কে বলিতে পারে?

শিক্ষা-বিভ্রাট।

আমাদের দেশে আজকাল শিক্ষা-প্রণালীর বাহ্য উন্নতি যথেষ্ট হইতেছে বটে। বিদ্যালয়ও বহুসংখ্যক হইয়াছে; এবং বিদ্যালয়ে দেশীয় শিক্ষকের সংখ্যাও অধিক। তাঁহাদের মধ্যে হিন্দুই আবার প্রায় সমস্তই। কিন্তু তবু আমাদের সুশিক্ষা হইতেছে না কেন? শিক্ষার মনোহর ফল ফলিতেছে না কেন? শিক্ষকেরা ছাত্রদিগকে নিরূপিত পাঠ্য-পুস্তকের অর্থ-গ্রহণ ও ভাব-সংগ্রহে সাধ্যমত সাহায্য করেন; বালক এবং যুবকেরা নিজ-নিজ পরিশ্রমের দ্বারা এবং শিক্ষকের সহায়তায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কত উচ্চ উচ্চ উপাধিও প্রাপ্ত হইতেছেন। কিন্তু, বালক এবং যুবকেরা বিদ্যালয়ে থাকিয়া পঠদ্দশাতেই, কিম্বা বিদ্যালয় হইতে বাহির হইবার পর সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াই, বাস্তবিকই কি শিক্ষার সুমধুর ফল দেখাইতে পারেন? কখনই না। কারণ, শিক্ষা বলিলে যাহা বুঝায়, তাহা হইতেছে না। বাস্তবিক আজকাল-কার পদ্ধতিতে শিক্ষিত হিন্দুর ছেলেকে দেখিয়া অনেক সময় চক্ষু ফাটিয়া জল পড়ে। যদি বলিলে অত্যুক্তি দোষ হয়, মার্জ্জনা করিবেন। কিন্তু আজকাল অনেক ইংরাজী-শিক্ষিত অপেক্ষা সম্পূর্ণ নিরক্ষরদিগের চরিত্র উজ্জ্বল দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুর ছেলের কেন এমন হইল? যাহাদের চরিত্র জগতের আদর্শ ছিল, কত জগদ্বিখ্যাত বীর-সম্রাট যাহাদের চরিত্রের উৎকর্ষের কথা শতমুখে প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন; সেই হিন্দুকুলের বংশধরদের কেন এমন অবনতি হইল? তাহার অনেক কারণ আছে। তাহার মধ্যে প্রধান এই যে, দেশের বালক এবং যুবকগণ ধর্ম্ম-সম্বন্ধে একেবারে কোন শিক্ষাই পায় না। মাত্র অর্থকরী-বিদ্যা ব্যতীত আর কোন শিক্ষা এদেশে এখন দেওয়া হয় না। সুতরাং পঠদ্দশার পর যৌবন-অবস্থায় সংসারে প্রবেশ করিয়া হিন্দু-যুবক স্বর্গীয় পূর্ব্ব-পুরুষদিগের পথে চলিতে পারেন না। শুদ্ধ তাহাও নহে, নীতিবিহীন, ধর্ম্মবিহীন শিক্ষার যতদূর বিষম ফল ফলিতে পারে, তাহা অনেক স্থলেই ফলিয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে, সকলে না হউক, অধিকাংশ ব্যক্তিই যদি হিন্দু-নীতি ও হিন্দু-ধর্ম্মের স্বর্গীয় জ্যোতি-দ্বারা হৃদয়-মনকে আলোকিত করিতে পারিতেন, তাহাহইলে বাস্তবিকই এদেশের এত দুর্দ্দশা অসম্ভব হইত।

এখনও আমাদের চৈতন্য হওয়া উচিত। পূর্ব্বে যে ভাবে গুরুগৃহে রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া হইত, নানা-কারণে সে ভাবে শিক্ষা এখন হইতে পারে না। তবে চেষ্টা করিলে যে যে উপায় অবলম্বন দ্বারা এখনও হিন্দু-বালক এবং যুবকদিগকে নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষা দিতে পারা যায়, প্রকৃত উন্নতির পথে তাহাদিগকে এখনও অনেকটা লইয়া যাইতে পারা যায়, তাহা না করা হয় কেন? মানব-জীবনে হৃদয়-মনের উন্নতিই যথার্থ উন্নতি। ইংরাজী আমাদের বর্ত্তমান সময়ের অর্থকরী বিদ্যা। ইংরেজ আমাদের বর্ত্তমান রাজা বলিয়া তাঁহাদের সহিত কায-কর্ম্মের সুবিধা হইবে—এইমাত্র কারণে, আমাদিগকে ইংরাজী শিখিতে একপ্রকার বাধ্য হইতে হইয়াছে। কিন্তু এই শিক্ষার সহিত যদি ধর্ম্ম ও নীতির মিশ্রণ না থাকে, তাহাহইলে অতি বিপরীত হয়। অর্থকরী বিদ্যার সহিত ধর্ম্ম ও নীতির যোগ না থাকাতে যে বিষময় ফল ফলিয়া দেশকে জর্জ্জরিত করিয়াছে, সে বিষয়ে বোধ আর কাহারও সন্দেহ নাই! সেই জন্য বলি, অর্থকরী বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম ও নীতি-শিক্ষার প্রচলন যাহাতে হয়, তদ্বিষয়ে সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। অন্যান্য পাঠ্য-পুস্তকের সঙ্গে যে দুই-একখানি ধর্ম্ম-পুস্তক পড়ান যাইতে পারে না, একথা সম্পূর্ণ অযুক্তিকর।

খৃষ্টিয়ানের স্কুলে প্রতিদিন অন্যান্য পুস্তকের সহিত নিয়ম-মত বাইবেল পড়াইয়াও বালকদিগকে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া যায়, তখন হিন্দুর ছেলেকে নির্দ্দিষ্ট পুস্তকের সহিত একখানি ধর্ম্ম-পুস্তক কি পড়ান যাইতে পারে না? শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ইচ্ছা করিলেই পুস্তকের সংখ্যার বৃদ্ধি করিয়া দিতেছেন, পাঠ্য বিষয়-সকল ক্রমেই কঠিন হইতে কঠিনতর করিতেছেন। তাহাতেও কিন্তু শিক্ষকদিগের পড়াইবার এবং ছাত্রদিগের পড়িবার সময় ও সুবিধা হইতেছে। তদ্ব্যতীত কত স্কুলে সঙ্গীত ও ব্যায়াম প্রভৃতিও শিক্ষা দেওয়া হয়। আর বোঝার উপর শাকের আটিটি কি ধরিতে পারে না? একখানি ছোট-খাট ধর্ম্ম-পুস্তক প্রত্যেক শ্রেণীতে পড়াইবার নিয়ম করা যাইতে পারে না? কিন্তু এ স্থলে একটী কথা আছে। একজন সচ্চরিত্র হিন্দুধর্ম্মপরায়ণ, হিন্দুশাস্ত্রে-সুশিক্ষিত লোক দ্বারা এই অধ্যাপনা হওয়া উচিত। প্রত্যেক স্কুলে একজন অথবা দুইজন এইরূপ লোক থাকিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। ঐ সকল ধর্ম্ম-পুস্তক পড়িয়া যখন অন্যান্য পুস্তকের ন্যায় পরীক্ষা দিতে হইবে না, তখন অধ্যাপক মহাশয়কে এমন করিয়া পড়াইতে হইবে এবং পুস্তকগুলিও এরূপ হওয়া আবশ্যক, যাহাতে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কার্য্য হয়। পুস্তকের লিখিত বা উদ্ধৃত বিষয়গুলির মধ্য হইতে এক একটী কথা বা বিষয় লইয়া হিন্দু-বালক ও হিন্দু-যুবকদিগকে, আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষ, তাঁহাদের পূর্ব্বকীর্ত্তি, নীতি ও ধর্ম্ম; তাঁহাদিগের দেবদুর্ল্লভ চরিত্র, অগাধ পাণ্ডিত্য, স্বদেশ-প্রেম, পরমেশ্বরের প্রতি অনির্ব্বচনীয় সহানুভূতি, জগদ্বিখ্যাত অতিথিসেবা, সত্যপ্রিয়তা; তাঁহাদের সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত, বীজগণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত শাস্ত্র, (শুধু বিখ্যাত কেন, জগতের মধ্যে যাহা প্রথম, প্রধান এবং অভ্রান্ত); আমাদের দেশের বিখ্যাত এবং ভূভাগের সর্ব্বত্র-সমাদৃত উৎকৃষ্ট শিল্প; আমাদের পুরাকালের বিখ্যাত রাজা, এবং তাঁহাদিগের শৌর্য্য, বীর্য্য, কীর্ত্তিকলাপ

প্রভৃতি, বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে। যাহাতে হিন্দু-সন্তানের ক্রমে চৈতন্য হয় এবং তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, আমাদের সকলই ছিল; সেরূপ শিক্ষা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। যাহা ছিল, তেমন এখন কাহারও নাই, এখনও তেমনটী কেহই লাভ করিতে পারে নাই; অন্যান্য জাতিরা তাহার কতকগুলি বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি-সাধন করিলেও, আমরা সকলে মিলিয়া কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিলে, আমাদের যাহা ছিল তাহার পুনরুদ্ধার করিতে পারা যায়;—যাহাতে এইরূপ শিক্ষার শীঘ্রই প্রচলন হয়, তদ্বিষয়ে আমাদের যথাসাধ্য আন্দোলন করা উচিত। গভর্ণমেণ্ট হইতে যদিও আপাততঃ কোন বিশেষ নিয়ম বাহির না হয় (কখনও হইবে বলিয়াও বোধ হয় না), তাহাহইলেও গভর্ণমেণ্ট-বিদ্যালয় ব্যতীত অন্যান্য বিদ্যালয়েও অনায়াসে এরূপ শিক্ষার প্রচলন করা যাইতে পারে। গভর্ণমেণ্ট-স্কুল কএকটী বইত নয়? তদ্ব্যতীত সমস্তই দেশীয় লোকের অধীনে। ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা এখন অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে। শুদ্ধ নীরস বিদেশীয় অর্থকরী-বিদ্যা শিক্ষা করিয়া হিন্দু-যুবকগণ বড়ই শোচনীয়ভাবে সংসারে প্রবেশ করেন। তাঁহাদের দেখিলে অনেক সময় বোধ হয়, যেন তাঁহারাও বিদেশী—এদেশ এবং এদেশের লোকের সহিত যেন তাঁহাদের কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই। তাঁহারা যেন উদ্দেশ্যবিহীন। তাই বলি, তাঁহাদের এই দিশা-হারা ভাব, তাঁহাদের এই উদ্দেশ্য-বিহীনতা, তাঁহাদের এই আপনার দেশে প্রবাসী-সাজা—আপনার গৃহে পরের মতন থাকা, এই অনুচিত ভাবগুলি দূর করিবার একমাত্র উপায় এই বলিয়াই তো আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয় যে, বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা প্রচলিত করা; হিন্দুর ছেলেকে হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত করাইবার জন্য প্রয়াস পাইতে আরম্ভ করা। আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস যে, হিন্দুর ছেলেকে অর্থকরী-বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মশিক্ষা দিলে দেশের প্রতি তাঁহাদের মায়া হইবে, মায়া হইবে; "বিলাত আমার দেশ, কি ভারত আমাদের দেশ"—এ সন্দেহদোলায় তাঁহাকে আর দুলিতে হইবে না। আর, তাহা হইলেই তখন বাস্তবিক কিছু উন্নতি হইবার আশা হইবে। কিন্তু এ সকল কথা কি এখন দেশের লোকের কর্ণে স্থান পাইবে?

জুয়াচোরের গরু-বেচা।

জাল জুয়াচুরীর যে কতই মহিমা, তাহা বলা যায় না। শিক্ষা-বিভ্রাটগ্রস্ত লোকেরই তো নানা জুয়াচুরী-ফন্দি জানিতে পাওয়া যায়; কিন্তু অশিক্ষিত নিরক্ষর লোকের এ জুয়াচুরী-ফন্দিও কি বড় অল্প? সম্প্রতি অশিক্ষিত মুটে-মজুরদের কৃত এই এক জুয়াচুরীর কথা শুনিয়া আমরা তো অবাক হইয়াছি! দেখুন পাঠক, নিরক্ষর মুটে-মজুরদেরও সে জুয়াচুরীর ফন্দি কতদূর?

২৪-পরগণার অন্তর্গত ঘোলা-গ্রামের মুন্সী মণ্ডল চাষবাস করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। লোকটা বেশ ভাল-মানুষ। কিছু দিন অতীত হইল, একদল মজুর ঐ গ্রামে খাটিয়া খাইতে আসিয়া মুন্সী মোড়লের বাড়ীতে আশ্রয় লয়। এক দিন কথায় কথায় মুন্সী মজুরদের সঙ্গে গল্প করে যে,—চাষের জন্য তাহার একটা 'হেলে-গরুর' দরকার; না হইলে এবার তাহার চাষের বড়ই গোলমাল হইবে। এই কথা শুনিয়া, মজুরদের মধ্যের একজন লোক মুন্সীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার কি রকম গরুর দরকার? কত টাকা দিয়াই বা গরু কিনিবার ইচ্ছা আছে?" মুন্সী তদুত্তরে বলে যে,—ভাল গরু হইলে সে ২৫।৩০ টাকা দিয়াও লইতে পারে। এই কথা শুনিয়া ঐ মজুরটাও বলে,—"আমি রাজার-হাটে (বিষ্ণুপুর—রাজার-হাটে) একটা ভাল গরু দেখিয়া আসিয়াছি। গরুটা খুবই ভাল বটে; তবে যাহার গরু, সে ৩০৲ টাকার কমে ছাড়িবে না।" সে কথা শুনিয়া, মুন্সী আগ্রহ জানাইয়া বলিল,—"তবে কালই চল না কেন, একবার তোমাতে-আমাতে দু'জনে গিয়াই গরুটা দেখে আসি! দেখে যদি পছন্দ হয়, তবে একেবারেই টাকা দিয়ে না হয় কিনে আস্‌বো!" মজুরটা তাহাতে উত্তর করিল,—"আমরা মজুরী করিতে বিদেশে আসিয়াছি—একটী দিন কাযকর্ম্ম বন্ধ করিয়া কেমন করিয়া যাই?" তাহাতে মুন্সী তাহার মজুরীর পয়সা দিতে স্বীকৃত হইলে, মজুর আর কোনও আপত্তি না করিয়া, তার পরদিনই মুন্সীর সঙ্গে গরু কিনিয়া দিতে যাইবে, বলিল।

কথা-মত পরদিন মুন্সী ও মজুর—দু'জনেই রাজার-হাটে গরু কিনিতে যায়; এবং গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, মাঠের একটা খুব ভাল 'হেলে-গরু' মুন্সীকে দেখাইয়া, মজুরটা বলে,—"এই গরুটার কথাই বলিয়াছি।" মুন্সীও কিন্তু গরু দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইল; এবং মনে করিল,—"যদি এ গরু ৩০৲ টাকায় কিনিতে পারে, তবে নিশ্চিতই জিত! ইহার দাম কিছুতেই ৪০৲ টাকার কম নহে!" পরে উহারা দুইজনে গ্রামে প্রবেশ করিলে, একটী ভদ্রলোকের বাড়ীর সম্মুখে মুন্সীকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, মজুরটা সেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল; এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে জানাইল যে,—এ গরুটা একজন ব্রাহ্মণের। ব্রাহ্মণে গরু বেচিলে বড় নিন্দা হয়—বিশেষতঃ মুসলমানকে। সেই জন্য যাঁর গরু, সেই ব্রাহ্মণ তোমার সঙ্গে দেখা করিতে চান না। তোমার যদি লওয়া মত হয়, তবে আমার নিকট ত্রিশটী টাকা দাও; আমি তাঁহাকে দিয়া আসি। পরে সেই গরু তোমাকে মাঠ হইতেই দিয়া দিব।"

মুন্সীও কোন কথা না বলিয়া টাকা কয়টী মজুরের হাতে গণিয়া দিল। মজুরটাও অবিলম্বে টাকা লইয়া বাড়ীর ভিতর গমন করিল; এবং ক্ষণপরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"সব ঠিক হইয়াছে। এইবার চল, সেই গরুটা তোমাকে মাঠ হইতে দিইগে! তোমাকে গরুটা দিয়ে, তারপরই না-হয় আমি একবার আমার কুটুম্বের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিব।" অতঃপর দু'জনে মাঠে গিয়া, মুন্সীর হাতে দড়ী-শুদ্ধ গরুটা দিয়া, মুটে বলিল,—"তুমি তবে যাও; আমি বোধ হয়, আজ আর তোমাদের ওখানে যাইব না।"

মুন্সী মহানন্দে গরুটা লইয়া বাড়ী-অভিমুখে যাত্রা করিল; মজুরটা পুনর্ব্বার গ্রামে চলিয়া গেল। মুন্সী কিছুদূর যাইতে না যাইতে গ্রাম হইতে একজন দ্রুতপদে আসিয়া মুন্সীকে কিন্তু চোর বলিয়া ধরিল। প্রথমে মুখোমুখি, শেষ হাতাহাতি! চাৎকার শুনিয়া গ্রামের কতকগুলা লোক দৌড়িয়া আসিল; কিন্তু গো-চোরের কথা যেই শোনে, সেই আর কোন কথা না কহিয়া মুন্সীকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে প্রহারিত হইয়াও মুন্সী সহজে নিস্তার পাইল না। যাহার গরু, সে এই গো-চোরকে আবার পুলিশে দিতে চায়! অবশেষে গ্রাম হইতে কয়েক জন ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং মুন্সীর মুখে আদ্যোপান্ত শুনিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া—গ্রামে গিয়া, মজুরটা যে বাড়ীটাকে গরুর মালিকের বাড়ী বলিয়া দেখাইয়াছিল ঐ বাড়ীওয়ালাকে ডাকিয়া, সমস্ত বিবরণ তাহাকে বলিলেন। সে তো শুনিয়া অবাক! ভদ্রলোকগুলি তখন ঘটনা বুঝিতে পারিয়া মজুরটাকে ধরিবার জন্য অনেক অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু তখন আর তাহার কোন উদ্দেশ কৈ? যাইহোক, অবশেষে তাঁহারা মুন্সীকে নির্দ্দোষী জানিয়া ছাড়িয়া দেন। মুন্সী বাড়ীতে আসিয়া দেখে

যে, তাহার আশ্রিত অন্যান্য মজুরগুলাও নিরুদ্দেশ!

শ্রীঃ——

দস্যু-দলপতি ঝুন্দা।

দেখিতে দেখিতে ঝুন্দা নামক আর একটী দস্যুবীর ইংরাজ-হস্তে নিহত হইলেন! ঝুন্দা ডাকাইত। কিন্তু ডাকাইত হইলেও বীর-পুরুষ। আমরা অধঃপতিত, তাই আমরা বীরের-বীরত্ব বুঝিতে পারি না; প্রকৃত বীর-কেও দস্যুউপেক্ষার সময়ে ২ অবহেলা করিয়া উড়াইয়া দিই। কিন্তু দস্যু হইলেই যে সে ঘৃণিত হইল,—অপর সহস্র গুণ থাকিতেও সে যে অবহেলিত বা বিড়ম্বিত হইবার উপযুক্ত, বাস্তবিকই কি তাই? নির্জ্জীব কাণ্ড-জ্ঞান-হীন আমাদের মনে সে ধারণা থাকে থাকুক; কিন্তু প্রকৃত বীর যাঁহারা—সাম্রাজের অধীশ্বর যাঁহারা—বিজ্ঞতার আদর্শ যাঁহারা, তাঁহারা তেমন ভাবনা মনে স্থানও দেন না। আর, সে ভাবনা তাঁহাদের মনে স্থান পাইবেই বা কি করিয়া? যখন সম্রাট-শ্রেষ্ঠ মহাবীর আলেকজান্দারের সহিত তুলনায় দস্যুবীরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়; যখন দেখা যায়, সম্রাট নিজের সুখেচ্ছার পরিতোষণায় দীনদরিদ্রের পীড়নেও কৃতসঙ্কল্প, আর দস্যুবীর আপন কামনায় জলাঞ্জলী দিয়া দীনদরিদ্রের সেবায় নিয়োজিত; যখন দেখা যায়, সম্রাট লুণ্ঠন করিয়া রাজকোষ পূর্ণ করিতেছেন, আর দস্যু সে লুণ্ঠন অনায়াসে—অবহেলে অনাথ-অতু-রের সেবায় ব্যয় করিতেছে; তখন কি আর বলিবার কিছু আছে?—কি করিয়া বলিতে পারি যে, দস্যু হইলেই সে হেয়? আর বাস্তবিকও তাহা নহে। যদি তাহাই হইবে, তবে আর লোকে কথায় কথায়—তান্তিয়ার নামে হা-হুতাশ তুলিবে কেন? তবে আর 'রবিন হুড' প্রভৃতির নামই বা কেন ইতিহাসে জলন্ত অক্ষরে লিখিত রহিবে? ঝুন্দাকে লইয়াও সেইজন্যই লোকের এত আক্ষেপ—এত আন্দোলন।

ঝুন্দা প্রথমে ভারতেশ্বরীর সেনা-বিভাগে একজন সৈনিকের পদে নিয়োজিত হন। কিন্তু কিছুদিন সেকাজ করিয়াই, ক্রমে তাঁহার তাহাতে বিরক্তি জন্মিল। সৈনিক-পরিচ্ছদ পরিয়া—প্যারেড করিয়া, ধড়াচূড়ায় সাহেব সাজিয়া সাহেবের পাছু-পাছু বেড়ান, তাঁহার মনমত হইল না। কিছুদিন পরেই তিনি সৈনিক-পদ ছাড়িয়া দিলেন। সৈনিক-পদ ছাড়িয়াই কিন্তু ডাকাইতির দিকেই তাঁহার আশক্তি হইল। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি একজন প্রধান ডাকাইত বলিয়া অভিযুক্ত হইলেন। সেই সময়ই অনেকগুলি ডাকাইতির অভি-যোগ তাঁহার বিরুদ্ধে প্রমাণ হয়; এবং তাহা-তেই তিনি ১৫ বৎসরের জন্য মিরাট-জেলে কয়েদ হয়েন। কয়েদী হইয়াও কিন্তু তিনি বীরত্ব-ক্ষমতার পরিচয় দিতে ত্রুটী করিলেন না। হঠাৎ এক দিন সকলে দেখে,—ঝুন্দা হাতের হাতকড়ি—পায়ের বেড়ী ভাঙ্গিয়া জেল হইতে পলাইতেছেন। অমনি চারিদিকে "ধর—ধর" পড়িয়া গেল—পুলিশ-প্রহরীরা তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে শশব্যস্ত হইল। ঝুন্দা সে যাত্রা আর পলাইতে পারিলেন না! অধিকন্তু এই পলায়ন-চেষ্টার অপরাধে তাঁহাকে আগ্রার সুদৃঢ় জেলখানায় প্রেরণ করা হইল; এবং সেখানে আর যাহাতে তিনি 'টুঁ' শব্দটী পর্য্যন্ত না করিতে পারেন, তাহারই বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইল।

আগ্রার জেলে কয়েদী-অবস্থায় ঝুন্দাকে কার্পেট-বোনার কাজে নিযুক্ত হয়। দেখিতে দেখিতে এই সময়ের মধ্যে, এই কার্য্যে ঝুন্দা ক্রমে বিশেষ প্রসিদ্ধি-লাভও করিয়া বসেন; সকলেই তাঁহার একার্য্যের প্রশংসা করিতে থাকে। এইরূপে এবার প্রশংসার সহিত কাটাইয়া ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ঝুন্দা কয়েদ-মুক্ত হন।

এইবার মুক্তিলাভ করিয়াই কিন্তু ঝুন্দার সুমতি হইল। ঝুন্দা এইবার প্রতিজ্ঞা করিলেন যে,—আর কখনও ডাকাইতি-ব্যবসা না করিয়া, সৎপথে থাকিয়া—সুমতি-পরিচালিত হইয়া, জীবনের অবশিষ্টাংশ কাটাইবেন। ঝুন্দার এ প্রতিজ্ঞায় বাস্তবিকই সকলেই আহ্লাদিত হইলেন; অধিক কি, গভর্ণমেণ্ট হইতে ঝুন্দাকে এই সময় বসবাস করিবার জন্য একখণ্ড জমিও প্রদত্ত হইল। ঝুন্দা এখন নিরীহ-নিরপরাধ-জীবনে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

কিন্তু আবার একি বিধিনিগ্রহ? গভর্ণমেণ্ট-প্রদত্ত ঝুন্দার সেই জমিটুকুর উপর ক্রমে একজন বণিকের লোভ পড়িল। বণিক পয়সার মহিমায়—গায়ের জোরে, কতকটা বা ষড়যন্ত্র খাটাইয়া, ঝুন্দাকে তাহা হইতে অপহৃত করিবার জন্য চেষ্টিত হইল। ঝুন্দার তখন আর উপায়ান্তর নাই! ঝুন্দা আর কি করেন? কাজেই ঝুন্দাও তাহার প্রতিশোধ দিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। ঝুন্দার ক্রোধানলে বণিককে জীবনাহুতি দিতে হইল; বিবাদের সময়, ঝুন্দার হস্তস্থিত এক তরবারির আঘাতেই বণিক পঞ্চত্ব পাইল। ঝুন্দা আবার পুলিশ-কর্ত্তৃক ধৃত হইলেন; বণিকের হত্যাপরাধে ঝুন্দাকে আবার ১৮ মাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইল।

গত নবেম্বর মাসে ঝুন্দার এই কারা-দণ্ডের অবসান হয়। এবার কিন্তু তাঁহার বড়ই নাম-ডাক—বড়ই প্রতাপ-বিক্রম! পঞ্জাবের প্রায় সকল অধিবাসীই, অধিকন্তু পুলিশ-প্রহরীরা পর্য্যন্তও, এবার তাঁহার আদর-আপ্যায়িত—সম্মান-অভ্যর্থনা করিতে থাকেন। আর, সেই সুযোগেই, এই সময় হইতেই ঝুন্দার দলবলও জুটিতে থাকে। তিনি একটী দস্যু-দলের নেতৃত্ব-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়েন।

দল বাঁধিয়া এইবার ঝুন্দা তাঁহার ডাকাইতি-ব্যবসায়টা আবার জমকাইয়া তুলিলেন। গত জানুয়ারি মাসে, তিনি বুলন্দর-সহর জেলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ডাকাইতি-কার্য্য শেষ করিয়া, মুরাদাবাদ-জেলায় লুট করিতে গমন করেন। উক্ত জেলার জাটুলিতে ডাকাইতি সারিয়া, ক্রমে মজঃফরনগরের এলাকাধীন সাতেরীতে, দিল্লির সমীপস্থ আলীপুরে এবং মিরাট-জেলার পাথুলি ও তালিয়ানায় ডাকাইতি করেন। সর্ব্বাপেক্ষা এই সময় মৌনপুরে তিনি যে ডাকাইতি করেন, তাহাতে বাহাদুরী ছিল! মিরাটের সেনানিবাস এবং কমিশনার সাহেবের আপিসের প্রায় অর্দ্ধ-পোয়া রাস্তা ব্যবধানের মধ্যে এই ডাকাইতি-ব্যাপার সাধিত হয়। অথচ এরূপ সুকৌশলে ও সাহসের সহিত সে কার্য্য সমাধা হয় যে, পুলিশ-প্রহরীরা দেখিয়াও তাঁহাদিগকে ধৃত করিতে পারেন নাই। ইহার পর ঐ সময়ে তাঁহার শেষ ডাকাইতি হইয়া-ছিল, 'পাবলী-কুর্দ্দেয়।' ঐ স্থানের বেনিয়ারা বড়ই সম্পত্তিশালী ছিল, অথচ তাহাদের ধনে কোন সৎকার্য্যের সূচনাই হইত না; অধিকন্তু ইতিপূর্ব্বে যে বেনিয়া তাঁহার জমি-টুকু ফাকি দিয়া লইয়াছিল, সেও ঐ বংশেই জন্মগ্রহণ করে;—এই সকল নানা কারণেই ঐ স্থানে ঝুন্দার দল ডাকাইতি করেন। এই ডাকাইতিতে তাঁহারা বিস্তর টাকার সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। এই লুণ্ঠন-ব্যাপারে বেনিয়াদের আরও একটা সর্ব্বনাশ হইয়া যায়। তাহাদের খাতাপত্র—দলিল-দস্তাবেজগুলিতে, আগুন লাগাইয়া, এই সময় তাঁহারা নষ্ট করেন। উক্ত বেনিয়ারা জাল জালিয়াত করিয়া—মিথ্যা খাতা-পত্র রাখিয়া অনেক গরিবের সর্ব্বনাশ করিতে-ছিল। কথিত আছে, তাহাদের সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেই—অনেক নিরীহ লোক তাহাদের প্রতারণা-ফাঁদ হইতে তখনও যাহাতে অব্যাহতি পায়, এই ভরসাতেই—ঝুন্দা বেনি-য়াদের গৃহে এই ডাকাইতি করিয়াছিলেন; এবং সাধারণের বিষম মনক্লেশ দূর করিবার

জন্যই, দলিল-দস্তাবেজে আগুণ লাগাইয়া দিয়াছিলেন।

এইরূপের কএকটা লোক-হিতকর কার্য্যেই ঝুন্দা ক্রমে অনেকেরই সহানুভূতির পাত্র হইয়া পড়েন। ঝুন্দার কোনরূপ অভাব-অনাটন পড়িলে, অর্থাৎ কোন সময়ে দস্যুবৃত্তির উপযোগী স্থান ও সুবিধা না পাইলেও তাঁহার লোকজন যাহাতে অন্নভাবে কষ্ট না পায়—এজন্যও, লোকে এই সময় হইতে তাঁহাকে সাহায্য করিতে আরম্ভ করে। এমন কি, এরূপও শুনা যায় যে, এই সময় ৫।৭ শত টাকারও আবশ্যক হইলে ঝুন্দাকে লোকে তাহা অমনি—অম্লান-বদনে প্রদান করিত। সম্প্রতি পুলিশও ঝুন্দার এরূপ সাহায্যকারী একজন বেনিয়ার পরিচয় পাইয়াছেন। এ ব্যক্তি ঝুন্দাকে পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্তও প্রদান করিত।

'পাব্‌লি-ফুর্দ্দের' বেনিয়াদিগের বাটিতে ডাকাইতির পর হইতেই, ঝুন্দার অনুসরণে পুলিশকে বিশেষ চেষ্টা পাইতে হয়। একদল অতিরিক্ত পুলিশ-প্রহরী এই সময় হইতেই ঝুন্দাকে ধরিবার জন্য নিযুক্ত হন। কিন্তু তাঁহাকে ধরিবার সাধ্য কার? এমনই তাঁহার প্রতি লোকের এই সময় অনুরাগ হইয়া পড়িয়াছে যে, ঝুন্দা কখন্ কোন্ বনে আছেন—একথা অনেকে জানিতে পারিলেও, পুলিশকে কিন্তু অঙ্কুশেও তাহা কেহই জানিতে দিত না। কাজেই পুলিশও এত ডাকাইতি-স্বত্বেও ঝুন্দাকে ধরিবার সুযোগ পান নাই। কতকটা অনুরাগ এবং কতকটা ভয়েও, লোকে কিছুতেই ঝুন্দার সন্ধান বাহির করিত না। তাঁহাকে ধরিয়া দিতে পারিলে পারিতোষিক পাইবার সম্ভাবনা থাকিলেও, কেহ দৃকপাত করিত না।

মধ্যে দলীপ নামক একটা ছোকরা কিন্তু পুলিশকে একবার ঝুন্দার সন্ধান দিয়া ফেলে। পুলিশও ঝুন্দাকে ধরিতে অগ্রসর হন। কিন্তু কি দুর্দ্দৈব! ঝুন্দা তাহাতেও ধৃত হইলেন না—ঝুন্দা-ভ্রমে পুলিশ তাঁহার এক ভ্রাতাকে গ্রেপ্তার করিয়া বাহাদুরী লইবার চেষ্টা পাইলেন! যাইহোক, সত্য কতক্ষণ ঢাকা থাকে? ক্রমে সকলেই জানিলেন, ধৃত ব্যক্তি ঝুন্দা নহে—ঝুন্দার ভাই। কাজেই পুলিশকে আরও বিব্রত হইতে হইল। ইতিপূর্ব্বে তান্তিয়াকে লইয়া পুলিশ যেরূপ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন—তখন যে তান্তিয়া বলিয়া ধরা পড়িত, সেই যেমন তান্তিয়ার অনুচর বলিয়া প্রতিপন্ন হইত—ঝুন্দাকে লইয়াও পুলিশ এখন সেই সমস্যায় পড়িলেন। ঝুন্দাকে ধরিবার জন্য পুলিশকে অধিকতর আদব-কায়দা গ্রহণ করিতে হইল।

দলীপের ষড়যন্ত্রে ঝুন্দার পরিবর্ত্তে তাঁহার ভ্রাতা ধৃত হওয়ায়, ঝুন্দার প্রাণে বড়ই বাজিল। তিনি তখন সেই বিশ্বাসঘাতক দলীপকে সমুচিত শিক্ষা দিতে সঙ্কল্প করিলেন। সেইজন্য, কৌশল করিয়া তাহার এক ভাইকে আপন দলে লইলেন; এবং তাহারই দ্বারা কৌশলে এক দিন দলীপকেও আপনার আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া সমুচিত শিক্ষা দিলেন। অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতকতা-অপরাধে ঝুন্দার হস্তে দলীপের প্রাণদণ্ড হইল। দলীপের ভ্রাতার নাম জয়নাম। জয়নাম তখন ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদে ঝুন্দার উপর বড়ই চটিল। তাঁহাকে ধরাইয়া দিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। কিন্তু সে ষড়যন্ত্র কতক্ষণ? ঝুন্দা ক্রমে তাহা জানিতে পারিলেন; জানিয়া, জয়নামকেও সমুচিত শাস্তি দিয়া পরলোকে প্রেরণ করিলেন।

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

জুয়াচোরদের এজেণ্ট-প্রেরণ।

'অনুসন্ধানের' জ্বালায় আজকাল আর জুয়াচুরীর বিজ্ঞাপন বিলি করিয়া লোক-ভুলানর

ড় একটা সুবিধা ঘটে না! কএক জন বটতলার জুয়াচোর মফঃস্বলে তাই এজেণ্ট পাঠাইয়া লোক-ভুলানর এক নূতনতর ফন্দী বাহির করিয়াছেন। অর্থাৎ আমরা বিশ্বস্ত-সূত্রে সংবাদ পাইতেছি যে, তাঁহাদের লোক মফঃস্বলের স্থানে স্থানে ঘুরিয়া, প্রথমতঃ গ্রাহক-সংগ্রহ করিয়া লইয়া, তার পর সেই বটতলাই জিনিসই দিয়া, সকলকে ঠকাইতেছে। বাবাজীরা বাস্তবিকই কৌশলী বটেন! যাইহোক, সাধারণে সাবধান হউন—ভাল করিয়া না দেখিয়া-শুনিয়া এরূপেও জুয়াচোরদের ঠকে না পড়েন, এই বাসনা।

হরিদাস রঘুনন্দন দত্তের

জুয়াচুরী-ফন্দী বাস্তবিকই কিন্তু গুরুতর! গতবারের সে প্রস্তাবটি লেখার পরও আমরা সন্ধান পাইলাম যে,—বিজ্ঞাপনটি বটতলার একখানি পঞ্জিকাতে প্রথমে বাহির হইয়াছিল। বিজ্ঞাপনে এইরূপ মর্ম্মে লেখা ছিল যে,—"সচিত্র কবিতা সুরসুন্দরী' দোল-পূজার পরই বাহির হইবে। পুস্তক যন্ত্রস্থ। অগ্রিম দাম ৸০ বার আনা; পুস্তক বাহির হইলে ১৲ এক টাকা লাগিবে। উপহার পুস্তকের মলাটের উপর গ্রাহকের নাম অঙ্কিত থাকিবে। শ্রীহরি দাস রঘুনন্দন দত্ত, অমৃতবাজার পত্রিকার কার্য্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা—এই ঠিকানায় পুস্তক পাওয়া যাইবে।" আমরা পূর্ব্বে যেরূপ অনুমান করিয়াছিলাম, এখনও দেখিতেছি, প্রকৃতই সেই ভাবেই প্রতারক ডাকঘরের সাহায্যে চিঠিপত্র লইতেছিল। যাইহোক, যাঁহারা অর্ডারও দিয়াছেন, তাঁহারা এখনও সাবধান—প্যাকেট কিছুতেই মাশুল দিয়া লইবেন না। আমরা এ বিষয় সত্বরই পুলিশের গোচরে আনিয়া প্রতিকারের চেষ্টা পাইতেছি।

প্রতারক গ্রাহকগণ।

কেবলমাত্র যে কএকজন পুস্তকব্যবসায়ীই জালজুয়াচুরী অবলম্বন করিয়াছেন, এরূপ নহে। মফঃস্বলের অনেক গ্রাহকও এই অপরাধে অপরাধী। আমরা নিজেরাও এরূপ অনেকের কার্য্যকলাপের পরিচয় তো পাই-ই; অধিকন্তু অনেক সময় অনেক ব্যবসায়ীও আমাদিগকে এজন্য অভিযোগ করেন; তাঁহারা বলেন,—"আপনারা মফঃস্বলবাসীকে সাবধান করিতে চেষ্টা পাইতেছেন, ভাল! কিন্তু মফঃস্বলের প্রতারক গ্রাহকদের জ্বালায় আমরা যে অস্থির, তাহার উপায় কি?" বাস্তবিকই একথাটা উপেক্ষার নহে। কাগজ ধারে একবার পাইলে, অনেকেই তো আর উপুড়-হস্ত করিতে চাহেন না; অধিকন্তু অর্ডার দিয়া—ভ্যালুতে পাঠাইলে টাকা দিয়া প্যাকেট লইব বলিয়াও, আজকাল অনেকেই দেখিতেছি, তাহা 'রিফিউজ' করিয়া থাকেন। এ রোগ কিন্তু বড়ই গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে! সত্বর ইহার একটা প্রতিকার না হইলেই নয়!

সম্প্রতি 'দরিদ্র-রঞ্জনের' কার্য্যাধ্যক্ষ বাবু রাধানাথ মিত্র মহাশয় বড়ই দুঃখে আমাদিগকে এ-সম্বন্ধে একখানি পত্র লিখিয়াছেন। "বাবু যশোদালাল তালুকদার, তারাটিয়া লাইব্রেরীর সম্পাদক, লৌহজঙ্গ পোঃ, ঢাকা"—হইতে তাঁহাকে পত্রিকা পাঠাইতে অর্ডার দিয়া শেষে গ্রহণ করেন নাই—এই তাঁহার অভিযোগ! খরচাটাও রাধানাথ বাবুর তাহাতে জলে গিয়াছে। তাই তিনি এরূপ সকল গ্রাহকের সুশাস্তির উপায় কি, জানিতে চাহেন। আমরা বলি, এরূপ দু'টা-একটাকে এক-আদবার জব্দ করিয়া দেওয়া কিন্তু মন্দ নহে! দশজনে যদি যোগ দেন, আমাদেরও তাহাতে সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। নহিলে, সদ্ব্যবসায়ীদের আরও বিড়ম্বনার সম্ভাবনা। এসম্বন্ধীয় আমাদের আরও অনেক বক্তব্য বারান্তরে বলিবার বাসনা রহিল।

সংবাদ।

—ক্রমে দেখিতেছি, গড়াইতেছেও ঢের। সম্প্রতি যশোহর হইতে এই এক নূতন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে, তথাকার খৃষ্টান-পাদ্রীরা যাত্রার দল বাঁধিয়া আবার লোক ভুলাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। অর্থাৎ আমাদের যেমন রামকৃষ্ণকে লইয়া যাত্রার পালা গাওয়া হয়, কএকজন রোমান-ক্যাথলিক জুটিয়া সেইরূপ যীশু-খৃষ্টের কীর্ত্তিকাহিনী লইয়া এক যাত্রার দল বাঁধিয়া বসিয়াছেন। ধর্ম্মের জাহিরই নাকি বাবাজীদের মতলব!

—সাহুল্লা কাশী নামক একজন মুসলমানের নিকট অপর একব্যক্তি ছ'আনার পয়সা পাইত। সাহুল্লা একটা পয়সায় পারা মাখাইয়া আধুলি করিয়া সেটি তাহাকে প্রদান করে। সে কিন্তু পরে সাহুর প্রতারণা বুঝিতে পারিয়া পুলিসে সংবাদ দেয়; এবং পুলিসের সন্ধানে সাহুর ঘর হইতে এরূপ আরও ৫টা জাল আধুলী পাওয়া যায়। যাহা হোক, অপরাধ সাব্যস্থ হওয়ায়, সাহুর ছ'মাস জেল হইয়াছে।

—কলিকাতায় একটা অপূর্ব্ব মেয়ে আসিয়াছে; সকলকে সে বড়ই যাদুতে ফেলিয়াছে। গত ২৩ এ মার্চ্চ রাত্রিতে ওয়েলেস্‌লী-ষ্ট্রীটের রাস্তার উপর বসিয়া সে যেন এক কাঁড়ি টাকা ছড়াইয়া দিতেছিল, লোকে হঠাৎ এইরূপ তার ক্রীড়া দেখিতে পায়। তার পর হইতেই তাকে লইয়া হুলস্থূল!

—একটী গয়লার মেয়ে। কাশীপুরের দয়াল ঘোষের বাড়ীতে দুধ যোগায়। মেয়েটী দেখিতে ভাল—বয়সও কম—চেহারাখানারও চটক আছে! দয়ালচাঁদের ভাই মেয়েটীতে লোভ পড়িল! কয়দিন হইতেই তিনি কৌশল খোঁজেন, কি করিয়া মেয়েটিকে হাত করা যায়! কিন্তু কিছুতেই তেমন সুবিধা হইল না। অবশেষে তিনি একদিন একখানি গাড়ীতে চড়িয়া, আরও দুইটী লোকের সঙ্গে, সেই মেয়েটার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মেয়েটা দুধ বেচিতে বাহির হইলেই তাহাকে গাড়িতে তুলিয়া চম্পট দিবেন, এই বাসনা। ক্রমে কাজেও গড়াইল তাই। প্রাতেই যেমন দুধের ভাঁড় হাতে করিয়া সে বাড়ীর বাহির হইল, অমনি বাবুরা তাকে ধরিয়া বসিলেন। ধরিয়াই গাড়ীতে তুলিয়া গাড়ী হাঁকাইলেন। গাড়ী ক্রমে একটা বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাবু তখন মেয়েটাকে পাইয়া বসিলেন, বিবাহ করিবেন বলিয়া ভুলাইলেন। বাবুর সঙ্গের অপর দুইজন বেগতিক দেখিয়া এই সময় পলায়ন করেন। বাবুই সুতরাং তখন একমাত্র। বাবুরই সহিত, কিজানি কোন বিধানক্রমে, মেয়েটির বিবাহও হইল। এদিকে এতদূর গড়াইতেছে, এমন সময় কিন্তু পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে হাজির! বাবু কাজেই ধরা পড়িয়াছেন। বিচার চলিতেছে। সহরের পার্শ্বে দিনে-দুপুরে এমন এরূপ বীভৎস কাণ্ড!—কি লজ্জা-কি ক্ষোভের বিষয়!

—ছয় জন যুবক সম্প্রতি গয়া-জেলার সন্নিকস্থ একটী জঙ্গলে শীকার করিতে যান। শীকার খুঁজিতেছেন, এমন সময়েই কিন্তু একটা ভয়ানক ব্যাঘ্র বিকট চিৎকার করিতে করিতে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। বাকের তিনজন তো অজ্ঞান অচৈতন্য! দুইজন গাছে চড়িলেন। অবশিষ্ট একটী বাঙ্গালী বাবু—তিনি কেবল তখন বাঘের সম্মুখে পড়িলেন। প্রাণের দায়ে বাবুটী তখন গুলি ছুড়িলেন। বাঘের চোখে গুলি লাগিল—বাঘও একটু কাবু হইয়া পড়িল। বাবুটী তখন আরও একটী গুলি মারিলেন। ব্যাঘ্রের তাহাতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্তি! যাহা হোক বাঙ্গালী যুবকের এই সাহসের জন্য গয়ায় কিন্তু গাড়ি ধন্য ধন্য পড়িয়াছে; এবং তথাকার মাজিষ্ট্রেট যুবকটীকে একটী সুন্দর বন্দুক ও একটী স্বর্ণপদক পুরস্কার দিয়াছেন।

—ভিক্ষুকের বেশ, কিন্তু পেশা ডাকাইতি—এইরূপ একটী দলের আটজন লোক সম্প্রতি রাজপুতানার অন্তর্গত বান্দু নামক স্থানে ধৃত হইয়াছে। ইহারা দিনমানে ভিক্ষুকের মত বেড়াইত, আর রাত হইলেই ডাকাইতি করিত। এইরূপে ভাঙ্গড়,থানার, কানিয়ান এবং বম্বেতে পর্য্যন্ত ইহারা নানা ডাকাইতি করিয়াছিল। অথচ কেহই এপর্য্যন্ত উহাদের ধরিতে পারেন নাই। শেষে ভিক্ষুকের বেশ, অথচ সঙ্গে নানা অপহৃত দ্রব্যাদি—এই সন্দেহেই থানা-পুলিসের হেড কনেষ্টবোলের মনে সন্দেহ হইয়াছিল। এবং সেই সন্দেহমতই, উহাদের নিকট সন্ধান করায় প্রায় ১৬ শত টাকার দ্রব্য বাহির হয়। মুক্তা ও জহরৎ প্রভৃতি অনেক দামি জিনিসও উহাদের নিকট পাওয়া গিয়াছে। এখন সন্ধান হইতেছে, উহারা কোথা হইতে কি চুরি করিয়া আনিয়াছে।

—একজন পুলিশের প্রহরী দুইজন বদমাইসের সর্দ্দারী লইয়া সম্প্রতি উত্তর-ভারতের কর্ণেলগঞ্জের এক সেকরার বাড়ীতে চুরী করিয়াছে। চুরিটা যখন হয়, প্রহরী তখন সেই কাণ্ড-স্থলে পুলিসেরই পরিচ্ছেদ পরিয়া উপস্থিত ছিলেন। পাহারাও দিতেছিলেন সত্য! তবে তাঁহার তখনকার সে পাহারাগিরী কিন্তু নূতন ধরণের! অর্থাৎ গৃহস্থ যাহাতে চোর ধরিতে পারে, তাঁহার পাহারার মতলব সেরূপ না হইয়া গৃহস্থকে যাহাতে চোর বেশ ভালরকম ফাকি দিতে পারে,—এই তাঁহার চেষ্টা ছিল। চেষ্টা যেরূপ থাকুক, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কারণ, চোর কয়জন ঘর হইতে বাক্স বাহির করিয়া তাঁহার হাতে যেমন রাখিতে দেয়, অমনই গৃহস্বামী জাগিয়া উঠেন। আর জাগিয়াই তাঁহাকে ধরিয়া বসেন। এখন আবার তাঁর সকল ষড়যন্ত্র বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

মোক্তারী পরীক্ষার ফল।

গত ১৯এ ও ২০এ ফেব্রুয়ারী যে মোক্তারী পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল, তাহাতে নিম্নের ব্যক্তিগণ উত্তীর্ণ হইয়াছেন,—

রোল নং	নাম।
২	নলিনীমোহন লাহিড়ী
৬	যদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
২৫	চিন্তাহরণ রায় চৌধুরী
২৯	দক্ষিণাকুমার চৌধুরী
৩৩	কালীপ্রসাদ সেন
৩৫	আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়
৩৫	নরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ
৩৭	মুনীন্দ্রনারায়ণ খাঁদাইত
৩৮	রামজীবন চট্টোপাধ্যায়
৪৫	অযোধ্যাপ্রসাদ ভট্ট
৫০	কমলা সহায়
৬০	সেখ আমির আলি
৬৭	কিকুলাল দাস
৬৯	আমিন উদ্দীন
৭৫	কানাইলাল ঘোষ
৭৬	রামকৃষ্ণ অধিকারী
৭৭	যোগেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৮২	মধুসূদন উপাধ্যায়
৮৩	কান্তিচন্দ্র রায়
৮৫	অভয়াবিহারী রায়
৮৬	হারলাল ষণ্ডক
৯৯	হারকুমার চট্টোপাধ্যায়
১০০	যজ্ঞেশ্বর সরকার
১১৩	তারাচরণ চৌধুরী
১১৯	আবদুল আজিজ
১২৮	আবদুল রফ্
১৩৬	পরমেশ্বর দয়াল
১৩৯	গোরক্ষনাথ
১৪১	পরমেশ্বরী প্রসাদ
১৪৭	A তিনকুলাল
১৫০	গণেশ্বর রায়
১৫৩	মায়াবর দাস
১৫৭	গোপালচরণ দাস
১৫৮	গোপাল শ্যামদানী
১৬০	দামোদর পট্টনায়ক
১৬২	ধ্রুবচরণ দাস
১৮৫	কুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায়
১৮৬	আদিত্যচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯২	প্রতাপচন্দ্র সমাজপতি
২০৭	ক্ষিরোদলাল মুখোপাধ্যায়
২০৮	সারদামঙ্গল চক্রবর্ত্তী
২২২	শরতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
২২৪	বিধুভূষণ সেন
২২৫	উপেন্দ্রচন্দ্র দে
২৩১	জমায়েত বিশ্বাস
২৩২	নাসিরুদ্দীন খাঁ
২৩৩	হরচন্দ্র লাহিড়ী
২৩৬	কালু মিঞা
২৪০	নরসিং নারায়ণ
২৪৬	গৌরীচরণ
২৪৯	লাল কিষণ লাল
২৫০	সৈয়দ আলী নাবী
২৫২	জগমোহন রাম
২৫৩	মাহাদেও প্রসাদ
২৫৫	রামপ্রসাদ
২৬৯	পরেশনাথ মুখোপাধ্যায়
২৭২	বঙ্কুবিহারী বিশ্বাস
২৮৩	রাধাকান্ত চক্রবর্ত্তী
২৮৯	নবকুমার চৌধুরী
২৯২	নাসিরুদ্দীন সেখ
২৯৬	রাধিকাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
৩০২	সত্যগোপাল পট্টনায়ক
৩০৭	নকুড়চন্দ্র সরকার
৩২০	নৃসিংহচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৩২৪	যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ
৩২৭	উমেশচন্দ্র রায়
৩৩০	সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৩৪	কামরুদ্দীন আহম্মদ
৩৩৭	প্রসন্ননাথ মজুমদার
৩৩৫	হারপ্রসন্ন আচার্য্য
৩৪৭	দুর্গাচরণ দত্ত
৩৬২	মথুরচন্দ্র বৈশ্য
৩৬৪	মহম্মদ আবদুল আলী
৩৭৪	সাদরুদ্দীন আহম্মদ
৩৭৬	মথুরানাথ ভৌমিক
৩৯২	আফজোদ্দীন
৩৯৬	হারহর সুর
৩৯৮	কেরামত আলী
৪০০	আব্বাস্ আলী
৪০৬	জ্যোতীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়
৪০৯	সতীশচন্দ্র আচার্য্য
৪১০	গোপালচন্দ্র সরকার
৪১১	শ্রীশচন্দ্র মিত্র
৪১২	হরিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
৪১৫	মকরধ্বজ সহায়
৪১৮	গজধর প্রসাদ
৪২০	বলদেও সহায়
৪২১	ফতাউল আজিজ
৪২৫	জিতান প্রসাদ
৪২৮	সুরাজ বংশীলাল
৪৩০	হরিহর প্রসাদ
৪৩১	মজহর-উল হগ
৪৩২	B নন্দকুমার
৪৩৪	কেশবনাথ বিশ্বাস
৪৩৫	প্রিয়নাথ গুহ
৪৩৬	আলী আকবার
৪৪৩	গিরিধর সাহা
৪৪৪	মুকুন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
৪৪৯	বীরেশ্বর কুণ্ডু
৪৫৬	মদন লাল
৪৬১	দ্বারকানাথ সাতিয়ার
৪৬৬	সাধু উদ্দীন মিঞা
৪৭৫	প্রসন্ননাথ রায়
৪৭৬	নরেন্দ্রনন্দন গুপ্ত
৪৯৮	ভবানীকান্ত চক্রবর্ত্তী
৫০২	আবির মহম্মদ সরকার
৫১১	রামলাল ঘোষ
৫১৭	হেমন্তকুমার চক্রবর্ত্তী
৫২৬	রাজীবলোচন চক্রবর্ত্তী
৫৩৫	রামারদ ওঝা
৫৩৬	সারদাপ্রসাদ মিত্র
৫৪০	গণেশপ্রসাদ নং ১ মহাবীর প্রসাদের পুত্র।
৫৪৬	মহাশপৎ লাল
৫৪৭	মুকুন্দলাল
৫৪৮	নবাবচাঁদ
৫৪৯	নুরুল আইন
৫৫০	রামবদন সিংহ
৫৫৫	হারশচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী
৫৬২	চামহুল আলী
৫৬৩	আমানুদ্দীন

৫৭২ আকামত আলী
৫৮০ আব্দুল হামিদ
৫৮১ জগদ্বন্ধু ভৌমিক
৫৮৭ আস্রফ্ আলী
৫৯৪ কালীমোহন কর চৌধুরী
৫৯৭ গিরোয়ারধারী লাল
৬০০ জং বাহাদুর
৬০২ গোপাল সহায়
৬০৯ মৈনাল হক
৬১০ আলীমুদ্দীন হোসেন
৬১১ রাজেন্দ্র সহায়
৬১৬ জহুরুদ্দীন
৬২১ হেমনারায়ণ
৬২৭ রাজেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
৬৩২ হরিমোহন সিংহ
৬৩৩ বিধুভূষণ মিত্র
৬৩৫ শশীভূষণ দাস
৬৩৬ দেবেন্দ্রনাথ বসু
৬৩৭ নটবেহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
৬৪০ লখিয়াত উল্লা
৬৪৫ উপেন্দ্রলাল হাজরা
৬৫১ নটবর রাহা
৬৫২ রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৬৫৬ হেমলাল ভট্টাচার্য্য
৬৬৩ হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
৬৬৬ বিষ্ণুকিশোর চক্রবর্ত্তী
৬৬৮ হেমচন্দ্র অর্ণব
৬৬৯ হরিশ্চন্দ্র লাহিড়ী

বর্দ্ধমান-বিভাগের

মধ্য-ইংরাজী ছাত্রবৃত্তি

পরীক্ষার ফল।

জেলা—বর্দ্ধমান।

প্রথমবিভাগ-পারদর্শিতাক্রমে।

ভাগবত গোস্বামী বাঘ্‌নাপাড়া
শচীপতি ভট্টাচার্য্য মশাগ্রাম
দ্বারকানন্দ ঠাকুর শ্রীখণ্ড

দ্বিতীয়বিভাগ-পারদর্শিতাক্রমে।

আশুতোষ সরকার মৌগ্রাম
কেদারনাথ ঘোষ ঐ
নিত্যানন্দ মণ্ডল বড়বেলুন
বসন্তকুমার কুণ্ডু শ্রীখণ্ড
বিরিঞ্চিপদ বড়াল মাজিগ্রাম
শরদিন্দু চক্রবর্ত্তী মৌগ্রাম
বিনোদবিহারীচক্রঃ বাঘ্‌নাপাড়া
কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যো। গোপালপুর
বিজয়গোপাল দত্ত বড়বেলুন
পঞ্চানন প্রামাণিক শ্রীকৃষ্ণপুর
চারুচন্দ্রভট্টাচার্য্য গোপালনগর
সতীশচন্দ্র মণ্ডল ঐ
গদাধর সেন বোহার
সতীশচন্দ্র মিত্র বড়বেলুন
নরহরিবিলাস ঠাকুর শ্রীখণ্ড
মহেন্দ্রনাথবিশ্বাস এ.ভি.সাহীন
রজনীশেখর রায় শ্রীখণ্ড
শরচ্চন্দ্র বন্দ্যো। গোপালনগর
কাঙ্গালচন্দ্র নন্দি অণ্ডাল

তৃতীয় বিভাগ।

দুঃখিরাম মুখো জৌগ্রাম
তিনকড়ি গোস্বামি গোপালনগর
শ্যামাদাস চট্টো। কুচুট
বরদাপ্রসাদ চট্টো। ঐ
আশুতোষ কোঙার শ্রীধরপুর
পশুপতি দাস বারুয়া
রামদাস বসু ঐ
সতীশচন্দ্র গোস্বামি নাসিগ্রাম
ভোলানাথ সরকার প্রাইভেট
নিশিভূষণ মুখো গোপালপুর
দুর্গাগতি মুখো উখড়া
গোবিন্দচন্দ্র মুখো ঐ
শশিভূষণ বন্দ্যো। ঐ
সুরেন্দ্রনাথ রায় অণ্ডাল
রজনীকান্ত মুখো নড়িহা
অবিনাশচন্দ্র মুখো ঐ
চারুচন্দ্র ঘোষ বরাকর
রজনীভূষণ মুখো আসানসোল
তিনকড়িমিশ্র গুহগ্রাম
মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল ঐ
হরিপদমজুমদার শ্রীখণ্ড
রাধিকানাথ দাস গুপ্ত ঐ
আশুতোষ ঘোষ ওকড়শা
নগেন্দ্রচন্দ্র আচার্য্য ঐ
হরিপদ ঘোষ ঐ
ক্ষেত্রনাথ মিত্র কাইগ্রাম
রাখালদাস ঘটক ঐ
বামনদাস রায় মাথরুণ
যতীন্দ্রনাথ চৌধুরি মাজিগ্রাম
শরচ্চন্দ্র দত্ত ঐ
তিনকড়ি চট্টো। রায়না
নরেন্দ্রনাথ বসু ঐ
সারদাপ্রসাদ ঘোষ পলাশন
শরচ্চন্দ্র চট্টো। আজাপুর
বিধুভূষণপাল নোদ্‌না বারশালি
রামযোগীন্দ্রপাল আনখোল
আশুতোষ ঘোষ ঐ

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ ইংরাজীতে উত্তীর্ণ না হওয়ায় ছাত্রবৃত্তিতে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

দ্বিতীয়বিভাগ—পারদর্শিতাক্রমে।

নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী যামনা
মহেন্দ্রনাথ চট্টো। বরাকর
ভোলানাথ সরকার বড়বেলুন

তৃতীয় বিভাগ।

গোবিন্দপ্রসাদ চট্টো। নাসিগ্রাম
শ্যামাপদ মুখো ঐ
সুরেশচন্দ্র মুখো নড়িহা
অন্নদাপদ মল্লিক শ্রীখণ্ড
যোগেশচন্দ্র দে মাথরুণ
ধর্ম্মদাস রায় ঝাউডাঙ্গা
জয়কৃষ্ণ সামন্ত রায়না
অতুলবিহারী সোম ঐ
শরচ্চন্দ্র চট্টো। শ্রীকৃষ্ণপুর
ক্ষুদিরাম বন্দ্যো। নোদ্‌নাবারশালি

জেলা—বাঁকুড়া।

প্রথম বিভাগ-পারদর্শিতাক্রমে।

প্রমথনাথ সেন বাঁকুড়া-মিশন
রামকিঙ্কর চট্টো। রাজগ্রাম

দ্বিতীয় বিভাগ।

প্রমথনাথ বন্দ্যো। বাঁকুড়ামিশন
ভুবনমোহন চট্টো। প্রাইভেট
অতুলকৃষ্ণ চৌধুরী বাঁকুড়ামিশন
হারাধন মুখো সলদাজয়পুর
রাখালদাস মুখো। খাতড়া
চন্দ্রশেখর সরকার ওন্দা

তৃতীয় বিভাগ।

শশিভূষণ বন্দ্যো। রাজগ্রাম
শশিভূষণ ঘোষ বাঁকুড়ামিশন

ফকিরচন্দ্র দত্ত বাঁকুড়া
উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী খাতড়া
রজনীকান্ত চৌধুরী ইন্দাস
হারাধন দত্ত আকুই
শ্রীপতিলাল নন্দী ওন্দা
বঙ্কুবিহারী পাল সংসার

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ ইংরাজীতে উত্তীর্ণ না হওয়ায় ছাত্রবৃত্তিতে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

দ্বিতীয় বিভাগ।

গিরিশচন্দ্র বন্দ্যো। শিক্ষক
আশুতোষ সরকার সাহসপুর
বসন্তরঞ্জনদাস বাঁকুড়া-মিশন

তৃতীয় বিভাগ।

উদয়চন্দ্র বন্দ্যো। বাঁকুড়া-মিশন
তারিণীপ্রসাদ বন্দ্যো। ঐ
সুরেন্দ্রনাথ সরকার সাহসপুর

বর্দ্ধমান বিভাগের

মধ্য-বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি

পরীক্ষার ফল।

জেলা—বাঁকুড়া।

প্রথম বিভাগ—পারদর্শিতাক্রমে।

নটবর দত্ত বাঁকাদহ
মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী পলাসডাঙ্গা
বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষাল রাইপুর
রামবিষ্ণু হোতা সিমলাপাল
হরিনাথ পাঁড়ে মালিয়াড়া
দ্বারকানাথ সিংহ সিমলাপাল

দ্বিতীয় বিভাগ।

যজ্ঞেশ্বর রায় বন-আসুরিয়া
মহেন্দ্রনাথ হাজরা টানাদীঘী
বিহারীলাল নাপিত সিমলাপাল
শৈলজাকান্ত কুণ্ডু খোসবাগ
শ্রীশচন্দ্র সিংহ পথন্না
অযোধ্যানাথ সিংহ সিমলাপাল
গোপেশ্বর বন্দ্যো। বিষ্ণুপুর
ব্রজনাথ দাস সিমলাপাল
শশিভূষণ মুখো রাধানগর
গোলকনাথ ঘোষ পথন্না
সনাতন নাপিত পুরন্দরপুর
কেশবচন্দ্র দে শিক্ষক
কালিচরণ বন্দ্যো। রাধামনগর
আশুতোষ বন্দ্যো। সংসার
দাশরথি বন্দ্যো। সিমলাপাল
হেমচন্দ্র পুজারি বিষ্ণুপুর
গোপালচন্দ্র চট্টো। রাইপুর
কেদারনাথনিয়োগী বেলেতোড়
প্রেমচাঁদ মণ্ডল কেঁজাকুঁড়া
প্রমথনাথ বন্দ্যো। বিষ্ণুপুর
রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ শিক্ষক
মহেন্দ্রনাথ পাল বাঁকুড়ামিশন
যোগীন্দ্রনাথচক্রবর্ত্তী বেলেতোড়
বিশ্বেশ্বর রায় বন-আসুরিয়া
যশোদানন্দ সাধু পাবড়াসার্কেল

তৃতীয় বিভাগ।

হৃষীকেশ মুখো বাকিসেন্দ্রা
সিতিকণ্ঠ ঘোষাল ঐ
রাজারাম নায়ক পুরন্দরপুর
হরেকৃষ্ণ দে রাজগ্রাম
দিগাম্বর মণ্ডল শুশুনিয়া
বিহারীলাল দেঘরিয়া ছাতনা
ঈশ্বরচন্দ্র পাইন গুন্নাথসার্কেল
মানগোবিন্দ রায় মসাড়া নৈশ
দোলগোবিন্দ সরকার তেলেণ্ডা
গোকুলবিহারী দাস ঐ
কৃষ্ণধন পাণ্ডত ইসলামপুর
বিভূতিভূষণদাসগুপ্ত হাড়মাসড়া
গোবিন্দচন্দ্র গোস্বামী ঘোলকুণ্ড
রাধানাথ চক্রবর্ত্তী শিক্ষক
বিপিনবিহারী বিশ্বাস ঐ
ঈশ্বরচন্দ্র রায় ঐ
জীবনদাস মহান্ত ঐ
শশিভূষণ মুখো ঐ
কাজি আফ্‌দারআলি খোসবাগ
গোষ্ঠবিহারী গঙ্গো বেলুট
ত্রিলোচন মিশ্র নালিয়াড়া
সুরেশচন্দ্র সিদ্ধান্ত ভড়া
নিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঐ
শরচ্চন্দ্র বন্দ্যো। বিষ্ণুপুর
হরিপদ দে কুচিয়াকোল
উপেন্দ্রনাথ কলে ঐ
জ্যোতিশ্চন্দ্র বিশ্বাস ঐ
শিবচন্দ্র বিশ্বাস ঐ
সতীশচন্দ্র চট্টো। পাঁচাল
অন্নদাপ্রসাদ ঠাকুর রাধানগর
শরচ্চন্দ্র মল্লিক ঐ
উপেন্দ্রনাথ দাস পেনো
হেমচন্দ্র গোস্বামী টানাদীঘী
শরচ্চন্দ্র কুণ্ডার জীবট্যা নৈশ
মহেন্দ্রনাথ মণ্ডল ঐ
অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল আমদহি
শশিভূষণ সাহা লেগো মডেল
মৃগেন্দ্রনাথ ভাণ্ডারী ঐ
শেখ মকবুল ইন্দাস
সীতানাথ সরকার ঐ
অজয়চন্দ্র মণ্ডল আমদহি
হৃষীকেশ রায় ঐ
অক্ষয়কুমার রায় সিমলাপাল

জেলা—বর্দ্ধমান

প্রথমবিভাগ—পারদর্শিতাক্রমে।

হেরম্বলালঘোষ কালিকাপুর
মণীন্দ্রনাথ নায়ক গলসিবোর্ড
দানবারি কোঙার বাদুলারাজডঙ্গা
রামপদ কুণ্ডু শ্রীবাটী
গোবিন্দচন্দ্র দে গলসিবোর্ড
গৌরকৃষ্ণ বন্দ্যো। পাচণ্ডি
বিজয়রাম চক্রবর্ত্তী পিপলুন
প্রমথনাথ বসু শুশুনিয়াবোর্ড

দ্বিতীয়বিভাগ—পারদর্শিতাক্রমে।

ক্ষেত্রনাথ চট্টো। বড়বেলুন
রামরাম চেন্দ্র কাটোয়া
শশধর চক্রবর্ত্তী কাঞ্চনগর
নিতাইপদ রেজ কুসুমগ্রাম
নরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পুটসুড়ি
সত্যকিঙ্কর চৌধুরি ঐ
কৃষ্ণকিঙ্কর ঠাকুর মাহুলি
রাখালচন্দ্র সাহা শ্রীখণ্ড
নিধরচন্দ্র মণ্ডল বাহাবপুর
সুরেন্দ্রনাথ যশ পালগ্রাম
শ্রীপদ রায় কড়ুই
হরিপদ সিংহ সাঙ্গপুর
শিবদাস রায় নাসিগ্রাম
দেবেন্দ্রনাথ বসু আহারবেলনা
রামনারায়ণ মুখো দ্বারনড়ি
পঞ্চানন পাল পিপলুন
কৃষ্ণচন্দ্র যশ প্রাইভেট
আনন্দপ্রসাদচক্রঃ শুশুনিয়া

মহাদেব ঘোষ	শ্রীখণ্ড
আশুতোষ চৌধুরী	ঐ
কালিপ্রসাদ সরকার	সাদিপুর
চণ্ডীচরণ দাস	শাঁকো
অবিনাশচন্দ্র রায়	মাস্থন্দী
কৃষ্ণচন্দ্র কর্ম্মকার	মামুদপুর
নিত্যানন্দ সরকার	মাস্থন্দী
হরিহর অধিকারী	গণপুর
বিজয়চন্দ্র ভট্টাঃ	গোপালনগর
নিতাইচাঁদরায়	নাসিগ্রাম

তৃতীয় বিভাগ।

সেখ ফকিরমহম্মদ	বোহার
নগেন্দ্রনাথ বসু	বর্দ্ধমান রাজ
বামাপদ মুখো	মণ্ডলগ্রাম
সেখ মহম্মদ	ঐ
সতীশচন্দ্র ঘোষ	সমঙ্গা
অনন্তমোহন রায়	ঐ
ভোলানাথ সরকার	ঐ
পূর্ণচন্দ্র চট্টরাজ	মাহাতা
যুগলচন্দ্র রায়	শাঁকো
অমূল্যরত্ন চট্টো	প্রাইভেট
অবিনাশচন্দ্র মণ্ডল	আলমপুর
সতীশচন্দ্র চৌধুরী	আমলপুর
যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	ঐ
রামদাস দাস	ঐ
দক্ষিণেশ্বর নন্দী	মাথরুণ
ইন্দ্রনারায়ণ চট্টো	কালিকাপুর
শেখ চাঁদ	ঐ
সমসুদ্দি সেখ	কড়ুই
ললিতমাধব দাস ঠাকুর	মাস্থন্দী
শরচ্চন্দ্র মুখো	পালিগ্রাম
দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার	ঐ
সুরেশচন্দ্র মিত্র	ঐ
ভূষণচন্দ্র সামন্ত	ক্ষীরগ্রাম
শরচ্চন্দ্র মজুমদার	পাচণ্ডা
গোপেশ্বর দাস	ঐ
ভুজঙ্গভূষণ মুখো	কাটোয়াআর্য্য
ধর্ম্মদাস দত্ত	চন্দ্রহাটী
আশুতোষচট্টো	বহড়ন
রামপদ দত্ত	মুণ্ডলী
অকিঞ্চন আচার্য্য	ঐ
ভুবনমোঃ চট্টো	নোদ্‌নাবারশালি
শেখ আবদুল	ঐ
রামকৃষ্ণ দাস	আহারবেলমা
পূর্ণচন্দ্র নায়ক	বোকড়া
খাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	ঐ
বগলাচরণ চক্রবর্ত্তী	কাইতি
অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	ঐ
গঙ্গারাম মণ্ডল	ঐ
অখিলচন্দ্র সিংহ	দীগুনগর
শশিভূষণ মুখো	গলসী-বোর্ড
রামপদ চট্টো	দ্বারনড়া
সচ্চিদানন্দ মুখো	বিল্বগ্রাম
অটলবিহারী রায়	জামনা
সুরেশ্বর মণ্ডল	ঐ
নৃত্যগোপাল মল্লিক	ঐ
পুলিনবিহারীদত্ত	পিপলুন
সুরেশচন্দ্র রায়	শুশুনিয়া বোর্ড
উপেন্দ্রনাথ নন্দি	ঐ
হরিদাসকোঙার	বাদলারাজডাঙ্গ
সত্যচরণ ঘোষ	গোদা
ভবানীচরণ সরকার	কালনা
কিরণচন্দ্র পাল	নালগোড়ে
নয়নতারা হুই	সিনা
ধর্ম্মদাস মাজি	ঐ

ডেপুটি মাজিষ্টারি পরীক্ষার ফল।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ১৮৯০ সালে ডেপুটী মাজেষ্টরী পদ পাইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন ;—শ্রীযুক্ত রামনাথ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, ; মৌলবী মহাম্মদ আব্বাস আলি এম, এ, ; শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি, এ, ; শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সরকার ; শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস এম, এ. ; মৌলবী সেখ আবদুল্লা ; শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ দত্ত বি, এ, ; মৌলবী সৈয়দ আলি হোসেন বি, এ, ; শ্রীযুক্ত ব্রজদুল ভ হাজরা বি, এ, শ্রীযুক্ত নবীন চন্দ্র কর বি, এ, ; শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দাস গুপ্ত বি, এ, ; এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন ।

ইহাঁরা ছাড়া শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী সিং[illegible], এ. বি, এল এবং শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়বি, এ, ইহাঁরাও কর্ম্ম পাইবার উপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছেন। বার জনের অধিক লোকএবৎসর নিয়োগ করা প্রয়োজন হইলে, ইহাঁরা দুইজনও কর্ম্ম পাইবেন।

ওকালতী পরীক্ষার ফল।

এবার নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ওকালতী পরীক্ষায় পাশ হইয়াছেন,—ইন্দ্রচন্দ্র সুর, রায়পদ সিংহ, শীতলপ্রসাদ মিশ্র, হরিপ্রসন্ন বসু, শ্রীশচন্দ্র সেন, মহেন্দ্র চন্দ্র সেন, রমেশচন্দ্র শসমল, কৈলাসচন্দ্র নিয়োগী, সূর্য্যকুমার, শম্ভুনাথ সিংহ, মহম্মদ নূর, কৃষ্ণসুন্দর সরকার, অম্বিকাপ্রসাদ, দিবাকর প্রসাদ, রামহরি সহায়, কিশোরীমোহন পাল, হরিদাস বক্সি, বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় আবদুল রহিম এবং কুঞ্জবিহারী দত্ত।

ইহাঁরাব্যতীত চন্দ্রকুমার শর্ম্মা, পিয়ারীলাল সোম, ব্রজসুন্দর শর্ম্মা এবং হরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ, কেবল মাত্র আসামরাজ্যে ওকালতি করিতে পারিবেন।

অনুসন্ধান।

ক্রোড়পত্র।

৫ই চৈত্র, ১২৯৬ সাল।

বক্তব্য।

'অনুসন্ধান'-পত্রের উন্নতির জন্য আমরা যে নানা-প্রকারে চেষ্টা পাইতেছি, তাহা আর কাহারও অজানিত নাই। কি আকারে, কি লেখায় 'অনুসন্ধানের' দিন দিন যাহাতে উৎকর্ষ সাধিত হয়, এই আমাদের একান্ত চেষ্টা। এজন্য যথেষ্ট অর্থব্যয়, বিশেষ চেষ্টা, প্রবল পরিশ্রম—কিছুরই আমরা ত্রুটী করিতেছি না। যে মূল্য 'অনুসন্ধানের' জন্য গ্রাহকগণ আমাদিগকে দিয়া থাকেন, হিসাব করিয়া দেখিলে, তাহাতে খরচাও সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হয় না। বৎসরে দেড়টী টাকা মাত্র পাইয়া, তাহা হইতেহ আবার ডাকমাশুল খরচা করিয়া অত বড় 'অনুসন্ধান' পূরা বারটি মাস গ্রাহকগণকে যোগান কি বড় অল্প কথা ?

তাহারও উপর আবার গ্রাহকগণের অধিকতর সুবিধার জন্য আমরা 'অনুসন্ধানের' এই এক 'ক্রোড় পত্র' কিছু দিন যাবৎ গ্রাহকগণকে দিতে প্রবৃত্ত হইলাম। অর্থাৎ এণ্টেন্স, এলএ বিএ, মাইনার, ছাত্রবৃত্তি, প্রাইমারী প্রভৃতি যাবতীয় পরীক্ষার ফল গ্রাহকগণকে জানাইবার জন্য স্বতন্ত্র এইরূপ আবার এক পত্রের সৃষ্টি করিলাম। ঘর হইতে ডাকব্যয়, ঘর হইতে ছাপাই ও কাগজের দাম দিয়া ইহাও গ্রাহকদিগকে দিব। দেড় টাকা মাত্র বৎসরে দাম দিয়া সকলের উপকারী 'অনুসন্ধান' এক বৎসর পাওয়া, হিসাব করিয়া দেখিলে, সেই তো বিশেষ লাভের কথা ; তাহার উপরও আবার এইরূপ 'ক্রোড়পত্র' প্রভৃতি মধ্যে মধ্যে পাওয়া কি অল্প সুবিধা ? সুতরাং এসম্বন্ধে আর কিছু বলাই অনাবশ্যক। সকলে ইহা দেখিতেই পাইতেছেন। সর্ব্বসমেত দেড় টাকায় 'অনুসন্ধান' ও তৎসহ এইরূপ-সকল অতিরিক্ত লাভ, কি অল্প সুবিধাজনক ? ইহা সাধারণেই বিচার করুন।

যেরূপ গুরুতর দায়িত্ব ও গুরুভার স্কন্ধে করিয়া আমরা সাধারণের জন্য কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছি, এক্ষণে সাধারণেও অনুগ্রহ করিয়া তাহা বুঝেন, এই নিবেদন। 'অনুসন্ধানকে' আমরা যেরূপ লোক-হিতকর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি, তাহাতে পাঠক মাত্রেরই গৃহে গৃহে ইহার স্থান হওয়া কর্ত্তব্য। আর, সেরূপ উৎসাহ পাইলে, ঈশ্বর-কৃপায় আমরাও ইহা অপেক্ষা 'অনুসন্ধানের' আরও উন্নতি করিতে পারিব, ভরসা করি। বলিতে কি, আমাদের দায়িত্ব ও অনুসন্ধানের উপকারিতা প্রভৃতির বিষয় একবার যদি সাধারণে চিন্তা করিয়া দেখিয়া ও ইহার কার্য্যকারিতা বুঝিয়াও, আমাদিগকে উৎসাহান্বিত করেন, তাহা হইলেই আমরা আমাদের পরিশ্রমের ও ব্যয়ের সার্থকতা জ্ঞান করিব।

মহাদেব ঘোষ	শ্রীখণ্ড
আশুতোষ চৌধুরী	ঐ
কালিপ্রসাদ সরকার	সাদিপুর
চণ্ডীচরণ দাস	শাঁকো
অবিনাশচন্দ্র রায়	মাহুন্দী
কৃষ্ণচন্দ্র কর্ম্মকার	মামুদপুর
নিত্যানন্দ সরকার	মাহুন্দী
হরিহর অধিকারী	গণপুর
বিজয়চন্দ্র ভট্টাঃ	গোপালনগর
নিতাইচাঁদরায়	নাসিগ্রাম

তৃতীয় বিভাগ।

সেখ ফকিরমহম্মদ	বোহার
নগেন্দ্রনাথ বসু	বর্দ্ধমান রাজ
বামাপদ মুখো	মণ্ডলগ্রাম
সেখ মহম্মদ	ঐ
সতীশচন্দ্র ঘোষ	সসঙ্গা
অনন্তমোহন রায়	ঐ
ভোলানাথ সরকার	ঐ
পূর্ণচন্দ্র চট্টরাজ	মাহাতা
যুগলচন্দ্র রায়	শাঁকো
অমূল্যরত্ন চট্টো	প্রাইভেট
অবিনাশচন্দ্র মণ্ডল	আলমপুর

সতীশচন্দ্র চৌধুরী	আমলপুর
যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	ঐ
রামদাস দাস	ঐ
দক্ষিণেশ্বর নন্দী	মাথরুণ
ইন্দ্রনারায়ণ চট্টো	কালিকাপুর
শেখ চাঁদ	ঐ
সমহুদ্দি সেখ	কড়ুই
ললিতমাধব দাস ঠাকুর	মাহুন্দী
শরচ্চন্দ্র মুখো	পালিগ্রাম
দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার	ঐ
সুরেশচন্দ্র মিত্র	ঐ
ভূষণচন্দ্র সামন্ত	ক্ষীরগ্রাম
শরচ্চন্দ্র মজুমদার	পাচণ্ডা
গোপেশ্বর দাস	ঐ
ভুজঙ্গভূষণ মুখো	কাটোয়াআর্য্য
ধর্ম্মদাস দত্ত	চন্দ্রহাটী
আশুতোষচট্টো	বহড়ন
রামপদ দত্ত	মুণ্ডলী
অকিঞ্চন আচার্য্য	ঐ
ভুবনমোঃ চট্টো	নোদ্‌নাবারশালি
শেখ আবদুল	ঐ
রামকৃষ্ণ দাস	আহারবেলমা

পূর্ণচন্দ্র নায়ক	বোকড়া
খাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	ঐ
বগলাচরণ চক্রবর্ত্তী	কাইতি
অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	ঐ
গঙ্গারাম মণ্ডল	ঐ
অখিলচন্দ্র সিংহ	দীগুনগর
শশিভূষণ মুখো	গলসী-বোর্ড
রামপদ চট্টো	দ্বারনড়া
সচ্চিদানন্দ মুখো	বিল্বগ্রাম
অটলবিহারী রায়	জামনা
সুরেশ্বর মণ্ডল	ঐ
নৃত্যগোপাল মল্লিক	ঐ
পুলিনবিহারীদত্ত	পিপলুন
সুরেশচন্দ্র রায়	শুশুনিয়া বোর্ড
উপেন্দ্রনাথ নন্দি	ঐ
হরিদাসকোঙার	বাদলারাজডাঙ্গা
সত্যচরণ ঘোষ	গোদা
ভবানীচরণ সরকার	কালনা
কিরণচন্দ্র পাল	মালগোড়ে
নয়নতারা দুই	সিনা
ধর্ম্মদাস মাজি	ঐ

ডেপুটি মাজিষ্টারি পরীক্ষার ফল।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ১৮৯০ সালে ডেপুটী মাজেষ্টরী পদ পাইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন ;—শ্রীযুক্ত রামনাথ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, ; মৌলবী মহাম্মদ আব্বাস আলি এম, এ, ; শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি, এ, ; শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সরকার ; শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস এম, এ. ; মৌলবী সেখ আবদুল্লা ; শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ দত্ত বি, এ, ; মৌলবী সৈয়দ আলি হোসেন বি, এ, ; শ্রীযুক্ত ব্রজদুল ভ হাজরা বি, এ, শ্রীযুক্ত নবীন চন্দ্র কর বি, এ, ; শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দাস গুপ্ত বি, এ, ; এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন।

ইহাঁরা ছাড়া শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী সিং [illegible], এ. বি, এল এবং শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়বি, এ, ইহাঁরাও কর্ম্ম পাইবার উপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছেন। বার জনের অধিক লোকএবৎসর নিয়োগ করা প্রয়োজন হইলে, ইহাঁরা দুইজনও কর্ম্ম পাইবেন।

ওকালতী পরীক্ষার ফল।

এবার নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ওকালতী পরীক্ষায় পাশ হইয়াছেন,—ইন্দ্রচন্দ্র সুর, রায়পদ সিংহ, শীতলপ্রসাদ মিশ্র, হরিপ্রসন্ন বসু, শ্রীশচন্দ্র সেন, মহেন্দ্র চন্দ্র সেন, রমেশচন্দ্র শসমল, কৈলাসচন্দ্র নিয়োগী, সূর্য্যকুমার, শম্ভুনাথ সিংহ, মহম্মদ নূর, কৃষ্ণসুন্দর সরকার, অম্বিকাপ্রসাদ, দিবাকর প্রসাদ, রামহরি সহায়, কিশোরীমোহন পাল, হরিদাস বক্সি, বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় আবদুল রহিম এবং কুঞ্জবিহারী দত্ত।

ইহাঁরাব্যতীত চন্দ্রকুমার শর্ম্মা, পিয়ারীলাল সোম, ব্রজসুন্দর শর্ম্মা এবং হরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ, কেবল মাত্র আসামরাজ্যে ওকালতি করিতে পারিবেন।

অনুসন্ধান।

ক্রোড়পত্র।

৫ই চৈত্র, ১২৯৬ সাল।

বক্তব্য।

'অনুসন্ধান'-পত্রের উন্নতির জন্য আমরা যে নানা-প্রকারে চেষ্টা পাইতেছি, তাহা আর কাহারও অজানিত নাই। কি আকারে, কি লেখায় 'অনুসন্ধানের' দিন দিন যাহাতে উৎকর্ষ সাধিত হয়, এই আমাদের একান্ত চেষ্টা। এজন্য যথেষ্ট অর্থব্যয়, বিশেষ চেষ্টা, প্রবল পরিশ্রম—কিছুরই আমরা ত্রুটী করিতেছি না। যে মূল্য 'অনুসন্ধানের' জন্য গ্রাহকগণ আমাদিগকে দিয়া থাকেন, হিসাব করিয়া দেখিলে, তাহাতে খরচাও সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হয় না। বৎসরে দেড়টী টাকা মাত্র পাইয়া, তাহা হইতেহ আবার ডাকমাশুল খরচা করিয়া অত বড় 'অনুসন্ধান' পূরা বারটি মাস গ্রাহকগণকে যোগান কি বড় অল্প কথা ?

তাহারও উপর আবার গ্রাহকগণের অধিকতর সুবিধার জন্য আমরা 'অনুসন্ধানের' এই এক 'ক্রোড় পত্র' কিছু দিন যাবৎ গ্রাহকগণকে দিতে প্রবৃত্ত হইলাম। অর্থাৎ এণ্ট্রেন্স, এলএ বিএ, মাইনার, ছাত্রবৃত্তি, প্রাইমারী প্রভৃতি যাবতীয় পরীক্ষার ফল গ্রাহকগণকে জানাইবার জন্য স্বতন্ত্র এইরূপ আবার এক পত্রের সৃষ্টি করিলাম। ঘর হইতে ডাকব্যয়, ঘর হইতে ছাপাই ও কাগজের দাম দিয়া ইহাও গ্রাহকদিগকে দিব। দেড় টাকা মাত্র বৎসরে দাম দিয়া সকলের উপকারী 'অনুসন্ধান' এক বৎসর পাওয়া, হিসাব করিয়া দেখিলে, সেই তো বিশেষ লাভের কথা ; তাহার উপরও আবার এইরূপ 'ক্রোড়পত্র' প্রভৃতি মধ্যে মধ্যে পাওয়া কি অল্প সুবিধা ? সুতরাং এসম্বন্ধে আর কিছু বলাই অনাবশ্যক। সকলে ইহা দেখিতেই পাইতেছেন। সর্ব্বসমেত দেড় টাকায় 'অনুসন্ধান' ও তৎসহ এইরূপ-সকল অতিরিক্ত লাভ, কি অল্প সুবিধাজনক ? ইহা সাধারণেই বিচার করুন।

যেরূপ গুরুতর দায়িত্ব ও গুরুভার স্কন্ধে করিয়া আমরা সাধারণের জন্য কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছি, এক্ষণে সাধারণেও অনুগ্রহ করিয়া তাহা বুঝেন, এই নিবেদন। 'অনুসন্ধানকে' আমরা যেরূপ লোক-হিতকর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি, তাহাতে পাঠক মাত্রেরই গৃহে গৃহে ইহার স্থান হওয়া কর্ত্তব্য। আর, সেরূপ উৎসাহ পাইলে, ঈশ্বর-কৃপায় আমরাও ইহা অপেক্ষা 'অনুসন্ধানের' আরও উন্নতি করিতে পারিব, ভরসা করি। বলিতে কি, আমাদের দায়িত্ব ও অনুসন্ধানের উপকারিতা প্রভৃতির বিষয় একবার যদি সাধারণে চিন্তা করিয়া দেখিয়া ও ইহার কার্য্যকারিতা বুঝিয়াও, আমাদিগকে উৎসাহান্বিত করেন, তাহা হইলেই আমরা আমাদের পরিশ্রমের ও ব্যয়ের সার্থকতা জ্ঞান করিব।

কালীপ্রসন্ন খাঁ মেদিনীপুর

দ্বিতীয়বিভাগ—পারদর্শিতাক্রমে।

শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী গড়বেতা
নবকুমার মাইতি পাইকবাড়
লুটবিহারী সিংহ গোপালনগর
কার্ত্তিকচন্দ্রকরমহাপাত্র এড়গা
নদেরচাঁদ রায় গড়বেতা
কুঞ্জবিহারীঘোষ মদনমোহনচক
সূর্য্যনারায়ণ পাত্র কলাগেছে
ব্রজমোহন ধর হরিপুর
দিলবার দালাল খারকুসুমা
শিবপ্রসাদ তুঙ্গ পিঙ্গলা
উপেন্দ্রনাথ ঘোষ লোয়াদা
বিরাজমোহন সামন্ত খেপুর
কালীপদ বন্দ্যো খারকুসুমা
ক্ষেত্রমোহন দাস পাইকবাড়
শশিভূষণ লাহা প্রাইভেট
নিবারণচন্দ্র সরকার মাণিককুণ্ড
শ্রীপতিচরণ মাইতি সেকেন্দারী
ত্রৈলোক্যনাথ দত্ত প্রাইভেট
তারিণীচরণ দলুই দেউলপোতা
ফকিরচন্দ্র বাগ ব্রাহ্মণচক
মহাদেব মাইতি কাজলীগড়
গোবর্দ্ধন মান্না নাঠশাল
দুর্গাচরণ চট্টো বানীওড
ধ্রুবচরণ নায়ক পাইকবাড়
রাজকৃষ্ণ মাজী লাক্ষা
জানকীনাথ পট্টনায়ক সারতা
মতিলাল খাঁ গড়বেতা
দীনবন্ধু দিস্তা কলাগেছে
অখিলপতি বন্দ্যো গড়বেতা
কৃত্তিবাস জানা বাঘাস্তী
গোপতিচরণ মাইতি দেউলিয়া
পীতাম্বর খাঁড়া নন্দনপুর
শম্ভুনাথ সামন্ত গড়বাসুদেবপুর
সারদাপ্রসন্নঅধিকারী কলাগেছে
বিধুভূষণ দাসদত্ত বাসুদেবপুর
হরনারায়ণ ভূঞা বিলুড়িয়া
রজনীকান্ত দে মেদিনীপুর
শ্রীনিবাস দাস নন্দনপুর
অনন্তচন্দ্র জানা সেকন্দারী
উমাচরণ জানা বাঘাদাড়ী
উপেন্দ্রনাথ মালী বাসন্তিয়া
চন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী মেদিনীপুর
বেণীমাধব কুম্ভকার মাণিককুণ্ড
বিপিনবিহারী কর দেউলপোতা

তৃতীয় বিভাগ।

যোগেন্দ্র সাহা মেদিনীপুর
পূর্ণচন্দ্র মিশ্র ঐ
সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ঐ
ত্রৈলোক্যনাথ প্রমাণিক ঐ
যামিনীনাথ মল্লিক ঐ
নারায়ণচন্দ্র চট্টো ঐ
ঠাকুরদাস মিশ্র খেলাড়
প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যো জনার্দ্দনপুর
দীননাথ দে বড়মোহনপুর
প্রসন্নকুমার রুদ্র মদনমোহনচক
পঞ্চানন মাল ঝাড়গ্রাম
লক্ষ্মীকান্ত পড়্যা আঁধারে
মনোহর মারেণ্ডী ভীমপুর
দুর্ল্লভ হাজদা ঐ
তারাপদ বিশ্বাস শলবুনি
লালাভবগৌরীশঙ্করসিংহগড়বেতা
রাধানাথ ঘোষ ঐ
হারাধন দালাল ঐ
পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ঐ
শশিভূষণ দত্ত পিঙ্গলা
অটলচন্দ্র দত্ত ঐ
বনমালী বেড়া ঐ
অধরচন্দ্র হাজরা ঐ
দ্বারকানাথ মাইতি ঐ
গগনচন্দ্র মজুমদার গোবর্দ্ধনপুর
পঞ্চানন দাস বেলুড়িয়া
কুমারনারায়ণ গতাইত ঐ
বৈকুণ্ঠনাথ মাইতি ঐ
কালীপ্রঃ অধিকারী গোপীবল্লভপুর
ভীমচরণ জানা বাঘাস্তী
রমানাথ মান্না প্রাইভেট
কান্ত কিস্কু শিক্ষক
উদয়নারায়ণ দাস ঐ
গোবিন্দচন্দ্র জানা ঐ
গোপালচন্দ্র নন্দ ঐ
মহেন্দ্রনাথ দে ঐ
গজেন্দ্রনাথ মিশ্র ঐ
রমানাথ পাত্র ঐ
ঈশানচন্দ্র দত্ত ঐ
গোপালচন্দ্র দাস ঐ
উপেন্দ্রনাথ সামন্ত সেকেন্দরী
শিবপ্রসাদ দলুই ঐ
উপেন্দ্রনাথ ভূঞা ঐ
অখিলচন্দ্র ঘোষ বাসুদেবপুর
নিবারণচন্দ্র দে ঐ
নিবারণচন্দ্র হালদার ঐ
সুরেশীচরণ ঘোষ ঐ
কুঞ্জবেহারী মল্লিক ঐ
রামচন্দ্র বন্দ্যো গোয়ালডাঙ্গা
মুচিরাম ভূঞা মাণিককুণ্ড
নটবর মণ্ডল খারকুসুমা
চারুচন্দ্র বসু রাণীওড়
ব্রজমোহন পাণ্ডা বাসন্তিয়া
বৈকুণ্ঠনাথ পাণ্ডা পাইকবাড়
গোবর্দ্ধন জানা ঐ
রামলাল বসু কাঁথি
দ্বারকানাথ পট্টনায়ক ঐ
পঞ্চানন মাইতি ঐ
ঈশানচন্দ্র দাস নমলডিহা
পদ্মনাভ দাস নলগড়ে
ঝাটচরণ মাইতি হলুদবাড়ী
হরমোহন পট্টনায়ক বড়ুরভেড়ী
গৌরহরি দাস পাঁচরোল
সূর্য্যকান্ত মাইতি খড়ুই
মহেন্দ্রনাথ পাড়ী পাচেটগড়
চিন্তামণি মহাপাত্র ঐ
রামহরি নন্দী মোহনপুর
রঘুনাথ জানা নানুড়ী
শ্যামাচরণ সাহু মিরগোদা
অনন্তকৃষ্ণ মাইতি দণ্ডবেলবুণিক
গুরুপ্রসাদ মাইতি ঐ
পদ্মকুমার মাইতি ঐ
শ্রীনিবাস হাজরা ঐ
বংশীবদন গিরি ঐ
হরনারায়ণ রায় শোণপুর
পরশুরাম নায়ক অনলবেড়ে
ভূতনাথ রায় দেউলে
গোপালচন্দ্র সামন্ত ঐ
প্রসন্নকুমার পালধি তমলুক
যোগেন্দ্রনাথ পট্টনায়ক ঐ
নবকুমার সাঁত ঐ
বিপিনবিহারী ঘোষ ঐ
রাধাবিনোদ কলে গোপালনগর
দীননাথ সাহু শোভারামপুর
হেরম্বনাথ মিশ্র দোড়কৃষ্ণনগর
শ্রীহরি মাইতি দেউলগোত
সঞ্জীবন মাইতি ঐ
শ্যামাচরণ আদরা নন্দপুর
নবীনচন্দ্র জানা ঐ
ক্ষেত্রমোহন প্রধান বাঘাদড়ি
রুদ্রনারায়ণ গুড়ে বেগুনবাড়ী
কৈলাশচন্দ্র মাইতি ঐ
রামরমণ রায় হেঁড়ে
তারিণীচরণ দাস লক্ষা

Brahma Mohan Mullick,
Inspector of Schools,
Western Circle

অনুসন্ধান।

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

৩য় খণ্ড] ৩১এ চৈত্র, ১২৯৬ সাল। [১৭শ সংখ্যা।

ঈশ্বর সাকার কি না ?

ঈশ্বর সে জ্যোতির্ম্ময় নিত্য নিরাকার।
হস্ত নাই পদ নাই চক্ষু নাই তাঁর॥
নাহি কোন অবয়ব নাহি কোন সাজ।
নাহি তাঁর সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কাজ॥
নাহি তাঁর কোন গুণ নাহি তাঁর ছেদ।
অংশ করে, পূর্ণ দেখে এই মাত্র বেদ॥
যে করে সে মনোমল আভায় কলঙ্কী।
যে দেখে সে দেহ-ঘর মটকার পাখী॥
সেই দুটী পক্ষীর রক্ষিত চরাচর।
নয়নের অগোচর জ্ঞানের গোচর॥
কেহ বা স্বীকার করে প্রকৃতির দেহ।
স্থূল সূক্ষ্ম উভয় মানে না কেহ কেহ॥
কেহ ভাবে স্থূল আর কেহ ভাবে মূল।
যে যা ভাবে ভাবুক, ভাবুক ভাবে স্থূল॥
ভাবুক ভাবুক আর না ভাবুক যেই।
বিশ্ব এক বস্তু তাহা না মানিবে কেই॥
দৃশ্যমান বিশ্বতে ব্যাপিত জ্যোতির্ম্ময়।
কে বলিবে জগদীশ বিশ্বরূপ নয়॥
সহস্রারে পরমাত্মা বিশ্ব তাঁর রূপ।
এক এক বিশ্ব এক এক লোমকূপ॥
জ্যোতি হৌক দেহ হৌক যেই সর্ব্বঘটে।
সাকার স্বীকার করা কর্ত্তব্যই বটে॥
নদ নদী সিন্ধু যার জ্যোতিরান্তর্গত।
সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম সহস্র কমলদলে নত॥
অতএব সাকার সে বিশ্বরূপধর।
বিশ্বরূপ বর্ণন করিব অতঃপর॥

ঈশ্বরের বিশ্বরূপ।

রসাতল পদতল স্বর্গ তাঁর শির।
চন্দ্র-সূর্য্য যুগল নয়ন নহে স্থির॥
পদনখ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক-কলস।
বিশ্বের ধরম-চিহ্ন পদাঙ্গুলি দশ॥
নাক তাঁর নাক দেখি অনেক বিস্তার।
নিশ্বাস প্রশ্বাস হয় পবন-সঞ্চার॥
ভুরুযুগ ইন্দ্রধনু অতি মনোহর।
দশন নক্ষত্রপাতি দর্শন সুন্দর॥
জিহ্বা তাঁর সুরধনী আসিন্ধু-বিস্তার।
শ্রবণ উদয়াগিরি অস্তগিরি আর॥
শ্রুতি আর স্মৃতি তাঁর মধুর বচন।
ছায়াপথ মুক্তাহার কণ্ঠের ভূষণ॥
পদভূষা শ্রদ্ধা আর ভকতির খনি।
পলকে পলকে হয় দিবস-রজনী॥
মেঘ তাঁর লোমাবলী মেঘস্থল বুক।
বিদ্যুৎ কুসুমহার দর্শনে কৌতুক॥
বজ্রধ্বনি তর্জন গর্জন কভু হয়।
বজ্রপাৎ নেত্র-অগ্নি-স্ফুলিঙ্গনিচয়॥

হস্ত তাঁর দশদিক প্রশস্ত বিস্তর।
সিন্ধু তাঁর নাভিকূপ অবনী উদর॥
সেই উদরের কীট আমরা সকল।
খেলিতেছি চরিতেছি লইতেছি স্থল॥
কেহ বা লইছে আশী লক্ষ জন্ম তায়।
ভক্তি-অস্ত্রে ছিদ্র করি কেহ বা পলায়।
শত শত মহাতীর্থ ঈশ্বরের দৃষ্টি।
অদ্ভুত এ ঈশ্বরের বিশ্বরূপ সৃষ্টি॥
ভৌতিকের তেজ তাঁর রূপের কিরণ।
জানালা দেহেতে যেই ঘর্ম্মের পতন॥
ক্ষিত্যাংশ চরণ-রজ জানিবে নিশ্চিত।
বায়ু-অংশ দেহে যেটী প্রণয় উদিত॥
শূন্য অংশ নির্দ্দয়তা অভক্তের হেতু।
এই পঞ্চভূত হয় একার্ণব-সেতু॥
ঈশ্বরের যশ, রস, হাস্য, হাব, ভাব।
এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বিজ্ঞান-বৈভব।
গতি, রতি, মতি আদি কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ।
অষ্টধা ঐশ্বর্য্য তাঁর বিহারের মঞ্চ॥
ধ্যানযোগ, ক্রিয়াযোগ করুণার স্তূপ।
বিরচিনু ঈশ্বরের এই বিশ্বরূপ॥

সাধনের নিয়ম।

সম্ভবে এ রূপ হতে রূপ বহুতর।
নির্ব্বাচন করি লওয়া কঠিন বিস্তর॥
মূল হতে স্থূল আর স্থূল হতে মূল।
যে বুঝে সারত্ব রস সেই পায় কূল॥
বৃহৎ বৃক্ষেতে উঠা মূলে মূল ক্ষয়।
শাখা থেকে মূল ধরা সহজেই হয়॥
যেই শাখা সেই মূল বস্তু এক সার।
অনেক তর্কেতে উঠে অনেক অসার॥
যত তর্ক তত্ত্ব হয় সার বস্তু ফাঁক।
অধিক মন্থিত জল সমস্তই পাঁক॥
মূল ভজ শাখা ভজ ভক্তি মাত্র সার।
ভক্তির ভিতরে আছে মুক্তির আধার॥
ভক্তি করি প্রহ্লাদ বলিল স্তম্ভে হরি।
তত্র তিনি যত্র বহে ভক্তির লহরী॥

শ্রীরসিকচন্দ্র রায়।

ভক্তমহিমা।

ভক্তিতত্ত্ব বুঝান সম্ভব হইলেও হই
পারে, কিন্তু ভক্তমহিমা বুঝান বড়ই দুরূ
শাস্ত্রে ভক্তকে এত উচ্চ আসন প্র
করিয়াছেন যে, তত্তুলনার যোগ্য সা
সংসারে অতি বিরল। শাস্ত্র কেবল ভ
উচ্চ আসন দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; ত
জীবনের জ্বলন্ত ছবি পুরাণাদি গ্রন্থের প
পত্রে ছত্রে ছত্রে চিত্রিত করিয়াছেন। শ
কারের কামনা যে, উদ্দেশ্যবিহীন জীব
ভ্রান্তি-অপনোদন-মানসে ঐ সমস্ত ভক্তা
দিগের অপূর্ব্ব জীবনচরিত পাঠ করিয়া
জীবন নিয়মিত করিবে। যখন শাস্ত্রের অ
ছিল, শাস্ত্র-পাঠে হিন্দু যখন আনন্দ অনু
করিত, এবং আত্মোন্নতির প্রতি তীব্র দৃষ্টি
তখন প্রতি হিন্দুর গৃহে পুরাণ-পঠনাদি স
ও সাগ্রহে অনুষ্ঠিত হইত। তখন হিন্দু
তেন যে, কেবল নিজের বলে চলিলে উ
সিদ্ধ হইবে না। বিশেষতঃ হিন্দুজীবন গ
করিতে হইলে প্রতিপদে হিন্দূচিত আদ
অপেক্ষা করে। সেই জন্যই হিন্দুর নি
পুরাণাদি শাস্ত্র এত বহুমূল্য বলিয়া বিবে
হইত। কিন্তু কালের কি বিচিত্র মহিমা!
সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া সসম্মানে পূ
অধীত, ও ব্যাখ্যাত হইয়া আসিল, আজ
বশে তাহাই হেয়, অত্যুক্তি ও অসম্ভবো
দোষে দূষিত ও বুদ্ধিমানের পাঠের অ
বলিয়া অগ্রাহ্য হইতে চলিল। কাল ম
এইরূপই শক্তি! এখন আর সকলে পু
মানা দূরে থাকুক, পুরাণ-পাঠও দূষণীয় ব
থাকেন। কারণ, তাঁহাদের বিশ্বাস যে পুরাণ
গ্রন্থের অসম্ভবোক্তি সমস্ত পাঠ করিয়া ম
ক্কের বিকৃতি হওয়াই অধিকতর সম্ভব। পূ
ভক্তদিগের যে সমস্ত অদ্ভুত অদ্ভুত কাহিনী লি
আছে, সে সমস্তই কেবল কল্পনা মাত্র। ক

সমস্ত আখ্যায়িকা এত পুরাতন যে, উহাদের
কানরূপ ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া অসম্ভব।
ই যুক্তি বলে ঊনবিংশ শতাব্দির শিক্ষিত
ক পুরাণোক্ত ভক্তমহিমা বিশ্বাসে সর্ব্বদা
ধাযুক্ত। ভক্ত যে ভক্তিবলে অসাধ্য সাধন
রতে পারেন, তাহা তাঁহাদের স্বপ্নাতীত বলিয়া
নে হয়। কিন্তু তাঁহারা দেখিয়াও দেখেন না
, তাঁহাদের চক্ষের উপর কত শত অদ্ভুত ও
লৌকিক ঘটনারাশি সচরাচর অনায়াসে
ঘটিত হইতেছে! আত্মম্ভরিতা ও অবিশ্বাস
াহাদের চক্ষুকে এতই অন্ধ করিয়া দিয়াছে!
দ্য আমরা ভক্তজীবনের একটি অপূর্ব্ব ঘটনা
বৃত করিব। হয় তো ইহা পাঠ করিয়া নাস্তিক-
দয়ে সন্দেহ-বীজ আরও দৃঢ়ভাবে রোপিত
ইবে। কিন্তু বিশ্বাসী, ভক্তের অপূর্ব্ব মহিমা ও
ক্তির বিষয় অবগত হইয়া, কৃতার্থ হইবেন;
বং পূর্ণ উৎসাহে ভক্তির অনুষ্ঠান দ্বারা
াপনাকে কৃতার্থ করিবেন। প্রসিদ্ধ 'ভক্তমাল'-
হে ভক্তের এই অপূর্ব্ব কাহিনী সংক্ষেপে
বৃত হইয়াছে।

জয়পুরের মহারাজা মানসিংহের নাম ইতি-
স-পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। মহারাজা
ধবসিংহ নামে উক্ত মানসিংহের এক
নিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। রাজা মাধবসিংহ
তি বিচক্ষণ ও সুশাসক ছিলেন। কথায়
লে,—"যেমন দেব তাঁর তেমনি দেবী।"
হারাজা মাধবসিংহের সর্ব্বগুণান্বিতা সুরূপা
ধর্ম্মপরায়ণা এক মহিষী ছিলেন। উক্ত
হিষীর গর্ভে এবং মহারাজের ঔরশে কুমার
প্রমসিংহ নামে একটি সুপুত্র জন্মগ্রহণ করেন।
মার অল্পবয়সেই ধর্ম্মপরায়ণ, প্রেমিক, ও সাধু-
বা-তৎপর হইয়া উঠিলেন। বাল্যকাল হই-
ই তাঁহার অসামান্য ধর্ম্ম-প্রবণতা দেখিয়া
াবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই পরম সন্তোষ
লেন। এক সময় মহারাজ মাধবসিংহ স্বীয়
ত্র কুমার প্রেমসিংহকে সমভিব্যবহারে করি
তাঁহার 'কাবেল' নামক রাজ্যের শাসনের জন্য
তথায় গমন করেন। উক্ত রাজ্যের সুবন্দো-
বস্তের জন্য বহুদিবস তাঁহাকে পুত্রসহ তথায়
থাকিতে হয়। এই সময় রাণী একাকিনী
গৃহে থাকিতেন। রাণীর বৈষ্ণব-ধর্ম্মে-দীক্ষিতা,
মিষ্টভাষিণী ও প্রেমিকা জনৈক পরিচারিকা
ছিল। উক্ত পরিচারিকা সর্ব্বদা রাণীর
নিকটে থাকিয়া তাঁহার সেবাশুশ্রূষাদি
করিত। একদিবস রাণী নিজ শয্যায় তন্দ্রাযুক্ত
হইয়া শয়ন করিয়া আছেন এবং উক্ত পরি-
চারিকা তাঁহার পদসেবা করিতেছে। পরিচারিকা
তাঁহাকে তন্দ্রাযুক্তা দেখিয়া আপন মনে ও
আপন ভাবে কৃষ্ণগুণ-কীর্ত্তন করিতে লাগিল।
ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণলীলা স্মরণ করিয়া প্রেমাবেশে
অশ্রুবারি বর্ষণ করিতে লাগিল; এবং আপন
ভাবে আপন ভাষায় তন্ন তন্ন করিয়া বিচার
করিয়া, সাংসারিক সুখ সমস্ত যে অনর্থের মূল ও
মায়া-মরিচারিকা-মাত্র তাহাই উল্লেখ করিয়া,
নিজের জীবনের প্রতি ধিক্কার দিতে লাগিল।
পরিচারিকা এমনি ভাবাবেশে উন্মত্তা হইয়া
উঠিল যে, ক্রমে তাহার বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া
গেল; এবং অনবরত দরদারিত ধরায়
অশ্রুবারি বিসর্জন করিয়া, কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণলীলা
ও কৃষ্ণগুণানুকীর্ত্তন করিতে লাগিল। রাণী
তন্দ্রাবস্থায়ই পরিচারিকার অদ্ভুত ভাব-বৈলক্ষণ্য
দেখিয়া অনন্যচিত্তে তাহার কার্য্যকলাপ
পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন; এবং একাগ্র-
মনে পরিচারিকার উক্তিগুলি শ্রবণ করিতে
লাগিলেন। 'ভক্তমাল'-গ্রন্থে এই স্থলটী
এইরূপ লিখিত আছে,—

"রাণীজীর পদসেবা করিতে করিতে।
নাম উচ্চারিয়া দাসী লাগিল কান্দিতে॥
নূতন কিশোর হে! হে নন্দকিশোর।
বলিয়া ফুৎকার করে প্রেমানন্দে ভোর॥
অপূর্ব্ব ফুৎকার করে প্রেমের সহিতে।
অমৃতের ধারা যেন বহে বদনেতে॥

রাণীর শুনিয়া তাহা হৃদয় দ্রবিল।

কহে পুনঃ পুনঃ কহ, আহা বল বল ॥"

এই বলিয়া রাণী ভক্তিভরে নিজ-দাসীর দুটি পা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন যে,—"তুমি আমার দাসীর যোগ্যা নহ। অদ্য হইতে আমি তোমার দাসী। তুমি আমার পরম গুরু। কারণ, আমি তোমা হইতে কৃষ্ণ-প্রেম শিক্ষা করিলাম।" তখন দাসী রাণীকে লক্ষ্য করিয়া প্রেমবিষয়িণী নানা তত্ত্ব-উপদেশ দিতে লাগিল। দাসীর উপদেশে আর্দ্র হইয়া রাণী কৃষ্ণোপাসনায় জীবন যাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন; এবং অতি সুন্দর, মনোমত রাধাকৃষ্ণ-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া, অতি নিভৃত-গৃহে স্থাপন করিয়া, নানাবিধ বিধিবিধানে পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমেই তাঁহার কৃষ্ণপ্রেম এতই প্রবল রূপ ধারণ করিল যে, তিনি সর্ব্বদা সেই নিভৃত গৃহে থাকিয়া কখনও কিশোরকিশোরীর যুগল মূর্ত্তি লইয়া আদর করিয়া নানা পরিচ্ছদে ভূষিত করিতেন, কখনও রাধিকাকে মানিনী সাজাইয়া বসাইতেন, এবং আপনি শ্রীকৃষ্ণের হইয়া যোগীর প্রেম-ভাবে কিশোরীর মানভঙ্গের জন্য চেষ্টা করিতেন। কত কাকুতি-মিনতি, কত আকুলি-বিকুলি, কত ক্রন্দন করিয়া রাইয়ের চরণ ধরিয়া সাধিতেন।

এইরূপে দিনের পর যতই দিন যাইতে লাগিল, রাণীও ততই কৃষ্ণানুরাগিনী হইয়া উঠিলেন। ক্রমে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া গেল। কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্তা পরম সাধিকার হৃদয়ে প্রেমতরঙ্গ এতই উথলিয়া উঠিতে লাগিল যে, তিনি সে তরঙ্গাঘাত একাকিনী সাম্‌লাইতে পারিলেন না। তখন বৈষ্ণব-মণ্ডলী মধ্যে সেই অনুপম প্রেমামৃত বিতরণে তাঁহার প্রবল বাসনা জন্মিল। তখন বৈষ্ণব-মাত্রেই অবাধে অন্দরে স্থান পাইতে লাগিল। ক্রমে এরূপ হইল যে, অন্দরের আর 'পরদা' রহিল না। রাজমন্ত্রী অবস্থা দেখিয়া বি ও চিন্তাযুক্ত হইলেন; এবং সত্বর অন্দরে ব পাঠাইলেন যে,—"মহারাণী কি সর্ব্বনাশ তেছেন! স্বয়ং রাণী হইয়া অন্দরের অম করিতেছেন! ইহাতে মানগৌরব স বিনষ্ট হইবে। অতএব এখনও ক্ষান্ত হ কিন্তু রাণী শুনিয়া হাসিয়া উত্তর করিলেন "মন্ত্রীকে বলগে যে, আর আমি রাণী আমি দাসী। কিশোরকিশোরীর চরণে দাসখত লিখিয়া দিয়াছি। আমার মর্য্যাদা, অভিমান-অহঙ্কার সমস্তই শ্রী চরণে অর্পিত হইয়াছে। অতএব আ যেন আর কোন কথা শুনিতে না হ মন্ত্রী উত্তর পাইয়া আরও স্তম্ভিত হই এবং তৎক্ষণাৎ মহারাজ মাধবসিংহ-স আনুপূর্ব্বিক সমস্ত সংবাদ পাঠাই মহারাজ রাণীর এই অভাবনীয় ভাবের শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া স্বীয় পুত্র সিংহকে অবিলম্বে রাণীর শিরোশ্ছেদ ক আদেশ দিলেন। কিন্তু প্রেমিকবর প্রেম মাতার অবস্থা শুনিয়া বুঝিলেন যে,—"মা সামান্যা নহেন। নিশ্চয়ই মাতার সৌ সূর্য্য উদিত হইয়াছে। অতএব আমি থাকিতে আমার এমন ভাগ্যবতী শিরোশ্ছেদিত হইবে? ইহা কখনই হইবে না। তাহাহইলে বিপদহারী শ্রীমধুসূদনের নাম তো আর কেহই লইবে প্রেমসিংহ এই সমস্ত স্মরণ করিয়া প্র করিলেন যে,—"আমি বাঁচিয়া থাকিতে মায়ের কেহ একগাছি কেশও স্পর্শ ক পারিবে না।" প্রকাশ্যেও মহারাজকে স করিয়া বলিলেন,—"পিত, আপনি নি জানিবেন যে, প্রেমসিংহ জীবিত থা মহারাজ মাধবসিংহের পতিব্রতা ধর্ম্ম কেশ স্পর্শে, এরূপ সাধ্য পৃথিবীতে কা নাই।" পুত্রের এই দাম্ভিক উক্তিতে ম

ক্রোধে অগ্নিবৎ হইয়া সেই মুহূর্ত্তে রাজধানী-অভিমুখে যাত্রা করিলেন; এবং স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়াই মন্ত্রীকে তদ্দণ্ডেই রাণীর শিরোশ্ছেদের আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু শিরোশ্ছেদে কেহ স্বীকার হইবে না ভাবিয়া, মন্ত্রী রাজাকে পরামর্শ দিলেন যে,—রাণীর গৃহে পিঞ্জর হইতে একটা প্রবল পরাক্রম ভীষণ মূর্ত্তি ব্যাঘ্র প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যাউক। তাহা হইলে ঐ ব্যাঘ্র-কর্ত্তৃক রাণীর বধকার্য্য অবলীলাক্রমে সংসাধিত হইবে। মন্ত্রীর পরামর্শ-মতে শীকার লোলুপ এক ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র রাণীর সেই নিভৃত গৃহে ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

এই সময় রাণী পরম ভক্তিভরে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে নানাবিধ চন্দনাদি-বিলেপিত পুষ্পহারে সেই পরম রমণীয় রাধা-মাধব মূর্ত্তিকে সুসজ্জিত করিতেছিলেন; মুখে কৃষ্ণগুণানুকীর্ত্তন করিতে করিতে বিভোর-ভাব ধারণ করিয়াছিলেন। এমন সময় সম্মুখে সেই ভীষণ মূর্ত্তি ব্যাঘ্র আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। রাণীর তখন বাহ্যজ্ঞান একেবারে শূন্য। তিনি সম্মুখে তাঁহার কাল দণ্ডায়মান রহিয়াছে দেখিয়াও কিছুমাত্র ভীত বা চকিত হইলেন না। বরং আরও প্রেমাবেশে উন্মত্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"প্রভু! আজ তোমার একি বেশ? আমাকে এত প্রবঞ্চনা! এস, আজ তোমায় এই বেশেই মনের সাধে সাজাইব।" এই বলিয়া সেই সমস্ত চন্দনাক্ত কুসুমহারে ব্যাঘ্রকে সাজাইতে লাগিলেন। ব্যাঘ্রও কোনরূপ ভীষণ ভাব প্রকাশ না করিয়া মায়ের কোলের ছেলের মত রাণীর গাত্রলেহন করিতে লাগিল। রাণী ব্যাঘ্রকে সাজান, আর "হা কৃষ্ণ—হা কৃষ্ণ" বলিয়া দরদরিত ধারে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করেন। মহারাজ মাধবসিংহ বাহির হইতে এই অপূর্ব্ব অমানুষী কাণ্ড দেখিয়া স্তম্ভিত, ভীত ও চকিত হইলেন। "মহারাণী আমায় রক্ষা কর, আমি ঘোর পাপী, না বুঝিয়া তোমার উপর এরূপ নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছি।"—এই বলিয়া রাণীর পদপ্রান্তে নিপতিত হইলেন।

রাণীও রাজার ঈদৃশ ভাবে আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া বলিলেন,—"স্বামীন্! আমি আপনার দাসী। আমার নিকট আবার আপনার অপরাধ কি? যদি কোন অনুতাপযোগ্য কার্য্য করিয়া থাকেন, সেই সর্ব্ব-বিপদহারী শ্রীমধুসূদনকে স্মরণ করুন।"

তিন শত বৎসর মাত্র অতীত হইল, ভক্ত-জীবনের এই অপূর্ব্ব ঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক জাজ্বল্যপ্রমাণ ইহার সাক্ষ্য দিতেছেন। গরীবের গৃহে নহে—রাজার গৃহে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। এরূপ সহস্র সহস্র সদ্দৃষ্টান্ত পাইয়াও শাস্ত্রদ্বেষী নাস্তিক তুমি যদি ভক্তমহিমা স্বীকার না কর, তবে সম্মুখে স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হইলেও, তোমায় বিশ্বাস করান সম্ভব হইবে না।

ভট্‌চাযের তীর্থদর্শন।

(শেষাংশ।*)

"সমস্ত রাত্রি হাজতেই কাটিয়া গেল। কাটিয়া গেল বলিয়াই যে শুইয়া-বসিয়া কাটিল, তাহা নহে। মধ্যে মধ্যে জমাদার-ইনেস্পেক্টার মহোদয়গণ আমার নিকট আসিয়া, কখন বা গুঁতাটা-আস্‌টা মারিয়াও, আমার দ্বারা চুরীটার 'একরার' করাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে আরও তাঁহারা আমায় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে লাগিলেন যে,—আমি আর কখনও কোথাও চুরি করিয়াছিলাম কি না?" কিন্তু বাস্তবিক-পক্ষে আমি তো সে দোষে কখনও দোষী নই! কাজেই তাঁহাদের সেরূপ কোন আশাই মিটিল না। কত পীড়ন—কত অত্যাচারে

* পূর্ব্বের সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের শেষ।

কাঁদিতে কাঁদিতেই আমার সে রাত্রিটি কাটিয়া গেল। বেশীর ভাগ সকলেই আমাকে ভয় দেখাইতে লাগিল যে,—"যখন তুই স্বীকার করিতেছিস্ না, তখন কালকার বিচারে নিশ্চিতই তোর সাত বৎসর জেল হইবে।"

এদিকে বাসাতেও আমাদের খোঁজখবর বিলক্ষণ পড়িয়াছিল। আমরা দু'জনে সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছি, অথচ সমস্ত রাত্রি আমাদের সাক্ষাৎ নাই; কাজেই শিষ্য মহাশয় ও পিতাঠাকুর মহাশয় উভয়েই বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। আমাদের তত্ত্ব-তল্লাসের জন্য তাঁহারাও স্থানে স্থানে লোক প্রেরণ করিয়াছেন। দুই একটা নিকটস্থ থানা-ফাঁড়িতেও সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। আর, সেই সন্ধানে-সন্ধানেই আসিয়া, ক্রমে দেখিলাম,—প্রাতে শিষ্য মহাশয় আমার নিকট উপস্থিত! তিনি তো ব্যাপার শুনিয়াই চমকিয়া উঠিলেন! কিন্তু তাঁহার আর ক্ষমতা কি? তাঁহার অনেক চেষ্টা-স্বত্বেও পুলিশ তখন আমায় কিছুতেই ছাড়িল না। যাইহোক, অবশেষে বেলা সাড়ে দশটার পর পুলিসে আসিয়া তিনি মকর্দ্দমার তদ্বির করিবেন বলিয়া, প্রস্থান করিলেন। বলা বাহুল্য, এসময় তিনি তাঁহার পুত্রের সন্ধান লইবারও চেষ্টা পাইতেছিলেন; কিন্তু তাহারও তখন আর কোন সন্ধান পাইলেন না। বিশেষতঃ পুলিসের লোকে আমাকেও সে বিষয় তাঁহাকে কিছু বলিবার সাবকাশ দিল না।

যাইহোক, সাজিয়া-গুজিয়া, পুলিসের গুঁতা খাইতে খাইতে, ক্রমে বেলা দশটার সময় পুলিসে গিয়া আমি উপস্থিত হইলাম। সেখানেও আমার প্রতি ভদ্র-ব্যবহারের কোন ত্রুটী ছিল না। যাইহোক, সেখানে গিয়া শিষ্য মহাশয়ের কিন্তু সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। দেখিলাম, তিনি রামহরি সরকার নামক একটী উকীলের সহিত কি পরামর্শ করিতেছেন। মনে একটু ভরসা হইল। বুঝিলাম, অবিচারে—তদ্বির অভাবে, বুঝি বা আর জেলে যাইতে হইবে না।

ক্রমে ম্যাজিষ্টর সাহেব আসিয়া আসরে বসিলেন। বিচার আরম্ভ হইল। আমার শরীর তখন কি জানি কেন কাঁপিতে লাগিল; ভাবিলাম,—না জানি অদৃষ্টে কিই বা আছে। তখন কিন্তু আমি কাঠগড়ার মধ্যে। যাইহোক, পুলিসের কর্ত্তারা ক্রমে সকল প্রমাণ করাইয়া গেলেন; দেখিতে দেখিতে আমার উপর চার্জ্জ হয় হয় হইল। তখন, আমাদের পক্ষের উকীল মহাশয় কি একখানি লেখা কাগজ ম্যাজিষ্টর সাহেবের সম্মুখে ধরিয়া দিলেন।

মকর্দ্দমা সে দিনের মত মুলতুবী রহিল। আমি সেদিনকার মত জামিনে খালাস পাইলাম। কি জানি কি সন্দেহে, শিষ্য মহাশয় ও আর একটী পুলিসের বাবুর সহিত, আমাকে সেই ঘটনাস্থল দেখাইতে চলিতে হইল। আমি তখনও তত কিছু তলাইয়া বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে শিষ্য মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিলাম যে, শিষ্য-পুত্র তখনও পর্য্যন্ত নিরুদ্দেশ, তখন আর আমার সন্দেহ কিছুই রহিল না। আমি ক্রমে সে দিনের সকল ঘটনা অর্থাৎ বেশ্যা-বাড়ীতে যাওয়া হইতে পার্শ্বস্থ ঘরে 'গোঁ—গোঁয়ানি' শব্দ উঠা অবধি সকল কথাই আমাদের সঙ্গের সেই পুলিশ-কর্ম্মচারীকে বলিলাম। কর্ম্মচারীও নিস্তব্ধভাবে সকলই শুনিতে লাগিলেন।

সেদিন এই পর্য্যন্তই যাইল। কর্ম্মচারীকে আমি বাড়ীটি চিনাইয়া দিলাম, আর সকল কথা খুলিয়া বলিয়া রাখিলাম। কর্ম্মচারী বাড়ীটি দেখিয়া লইয়াই, সেদিনের মত আমাদের বিদায় দিলেন। আমরা গৃহে প্রত্যাগত

হইলাম। তারপর তাঁহার কাজ তিনিই করিয়াছিলেন; জানেনও, তিনিই। আমরা তবে এই পর্য্যন্তই সে দিনের কথা জানিলাম-মাত্র। যাইহোক, বাড়ীতে আমাদের একরূপ কান্নাকাটি উঠিল; শিষ্য মহাশয়ের এক মাত্র পুত্র শ্রীমানের বিরহে শিষ্য মহাশয় একরূপ জীবন্মৃতই হইয়া রহিলেন। আরও, পুলিসের উপর ভার দিয়াও আমরা কিন্তু নিশ্চিন্ত রহিলাম না। পুলিসের ন্যায় আমরাও নানা স্থানে শিষ্য-পুত্রের সন্ধান লইতে লাগিলাম।

পরদিন ভোরেই কিন্তু একি দুঃসংবাদ! আমরা বাসায় কেহই শয্যা হইতে উঠি নাই—সকলেই তখনও শুইয়া, এমন সময়, একটা পাহারওয়ালা হঠাৎ ছুটিতে ছুটিতে আমাদের বাসায় আসিয়া "হরি বাবু উঠুন—হরি বাবু" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। বলা আবশ্যক যে, আমাদের শিষ্য মহাশয়ের নামই 'হরি বাবু।' শিষ্য মহাশয় অমনি উঠিলেন। দুই দিন আর তাঁহার ঘুম তো নাই-ই; একরূপ জাগিয়াই তো রাত্রি কাটাইতেছিলেন; সুতরাং উঠিতে বিলম্ব হইল না। দুইবার ডাকিতেই তিনি "কেহে ডাকিতেছ" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি উঠিতেই, অমনি সে লোকটা বলিল,—"হরি বাবু, ইনেস্পেক্টার আপনাদের ডাকিতেছেন। শীঘ্র আসুন।"

শিষ্য মহাশয়, বিশেষ ব্যগ্র হইয়া, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে, ও করিম বকস্! খবর কি?" 'আসিলেই জানিবেন—আসুন, আর দেরী করিবেন না"—বলিয়া করিম অগ্রসর হইল। শিষ্য মহাশয়কেও সঙ্গে সঙ্গে চলিতে হইল। যা'বার সময় আমাকেও তিনি একটা ডাক দিয়া গেলেন। কিন্তু আমি শয্যাত্যাগ করিয়াই, আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। বুঝিলাম, তিনি দৌড়িতে-দৌড়িতেই গিয়াছেন। কাজেই আমিও আর বিলম্ব করিতে পারিলাম না। তাঁহার অনুসরণেই পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমিও ছুটিলাম। মনে আমারও বড়ই শঙ্কা উপস্থিত হইল।

ছুটিতে ছুটিতে আমি গিয়া ক্রমে থানায় উপস্থিত হইলাম। কিন্তু সেখানে গিয়া শিষ্য মহাশয়কে আর দেখিতে পাইলাম না। তবে শুনিলাম,—থানার ইন্‌স্পেক্টার প্রভৃতি সকলের সঙ্গে এইমাত্র তিনি গঙ্গার ধারে যাইতেছেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে আরও শুনা গেল যে, সেখানে নাকি কার একটা লাশ পাওয়া গিয়াছে, তাই সকলে তাহা দেখিতে গিয়াছেন। কাজেই আমার মন আরও উদ্বিগ্ন হইল। আমিও সেই দিকেই চলিলাম। মনে আমারও বড়ই সন্দেহ হইল যে,—বুঝি বা শিষ্য পুত্রেরই এই দুর্দ্দশা হইয়াছে।

যাইহোক, ক্রমে গিয়া আমিও সেই ঘটনা-স্থলে পৌঁছিলাম। সেখানে পৌঁছিয়া দেখি, পুলিসের লোকজন চারিদিকে জমায়েৎ—মধ্যস্থলে বসিয়া শিষ্য মহাশয় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছেন। অন্য লোকও দু'দশজন চতুর্দ্দিকে ক্রমে জমিয়া যাইতেছে। তখন আর বুঝিতে আমার কিছুই বাকী রহিল না। আমিও কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া শিষ্য মহাশয়ের পার্শ্বে উপস্থিত হইলাম। সেখানে যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার 'চক্ষুস্থির' হইল—মাথা ঘুরিয়া গেল। আমি দেখিলাম,—শিষ্য মহাশয়ের সম্মুখে তাঁহার পুত্রের মুণ্ডটি-মাত্র পড়িয়া রহিয়াছে; ধড়খানি কোথায়, তাহার স্থিরতা নাই। তখনও পর্য্যন্ত পুলিস নদীর চারিদিকে লোকজন নামাইয়া তাহা খুঁজিতেছেন, কিন্তু পান নাই। কর্ত্তিত মুণ্ডটি যদিও দুই দিনে অনেকটা বিকৃত হইয়াছে, দেখা গেল; কিন্তু তথাপিও তাহা দেখিয়া আমরা স্পষ্টতঃই চিনিতে পারিলাম। তাহা যে শিষ্যপুত্রের মুণ্ডই প্রকৃত, তাহাতে আর কোন সংশয় রহিল না।

পুলিস ক্রমে গোলমাল সরাইয়া দিলেন। এবং আর কোন চিহ্নই না পাইয়া, অনন্যো-

পায় হইয়া, সেই মুণ্ডটী-সহিতই সকলে থানার দিকে অগ্রসর হইলেন। শিষ্য মহাশয় এবং আমাকেও সেই সঙ্গে যাইতে হইল। কিন্তু শিষ্য মহাশয় তখন আর তাঁহাতে নাই। এমন যে তাঁহার সুদৃঢ় শরীর, তখন যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। একরূপ আমিই তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া পুলিসে চলিলাম।

পুলিসে আমরাও গিয়া পৌঁছিয়াছি, এমন সময় দেখিলাম, আর এক দল পুলিসপ্রহরী দুইটা লোককে বাঁধিয়া আনিতেছে। তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে দুইটি স্ত্রীলোককেও ধরিয়া আনা হইতেছে। যাইহোক, তাহারা আসিয়া পৌঁছিবামাত্রই, থানার ইন্‌স্পেক্টার মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন, আপনি ইহাদের চিনিতে পারেন!" আমি একটু অপ্রতিভ হইলাম। যদিও মনে মনে বুঝিলাম যে উহারা কে, কিন্তু তথাপিও চেহারায় তো মিলিল না! সেদিন যাহাদের রূপে মোহিত হইয়াছিলাম—অপ্সরী-বিদ্যাধরী-ভ্রমে মোহজালে আবদ্ধ হইয়াছিলাম, দেখিলাম,—এতো সে রূপ নহে! কই সে চমক—সে ঠমক কোথায় গেল? সে চাহনি—সে ভঙ্গিমা—সে ভ্রূকুটিই বা কই? বিশেষতঃ পুরুষ দু'জনের চেহারাও আবার সেইরূপ বিপরীত! সেদিন যাহাদের ষণ্ডাকৃতি গুণ্ডাসদৃশ ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, আজ তাহারা ভদ্রবেশী রাজপুত-মাত্র! দিন-রাতের প্রভেদই কি এত প্রভেদ! তবে কি পাউডার-পরিচ্ছদেই চেহারা-সুচেহারা ফুটে! যাইহোক, ইন্‌স্পেক্টার মহাশয় জিজ্ঞাসা করাতেই আমায় কিন্তু উত্তর করিতে হইল,—"হাঁ, ইহারাই বটে! এই দু'টো স্ত্রীলোকই আমাদের ভুলাইয়া উপরে লইয়া যায়, এবং এই দুইজন ও ইহাদের সঙ্গের আরও একটা লোক আমার গলায় ফাঁস জড়াইয়া টানাটানি করিয়াছিল।"

ইহার পরই তাহাদিগকে লইয়া তাহাদের প্রত্যেককে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গারদ-ঘরে পুরা হইল। এবং সেখানে যে কিরূপ কি হইতে লাগিল, তাহা আর আমরা দেখিতে বা শুনিতে পাই নাই। তবে আমার অদ্যাবধি বিশ্বাস যে, আমার দ্বারা চুরী মকর্দ্দমার 'একরার' করাইবার জন্য যেরূপ চেষ্টা হইয়াছিল, ইহাদের দ্বারাও খুনের কিনারার জন্য যে সেরূপ চেষ্টা হয় নাই, এরূপ নহে।

ক্রমে ঘটিয়াছিলও তাই। ঘণ্টাখানেক যাইতে না যাইতেই, তাহাদের একটা স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়া (সম্ভবতঃ যে স্ত্রীলোকটা সে রাত্রে আমাকে লইয়াছিল, তাহাকে লইয়াই) পুলিশ আবার ছুটিল। আমরা আঁচে বুঝিলাম যে,—লাশের কোন কিনারা বুঝি হইয়াছে। অর্থাৎ সেই স্ত্রীলোকটাকে ফুস্‌লাইয়া—তাহাকে তো খালাস দেওয়াইবেই বলিয়া, পুলিস তাহার দ্বারা কি সন্ধান বাহির করিয়াছেন।

প্রকৃতই সন্ধান তাহার দ্বারা কতক কতক পাওয়া গিয়াছিল। সে দুই খানা পা ও হাতের কর্ত্তিত অংশ পুলিসকে প্রদান করিয়াছিল; এবং তাহার সাক্ষ্যে এরূপও প্রকাশ পাইয়াছিল যে, তাহারা ধড়, মুণ্ড ও হাত-পা সমস্ত পৃথক পৃথক কাটিয়া হাঁড়িতে করিয়া গঙ্গায় ডুবাইয়া দিত। ধড় পাচার করিয়াছিলও ঐরূপে; মুণ্ডের বেলায় ধরা পড়ে! যাইহোক, সেই স্ত্রীলোকটা এইরূপ আরও খুনের কথা পুলিসের কাছে স্বীকার করে। এবং অনেককে খুন না করিয়াও, জিনিস পত্র কাড়িয়া লইয়া, ছাড়িয়া দিত বলিয়াছিল।

এইরূপে স্ত্রীলোকটার সন্ধানে উহাদের দলের আরও দুই-চারিজন ধৃত হইয়াছিল; এবং দুই চারিজন নিরুদ্দেশ হইয়া পলায়ন করে। আরও স্ত্রীকোকটার দ্বারা ইহাও জানা গিয়াছিল যে,—উহারাও মধ্য-প্রদেশের ঠগীর দলভুক্ত বটে। ফাঁস দিয়া মানুষ মারাই

উহাদের প্রথা। তবে তারপরে যে কুচি কুচি করিয়া লাস ভাসাইয়া দিত, সে কেবল পুলিসের ভয়ে—অব্যাহতি পাইবার চেষ্টায়।

যাইহোক, মকর্দ্দমা ক্রমে চলিতে লাগিল। দুইচারি দিনে সহরে মহা তোলপাড় পড়িল। শিষ্য মহাশয় বা আমার কিছুমাত্র অবসর নাই। কেবল আমরা মকর্দ্দমার তদ্বিরেই—পুলিসের পাছু পাছুই ঘুরিতেছি।

এমন সময়, সম্ভবতঃ সুশ্রূষার অল্পতা-হেতুই, পিতাঠাকুরের হঠাৎ মৃত্যু হইল। আমার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এখন আমি মকর্দ্দমা চালাই, না পিতার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার আয়োজন করি? যাইহোক, শিষ্য মহাশয়ের কৃপায় আমি তখন মকর্দ্দমা হইতে অব্যাহতি পাইলাম। আমার সাক্ষ্য প্রভৃতি লওয়াইয়া, আমাকে তিনি ছাড়িয়া দিলেন। আমি দেশে ফিরিয়া আসিয়া পিতার শ্রাদ্ধ-শান্তির চেষ্টায় ব্যস্ত হইলাম।

মল্লভূমি।

মল্ল-রাজবংশ।

মেদিনীপুর জেলার মধ্যে অনেকগুলি প্রাচীন জমিদার ও রাজবংশ অদ্যাপি বিদ্যমান আছেন। এই সকল ভূস্বামীগণ এ-প্রদেশে যে ক্রমান্বয়ে ২৫।৩০ পুরুষ পর্য্যন্ত আধিপত্য করিয়াছেন, এ বিষয়টী নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণ করা যাইতে পারে। এই সকল রাজা-জমিদারদিগের মধ্যে কোন কোন বংশ, মোগল-সম্রাটদিগের এ-প্রদেশে আধিপত্য-সংস্থাপনের বহু পূর্ব্বে অর্থাৎ উৎকলে কেশরী ও গঙ্গাবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজাদিগের শাসন-সময়ে, এপ্রদেশে প্রভুত্ব সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, প্রমাণ পাওয়া যায়।

আমি অদ্য যে মল্লরাজবংশের উল্লেখ করিতেছি, এই রাজবংশও এদেশে বহুকাল হইতে প্রতিষ্ঠিত আছেন। শৌর্য্য-বীর্য্যে এই রাজবংশীয়গণ এদেশের মধ্যে একসময়ে যথেষ্ট খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এপ্রদেশের জনসাধারণের নিকটে ইহাঁরা 'মল্লমহারাজ' নামে অভিহিত ছিলেন। এই রাজবংশের বীরত্ব ও দাতৃত্বগুণের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই বংশের কোন্ ব্যক্তি কোন্ সময়ে এদেশে আগমন করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কোন বিশ্বস্ত প্রমাণ সংগ্রহ করান যাইতে পারে না। তবে এইরূপ কিম্বদন্তী আছে,—উৎকলের দেওরাজবংশের কোন রাজার পট্টমহিষীর গর্ভজাত কয়েকটি সন্তান ছিল, আর একটী দাসী-পুত্র ছিল। রাজা দাসী-পুত্রকেই অত্যন্ত ভাল বাসিতেন; এবং কৌশলক্রমে সেই দাসী-পুত্রকেই স্বরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। রাজকুমারগণ এই অব্যবহারে অত্যন্ত দুঃখিত ও অপমানিত হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কেহ কেহ উৎকলের অপর খণ্ডে, কোন কোন রাজকুমার মেদিনীপুর জেলার জঙ্গলখণ্ডে, আপনাদিগের আধিপত্য সংস্থাপন করেন। উক্ত দেওরাজ-বংশীয় কোন রাজকুমার মল্লরাজবংশের প্রতিষ্ঠিতা। এই রাজবংশও জাতিতে ক্ষত্রিয়। সুতরাং উক্ত জনশ্রুতি অমূলক বলিবার কোন হেতু পরিলক্ষিত হয় না।

মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর, বাহাদুরপুর প্রভৃতি পরগণা "ভঞ্জভূম" নামে প্রসিদ্ধ। নিজ মেদিনীপুর সহরের ৮।১০ ক্রোশ পশ্চিমাংশে "চিয়াড়া", "ঝাড়গ্রাম", "বেলিয়াবেড্যা" প্রভৃতি পরগণাই মল্লভূম (মল্লভূমি) নামে বিখ্যাত। অর্থাৎ ভঞ্জভূমের পশ্চিম পার্শ্ববর্ত্তী স্থানই 'মল্লভূম' নামে বিখ্যাত। ইংরাজ-রাজত্বের পূর্ব্বে এই রাজবংশের অধিকার বহুবিস্তৃত ছিল। কিন্তু ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের অধিকারের প্রারম্ভেই চিয়াড়া ও ঝাড়গ্রাম পরগণা এই রাজবংশের অধিকারে আইসে। তৎকালে এই জঙ্গল-মহলের অনেক রাজা-জমিদার ইংরাজগণের বিপক্ষে অনেক ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। কিন্তু

এই রাজবংশীয়গণ ইংরাজ-পরাক্রমের নিকট অবনত হইয়াছিলেন; এবং ইংরাজ-রাজ্যের যথেষ্ট সম্মান ও সাহায্য করিয়াছিলেন।

দশশালা বন্দোবস্তের সময়ে সাধারণ জমিদারের প্রতি যে প্রকার কর নির্দ্ধারণ করা হইয়াছিল, তদপেক্ষা ইহাঁদিগকে অত্যল্প রাজকরে জমিদারী বন্দোবস্ত করা হয়। বর্ত্তমান কালে চিয়াড়া এবং ঝাড়গ্রাম নামক যে দুইটি বিস্তৃত পরগণা এই রাজবংশের অধিকৃত আছে, ইহার সরকারী রাজস্ব ৮০০৲ আটশত টাকার অধিক নহে। কিন্তু উক্ত ভূখণ্ডের বার্ষিক আয় ৫০।৬০ হাজার টাকার কম নহে। তদ্ভিন্ন বর্ষে বর্ষে অনেক শালকাষ্ঠ বিক্রয় হইয়া থাকে। এইক্ষণে মেদিনীপুরে যে সকল শালকাষ্ঠ আনীত হইয়া থাকে, তাহার অধিকাংশই মল্লভূমির জঙ্গল-জাত।

ইংরাজ-শাসনের পূর্ব্বে এ প্রদেশ মুসলমানাধিকার-ভুক্ত ছিল। কিন্তু মুসলমান-প্রকৃতি এ প্রদেশে বদ্ধমূল হয় নাই। বাঙ্গালার নবাব নামে-মাত্র শাসনকর্ত্তা ছিলেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সকল ভূস্বামীগণই প্রজাপালন, শাসন ও দেশের শান্তি-সংস্থাপন-সম্বন্ধে সম্পূর্ণই স্বাধীনভাবে চলিতেন। বাঙ্গালার নবাবের প্রভুতা অথবা অধীনতা এই সকল রাজাগণ অস্বীকার করিতেন না। কিন্তু নবাব-সরকারে এদেশ হইতে রাজকর কখনই নিয়মিত দাখিল হইত না।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বীরত্বে অথবা শৌর্য্য-বীর্য্যে এই রাজবংশ এপ্রদেশে চিরপ্রসিদ্ধ ছিলেন। অপরিমিত বল ও অদ্বিতীয় বীরত্বের পুরস্কারস্বরূপ ইহাঁরা মল্লনামে অভিহিত হইয়াছিলেন। রাজবংশীয়দিগের নামের পূর্ব্বে 'রাজ', এবং নামের শেষে 'মল্ল উগলি ষণ্ড দেনবাহাদুর' এইরূপ সম্মানসূচক উপাধি বহুকাল ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। 'মল্ল' শব্দের প্রকৃতার্থ সাধারণের অবিদিত নাই। 'উগলি ষণ্ড' অর্থে উদ্দাম ষণ্ড। উদ্দাম ষণ্ড যেমন কোন বিঘ্নবাধা মানে না, ইহাঁরাও সম্পূর্ণ অব্যাহত স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতেন, ফলতঃ এই দুইটী উপাধিই বীরত্বব্যঞ্জক। এই রাজবংশীয়গণ যে পুরাকালে অদ্বিতীয় বলশালী ছিলেন, তৎসম্বন্ধে নিম্নে একটী প্রত্যক্ষ উদাহরণ প্রদর্শন করিব। বর্ত্তমান রাজা বাহাদুরের প্রপিতামহ রাজা শ্যামসুন্দর মল্ল অথবা পিতামহ রাজা বিক্রমজিত মল্লকে যে সকল লোক দেখিয়াছিলেন, তন্মধ্যস্থিত দুই একটি প্রাচীন লোক অদ্যাপিও জীবিত আছেন। তাঁহাদিগের নিকটে উক্ত ভূপতিদিগের বীর্য্যবত্তার বিষয় সম্পূর্ণই অবগত হওয়া যায়।

এই রাজবংশের বর্ত্তমান অধিপতি রাজা রঘুনাথ নারায়ণ মল্ল বাহাদুর অপ্রাপ্ত বয়স্কাবস্থায় 'কোর্ট অব ওয়ার্ডের' অধীন ছিলেন। ইনি যে সময়ে ওয়ার্ডের তত্ত্বধারণে মেদিনীপুর-সহরে অবস্থিতি করিতেন, তৎকালে শারীরিক বলবীর্য্যে এখানে যথেষ্টই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ইহাঁর বলবত্তার বিষয় অবগত হইয়া, একদিন বর্দ্ধমান-বিভাগের কমিশনার সাহেব বাহাদুর ওয়ার্ডে রাজকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

কথা-প্রসঙ্গে কুমারের দৈহিক বলের বিষয়ও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তৎকালে একখণ্ড লৌহ-গরাদে তথায় পতিত ছিল, উহার পরিধি ৩।৫ ইঞ্চির কম নহে। কুমার দুই হস্তে সেই লৌহখণ্ড ধারণ করিয়া, সম্পূর্ণ বলের সহিত মোড়া দিয়াছিলেন। লৌহখণ্ড এইরূপ ভাবেই অবনমিত হইল। দড়িতে পাক দিলে যেরূপ অবস্থা হয়, উহাও ঠিক সেইরূপ অবস্থায় পরিণত হইল। মাননীয় কমিশনার সাহেব বাহাদুর কুমারের বলবত্তা প্রত্যক্ষ করিয়া অবাক হইয়া গেলেন। আমাদিগের দেশীয় লোকের বলবীর্য্য পুরুষানুক্রমে অল্প হইয়া আসিতেছে। ফলতঃ ইহাঁর পূর্ব্ব-পুরুষগণের বলবীর্য্য যে অপরিমিত ছিল, ইহার অনুমাত্র সন্দেহ কি?

দাতৃত্ব-গুণেও এই রাজবংশ চিরপ্রসিদ্ধ। সাধারণভাবে ইহাঁদের একটিমাত্র দানশীলতার পরিচয় ব্যক্ত করিব। এই রাজবংশ উৎকলপ্রদেশ হইতে এদেশে আসিয়াছিলেন। এপ্রদেশে সম্পূর্ণ আধিপত্য বদ্ধমূল হইবার কিছুদিন পরে, রাজা ও রাজমহিষী অধিকারস্থ সমস্ত প্রজাবর্গকে কোন কার্য্য-বিশেষ উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করেন। সমস্ত লোকজনকে আহারাদি করাইবার পরে, একজন উৎকল-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ প্রায় দিবাবসান-কালে আহার করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ আহার করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার মস্তকোপরি অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের প্রখর রশ্মি পতিত হইয়াছে। রাজা ও রাজমহিষী ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া একজন অনুচরকে ব্রাহ্মণের মস্তকে ছত্রধারণ জন্য অনুমতি করিলেন।

ব্রাহ্মণের আহার সমাপন হইল। তৎপরে তিনি রাজ--সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া আবেদন করিলেন,---"অদ্য মহারাজের অনুমতিমতে আমার মস্তকে যে ছত্র ধারণ করা হইয়াছে, উক্ত ছত্র আমি কোন্ স্থানে রাখিব?" তৎকালে মস্তকে ছত্রাদি ধারণ রাজ-চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত হইত।

রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—"বেলা শেষ হইতে যে বিলম্ব আছে, ইহার মধ্যে তুমি যতদূর বেষ্টন করিতে পারিবে, সেই ভূভাগের মধ্যে তুমি স্বাধীনরূপে আধিপত্য করিতে পারিবে।" ব্রাহ্মণ অশ্বারোহণে অবশিষ্ট এক প্রহর বেলার মধ্যে প্রায় চারি ক্রোশ স্থান পরিবেষ্টন করিলেন। এই ভূভাগ তদবধি 'বেলা-বেড্যা' নামে বিখ্যাত হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে উক্তস্থান (বেলা-বেড্যা) পরগণা নামে অভিহিত। উক্ত ব্রাহ্মণবংশ "প্রহরাজ" নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। অদ্যাপিও উক্ত স্থান প্রহরাজ-বংশের অধিকৃত আছে। প্রহরাজ শব্দের অর্থ—এক প্রহরের পথের রাজা। এই প্রহরাজ বংশীয়গণ ২।৩।৬ পুরুষ হইতে উক্ত স্থানের আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই বিষয়টী-সম্বন্ধেও দলিলাদি দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে। মল্ল-রাজবংশের সামান্য সামান্য বহুল দানের পরিচয় পাওয়া যায়।—শ্রীচঃ

নবীন বাবুর 'চণ্ডীব্যাখ্যা।'

(প্রাপ্ত)

"বড় অদ্ভুত প্রশ্ন মার্কণ্ডেয় ঠাকুরের এই চণ্ডীখানি।" বঙ্গ-সাহিত্যে-সুপ্রকাশ কবি শ্রীমান নবীনচন্দ্র সেন নভেলী-প্রক্রিয়ায় ইঙ্গ-বঙ্গে মিলাইয়া-মিশাইয়া চণ্ডীর ত্রয়োদশ মাহাত্ম্য ১৫টি পৃষ্ঠায় 'প্রচারে' প্রচার করিয়া ফেলিয়াছেন। ফেলিয়াছেন, গ্লাডষ্টোন সাহেবের হোমার লেখার মত—জগতের হিতের জন্য। গভীর গবেষণা করিয়া সাধু হংসের মত নীরত্যাগ করিয়া কেবল ক্ষীরটুকু পান করিয়াছেন। যে সমস্ত পাঠকপাঠিকা সত্যের আদর করেন, যাঁহারা সত্য ভিন্ন কোন মতেই মিথ্যার লেশমাত্র দর্শন, স্পর্শন বা পাঠনাভিলাষী নহেন, তাঁহারা হংসের নীরত্যাগ করিয়া 'ক্ষীরপাননিব' চণ্ডীর আষাঢ়ে গল্প ত্যাগ করিয়া প্রকৃত সত্যটুকু সানন্দে পান করেন—এই সাধু সঙ্কল্পেই প্রবন্ধটি সৃজিত হইয়াছে। যাঁহারা বিনা সাহায্যে এই ক্ষীরপানে সমর্থ, তাঁহারা 'প্রচারের' পৌষ ও মাঘ-খণ্ডে ইহা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হউন। আর যাঁহাদের সে সুবিধা নাই, তাঁহাদের জন্য আমরা এই প্রবন্ধের নীর ও ক্ষীরটুকু নবীন বাবুর মত পৃথক করিয়া রাখিব। পাঠক-পাঠিকাগণ ক্ষীরপানানন্তর নীরপান করিয়া শীতল হউন, ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য।

অগ্রে চণ্ডীর 'আষাঢ়ে গল্পটি' দিয়া নবীন বাবু পরে মন্তব্য দিয়াছেন। আমরাও অগ্রে নবীন বাবুর 'আষাঢ়ে গল্প' উল্লেখ করিয়া পরে তাঁহার মন্তব্য দিব।

নবীন বাবু লিখিতেছেন,—সুরথ রাজা সমাধি বৈশ্য (Respectively) শূকরভোজী, এবং স্ত্রীপুত্রের কাছে অর্দ্ধচন্দ্র খাইয়া, মেধস ঋষির আশ্রমে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ঠাকুর অর্দ্ধচন্দ্র খাইয়াও রাজ্য ও স্ত্রীপুত্রের প্রতি মমতা হইতেছে কেন?' ঋষি ঠাকুর দার্শনিক উত্তরে বলিলেন,—

"পতিত মমতাবর্ত্তে, মোহগর্ত্তে জীব যত।
সংসার-স্থিতিকারীর মহামায়া প্রভাবতঃ॥"

অর্থাৎ এটা মহামায়ার কার্য্য।

[প্রকাশ থাকে যে, চণ্ডীর কবিতার এ অনুবাদ নবীন বাবুর স্বকৃত]

পুনর্ব্বার প্রশ্ন হইল,—'মহামায়াটা কে?' মেধস ঠাকুর "কতকগুল" আষাঢ়ে গল্প ছাঁদিলেন। ভগবান নিদ্রায় আছেন; তাঁহার কাণের ময়লা হইতে 'মধু' আর 'কৈটভ' নামে দু'টা অসুর জন্মিল। অসুর দুটা আবার বড় Noble fellows "আছিল।" কিন্তু যখন তাহারা ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত হইল, তখন ব্রহ্মা নিদ্রা-দেবীর কাছে মহা কান্না যুড়িলেন। নবীন বাবু বলিতেছেন,—খোসামুদীটা তখনও ছিল। ব্রহ্মা এবং মার্কণ্ডেয় ঠাকুর বাঙ্গালী ছিলেন কি না, কাজেই নিদ্রাকে সংসারের সর্ব্বে-সর্ব্বা বলিয়া স্তব করিলেন। কারণ, "নিদ্রাপ্রিয় বাঙ্গালীর পক্ষে নিদ্রার এই স্তব-স্তুতি অপেক্ষা সুখকর আর কি হইতে পারে!" "নিদ্রামুক্ত জগন্নাথ" মধুকৈটভের সহিত যুদ্ধ যুড়িয়া দিলেন। নারায়ণ কিছু কুলকিনারা করিতে পারিলেন না। তিনি ফাঁপরে পড়িলেন। দেখিয়া Noble fellows দু'টা দয়া করিয়া নারায়ণকে বর দিলেন। নারায়ণ বলিলেন,—আমার বধ্য হও। Noble fellows অসুর দুটা কিঞ্চিৎ Diplomacy (কূট নীতি) খাটাইয়া নির্জ্জল স্থানে বধ করিতে বলিল। কিন্তু তখন পৃথিবীর সর্ব্বত্রই জল! শ্রীহরি তাই নিজের উরুর উপর রাখিয়া চক্রে মাথা কাটিলেন। এই খানেই চণ্ডীর প্রথম মাহাত্ম্য "শ্যাষ" হইল।

চণ্ডীর দ্বিতীয় মাহাত্ম্যে নবীন বাবু দেখাইতেছেন,—মহিষ আর পুরন্দরে ১০০বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ হয়। তাহাতে ইন্দ্র হারিলেন। কিন্তু ইন্দ্র বাঙ্গালীর দেবতা কি না—তাই বাঙ্গালীর মত তিনি Political agitation বা রাজনৈতিক আন্দোলন লাগাইয়া দিলেন। Deputation বা দল বেঁধে ঈশান ও বিষ্ণুর কাছে গিয়া একখানা Memorial বা দরখাস্ত করিলেন। "এখনে" নবীন বাবু বলেন যে,—"বাঙ্গালীরাই যে খালি "গৃহের চতুঃসীমার মধ্যে গৃহিণীর সন্নিধ্যে মহাতেজস্বী, তা'নয়—দেবতারাও তাই।" যা'হোক নিজের তেজ দিয়া "দবতাগুল" একটা দেবী সৃজন করিলেন। দেবীটা মহিষাসুরের Monster সেনাপতিগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন।

তৃতীয় মাহাত্ম্যে দেবী তাহাদিগকে বধ করিলে, খোদ মহিষাসুর আসিলেন। তারপর দেবী কিন্তু "একেবারে Exhausted বা অবসন্না হইয়া পড়িলেন।" "হাজার হোক মেয়ে মানুষ কি না! কাজেই তখন কিঞ্চিৎ Stimulent বা সুরা পান করিলেন; আর বলিলেন,—

"গর্জ্জ গর্জ্জ মূঢ়! মধু পান করি যতক্ষণ।
তোমাকে বধিলে শীঘ্র গর্জ্জিবেন দেবগণ॥"

[দ্বিতীয় দফা প্রকাশ থাকে যে, এই কবিতার অনুবাদগুলি সমস্তই নবীন কবির স্বকৃত]

তার পরেই আর কি,—

"অসিতে কাটিয়া শির দেবী করিলেন হত।"

দেবতারা "তখনে" খুব নাচগান করিয়া বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব Inaugurate বা প্রচলন করিলেন।

তার পর চতুর্থ মাহাত্ম্যে দেবী দেবতাদের লম্বাচৌড়া Thanksgiving বা ধন্যবাদ বা খোসামুদীটা পেট ভরিয়া খাইয়া গা-ঢাকা দিলেন। কিন্তু আবার বিপদ! শুম্ভ নিশুম্ভ

দেবতাদিগকে বেদখল করিল। আবার Monster meeting হইয়া Resolution হইল। এখনকার সিমলা-দারজিলিঙ্গ যেমন আছে, নবীন বাবু বলিতেছেন,—তখনও তা "আছিল।" হিমালয়ে দেবতারা গিয়া Her Excellency বা বিষ্ণুমায়া চণ্ডীঠাকুরাণীর কাছে দীর্ঘ Memorial বা দরখাস্ত পাঠ করিলেন। ঠিক বাঙ্গালীরা যেমন দরবারে আগাগোড়া "খুসামুদী" আর সেলাম ক'রে থাকে, সেই রকম আর কি! কিছুই তফাৎ নাই। দেবী "এখনে" দেহ-কোষ হইতে কালিকা-মূর্ত্তি বাহির করিলেন। মাগী কালিকা—কালা কুচকুচে—তাই রসিকা। "তানি" "একটুক" Humourous procedure বা রসিকা কার্য্যপ্রণালী করিলেন। চণ্ডমুণ্ড শুম্ভকে জানাইল। শুম্ভও "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি" জানিতেন; তাই "রসিকা ঠাকরাণীটিকে" আনিবার জন্য সুগ্রীবকে পাঠাইলেন। ঠাকুরাণী 'একটুক' মুচকি হাসিয়া বলিলেন,—

"যে আমাকে জিনে রণে, করে দর্পচূর্ণ মম।
সে আমার প্রতিযোগী—ভর্ত্তা হবে সেই জন॥"

[তৃতীয় দফায় প্রকাশ থাকে যে, যত কবিতা এই প্রবন্ধে আছে, সমস্তই নবীন বাবুর স্বকৃত অনুবাদ।]

সুগ্রীব পাগল ঠাওরাইয়া বলিল,—"মিষ্টি মুখে না যান ত চুলে ধরিয়ানিবে।" কিন্তু "নিবার" ত পারিল না! তখন ৮ম মাহাত্ম্যে শুম্ভ 'ধূম্রলোচন, ধূম্রলোচন' বলিয়া "ডাক" দিলেন। ধূম্রলোচন গর্ব্ব করিয়া গিয়া বলিল,—"ওগো ভালমানুষের মেয়ে,

"প্রীতিতে প্রভুর কাছে না যাও যদি অবলা।
নিব তবে ধরি বলে কেশাকর্ষণে বিহ্বলা॥"

বাহবা কবি! যাইহোক, "তানিও নিবার" পারিলেন না। তখন শুম্ভ চণ্ডমুণ্ডকে হুকুম দিলেন,—"সিংহটাকে মারিয়া স্ত্রীলোকটিকে চুলে ধরিয়া আন।" কিন্তু চণ্ডমুণ্ড মরিল। অষ্টম মাহাত্ম্যে রসিকা কালী ঠাকুরাণী পৌরাণিক পুরুভুজ রক্তবীজকে বিনাশ করিলেন। নবম মাহাত্ম্যে দেবী উপাধিগ্রস্ত বাঙ্গালীর মত 'জয়া' উপাধি পাইলেন; এবং শূলে নিশুম্ভের বুক বিদ্ধ করিলেন। দশম মাহাত্ম্যে যুদ্ধটা Unfair অন্যায় হইতেছে দেখিয়া শুম্ভ বলিল,—

"বলোন্মত্তা দুর্গে হইওনা গরবিণী।
অন্য বলাশ্রয়ে তুমি যুঝিছ অভিমানিনী॥"

দেবীর আবার Deplomacyও জানা "আছিল।" শুম্ভকে মারিয়া ফেলিলেন। নবীন বাবু বিস্মিত হইয়া অমনি লিখিয়া ফেলিলেন,—"বাপ! কি কাণ্ড-কারখানা!" 'তখনে' ভীরু 'দেবতাগুল' বাইজির নাচগান আরম্ভ করিয়া দিল। বাঙ্গালীর মত 'দেবতাগুল' নিজে কিছুই করিতেন না। তাই যুদ্ধ-কার্য্যটা গৃহিণী দ্বারা নির্ব্বাহ তো করাইতেনই; অধিকন্তু নাচ-গানটাও নিজে না করিয়া গন্ধর্ব্ব-অপ্সরা-বাইজীর উপর বরাদ্দ "আছিল।" যা'ক্ ও কথা! তারপর একাদশ মাহাত্ম্যে আবার Thanksgiving service বা ধন্যবাদ-পর্ব্ব নির্ব্বাহ হইল। দ্বাদশ মাহাত্ম্যে দেবী ঊনবিংশ শতাব্দির বিজ্ঞান দ্বারা তাঁহার উপযুক্ত চরিতাবলী পাঠের ফলাফল নির্ণয় করিলেন।

নবীন বাবু বৈদ্যের মত অমনি দেখাইলেন যে, তাহার কাছে হলওয়ের বটিকা লাগে না। সব রোগ তো তাহাতে প্রশমিত হইবেই; তা ছাড়া নবীন বাবু জানাইতেছেন,—ঐ-টি পড়িলেই ভূভারতের সব পাওয়া যায়। দেবতারা 'অসুরগুলকে' পাতালে পাঠাইলেন। পাতালটা নাকি Transportationএর স্থান, নবীন বাবু ইহাও দেখাইতেছেন। নবীন বাবুর মনে আবার এক মহাপ্রশ্ন জাগিয়া উঠিল। চণ্ডীতে কোথাও পূজায় পশু-হননের ব্যবস্থা নাই। তবে এমন পশুহনন-রূপ মহাপাতকের ব্যবস্থা কে করিল? ভাবিয়া

ভাবিয়া তিনি যেমন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছিলেন, অমনি মনের আবেগে বলিয়া ফেলিলেন,—"ও হরি! তবে 'বলি' শব্দের অর্থ অজ ও মহিষ-মুণ্ডচ্ছেদন নহে? আর আমরা কি 'নিজ গাত্ররক্তের পরিবর্ত্তে' পাঁঠার রক্ত দিয়া থাকি?" এই সিদ্ধান্তে যাই আসা, 'সাই' শ্রীনবীন বাবু বাঙ্গালী জাতির সম্বন্ধে দুটো মহা মন্তব্য প্রকাশ করিয়া সমস্ত বাঙ্গালী জাতির পরম উপকার করিলেন। (১ম) 'যখনে' বাঙ্গালী নিজ গাত্ররক্ত বলি না দিয়া পাঁঠার রক্ত দেয়, 'তখনে' বাঙ্গালী ও পাঁঠা একই শ্রেণীভুক্ত। (২য়) অতএব বাঙ্গালীগণ অজপুত্র। কিন্তু আমরা বলি, নবীন বাবুও তো বাঙ্গালী? এইরূপ গৌরবের আত্মপরিচয়ে নিজের মুখই জ্বলজ্বলে করিয়াছেন।

ত্রয়োদশ মাহাত্ম্যে সুরথ ও বৈশ্যজ দেবীর মূর্ত্তি গড়িয়া দেবীপূজা করিলেন; এবং তাঁহাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। এখানে চণ্ডী শেষ হইল। এই তো নবীন বাবু দেখাইলেন, আষাঢ়ে গল্প। পরে মন্তব্য বা রায় দিতেছেন। রায় দিবার অগ্রে নবীন বাবু যে সমস্ত সত্য এই আষাঢ়ে গল্পের মধ্যে পাইয়াছেন, তার একটা চুম্বক দেওয়া আবশ্যক। নবীন বাবুর আবিষ্কৃত সে সত্যগুলি এই,——

১। "খুসামুদীটা" হালে প্রচলিত হয় নাই।

২। ব্রহ্মা এবং মার্কণ্ডেয় মুনি বাঙ্গালী এবং নিদ্রাপ্রিয় ছিলেন।

৩। চণ্ডীর 'দেবতাগুল' সমস্তই বাঙ্গালী। আর বাঙ্গালীর মত Political agitation বা রাজনৈতিক আন্দোলন করিতেন; Deputation করিয়া Thanksgiving দিতেন।

৪। গৃহের চতুঃসীমায় গৃহিণীর সান্নিধ্যে বাঙ্গালী যেমন বীরপনা করে, চণ্ডীর বাঙ্গালী দেবতাগুলাও তাই করিত।

৫। "তখনেও" সিমলা-দার্জ্জিলিঙ্গ ছিল; সেটা নাগেশ্বর হিমাচল।

৬। চণ্ডী বড় রসিকা।

৭। 'হলওয়ের বটিকা' অপেক্ষা চণ্ডী পাঠে শরীর ভাল হয়।

৮। বাঙ্গালী আর পাঁঠা এক।

৯। বাঙ্গালীরা অজপুত্র।

নবীনবাবু যেরূপ দেখিয়াছেন, সেইরূপ লিখিয়াছেন। সত্যের অনুরোধে বলিতে হয় যে আরও বহুত বহুত রত্ন, বড় অদ্ভুত রচনা নবীন বাবুর এই প্রবন্ধ-মধ্যে লিখিত আছে। পাঠক নিজে পরিশ্রম করিয়া সেগুলি গ্রহণ করিবেন।

এক্ষণে এই আষাঢ়ে গল্প-সম্বন্ধে নবীন বাবুর মন্তব্য।—মার্কণ্ডেয় ঠাকুর যে নিতান্ত গঞ্জিকা দেবীর সেবক ছিলেন, চণ্ডীখানি পড়িয়াও নবীন বাবু এমন বোধ করেন না। তবে, 'একটুক একটুক' যে গাঁজা খাইতেন, অত্র বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি। কারণ, মার্কণ্ডেয় ঠাকুর স্থানে স্থানে নাকি অতি উচ্চ অঙ্গের কবিত্ব ও দার্শনিকত্ব দেখাইয়াছেন। আর নবীন বাবু অনুগ্রহ করিয়া ইহাও বোধ করেন যে,—মার্কণ্ডেয় ঠাকুর ইচ্ছা করিলে যে আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর (স্মরণ থাকে যে, প্রথম শ্রেণীর বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মত লেখা ঠাকুরের সাধ্যাতীত) উপন্যাস-লেখকের ন্যায় একটি গল্প ছাঁদিতে না পারিতেন, ইহা নয়। "এখনে" সমস্যা এই 'অয়' যে,—যদি তাঁনির শক্তি "আছিল", তবে "তানি" ক্যান্ আষাঢ়ে গল্প লিখিলেন। অবশ্য ইহার কোন গূঢ় অর্থ আছে। এই গূঢ় অর্থটুকু নবীন বাবুর ক্ষীর ভাগ। হংস পাঠক এক্ষণে ক্ষীর ভক্ষণ করুন। চণ্ডীর মূলে দশ-অবতারবাদ-নিহিত বিবর্ত্তনবাদ রহিয়াছে। কিন্তু চণ্ডীখানি গীতার কয়েকটি সূক্ষ্মতত্ত্বের স্থূল ব্যাখ্যা মাত্র। স্থূলবুদ্ধি লোকের "জন্যে" আষাঢ়ে গল্প চাই। পাঠক মহাশয় ক্ষীর অনেক পাইবেন—অমার তো 'প্যাট' ভরিয়া গিয়াছে। সংক্ষেপে আরও দুই একটা সত্য নবীন বাবু দেখাইতেছেন।

১। ব্রহ্মা রজোগুণ। ২। মধুকৈটভ ...ত্ব তম—অমৃত ও বিষ; অম্লজান ও জলজান। ৩। এই অম্ল ও জলজানদ্বয়কে অভিভূত করিতে পারিলে রজঃশক্তির ক্রিয়া হয় না। ৪। রজঃশক্তির ক্রিয়া আরম্ভ হইল। কিন্তু সমস্ত জল; এজন্য ক্রমে ক্রমে সলিলে ...ৎস্য, কূর্ম্ম, পরে দৃঢ়ীভূত কর্দ্দমে বরাহ সৃষ্টি হইল। ৫। চণ্ডীর রাক্ষসসৃষ্টির দ্বারা বুঝা ...ইতেছে, তিন যুগ সংক্ষেপে সারিয়া চণ্ডী চতুর্থ যুগের অবতারে উপস্থিত। চণ্ডীর মহিষাসুর—অবতার-বাদের নরসিংহ। নিম্নার্দ্ধ পশু উপরি-অর্দ্ধ নর। ৬। তারপর একদিকে বামন, পরশুরাম, অন্যদিকে নিশুম্ভ, শুম্ভ। অর্থাৎ নিশুম্ভ বামনের মত আর পরশুরাম শুম্ভের মত। অর্থাৎ দেহ মানবের, হৃদয় ...শুর। তা না হইলে মাতৃবধ করে কেমতে! এইরূপ বিবর্ত্তন-নীতিতে ক্রমে পূর্ণ মনুষ্য ...ইল; এবং কলিযুগ সৃষ্ট হইল। কলিযুগে পূর্ণ মনুষ্য সৃষ্টি করিয়া চণ্ডী শেষ হইলেন। ইতি।

একজন ভদ্রলোকের বাড়ীতে একটি মূর্খ ...য়া তাঁহার ঘর-দুয়ার দেখিতে গিয়াছিল। ...ভ্রান্ত ব্যক্তি ঐ চস্যরাজটিকে রীতিমত অভ্য...না করিয়া রাত্রিকালে শয়নের জন্য একটি ...র দেখাইয়া দিয়া গেলেন। সেই ঘরে একটী ঘড়ি ছিল। ঘড়িটি 'টিক টিক' শব্দে চলিতে ...ল। চস্যরাজ কখনও ঘড়ি দেখেন নাই। ... দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তিনি শয়ন করিলেন। ... তাঁহার নিদ্রার বড় ব্যাঘাত হইতে ...গল। তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না ... ঘরের মধ্যে কে শব্দ করিতেছে! অবশ্যই ...ন একটা পোকা ঘরের মধ্যে আছে, স্থির ...লেন; এবং যেদিক হইতে শব্দ আসিতেছিল, ... দিকে কান পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন। ...া তিনি স্থির করিলেন, ঘড়িরূপ বস্তুটার ...রে পোকাটা লুকাইয়া শব্দ করিতেছে। ... পোকাটা পালাইয়া যায়—এই ভয়ে, অতি আস্তে ঘড়িটার কাছে গেলেন; এবং অতি ধীরে ঘড়িটা নামাইয়া আনিলেন। ঘড়ীর দ্বারটা শক্তরূপে বন্ধ করিয়া দুই চারি বার ঘড়িটা নাড়া দিলেন। কিন্তু পোকাটা দেখিতে পাইলেন না; এবং পোকার শব্দও থামিল না। তখন একটু ভয় ও বিস্ময় জন্মিল। আস্তে আস্তে ঘড়ীর দ্বার খুলিয়া বেশ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া ঠিক করিলেন,—বোধ হয় পোকাটা কতকগুলা তারের মধ্যে লুকাইয়া আছে। তখন আস্তে আস্তে ঘড়ির তারগুলি ধরিয়া ঘাড়টি মুচড়াইয়া তা'র মধ্যস্থ লুক্কায়িত পোকাটি বিনাশ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ন করিলেন।

শাস্ত্রমধ্যে যে পোকাগুলা 'টিক টিক' করিয়া ঘুমাইতে দিতেছে না, তাহার মধ্যের একটা এখানে বিনাশ হইল। "এখনে" নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাওয়া যাউক।

দস্যুদলপতি ঝুন্দা।

(২)

এই সকল ভয়ানক-রকমের খুন-ডাকাতিতে মিরাট-প্রদেশ কাঁপিল। লোকে ক্রমে প্রাণ লইয়া বিব্রত হইল। পুলিশ ব্যাতব্যস্ত—গভর্ণমেণ্ট ত্রস্ত! না জানি ঝুন্দা আরও বা কি সর্ব্বনাশ বাধায়? যাইহোক, সকলে প্রাণপনে ঝুন্দাকে ধরিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন। ক্রমে অদৃষ্টের ফলভোগ—ঝুন্দার এক ঘর সন্ধানী পুলিশকে সন্ধান দিয়া সকল অনর্থ ঘটাইল। গত ২৮ এ ফেব্রুয়ারী ঝুন্দা মিরাটের সন্নিকটস্থ এক গ্রামে ডাকাইতি ক[র]িতে যাইবেন;—ঝুন্দার এক ঘর-বিভীষণ ২৫এ তারিখে পুলিশকে সেই সন্ধান প্রদান করিল।

পুলিশেরও তাহাতে 'পোহাবারো!' পুলিশ চারিদিক হইতে ছদ্মবেশে লোকজনের যোগাড় করিলেন। ইন্স্পেক্টার, জমাদার, সার্জ্জন—পুলিশের প্রধান প্রধান সকলেই

ঝুন্দার সেই ডাকাইতির জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া—সাজিয়া-গুজিয়া পুলিশের লোকজন ঝুন্দাকে ধরিবার জন্য ব্যস্ত রহিল।

ঝুন্দা এই সময়ে ডাকাইতি করিতে যাইছেন। কার্য্যস্থলে যাইবার তাঁহাদের আর আদ মাইল-মাত্র বাকী আছে! একটা ফকিরের পরিত্যক্ত আড্ডার নিকট আসিয়া তাঁহারা উপস্থিত হইয়াছেন। এমন সময়, অমনি চারিদিক হইতে পুলিশের লোকজন আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। চারিদিক হইতে অস্ত্র-শস্ত্র চলিতে লাগিল। ঝুন্দার দল মহাবিভ্রতে পড়িলেন। কিন্তু তাঁহারাও নাছোড়বান্দা। 'মারিয়া মরিব, তবু মার খাইয়া মরিব না'—তাঁহাদেরও এই প্রতিজ্ঞা। তাঁহারাও কাজেই পশ্চাৎ-পদ হইলেন না। সবেগে—প্রাণের দায়ে তাঁহারাও অস্ত্র চালাইতে আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু পুলিসের সে অগণ্য বলদর্পে তাঁহাদের ক্ষমতা কতক্ষণ? পুলিশের আঘাতে প্রথমেই ঝুন্দা মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। ঝুন্দার দল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। এই অবধিই ঝুন্দার জীবনী শেষ!—এই হইতেই পুলিশের বাহাদুরী!

এইরূপেই ঝুন্দার জীবন ফুরাইয়াছে! ঝুন্দা দস্যু—ঝুন্দা নরহত্যাকারী—ঝুন্দা নৃশংস! সুতরাং ঝুন্দার এ মৃত্যুতে লোকের আর ক্ষোভ কি? ক্ষোভ নাই বটে; কিন্তু তথাপি লোকে আজিও কেন ঝুন্দার বিয়োগ-ক্লেশ অনুভব করিতেছে? তাহারও কারণ আছে। ঝুন্দা দস্যু, অথচ বীর ছিলেন; ঝুন্দা পরস্বাপহারী অথচ দাতা ছিলেন; লুণ্ঠন করিয়া তাঁহাকে নিজের জীবন কাটাইতে হইত, অথচ অনেক গরিব দরিদ্রগণ তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইত। এই জন্যই ঝুন্দার এত নাম—এই জন্যই ঝুন্দার জন্য লোকে এত কাতর! দস্যু-দলপতি তান্তিয়াও যে গুণে লোকের মন আকর্ষ করিয়াছিলেন, ঝুন্দার জন্যও লোকে তাই অভিভূত!

ঝুন্দার দানকার্য্যের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এক গ্রাম হইতে—গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণ ব্যক্তির বাড়ী হইতে লুণ্ঠন করিয়া, অপর গ্রামের দীনদরিদ্রদিগকে কিছু কিছু করিয়া তাহা বণ্টন করিয়া দিতেন। এরূপে গরিব দরিদ্র দিগকে অল্প অল্প দানের পরিচয় তো তাঁহার অনেক পাওয়া যায়; অধিকন্তু এক সঙ্গে দু'শ', একশ' টাকাও ঝুন্দা অনেক সময় অনেককে দান করিয়াছেন। এক সময়ে একজন তন্তুবায় মিরাট হইতে তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র ক্রয় করিতে যাইতেছিল; পথে ঝুন্দার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। ঝুন্দা তাহাকে জিজ্ঞাসায় জানেন যে, তাহারা তন্তুবায়; কিন্তু মূল ধন অভাবে বস্ত্র-বয়ন করিতে পারে না—ভিক্ষায় জীবন কাটায়। আর, ভিক্ষালব্ধ অর্থেতেই আজ কাপড় কিনিতে যাইতেছে। কথাটা ঝুন্দার প্রাণে বড়ই বাজিল; অর্থাভাবে ব্যবসায় চালাইতে না পারায়, ভিক্ষা করিয়া, তন্তুবায় বস্ত্র কিনিতে চলিয়াছে, তাহাতে তাঁহার বড়ই কষ্ট হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ তন্তুবায়কে এক শত টাকা প্রদান করিলেন; বলিলেন—"তুমি আর কাপড় কিনিও না। সূতা কিনি ব্যবসায় চালাওগে।" তন্তুবায় যেন হাতে স্ব পাইল। তদবধি তাহার আর কোন কষ্টই রহি না। ঝুন্দার দান লোক-মুখে নানারূপে কীর্ত্তি হইতে লাগিল। এইরূপ দানের পরিচয় ঝুন্দা আরও অনেক পাওয়া যায়।

ঝুন্দা তো এখন ইহজীবন হইতে অব্যাহতি লইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার দলস্থ অধিনায়ক গণের নিস্কৃতি কই? তাঁহার দলস্থ লোকগণের এক্ষণে বিচার হইতেছে। মিরাটের জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচার চলিতেছে। শু যায়, আসামীরা অনেক বড়-লোককে তাহাদের দলের সহায়কারী বলিয়া জড়াইতেছে। পুলিশও কে মনসা, তায় ধুনার গন্ধ পাইয়াছে। কাজেই তাঁহাদের আর পায় কে? আসামীদের 'একরারে' হাজতে স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না। হুসানী নামক একটা মুসলমানেই যত জড়াইতেছে।

যাইহোক, আমরা এই পর্য্যন্তই ঝুন্দার জীবনীর উপসংহার করিলাম। ডাকাইত ঝুন্দা পরজীবনে অবশ্যই সুখী হইবেন, এই ভরসা।

মতামত।

পুস্তক-সম্বন্ধে।

সরযূবালা বা শান্তি-নিকেতন। এখানি একখানি উপন্যাস। ভাষার দোষ ও ভাবের অসংলগ্নতা ইহাতে যথেষ্ট আছে। এরূপ পুস্তক যত কম প্রকাশিত হয়, ততই মঙ্গল। আজকাল দুই-চারিখানি বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ করিয়াই অনেকের গ্রন্থকার হইবার সাধ হয়; তাহার পর মুদ্রণকার্য্যের ব্যয় হিসাব করিলে বোধ হয়—'সোনায় সোহাগা!' বঙ্গভাষায় যে আজকাল রাশী রাশী পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে, সে কেবল এই 'সোনায় সোহাগারই' গুণে। বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণী অবধি পাঠ করিয়াই, কত লোক 'আউট্' হইয়া এই দেশহিতকর মহাব্রতে যে ব্রতী হইয়াছেন, তাহা বলা যায় না। তাহারা কি করিবেন? তাঁহাদিগের পক্ষে চতুর্দ্দিক অন্ধকার! কাজেই 'নাম-কাটা সিপাইএর' একটা কাজ তো চাই? পিতৃ-মাতৃহীনা বঙ্গভাষার উপরেই তাই প্রথম অত্যাচার আরম্ভ হয়; এবং তাহাতেই তাঁহারা কেহ 'এডিটর', কেহ 'গ্রন্থকার', কেহ বা 'অনামোপুরুষোধন্য' হইয়া বসেন! কেন বাপু! পুস্তকখানি কোন ভাল-লোককে একবার দেখাইয়া ছাপাইলে কি ভাল হয় না?

'সরযূবালা'-সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার আমাদের কিছুই নাই। পূর্ব্বাপর না ভাবিয়া গ্রন্থকারের কিন্তু এ পুস্তকখানি প্রকাশ করা উচিত হয় নাই! একে ঐতিহাসিক ঘটনা, তাহার উপর তাঁহার অত্যদ্ভুত কল্পনা! পুস্তকখানি তাহাতে বড়ই সুন্দর সাজে সাজিয়াছে! আমরা আশা করি, লেখক তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তকখানি, ইহা অপেক্ষা উত্তম না করিয়া, আর প্রকাশ করিবেন না।

কুমুদিনী।—উপন্যাস।— শ্রীকালীপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। পুস্তকখানিকে কিন্তু উপন্যাস বলা যায় না; তবে একটি প্রকাণ্ড গল্প বলা যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার সরকার মহাশয়ের নামে গ্রন্থকার তাঁহার এই পুস্তকখানি উৎসর্গ করিয়াছেন। উপরে 'প্রিয় অক্ষয় বাবু' নীচে 'অভিন্ন হৃদয়' ইত্যাদি দর্শনে মনে প্রথমেই ধারণা হইয়াছিল যে, গ্রন্থকার একজন 'পাকা লেখক' হইবেন। কিন্তু পুস্তক পাঠ করিয়া তাঁহার লেখনীর সে প্রবীণত্বের পরিচয় পাইলাম কই? বয়সের সঙ্গে মানবচরিত্র-সম্বন্ধে যতটা জ্ঞান জন্মে, তাহা অবশ্য তাঁহার আছে। কিন্তু তাই বলিয়া যে পুস্তক-লেখায়ও তাঁহাকে বাহাদুরী দিতে হইবে, এমন কি কোন কথা আছে? তবে একথা স্বীকার করি বটে যে, এখানি একখানি মনোহর স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থ। স্থানে স্থানে রুচির কতকটা দোষ থাকিলেও, ইহা স্ত্রীলোকদিগকে পাঠ করিতে দেওয়া যায়। গল্পাংশে পুস্তকখানি বাস্তবিকই অতি মনোহর। কিন্তু এ ঠাকুরদা-ঠান্‌দিদির গল্প আজকালকার উন্নতিশীল সাহিত্য-জগতের যুবকগণ ভালবাসিবেন কি? বসন্তকুমারী ও মাধবীর কথোপকথনে মাঝে মাঝে বেশ সুন্দরতা পরিলক্ষিত হয় বটে! তবে তাহারা যে কথায় কথায় 'স্বপ্ন' দেখে, আর 'চিন্তা' করিতে হইলে একেবারে তিন-চারি পাতা 'চিন্তা' করিয়া ফেলে, এটা কিন্তু বড়ই অস্বাভাবিক! পুস্তকের ঘটনাটী

বড় জটিল ; সহজে (অন্ততঃ শেষ অবধি না পড়িলে) কিছুই বুঝা যায় না। ইহাতে বঙ্কিম বাবুর 'রজনীর' কতক কতক ছায়া পড়িয়াছে বলিয়া, বোধ হইল। শেষ কথা এই যে,—যদি 'কুমুদিনী' আরও বিশ-পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইত, তাহাহইলে ইহার যথেষ্ট আদর হইত, সন্দেহ নাই।

কালাচাঁদ।—অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর অষ্টাদশ পর্ব্ব। কিন্তু আমরা পাইয়াছি, সবে তারই প্রথম ও দ্বিতীয় এই দুই পর্ব্ব ! কালাচাঁদ রামতারণের পৌত্র। পিতামহের মৃত্যুর কিছু দিন পরেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয় ; তখন কালাচাঁদ মাতৃ-গর্ভে। দুঃখে-সুখে, বিধবা মাতার অঞ্চল রতন হইয়া, দিনে দিনে কালাচাঁদ বাড়িয়া উঠিলেন ; পাড়াপ্রতিবেশী তাঁহার অত্যাচারে বড়ই ব্যাকুল হইল। শেষে কালাচাঁদের মাতা নানা-বিষয়ে পুত্রের উন্নতি ও সুখস্বচ্ছন্দ দেখিয়া ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। তা'রপর এক সম্পর্কীয় মামার নিকট তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ—কালেক্রমে মামার মৃত্যু—সুতরাং কালাচাঁদের সে স্থান পরিত্যাগ—মাষ্টারী পদ গ্রহণ—কোন বিশেষ অপরাধে জেলে যাওয়া ইত্যাদি। শেষে জেল হইতে ফিরিয়া আসিয়া পিতামহের সহোদর মহাশয়ের সহিত আলাপ পরিচয় অবধি—এই পর্য্যন্তই আমরা কালাচাঁদের বিবরণ পাঠ করিয়াছি। তা'র পর কি আছে না আছে, জানি না। তবে যে অবধি পড়িয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, গ্রন্থকার বিজ্ঞ এবং বহুদর্শী ; সংসারে তিনি মানব-চরিত্র-সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছেন। শুধু গল্পের খাতিরে না পড়িয়া, একটু বুঝিয়া-সুঝিয়া পড়িলে বেশ বুঝা যায় যে, গ্রন্থকারের শ্লেষোক্তির সীমা কতদূর ! কালাচাঁদের অবস্থা এখন তো এই পর্য্যন্ত ! কিন্তু ইহার পর আরও কতদূর কি গড়াইবে, তাহা বলিতে পারি না। তবে যতদূর পড়িয়াছি, তাহাতে বোধ হয় কালাচাঁদের মত লোকের কাছে এ গল্প শুনা-ইলে তাহার কোন কোন বিষয়ে চৈতন্য হইতে পারে। এরূপ ধরণের পুস্তক বাঙ্গালায় অতি অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে।

বসন্তরোগ-চিকিৎসা।—কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ সেন কবিরত্ন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। মুল্য ৷৷৹ আট আনা।

পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা প্রী[ত] হইয়াছি। ইহাতে বসন্তরোগের উৎপত্তি প্রকরণ, পূর্ব্বাবস্থা বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যেরূপ বসন্ত হইলে, তাহার যেরূপ চিকিৎসা করিতে হয়, তাহা সহজে সুবিস্তারিতরূপে বিবৃত আছে। ইহা পাঠ করিলে অনেকেরই উপকার দর্শিতে পারে। তবে মূল্যটা কিছু অধিক হইয়াছে ; চারি আনা করিলে গ্রন্থকারেরও কিছু ক্ষতি ছিল না, অনেকে লইতেও পারিতেন।

'সেন ফ্রেণ্ডসের' পোষাকের দোকান।

৭০ নং অপার চিৎপুর রোডের 'সেন এণ্ড ফ্রেণ্ডসের' কাটা কাপড়ের দোকান আমরা দেখিতে গিয়াছিলাম। দোকানটি দেখিয়া সুখী হইলাম। এ চাকরী-বিভ্রাটের সময় দেশের দু' পাঁচজন ভদ্রলোকের ছেলে, ভবঘূরের ন্যায় চাকরীর উমেদারিতে না ঘুরিয়া, ব্যবসা-বাণিজ্যে এরূপ মন দিতেছেন, ইহা বড়ই সুখের বিষয়। আমাদের বেশী আহ্লাদই এইজন্য। তাহার উপর আবার ইহাঁদের সাজ-সরঞ্জাম, দ্রব্যসামগ্রীর আয়োজন, জামাজোড়ার ছাট-কাট এসব ভাল। অধিকন্তু দোকানের কর্ম্মচারীগণও বেশ বিনয়ী ও ভদ্র। ইহাঁরা এবং এইরূপ অন্য দোকানদারেরা যদি ভদ্রভাবে—অ[ল্প] মুনফায় লোকের ফ্যাসন-বাসনা পরিতৃপ্ত করিতে পারেন, তবে কতকটা কাজ করা হয় কি ? ধর্ম্মতলা, বহুবাজার, বড়বাজার প্রভৃতি সহরের নানা-স্থানে এইরূপ কাটা-কাপড়ের কারবার আছে। জাঁক-জমকে, ভিতর-বাহিরের সৌন্দর্য্যে ইহাঁরা তাঁহাদের অনেকের অপেক্ষা চটক লাগাইয়াছেন বটে ! কিন্তু সেই চটক যদি দ্রব্যগুণে এবং মূল্যের সুলভতায় গ্রাহকের মনে বিধিঁয়া যায়, তাহা হইলে দেশেরও উপকার হইবে—ইহাঁদেরও বেশ লাভ হইবে। এখন, এ ব্যবসায়-বুদ্ধি বজায় রাখিয়া কাজ করিতে পারিলেই মঙ্গল। 'সেন এণ্ড ফ্রেণ্ডস' কোম্পানী এখনও বেশ যত্ন এবং অধ্যবসায়ের সহিত আপনাদিগের ব্যবসায়-বুদ্ধির পরিচয় দিতেছেন। উন্নতিও তাঁহাদের হইতেছে। আশা, তাঁহারা এইরূপ সৎপথে সদ্ব্যবসা চালাইয়া, উপার্জ্জনের পথ দিন দিন প্রশস্ত করিবেন। ৩৭৩ নং অপার চিৎপুর রোডে ইহাঁদের একটী দেশী কাপড়ের দোকানও আছে।

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

ইহাকে কি বলিব ?

বটতলার এক চতুর-চূড়ামণি সম্প্রতি এই এক অপূর্ব্ব বিজ্ঞাপন ক্রোড়পত্র মফঃস্বলে বিলি করিতেছেন। প্রথমে দেখুন পাঠক, বিজ্ঞাপনের কি বোল-চাল—কি আদব-কায়দা ! বিজ্ঞাপনের প্রথমেই লিখিত আছে,—

RAND CLEARENCE SALE.

তার পরের ছত্রেই আবার দেখুন,—

"মাল সাবাড় বিক্রয়।

দেখুন ! দেখুন ! শীঘ্র লউন !

সস্তার চূড়ান্ত !

এতদিন পরে বৎসর শেষে মাল সাবাড় জন্য [মা]টির দরে ওজন দর অপেক্ষা সুলভে সর্ব্বজন-আদৃত বঙ্গ-সাহিত্যের অত্যুজ্জ্বল প্রভাময়ী [হী]রাজী বিক্রয় করিতেছি।

শ্রীমদ্ভাগবত (মহাপুরাণ) ১ম নাং দ্বাদশ স্কন্ধ ২৷৷৹, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ১।৹, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ১৲ কালিকাপুরাণ ১৲, বৃহৎ নারদীয় পুরাণ ১৷৷৹, কল্কীপুরাণ ১৲, বিষ্ণুপুরাণ ১৲, পদ্মপুরাণ ১৲ মহাভাগবতপুরাণ ১৲, বৃহৎ তন্ত্রসার ২৲, গৌরীকাঞ্চলিকাতন্ত্রম্ ।৹, সর্ব্ববিজয়ীতন্ত্রম্ ।৹, অষ্টাবক্রসংহিতা ৷৷৹, মনুসংহিতা ৬৲, ঘেরণ্ড-সংহিতা (যোগশাস্ত্র) ১৲, সিদ্ধিশঙ্করতন্ত্রম্ ৶৹, শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা (সটীক সানুবাদ) ৸৹, শ্রীভগবতীগীতা ৶৹, উত্তরগীতা ।৹, রামগীতা ।৹, গুরুগীতা ৶৹, পাণ্ডবগীতা ।৶৹, মেঘদূতম্ (সটীক সানুবাদ) ১৲, হংসদূত ৸৹, পদাঙ্কদূত ।৹, প্রাণকৃষ্ণ-ঔষধাবলী ৸৹, গৌড়ীয়-ঔষধাবলী ১৷৷৹, উৎকৃষ্ট ঔষধাবলী ১৷৷৹, মৃত্যুঞ্জয়, ঔষধাবলী ৸৹, চক্রদত্ত ৩৲, ভৈষজ্য ধন্বন্তরি ৩৲ নিদানার্থ প্রকাশিকা ৸৹, নিদান (সটিক সানুবাদ) ১৷৷৹, নিদানার্থ চন্দ্রিকা ৸৹, মাধব-নিদান ।৹, দ্রব্যগুণ দর্পণ ।৶৹, আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যগুণ অভিধান ২৲, সারকৌমুদী ।৹, চিকিৎসার্ণব ৶৹, ধন্বন্তরী মুষ্টিযোগ ৶৹, চিকিৎসা-দর্শন ১৷৷৹, চিকিৎসাসারসংগ্রহ ৷৷৹, চৈতন্য-চরিতামৃত (সটীক) ১৷৷৹, চৈতন্যচরিতামৃত (ভাষা) ৷৷৹, চৈতন্য ভাগবত ৷৷৹, শ্রীভক্তমাল গ্রন্থ ৷৷৹, চৈতন্যমঙ্গল ।৶৹, একান্নপদ (গোবিন্দ দাস) ৴৹, ভক্তিতত্ত্বসার ৶৹, মুক্তালতাবলী ৶৹, রাধাকৃষ্ণবিলাস ৶৹, পদকল্পলতিকা ।৹, পদকল্প-তরু ১।৹, বৃহৎ পাষণ্ড দলন, ৶৹ নামসংগ্রহ (গোপাল, বিষ্ণু, রাধিকা, কৃষ্ণ, মহাদেব, ভগবতী, কৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর সহস্র নাম একত্রে) ।৹, ললিতমাধব ।৶৹, বিদগ্ধ-মাধব, ৷৷৹ গোবিন্দলীলামৃত ৷৷৹, গোবিন্দমঙ্গল ১৲, কৃষ্ণমঙ্গল ১৲, বৃন্দাবনলীলামৃত ৸৶৹, সনাতন-গীতা ।৹, মহাভারত অষ্টাদশপর্ব্ব সচিত্র (ভাল কাগজ, বিলাতী বান্ধাই) ১৷৷৹, খেল কাগজে ১৲, দণ্ডীপর্ব্ব ৶৹, রামায়ণ সপ্তকাণ্ড কৃত্তিবাস পণ্ডিত প্রণীত (ভাল কাগজ, বিলাতী বন্ধাই) ১৲ খেলো কাগজে ৷৷৹, জৈমিনী ভারত ১৷৷৹, অধ্যাৎ

রামায়ণ ১৲, অদ্ভুত রামায়ণ (গদ্য) ১৲, পদ্য ।৶, কালিকৈবল্যদায়িনী ॥৶০, কবিকঙ্কন চণ্ডী ।৶০ শ্রীমদ্ভাগবতসার।৶০, কবিতারত্নাকর ৶০, মন্দার-মালা ॥০, সত্যনারায়ণের পাঁচালী ৶০, শনির পাঁচালী ৶০, পাঁচালী ১ম হইতে ৫ম খণ্ড একত্রে (৺ দাশরথি রায় প্রণীত) ১৲, ৬ষ্ঠ খণ্ড ৶০, ৯ম খণ্ড ।৶০, সটীক সর্ব্বসৎকর্ম্ম-পদ্ধতি ১৲, সর্ব্বদেবদেবী পূজাপদ্ধতি ॥০, মার্কণ্ডেয় পুরাণা-ন্তর্গতা চণ্ডী (সটীক) ॥৶০, ব্রতমালা পদ্ধতি ॥০ শ্রীমদ্ভাগবতগীতা (পুঁথির আকারে) ৸০, ব্যবস্থা কল্পদ্রুম ১।০, ব্যবস্থা সর্ব্বত্র ১৲, শিবসংহিতা ১৲, সটীক শ্লোকমালা ৸০, অমরকোষ (অভিধান) ৶০, অমরার্থ চন্দ্রিকা ১৲, শব্দার্থ প্রকাশিকা (অভিধান) ১॥০, শীলপ্রেশ পকেট অভিধান ।৶০, প্রকৃতিবোধ অভিধান ৩॥০, প্রকৃতিবাদ অভিধান ৫৲, মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ (মূল) ।০, ঐ সটীক সানুবাদ ৩॥০, ইংরাজি বাঙ্গালা ডিক্সনারি (বৃহৎ বান্ধাই) ১॥০, ঐ ছোট ॥০, বাঙ্গালা-ইংরাজি অভিধান ৸০, মরেশ স্পেলিংবুক ৶০, ইংরাজি কাপি ৶০, শিশুবোধক (বৃহৎ সচিত্র) ৶০, ঐ ক্ষুদ্র ৶০, ভোকাবুলরি (ইংরাজি শব্দের বাঙ্গালা অর্থ সহিত) ৶০, ৺ ভারতচন্দ্র রায়ের গ্রন্থাবলী ৸০, সঙ্গীতমালা ৶০, বাউল সঙ্গীত ৶০, ঐ বৃহৎ ২৪৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ।০, পদাবলী (৺ রাম প্রসাদ সেন প্রণীত) ৶০, শান্তি-শতক (সটীক সানুবাদ) ৸০, মহানাটক ৶০, শ্রীমদ্রামরসায়ন ২॥০, দোঁহাবলী (১ নাং ১০ খণ্ড) ৸৶০, গীতরত্ন ১৲, জাতিকৌমুদী ৶০, প্রভাসখণ্ড (১ম) ॥০, ঐ (২য়) ॥০, ঐ ১ নাং ১০ খণ্ড একত্রে ৸০, প্রেমোল্লাস ।০, পথ্যাপথ্য-ব্যবস্থা ॥৶০, পরিভাষা-প্রদীপ ॥৶০, গায়নহৃদ-কুমুদ ৶০, বাদ্যশিক্ষা (১ম) ।০, ঐ ২য় ।০, সামবেদীয় সন্ধ্যাবিধি ৶০, ত্রিবেদীয় সন্ধ্যা ৶০, কালীবিলাস ৶০, পাকরাজেশ্বর ৸০, বৈরাগ্য-শতক ।৶০, বামনপুরাণ ২॥০, প্রাণতোষিণী তন্ত্রম্ ৪৲, জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্রম্ ।০, জ্যোতিষার্থ-দীপিকা ১॥০, জ্যোতিঃসারসংগ্রহ ।০ জ্ঞানকৌমুদী ৶০, তরজা (সর্ব্ববৃহৎ) ।০, ঐ ৫ম খণ্ড ৶০, ঠকণ্ঠকী তরজা ৶০, নাড়ীবিজ্ঞান ৶০, নিত্য-কর্ম্ম পদ্ধতি ৶০, কৃষ্ণকর্ণামৃত ১৲, চৈতন্যচন্দ্রো-দয় নাটক ১৲, কৌতুকতরঙ্গিনী ॥৶০, কৌতুক-দর্পণ ৶০, ব্রহ্মসংহিতা ৶০, রত্নমালা অভিধান ।০, রসেন্দ্রসারসংগ্র ২৲ শীতলার জাগরণ পালা ।০, বেতালপঞ্চবিংশতি ৸০, বত্রিশসিংহাসন ৸০, হনুমান চরিত্র ৶০, কর্ম্মবিপাক (শতাতপীয়) ।০, অদৃষ্ট-পরীক্ষা ৶০, দেবার্চ্চনাবারিধি ১॥০, দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী ॥০, নারদপঞ্চরাত্র ১॥০, মন-সার ভাষান ৶০, মনসাচরিত ৸০, লক্ষ্মণ দিগ্বি-জয় ॥০, স্মরণমঙ্গল ৶০, বিজয়বসন্ত নাটক ৶০, মেঘনাদবধ নাটক ৶০, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ নাটক ৶০, হরিশ্চন্দ্র নাটক ৶০, রাবণবধনাটক ৶০, দক্ষযজ্ঞ নাটক ৶০, ভীষ্মের শরয্যা নাটক ৶০, কীচকবধ নাটক ৶০, সাবিত্রী-সত্যবান নাটক ৶০, গোলেবকায়লী নাটক ৶০, শকুন্তলানাটক ৶০, রামবনবাস নাটক ৶০, আরব্য উপন্যাস ॥০, পারস্য উপন্যাস ॥০, শুকসারীর উপন্যাস ১৲, নূতন অদ্ভুত গুপ্তকথা ॥০, পাঁচটী মেয়ে (উপ-ন্যাস) ॥০, সুরবালা (উপন্যাস) ॥৶০, দেব-যানী (উপন্যাস) ৸০, স্বর্ণবাই (উপন্যাস ॥৶০, রাণী চোধুরাণী (উপন্যাস) ৸০, তাপসীকণ্ঠ-হার (উপন্যাস) ॥০, উপন্যাস-কুসুম ॥০, ফুল-পঞ্জিকা ॥০, ভিক্টোরিয়া পঞ্জিকা ৸০, সচিত্র গোল-কধাম (খেলা) ১০ হাতেমতাই (গদ্য) ১।০।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

এই সকল গ্রন্থের পূর্ণ মূল্য তিন গুণ কোন কোনটি বা চতুর্গুণ অপেক্ষাও অধিক—এস্থলে কেবল সুলভ মূল্য লিখিত হইল। যিনি আট আনার অধিক মূল্যের পুস্তক লইবেন, তাঁহাকে আমরা নিজ হইতে ডাকমাশুল দিব ও ভিঃ পিতে পাঠাইব। ভিঃ পিঃ খরচা ৶০ গ্রাহকের লাগে। কিন্তু আট আনার কম লইলে ডাক মাসুল গ্রাহককে দিতে হইবে এবং ঐ সকল পুস্তক ভিঃ পিতে পাঠাইব না। গ্রাহকগণকে ইহার জন্য ডাকটিকিট পাঠাইলেই চলিবে। একত্রে দুই টাকার বা তদূর্দ্ধ মূল্যের পুস্তক লইলে প্রত্যেক গ্রাহকেই ১২৯৭ সালের এক-খানি সুন্দর বিশুদ্ধ হিন্দুপঞ্জিকা উপহার পাইবেন।"

* * * *

পরতে-পরতে এরূপই বোল-চাল বাড়িয়াছে; স্তরে-স্তরে লোভানি-ভুলানির এরূপই লহর উঠিয়াছে! ধন্য বাপাজীরা কিন্তু!—ধন্য তোমা-দের বিজ্ঞাপন-লেখার আদব কায়দা! এ না হইলে কি আর বাহাদুরী বলে?

যাইহোক, পাঠক মহাশয়গণ এখন ব্যাপার-খানা কিছু বুঝিয়াছেন কি? "এই সকল গ্রন্থের পূর্ণ মূল্য তিনগুণ কোন কোনটি বা চতুর্গুণ অপেক্ষাও অধিক—এস্থলে কেবল সুলভ মূল্য লিখিত হইল"—একথার কোন তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন কি? বোধ হয়—না। এ জুয়াচুরী-তত্ত্বের মর্ম্মভেদ বড় অল্পদর্শিতার কাজও নহে। তবে প্রধানতঃ পাঠকগণ এইটুকু মর্ম্ম বুঝিয়া রাখুন যে,—এই বহিগুলির অনেকগুলিই বটতলাই বই। বাপাজীরা যা দাম লিখিয়াছেন অর্থাৎ বিক্রেয় মূল্য. বাপাজীরা যারও তিনগুণ বা চারিগুণ বলেন—এক কথায় বাপাজীদের লিখিত যাহা সুলভ মূল্য—প্রভৃতি প্রস্তাবে এই তালিকার অধিকাংশ পুস্তকই তাহা অপেক্ষাও ঢের কমদরে অর্থাৎ কোনটি বা বাপাজীদের প্রদত্ত দরেরও অর্দ্ধেক বা সিকিতেও বাজারে সচরাচর বিক্রীত হয়! পাইকারী দরের কথা বলিতেছি না,—খুজরা দরেও সচরাচর সকলেই কিনিতে পান। সুতরাং পাঠকগণ বুঝুন, কি সুলভের লোভানি—কি 'মাল সাবাড় বিক্রয়!'

তার'পরে বাপাজীদের বিজ্ঞাপনের আরও একটা কারচুপী দেখুন। বিজ্ঞাপনে যদিও লিখিত আছে,—"এই সকল গ্রন্থের পূর্ণ মূল্য তিনগুণ কোন কোনটি বা চতুর্গুণ অপেক্ষাও অধিক—এস্থলে কেবল সুলভ মূল্য লিখিত হইল।" অথচ পুস্তকের দামের তালিকায় অনেক পুস্ত-কের পূর্ণমূল্য অপেক্ষাও দাম বেশী ধরা হইয়াছে। এই এক 'প্রকৃতিবাদ অভিধান' পুস্তকের দাম লিখিয়াছেন,—সুলভ মূল্যে ৫৲ টাকা। সুতরাং উহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, উহার আসল দাম ৫৲ টাকার তিন গুণ বা চারি গুণ অর্থাৎ ২০ টাকা বা অভাবে অন্ততঃ ১৫৲ পনের টাকাও। কিন্তু বাস্তবিকিই কি তাই? পূর্ণমূল্য অপেক্ষা এইরূপ আরও অনেক স্থলে অধিক মূল্য ধরিয়া-অথচ সুলভ দিতেছি বলিয়া—লোকের চক্ষে ধাঁধা দিবার চেষ্টা হইয়াছে।

এক এক করিয়া প্রত্যেকটি দেখাইবার স্থান আমাদের নাই। তবে মোটের উপর পাঠক-গণ বুঝুন যে,—*Grand Clearence Sale* বা 'মাল সাবাড় বিক্রয়' বলা—এও এক ফন্দি! এই বলিয়া লোকের চক্ষে ধাঁদা দিয়া শেষে ঠকাইয়া লওয়াই বিজ্ঞাপনদাতার উদ্দেশ্য। ফলতঃ সাধারণে দর যাচাই করিয়া, ঐ সকল পুস্তক ক্রয় করেন, এই বাসনা।

উপসংহার বলা কর্ত্তব্য যে, এই বিজ্ঞাপনটি 'সঞ্জীবনীর ক্রোড়পত্র' বলিয়া 'সঞ্জীবনীর' সহিত ও নানারূপে বিলি হইতেছে।

সংবাদ।

—আমেরিকায় যাহা হয়, তাহাই বৃহৎ কাণ্ড হয়। দৈব-দুর্ব্বিপাকও ওরূপ আর কোথাও শুনা যায় না। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে,—ইলিনইস, ইণ্ডিয়ানা, কেণ্টাকী প্রভৃতি স্থানে ভয়ানক ঝড়, বৃষ্টি ও বন্যা হইয়া গিয়াছে। অনেকগুলি গ্রামকে গ্রামই একেবারে ধ্বংশ করিয়া দিয়াছে। কতক নগর জনশূন্য হইয়াছে। লুইভিল্ল নামক একটী স্থানেই প্রায় ৮০০ লোক মারা গিয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন, বর্ত্তমান দৈব-দুর্ব্বিপাকে সর্ব্বশুদ্ধ ১৫০০ লোক মারা গিয়াছে। বন্যা আসিয়াছিল, মিসী-সিপী নদী হইতে। মাঝে মাঝে অনেক স্থানে ঘূর্ণবায়ুও দেখা দিয়াছিল। দৈব-দুর্ব্বিপাকের অনুষ্ঠানের ত্রুটী হয় নাই।

—কলিকাতার ঘরে ঘরে আজকাল ইনফ্লুয়েঞ্জা ব্যায়রাম! এমন বাড়ী নাই যে, যেখানে এরোগ প্রবেশ করেন নাই।

—ইনফ্লু-এঞ্জার সহজ-লভ্য ঔষধ।—জ্যৈষ্ঠমধু এক ছটাক, ইসবগুল ½ ছটাক, রসুন ¼ ছটাক, লবণ ¼ ছটাক, গোলমরিচ ¼ ছটাক, এবং কর্পূর ½ ছটাক। এই কয় দ্রব্যকে একসের জলে ফেলিয়া দিয়া দেড় ঘণ্টা-কাল সিদ্ধ করিতে হইবে। তৎপরে ছাকিয়া ফেলিয়া অল্প মিছরীর সহিত প্রত্যেকবারে ½ ছটাক করিয়া দুইঘণ্টা অন্তর খাইবে। খাটী সরিষার তৈল এরূপ ভাবে গরম করিবে, যেন তাহাতে কোনরূপ গন্ধ না থাকে। সেই তৈল তৎপরে গলায় মর্দ্দন করিবে।

—বড়-লোক চোর! ডিউক-অফ-কনটের বোম্বায়ে এক ফরাসী পাচক ছিল। ডিউক যে দিবস ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহার পূর্ব্ব-দিবসে পাচকের ১ হাজার টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি চুরী যায়। ডিউকের ঘরে চুরী, মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল—পুলীষ রীতিমত অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অবশেষে ডিউকের ছেলেদের শিক্ষক সার্জ্জেণ্ট বার্ণেসকে পুলীষ চোর বলিয়া ধরিয়াছেন। সার্জ্জেণ্ট বার্ণেস বোম্বায়ে অপহৃত কতকগুলি দ্রব্য বিক্রয় করিয়া কলিকাতায় পলাইয়া আসিয়াছিলেন। এখান হইতে ধৃত হইয়া আবার বোম্বায়ে প্রেরিত হইয়াছেন। ডিউক উপযুক্ত পাত্রেই ছেলেদেব শিক্ষকতা ভার ন্যস্ত করিাছিলেন!

—আমেরিকায় হতাশ-প্রেমিকের এক সভা স্থাপিত হইয়াছে। বিবাহ করিবে বলিয়া প্রণয়িণীরা যাহাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন, সেই মনোভঙ্গ প্রেমিকদলের ১২ জনে মিলিয়া এই সভা গঠিত হইয়াছে। সভার সভ্যেরা একেবারে নারীজাতির সহিত আর কোন সম্বন্ধ রাখিবেন না, রমণীর সহিত জীবনে কথা কহিবেন না, কোন রমণীর নিকট হইতে কখনও কোন দ্রব্যাদি ক্রয় বা কোন রমণীকে দ্রব্যাদি বিক্রয়ও করিবেন না। যে সভ্য এসকল নিয়ম ভঙ্গ করিবেন, তাঁহাকে সভা হইতে বিতাড়িত করা হইবে।

—অল্প কয়েক দিন হইল, মাতলা-রেলওয়ের একজন আরোহী পদব্রজে ট্রেনকে পরাজয় করিয়াছে। কলিকাতায় নৌ-সখের দলের সৈন্যেরা সে দিন সখের ক্রীড়ার জন্য ডায়মণ্ডহারবারে যাইতেছিল। তন্মধ্যে একজন কোনও এক ষ্টেশনে জলপান করিতে অবতরণ করে; এবং ইতিমধ্যে ট্রেন ষ্টেসন ছাড়িয়া চলিয়া যায়। অন্য উপায় না দেখিয়া ঐ সৈনিক ট্রেনের সঙ্গে চলিতে থাকে। অবশেষে ৬ মাইল দৌড়িয়া যাইয়া, পরবর্ত্তী ষ্টেশনে গাড়ী ধরিয়াছিল। বাহাদুর বটে!

—বিগত ৩ বৎসরে, প্রতি বৎসর ২৫ হাজার টাকা রবার ষ্ট্যাম্প ও কালী ইত্যাদিতে গভর্ণমেণ্টের খরচ হইয়াছে। তাই গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিয়াছেন, এখন হইতে কাগজ কলম ইত্যাদির ন্যায় এই ষ্ট্যাম্পাদিও সরকারী ষ্টেশনারী আফিস হইতে যোগান হইবে।

—মেয়েমানুষ (Women) নামক এক মজার সংবাদপত্র বিলাত হইতে বাহির হইতেছে। কাগজখানির সবই মেয়েমানুষ! মেয়েমানুষ নাম, মেয়েমানুষ সম্পাদক, মেয়েমানুষ প্রিণ্টার-প্রেসম্যান, মেয়েমানুষ কম্পোজিটার-প্রুফরিডার! মেয়ের মেয়ের ছয়লাপ!

—তারককৃষ্ণ নামক একটী ছেলে শৈলেন্দ্রকৃষ্ণের কাণ কামড়াইয়া ছিঁড়িয়া লইয়াছিল। তারককৃষ্ণ শৈলেন্দ্রের নামে তাহার অভিভাবকের নিকট কি নিন্দা করে। তাই শৈলেন্দ্র তারককৃষ্ণকে পথে পাইয়া টানাটানি করিয়াছিল। তারককৃষ্ণ নিস্তারের কোন উপায় না দেখিয়া শৈলেন্দ্রের কাণ কামড়াইয়া দিয়াছিল। এমন কামড়াইয়াছিল যে, কাণের খানিকটা মাংস খসিয়া পড়ে। এমনই মজা, মাংসটা খসিয়া পড়িবামাত্র তখনই একটা কাক তাহা মুখে করিয়া তুলিয়া লইয়া চম্পট দেয়। তারককৃষ্ণের দুই মাস সপরিশ্রম কারাদণ্ড হইল।

—সিসিলি দ্বীপে রেলওয়ের মধ্যে একটা ভয়ানক চুরি হইয়া গিয়াছে। ফিকারাজেলি ষ্টেশন ছাড়িবার জন্য যাই ট্রেণে মোশান দিয়াছে, অমনি চারি জন লোক লম্ফ দিয়া ব্যাগেজের গাড়ীতে উঠিয়া পড়ে। পরে গার্ড ও পোর্টারকে বাঁধিয়া একটী বাক্স ভাঙ্গে, এবং তাহাহইতে ৮০০০ লায়ার (lire) নগদ পায়, এবং ৪০০০ লায়ার মূল্যের কতকগুলি দ্রব্যও অকস্মাৎ আত্মসাৎ করে। পরে পালার্মো ষ্টেশনে গাড়ী পোঁছিবার পূর্ব্বেই তাহারা নামিয়া পলায়ন করে। গার্ড ও পোর্টার বাঁধাই পড়িয়া থাকে। পশ্চাৎ ষ্টেশনের লোকে খুলিয়া দেয়। কি দুঃসাহস!

—এবার সবডেপুটী-কলেক্টরী পরীক্ষায় নিম্নলিখিত পাঁচজন উত্তীর্ণ হইয়াছেন:—

—১। বাবু উপেন্দ্রনাথ ঘোষ বি, এ, ২। বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঘোষ বি, এ, ৩। বাবু কৃষ্ণলাল দে, ৪। বাবু দেবেন্দ্রপ্রসাদ দত্ত, ৫। বাবু সুরেন্দ্রলাল মিত্র। ইহার মধ্যে প্রথম চারি জন ৩য় শ্রেণীর প্রতিনিধি কলেক্টরের কার্য্য পাইয়াছেন। বাকী বাবুটী আপাততঃ কার্য্যশিক্ষা করিবেন, এবং সেই জন্য মাসিক ৩০৲ টাকা মাসহরা পাইবেন।

ফরিদপুর-জেলার মধ্য ইংরেজী ও মধ্য বাঙ্গলা ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার ফল।

প্রথম বিভাগ।—গোপালগঞ্জ, শ্রীনাথ অধিকারী বল্লভদী, অশ্বিনীকুমার ভট্টা। গোসাইরহাট, বৈকুণ্ঠচন্দ্র রায়। কার্ত্তিকপুর, গোবিন্দচঃ সেন, গিরীন্দ্রচঃ চক্র, সারদাচঃ দাস। দ্বিতীয় বিভাগ।—ফরিদপুর, সীতানাথ চৌ, হরেন্দ্র সাহা। মাণিকদহ, আবদুলহামিদখাঁ, তারাপ্রদাস, অক্ষয়কু দাস। ওলপুর, অবনী রায়। কোটালীপাড়া, উমেশচঃ গুপ্ত। আমগ্রাম, বীরজাচঃ ভট্টা। বল্লভদী, অশ্বিনীকু দে, শশিমোঃ সেন। গোপালপুর, হরলাল বন্দ্যো, কাজি আহাম্মদ মহিয়দ্দিন। লোনসিংহ, যামিনীকান্ত সমদ্দার। বঙ্গেশ্বরদী, রসিকলাল নাগ। তৃতীয় বিভাগ।—খালিয়া, ললিতমোঃ চৌ। উমেদপুর, বিপিন ঘোষ। মাদারীপুর, উমেশচঃ দত্ত। খালকুলা, যতীন্দ্রভূঃ আচার্য্য। মেঘনা, হরিদাস বাগছি।—মধ্যইংরেজী পরীক্ষার্থী মধ্যবাঙ্গালায় উত্তীর্ণ।—প্রথম বিভাগ।—লোনসিংহ, অনাথবন্ধু বন্দ্যো। দ্বিতীয় বিভাগ।—বল্লভদী কামিনী চন্দ। উমেদপুর ললিত বন্দ্যো। লোনসিংহ, বৈকুণ্ঠ কাহালী। তৃতীয় বিভাগ।—পিঙ্গলা, শশধর ভট্টা, এজলার রহমান সেক। কালামধা, ললিতকুঃ ভট্টা। মধ্যবাঙ্গালা পরীক্ষার ফল।—প্রথম বিভাগ।—ফরিদপুর, মীর এছহাক। মাণিকদহ, বসন্তকুঃ ভৌমিক। আলগী, প্যারী চাকী। বল্লভদী, রসিক চক্র। পাঁচ্চর, অক্ষয়কু দাস পালং, বরদাকাঃ কাহালী। কার্ত্তিকপুর, রোহিণী গুহ। গোসাইরহাট, নিবারণ ভট্টা। লোনসিং, দেবেন্দ্র মুখো। কুলকুড়ী, নবীনচ চন্দ। খানাখানাপুর, বিজয়শঙ্কর দত্ত। সোণাপুর, গতিলাল সাহা। রাজবাড়ী, যাদবচ পাল। দ্বিতীয় বিভাগ।—ফরিদপুর, শশিভূষণ চক্র। কৃষ্ণপুর, অম্বিকাচ মিত্র। ঢেউখালী, অন্নদা কর। মাণিকদহ, কৈলাশ সূত্রধর। খাদারপাড়া, আবদুল লতিফ খাঁ। পিঙ্গলা, হৃদয়নাথ দাস। বাটীকামারী, রাধাচ ভট্টা, অমৃত ভট্টা। আলগী, শরচ্চন্দ্র বসু। মোচনা, বিপিনচ চন্দ। লনীক্ষীর, দৈবচ ধর। ওড়াকান্দী, চন্দ্রকান্ত বিশ্বাস, জলধর বিশ্বাস। উজানী, বিনোদ রায়। জাহানাদ, যোগেন্দ্রমোঃ রাহুত। বনগ্রাম, নকুলেশ্বর সাহা। সোনাপাড়া, ষষ্ঠি মণ্ডল। কবিরাজপুর, বিপিন চক্র। ওলপুর, সীতানাথ রায়। কোটালীপাড়া, কালীনা গৌতম। মাঝবাড়ী, বিপিন চক্র, সর্ব্বেশ্বর গাঙ্গো। হিরণ, কৈলাসচ কর্ম্মকার। টুপরিয়া, বঙ্কু বি চক্র। গোপালপুর, মহিয়দ্দিন। আমগ্রাম, হরিহর চক্র। বল্লভদী, রাসবি দত্ত, বিপিনবি মিত্র। পাঁচ্চর, যজ্ঞেশ্বর চক্র, নিশিকান্ত গঙ্গো, মোহনচ গোপ, পুলিনচ ঘোষ। পালং, বিপিনবি চৌ, কুঞ্জলাল সেন। কার্ত্তিকপুর, প্রভাতচ মুখো। তুলাসার, নিশিকান্ত চৌ, যদুনাথ মুখো। লোনসিংহ, জানকী বন্দ্যো, বিপিনবি চক্র, মনোমোহন দে। রুদ্রকর, বসন্তকু কাজলিয়া, কামিনীকু চক্র, নিশিকান্ত চক্র, সতীশচ চক্র, ব্রজেন্দ্রকু চট্টো। রামভদ্রপুর, মহেন্দ্রচ দে, বিধুমোহন ঘোষ। কনেশ্বর, যোগেশচ মুখো। কুড়াশী, শরৎচ বন্দ্যো। মেঘনা, গোপালচ বিশ্বাস, মুজিবদ্দিন মিঞা। বালিয়াকান্দি, অবিনাশচঃ ভৌমিক। খানাখানাপুর, প্যারীমোহন, গোপালচ কুণ্ডু। নওপাড়া, কৃষ্ণচ পাল। রাজবাড়ী, কার্ত্তিকচ দাস। ডুমাইন, ললিত ঘোষ। প্রাইভেট, নিশিকান্ত চক্র, যাদবচ ঘোষ। তৃতীয় বিভাগ।—ফরিদপুর, রবিলোচন সাহা, রজনীকান্ত চন্দ মতিলাল মজুম, প্রসন্নকু দাস, আজারদ্দিন মোল্লা। গোপালপুর, রামলাল গুহ, অক্ষয়কু বিশ্বাস। মাচ্চর, উপেন্দ্রচ মজুম। গোরচর, বসন্তকু বিশ্বাস। কাগদী, সীতানাথ সরকার, রাসবি ঘোষ। জগন্নাথদী, মধুসূদন দত্ত। মাণিকদহ, যোগেন্দ্রকু দত্ত, বেণীমাধব দে, গোপালচঃ গোপ। খাদারপাড়া, যজ্ঞেশ্বর চক্র, আবদুল করিম। পিঙ্গলা, রজনীকান্ত দাস, যাদবচন্দ্র পাল। কালামধা, হীরালাল রায়। বাটীকামারী, শ্যামাকান্ত ভট্টা। বাজেকুকুরা, রসিক কর্ম্মকার, রাজেন্দ্র গঙ্গো, বিপিনবি কর্ম্মকার। আলগী, দক্ষিণা ভট্টা। মোচনা, মুকুন্দনাথ ঘোষ। লনীক্ষীর, জাহ্নবীচ ঘোষ, কালীদাস বসু। ওড়াকান্দী, বিশ্বেশ্বর চৌ। শিকুয়াইল, কৈলাসচ মুখো, নিবারণচ শীল, কালীমো দাস, হরিনাথ দে। সদরদী, রাজেন্দ্র রায়। জাহানদী, রাজেন্দ্রচ দত্ত। গোহালা, রসিক দালাল। বনগ্রাম, পূর্ণচন্দ্র সাহা। নড়াইল, মাধব মণ্ডল, গুরুচ মণ্ডল। কবিরাজপুর, আশুতোষ রায়। কোটালীপাড়া, বিশ্বেশ্বর মজুম, রাধানাথ গৌতম, গুণসিন্ধু গোপ, নবীনচ দাস গুপ্ত। গোপালগঞ্জ, গোবিন্দচ দে দাস, অশ্বিনীকু দত্ত বণিক। হিরণ, বসন্তকু রুদ্র। টুপরিয়া, তারাচ সমদ্দার। আমগ্রাম, হেমন্তকু ঘোষ। বল্লভদী, তারাপ্র বসু। মাদারীপুর, ফৈজুদ্দিন, আবদুল মোমেদ, রাধারঃ কুণ্ড। ইশিবপুর, অতুলচ বসু, শরচ্চন্দ্র ঘোষ। কুলপদ্দী, নীলকণ্ঠ বণিক। পালং, আদিত্যচ আচার্য্য। গোসাইরহাট, মহেন্দ্রচ দাস গুপ্ত, বসন্তকু কাহালী। রুদ্রকর, শ্রীশচ মুখো, নিশিকান্ত বন্দ্যো। জপসা, নিবারণচ রায়। রামভদ্রপুর, অশ্বিনীকু কর। কোঁয়ারপুর, তারাপ্র রায়, হরপ্র রায়।

ডোমশার, বেণীমাচক্র। কুড়াশী,সারদাপ্র সেন.মহিমচ বন্দ্যো। তিলৈ,রোহিনীকু গঙ্গো। ঘোষপুর, প্রসন্নকু মিত্র। মেঘনা,মাখনলাল পাল, শশিভূ কর্ম্মকার। সোণাপুর,জানকীনাথ বৈরাগী। হমদমপুর, ময়েনউদ্দিন মিঞা, কাজি কওছের আলী, রামচন্দ্র কর। খাগজানা, রসিকলাল ভদ্র, লক্ষ্মণচ দত্ত, প্রতাপচ ভৌমিক। রামদিয়া, রজনীকান্ত বণিক, বসন্তকু সাহা। বাগাট, রসিক বন্দ্যো গণেশ কাঞ্জিলাল। রাজবাড়ী, অক্ষয়কু সাহা, ত্রৈলোক্য মুখো। ডুমাইন, ষষ্ঠীচ সেন। বহরপুর, বসন্তকু সরকার। গাজনা, ভুবনমো ভট্টা। বাগহুলী, জানকী দাস। হাবাসপুর, অভয় বিশ্বাস, জহিরদ্দিন বিশ্বাস। প্রাইভেট, রামচ ভৌমিক, কেদারনাথ মিত্র, যজ্ঞেশ্বর সমদ্দার।

বাখরগঞ্জ-জেলার মধ্যইংরেজি ও মধ্য-বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ফল ;

প্রথম বিভাগ।—রায়েরকাটী,অম্বিকাচ নাগ। বাসণ্ডা, গোপালচ রায়। কীর্ত্তিপাশা, অনুকুলচ বন্দ্যো, রতনলাল গুপ্ত। গাভা,ভুবনেশ্বর ঘোষ। কুশঙ্গল,কুঞ্জবি ঘোষ। কেওরা,যোগেশচ রায়। দ্বিতীয় বিভাগ।—গোয়ালভাওর, উমেশচঃ ঘোষ। নলচিড়া, কুসুমকুমার মুখো। রহমতপুর, সারদাচঃ বন্দ্যো, বিপিনচঃ মিরবহর, আবদুল গফর, চন্দ্রকুমার দাস,শ্যামাচ ভট্টা, শরচ্চন্দ্র মুখো। বাঁকাই,নিবারণচঃ সান্যাল। উজিরপুর,নিবারণচ চট্টো। গৈলা, শরচ্চঃ সেন। জলাবাড়ী, গোপালচ দাস, রাইচরণ দত্ত। ইলুহার, বিধুভূষণ সরকার। বাউফল, দেবেন্দ্রনাথ সাহা। বাসণ্ডা, সীতানাথ দাস, নগেন্দ্রনাথ সেন। কীর্ত্তিপাশা, হেমচ সেন গুপ্ত, বসন্তকুমার সেন। গাভা, সতীশচঃ ঘোষ। ঝালকাটী, প্রভাতচ রায়। তৃতীয় বিভাগ।—রহতমপুর, প্রিয়নাথ মুখো, সারদাচ ঘোষ। উজিরপুর, রাজেন্দ্র দাস, গঙ্গাচ চট্টো। বাইসারি, অশ্বিনীকু রায়। কীর্ত্তিপাশা, গোপাল চঃ চক্র। অভয়নীল, অন্নদারঞ্জন দাস। নলছিটী, অনুকুলচ ঘোষ। কীর্ত্তিপাশা, হারাণচঃ গুপ্ত। মধ্যইংরেজী পরীক্ষার্থী মধ্যবাঙ্গালায় উত্তীর্ণ-প্রথম বিভাগ।—কুসঙ্গল,বিপিনবিঃ দত্ত। দ্বিতীয় বিভাগ।— বাইসারি,কালীচ সেন। ইলুহার, নগেন্দ্র সরকার। তৃতীয় বিভাগ।গোয়ালভাওর, আশুতোষ রায়। নলচিড়া, ললিতকু দাস। রহতমপুর, সতীশ চট্টো। খলিসাকোটা, গোপালচঃ গুপ্ত। ইলুহার, বিহারী চক্র। অভয়নীল, লক্ষ্মীচ সেন। মানপাশা, নিবারণচ বন্দ্যো। পুনিহাট, যোগেশচ গুপ্ত। মধ্যবাঙ্গালা পরীক্ষার ফল।-প্রথম বিভাগ।—রহমৎপুর, আবদুল রহিম খাঁ। বরিশাল, শ্রীনাথ বর্দ্ধন। গৈলা, হরপ্রসাদ রায়। জুলহার,অন্নদাচ বিশ্বাস। শ্রীরামপুর, আমেজেদালী কাজি। কুশঙ্গল, রসিকচ দত্ত। বাউকাঠী, জগদীশ্বর বসু, বিলাসচ সেন। স্বরূপকাঠী, কামিনীকু দাস। দ্বিতীয় বিভাগ।—গোওয়ালভাওর, মোহিনীমো গাঙ্গুলী। নলচিড়া, রাজনাথ দাস। রহমতপুর, হরকুমার দত্ত। সাহসপুর, অশ্বিনীকু দে। কড়াপুর, কিশোরীমো বসু। বরিশাল, কালীপদ বন্দ্যো, ললিতকু গুহ। বাটাজোড়, অক্ষয়কু কাঞ্জবল্লী, রসিকচঃ চক্র, উমেশচ দাস। শ্লোক, হরিচ চৌধুরি। রাখালতলা, পার্ব্বতীচ ঘোষ, চিন্তাহরণ চক্র। মান্দারকাঠী, মথুরানাথ দে। ইলুহার, অম্বিকাচ দত্ত, অনন্তকু সরকার। স্বরূপকাঠী, হরকু পাল, শরচ্চ বসু, গোপাচঃ গুহ, রাজেশ্বর দত্ত। সোহাগদল, মোজাফর আলী খাঁ। জুলুহার, কলিঙ্গনাথ পাল। মুরদিয়া, গোবিন্দ দাস। কীর্ত্তিপাশা, বিহারী রায়। নারায়ণপুর, মনোরঃ চক্র,নিবারণচ চক্র, পার্ব্বতীচ দাস। কুসঙ্গল, গুরুচ চক্র। নথুলাবাদ,অবিনাশচ নাগ। কেওরা,কৃষ্ণচ দত্ত। শিবপুর,নিশীকান্ত মুখো। ভাতশালা, অনাথবন্ধু বন্দ্যো। শ্যামপুর, কৈলাশ রায়,বিশ্বেশ্বর বন্দ্যো। হয়বতপুর, নিবারণচ দাস। বৈচণ্ডী, প্যারীমো হাজরা। বাউকাঠী, শশিভূষণ কাঞ্জবিল্ল। প্রাইভেট, হরনাথ দত্ত। তৃতীয় বিভাগ।—নলচিড়া, রাম চট্টো, বিপিনবি ভট্টা। রহমতপুর, রসিকচঃ দাস। বাগধা, আশুতোষ সমদ্দার। কড়াপুর, ললিতচ গুহ। চাঁদসী, অম্বিকাচ দাস। বরিশাল, নবীনেয়াজ খাঁ, বাণীকান্ত গঙ্গো, অশ্বিনীকু দে। বরিশাল, সুকুমারী দাস। গৈলা, রুহিণীকু সেন। হবিবপুর, কামিনীকু চক্র, রজনী দাস। মোড়াকাঠী, গিরিশচ চট্টো। শ্লোক, শীতলচ বিশ্বাস। বার্থী, হরিনাথ শীল, কালীকু চক্র, নিবারণচ দাস। রত্নপুর, কালীকান্ত ভট্টা। গৈলা, উমাচরণ চক্র, অক্ষয়কু কুশিয়ারী। জলাবাড়ী, শশীনাথ বিশ্বাস। ইলুহার, ভুবন সরকার, চন্দ্রকান্ত সেন। সোহাগদল, যোগেন্দ্রচ দাস, মেহেরুদ্দিন। কামারকাঠী, যদুনাথ চন্দ্র, চন্দ্রকান্ত কর। শ্রীরামপুর, হাসমতালী খাঁ, মির তাহেরালী। মুরদিয়া, কেদার মজুম। দশমিনা, মহম্মদ, এছারাইল। বাসণ্ডা, যোগেশচ দাস। নারায়ণপুর, ললিকু দাস, শরচ্চন্দ্র সেন। কেওরা, বিপিনবি সেন। শিবপুর, আশুতোষ বন্দ্যো, তরিপ মোল্লা। রামচন্দ্রপুর, শরৎকু বসু, অক্ষয়কু ঘোষ। বাউকাঠী, কাশীশ্বর দত্ত। প্রাইভেট, যদুনাথ মুখো, আবদুল হমিদ, যদুনাথ চট্টো।

অনুসন্ধান।

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

৩য় খণ্ড] ১৫ই বৈশাখ, ১২৯৭ সাল। [১৮শ সংখ্যা।

সাধক-সঙ্গীত।

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

"মা! আমায় ঘুরা'বে কত?
কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত!
ভবের গাছে যুড়ে দিয়ে, মা, পাক দিতেছ
অবিরত;
তুমি কি দোষে ক'রেছ আমায় ছ'টা কলুর
অনুগত?
'মা' শব্দ মমতাযুত কাঁদ্‌লে কোলে করে সুত;
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি, মা, আমি কি
ছাড়া জগত?
'দুর্গা-দুর্গা-দুর্গা' ব'লে ত'রে গেল পাপী কত;
আমার পারের সম্বল নাই কিছু, মা, ভাব্‌ছি
ব'সে অবিরত।
প্রসাদ বলে, ওমা তারা, দুখ দিবে আরও কত;
একবার খু'লে দে, মা, চোখেরঠুলি দেখি
অভয় পদ।"

ভক্তের কথা।

তোমা বিনা কারে প্রভু বলি আপনার!
তুমিই হৃদয়স্বামী,
তুমি বিনা মিথ্যা আমি,
পিতামাতা বন্ধু তুমি—সর্ব্বস্ব আমার।
আপন বলিতে হায়,
কেহ নাই এ ধরায়,
মায়ার বন্ধনে শুধু বদ্ধ এ সংসার!
জীবনে মরণে কভু,
কেহ নহে মোর প্রভু,
দারাসুত-পরিবার, আমি কেবা কার!
অনিত্য সংসার-লীলা,
দুদিনের খেলা-ধূলা,
মিথ্যা আমি, আত্মপর আমার আমার।
পরাণ-সর্ব্বস্ব তুমি,
তোমাতে জীবিত আমি,
জীবনের ধ্রুবতারা—সর্ব্ব মূলাধার।
তুমি প্রাণ, আমি কায়া,
ইহ-পরকালে ছায়া,
এ প্রেম-সম্বন্ধ দেব, নহেক যাবার।

বিশ্বাসঘাতকের ষড়যন্ত্র।

(১)

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে মহাবল-পরাক্রান্ত এক রাজা ছিলেন। বৃদ্ধবয়সে তাঁহার একটি পুত্র হয়। যখন পুত্রের বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসর মাত্র, তখন বৃদ্ধ রাজা ইহলোক পরিত্যাগ করেন। মৃত্যু-শয্যায় তিনি প্রধান মন্ত্রীকে আপনার নিকটে ডাকাইয়া আনিয়া, আপন

শিশু পুত্রকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া, অনেক কথা বলিয়া যান।

প্রধান মন্ত্রী কিন্তু বড়ই কূটবুদ্ধি। শূন্য-সিংহাসন তাঁহার করতলগত জানিয়াও, রাজার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই, তিনি তাহা অধিকার করিতে যত্নবান হয়েন নাই। রাজার মৃত্যু হইল; তাঁহার যথা-বিধি সৎকার করাও হইল। জানিয়া-শুনিয়াও তথাপি সূক্ষ্মদর্শী মন্ত্রীবর সিংহাসনে হস্তক্ষেপ করিলেন না। বরং তিনি রাজ্যমধ্যে প্রচার করিলেন যে,—"এতদিন পরে যদিও আমরা পিতৃহীন হইয়াছি, কিন্তু আমাদিগের সিংহাসন শূন্য হয় নাই। আমরা শিশু রাজকুমারের উদ্দেশে, 'রাজ্যে রাজা বর্ত্তমান' জ্ঞানে, মন্ত্রী-সমাজ গঠিত করিয়া যথারীতি রাজ্য পরিচালন করিব। পরে, কুমার বয়স্থ হইলেই, তাঁহাকে যৌব-রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আমরা তাঁহার আজ্ঞাধীন হইব।" এই ঘোষণায় প্রজাবর্গ অতিমাত্র প্রীত হইল; রাজকার্য্যও অতি সুশৃঙ্খলে চলিতে লাগিল।

অল্প দিনের মধ্যেই মন্ত্রীর রাজ্যশাসন-গুণে প্রজাবর্গ বশীভূত হইল; সেনাপতি, অপরাপর মন্ত্রীবর্গ, রাজের শিরোভূষণ গন্য-মান্য জনগণ—সকলেই নৃপতির মৃত্যু-জনিত শোক ভুলিয়া গিয়া, সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। অত্যাচার, অনাচার, অবিচার একেবারেই তিরোহিত হইল। সকলেরই এই ধারণা হইল যে,—"এমন সুখে কখনও কোন দেশের প্রজাবর্গ জীবন-যাপন করিতে পারে না।"

এতদিনে মন্ত্রী আপনার সময় বুঝিলেন। তিনি দেখিলেন, চারিদিক নিস্তব্ধ; প্রজাগণ সকলেই সুখী; অমাত্যবর্গ কেহই তাঁহার কৌশল বুঝিতে পারেন নাই। বরং সকলেই তাঁহাকে বড় উদারচেতা বলিয়া বিশ্বাস করেন; সেনাপতি তাঁহার কথায় অঘটন সংঘটন করিতে অগ্রসর; রাজ্যের পঞ্চম বর্ষ বয়স্ক শিশু হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত তাঁহার জয়গানে তৎপর। তখন তিনি আপনার ভাগ্য-পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইলেন।

রাজনীতিজ্ঞ সূক্ষ্মদর্শী মন্ত্রীবর চারিদিক সুবিধাজনক দেখিয়াও, শিশু রাজকুমারকে তাঁহার উচ্চ আশার পথে প্রধান অন্তরায় এবং কণ্টকস্বরূপ জ্ঞানে, তাহাকে কোনপ্রকার ষড়যন্ত্রে সে পথ হইতে সরাইয়া, নিষ্কণ্টক হইবার বাসনা করিলেন। কুচক্রীর কুচক্রের অভাব কি? মনে মনে নানা-প্রকার অভিসন্ধি স্থিরীকৃত করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

(২)

দুই স্থানে দুই দৃশ্য! আমরা আগে কোনটি বলিব তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, একটি একটি করিয়াই বলা যাউক।

ঘোর অন্ধকারময়ী রজনী। কোলের মানুষ দেখা যায় না। এমন সময়ে রাজপুর-মধ্যস্থ উদ্যানের প্রান্তভাগে রাজবাটীর ধাত্রী এবং রাজ-কুলগুরু দণ্ডায়মান।

ধাত্রী কহিল,—"গুরুদেব! একবার যদি সেখানে পৌঁছিতে পারি, তাহাহইলেই জানিলাম, এযাত্রা কুমারের জীবন রক্ষা হইল।"

গুরুদেব হাসিয়া কহিলেন,—"সেখানে পৌঁছিতে পারিবে, এমন আশা রাখ কি?"

ধাত্রী।—কেন গুরুদেব?

গুরু।—পথে কোন বিপদ ঘটিতে পারে না কি?

ধাত্রীও বুদ্ধিমতী। ইসারায় কথার ভাবার্থ বুঝিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তবে উপায়?"

গুরু।—পলায়ন।

ধাত্রী।—কোথায়?

গুরু।—সে উপায় আমি করিয়াছি। তুমি কুমারকে লইয়া আইস।

ধাত্রী।—তবে মাতুলালয়ে যাইবার কথা তুলিলেন কেন?

গুরু।—মন্ত্রীর চোখে ধূলা দিবার জন্য। রাজ্যলোভ বড় লোভ। এই লোভে পড়িয়া কোন্ দিন মন্ত্রী রাজপুরেই কুমারকে হত্যা করিত, সে কথা কেহ জানিতে পারিত কি? কুমারের মাতুল করদ রাজা; মন্ত্রী ইচ্ছা করিলে, তাঁহার রাজ্যকে রাজ্য-শুল্ক উড়াইয়া দিতে পারেন। কি সাহসে তথায় প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব? কুমারের মাতুলালয়ে যাইবার কথা উঠিয়াছে, মন্ত্রীও রাজপুরে হত্যা করিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াছে। লোকজন সমস্তই তাহার আয়ত্তাধীন। পথে পথে রাজকুমারকে ইহলোক হইতে সরাইবার আর বাধা কি? রাজ-ভাণ্ডার মন্ত্রীর হস্তে; কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় করিয়া উৎকোচ-প্রদানে সমস্ত ঘটনা মিথ্যা করিয়া সাজাইবার বাধা কি? শেষে হয় তো কুমারের মাতুলের উপর দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে শুদ্ধ সিংহাসন-চ্যুত করিতে পারে! তখন তাহার উচ্চ আশায় বাধা দেয়, এমন সাধ্য কার?

ধাত্রী।—উপায়?

গুরু।—উপায় আমি করিয়াছি। তুমি রাজপুত্রকে লইয়া পলায়ন কর।

ধাত্রী।—কোথায় যাইব?

গুরু।—আমার পরম বন্ধু, কাশ্মীরাধিপতির কুলগুরু, উদ্যানের বহির্ভাগে তাঁহার চারিজন শিষ্য-সহ উপস্থিত আছেন। তাঁহাদিগের সহিত আমি সমস্ত ঠিক করিয়াছি। তুমি উদ্যান হইতে বাহির হইলেই তাঁহারা তোমার সহায় হইবেন। তাঁহারা তোমাদিগকে লইয়া কাশ্মীর-যাত্রা করিবেন। তার পর এখানকার যাহা কিছু করিবার, তাহা আমি করিব।

ধাত্রী।—কবে পুনরায় আপনার শ্রীচরণ দর্শন পাইব?

গুরু।—শীঘ্রই।

ধাত্রী রাজকুমারকে আনিবার জন্য তথা হইতে প্রস্থান করিল। কুল-গুরুও উদ্যান হইতে বহির্গত হইলেন।

(৩)

পাঠক! একটী দৃশ্য দেখিলেন; এখন, আর একদিক দেখুন!

রাজবাটীর একটি নিভৃত কক্ষে রাজবেশধারী মন্ত্রী, এবং তৎসম্মুখে দুইজন ঘাতুক দণ্ডায়মান। তাহাদিগের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিলে বোধ হয় যমরাজ পর্য্যন্তও ত্রাসে কম্পান্বিত কলেবরে প্রস্থান করেন।

অনেকক্ষণ নানারূপ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া মন্ত্রী মস্তক উত্তোলন করিলেন। ঘাতুক দুইজন ব্যগ্রভাবে আরও নিকটস্থ হইল। মন্ত্রী তাহাদিগকে কক্ষের বাহিরে গিয়া অপেক্ষা করিতে কহিলেন। তাহারা চলিয়া গেল।

আজ পাপীর চিন্তাকুল চিত্তে শত বৃশ্চিক দংশন করিতেছে। সেই জ্বালা সহিতে না পারিয়া মন্ত্রী উঠিয়া দাঁড়াইলেন; গৃহের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত উন্মত্তের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। একবার একখানি পালঙ্কে উপবেশন করিলেন; আবার উঠিলেন —আবার বসিলেন। তথাপি কোন ক্রমেই মনস্থির হইল না। শেষে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে করিতে কহিলেন,—কেমন করিয়া আমি এ বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করিব? মহারাজ আমাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতেন। তাঁহার শিশুকে বধ করিয়া কেমন করিয়া জীবনধারণ করিব? এখনও তাঁহার জ্বলন্ত প্রতিমূর্ত্তি আমার সম্মুখে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে—এখনও তাঁহার উপদেশমালা জ্বলন্ত অক্ষরে আমার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে। আমি কি করি? রাজ্যলিপ্সা বড়ই প্রবল। কুমার জীবিত থাকিতে আমার পথ নিষ্কণ্টক হইবে না। আমার মিষ্টকথায় অপ-

রাপর মন্ত্রী হইতে আপামর সাধারণ প্রজাবৃন্দ আমার প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছে। আমার সুবিচারে তাহারা মোহিত হইয়াছে। কিন্তু কুমারকে হত্যা করিলে, রাজ্যমধ্যে নানাস্থল হইতে যে বিদ্রোহানল জলিয়া উঠিবে না, তাহা কে বলিল? সাহসী যোদ্ধৃগণই আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে! তখন একটি পথ নিষ্কণ্টক করিতে গিয়া, আমিও শতসহস্র বিপদজালে জড়িত হইয়া পড়িব। এতদিন আমি এই সকল ভাবিয়া কিছু করিতে পারি নাই। কিন্তু রাজকুল-গুরু এখন সে সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। কুমার মাতুলালয়ে যাত্রা করিবে; পথে পথে তাহাকে ইহলোক হইতে অপসারিত করিতে হইবে। অবশেষে তাহার মাতুলের উপর দোষারোপ করিয়া এই সুযোগে তাহারও রাজ্য কাড়িয়া লইব।"

এইরূপে মন্ত্রী অনেকক্ষণ অনেকপ্রকার চিন্তা করিয়া উন্মত্তের ন্যায় আবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সম্মুখে কুক্রিয়াভিলাষী বিশ্বাস-ঘাতকের পরম ঔষধ মদিরা ছিল। তাহা পানপাত্রে ঢালিয়া ধীরে ধীরে উদরস্থ করিলেন। তখন চিন্তাস্রোত কথঞ্চিৎ উপ-শমিত হইয়া আসিল। এতক্ষণে মন্ত্রী দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন। হলাহল মস্তকে উঠিয়াছে; আর মায়া নাই, মমতা নাই, ভয় নাই, মান নাই, অপমান-বোধ নাই। মন্ত্রী ডাক-লেন—"হুসেন আলি!"

"খোদাবন্দ—জাঁহাপনা" বলিয়া এক ভীষণ মূর্ত্তি গৃহপ্রবিষ্ট হইয়া যথারীতি অভিবাদন করিল। তাহার সেই ভীষণ মূর্ত্তি, সেই গোল গোল রক্তবর্ণ চক্ষু, আর সমস্ত শরীরের দড়ীর মত শিরাবলী দেখিলে যথার্থই ভয়ের সঞ্চার হয়। মন্ত্রী পালঙ্কে উপবেশন করিয়াছিলেন, উঠিয়া দাঁড়া-ইলেন। গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হুসেন আলি! তুমি এ জীবনের মধ্যে কয়টা হত্যা করিয়াছ?"

হুসেন নির্ভয়-চিত্তে উত্তর দিল,—"তার কি সংখ্যা আছে? পয়সার জন্য কি না করিয়াছি!"

মন্ত্রী।—তুমি কাহার সম্মুখে কথা কহিতেছ, তাহা জান? আমি তোমার উপযুক্ত দণ্ডবিধান করিতে পারি, তাহা একবার ভাবিয়াছ কি?

হুসেন।—কিন্তু মহারাজ! আমি যখন 'খুনী' বলিয়া এই রাজ্যে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলাম, তখন ভূতপূর্ব্ব মহারাজ আমার বন্দী করেন। দুই চারি দিন পরে আমার বিচার হইল। তিনি ঠিক আপনার মতই আমায় এই কয়টি কথা প্রথমে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তার পর কহিলেন,—"হুসেন, এ পৃথিবীতে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। তাই আমি তোমার প্রাণদণ্ড-বিধান করিলাম না। তুমি অসংখ্য প্রাণী হত্যা করিয়াছ; কিন্তু ভগবান তোমায় অসংখ্য জীবন প্রদান করেন নাই। সুতরাং অসংখ্য জীবহত্যা-পাপের প্রায়শ্চিত্ত তোমার একটা জীবন-বধে পূর্ণ হইবে না বলিয়া, আমি তোমার বধ করিতে বিরত হইলাম। তুমি আজ হইতে জহ্লাদস্বরূপে রাজসরকারে চাকরী গ্রহণ কর—আর হত্যা করিও না।"

মন্ত্রীর মস্তক বিঘূর্ণিত, চক্ষুর্দ্বয় আরক্ত, হৃদয়-মধ্যে ভীষণ চিন্তার উত্তেজনায় সর্ব্বশরীর কণ্টকিত; মুখ দিয়া কথা বাহির হইয়াও হই-তেছে না। মন্ত্রী বলিলেন,—"আজ তোমায় আমার কি আবশ্যক, জান?"

হুসেন।—কেমন করিয়া জানিব, মহারাজ? আপনি যাহা হুকুম করিবেন, আমি তাহাই পালন করিব।

মন্ত্রী।—আমি যা বল্‌বো, তাই করতে পারবে?

হুসেন।—মহারাজ! আমাদের অসাধ্য

কি আছে? কিন্তু আপনার এ প্রকার কথায় আমার মনে কেন আতঙ্কের উদয় হচ্চে!

মন্ত্রী।—তোমারও ভয় হচ্চে?

হুসেন।—মহারাজ, ভয় কাকে বলে, তা আমি জানি না। কিন্তু তবুও আজ আপনার মনে কি আছে, কে জানে? আপনার এক একটি কথায় আমার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠ্‌চে। মহারাজ, ভূতপূর্ব্ব মহারাজের চেহারাখানা যেন আমার সম্মুখে—এই অন্ধকার রাত্রে—যেন ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বল্‌চে—"

অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মন্ত্রী কহিলেন,—"তুমি আমার সম্মুখ হইতে দূর হও—কালই তোমার চাকরী জবাব দিব।"

চাকরীর জন্য হুসেন বড় গ্রাহ্য করিত না। কিন্তু আজ যে মন্ত্রীর কঠোর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইল, ইহাই পরম লাভ ভাবিয়া সে চলিয়া গেল। কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াই, আবদুলের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে সে তাহাকে কহিল,—"দেখ্ আব্‌দুল্! আজ আমার প্রাণটা কেমন ছট্‌ফট্ করচে। যেন দুই একদিনের মধ্যে একটা কি ভয়ানক ঘটনা ঘট্‌বে। তুই এইখানে দাঁড়িয়ে থাক্—হয় তো তোকে রাজা এখনি ডাক্‌বে।"

মাদক-সেবন।

মদ, গাঁজা, চরস, চণ্ডু, ভাঙ্গ, আফিম, বিড়ি, তামাক প্রভৃতি পদার্থ, যাহাতে বুদ্ধির বিপর্য্যয় ও শরীরের বিকলতা সাধিত হয়—তৎসমুদায়ই, মাদক নামে বাচ্য। কতদিন হইতে এই বুদ্ধিভ্রংশকর বিষ মানব-শরীরে প্রবেশ-লাভ করিতেছে, তাহা নির্ণয় করা যায় না। তবে মানব-জাতির আদি-পুস্তক বেদ পাঠ করিয়া আমরা এইমাত্র অবগত হইতে পারি যে,—যখন আর্য্যজাতি ভারতবর্ষে আগমন করেন নাই, যখন তাঁহারা যক্ষু নদীর তীরে দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত থাকিয়া উপাসনা ও আরাধনায় কালাতিপাত করিতেন, সেই সময়েই তাঁহাদিগের মধ্যে মাদক-সেবন প্রচ-লিত হইয়াছিল। কেন না, আমরা দেখিতে পাই, তাঁহাদের এক সম্প্রদায় মাদক-দ্রব্য যদিও স্পর্শ করিতেন না বটে, কিন্তু অপর সম্প্রদায় মাংস ও সোমলতার রসেই দেবতার আরাধনা করিতেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে,—আমরা যে সময় হইতে মানব-জাতির ইতিহাস সংগ্রহ করিতে পারি, তাহার পূর্ব্ব হইতেই মানবগণ সোম-নির্য্যাস পান করিতে আরম্ভ করিয়া-ছিলেন। এক্ষণে কথা হইতেছে, এই বিষ কে মানুষকে পান করিতে শিখাইয়া দিল? ইহা কি মানুষের স্বাভাবিক সংস্কার! অথবা যে দুষ্ট শক্তি মানবাদি জীব-সমূহকে দুর্গতি ও ধ্বংশের পথে নিয়োজিত করিতেছে, এ কি তাহারই কার্য্য?

আমরা সংসারে কোন দুষ্টা শক্তির বিদ্য-মানতা স্বীকার করি না। এবং মদ্যপানের ইচ্ছা যে মানুষের স্বাভাবিক, তাহাও আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। আমরা দেখিতে পাই, এক্ষণে যে সকল উপাদেয় ও রসনা-তোষক পদার্থ মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতেছে, পূর্ব্বে মানুষ স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, এইরূপ রুচিকর পুষ্টিকর পদার্থ-সকল কখনও তাহারা খাদ্যরূপে প্রাপ্ত হইতে পারিবে। আমরা মানুষের আদিম-সমাজে প্রবেশ করিয়া দেখি, মৃগয়ালব্ধ আম মাংস তখন তাহাদিগের একমাত্র খাদ্য ছিল। ক্রমে তাহারা মাংস পোড়াইয়া খাইতে শিখি-য়াছে; ক্রমে তাহারা মাংস রন্ধন করিতে শিখিয়াছে। ক্রমে দুগ্ধের ব্যবহার শিখি-য়াছে; ক্রমে কৃষিকার্য্য শিখিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মানুষ কোন মহাশক্তির নিকট খাদ্যাখাদ্যের কোন উপদেশ লাভ করে নাই। ক্রমে বহুদর্শিতা ও আবিষ্ক্রিয়ায়

যেমন তাহাদের জ্ঞান উন্নত করিয়া তুলিয়াছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে অভিনব, পুষ্টিকর বা রুচিকর পদার্থ-সকলও মানুষের খাদ্য-মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

এই সিদ্ধান্ত হইতেই আমরা দেখিতে পাই, মদ্য মানুষের আদিম বা স্বাভাবিক খাদ্য নয়। যাহা স্বাভাবিক খাদ্য, তাহার অভাবে মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। মানুষের সাধ্য নাই, বায়ুসেবন মুহূর্ত্ত কালের জন্য পরিত্যাগ করে, বা জলপান পরিত্যাগ করিয়া অনেক দিন বাঁচিতে পারে! কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, যক্ষ বা জাক্‌জারটিস্ নদীতীর-বাসী আর্য্যদিগের এক সম্প্রদায় মাদক দ্রব্য স্পর্শও করিতেন না। সুতরাং মাদক যদি ঈশ্বরাদিষ্ট স্বাভাবিক খাদ্য হইত, তবে তাঁহারা কখনই উক্ত প্রকারে উহা ব্যবহার না করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারিতেন না; এবং এই ঊনবিংশ শতাব্দীর যে সকল লোক পৃথিবী হইতে মাদক পদার্থ সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাসিত করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন, তাঁহারাও কোন্ দিন পৃথিবীতে অচিরু হইয়া যাইতেন। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মাদক দ্রব্য আমাদিগের স্বাভাবিক খাদ্য নয়।

তবে ইহা কিরূপে বা কি জন্য মানব-সমাজে প্রচলিত হইল? ইহার উত্তরে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, বর্ত্তমান সময়ের অন্যান্য খাদ্য মানুষ যেরূপে ও যে জন্য ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে, মাদক পদার্থও সেইরূপে মানব সমাজে প্রচলিত হইয়াছে। যখন কেবলমাত্র কাঁচা মাংস মানুষের খাদ্য ছিল, তখনই মানুষ বুঝিতে পারিয়াছিল, কেবল মাংসই মানুষের জন্য প্রচুর খাদ্য নয়। সৃষ্টির মধ্যে অবশ্য এমন অসংখ্য পদার্থ রহিয়াছে, যাহা হইতে মানুষ আরও খাদ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হইবে। আর এই বিশ্বাসেই, তাহারা নানাবিধ পরীক্ষা আরম্ভ করিল। তাহারা দেখিল, গাভীর স্তনে প্রচুর দুগ্ধ রহিয়াছে। তখন মনে করিল, বোধ হয় ইহা মাতৃস্তন্যের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে। একদিন ব্যবহার করিয়া দেখিল, এবং তাহার স্বাদ ও মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া গেল। সেই দিন দুগ্ধ মানুষের আহার্য্য হইল। তাহারা দেখিল, ছাগ, গো, মেষ প্রভৃতি পশু নানা-প্রকার লতা-পাতা ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করে। তাহারা মনে করিল, এই সকলের মধ্যেও হয়তো মানুষের খাদ্য থাকিতে পারে। এই মনে করিয়া, তাহারাও একে একে নানা-প্রকার ফল-মূল ও লতা-পাতা চাকিয়া দেখিতে লাগিল। অনেক সুমধুর ফল অনেক সুস্বাদ মূল, অনেক রুচিকর পাতা ক্রমে মানুষের খাদ্য মধ্যে পরিগণিত হইল; এবং অনেক জিনিস বিষাক্ত বলিয়াও পরিত্যক্ত হইল। হয় তো এইরূপেই মানুষ সোমলতার স্বাদ গ্রহণ করিয়া দেখিয়াছিল,—উহা সুস্বাদ, রুচিকর এবং শরীরস্থ করিলে ইন্দ্রিয়-সকল শিথিল করিয়া মনে একপ্রকার অভূতপূর্ব্ব আনন্দ আনয়ন করে। সুতরাং তাহারা সোমলতা উপাদেয় বলিয়া ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহারা তখনও জানিতে পারিল না, সুধার সহিত বিষ মিশ্রিত রহিয়াছে; উহা মানুষের শরীর জর্জ্জরিত ও ভগ্ন করিয়া তুলিবে; এবং উহার ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে প্রচলিত হইলে নানা-প্রকার অশান্তি ও দুর্গতি মানবসমাজে প্রবিষ্ট হইয়া এই সুখময় সংসার রোগ ও শোকের আধার করিয়া ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিবে।

এইরূপে মাদক-দ্রব্য মানুষের নিকট আদর লাভ করিল। ক্রমে গাঁজা, ভাঙ্গ, চরস, চড়ু, তাড়ি, তামাক, সোমলতার স্থান গ্রহণ করিল। মানুষ সুধা বলিয়া এই সকল জলন্ত বিষ স্বহস্তে তুলিয়া পান করিতে লাগিল।

কিন্তু দশ দিন চোরের এক দিন সাধুর। সংসারে দূষিত পদার্থ বা কলুষিত ইচ্ছা চিরকাল কখনও প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকিতে পারে না। যাহা অসাধু, তাহা সাধুতার নিকট পরাজিত হইয়া যায়; যাহা অপবিত্র, তাহা পবিত্রতার হিল্লোলে ডুবিয়া যায়; এবং যাহা অক্ষম ও দুর্ব্বল, তাহা শক্তির চরণে প্রণত ও অবনত হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান শতাব্দীরও ইহাই মূল-মন্ত্র। ইংরাজীতে ইহাকে Survival of the fittest বলে। ক্রমে মানুষ দেখিল, মাদক দ্রব্য মানবসমাজে নানা প্রকার দুর্গতি আনয়ন করিতেছে। তখন মানুষের চক্ষু ফুটিল। মানুষ মাদক পদার্থের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল।

হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে শুক্রাচার্য্য সর্ব্বপ্রথম মাদকের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। কথিত আছে, বৃহস্পতি-পুত্র কচ বিদ্যাভ্যাসের জন্য শুক্রাচার্য্যের নিকট গমন করেন। একদিন অসুরেরা দেখিল, তাহাদের চিরশত্রু দেবতা-দিগের শিক্ষাগুরু বৃহস্পতির পুত্র তাহাদিগের গুরুর নিকট হইতে নানা অজ্ঞাত-বিদ্যা শিখিয়া যাইতেছে। তাহাদিগের তাহা সহ্য হইল না। তাহারা কচকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ব্যাঘ্র-ভল্লুকের উদরসেবা করাইল। কচের কোন চিহ্ন বিদ্যমান রহিল না। এদিকে সন্ধ্যার সময়েও কচ আশ্রমে প্রত্যাগত হইল না। শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানী পিতার নিকট কাঁদিয়া বলিল,—"কচকে শীঘ্র আনিয়া দাও। নতুবা এই অন্নজল পরিত্যাগ করিলাম।" শুক্রাচার্য্য অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু কচের কোন সন্ধানই পাইলেন না। অবশেষে সঞ্জীবনী মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, কচকে তিনবার আহ্বান করিলেন। কচ ব্যাঘ্রাদির উদর পরিত্যাগ করিয়া শুক্রাচার্য্যের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল,—দৈত্যগণ তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ব্যাঘ্রাদির উদর-পূর্ত্তি করাইয়াছিল; এক্ষণে শুক্রাচার্য্যের মন্ত্র-প্রসাদে জীবনলাভ করিয়াছে। শুক্রাচার্য্য অসুরগণকে সাবধান করিয়া দিলেন। কচ নির্ভয়ে বিচরণ করিতে লাগিল। কিন্তু অসুর-গণ সহজে ছাড়িবার পাত্র নহে। তাহারা তখন মনে মনে কচের বিনাশের উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। অবশেষে স্থির করিল, কচের বিনাশের অন্য উপায় নাই; কচকে শুক্রা-চার্য্যের উদরস্থ করিতে হইবে। মন্ত্রণা স্থির করিয়া, তাহারা কচকে রেণু রেণু করিয়া কাটিয়া ফেলিল; এবং ঘৃতে ভাজিয়া মদের সহিত মিশ্রিত করিয়া শুক্রাচার্য্যকে খাওয়াইয়া দিল। আবার সমস্ত দিন কাটিয়া গেল। আবার দেবযানী কচের সন্ধান না পাইয়া পিতার চরণে কাঁদিয়া পড়িল। এবার শুক্রাচার্য্য দেখিলেন, মহা বিপদ। কচ তাঁহার নিজের উদরের মধ্যে। কচকে বাঁচাইতে গেলে নিজের প্রাণ বাহির হইয়া যায়; এবং বাঁচা-ইতে না পারিলেও ব্রাহ্মণ-হত্যা হয়। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া উদরস্থ কচকে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখাইলেন, এবং কচকে ডাকিয়া বলিলেন,—"তুমি আমার উদর চিরিয়া বাহিরে আইস, এবং এই সঞ্জীবনী মন্ত্রবলে আমাকে বাঁচাইয়া দাও।" কচ বাহিরে আসিল, এবং গুরু ও শিষ্য উভয়েই জীবন-লাভ করিলেন।

এক্ষণে শুক্রাচার্য্য দেখিলেন, মদের কি মহিয়সী মাদকতা! তিনি ঐ মত্ততায় এতদূর বিহ্বল হইয়া গিয়াছিলেন যে, মানুষের মাংস আহার করিয়াছেন, অথচ তাহা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। সুতরাং মাদক পদার্থের বিরুদ্ধে শুক্রাচার্য্যের ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন,—"আজ হইতে মাদক পদার্থ যে স্পর্শ করিবে, তাহার সপ্তপুরুষ নরকস্থ হইবে; এবং তাহার দুর্গতির পরিসীমা থাকিবে না।"

এই গল্প সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, কিন্তু ইহাতে জলন্ত ভাষায় প্রমাণিত হইতেছে যে,—যে সময়ে এই সমস্ত পুরাণ রচিত হইয়াছিল, তখনও অন্ততঃ মনুষ্যের মনে মাদক পদার্থের অপকারিতা সম্যক বদ্ধমূল হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের মত পূর্ব্বে যে কখনও মাদক পদার্থের বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল বা শুক্রাচার্য্যের অভিসম্পাৎ বা উপদেশ যে কেহ কার্য্যে পরিণত করিয়াছিল, এরূপ বোধ হয় না। কেন না, আমরা দেখিতে পাই, মুনিগণ যজ্ঞাদি প্রায় ক্রিয়াতেই সোমরস ব্যবহার করিতেন। আমরা দেখিতে পাই, লঙ্কাবিজয়ের পর বানর-সৈন্যদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য রামচন্দ্র বহুল পরিমাণে মদ বিতরণ করিয়াছিলেন। কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গের জন্য কত পুস্করিণী মদ শুষ্ক করা হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। আমরা দেখিতে পাই, যাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করা হয়, সেই বলরাম একজন ঘোর মদ্যপায়ী ছিলেন। ভক্ত এই বলিয়া তাঁহার সম্মান রক্ষা করিতেছেন যে,—"বারুণী মদ বিঘূর্ণিত লোচনস্য যুক্তংহি লাঙ্গল-ভৃতঃ পতনং ধবলীতঙ্গে।" কিন্তু যখন মদের অপকারিতা লোকে বুঝিয়া মদ্য ছাড়িল না, লোভ যখন বিবেকের উপর আধিপত্য করিতেও ক্ষান্ত হইল না, তখন ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রের অব্যর্থ অস্ত্র লইয়া অগ্রসর হইলেন। মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ ধর্ম্মশাস্ত্রে মদ্যপায়ীর নরকগমন বিধান করিলেন। জ্ঞানের নিকট অজ্ঞতা পরাজয়-স্বীকার করিল; হিন্দু-সমাজে মদ্যপান রহিত হইয়া গেল।

কিন্তু সকলেরই গৃহশত্রু আছে। মদের মায়া মানুষে সহজে ভুলিতে চায় না, ভুলিতে পারে না। মদ্যপ ব্রাহ্মণগণ দেখিলেন,—'ভারি ফ্যাসাদ।' তাঁহাদিগের পরম পদার্থ, শোকের সান্ত্বনা, অনুশোচনার বিস্মৃতি, সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা হইতে একটু আরাম পাইবার একমাত্র ঔষধ, শাস্ত্রের এক ফুৎকারে উড়িয়া যায়; তাঁহাদিগের প্রাণে তাহা সহ্য হইল না। তাঁহারা অমনই পাল্টা গাহিলেন। নারকীয় অন্ধকার ভেদ করিয়া তন্ত্রশাস্ত্র মস্তকোত্তলন করিয়া কহিতে লাগিল,—"কে বলে সুরা অপেয়, অস্পৃশ্য, অসেব্য! মিথ্যা কথা! শুনিও না। মদ খাও। মাদক সেবন কর। ব্যভিচার করিয়া ধর্ম্মসাধন কর।" কিন্তু ঈশ্বরের রাজত্বে অধর্ম্ম কোন দিন মস্তকোত্তলন করিয়া থাকিতে পারে না। অধিক লোক তন্ত্রের আহ্বানে ভুলিল না। যাহারা ভুলিল, তাহারাও তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিল না। কালের হিল্লোলে আবর্জ্জনা-রাশির ন্যায় সকলই ভাসিয়া গেল। সেই কাপলিকগণ—যাহাদিগের নাম করিতে শরীরের প্রত্যেক লোম শিহরিয়া উঠে, যাহাদিগের ধর্ম্মসাধনের জন্য কত যুবক তরুণ বয়সে শবস্থানীয় হইয়াছে, যাহাদিগের ইন্দ্রিয়-সাধন ও শক্তি-সাধনের জন্য বাঙ্গালার কত অনূঢ়া কুমারী কলঙ্কিত ও লাঞ্ছিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ইহলোকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছে—আজ ধর্ম্মের জলন্ত নিশ্বাসে তাহারা দগ্ধ হইয়া কোথায় ছারেখারে গিয়াছে, কে তাহার নিদর্শন বাহির করিতে পারে! তান্ত্রিক ধর্ম্ম এক্ষণে একরূপ লোপ পাইয়াছে। এক্ষণে কতকগুলি গাঁজাখোর সন্ন্যাসী তাহাদিগের বিকৃত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছে।

(ক্রমশঃ)

ভগ্নহৃদয়ের আক্ষেপ।

নিথর গগনে, শশধর আর,
সুমধুর হাসে হেস না হে,
রজত-সলিলে, শ্বেত-শতদল,
ভেস না—ভেস না—ভেস না হে!
আঁধার ধরায়, বিমল কৌমুদী,
অমৃত-লহরী, ঢেল না হে,
তারকার হারে, হীরক-প্রদীপ,
রজত-লহরে জ্বেল না হে!
বিমল সলিলে, সোনার কমল,
সে বিমল ভাতি লও না হে,
শীতল মলয়, নাচায়ে কানন,
কাঁপায়ে লহরী, যেও না হে!
শেফালি-চামেলী, মল্লিকা-মালতী,
বিকচ বদনে হেস না হে,
মলয়ের ভরে, ঠমক মারিয়া,
মাধুরী-সাগরে ভেস না হে!
মধুকর-কূল, প্রসূনের পাশে,
প্রাণাকুল স্বরে, গেয়ো না হে,
কুলকুল-রবে, অয়ি কল্লোলিনি,
লহরী নাচায়ে, যেও না হে!
মধুসখা পিক, রসাল কাননে,
সুমধুর গীত গেয়ো না হে,
নদী-গিরি আর, তরু-তৃণ-লতা,
ললিত-স্বভাব ধ'রো না হে!
সাধে কি এ' বলি! সে সুখ আমার,
অনন্তের স্রোতে ভেসেছে হে,
তাই, শশাঙ্কে অনল, কমলে গরল,
আলোকে আঁধার, ঘটেছে হে!
হায়, কি করিব, জীবন আমার,
মরু-পরিণত হয়েছে হে,
কালকীট হায়, হৃদয়-কুসুমে
করাল ব্যাদানে পশেছে হে!
কাঁদিছে পরাণ, হৃদয় নিয়ত
নয়ন-আসারে ভাসিছে হে!,
কে যেন কি ক'রে, মরমে মারিয়া,
হৃদয়ে অনল জ্বালিছে হে!
সাধে কি এ বলি! বঁধু যে আমার,
দূর—দূরালয়ে রয়েছে হে,
বিচ্ছেদ-আগুণে শৈশব-হৃদয়,
মরমে মরমে মরিছে হে!

শ্রীব্রজ—

চতুর চোর।

সোনাগাছির মধ্যে গোলাপীর প্রসিদ্ধি সমধিক। গোলাপীর রূপের ত কথাই নাই—জগতে অতুলনীয়া; গুণেও ভাল—এ কথা গোলাপীর কতিপয় খরিদদারের মুখেই শুনিয়া থাকি। যদি বলেন,—বেশ্যার আবার গুণ কি, রূপে ভাল হইতে পারে! আমরা তাহার উত্তরে বলি,—গোলাপী খরিদদারগণের প্রতি বিশেষ দয়াবতী ও কল্পলতা-স্বরূপা। যত ব্রাণ্ডি চাও, তত দিবেন; তাহাতে তিনি কাতর নহেন! ছোলা-ভাজা, লঙ্কাপোড়া, কি বিলাতী চাট্‌নী চাও, অক্ষুণ্ণ-চিত্তে দিবেন। আর জগদ্ধাত্রী-পূজা, লক্ষ্মী-পূজা, কার্ত্তিক-পূজা প্রভৃতি হিন্দুজাতির ধর্ম্মানুষ্ঠিক কর্ম্মও গোলাপী সকলই করিয়া থাকেন। গোলাপীর কার্ত্তিক-পূজা কলিকাতায় বিখ্যাত! নিমন্ত্রণের আয়োজনও খুব। বলা বাহুল্য, কতিপয় রসিক-নাগর গোলাপীর প্রেমে, প্রণয়ে, রসে, বসে, বিমুগ্ধ! আর তাহাদের গভীর বিশ্বাস যে, গোলাপী বেশ্যা বটে; কিন্তু গোলাপী ধর্ম্মশীলা ও পুণ্যবতী! যাহা-হউক, সে কথায় কাজ নাই। এখন, যাহা বলিতেছি, পাঠক মহাশয়গণ তাহাই শুনুন :—

বৈশাখ মাস, সন্ধ্যার প্রাক্কাল। সারাদিন ভয়ানক গ্রীষ্ম গিয়াছে। কলিকাতার পথ-ঘাট ধূলিময়, মধ্যে-মধ্যে ঝুমুকা বাতাস আসিয়া ধূলা উড়াইয়া সৌখিন বাবুদের সর্ব্বনাশ করিতেছে। আকাশে মেঘের সাজ নাই—আকাশ অতি নির্ম্মল। কিছুক্ষণ পরে দিনমনি অস্তাচলে গমন করিলেন। এমন সময়, একখানি দ্বিতীয়-শ্রেণীর শকট গোলাপীর সদর দরজায় আসিয়া পৌঁছিল। শকটের মধ্যে একজন উন্নত-বেশধারী বিশিষ্ট ভদ্রলোক। সঙ্গে কেহই নাই, জিনিসের মধ্যে একটী পোর্ট-ম্যাণ্ট আছে। গোলাপীর সদর দরজায় একজন

দ্বারবান নিযুক্ত আছে। ভদ্রলোকটী তাহাকে বলিলেন,—"এই কি গোলাপীর বাড়ী?"

দ্বারবান সঠিক উত্তর দিল। ভদ্রলোকটী বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা জানাইলেন। দ্বারবান পয়না-লোভী; যাহাতে মাহিনা-ছাড়াও উপরি দু'দশ টাকা পায়, তাহার দিকে তাহার বেশ লক্ষ্য! আর গোলাপীর প্রেম-প্রয়াসীরাও তাহাকে ভদ্র-দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। যাইহোক, এক্ষেত্রে দ্বারবানকে কিন্তু কিছুই বলিতে হইল না; ভদ্রলোকটী নিজেই গাড়োয়ানকে একটী টাকা ও দ্বারবানকে দুটী টাকা পুরস্কার দিয়া দোতালায় উঠিলেন। বাবুর এইরূপ ব্যয় গোলাপীও বারাণ্ডা হইতে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

গোলাপীর ঘরে চিম্‌নির আলোক জ্বলিতেছে। ঘরখানি অতি সুন্দর দেখাইতেছে। ভদ্রলোকটী অকুতোভয়ে ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"আপনিই কি গোলাপ!"

গোলাপীর উত্তর শুনিয়া ভদ্রলোকটী যেন অতি পরিচিতের ন্যায় তাঁহার 'সেকহ্যাণ্ড' করিয়া মহোল্লাসে বলিলেন,—"গুড মর্ণিং—গুড মর্ণিং!" গোলাপীর মুখে স্বভাব-সুলভ হাসি দেখা দিল। কিন্তু তাঁহাকে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হইল। ভদ্রলোকটী তখন বলিলেন,—"আমি আপনার দিদিকে মাসিক ৫০০৲ টাকা করিয়া দিয়া থাকি। কমলা আমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন। কোন কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়াছিলাম; আপনার সঙ্গে দেখা করিতে তিনি বলিয়া দিয়াছিলেন। আপনার দেখা পাইয়া বড়ই প্রীত হইলাম। আপনার দিদির একখানি পত্র আছে।"

তখন গোলাপী সসম্ভ্রমে, সাদর সম্ভাষণে, তাঁহাকে পালঙ্কে বসাইলেন। দিদির কুশল-বার্ত্তা জ্ঞাত হইয়া তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন।

ভদ্রলোকটী বলেন,—"আমি ফরিদপুরের বিখ্যাত জমীদার—আমার নাম রায় বিজয়-ভূষণ চৌধুরী।" বিজয় বাবু তখন পোর্টম্যাণ্ট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া গোলাপীকে দিলেন; আর ১০০৲ টাকাও দিলেন। গোলাপী প্রফুল্লচিত্তে দিদির প্রেরিত পত্রখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন,——

"প্রিয় ভগিনী গোলাপ,—আমার সস্নেহ চুম্বন লইবে। তোমার সুখ-সংবাদ না পাইয়া যারপরনাই দুঃখিত আছি। তোমার পসার কেমন চলিতেছে, তাহা শীঘ্রই জানাইবে। এই জমীদার (ইনি ফরিদপুরের একজন বিখ্যাত জমীদার, নাম রায় বিজয়ভূষণ চৌধুরী) মাসিক ৫০০৲ টাকা দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞ রাখিয়াছেন। ইহাঁর ভালবাসার গুণে আমি মুগ্ধ আছি। আমার অধিক লিখিবার সময় নাই যে, মনের কথা সমস্ত জ্ঞাপন করিয়া সুখানুভব করি। ইহাঁর হস্তে নিম্নলিখিত জিনিসগুলি পাঠাইয়া দিয়া তোমার হতভাগিনী দিদিকে বাধিত করিবে। শাল জোড়াটী যেন ভাল হয়। এসকল কথা জমীদার বাবুকে জানাইবে না। শাল-জোড়াটী তাঁহাকেই উপহার দিব। তিনি জানিলে কোন মতেই কিনিতে দিবেন না। ১০০৲টী টাকা দিলাম। আমার হাতে আজ আর কিছুই নাই; সপ্তাহ-মধ্যে আর সমস্ত টাকা মনিঅর্ডারে পাঠাইব। বেশী কি লিখিব, নিম্নের জিনিসগুলি পাঠাইতে ভুলিবে না। বিজয় বাবুর মত ভদ্র ও বিশ্বাসী লোক আমার চক্ষে পড়ে নাই।

এক গাছি সোণার হার	১৫০৲
এক জোড়া কাশ্মীরী শাল	৩০০৲
এক খানি বারানসী শাড়ী	১০০৲

আমি কলিকাতার জিনিস অতি উৎকৃষ্ট বিবেচনা করি। যাহা হউক, আমি ভাল আছি, তোমার মঙ্গল সংবাদ দিবে।

তোমার দিদি
কমলা!"

পত্রখানি পড়িতে পড়িতে গোলাপী আহ্লাদে ভোরপুর হইতে লাগিলেন। ঝিকে বিজয় বাবুর বিশেষরূপ আহারের আয়োজন করিতে বলিলেন। দ্বারবানকে সদর দ্বার বন্ধ করিতে আদেশ করিলেন; কারণ, অদ্য এই জমীদার বাবুর সঙ্গেই আমোদ-প্রমোদ করিয়া রাত্রিযাপন করিবেন।

যাহা-হউক, পরদিন বেলা দশটার মধ্যে গোলাপী পত্রোল্লিখিত জিনিসগুলি কিনিলেন। বিজয় বাবুকে দু'এক দিন থাকিতে বড়ই অনুরোধ করিলেন; কিন্তু তিনি হাত-যোড় করিয়া সে বিষয়ে গোলাপীর কাছে মাপ চাহিলেন। বিজয় বাবু গোলাপীর একখানি পত্র ও জিনিসগুলি যত্নের সহিত পোর্টম্যাণ্টে লইয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। গোলাপীও একগাড়ীতে বাবুর সঙ্গে ষ্টেশন-পর্য্যন্ত আসিলেন। পরে বাবু ষ্টেশনে নামিয়াই গোলাপীর একটী প্রেম-চুম্বন লইয়াই রেলগাড়িতে উঠিলেন।

রেলগাড়িতে বাবুই উঠিলেন, গোলাপীও এই পর্য্যন্তই দেখিলেন। কিন্তু তারপর বাবুটি যে কোথায় গেলেন, তাহা আর কে বলিতে পারে? আমরাও তো তাঁহাকে আর তদবধি খুঁজিয়া পাইলাম না। কোথায় গিয়া কি ভাবে তিনি নামিলেন, তাহার আর অদ্যাবধি কিছুই সন্ধান নাই।

যাইহোক, কমলার নিকট হইতে বাকী টাকাগুলি আসিতে কাল-বিলম্ব দেখিয়া, গোলাপী ক্রমে তাঁহাকে দুই-তিনখানি পত্রও লিখিয়াছিলেন। কিন্তু সে সকল পত্রের যাহা উত্তর আসিয়াছিল, তাহা কি আর লিখিতে হইবে? কমলার উপপতি, প্রকৃতই যাঁহার নাম বিজয় বাবু—তিনি, সে সময় কলিকাতায় আসেনই নাই—কমলার নিকট হইতে গোলাপী এইরূপ উত্তর পাইয়াছিলেন।

তারাচাঁদ।

(নয়টি পরিচ্ছেদে ক্ষুদ্র উপন্যাস।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কলিকাতার কোন এক ভদ্র-পল্লীতে রামদয়াল ঘোষ বাস করিতেন। রামদয়ালের পিতার অবস্থা বড় ভাল ছিল না; তাহাতে আবার অল্প-বয়সে পিতৃমাতৃহীন হইয়া রামদয়াল পরের গলগ্রহ হন। এজন্য লেখা-পড়ায়ও তিনি বিজ্ঞ হইতে পারেন নাই। যে ব্যক্তির অনুগ্রহে রামদয়ালের বাল্য-জীবন অতিবাহিত হয়, তিনি রামদয়ালকে বড় ভাল বাসিতেন। বহু দিন একত্র-বাস করিতে হইলেই পরস্পর সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া থাকে; এই হিসাবে রামদয়াল আশ্রয়দাতাকে 'মামা' বলিয়া সম্ভাষণ করিতেন। মামার সংসারে কিছুরই অভাব নাই, মা লক্ষ্মী জাজ্বল্যমান. বার মাসের তের পার্ব্বণ দোল-দুর্গোৎসব ইত্যাদি সকল উৎসবই তথায় মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। রামদয়াল মামার সংসারে থাকিয়া ভাত-কাপড়ের জন্য একদিনও দুঃখ পান নাই। কিন্তু পাঠে তিনি তাদৃশ মনোযোগী ছিলেন না; আপনার কেহ অভিভাবক না থাকা, মামার ছেলেদের মনস্তুষ্টি করিতে গিয়াই, তিনি আপনার উন্নতির পথে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। যদিও রামদয়াল বিদ্যাবলে সুকৃতি-লাভ করিতে পারেন নাই, তথাচ হিসাব-পত্রে তিনি বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। আর আমরা যে সময়েরও কথা উল্লেখ করিতেছি, তৎকালে বিদ্যাশিক্ষারও এরূপ হুড়া-হুড়ি ছিল না।

রামদয়ালের মামা যথা-সময়ে ভাগিনেয়ের বিবাহ-উৎসব সম্পন্ন করিলেন। ভাগ্যক্রমে রামদয়াল এক রূপবতী বালিকার ভর্ত্তা হইলেন। এই সময় হইতেই রামদয়ালের সংসার-বন্ধন দৃঢ় হইবার সূত্রপাত হয়। এদিকে রামদয়াল মামার সংসারে থাকিয়া হাট-বাজার

করিয়া দুই দশ টাকা উপায় করিতেছেন, ওদিকে দিনে দিনে তাঁহার পত্নীও নিজের ঘর-কন্না বুঝিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে রামদয়াল ঘোর সংসারী হইয়া পড়িলেন।

মামার উদার প্রকৃতি। রামদয়াল তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া যে দু'দশ টাকা উপার্জ্জন করিয়া ক্রমে গুছাইয়া উঠিতেছেন, তাহাতে মামার বরং আনন্দ হইতে লাগিল। বিশেষতঃ রামদয়ালের যাহাতে দশ টাকার সংস্থান হয়, সে বিষয়েও তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। কারণ, তিনি বাল্য-কাল হইতেই রামদয়ালের স্বভাব-চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন; এবং এত দিন দেখিয়া তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, রামদয়াল কদাচ বিপথগামী হইবে না। প্রকৃতই রামদয়ালের যেমন দুঃখীর ঘরে জন্ম, তেমনই কখনও বড়-লোকের সুখ-সম্ভোগ দেখিয়া, কদাচ তাঁহার মনে বিলাস-ভোগের উদয় হয় নাই।

এইভাবে কিছু দিন কাটিয়া গেল। সময়ে রামদয়াল পুত্র-কন্যার পিতা হইলেন। বড়-লোকের ঘরে থাকিয়া যদিও গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য রামদয়ালকে বিশেষ চিন্তিত হইতে হয় নাই, তথাচ মামার অবর্ত্তমানের ভাবনায়ও তাঁহাকে ভাবিত হইতে হইয়াছিল। চিরদিন যে এরূপ আদর-যত্নে যাইবে, তাহারই বা ঠিক কি?—এই সকল ভাবিয়া-চিন্তিয়াই রামদয়াল মনের প্রীতি দিন দিন হারাইতে লাগিলেন। এখনও মামা জীবিত রহিয়াছেন; এবং তিনি যে ভাবে রামদয়ালের প্রতি ব্যবহার করিতেছেন তাহাতে তাঁহার মনে এরূপ চিন্তার আশু কোন আবশ্যক নাই। কিন্তু যতই তিনি সন্তান-সন্ততির প্রতি চাহিয়া দেখেন, ততই তাঁহার মন বিষণ্ণ হইতে থাকে। তাহাতে আবার সংসারে মধ্যে মধ্যে কলহেরও সূত্রপাত উপস্থিত হইতে লাগিল। মামার ছেলেমেয়েদের মন যোগাইয়া কার্য্য করা রামদয়ালের যদিও অভ্যস্ত ছিল, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী বা পুত্রকন্যা ঠিক সে ভাব বজায় রাখিয়া তো চলিতে পারিত না! কাজেই এজন্য সময়ে সময়ে কথাবার্ত্তার গোলযোগ ঘটিত। কিন্তু এরূপ বিবাদের কথা কর্ণগোচর হইলেই, কোন গুরুত্বে না লইয়া, রামদয়াল তাহা সহজে মিটাইবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু যখন তিনি উপস্থিত থাকিতে পারিতেন না বা পয়সার চেষ্টায় তাঁহাকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত, তখনকার গোলযোগ কাজেই রহিয়া যাইত।

বাটীর বউগুলি তাঁহার পরিবারবর্গের উপর অসন্তুষ্ট হইলেও, শ্বশুরের অনুরোধে সহজে যে বিশেষ কোন অনিষ্ট হইবে না, রামদয়ালের মনে একথাও সতত জাগ্রত ছিল বটে! কিন্তু তখনও তিনি পর! এ বাড়ী ত্যাগ করিয়া যাইতে বলিলেই যখন তাঁহাকে যাইতে হইবে, তখন আর উপায় কি? তিনি এও মনে মনে ভাবেন যে,—"আপনার পুত্র-কন্যা যতই কেন অপরাধী হউক না, অবশ্যই আমার অপেক্ষা তাহাদের মঙ্গল-চেষ্টায় লোকত-ধর্ম্মতঃ মাতুল মহাশয়কে থাকিতে হইবেই; এরূপ অবস্থায় আমার বিবাহ করা ভাল হয় নাই; বিবাহ করিয়াছি, আপনার গলগ্রহ আপনিই যোটাইয়াছি। তখন নিজের পেটের ভাবনা ছিল, এখন দুই জনের জন্য ভাবিতে হইতেছে; তাহার উপর আবার দেখিতে দেখিতে ছেলে-পিলেও হইল। এইবেলা মানে মানে এস্থান হইতে স্থানান্তরিত হইতে পারিলেই মঙ্গল। কিন্তু কেমন করিয়া দিন চলিবে? মামার সংসারে থাকিয়া যদিও এখন কোন কষ্ট পাইতেছি না, কিন্তু এসংসার আমার ঘাড়ে পড়িলে, আমি কেমন করিয়া চালাইব?"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

একদিন রামদয়াল সমস্ত কাজকর্ম্ম সারিয়া গৃহে নিশ্চিন্ত-মনে বসিয়া আছেন,

ম্মুখে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র তারাচাঁদ ও কনিষ্ঠ ্যামচাঁদ বসিয়া স্কুলের পড়া তৈয়ার করি-তেছে। তারাচাঁদের বয়স এখন ১৫। ১৬, জেনারেল এসেম্ব্লিতে পড়িতেছে। ছেলেবেলা হইতেই রামদয়াল ও তাঁহার পত্নী তারাচাঁদের াহাতে ভালরূপ লেখাপড়া হয়, তজ্জন্য বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। কিন্তু গুরুজনের হিত-কথায় তারাচাঁদের বিরক্তিবোধ হইত, সময়ে সময়ে পতা-মাতার প্রতি সে কটু কথাও প্রয়োগ করিত। নিষ্ঠ শ্যামচাঁদের বয়স ৮বৎসর। যদিও তাহার খনও জ্ঞানলাভ হয় নাই, কিন্তু পিতামাতার তি জ্যেষ্ঠের ব্যবহার দেখিয়া সে মনে মনে সন্তুষ্ট হইত। তারাচাঁদ ইংরাজী পড়ি-তেছে; রামদয়াল বসিয়া বসিয়া শুনিতে-ছেন মাত্র। কিন্তু শ্যামচাঁদের পাঠের প্রতিই াহার মনোযোগ রহিয়াছে। ইতিপূর্ব্বেই ামদয়াল তারাচাঁদের আচার-ব্যবহার দেখিয়া াহার প্রতি যথেষ্ট বিরক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তা হইয়া পুত্রকে কিরূপে ফেলিতে পারেন? ারাচাঁদ যতই কেন অপরাধী হউক না, তিনি াহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতে কদাচ উপেক্ষা রেন নাই; এবং সময়ে সময়ে পুত্রের অন্যায় খিয়া তাহার বোধগম্য করাইবার জন্যও ষ্টা পাইতেন। গাছের প্রথম ফলের প্রতিই ক-স্বামীর যথেষ্ট অনুরাগ হইয়া থাকে, ্ভাগ্যক্রমে সে ফলের বিকৃতি হইল ভাবিয়া মদয়াল মনস্তাপানলে দগ্ধ-বিদগ্ধ হইতে াগিলেন। শ্যামচাঁদ এখন ছেলে-মানুষ। য় তো সময়ে শ্যামচাঁদই পিতার মনকষ্ট দূর রিবে—এই ভাবিয়া, রামদয়াল কনিষ্ঠ পুত্রের দ্যা-শিক্ষায় বিশেষ উদ্যোগী। প্রকৃতই ্যামচাঁদ বয়স অপেক্ষা পাঠে বিজ্ঞতা লাভ রিতেছে দেখিয়া, পিতার মন প্রসন্ন।

রামদয়াল পুত্রদিগের নিকট বসিয়া আছেন, নন সময়ে তাঁহার আশ্রয়দাতা মামার জ্যেষ্ঠ-ত্র উগ্রমূর্ত্তি ধরিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। রামদয়াল মর্য্যাদায় তাঁহাপেক্ষা হীন হইলেও বয়সে প্রবীণ, এজন্য তাঁহাকে নাম ধরিয়া ডাকিতেন। তিনি শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করি-লেন,—"জীবন, আজ কি বেড়াইতে যাও নাই! তুমি যে এখানে?"

জীবন।—দেখ দয়াল দাদা, তোমার তারাচাঁদের জ্বালায় সপরিবার বিরক্ত—রোজ রোজ এরকম অত্যাচার আর সহা যায় না?

দয়াল।—ব্যাপার কি? কি হইয়াছে?

জীবন।—তেরো পেনোর হাত ভেঙ্গে দিয়েছে। ছেলেয়-ছেলেয় কি মারামারি হয়ে-ছিল—জানি না। কিন্তু তা'বলে ওই অত-বড় বুড়ো ছোঁড়ার কি কিছু আক্কেল নেই!—থানে-অথানে লাগ্‌লে যে মারা যেত! ষোল বছরের ছোঁড়ার সে বোধ নাই—এ কোন কথা? এ কথা আমি তোমাকে বলিতাম না; কিন্তু বাড়ীতে শুনিলাম—আজ পেনোর কোন দোষ নাই; সে ঘরে বসিয়া খেলা করিতেছিল, বাবুই জোর করিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া এই বিপদ ঘটাইয়াছেন।

জীবনের কথায় রামদয়ালের মাথায় যেন বজ্রপাত হইল। তিনি জানিতেন, জীবনের পুত্র প্রাণকৃষ্ণ আশ্রয়দাতার জীবন-সর্ব্বস্ব ধন। প্রাণকৃষ্ণের প্রতি এরূপ অত্যাচার হই-য়াছে,—এ কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইলে, অব-শ্যই তিনি তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠাইবেন। পৌত্রের প্রতি এরূপ ব্যবহার পিতামহ হইয়া কিরূপে সহ্য করিতে পারিবেন! তাহাতে প্রাণ-কৃষ্ণ ৭ বৎসরের বালক মাত্র। যদিও তাহার কোন অপরাধ থাকে, সে কথা কে গ্রাহ্য করিবে? ফলতঃ এজন্য তাঁহাকে যথেষ্ট অপমান সহ্য করিতে হইবে; হয় তো এই সূত্রেই তাঁহাকে আশ্রয়ত্যাগী হইতে হইবে। রামদয়াল মনে মনে নানা তর্কবিতর্ক করিয়া প্রথমেই তারাচাঁ-দের গালে দুই চড় কশাইলেন; এবং তাহাতেও ত.হার মুখভাবের বিকৃতি না দেখিয়া, পদাঘাতে

তাহাকে চৌকি হইতে ফেলিয়া দিলেন। জীবন রামদয়ালের পুত্রের প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহারে মনে মনে যদিও সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু যাহাতে দয়াল দাদার ক্রোধের শান্তি হয় তাহারও উপায় ভাবিতেছিলেন। অধিকন্তু পর-মুহূর্ত্তের কঠোর ব্যবহার দেখিয়া তিনিও ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন।

তারাচাঁদ তখন ভূমি হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া পিতাকে গালাগালি দিতে দিতে সবেগে তাঁহার হস্ত ধরিয়া বসিল; ভাবে প্রকাশ, সে যেন রামদয়ালকেই মারিতে উদ্যত! জীবনবাবু যে সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন, সেদিকেও তাহার লক্ষ্য নাই। জীবনবাবু তারাচাঁদের এ ভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"একি?"

তারাচাঁদ তখন ক্রোধান্ধ। কাহার সহিত কথা কহিতেছে, কোথায় দাঁড়াইয়া আছে, এক-কালে দৃষ্টিশূন্য। জীবনবাবুর কথায় 'চোপরাও' বলিয়া উত্তর দিল। জীবনবাবুর এ অপমান সহ্য হইবে কেন? বিশেষতঃ তারাচাঁদের অপেক্ষা তাঁহার শক্তি যথেষ্ট। তিনি এক ধাক্কায় তারাচাঁদকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিলেন। তখনও তারাচাঁদ জীবন-বাবুকে যথেচ্ছা গালাগালি দিতেছিল। জীবন-বাবুর হাঁকডাকে ক্রমে দেউড়ীর দ্বারবান দৌড়িয়া আসিল। জী[illegible]বাবু তারাচাঁদকে পদাঘাত ক[illegible] [illegible]হার নিবৃত্তি নাই: এত [illegible] [illegible] [illegible] বন্ধ হয় নাই। [illegible] জীবন[illegible] গালা-গালি [illegible]তেছে; জীবনবাবুও আ[illegible] সহ্য করি[illegible] পারি[illegible] না। তৎক্ষণাৎ তাহাকে এককালে বাটী হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিবার জন্য দ্বার[illegible]কে আদেশ করিলেন।

মনিবের আজ্ঞামাত্রেই তারাচাঁদকে পিতার আশ্রয়দাতার বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

ভয়ানক খুন।

তৃতীয় দৃশ্য।

ছায়াবাজি।

বড় দরকার—শীঘ্রই কাপড়খানিকে ছাড়িয়া রাখিয়া যাইতে হইবে! গোকুল বাবু তাই তাড়াতাড়ি কাপড়খানি-মাত্র ছাড়িয়া বাড়ির বাহির হইয়াছেন; গলির মোড়-পর্য্যন্তও এখনও যান নাই! এমন সময়, পথপার্শ্বস্থ একখানি দ্বিতল বাড়ীর উপরকার খড়খড়ি হইতে তাঁহার গায়ে একটী তোড়া ফুল পড়িল। তিনি উপরের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন,—একটী সুন্দরী যুবতী; খড়খড়ি দিয়া মুখ বাহির করিয়া তাঁহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছেন।

দেখিয়াই গোকুল বাবুর মাথা ঘুরিয়া গেল! তিনি তাড়াতাড়ি যাইতেছিলেন, থমকিয়া দাঁড়াইলেন। রমণীর সে অপূর্ব্ব মুখ-ভঙ্গিমা, সে সলোল কটাক্ষ, সে হাসি-হাসি মুখখানি, তাঁহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে যেন বিঁধিয়া গেল। সে অপরূপ রূপ-সাগরে পড়িয়া তিনি হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। ব্যস্ত হইয়া যাইতে-ছিলেন; গলি পার হইয়াই তাঁহাকে গাড়ি দেখিতে হইত; নতুবা অভিপ্রেত স্থানে গিয়া সময়-মত উপস্থিত হওয়ার আর সময়ই বা কই! কিন্তু এ দৃশ্য দেখিয়া তাহা হইল না। যদিও তিনি একবার, দুইবার, তিনবার বা চারিবার সেদিকে চাহিয়াই ফিরিতে পারিতেন; যদিও বেল্লিক হইলেও ভদ্রলোকের ঘরের মেয়ে-ছেলে ভাবিয়া, তিনি চোখের চাহনি চাহিয়াই, চলিয়া যাইতে পারিতেন; কিন্তু তাহাতেও যে বাধা পড়িল! রমণীর ইঙ্গিত-ইসারার সঙ্গে-সঙ্গেই বাড়ীর একটী ঝি নীচেয় নামিয়া আসিয়া ডাকিল,—"গোকুল বাবু, মা-ঠাকুরুণ একবার [illegible]কে ডাকিতেছেন। কি কথা আছে।"

[illegible] বাবু তো আকাশ হইতে পড়িলেন। তিনি জানিতেন,—বাড়িটি একটী বিশিষ্ট ভদ্রলোকের—অর্থের, সম্মানের পদমর্য্যাদার তাঁহার কিছুরই অভাব নাই। সে বাড়ীর রমণী, বিশেষতঃ সুন্দরী রূপসী যুবতী, কেন এমন বিশৃঙ্খল হইল? কিন্তু সে ভাবনায় তাঁহারই বা কাজ কি! তিনিও তো সুবিধার লোক নহেন—তিনিও তো দাঁও খুঁজিয়াই কাল কাটান! বিশেষত আরও একদিন সকালে ঐখান দিয়া যাইবার সময় তাঁহার গায়ে ঐরূপে একটী পান পড়িয়া-ছিল। কিন্তু সেদিন তিনি তাহা গণনাতেই আনেন নাই। কাজেই, ঝি ডাকিতেই, আজ আর তিনিও লোভ-সম্বরণ করিতে পারিলেন না। ডাক শুনিয়াই তিনিও জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বড় বাবু এখন কোথায়? আমি কি করিয়া তাঁহার অজ্ঞাতে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারি?"

ঝি।—মা-ঠাকুরুণ বলেছেন, তা' সে জন্য আপনার কোন চিন্তা নাই। সে দায়ী মা-ঠাকুরুণ!

উপরকার খড়খড়ি হইতে শুনিয়া অমনি রমণীও বলিয়া উঠিলেন,—"না—না গোকুল বাবু, সেজন্য আপনার কোন চিন্তাই নাই। আমি একটীমাত্র কথা বলিয়াই আপনাকে ছাড়িয়া দিব। বেশী দেরীও হইবে না।"

আরও বেশী কথাবার্ত্তা হইলে, পাড়ার লোক পাছে জানিতে পারে, কাজেই এই অবধিই রাস্তার কথাবার্ত্তার শেষ হইল। "না-হুঁ—না-হুঁ" করিয়া অগত্যা গোকুল বাবু ঝির সহিত বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। যা'বার সময় কিন্তু বলিলেন,—"দেখ ঝি, আমি কিন্তু বেশীক্ষণ থাক্‌তে পার্‌বো না! আমার জন্য সকলে অপেক্ষা করিতেছেন। এখনই আমাদের কালীঘাটে যাইতে হইবে। আমার দেরী হইলে সকলেই চটিবেন! সুতরাং কথা-বার্ত্তা যাহা থাকে, শীঘ্র শীঘ্র যেন শেষ [illegible]"

এই বলিতে বলিতেই ঝির সহিত গোকুল[illegible] বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তা'রপর—পাঠক মাপ করিবেন—ভদ্রলোকের অন্দরের ভিতরের কথাবার্ত্তা আর আমরা শুনিবার সুবিধা পাই নাই। সুতরাং আপনা-দিগকেও এখন আর তাহা বলিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ গোকুল বাবুর মত নাক-কান-কাটা না হইলে তো আর কাহারও অন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কথা শুনা যায় না!

*   *   *   *

একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়াটিয়া গাড়ি! গাড়ির ভিতরে একটী স্ত্রীলোক এবং একটী পুরুষ—দুইজন গাড়ির দুইদিকে বসিয়া। স্ত্রীলোকটীর হাতে একটী 'ডবল্ টিনের' সুন্দর রঙ্ করা ছোট গহনার বাক্স; এবং পুরুষটী সুধু একখানি হাত গালে দিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছেন। গাড়ির দরজা খোলা। সুতরাং গাড়িখানি ভদ্রপল্লীর বলিয়া বোধ হইল না। আর বাস্তবিকও সেরূপ নহে। যাইহোক, গাড়িখানি ক্রমাগত দক্ষিণ-মুখো আসিয়াই, মেছুয়াবাজারের চৌরাস্তায় হরিহর পোদ্দারের রোকড়ের দোকানের সম্মুখে থামিল। বাবুটিকে না হউক, স্ত্রীলোকটিকে পোদ্দার মহাশয় পূর্ব্ব হইতেই চিনিতেন; কাজেই "আসুন—আসুন" বলিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাদিগকে বসাইলেন।

কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর, পোদ্দার মহাশয় রমণীটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোন প্রয়োজন আছে কি?"

"আছে বই কি! এই স'চারেক টাকার প্রয়োজন। এই জিনিসগুলি রাখিব।"—এই বলিয়া, স্ত্রীলোকটি বাক্স খুলিয়া, কয়েকখানি গহনা বাহির করিলেন; ও তাঁহার সঙ্গের বাবুটি তাহা পোদ্দার মহাশয়ের হাতে দিতে লাগিলেন।

পোদ্দার মহাশয় আরও দুই চারিবার রমণীটির সহিত [illegible]রবার করিয়াছিলেন; কিন্তু কোন বারই তাঁ[illegible] প্রতি সন্দেহের কোন [illegible]রণ

পান নাই। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকটীকে সোনাগাছির একজন বাড়ীওয়ালা বাসিন্দা জানিয়াই, তিনি মনে কখনও ওরূপ কোন সন্দেহ-প্রশ্ন তুলিতেনই না। কাজেই, গহনাগুলি এক-বার কসিয়া-মাজিয়া লইয়াই, তিনি টাকা দিতে উদ্যোগী হইলেন।

পোদ্দার মহাশয় টাকা গণিতেছেন, নোট-গুলি মিলাইয়া দিতেছেন। এমন সময়, একটী মাড়োয়ারী খোট্টা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—'বাবু সা'ব, ইষ্টাম্পকা কাগজ হিঁয়া মিল্‌তা হ্যায়!" কিন্তু উত্তর পাইলনা। পোদ্দার মহাশয় একথোক দাঁও মারিতে বসিয়াছেন; সুতরাং ও খুজরা-খাজরা কথায় এখন আর তাঁহার কর্ণপাত হইবে কেন? বিশেষতঃ লোকটার যেমন চেহারা, তেমনিই পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়াই তো হরি-ভক্তি উড়িয়া যায়! যেমন কালির পোঁচ-দেওয়া চেহারা, তেমনি পরণে মাটি-ময়লা-মাখা এক কৌপিন-মাত্র। সুতরাং সে আর কত টাকার ষ্টাম্প লইবে? হয় তো "পাওয়া যায়" শুনিয়াই চলিয়া যাইবে! কাজেই পোদ্দার মহাশয় সে সব দিকে কি আর দৃষ্টি রাখিতে পারেন? আগন্তুকের ডাক শুনিয়াছিলেন কি না, ভগবান জানেন; কিন্তু কোন উত্তর না দিয়াই, পোদ্দার মহাশয় সেইরূপ টাকাই গণিতে লাগিলেন। মাড়োয়ারিটা ক্রমে দোকানে ঘেঁসিয়া বসিল; আবার জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবু সাব, ইষ্টাম্পকা কাগজ্ একঠো—আঠ্ আনা দাম-কা মিলে-গা!"

বার বার বিরক্ত করায় পোদ্দার মহাশয় একটু চটিয়াছেন। ঐরূপ দুই-তিনবার জিজ্ঞাসা করার পরই, তিনি চটিয়া বলিয়া উঠিলেন,—'যাও—যাও, গোলমাল মাত্ কিও—ভাগো, ভাগো! হিঁয়া মিলেগা নেই!"

মাড়োয়াড়িটা তথাপিও সরিল না। এবার সে যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল,—"আচ্ছা, আপ্ কাম্ সার্‌কে লেও; হামবি পিছে লেগা।" এই বলিয়া সে সেই দরজার নীচেই বসিল। বসিল বটে, কিন্তু তাহার দৃষ্টি অন্যদিকে রহিল। কি জানি কেন, সে সেই গহনার দিকেই একদৃষ্টে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল।

ক্রমে কাজ মিটিল। টাকাগুলি গণিয়া লইয়া বাবুটি স্ত্রীলোকটীর বকলমে পোদ্দার মহাশয়ের দোকানের জাবদা-খাতায় একটী সহি করিয়া দিলেন; স্ত্রীলোকটীও কলম ছুঁইয়া দিলেন। অর্থাৎ যে গহনাগুলি বন্ধক থাকিল, তাহার তালিকার পার্শ্বে, যেমন সচরাচর দস্তুর আছে সেইমতই, পোদ্দার মহাশয় উহাঁদের সহি করাইয়া লইলেন।

বাবুরা গাড়িতে উঠিলেন। পোদ্দার মহাশয়ও উঠিয়া দাঁড়াইয়া আপ্যায়িত করিলেন। গাড়ি চলিয়া গেল। যাইহোক, এতক্ষণে পোদ্দার মহাশয়ের সেই ষ্টাম্প-ক্রয়াভিলাষী মাড়োয়ারীর কথা মনে পড়িল। তিনি ডাকিলেন,—"কই, কে ইষ্টাম্প চাহিতেছিলে, এস!" কিন্তু তখন আর কে কোথায়? সে মাড়োয়ারী চলিয়া গিয়াছে। কাজেই ষ্টাম্প বিক্রয় হইল না। এদিকে বেলাও প্রায় ৯টা বাজে-বাজে দেখিয়া, 'র'তো ছোঁড়াটাকে দোকানে বসাইয়া, পোদ্দার মহাশয় তৈল মাখিয়া স্নানের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ দৃশ্য।

কালীঘাটে।

"বাহবা কি বাহবা! বা বাবা!—বেশ-বেশ! আরও একটু দেরী করে এলে হতো না কি? এই যাবো, আর কাপড়খানা ছেড়ে আসবো—এতে হদ্দ পনের মিনিট! এ না হলে কি আর কাজকর্ম্ম হয়!"

গোকুল বাবু প্রবেশ করিতেই, দলস্থ সকলেই তাঁহাকে এই বলিয়া ঠাট্টা-উপহাস আরম্ভ করিল। গোকুল বাবু কিছু অপ্রতিভ হইয়া

বলিলেন,—"আগে শোনই কথাটা, তার পর যা' হয় ব'লো।"

"আরে রেখে দেও, তোমার শোনা। দশটা বাজে—তবুও তোমার ভ্রূক্ষেপ নেই। কোথায় তুমি এসে টাকার যোগাড় করবে, তার পর যাওয়া হবে; তা'না একেবারে তুমিই নিরুদ্দেশ—বিষমোল্লাতেই গলদ্।"

"না—না, আচ্ছা, চল—চল; যাওয়া যাক।"

"টাকা!"

"আর কেন? সে সব আমি শুনেছি। গাড়িও আছে; চল, বাওয়া যাক। কিজন্য আস্‌তে দেরী হলো, রাস্তায় যেতে যেতে সব্ বল্‌বো এখুনি!"—এইরূপ দু'পাঁচটা কথাবার্ত্তার পরই, বাবুরা সকলে বাহির হইলেন। বাবুরা হইলেন, পাঁচজন; আর সঙ্গে মেয়ে-মানুষ দুইজন। তাঁহাদের একজনের সহিত পোদ্দার মহাশয়ের দোকানেই পাঠক-মহাশয়দের একরূপ আলাপ-পরিচয় হইয়াছে: সুতরাং আর পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে আর যে একজন—আবশ্যক হইলে দেখা-সাক্ষাৎ করিয়াই তাঁহার সহিত আলাপ করিবেন; আমরা আর এখন সে 'টবল' লইবার অবসর পাইতেছি কই? কারণ বেলা প্রায় ১০ টা বাজে; আর দেরী করিলে কালীঘাটে যাওয়া হয় কই? বিশেষতঃ গাড়ি তো আর দাঁড়াইবে না? তবে সঙ্গে সঙ্গে যাইতে পারেন তো ভরসা হয়, শেষে আলাপ-আপ্যায়িত সকলই হইবে।

* * * *

গাড়ি দু'খানি কালীঘাটে পৌঁছিল। এখনও মায়ের বাড়ীর দুয়ার-পর্য্যন্ত যায় নাই! কিন্তু এখন হইতেই দুইজন ব্রাহ্মণ গাড়ি-দু'খানির সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতে ছুটিতে বলিতে-লাগিল,—"মহাশয়েরা মায়ের পূজা যদি দেন, আমাদের ওখানে আসুন। বেশ নির্জ্জন বাসা পাইবেন; সকল রকমের সুবিধা করিয়া দিব। মেয়েছেলে লইয়া থাকিবার মতই বাসা। বেশ নির্জ্জন বাসা—গঙ্গার ধারেই। তা'ছাড়া চাকর-বাকরও পাইবেন।"

এইরূপ দুইচারিবার অভ্যর্থনা করাতেই, বাবুরা বলিলেন,—"আচ্ছা চল; আর ভাড়াটে যোটাইলে বা গোলমাল হইলে আমরা কিন্তু থাকিব না। চল দেখি, দেখিগে কেমন বাসা!"—এই বলিয়া একটী বাবু নামিলেন; এবং ক্ষণপরেই বাসা দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া সকলকে লইয়া সেই বাসাতেই উঠিলেন। চাকর তামাক সাজিয়া ছিল; হাত-পা ধুইবার জল দিল। পুরোহিত পূজার আয়োজন করিতে লাগিলেন; দোকানী দোকানের দ্রব্যাদি গছাইবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

পুণ্যাত্মার পার্শ্বেই পাপী; স্বর্গের সম্মুখেই নরক। দেখাইবার, শিখাইবার জন্যই কি এ চিত্র জগৎ-পটে অঙ্কিত হয়? যাইহোক, পুণ্য-স্থানমাত্রেই কিন্তু আমরা এ চিত্রের পূর্ণতা দেখিতে পাই। এই শ্রীশ্রী৺কালীমাতার পীঠস্থানে আজ কতশত লোক পূজার-অছিলায় উপস্থিত! কিন্তু সকলের কি একই অভিপ্রায়? কেহ বা পুণ্যার্জ্জন, কেহ বা পাপসাধন; কেহ বা ধর্ম্মের জন্য, কেহ বা আমোদ করিতে—সকলেই ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায়ে কি এখানে আসে নাই? বাস্তবিকও তাই! নিত্য নূতন পাপ করিব, অথচ বাঁচিয়া যাইব,—এই বা কাহারও ধারণা; পাপ করিয়াছি, কিন্তু অব্যাহতি যেন পাই, এই বা কাহারও প্রার্থনা; পুণ্য করিতেছি, স্বর্গে যাইব—সুখী হইব, এই বা কাহারও উপাসনা। এইরূপ নানা রঙের নানা ঢঙেই সমাজ চলিতেছে; লোকে কাহাকেও বা সুলোক, কাহাকেও বা কুলোক আখ্যায় আখ্যায়িত করিতেছেন। মা পতিতোদ্ধারিণী সেই সকলই দেখিতেছেন; আর মনে মনে হাসিতেছেন। জগৎ তাঁহার ক্রীড়ার পুত্তলি; কখনও হাসিতেছে, নাচিতেছে; কখনও কাঁদিতেছে, ডুবিতেছে; মা কিন্তু গম্ভীরা হইয়া সকলই দেখিয়া যাইতেছেন, আর মনে মনে হাসিতেছেন!

এদৃশ্য দেখিয়া—ভাবিয়া কেই বা হাস্য-

সম্বরণ করিতে পারেন? মায়ের চরণামৃত পান করিতে আসিয়া, শৌণ্ডিকের চরণামৃত পান করিতেছি; মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিবার ভান করিয়া আসিয়া, কুলটা বেশ্যার চরণপূজা করিতেছি! হায়—হায়, এ অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে! দেখিয়া চক্ষে জল আসে, আজকাল প্রায় বাবুদেরই এই ভাব!

আমাদের উপস্থিত যাত্রীরাও এখন এই ভাবে বিভোর! পূজায় স'পাঁচ আনা, পুরোহিতের দক্ষিণা পাঁচ পয়সা,—এইমাত্র তাঁহাদের পূজায় ব্যয় হইয়াছে। কিন্তু এখন মোহর-দু'মোহর শৌণ্ডিকের সেবায়, দু'কেতা-তিনকেতা পোলাও-কালিয়ার ছটায় ব্যয় হইতেছে। বাবুরা গড়াগড়ি-হুড়াহুড়ি, মাতামাতি-ঢলাঢলি—এই লইয়াই পড়িয়া আছেন। পূজা মিটিয়াছে; এখন সখ মিটিতেছে! পাপের পসরা মস্তক হইতে নামিবে কোথায়, ক্রমেই সে ভারে মস্তক ভারাক্রান্ত হইতেছে! কাহারও স্নানাহারে ভ্রূক্ষেপ নাই; কাহারও মান-মর্য্যাদায় আর ভয় নাই। মদে সকলেই মাতোয়ারা। বেশ্যা লইয়া, লোক-সম্মুখে ঢলাঢলি-মাখামাখি করিতেও কেহ কুণ্ঠিত হইতেছে না।

বাবুদের রসুই-রান্না 'বামুনে' করিতেছে। যোগাড়-যন্ত্র চাকরে করিয়া দিতেছে। গ্লাস-দু'গ্লাস মদও চাকরে বাবুদের মুখে ঢালিয়া দিতেছে। পয়সা পাইলে কে না কি করে? যদিও ঠিকা চাকর, তথাপি বেশী পয়সার প্রত্যাশায় সেও যেন বাবুদের কেনা গোলামের মত কাজ করিতেছে। আর, বাবুরাও তাহার প্রতি তখন বড়ই সন্তুষ্ট। শশী বাবু তাহাকে আবার নিজের বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা পাইতেছেন! তাহাকে বুঝাইতেছেন,—"তোকে একটা বাঁধা খানসামাগিরি ভাল কাজ দেব! মাহিনাও, খোরাক পোষাক বাদ, ৭।৮৲ টাকা পা'বি। তুই আমাদের সঙ্গে যা'বি!"

চাকরটাও যেন তটস্থ। সে বলিল,—"বাবুরা যদি মেহেরবানি করে নিয়ে যান, তবে যাইব না কেন?" বিশেষতঃ শশী বাবুরও যেমন ঝোঁক, স্ত্রীলোক দু'জনেরও আবার তথৈবচ!—অমন চাকর পাইলে তাঁহারাও রাখেন, এমন ইচ্ছা!

এইরূপ নানা কথাবার্ত্তা হইতেছে; এমন সময় হরি বাবু নামক ইহাঁদের দলস্থ একটী বাবু, কি জানি কি মনে করিয়া, সেই চাকরটীর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেছিলেন। ক্ষণেক পরে, একটু নেসার ঝোঁকেই, তিনি বলিয়া ফেলিলেন,—"আজ গয়নাগুলো বাঁধা দিতে যা'বার সময়, পোদ্দারের দোকানে ঠিক এই চেহারারই একটা হিন্দুস্থানী ষ্টাম্প কিনিতে আসিয়াছিল; কেমন সরি, (নাম সরলা—আদর করিয়া সকলে 'সরি' বলিয়া ডাকে) সে লোকটাও এই রকমই নয়?"

সরলা ওরফে 'সরি' উত্তর করিল,—"আমিও তো তাই ভাবিতেছিলাম। চেহারাখানা ঠিকই বটে; কিন্তু এ বাঙ্গালী, আর সে খোট্টা, এই যা' প্রভেদ।"

তখন শশী বাবু প্রভৃতি সকলে বলিলেন,—"তা' এক-চেহারার লোক কি আর দু'জন থাকতে নেই? আর, তাতেই বা আর আসে-যায় কি? যাইহোক, আমি তো ওকে নিয়েই যাচ্ছি। কেমন হে, তুমি যাবে তো!"

"আজ্ঞে, যাব বৈ কি! নিয়ে গেলেই যাব!"—এই বলিয়া চাকরও যেন আপ্যায়িত ভাব প্রকাশ করিল।

সরলা ও হরি বাবুর কিন্তু সন্দেহ ঘুচিল না। কি জানি তাঁহাদের মন কেন, তোলপাড় করিতে লাগিল।

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

আজকালকার বিজ্ঞাপন,

অন্ততঃ যেগুলি প্যাক বাঁধিয়া অযাচিত ভাবে মফঃস্বলের ভদ্রলোকদিগের নামে পাঠান হয়, তাহার অধিকাংশ বিজ্ঞাপনেই প্রতারণা দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ, 'তন্ত্রমন্ত্র', 'গুপ্তকথা', 'ইন্দ্রজাল', 'ডাকিনী-বিদ্যা', 'ডামরতন্ত্র', 'মায়ামন্ত্র, 'শাস্ত্রসংগ্রহ' প্রভৃতি শীর্ষক যে সকল বিজ্ঞাপন বিলি হইতেছে সেগুলি তো ভয়ানক রকমেরই। মলাট বদলাইয়া, এক পুস্তকে অন্য পুস্তকের মলাট দিয়া, এই-সকল বিক্রেতারই আজকাল লোক ঠকাইতেছে। আরও, তাহাদের পুস্তকে যে সকল শ্লোক বা মন্ত্র থাকে, তাহা হয় ভ্রমপূর্ণ, নয় তো কোন কার্য্যেরই নয়! সাধারণে সাধারণতঃ ঐরূপ শ্রেণীর বিজ্ঞাপন হইতে সাবধান থাকুন, এই আমাদের পূর্ব্বাপর অনুরোধ। বিশেষতঃ যে সকল বিজ্ঞাপনে যত বেশী লোভানি আছে, সে সকল

বিজ্ঞাপনেই তত জুয়াচুরী বর্ত্তমান, একথা যেন সকলেরই স্মরণ থাকে।

'ভারত-শ্রমজীবি'

পত্রের জন্য অনেকে টাকা জমা দিয়া তাহা পাইতেছেন না, অথবা পত্র লিখিলেও উত্তর নাই—পূর্ব্বাপর এইরূপ নানা অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে। 'ভারত-শ্রমজীবির' অনুষ্ঠাতা শশীবাবুকে বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি বলিয়াই জানি; তাঁহার এরূপ সকল কলঙ্কে আমরা বড়ই ব্যথিত হই। যাইহোক, এখনও তিনি সকলকে তুষ্ট করুন, এই নিবেদন।

'এস, বি, বসু এণ্ড কোং'

এই নাম দিয়া, 'দেবপাড়া ষ্টীট, কোন্নগর' ঠিকানা হইতে এক পুস্তকের দোকানের বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছে। কিন্তু তথায় পুস্তকের অর্ডার দিয়া অথবা টাকা পাঠাইয়া কেহ কেহ প্রতারিত হইতেছেন, এরূপ অভিযোগ পাইতেছি। কলিকাতার বাহিরের বিজ্ঞাপনদাতা, তাঁহার দোকান-পাট বা আয়োজন-আসবাব দেখিবার আমাদের সুবিধা নাই; সুতরাং আমরা ও-সম্বন্ধে কোন মন্তব্য দিতেই ইচ্ছা করি না। কিন্তু ব্যবসায়ীর পক্ষে এরূপ-সকল অভিযোগে বড়ই দুঃখিত হইতে হয়। তাই আশা করি, সদিচ্ছা থাকিলে, 'বসুকোম্পানী' এখনও বুঝিয়া-সুঝিয়া কাজ করিবেন।

নূতনতর প্রতারণা।

Express এই নামের এক কাগজের প্রতিনিধি সাজিয়া একজন সাহেব এক বড়ই নূতনতর রকমের জুয়াচুরী করিয়া বেড়াইতেছেন, এইরূপ সংবাদ পাওয়া যায়। সাহেবের একটি জুয়াচুরীর বিবরণ পাঠকগণ দেখুন, এইরূপ;—

বৌবাজার ষ্ট্রীটে 'চিত্রশিল্পী-কোম্পানী' নামক একটী চিত্রালয় আছে। তথায় গৃহসাজাইবার উপযোগী নানাবিধ দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি বিক্রয় হয়, এবং নানারূপ চেহারা-চিত্র তোলা হয়। উল্লিখিত সাহেবটি গত ২৮এ এপ্রিল কোম্পানীর ঐ চিত্রালয়ে উপস্থিত হইলেন; এবং Express নামক তাঁহাদের এক কাগজ আছে জানাইয়া, তাহাতে চিত্রালয়ের একটী বিজ্ঞাপন দিবার জন্য কোম্পানীর ম্যানেজারকে অনুরোধ করিলেন। সাহেব আরও জানাইলেন যে, তাঁহাদের Express কাগজ প্রায় ৪০,০০০ হাজার বিলি হয়, অথচ বিজ্ঞাপনের রেটও অল্প। সুতরাং ক্রমে দরের কথা পড়িল। চিত্রশিল্পীর ম্যানেজার মহাশয় তাহাতে দেখিলেন, দরেও ঢের কম বটে! সুতরাং মাসিক ৩৲ টাকা বন্দোবস্তে তিনি একটী বিজ্ঞাপন ঐ পত্রে দিতে স্বীকৃত হইলেন। সাহেব তখন বিজ্ঞাপনের হিসাবে কিছু টাকা অগ্রিম (advance) দিতে বলিলেন; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের ফারমের ছাপান বিল ও চেক-বহি বাহির করিলেন। আরও সাহেব এই সময় বলিলেন যে,—'থ্যাকার স্পিঙ্ক কোম্পানীর' আপিসেই আমাদের আপিস। সুতরাং পত্রাদি লিখিতে হইলে ঐ ঠিকানাতেই লিখিবেন।" চিত্রশিল্পীর ম্যানেজার মহাশয়ও তাহাতেই ভুলিলেন। বিশেষতঃ ছাপান রসিদ-পত্র দেখিয়া তাঁহার আর সন্দেহই করিবার অবসর হইল না। তখন তিনি এক মাসের তিনটি টাকা সাহেবকে অগ্রিম দিলেন। সাহেব তাড়াতাড়ি বিল-রসিদ ও কণ্ট্রাক্ট-ফর্ম্ম প্রদান করিয়া গাড়িতে উঠিলেন। এইখানে আরও একটি কথা বলা আবশ্যক যে, সে সময় বিজ্ঞাপনটি লিখা না থাকায়, সাহেব আর বিলম্ব করিতে না পারিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা, বিজ্ঞাপনটি লিখিয়া আপনি আপিসে পাঠাইয়া দিবেন।"

ম্যানেজার মহাশয়ও বুঝিলেন তাই। কিন্তু এখন হিতে বিপরীত! কোথায় সাহেব, কোথায় বা তাঁহাদের কাগজ! 'থ্যাকার স্পিঙ্ক কোম্পানী' সাহেবকে জানেনই না, বলিতেছেন; রসিদপত্র সব জাল বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। সুতরাং বুঝুন পাঠক কি ভয়ানক জুয়াচুরী-ফন্দি! কলিকাতা-সহরে দিনে-দু'পরে এই কাণ্ড ঘটিতেছে।

যাইহোক, আমরা সন্ধান পাইলাম, এই সাহেব এইরূপ আরও নানা ব্যবসায়ীর নিকট, বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিতে যাইতেছেন। সুতরাং সাধারণে সাবধান—যদি সাহেবকে কেহ ওরূপ অবস্থায় পান, তবে আমাদের আপিসে অথবা উক্ত চিত্রশিল্পী কোম্পানীকে তৎক্ষণাৎ সংবাদ দিলে বাধিত হইব। ফলতঃ এরূপ-সকল প্রতারক বড়ই বিষম চিজ! জাল-জুয়াচুরী করিবার উদ্দেশ্যেই ফর্ম্ম প্রভৃতিও উহারা যখন ছাপাইয়াছে, তখন কত লোক যে উহাদের কুহকে পড়িবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

সংবাদ।

—এ অপেক্ষা পুলিসের ভয়ানক অত্যাচার আর কি হইতে পারে? এত অত্যাচারেও যে পৃথিবী রসাতলে যাইতেছে না, এই আশ্চর্য্য! সম্প্রতি অমৃতসহরে পুলিস যে কাণ্ড করিয়া বসিয়াছেন, তাহা আর বলিবার নহে! শুনিলে কাণে হাত দিতে হয়; মুখে বলিলেও পাপ বর্ত্তে। নীতিবেদ কুর একজন ব্রাহ্মণ-কন্যা। গৃহ-বিচ্ছেদ-সূত্রে শ্বশুর-কর্ত্তৃক চৌর্য্যাপরাধে ইতিপূর্ব্বে তাঁহার কারাদণ্ড হইয়াছিল। সেই অবধিই তিনি মরমে মরিয়া আছেন—লোকালয়ে আর মুখ-পর্য্যন্তও দেখান না। কিন্তু ইতিমধ্যে পুলিসের প্রয়োজন হইল, যত চৌর্য্যাপরাধী আসামীর তালিকা গ্রহণ করা। অমনি পুলিস রমণীর সন্ধান লইল, বাড়ী হইতে রমণীকে বাহিরে বাহির করিল; এবং তাঁহার সকল কার্য্যকাহিনী লিখিয়া লইতে লাগিল। কিন্তু তাহাতেই বা অব্যাহতি কই? অবশেষে পুলিস সর্ব্ব-সমক্ষে সেই রমণীকে উলঙ্গিনী করিয়া তাঁহার শারীরিক চিহ্নাদির রিপোর্ট লিখিতে চাহিল। রমণীর আত্মীয়-স্বজন তাহাতে অনুনয়-বিনয় করিলেন। রমণীও সকলের পায়ে ধরিয়া, সেরূপ যেন না করা হয়—এরূপ প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু 'হামবড়া' দুর্দ্দান্ত পুলিস সে কথা শুনিবে কেন? সকলের অনুরোধ-উপরোধ অগ্রাহ্য করিয়া পুলিস রমণীকে সর্ব্ব-সমক্ষে উলঙ্গিনী করিল। রমণী তো মরমে মরিয়া রহিলেন। অপর সকলেই নিস্পন্দবৎ সে ব্যাপার দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতেই গৃহে ফিরিলেন। এদিকে, এই ঘটনার পরই—এরূপ অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়াই, রমণী নিরুদ্দেশ হইয়াছেন; তিনি মরিয়াছেন, কি কোথাও বাঁচিয়া আছেন, তাহারও স্থিরতা হইতেছে না। এরূপ জঘন্য অত্যাচার আর কি কোথাও কেহ শুনিয়াছেন? এরূপ অত্যাচারেই কি লোকে প্রার্থনা করে না যে,—"মা, বসুন্ধরে তুমি দ্বিধা হও; আমরা তোমার গহ্বরে প্রবেশ করিয়াও অব্যাহতি পাই!" ছি-ছি! কি কলঙ্কের সংবাদ?

—আফ্রিকার উত্তরাংশে এখনও প্রকাশ্য নীলামে নরনারী বিক্রীত হইয়া থাকে। সেদিন মরক্কোর টাঞ্জিয়াস সহরে ৫০০০ নরনারী বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। ইহারা টিম্বাকুটু হইতে আনীত হইয়াছিল। অল্পবয়স্কা রমণীরাই সেদিন অধিক দরে হস্তান্তরিত হইয়াছিল; সুন্দরী যুবতীদের তো অগ্নিমূল্য! তা'ত হইবারই কথা!

—ময়মনসিংহের অধীনস্থ জামালপুর মহকুমার এলাকা-ভুক্ত মিসিন্দি, গড়পাড়া, সাবাজপুর, কৈদোলা, সিংগুরা তুলসীপুর এবং রামনগর গ্রামে সম্প্রতি ভয়ানক ঘূর্ণবায়ু (Tornado) হইয়া গিয়াছে। দ্রব্যাদি নষ্টের ত কথাই নাই; কএকটি প্রাণী হত্যার সংবাদও পাওয়া যায়।

—সম্প্রতি সিডনীতে টাসেল নাম্নী একটি স্ত্রীলো বেলুনে ৩ হাজার ফীট উচ্চে উঠিয়া প্যারাসুটে অবতরণ করিয়াছেন।

—যশোহর জেলা নীলকরদের অত্যাচারে উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। প্রজারাও যত বিপন্ন হইয়া আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা পাইতেছে, আর এদিকে নীলকর সাহেবেরাও ততই অত্যাচারের মাত্রা বাড়াইতেছে। শুনা যাইতেছে, পুলিসও নাকি নীলকরদের পক্ষ। সত্যমিথ্যা ভগবান জানেন। কিন্তু সম্প্রতি এই নীলকর-প্রজাঘটিত বিবাদের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা শুনিয়া তো শিহরিয়া উঠিতে হয়! এই দেখুন,—নীলকুঠির অধীনস্থ ২০ খানি গ্রামে প্রায় দুইহাজার পুরুষের বাস। কিন্তু সকলে শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন যে, তন্মধ্যের ১৪ শত ব্যক্তি আদালতের মকর্দ্দমায় জড়িত। অর্থাৎ ৯শত ব্যক্তিকে দেওয়ানীতে এবং ৫শত ব্যক্তিকে ফৌজকারীতে মকর্দ্দমা চালাইতে হইতেছে। এছাড়া প্রজাদের আর্ত্তনাদ লাট-উপলাটের নিকটও কতরূপে যে জানান হইতেছে তাহারও ইয়ত্বা নাই। সুতরাং প্রজাগণ কতদূর অত্যাচারিত হইতেছে, তাহা কি আর বলিতে হইবে? যাইহোক, গবর্ণমেণ্ট এখনও ইহার একটা প্রতিকার করেন, এই বাসনা।

—আমরা যে ষ্টিল-পেনের নিপে সচরাচর লিখিয়া থাকি, ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে বর্ম্মিংহামবাসী যোশেফ গিল্ট উহা প্রথম প্রস্তুত করেন। তাঁহার আবিষ্কারের পর হইতেই নানা স্থানে নানা রকম হইয়া উহা প্রস্তুত হইতেছে।

—এক সাহেব পঞ্জাবে এক অদ্ভুত প্রথা দেখিয়াছিলেন। বোজদার নামক এক জাতির জনৈক ব্যক্তি চৌর্য্যাপরাধে তাঁহার নিকট অভিযুক্ত হয়। কিন্তু অভিযুক্ত স্বীয় নির্দ্দোষিতা প্রমাণার্থ স্বেচ্ছা-পূর্ব্বকই বলে যে,—সে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইবে। ইহাই পরে স্থির হয়। একটা কুণ্ড খনন করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রজ্বলিত করা হয়। অভিযুক্ত প্রকৃতই তাহার উপর দিয়া হাঁটিয়া যায়। কিন্তু ইহাতে তাহার পদদ্বয় পুড়িয়া গিয়াছিল। যাইহোক, সে যে হাঁটিয়া এপার-ওপার করিতে পারিয়াছে, ইহাতেই তাহার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণিত হইয়াছে!

—বোম্বাই-প্রদেশে ব্রাহ্মণ-বিধবাগণের উপর বড়ই উৎপীড়ন! বিধবা হইলেই, প্রথমে তাহাদের অঙ্গের অলঙ্কারগুলি পরিত্যাগ করিতে হইবে; পরে কর্কশ মোটা কাপড় পরিতে হইবে, আর মস্তক একেবারে মুড়াইয়া ফেলিতে হইবে! ইহাতেও যদি কোন রূপবতী বিধবার শরীর কুৎসিত না দেখায়, তাহাহইলে অগ্নির ছাঁকা-ছোঁকা দিয়াও তাহার অঙ্গ কুৎসিত করিতে হইবে। ফলতঃ একপক্ষে তাহার স্বামিবিয়োগ-যন্ত্রণা, অপর পক্ষে আত্মীয়-স্বজনগণের এই উৎপীড়ন! বিধবাদিগের প্রতি এইরূপ সকল অত্যাচার দেখিয়া, দয়াপরবশ হইয়া, তথাকার নাপিতেরা সম্প্রতি এই এক ধর্ম্মঘট করিয়াছে যে, তাহারা আর কিছুতেই বিধবাদের মস্তক মুড়াইবে না। ব্রাহ্ম-খৃষ্টানদের ন্যায় নাপিত ভায়াদেরও শেষে দয়াটা একচেটে হইল নাকি?

মধ্য-ইংরাজী-ছাত্রবৃত্তির ফল!

জেলা ময়মনসিংহ।—প্রথম বিভাগ।—কালীপুর, সর্ব্বেশ্বর নাথ। হাড়িঙ্গা, বিপিনচন্দ্র রায়, গিরিজানাথ রায়। শিমূলকান্দি, প্রাণেশচ ধর। জামুর্কী, প্রবোধচ সেন। বড়বাসালিয়া, শ্যামচন্দ্র বাগছী, যোগেন্দ্রনাথ সাহা, রামেশ্বর চক্র। নগরবাড়ী, আজগর আলী মিঞা। পিঙ্গলা, হরিহর গুহ রায়। নাগরপুর, যোগীন্দ্রলাল সাহা। আড়রা, জ্যোতিশচ বন্দ্যো, সাহেব খাঁ।

দ্বিতীয়বিভাগ।—মুক্তাগাছা, শতীশচ ভাদুড়ী। হোসেনপুর, রাজেন্দ্র সেন। বাজিৎপুর, হারাধন সাহা, গোকুলচ দত্ত, রামকিশোর ধর, প্যারীমো দাস, অখিলচ দাসগুপ্ত, শ্যামাচ চক্র। আচমিতা, রাজেন্দ্রকি ভট্টা। মসুয়া, শশিভূ ভট্টা, শিবেন্দ্রকি রায়। পাথরাইল, জানকী সূত্রধর। বড়বাসালিয়া, লালমোহন ভট্টা। নগরবাড়ী, যামিনীসুন্দর গুহ। পিঙ্গলা, রজনীকা ভাদুড়ী। সাঁকরাইল, আশুতোষ সেন, সীতানাথ মজুম। করটীয়া, মজিরউদ্দিন মিঞা। আলিসাকান্দা, কালীকু চক্র। নাগরপুর, সুরেন্দ্র চৌধুরী, রাসবি সাহা, নরেন্দ্র চৌধুরী, বীরেন্দ্রনা চৌধুরী। আড়রা, কামিনীকা চক্র।

তৃতীয়বিভাগ।—মুক্তাগাছা, ভারতচন্দ্র কুশারী। হোসেনপুর, গোবিন্দচ বর্ম্ম। বাজিৎপুর বৈকুণ্ঠনাথ দাস। জঙ্গলবাড়ী, সেখ আছালত, শ্রীনাথ আধ। নওপাড়া, গোবিন্দচ মজু। করটীয়া, শরচ্চ কর, মক্বল হোসেন খন্দ। আড়রা, শ্রীশচ ঘোষ, হোসেনুদ্দিন মিঞা।

মধ্য-ইংরাজীর পরীক্ষার্থী মধ্য-বাঙ্গালায় উত্তীর্ণ।—দ্বিতীয়বিভাগ।—মুক্তাগাছা, মহীন্দ্রচ দে। দুর্গাপুর, গোকুলচ পাল। আলিসাকান্দা, জগচ্চন্দ্র রায়।

তৃতীয়বিভাগ।—মুক্তাগাছা, উমেশচ ধর। বাজিৎপুর, নবীনচ বর্ম্মণ, কুঞ্জবি বণিক। জঙ্গলবাড়ী, রামচ নাথ। দুর্গাপুর, মুকুন্দচ গোস্বামী। নওপাড়া, কৃষ্ণসুন্দর চক্র। আলিসাকান্দা, বসন্তকু রায়। নাগরপুর, বিপিনবি প্রামা। আড়রা, কাজী গোলাম মোস্তফা। গরাহাটা, বাহেরুদ্দিন সেক।

জেলা নোয়াখালী।—প্রথম বিভাগ। দত্তপাড়া, চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী।

দ্বিতীয়বিভাগ।—দত্তপাড়া, শরচ্চন্দ্র চক্র, নবীনচ ভুঞা। রাজকুমার জুবিলি, আসরফ আলী। সোনাইমুড়ী, প্যারীমোহন সেন।

মধ্য-ইংরাজীর পরীক্ষার্থী মধ্য-বাঙ্গালায় উত্তীর্ণ।—দ্বিতীয়বিভাগ।—খিলপাড়া, যদুকৃষ্ণ বর্দ্ধন। হরিশপুর, শরচ্চন্দ্র মৎস্যজীবী, মহেন্দ্রকু বন্দ্যো, সূর্য্যকু গুহ। তৃতীয়বিভাগ—হরিশপুর, ভারতচ দে।

জেলা ত্রিপুরা।—প্রথম বিভাগ।—কুমিল্লা, সত্যেন্দ্রচ সেন। সুলতানপুর, শশিকা ভট্টা। কালীকচ্ছ, মনোমো চক্র, শরচ্চ চক্র।

দ্বিতীয়বিভাগ।—কুমিল্লা, রাইমোহন কুশারী। বাবুরহাট, বৈকুণ্ঠচরণ চক্রবর্ত্তী। নবীনগর, মোয়াজ্জিন। সরাইল অন্নদা, গুরুচরণ ভট্টা। কড়ৈতলী, চন্দ্রকুমার নাথ।

তৃতীয়বিভাগ।—কুমিল্লা, রজনীকু সিংহ। সরাইল, গগনচ বণিক্য। কালীকচ্ছ, কামিনী দে।

মধ্য-ইংরাজীর পরীক্ষার্থী মধ্য-বাঙ্গালায় উত্তীর্ণ।—প্রথমবিভাগ।—বিদ্যাকুট, কালীচ ভট্টা। দ্বিতীয়বিভাগ।—বিদ্যাকুট, গোপীশচন্দ্র ভট্টা। তৃতীয়বিভাগ।—নবীনগর, গোবিন্দচ মাল। শ্যামগ্রাম, রজনী রায়। কসবা, গদাধর চক্র। সরাইল অন্নদা, দ্বারিকানাথ দেব।

জেলা চট্টগ্রাম।—প্রথম বিভাগ।—চট্টগ্রাম, ললিতমো গুপ্ত। কাঞ্চনবাজার, ধনঞ্জয় বড়ুয়া। রাঙ্গামাটীয়া, যতীন্দ্রকু চৌধুরী, ভুবনমো রায়, প্রাথা খোঁয়াই চৌধুরী, সত্যেন্দ্র চৌধুরী।

দ্বিতীয়বিভাগ।—চট্টগ্রাম, গৌরচ চক্র। সুলতানপুর, দুর্গাদাস নন্দী, আবদুল হাদি। রাঙ্গামাটীয়া, রাজমণি দেওয়ান।

তৃতীয় বিভাগ।—চট্টগ্রাম, আতাহারউদ্দিন আহাম্মদ। সাতকানিয়া, রমজান আলী।

প্রাইবেট, কালীকুমার সেন (১), কালীকুমার সেন (২)।

মধ্য-ইংরাজীর পরীক্ষার্থী মধ্য-বাঙ্গালায় উত্তীর্ণ। দ্বিতীয় বিভাগ।—পহুয়া, শরচ্চন্দ্র দাস। সারোয়াতলী, জয়ন্তকু বড়ুয়া, কালীকু সেন।

তৃতীয়বিভাগ।—সুলতানপুর, শ্যামাচ সরকার। পরাগলপুর, আম্বর আলী। চটগ্রাম, ভুবনমোহন গুপ্ত, জগদ্বন্ধু কাননগু।

মধ্যবাঙ্গালা-ছাত্রবৃত্তি-পরীক্ষার ফল।

জেলা ময়মনসিংহ।—প্রথম বিভাগ।—হাডিঞ্জ, প্রমথমোহন দাস, ভারকনাথ চট্টো, দুর্গাচ বিশ্বাস, রামচ রায়, নরেন্দ্রকি বিশ্বাস। রাজিৎপুর, অধরচ চক্র, লোকনা বণিক, গোবিন্দচ সাহা, রামচ সাহা, রমাকান্ত সাহা। লক্ষ্মীয়া, শরচ্চ রুদ্রপাল, । কান্দিউড়া, অখিলচ গুপ্ত। মোজফরপুর, মহেন্দ্রচ সেন। কান্দিউরা, গোপালচ নাথ। বল্লা, প্রসন্নকু নিয়োগী, মহেশচ দাস, । করটীয়া, আবদুল আজিজ খাঁ। সন্তোষ-জাহ্নবী, কেদারনা বসু, নন্দলাল দাস, মাখনলাল চক্র, সতীশচ আচার্য্য, চিন্তাহরণ চক্র। টাঙ্গাইল, বিন্দুবাসিনী, কালীধন হালদার, দিননাথ ঘোষ। মৈশামুড়া, পূর্ণচ চক্র।

দ্বিতীয় বিভাগ।—ঈশ্বরগঞ্জ-বিশ্বে, কালীকু দাস। কালীপুর, ঈশ্বরচ বিশ্বাস। রসুলপুর, মহম্মদ ইলিম, চন্দ্রকান্ত কর্ম্মকার। হাডিঞ্জ, মহম্মদ ছাবেতুল্লা, বিনন্দগৌরগোস্বামী। ধলা, অন্নদাচ বিশ্বাস। কুমারুলী, সনাতন শীল। হোসেনপুর, রামচ দে। বাজিৎপুর, সেখ মিঞাধর, কৃষ্ণচ সাহা, সুরেশচ চক্র, মহেশচ দে। আচমিতা, দেবেন্দ্রচ রায়, নন্দকি চক্র। জঙ্গলবাড়ী, সেখ আইনউদ্দিন। বনগ্রাম, গোবিন্দচ দে, কামিনীকু চক্র, রাজেন্দ্রচ রায়, শশধরভট্ট। শ্রীনাথ চক্র। গোসাঞীগঞ্জ, কামিনী গোস্বামী। গচিহাটা, মহিমচ রুদ্রপাল। কিশোরগঞ্জ, কাশীনাথ সাহা। কান্দিভড়া, মহম্মদ নবিহোসেন, মহম্মদ আনালহোসেন, সনাতন দাস। জামালপুর, প্রসন্নকু রাহা। নরুন্দি, পূর্ণচ দত্ত। জামুর্কি, বসন্তকু দাস। বড়বাঁশালিয়া, চিন্তাহরণ সান্যাল। বল্বা, রমণীনাথ দত্ত। চুনিয়াপেটল, রাধানাথ দে। করটিয়া, কালীকু চন্দ, কেদারনাথ সরকার। আলিসাকান্দা, পূর্ণচ গুহ। আম্বারিয়া কালীনাথ দাস। বাঁসাইল, প্রসন্নকু সাহা, হরিদাস গুহ। বাঘিল, উমেশচ মিত্র। ঘাটাইল, কালীচরণ দে। বহুরিয়া, প্রফুল্লচ বসু। সন্তোষ, যদুনাথ গোস্বামী, নগরবাসী দে। টাঙ্গাইল, নবকু দাস, কুঞ্জবি দাস। গয়হাটা, শ্রীনাথ ভৌমিক। সহবৎপুর, নছিমউদ্দিন মিঞা, বেণীমাধব চক্র। মৈশামুড়া, দিগিন্দ্র ঘোষ। বানাইল, মছলেম আলী সেক, শ্যামাচ সরকার।

তৃতীয় বিভাগ।—ঈশ্বরগঞ্জ, গোবিন্দচ দে। রসুলপুর, জয়চ দে। ভবানীপুর, মফিজউদ্দিন খাঁ, হরচ রাউত, সারদাচ ভট্টা। হাডিঞ্জ, রজনীকা ভট্টা, বসন্তকু কর্ম্মকার, মহিমচ অধি, হরদাস চক্র। ধলা, শরচ্চ দে, তমিজদ্দিন, দ্বারকানা মজুম, দুর্গাচ পণ্ডিত, কৈলাসচ ঘোষ, নন্দকু দাস, মহম্মদ একিনআলি, চন্দ্রকান্ত মজু। কুমারুলি, জগচ্চন্দ্র দে। কানিহারি, যোগেশচ ভট্টা, রসিকচ চট্টো। খারুয়ামুকুন্দ, সেকইব্রাহিম। বাজিৎপুর, রজনী দে। আচমিতা, কালীচ ভট্টা। শিমূলকান্দি, মহামুদজামিরুদ্দিন। চাতলবাগহাট, কামিনী ভট্টা। গচিহাট, মথুরা ভট্টা। লক্ষ্মীয়া, উমাচ দাস, ভারতচ বণিক, মহেশচ দাস। জারইতলা, ঈশ্বরচ নাথ। কিশোরগঞ্জ, শিব কর্ম্মকার, মহানন্দ সাহা। শিমূলকান্দি। মহাম্মদ জাফরালী। নওপাড়া, ঈশানচ আচার্য্য। কান্দিভিড়া, দীনদয়াল বিশ্বাস। মোজফরপুর, গয়ানাথ চক্র পূর্ব্বধলা, গয়ানাথ কর। সেকেন্দরনগর, শরচ্চ বণিক্য। হাজিপুর, প্রসন্নকু অধি। কামারেরচর, মতিলাল চক্র। জামুর্কী, অক্ষয়কু রক্ষিত। এলেঙ্গা, রাজেন্দ্রলা বসু। করটীয়া, যদুনা মিত্র, বিপিনচ বসু, মোখলছার রহমান। আলিসাকান্দা, যদুনাথ চক্র, শিবনা সরকার।

কোকডোহরা, পূর্ণচ মিত্র। বাঁশাইল, জব্বরআলী খাঁ, আহম্মদআলী খাঁ, কসিমউদ্দিন মিঞা। বাঘিল, নন্দকুমার বসু। সুতি, হেমচ দাস, গণেশচ নন্দি। কাঁটালিয়া, হৃদয়মো অধি। বহুরিয়া, জলধর ঘোষ। মগরা, বিপিনবি দে। নরদৈ, রজনী সেন। সুতি, রামদ পণ্ডিত। সন্তোষ, মধুসূদন দে। টাঙ্গাইল, শরৎকান্ত বিশ্বাস, নিশিকান্ত ঘোষ। আড়রা, যাদবচ গোপ। মৈশামুড়া, রাজেন্দ্রনা বিশ্বাস। বানাইল, কৈলাসচ বসু।

প্রাইভেট।—দ্বিতীয়বিভাগ।—যাদবানন্দ চট্টো। তৃতীয়বিভাগ।—তমিজউদ্দিন, কৈলাসচ লোহ, যজ্ঞেশ্বর ঘোষ, ব্রজেন্দ্রকুমার মুখো, হরচ নন্দী, মহম্মদ চেরাদআলী, রজনীনাথ তালুক, শরচ্চন্দ্র ঘোষ।

জেলা নোয়াখালী।—প্রথম বিভাগ—দত্তপাড়া, নন্দকু চক্র। রাজকুমার জুবিলী, ত্রিবেণী চ শূর। নোয়াখালীবঙ্গ, নুরবক্স। ফরাসগঞ্জ, লক্ষ্মীচ দে। দালালবাজার, ভারতচ নাথ, জয়গোবিন্দ নাথ। মনুপুর, গিরিশচ সাহা। মঙ্গলকান্দি, বসন্তকু দত্ত। যোগদিয়া, হারশ্চশীল, নবীনচ পাল।

দ্বিতীয়বিভাগ—দত্তপাড়া, বঙ্গচ দাস। রাজকুমার তুলামিঞা, শশিকু ঘোষ, বসন্তকু দাস, জলধর চৌধুরী। নোয়াখালীবঙ্গ, হামিদ মিঞা, রামকু সূত্রধর, বসন্তকু ধর, লক্ষ্মীচ চন্দ্র, কুঞ্জবি বন্দ্যো, হরগো মালদাস, টুকু মিঞা, দিনবন্ধু দাস, অনাথবন্ধু চক্র, ছেনাইল হক, হেলালদিন কাজী, সতীশচ সেন, ঈশানচ চক্র। ফরাসগঞ্জ, ললিত মো, গুহ। দালালবাজার, রামকু পাল, নবদ্বীপচ রায়। করপাড়া, হারিশ্চ দাস। লামচর, বিপিনবি সিংহ। নন্দীগ্রাম, সীতানাথ বন্দ্যো। মঙ্গলকান্দি, শশিকু দত্ত, উমাচ দাস, কৈলাশচ দে, অক্ষয়কু দে, প্রসন্নচ দাস। ফুলগাজি, নন্দকু চক্র, মফিজউদ্দীন আহম্মদ। সোনাইমুড়া, ঈশ্বরচ দে। আঁধারমাণিক, আবদুল রজ্জাক। রামনগর, আমজাদ আলী। হরিশপুর, বজলের রহমান (১)। গাছুয়া, মৃত্যুঞ্জয় শীল, আলী মিঞা। প্রাইভেট, সৈয়দ আব দল করিম।

তৃতীয়বিভাগ।—রাজকুমার জুবিলি, গুরুদাস সাহা, সুধন্যকু সরকার, কালীকু সূত্রধর। নওয়াখালী-বঙ্গ, নিশিকা মুখো, আজিজের রহমান, প্রসন্নকু বসু, রুহিণীকু শ্যাম। ফরাসগঞ্জ, রহিমবক্স। পাচগাও, শ্যামাচরণ চক্র। খিলপাড়া, অশ্বিনীকু ভূঞা, নবীনচঃ দত্ত, ক্ষীরোদচ সেন। লোমচর, দ্বারকানাথ রায়। মনুপুর, বলরাম নাথ, কৈলাসচ পাল, চন্দ্রকু দে। ফুলগাছি, অভয়চ দত্ত, হাসমত আলী। আমিরাবাদ, শরচ্চন্দ্র দে, চন্দ্রশে দে। করৈয়া, নিশিচ মজু। যোগদিয়া, তারিণীচ সরকার, শশিকু রায়। রামনগর, অক্ষয়কু পাল। বক্সমামুদ, রাজচ সেন। হরিশপুর, রসিকচ শীল, বিপিনবি সেন, অখিলচ দাস, উপেন্দ্র ঘোষাল। মুসাপুর, নবীনচ বাণিক্য, জগদ্বন্ধু শীল। প্রাইভেট, সফর আলি মিঞা, ক্ষীরোদচ তন্তুবায়।

জেলা ত্রিপুরা।—প্রথমবিভাগ।—কুমিল্লা-বঙ্গ, মহম্মদ ওয়াছক, আবদুল হামিদ। কুমিল্লা গিরিধারী, নজুমদ্দান, নিকুঞ্জবি চন্দ। পাশ্চমগা, হরিহর আচার্য্য। রূপসা, গগনচঃ সেন। বাজাপ্তী, কালীকু সেন। উত্তর হরিণা, কালীকু দত্ত। শ্যামগ্রাম, উমেশচঃ ভট্টা। কসবা, মহিমচঃ দত্ত। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, রামসুন্দর নাথ, চাঁদ মিঞা, ছন্দুর আলী।

দ্বিতীয় বিভাগ।—কুমিল্লা, দীনবন্ধু চৌধুরী। কমলপুর, আছিমদ্দিন। কুমিল্লা-বঙ্গবিঃ, ওসমান আলী। গণেশপুর, নন্দকু দত্ত। কুমিল্লা-গিরি, আবদুল ছোবান। হায়দারচর, শ্যামাকান্ত চক্র, কৈলাশচ চক্র। দামোদরদী, মতহর খাঁ। বাজাপ্তী, কামিনীকু দত্ত। হরিণা, হরিমো চট্টো, গোবিন্দচঃ শীল। উত্তরহরিণা, বরদাচ চক্র। চালিতাতলী, মদনমো দাস। সাপলেজা, কৃষ্ণকু দে, হরিশ্চন্দ্র দত্ত, গিরিশচ দত্ত। সাইসাঙ্গা, রাসবি সোম। পাইকপাড়া, গিরিশচ বসু, গোবিন্দচ দে। কড়ৈতলী, মনোমো দত্ত, নন্দকুমার দে, রাজকু মজুমদার। শ্যামগ্রাম, প্রভাতচঃ ভট্টা, নবীনচঃ মহত্ব। বিটঘর, রমাকান্ত নাগ, হেমন্তকু ঘোষ। কসবা, ডেঙ্গুচরণ মহত্ব। সুলতানপুর, অধরচঃ দে। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, কেরামত আলী, রজনীকান্ত কর্ম্মকার, তিলকচঃ দাস, হরেন্দ্রচঃ চক্র, রসরাজ শর্ম্ম, গগণচঃ কর্ম্মকার, নজফ আলী। ধরমণ্ডল,

কুমুদিনীনা চক্র, উমেশচঃ কর। সুবিল, জয়কু চক্র। চন্দনাইল, রামচঃ চক্র।

তৃতীয় বিভাগ।—কনকপুর, দীননাথ দাস শরৎচঃ চন্দ। কুমিল্লা বঙ্গাবং, কারেশ্বর গুপ্ত ডিঙ্গোড়া, কেলাস সেন। গণেশপুর-বঙ্গ, মাধব চঃ দে। গণেশপুর, রাজমো দে। কুমিল্লা-গিরি, মনোহর আলী, রহিমবক্স, ফজলে রহমান, নবীনচঃ দত্ত। বুধহর, আনন্দচঃ দাস। চৌদ্দ-গ্রাম, লুৎফে অলী, চন্দ্রকু মুখার্জী, কামিনীকু সেন। রুপসা, আবদুল হামিদ। হানারচর, গিরিশচঃ নজু। দুর্গাপুর, রজনী দাস। দামোদরদা, হরচঃ চক্র। মতলগঞ্জ, শ্রীনাথ গোপ, দেবীচ হালদার। বাজাপ্তী, গুরুপ্রসাদ দত্ত। হরিণা, গুরুপ্র চক্র, কামিনীকু চক্র। উত্তর হরিণা, হরিশচন্দ্র দে। সাইনাঙ্গা, রজনীকা দত্ত। পাইকপাড়া, বসন্তকু দাস। কড়ৈতলা, গোবিন্দচঃ শীল, কালাচঃ দত্ত. ঈশ্বরচঃ চন্দ। বিদ্যাকূট, কালীকু ভট্ট। লক্ষ্মীগঞ্জ, রজনীমো ভট্ট। বিটঘর, নালমো ঘোষ। কশকু ভট্ট। তারিণী দে, পাঞ্জত আলী। নাছিরাবাদ, শ্রীশচঃ সেন, নগেন্দ্রচঃ সেন, মহেন্দ্রচঃ চক্র। জয়নগর, ছৈয়দ আলী। শিবপুর, পূর্ণশশী ভট্ট, নবদ্বীপচঃ চক্র। কৃষ্ণনগর, অশ্বিকু দে। নবীনগর, ঈশ্বরচঃ দাস। সরাইল অন্নদা, উমেশচঃ ভদ্র, আবদুল নুরখাঁ, আনন্দকি চৌধুরী। সুলতানপুর, শ্যামাচঃ নন্দী। আড়াইসিধা, আহম্মদ উল্লা। মোহারী, মনোমো সেন বিশ্বাস। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া কামিনী দাস, পূর্ণচঃ চক্র। হরিপুর, প্রকাশচঃ দে। ফান্দাউক, অঘোরচঃ দে। আমিরাবাদ, পূর্ণচঃ দে, অশিনীকু দে, শরচ্চঃ গুপ্ত। সুবিল, শশীমোহন সিংহ। আটিয়াখলা, জগদীশচঃ দে। শ্রীকাইল, পূর্ণচঃ দে, নবীনচঃ শীল (১)। চন্দনাইল, মহেন্দ্রচঃ দত্ত, প্রকাশচ ঘোষ, হরিদাস গুহ। ফতেয়াবাদ, চন্দ্রকুমারদাস। প্রাইবেট—তারকচ দে (১)।

জেলা চট্টগ্রাম।—প্রথম বিভাগ।—হাজারি, নিবারণ সেন। চট্টগ্রাম, মহাম্মদ আবদুল ওয়াজ। চট্টগ্রাম-বঙ্গ, ছমিউদ্দিন। আনোয়ারা, রাজকু ভট্টা। অলিরহাট, নগেন্দ্র চৌধুরী। হাসিমপুর, শ্যামাচ সরকার। মীরেশ্বরী, বংশীবদন নাথ। কুমিরা, উমাচ বণিক।

দ্বিতীয় বিভাগ।—সাকপুরা, রামচন্দ্র সেন। হাজারি, সুবলচ দে, যোগেন্দ্রচ গুহ। চট্টগ্রাম, দ্বারিকানা চৌধুরী, মোহিনীমো মিত্র। সরোয়াতলী, নূতনচ বড়ুয়া, কামিনীমো বড়ুয়া, রাজকুমার প্যারিয়াল, পরমলাল সেন, রমেশচ চক্র। সুলতানপুর, রমেশচ পাল। নানুপুর, মহাম্মদ ইজহাক, শ্রীমন্ত বড়ুয়া। সীতাকুণ্ড, ক্ষীরোদচ দে (২)। ফতেয়াবাদ, বামাচ দেব। চট্টগ্রাম-বঙ্গ, বঙ্গচ দাস। কধুরখীল, নগেন্দ্রচ দত্ত। ধলঘাট, সারদাচ চৌধুরী। সুচক্রদণ্ডী, বিহারিমো সেন, মহেন্দ্রচ বিশ্বাস। আলরহাট, মনোমো বিশ্বাস। খিতাপচর, রমেশচ সেন। জুবিলী, দীনবন্ধু দত্ত। আলমপুর, শ্যামাচ দে। দাক্ষিণভূর্ষী, গুরুদাস সর্দ্দার। কদলপুর, উমাচ রাহা। মীরেশ্বরী, প্রসন্নকু সিংহ, দীনবন্ধু পাল। মারেশ্বরী, বঙ্গচ নাহা। পাহাড়তলী, কাশীচ বল। কুমারা, রজনীকা বিশ্বাস, গগনচ দে। এনায়তপুর, উপেন্দ্র নাথ। হাড়ভাঙ্গা, আহাম্মদ কবীর।

তৃতীয় বিভাগ।—হাজারি, চন্দ্রকুমার চক্র, মাহাং নুরল হক, দিগম্বর দে, অভয়চ বৈদ্য, অন্নদাচ সেন, অতুলচ দে। চট্টগ্রাম, বিপিনচ গুহ, নুরদ্দিন, হেমেন্দ্রলাল সেন, যমুনা দে। সারোয়াতলী, যাত্রামো দাস, রাজচ শর্ম্মা, উমাচরণদাস। সুলতানপুর, নবীনচ নন্দী, ব্রজমো বিশ্বাস, নাজির আলী। সীতাকুণ্ড, ক্ষীরোদচ দে (১), সীতানাথ চক্রবর্ত্তী, গোপালকৃষ্ণ শীল। ফতেয়াবাদ, নুর আলী, সাগরচ পাল, শ্যামাচ দত্ত। পরাগলপুর, ক্ষীরোদচ সেন, শরচ্চন্দ্র নাথ, কেরামত আলী। চট্টগ্রাম, মহাম্মদ আবদুল খাঁ, অন্নদা দে. বঙ্গ ধর, মকবুল আহাম্মদ। কধুরখীল বঙ্গ, হরকুমার শীল, ভুবনমো দত্ত, রজনীকা বিশ্বাস, জগদ্বন্ধু পোদ্দার। চট্টগ্রাম-বা, নিরুপমা দত্ত ধলঘাট, শামাচ সেন। সুচক্রদণ্ডী, অন্নদাচ গুহ। সাতবাড়িয়া, রজনীকা চক্র। চক্রশালা, পূর্ণচ চৌধুরী, তারাচ ভট্ট। খরন্দীপ, গোবিন্দচ শর্ম্মা, আবদুল রহেমান, সারদাচ বসু। জুবিলী, শশিকু দে। দক্ষিণভূর্ষী রজনীকা চৌধুরী। হাসিমপুর, ঈশ্বরচ বড়ুয়া। কদলপুর, প্রতাপচ ধর, শেখফল কবির। মারেশ্বরী, উমেশচন্দ্র রায়। মীরেশ্বরীআ, নন্দকু মালাকার। পাহাড়তলী, প্রতাপচ শর্ম্মা। ঢাকাখালী, বেণীমাধব গুহ, রমেশচ শর্ম্মা। এনায়তপুর, আবদুলবাড়ী। মহাবিরহাট, রাজমঙ্গল বড়ুয়া। প্রাইবেট, রসিকচ দত্ত, অভিমন্যু বড়ুয়া, নগেন্দ্র গুহ, রাজকু দে, গিরিশচ দে, রামকু চক্র, রজনীকা গুপ্ত।

অনুসন্ধান

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

৩য় খণ্ড] ৩১এ বৈশাখ, ১২৯৭ সাল। [১৯শ সংখ্যা।

সংসারের অনিত্যতা।

(সাধকের উপদেশ)

(গীত।)

"জীবন-যৌবন, মানস-মোহন,
রমণী-রতন, সঙ্গে যা'বে না।
নয়ন-রঞ্জন, সুন্দর বসন,
মোহন ভূষণ, অঙ্গে র'বে না।
ত্যজিলে এ ভব, পড়ি' র'বে সব,
পার্থিব বিভব, সাথী হ'বে না।
সুন্দর গঠন, তব সে ভবন,
ল'বে অন্য জন, সঙ্গে যা'বে না।
যা'রে বন্ধু বলি' দিয়াছ সকলি,
সে প্রাণ পুতলি, ফিরে চা'বে না।
দাস-দাসী যত, কাঁদিবে নিরত,
পিতা-মাতা মত ; সঙ্গে র'বে না।
নির্ব্বাণ-জীবনে, ত্যজিলে স্বজনে,
কেহ সে জীবনে, সাথী হ'বে না।
সেই ব্রহ্ম ভিন্ন, বিশ্ব-পিতা ভিন্ন,
নিকটেতে অন্য, কেহ র'বে না।
তাই বলি মন! বিষয়-ব্যসন,
এ নিত্য জীবন, চির র'বে না।
ত্যজিয়ে এ ভব, পার্থিব বিভব,
সঁপ তাঁ'রে সব, কষ্ট পা'বে না।"

বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাস।

(১)

বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাস আমাদিগের প্রাচীন কবি। এই দুইজন হইতেই বঙ্গের গৌরব কিছু অধিক। যে কবিত্ব-কল্পনা ও প্রেম-সৌন্দর্য্যে জয়দেব বঙ্গের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, সেই সৌন্দর্য্য ও কল্পনা লইয়াই বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসের জীবন।

রাধাকৃষ্ণের প্রেম-কীর্ত্তনই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র সাধনা। জয়দেব সঙ্গীত রচনা করিলেন ; আর বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাস সেই সুর ধরিয়া ললিত-পঞ্চমে কণ্ঠ মিলাইয়া এমনি গাহিলেন যে, প্রাণ ভরিয়া গেল, ভক্তের হৃদয়ে ভক্তির উচ্ছ্বাস তুলিল ; কেবল মিথিলা ও বঙ্গদেশ কেন, সমগ্র ভারতবর্ষ সেই স্বরে প্লাবিত হইল। বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসের সেই মধুর স্বর-লহরী, সেই মনোমুগ্ধকর প্রাণস্পর্শী অমৃত-সঙ্গীত—আজিও তাই আমাদিগের কর্ণে নূতন, আজিও সে সঙ্গীত বঙ্গের কাননে তাই প্রভাত-সন্ধ্যায় প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে। প্রাচীন কবিদিগের হৃদয় প্রেমে পূর্ণ—তাঁহারা এই ধরণীর সকল সামগ্রী অপেক্ষা প্রেম কিছু ভাল বুঝিতেন। সেই জন্যই তাঁহাদের চরিত্রে প্রেমের

উৎকর্ষ অধিক দেখা যায়। বৈষ্ণব কবিদিগের সহিত প্রেম-সঙ্গীতে আজি-পর্য্যন্তও কেহই সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। জগতে তাঁহাদিগকে অদ্বিতীয় বলিলেও বলা যায়। বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাস প্রেম-সঙ্গীতে জগত মাতাইয়াছেন। জগতে ভাল সামগ্রীর আদর কখনও কমে না; যাহা সুন্দর, যাহা মধুর, যাহা সত্য, চিরদিনই তাহার আদর থাকিবে; মনুষ্যের নিকট তাহা চিরদিনই নূতন—চিরদিনই প্রীতিকর। বৈষ্ণব কবিদিগের অমৃতময় লেখনী-প্রসূত প্রেম-সঙ্গীতই তাঁহাদের অপূর্ব্ব গুণপনার পরিচয়, ও চিরদিনের অত্যুজ্জ্বল কীর্ত্তি।

পৃথিবীতে চিরদিনই জীবন-চরিতের অভাব। মনুষ্য যতদিন চক্ষের সম্মুখে থাকে, ততদিন তাহাতে সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য কিছুই অনুভব করা যায় না। তাহাতে ভালবাসিবার কিছুই দেখা যায় না—তাহার জন্য প্রাণ কাঁদে না। কিন্তু চক্ষের অন্তরাল হইলেই যত সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়; একেবারে মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে। বিরহ না হইলে মিলনের কি সুখ, তাহা অনুভব করা বড় কঠিন। সেক্ষপীর, হোমর অনেক দিন গত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের জন্য আজিও ইংরাজগণ কাঁদিয়া আকুল। কালিদাস, মাইকেল ও বিদ্যাপতি আর নাই; তাই বঙ্গবাসী আজি তাঁহাদের জন্য অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইতেছেন। ইহা কি কম আক্ষেপের বিষয়? তবে ইতিহাস হইতে, প্রস্তর-খোদিত অক্ষর হইতে, কীটদষ্ট পুঁথি হইতে, যে সকল বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা অনন্ত সমুদ্রের এক বিন্দুমাত্র। কবি-হৃদয়ের বিস্তৃত পরিচয়ের অতি ক্ষুদ্র আভাষও তাহাতে সম্পূর্ণ নাই। যে দু'একটা কথা জানা গিয়াছে, তাহাও এতদূর রঞ্জিত যে, মনুষ্য-সমাজে নিতান্ত অলৌকিক ও অমানুষিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। সে সকল বিবরণ হইতে সমাজের বড় বেশী উপকার হয় না। ইতিহাস কিম্বা জীবনচরিতের প্রতি আদর থাকিলে আজি ভারতবর্ষের এ সর্ব্বনাশ ঘটিত না। রাজপুত-মহিলার সতীত্ব কাহিনী—পৃথ্বীরাজ-সমরসিংহের বিজয়-গৌরব—জয়মল্ল ও পুত্তের ভেরী-নিনাদ—প্রতাপসিংহের অপূর্ব্ব বীরত্ব—সতীর চিতারোহণ—জহরত-ব্রতের অনুষ্ঠান প্রভৃতি রাজস্থানের বিবরণ যদি ইংরাজ-ইতিহাসবেত্তা মহাত্মা টড্ আমাদিগের কর্ণের নিকট না শুনাইতেন, বোধ হয়, তাহাহইলে সে সকল চিরদিনের মত অন্ধকারেই পড়িয়া থাকিত। বাঙ্গালী-কর্ত্তৃক যে তাহার উদ্ধার হইত, এমন আশা এখনও করা যায় না। এডুইন আরর্ণল্ড সাহেব 'লাইট্ অব্ এসিয়া' বা বুদ্ধদেব-চরিত রচনা করিলেন; বাঙ্গালী আজিও বুদ্ধের জীবনী লিখিতে বসিলে তাহার ছায়া ব্যতীত পুস্তক প্রণয়নে সাহসী হয়েন না। ইহা বাঙ্গালীর গৌরবের বিষয় যে, তাহাতে আর সন্দেহ কি! যাহাহউক, এখন যে কথা বলিতে বসিয়াছি, অগত্যা সেই কথাটা বলাই ভাল। বাজে কথায় আর কাজ নাই।

বিদ্যাপতি কোন সময়ের লোক, কোথায় তাঁহার জন্ম বা কতদিন পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, তাহা ইতিহাসে লিখিত নাই। সুতরাং তাহার এপর্য্যন্ত কিছু নিরূপণও হয় নাই। তবে পাঁজি-পুঁথি উল্টাইয়া, কসিয়া-মাজিয়া হিসাব করিয়া, এই পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে যে, বিদ্যাপতি মিথিলা-অঞ্চলের লোক ও চৈতন্য-দেবের পূর্ব্বে তিনি জন্মগ্রহণ করেন; এবং অনুমান প্রায় ৯০ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। বিদ্যাপতি কৃষ্ণপ্রেমে পাগল, আর চৈতন্যদেবও কৃষ্ণপ্রেমের পাগল। পাগলে-পাগলে কাজেই মিশিয়াছিলও বড় ভাল।

বিদ্যাপতি প্রেমের কবিতা রচনা করিতেন, আর চৈতন্যদেব তাহাই শুনিতেন। বিদ্যাপতির কবিতা সে সময়ে লোকে বড় পছন্দ করিত। একদিকে কৃষ্ণরাধার প্রেম, অপর দিকে বিদ্যাপতির সরস লেখনী। তখন বিদ্যাপতি যে জনসাধারণের নিকট প্রিয়পাত্র হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসের কবিতা-সম্বন্ধে দুই এক জন এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন,—

"জয় জয় দেব-কবি নৃপতি-শিরোমণি
বিদ্যাপতি রসধাম।
জয় জয় চণ্ডিদাস রসশেখর
অখিল ভুবনে অনুপাম।
যা' কর রচিত মধুর রস নিরমল
গদ্য-পদ্যময় গীত।
প্রভু মোর গৌরচন্দ্র আস্বাদিলা
রস স্বরূপ-সহিত।
যবহু যে ভাব উদয় হুঁহু অন্তরে
তব গায়হি হুঁহু মেলি।
শুনইতে দারুণ পাষাণ গলি যায়ত
ঐছন সুমধুর কেলি।
আছিল গোপতে যতন করি গহুঁ মোর
জগতে করল পরকাশ।
সো রস শ্রবণে পরশ নাহি হোয়ল
রোয়ত বৈষ্ণবদাস।"

বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসের সুমধুর সঙ্গীতে পাষাণ দ্রব হইত। এই কবিতা পাঠে বুঝা যায় যে, কবি চণ্ডিদাস বিদ্যাপতির সম-সাময়িক। যেহেতু উভয়ের নাম এক সঙ্গে গাত ইয়াছে। বিদ্যাপতি যে সময়ের লোক, সেই সময়ে মিথিলায় শিবসিংহ নামে একজন অতি কীর্ত্তিমান পুরুষ রাজত্ব করিতেন। মৈথিলগণ মহারাজ শিবসিংহকে অতি সম্মান করিতেন; ও তাঁহাকেই কেবলমাত্র সিংহাসনের উপযুক্ত রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। মিথিলাবাসীদিগের মহারাজ শিবসিংহের প্রতি বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল। এজন্য মিথিলায় আজি পর্য্যন্ত এই প্রবাদটি প্রচলিত আছে,—

"পোখুরি রজোখরি অরু সব পোখ্‌রা।
রাজা শিবসিংহ অরু সব ছোক্‌রা।"

অর্থাৎ রাজখনিত পুষ্করিণীই যথার্থ পুষ্করিণী, আর সকলি ডোবা। রাজা শিবসিংহ রাজাই রাজা, আর সকলেই অতি সামান্য লোক। দ্বারভাঙ্গায় শিবসিংহ নরপতির আমলের পাঁচটি পুষ্করিণী আছে; তন্মধ্যে "গঙ্গাসাগর" নামে পুষ্করিণীটিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান।

রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র যেরূপ নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্ ছিলেন, আমাদিগের কবি বিদ্যাপতিও সেইরূপ সম্মানের সহিত নরপতি শিবসিংহের সভায় স্থান পাইয়াছিলেন।

ভারতচন্দ্র যেমন লিখিয়াছেন,—

"আজ্ঞা দিল কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী-ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥"

সেইরূপ দেবকবি বিদ্যাপতিও তাঁহার কবিতার ভণিতায় লিখিয়াছেন,—

"তোহারি বিরহে দীন ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণ
চৌদশী চাঁদ-সমান।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শিবসিংহ নরপতি
লছমী দেবী পরমাণ।"

তাঁহার কবিতার অন্য এক স্থলে আবার এইরূপ ভণিতা দেখা যায়,—

"বিদ্যাপতি কহ ভাখি,
রূপনারায়ণ সাখি।"

এই সকল ভণিতায় বুঝিতে হইবে, বিদ্যাপতি শিবসিংহ নরপতির সভাসদ্ ছিলেন; এবং রূপনারায়ণ বলিয়া নৃপতির এক সখা ছিল। কিন্তু আবার বিদ্যাপতির অন্যস্থলে এইরূপ ভণিতা দৃষ্ট হয়,—

"ভণয়ে বিদ্যাপতি অপরূপ মূরতি
রাধারূপ অপারা।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
একাদশ অবতারা।"

ইহাতে শিবসিংহ ও রূপনারায়ণ যে একব্যক্তি, এইরূপই অর্থ হইয়া থাকে। শিবসিংহ ও

রূপনারায়ণ পৃথক বলিয়া বোধ হয় না। ভিন্ন হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহার প্রমাণ নাই।

পঞ্জিগ্রন্থে জানা যায়, শিবসিংহ নরপতি সাড়ে তিন বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। যাঁহাকে বিদ্যাপতি লছমী দেবী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সেই লক্ষ্মী দেবীই তাঁহার মহিষী। দেবসিংহ তাঁহার পিতা ছিলেন।

পঞ্জিগ্রন্থে দেবকবি বিদ্যাপতিরও কিছু পরিচয় লিখিত আছে। তাঁহার পিতার নাম গণপতি, পিতামহের নাম জয়দত্ত ও প্রপিতামহের নাম ধীরেশ্বর। বিদ্যাপতির পরবর্ত্তী বংশের আর উল্লেখ নাই। বিদ্যাপতি একজন সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায় কর্ত্তৃক বিদ্যাপতির কবিতা ও গ্রন্থ-সকল অনুবাদিত হইয়াছিল। বিদ্যাপতি সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচখানি পুস্তক প্রণয়ণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে তাঁহার প্রথম গ্রন্থ 'পুরুষ পরীক্ষা' সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। দ্বিতীয়—'দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিনী', তৃতীয়—'দানবাক্যাবলী, চতুর্থ—'বিবাদসার,' পঞ্চম—'গয়াপত্তন।' চণ্ডিদাস বিদ্যাপতির সম-সাময়িক কবি ছিলেন। চণ্ডিদাস জাতিতে ব্রাহ্মণ। বীরভূম-প্রদেশস্থ নান্নুর-গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল। চণ্ডিদাস প্রথমে একজন বামাচারী ছিলেন। তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রতিমা বিশালাক্ষি দেবীর আদেশে তিনি বৈষ্ণব হইয়া যান। চণ্ডিদাস অতিশয় মদ্যপান করিতেন। এজন্য সাধারণ লোকে তাঁহাকে "চণ্ডে মাতাল" এই নামেই ডাকিত। আরও এক কিম্বদন্তী আছে যে, 'রামী' বলিয়া এক নীচবংশীয়া স্ত্রীলোক তাঁহার উপনায়িকা ছিল। বৈষ্ণব হইয়া অবধি চণ্ডিদাস এসকল পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল।

চণ্ডিদাস যে বীরভূম-প্রদেশের লোক এবং নান্নুর-গ্রামে তাঁহার নিবাস, সে সম্বন্ধে কোন কোন প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়। নিম্নোদ্ধৃত এই একটী কবিতাও তাহার পরিচয়। যথা,—

"নান্নুরের মাঠে, গ্রামের হাটে,
বাসুলী আছয়ে যথা।
তাঁহার আদেশে, কহে চণ্ডিদাস,
সুখ যে পাইব কোথা।"

তদ্ভিন্ন, অদ্যাপিও নান্নুর-গ্রামে তাঁহার গৃহের ভগ্নাবশেষ ও বিশালাক্ষি বা বাসুলি দেবীর প্রস্তর-খোদিত প্রতিমূর্ত্তি লক্ষিত হয়।

চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি উভয়েই এক সময়ের লোক—উভয়েই কবি—উভয়েই কৃষ্ণ-প্রেমে প্রেমিক। কৃষ্ণপ্রেমে দু'জনারই সমান অধিকার। দেবকবি বিদ্যাপতি চণ্ডিদাসের কবিত্বশক্তি ও গুণপনার পরিচয় পাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে মানস করিয়াছিলেন। এইরূপ প্রবাদ আছে,—সুরধনী-তীরে কবিদ্বয়ের সাক্ষাৎ হয়। কবির সহিত কবির মিলন—প্রেমিকের সহিত প্রেমিকের পরিচয়, ইহাপেক্ষা আর সুখের কি আছে? সেই সুরধনী-তীর ও উভয় কবির অপূর্ব্ব মিলন উল্লেখ করিয়া কতকগুলি কবিতা রচিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে এই একটি,—

"চণ্ডিদাস বিদ্যাপতি দুইজন পীরিতি
প্রেম-মূরতিময় কাঁতি।
যে করিল দুইজন লীলা-গুণ বর্ণন
নিতি নিতি নব নব ভাতি।
দুঁহু গুণ শুনি চিত দুঁহু উৎকণ্ঠিত
দুঁহু দোঁহা দরশন লাগি।
দোঁহার রসিক পণ শুনি শুনি দুই জন
দুঁহু হিয়ে দুঁহু রহু জাগি।
নিজ নিজ গীত লেখি বহু ভেজল
তাহে অতি আরতি ভেল।
রাধা-কানুক প্রেমরস কৌতুক
তাহে মগন ভৈগল॥"

আর এক স্থলে এইরূপ আছে,—

"সময় বসন্ত, যামদিন মাঝহি
বটতলে সুরধনী-তীর।
চণ্ডিদাস কবিরঞ্জনে মিলল
পুলকে কলেবর গীর॥
দুঁহুজন ধৈরজ ধরই না পার
সঙ্গে রূপনারায়ণ কেবল॥"

এই স্থানে উভয় কবির প্রথম পরিচয় আরম্ভ। সমান বিষয় লইয়া দুইজনের কবিতা। রাধাকৃষ্ণের বিরহ, মিলন, পূর্ব্বরাগ ও অভিসার—এই একই জিনিসের উপর দুই জনের লক্ষ্য। কিন্তু তথাপি উভয়ের কবিত্ব-কল্পনা, রচনা-পরিপাট্য ও ভাষা-প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

এক জিনিসের উপর উভয়ের সমান দখল, এক সামগ্রী লইয়াই দুইজনের কবিতা, এক চিত্রই দুইজনে আঁকিতে বসিয়াছেন। কিন্তু মনের ভাবে, কল্পনার বলে, তুলিকার তারিফে, হাতের কায়দায় উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক কিছু দূর হইয়া পড়িয়াছে; আর চিত্রও সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের! বিদ্যাপতিও রাধিকার সেই রূপ, সৌন্দর্য্য ও বিরহ বর্ণনা করিলেন; আর চণ্ডীদাসও তাই করিলেন। তবু দু'জনার মধ্যে কি বর্ণনা-কল্পনার প্রভেদ! কবি-হৃদয়ের এ ভাব—এ সৌন্দর্য্য বড়ই চমৎকার!

রাধার মনোমোহিনী মূর্ত্তি, মনভুলান প্রাণ-কাঁদান শ্যামের বাঁশী, যমুনার তীর, বসন্তে বিরহ, নির্ম্মল আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ—এই একই সামগ্রী উভয়ে লিখিলেন; কিন্তু কি আশ্চর্য্য ক্ষমতার পরিচয়! বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাস উভয়েই রাধার রূপ খুলিয়া বসিয়াছেন; উভয়েই রাধার রূপে মজিয়াছেন। কিন্তু উভয়ের প্রাণে কি ভিন্ন ভিন্ন ভাবের স্ফূর্ত্তি! কেবল যে ভাবের তফাৎ, তাহা নহে—ভাষারও বিস্তর তফাৎ আছে।

রাধিকার বিরহে চণ্ডিদাস শ্রীমতীর মনোভাব এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

"কি বুকে দারুণ ব্যাথা!
যে দেশে যাইব সে দেশে না শুনি
পাপ পিরীতির কথা॥
সই, কে বলে পিরীতি ভাল?
হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া
কাঁদিয়া জনম গেল॥
কুলবতী হৈয়া কুলে দাঁড়াইয়া
যে ধনী পিরীতি করে।
তুষের অনল যেন সাজাইয়া
এমতি পুড়িয়া মরে॥
হাম অভাগিনী এ দুঃখে দুখিনী
প্রেমে ছল ছল আঁখি।
চণ্ডিদাস কহে যেমতি হইল,
পরাণ সংশয় দেখি।"

আর এক স্থলে কবি বলিতেছেন,—

"রাধার কি হলো অন্তরে ব্যথা!
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারও কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে
যেমন যোগিনী পারা।
এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনী
দেখয়ে খসায়ে চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে মেঘপানে
কি কহে দু'হাত তুলি॥
এক দিঠ করি ময়ূর ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডিদাস কহে নব পরিচয়
কালিয়া বঁধুর সনে॥"

চণ্ডিদাসের হাতে বিরহিণী রাধিকার মূর্ত্তি ও আক্ষেপ বড়ই সুন্দর হইয়াছে। কল্পনা ও কবিত্বে বিষাদিনী মূর্ত্তির প্রতিরূপ ইহাপেক্ষা অধিক কি হইতে পারে? চণ্ডিদাসের এ চিত্র বড়ই সুন্দর। ভাষার লালিত্বে নায়িকার পূর্ব্বরাগ অতি উজ্জ্বলভাব ধারণ করিয়াছে। কথার ছন্দে ছন্দে, কবিতার মর্ম্মে মর্ম্মে, ভাষার মধ্য দিয়া, যেন অতর্কিত ভাবে একটা বিষাদের স্রোত বহিয়া গিয়াছে! প্রাণ উদাস—হৃদয় উদাস

—সংসারে যেন মন নাই—সংসারে যেন আর মন বসে না! এইই ত বিরহের আদর্শ ছবি!

আর এদিকে বিদ্যাপতিও তাই লিখিতেছেন। প্রেমোন্মাদিনী বিরহিণী রাধার মনোভাব এইস্থানেও বেশ সম্পষ্ট,—

"সজল নয়ান করি, পিয়া-পথ হেরি হেরি
তিল এক হয় যুগ চারি।
বিধি বড় নিদারুণ, তাহে পুন ঐছন,
দুরহি কয়হি মুরারি॥
সজনি! কিয়ে করব পরকার।
কি মোর করম-ফলে, পিয়া গেল দেশান্তরে,
নিতি নিতি মদন-ঝঙ্কার॥
নারীর দীর্ঘ-নিশ্বাস, পড়ুক তাহার পাশ,
পিয়া মোর যার পাশে বৈসে।
পাখী জাতি যদি হও, পিয়াপাশে উড়ি যাও,
সব দুঃখ কহোঁ তছু পাশে॥
আনি দেই মোর পিউ, রাখয়ে আমার জিউ,
কো ইহ করুণাধান।
বিদ্যাপতি কহ, ধৈরজ ধর চিত,
তুরিত হি মিলব কান॥"

আর এক স্থানে মাধব-বিরহে রাধিকার মনোভাব ও অবস্থা এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন,—

"কুসুমিত কানন হেরি কমল-মুখী
মুদি রহয়ে দু'নয়ান।
কোকিলক কলরব মধুকর-ধ্বনি শুনি
কর দেহ ঝাঁপয়ে কান॥
মাধব শুন বচন হামারি!
তুয়া গুণে সুন্দরী অতি ভেল দুবরি
গুণি গুণি প্রেম তে'হারি॥
ধরণী ধরিয়া ধনি কত বেরি বৈঠই
পুন তহি উঠই না পারা।
কাতর দিঠি করি চৌদিশ হেরি হেরি
নয়নে গলয়ে জলধারা॥
তোহারি বিরহে দীন ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণ
চৌদশী চাঁদ সমান।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শিবসিংহ নরপতি
লছমী দেবী পরমাণ।"

তারাচাঁদ।

(নয়টি পরিচ্ছেদে ক্ষুদ্র উপন্যাস।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রামদয়ালের আশ্রয়দাতা হরিহর বাবু নিতান্ত প্রকৃতির লোক। স্বোপার্জ্জনে তিনি দশটাকার সংস্থান করিয়াছেন; ক্রিয়াকলাপে কলিকাতার সম্ভ্রান্তসমাজে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি-প্রতিপত্তি আছে। তদ্ব্যতীত দান-ধ্যানেও তিনি মুক্ত-হস্ত। তাঁহার পুত্রেরাও উপযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে; বিষয়-কর্ম্ম তাঁহারাই দেখেন-শুনেন। হরিহর বাবু এক্ষণে নিশ্চিন্ত-মনে জীবনের অবশিষ্ট কাল ক্ষেপণ করিতেছেন। অধিকন্তু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি আছে।

রামদয়ালের স্বভাব হরিহর বাবুর আনন্দপ্রদ হইলেও, পরিবার-জনিত অপরাধে অপরাধী বলিয়া, রামদয়াল মামার নিকট আর পূর্ব্বের মে ভাবে মুখ দেখাইতে পারেন না। মামার মন যদিও হইলেও, পুত্রকন্যা-পরিবারের কথাবার্ত্তা ও বাদ-বিশম্বাদে, ভাগিনেয় মনের প্রফুল্লতা হারাইয়াছেন। যদিও মামা মহাশয় এক দিনের জন্য মুখে তাঁহাকে কোন বিরক্তিভাব প্রকাশ করেন নাই, তথাচ অবশ্যই তাঁহার পরিবারবর্গের অত্যাচারে মামার মন যে টলিয়াছে—এ সংস্কার রামদয়ালের মনে দৃঢ় হইয়াছিল।

রামদয়াল মামার সংসারে থাকিয়া যে দুই দশ টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে তারাচাঁদ তলে তলে তাহার সমস্তই নষ্ট করিয়াছিল। রামদয়াল কিন্তু সে সংবাদ পূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই। তিনি জানিতেন যে, গৃহিণী অবশ্যই রাখিয়া দিয়াছে। কিন্তু তারাচাঁদের মাতা সাতিশয় পুত্রবৎসলা; সুতরাং তারাচাঁদ মার নিকট যখন যাহা আবদার করিত, তৎক্ষণাৎ তাহার সে সাধ মিটিত। এইরূপে এবং তারাচাঁদের অন্যান্য অসৎ উপায়ে রামদয়াল এককালে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন।

হরিহর বাবু স্বয়ং যখন বিষয়-কর্ম্ম দেখিতেন, সেই সময়ে রামদয়ালের দশটাকা রোজকার হইত। কিন্তু এখন তাঁহার পুত্রেরা উপযুক্ত হইয়া উঠিয়াছেন—তাঁহারাই সমস্ত কাযকর্ম্ম দেখিয়া থাকেন। অগত্যা উপস্থিত সময়ে রামদয়ালের পূর্ব্বের মত উপার্জ্জন নাই। এদিকে যে দশ টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার কুপোষ্য তারাচাঁদ আত্মসাৎ করিয়া নষ্ট করিয়াছে। রামদয়াল এখন হরিহর বাবুর ভালবাসা খাইতে বসিয়াছেন; রামদয়ালের অনুষ্ঠানের প্রতি জীবন ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নবীনের লক্ষ্য রহিয়াছে। কাযকর্ম্মে দুই পয়সা আয়-উপায় নাই, রামদয়ালের পূর্ব্বের মত মনোযোগও নাই; যাহা না করিলে চলে না, উদরের অন্ন ও পরিধেয় বস্ত্রের জন্য রামদয়ালকে তাহাই করিতে হয়। তাহাতে আবার তিনি বয়োধিক্য-বশতঃ এখন অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন।

রামদয়ালের জ্যেষ্ঠ-পুত্র তারাচাঁদ। তারাচাঁদের পর রামদয়ালের সহধর্ম্মিণী উপর্য্যুপরি দুইটী কন্যাসন্তান প্রসব করিয়াছেন। তৎপরে শ্যামচাঁদ সর্ব্বকনিষ্ঠ। রামদয়ালের স্ত্রী দেখিতে পরম রূপবতী। তাঁহার গর্ভের কন্যা দুইটীও দেখিতে সুন্দরী হইয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ-কায়স্থের গৃহে কন্যাদায় পিতৃমাতৃদায় অপেক্ষাও গুরুতর। দেখিতে দেখিতে দুইটী কন্যাই বিবাহের উপযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। জ্যেষ্ঠার বিবাহ না দিলে আর জাতিরক্ষা হয় না! রামদয়াল কিন্তু এককালে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন। তাহাতে হরিহর বাবুর সম্মুখীন হইয়া যে কন্যার বিবাহের কথা জানাইবেন, সে মুখও নাই। কাজেই তিনি বড়ই বিপদে পড়িয়াছেন; তাঁহার খাওয়া-দাওয়া এককালে রহিত হইয়াছে, বলিলেই হয়; রাত্রিতে নিদ্রা নাই—কিরূপে কন্যাদ্বয়ের বিবাহ হইবে, এই ভাবিয়াই তিনি জীর্ণশীর্ণ হইতেছেন।

হরিহর বাবুর নামডাকে স্থানে স্থানে সম্বন্ধ জুটিতেছে বটে; কিন্তু তাহারা দেনা-পাওনার কথা শুনিয়াই পিছাইতেছে। তাহাতে হরিহর বাবুর পরিবারবর্গের সহিত রামদয়ালের পরিবারবর্গের নিত্য কলহ উপস্থিত হয় শুনিয়া, কেহই তাহাতে তাদৃশ ভরসা করিতেছে না।

একদিন হরিহর বাবু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত লইয়া বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন, নানাবিধ কথা-বার্ত্তা হইতেছে; এমন সময়ে একজন কুলাচার্য্য আসিয়া এককালে হরিহর বাবুর সম্মুখে উপস্থিত হইল। হরিহর বাবু পূর্ণ-হিন্দু। তিনি অভ্যাগত ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া উপবেশনের জন্য আকিঞ্চন করিলেন। কথায়-কথায় ব্রাহ্মণ রামদয়ালের কন্যার বিবাহের কথা উত্থাপন করিল।

হরিহর বাবু যদিও এখন বিষয়-কার্য্যে মনোযোগী নহেন, তথাচ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের প্রতি তাঁহার সম্যক দৃষ্টি। ইতিপূর্ব্বেই এক দিন তিনি রামদয়ালের কন্যার বিবাহের কথা লইয়া মনে মনে আন্দোলন করিয়াছিলেন; এবং এই দুইটী কন্যার বিবাহ-ভার যে তাঁহাকেই বহন করিতে হইবে, তাহাও মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি উপস্থিত ঘটকের মুখে পাত্রের সবিশেষ সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে, রামদয়াল বাবুকে ডাকিয়া আনিবার জন্য জনৈক ভৃত্যকে আদেশ করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে রামদয়াল হরিহর বাবুর বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলেন। এক বাটিতে থাকিয়াও হরিহর বাবুর সহিত রামদয়ালের বহু দিবস দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই। হরিহর বাবুর মনের ভাব যাহাই হউক না কেন, রামদয়াল অনুমানে লজ্জা-বশতঃ দেখা-সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই। এক্ষণে হরিহর বাবু ডাকাইয়া পাঠাইয়াছেন; কাজেই তাঁহাকে উপস্থিত হইতে হইয়াছে। হরিহর বাবু রামদয়ালের

মুখের প্রতি একবার তাকাইলেন; বুঝিলেন যে, রামদয়ালের মুখভাব বিষাদে পূর্ণ। এভাব দেখিয়া তাঁহারও মন বিচলিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি রামদয়ালকে নিকটে আসিয়া বসিতে বলিলেন।

রামদয়াল প্রকৃতই কোন দোষে দোষী নহেন। কিন্তু আজ সংসার-বন্ধনে জড়িত হইয়া সকল অপরাধ মাথা পাতিয়া লইয়াছেন। তিনি হরিহর বাবুর কথায় ধীরে ধীরে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন বটে, কিন্তু মৌনভাবে অবনত-মস্তকে বসিয়া রহিলেন। হরিহর বাবু রামদয়ালের এভাব দেখিয়া কিন্তু বড়ই উৎকণ্ঠিত হইলেন; বলিলেন—"রামদয়াল! আজ তোমার এভাব দেখিতেছি কেন?"

রাম।—মামা! আপনার আশ্রয়ে থাকিয়া আমার এক দিনের জন্যও কোন অভাব নাই। কিন্তু আজ——

রামদয়ালের মুখ হইতে আর কথা নিঃসৃত হইল না; মনোভাব যেন চক্ষুকর্ণ দিয়া বিকাশ পাইতে লাগিল; দরদর-ধারে নয়নযুগল হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। হরিহর বাবু সংসারের সমস্ত ঘটনা সবিশেষ জ্ঞাত না হইলেও, বিচক্ষণতা-বলে সমস্তই বুঝিয়াছিলেন। তিনি রামদয়ালকে রোদন সম্বরণ করিতে বলিলেন। হরিহর বাবুর বিনয়নম্র-বাক্যে রামদয়াল কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন বটে; কিন্তু মুখের ভাবে মনোভাব ব্যক্ত হইল না। হরিহর বাবু তখনও রামদয়ালের মুখের প্রতি তাকাইয়া আছেন; কতক্ষণে রামদয়াল প্রকৃতিস্থ হইবেন, তাঁহার সহিত বিবাহের কথাবার্ত্তা হইবে, সেই সময়ের অপেক্ষা করিতেছেন।

কুলাচার্য্য এই রহস্যের বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারেন নাই। তিনি মনে মনে ভাবিলেন,—"অবশ্যই বিবাহের কথায় এভাব দাঁড়াইয়াছে। তবে কি আমি যাহার সম্বন্ধ করিতে আসিয়াছি, তাহার কোন ভাল-মন্দ ঘটিয়াছে!" ব্রাহ্মণ অমনি অধৈর্য্য হইয়া রামদয়ালকে বলিলেন,—"মহাশয়, সংসারের নিয়মই এই! আপনি বৃথা রোদন করিতেছেন কেন?"

হরিহর বাবুর সহিত রামদয়ালের অন্য কোন কথাবার্ত্তা হইল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

তারাচাঁদ যেদিন হইতে বাটী হইতে বিদায় হইয়াছে, রামদয়ালের গৃহিণী সেই দিন হইতেই মনে মনে দুঃখিত। কিন্তু কি করিবেন? তিনিই পরের বাড়ীতে আছেন; পুত্রের প্রতি বিশেষ মমতা দেখাইতে হইলে, তাঁহাকেই বাটী পরিত্যাগ করিতে হয়! বিশেষতঃ তাঁহার পৈত্রিক কুলেও কেহই জীবিত নাই যে, তারাচাঁদকে মামার বাড়ী যাইয়া থাকিতে বলিবেন। থাকিবার মধ্যে পিতার দ্বিতীয় পক্ষের পরিবার আছেন। কিন্তু তিনি কি আর তারাচাঁদকে মাতামহীর মত যত্ন করিবেন? কখনই না। যে মা কন্যার ভাল-মন্দের সংবাদ লন না, তাঁহার কাছে কি তারাচাঁদ ঠাঁই পাইবে? ভাবিলেন,—বিমাতা ঠাকুরাণীর নিকট লোক পাঠাইয়া সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইবার সম্ভাবনাই বা কই? বিশেষতঃ ছেলেও সুবোধ নহে! এই সকল ভাবিয়া-চিন্তিয়া তিনি নিরস্ত হইয়াছেন। কিন্তু তবুও মার প্রাণ—থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠে! অভাগিনীর মনের দুঃখ মনেই মিলাইয়া যায়, সে কথা কাহার নিকটেই বা প্রকাশ করেন?

এক দিবস তিনি গৃহকর্ম্ম সারিয়া বসিয়া আছেন, শ্যামচাঁদ স্কুল হইতে আসিল। শ্যামচাঁদ অন্যান্য দিন বিদ্যালয় হইতে আসিয়া পাঠগৃহে পুস্তকাদি রাখে; কাপড় চাদর ছাড়ে। কিন্তু আজ শ্লেট-বই লইয়া মার নিকট উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই তিনি ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শ্যাম, আজ তুমি এখনও কাপড় ছাড়-নি কেন?"

শ্যাম।—মা দাদাকে একজন পাহারওলা ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

মা।—কেন?—কি হয়েছে?

শ্যাম।—মা! তাও আমি জানি না। আমি পথে আসিতে আসিতে দাদাকে দেখিলাম। মা! পাহারাওলা সাহেব দাদার হাতে হাত-কড়ি দিয়াছে।

মা।—বাবা! সে কি কথা! কেন, পাহারাওলাকে জিজ্ঞাসা করিলে না?

শ্যাম।—হাঁ মা, আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম কিন্তু সে কিছুই বলিল না। লোকের মুখে শুনিলাম, কন্‌সাটের দলের ছেলের সঙ্গে কি মারামারি করিয়াছে।

মাতা-পুত্রে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে পুলিশ হইতে তারাচাঁদের জামিনের জন্য একজন জমাদার হরিহর বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইল। তারাচাঁদের সৌভাগ্য-বশতঃ হরিহর বাবু তখন বৈঠকখানায় বসিয়াছিলেন। তারাচাঁদ তাঁহার ঘরের ছেলে—খাইয়া-দাইয়া মানুষ হইয়াছে; স্বভাব-দোষে যদিও খারাপ হইয়াছে, তথাচ তাঁহার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া পুলিশ-সুপারিটেণ্ডেণ্টের নামে একখানা চিঠি লিখিলেন। বলা বাহুল্য, সেই পত্রের জোরেই তারাচাঁদ সে বার কারাগারের ভীষণ যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি-লাভ করিল।

মা'র প্রাণ কিছুতেই শান্ত না মানে না। শ্যামচাঁদ বলিল,—"দাদা ফিরিয়া আসিয়াছে।" রামদয়াল বলিলেন,—"বড় কপালের জোর, তাই মামার দয়ায় এ ক্ষেপ বাঁচিয়া গেল।" তথাচ কিছুতেই রামদয়ালের পত্নীর মনে কিন্তু প্রবোধ মানিল না। তিনি যাহাকে দেখেন, তাহাকেই তারাচাঁদের কথা জিজ্ঞাসা করেন।

রামদয়াল এখন জ্যেষ্ঠ কন্যার বিবাহ লইয়া ব্যস্ত আছেন। যে দিবস হরিহর বাবুর সহিত তাঁহার দেখা-সাক্ষাৎ হয়, যদিও তখন লজ্জা-বশতঃ সেদিন বিবাহের কোন কথা-বার্ত্তা হয় নাই, সেই দিন হইতে রামদয়ালের মনে আর তত ভয় নাই। আগে আগে মামার সহিত তিনি যেরূপ দেখা-সাক্ষাৎ করিতেন, এখনও সেইরূপ হইতে লাগিল। হরিহর বাবু রামদয়ালের পরিবারবর্গের আচার-ব্যবহার সম্যক অবগত ছিলেন। তথাপি একজন আশ্রিত ব্যক্তি তাঁহার সংসারে থাকিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, তাই আপনার সামান্য স্বার্থের প্রতি উদাসীন হইয়া, তাঁহাকে কোন কথাই বলেন নাই।

কিন্তু মনে মনে হরিহর বাবু স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহার জীবনান্তে রামদয়াল কদাচ পরিবারবর্গ লইয়া, তাঁহার সংসারে সুখে কাল কাটাইতে পারিবে না। অবশ্যই তাঁহাকে আশ্রয়হীন হইতে হইবে। এজন্য রামদয়ালের কন্যাদ্বয়কে পাত্রস্থ করিবার নিমিত্ত তিনি বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন।

রামদয়ালের সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, তাঁহাকে কন্যা-সম্প্রদানের নিমিত্ত আর অধিক ভাবিতে হইল না। লোকে রামদয়ালের নাম শুনিয়া পশ্চাৎপদ হইয়াছিল বটে, কিন্তু এক্ষণে হরিহর বাবু সম্মত হইয়াছেন শুনিয়া চতুর্দ্দিক হইতে ঘটক, ঘটকঠাকুরাণী ইত্যাদি দলে দলে আসিতে লাগিল। অবশেষে ঝামাপুকুরে বসুদের বাড়ী সম্বন্ধ স্থির হইল। হরিহর বাবু সর্ব্বাগ্রে দেনা-পাওনার কথা চুকাইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। কন্যার বিবাহের কথা ধার্য্য-দিবসাবধি রামদয়ালের মন আর তত উৎকণ্ঠিত নহে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

তারাচাঁদ পিতার কথায় দ্বিরুক্তি, এবং জীবন বাবুর প্রতি উগ্রভাব দেখাইয়া যে বাটী হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে, আর তাহার সে বাটীতে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। বাল্য-কাল হইতেই তারাচাঁদ নস্য, চুরুট, তামাক প্রভৃতি নেশার সেবক হইয়াছিল। হাতে সর্ব্বদা পয়সা

জুটিত না, এজন্য যাহাতে কিছু খরচ লাগে, এরূপ কোন মদিরা দ্রব্যের উপাসনা করিতে সুবিধা পায় নাই।

বাবুর বাড়ীর ছেলেরা যেখানে বসিয়া লেখাপড়া করিত, প্রথম প্রথম তারাচাঁদ সেই ঘরেই বসিতে পাইত। কিন্তু দিনে দিনে যখন তাহার বিদ্যা-গৌরব কলিকাতাময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, তখন আর তাহার বাবুর বাড়ীর ছেলেদের সহিত একত্রে পাঠ ভাল দেখাইল না। এজন্য তারাচাঁদের পিতা কর্ম্ম-অবসানে আসিয়া যে ঘরে বিশ্রাম করিতেন, সেই গৃহেই শ্যামচাঁদের সহিত একত্রে সেও পড়িতে বসিত। বস্তুতঃ তারাচাঁদের লেখাপড়ায় এরূপ যত্ন ছিল যে, মাসের মধ্যে চারি-পাঁচখানি কেতাব নষ্ট করিত। সবিশেষ সংবাদ রামদয়াল জানিতে পারিতেন না; অভাগিনী তারাচাঁদের গর্ভধারিণীই সকল আব্‌দার মিটাইতেন।

পিতামাতার শাসনাধীনে তারাচাঁদ এক একবার বই খুলিয়া বসিত বটে; কিন্তু এক দিন এক ছত্রও তাহার শিক্ষা হইত না। এখন আর তারাচাঁদের সে ভাবনা-চিন্তা নাই। বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে, এখন আর পিতামাতা বা গুরুজনের সহিত তাহার সম্বন্ধ কি? সে আপনার মনে আপনি কাজ করে; সে মনে মনে আপনাকেই একজন বলিয়া জানিয়াছে।

যেদিন কন্‌সাটের দলের সহিত মারামারি করিয়া তারাচাঁদ পুলিশের হস্তে পতিত হয়, সেদিন তাহার একটু চৈতন্য হইয়াছিল। অলালের ঘরের দুলালের মত আমোদ করিয়া কাল কাটাইলে আর চলিবে না, মনে মনে বুঝিয়াছিল। কিন্তু সে মনোভাব ক্ষণেকেই তাহার হৃদয় হইতে চলিয়া যায়; যেহেতু বাবুর সদয়তায় সে ভাব তাহার চিত্তে স্থান পায় নাই। কিন্তু মার নিকটে যে দুই পাঁচ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিল, তাহা দুই চারি দিনের মধ্যেই নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে; এখন উদরের এক মুষ্টি অন্নের জন্য তাহাকে লালাইত হইতে হইয়াছে।

তারাচাঁদ পিতার আশ্রয়ে থাকিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য একদিনও ভাবে নাই। বাবুর বাড়ীর ছেলেরা যেরূপ আমোদ-প্রমোদে কালক্ষেপ করিত; যদিও তাহার বেশভূষা তদনুযায়িক নাই হউক, তথাচ সেও প্রায় সেই ভাবেই কাটাইত। কিন্তু এখন আর তারাচাঁদের সে ভাব নাই। যে বস্ত্র পরিয়া গৃহ হইতে সে বহিস্কৃত হইয়াছে, এখনও পরিধেয় তাহাই। মধ্যে একদিবস বাবুর বাড়ীর ভৃত্যের সুপারিশে গর্ভধারিণীর নিকট হইতে একখানি বস্ত্র ও দুইটী টাকা অনাইয়াছিল। কিন্তু নেশার দায়ে ও সঙ্গীদিগের আপ্যায়িতে তাহা আর নাই। যাহারা এক সময়ে তারাচাঁদকে লইয়া আমোদ-প্রমোদ করিত, তাহারাও এখন আর সে ভাব দেখায় না।

এখনও তারাচাঁদ নিজের মত-গর্ব্বে চলিতেছে, কনসার্টের দলে মিশিয়া তারাচাঁদ বেশ বেহালা বাজাইতে শিখিয়াছে; থিয়েটার-যাত্রায় তারাচাঁদের বড় গৌরব! শনিবার রবিবার তারাচাঁদের আমোদের সীমা নাই। কেন না, কোন দলে মিশিয়া, যা নগদ কিছু হউক না হউক, দুই দিন উত্তম মধ্যম আহার পাইয়া থাকে।

কিন্তু এভাবে দিন কাটাইয়া তারাচাঁদের অস্তিত্ব প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বে যাহারা তারাচাঁদকে দেখিয়াছে, এখন আর তাহারা তারাচাঁদকে চিনিতে পারে না। অনিয়ম আহার, রাত্রিজাগরণ, মাদক দ্রব্য সেবন, তাহাতে আবার থাকিবারও ঠিক নাই;—এই সকল নানা কারণে তারাচাঁদের অস্থিচর্ম্ম শেষ হইয়াছে।

এক সময়ে তারাচাঁদ জীবন বাবুর ব্যবহারে বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলেন; একবার তাঁহাকে

সুবিধায় পাইলে রীতিমত প্রহার দিবে, মনে মনে স্থির করিয়াছিল। কিন্তু অভাগার মনের আশা মনেই মিলাইয়াছিল। তারাচাঁদ এখন আপনার অবস্থা বুঝিয়াছে; দরিদ্র পিতার সন্তান হইয়া বাবুদের সমকক্ষ হইতে বাসনা তাহার আর নাই। কি উপায়ে পুনশ্চ হরিহর বাবুর গৃহে প্রবেশের অনুমতি পাইবে, এখন সেই চেষ্টাতেই সে ফিরিতেছে। দুই একবার বাটীর দ্বার পর্য্যন্তও আশ্রয় লইয়াছিল; কিন্তু সাহস করিয়া মাথা গলাইতে পারে নাই। তাহার এই ভয়, পাছে জীবন বাবুর দৃষ্টিতে পতিত হয়!

তারাচাঁদ ভাবিয়াছিল, ভগ্নীর বিবাহের সময়ে অবশ্যই পিতামাতা তাহার সন্ধান লইবেন। বাবুদের মনও সে সময়ে কতক ফিরিয়া যাইবে; সে সুযোগে পিতামাতর সহিত সাক্ষাৎ হইবে। তাই পথে-ঘাটে বাবুর বাড়ীর চাকর বাকর দেখিলেই ভগ্নীর বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করিত। কিন্তু কথাবার্ত্তা ধার্য্য না হইলে সঠিক সংবাদ কিরূপে পাইবে? অগত্যা তারাচাঁদকে উৎকণ্ঠিত ভাবেই কাল কাটাইতে হয়। সময়ে সময়ে পিতার দুই এক জন বন্ধুর বাটীতে উপস্থিত হইয়া তারাচাঁদ দুই বেলার আহার এক বেলায় সারিয়া আসিত। কিন্তু ভদ্র-লোকের ছেলে ভিক্ষুকের মত পরের বাড়ী খাইতে লজ্জা পায়—মরমে মরিয়া যায়!

বেহালা বাজাইয়া মাসে দুই চারি টাকা তারাচাঁদের উপায় হয় বটে; কিন্তু সংসর্গের দোষে তাহাতে কুলায় না। এই ভাবেই অভাগার দিন কাটিতে লাগিল। তারাচাঁদ আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারিয়াছে, মনে মনে বুঝিয়াছে। কিন্তু বুঝিয়াও অদ্যাবধি তাহার কিছুই প্রতিকার করিতে পারে নাই।

মাদক-সেবন। *

শাস্ত্রে মাদক পদার্থে নিষিদ্ধ হইয়াছে বটে; কিন্তু দেশ হইতে উহা তিরোহিত হয় নাই। হিন্দুসন্তানকে জিজ্ঞাসা কর,—‘হিন্দুশাস্ত্রে মাদক পদার্থ সেবনের বিধান আছে কি না!’ তিনি অম্লান-বদনে উত্তর করিবেন,—‘নাই। যে মাদক পদার্থ সেবন করে, তাহার সপ্তপুরুষ নরকস্থ হয়।’ কিন্তু দেশের দিকে চাহিয়া দেখ; দেশের ৬৶১৯৬ = লোক মাদক সেবনে আশক্ত রহিয়াছেন। দেশের ৬৶১৯৬ = পুরুষ ধূমপায়ী। হিন্দুসন্তানকে জিজ্ঞাসা কর,—‘বাটীতে অভ্যাগত আসিলে কি দিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা কর!’ তিনি অম্লান বদনে উত্তর করিবেন,—‘কেন, পান ও তামাক।’ অথচ এই তামাক যে তাঁহার শাস্ত্র-নিষিদ্ধ মাদক পদার্থ, ইহা তাঁহার আদৌ ধারণা নাই। এস্থলে তামাক-সম্বন্ধে সংক্ষেপে কতকগুলি কথা বলিব।

তামাক এদেশের প্রাকৃতিক বা আদিম পদার্থ নয়। আমরা প্রাচীন-কালে কাব্য বা শাস্ত্রে তামাকের কোনরূপ উল্লেখ দেখিতে পাই না। এমন কি, আমরা বিদ্যাপতি বা চণ্ডিদাসের সম সাময়িক যে সকল গ্রন্থও পাঠ করি, তাহাতেও তামাকের ব্যবহার প্রচলিত থাকিবার কোন উল্লেখ দেখি না। তবে তামাক কিরূপে এদেশে প্রবেশ-লাভ করিল?

পূর্ব্বে এদেশে কেহ তামাক জন্মাইতও না। কেন না, প্রাচীন রোমকজাতি যে সকল ভারতীয় উৎপন্ন পদার্থের তালিকা রাখিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে তামাকের উল্লেখ নাই। ইহাতে বোধ হয়, মুসলমানদিগের ভারতবর্ষে প্রবেশের সহিত তামাকও ভারতে প্রবেশ-লাভ করিয়াছে। ইহা মুসলমানদিগের খাদ্য। আবার তামাক-সেবনের উপকরণ সমস্তও যাবনিক। কুরসি, গুড়গুড়ি, আলবোলা প্রভৃতি

* পূর্ব্ব সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর।

মুসলমানদিগের সামগ্রী। এখনও ফৌজদারী-বালাখানায় 'দেলখোস্' প্রভৃতি তামাক, 'কাশীর তামাক' প্রভৃতি উৎকৃষ্ট তামাকের প্রস্তুত-কর্ত্তাও মুসলমানেরা। সুতরাং এক্ষণে হিন্দুর সন্তান তামাক ব্যবহারে যে মুসলমানদিগের প্রসাদ সেবন করিতেছেন, তাহাতে কি আর সন্দেহ থাকিতে পারে। মুসলমানেরা যখন এদেশ জয় করিয়া এদেশের বাদসাহ হইয়াছিলেন; হিন্দু-সন্তান যখন 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' অর্থাৎ 'দিল্লীর বাদসাহও যিনি, জগদীশ্বরও তিনি' বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই; যখন মুসলমানদিগের ভক্ষ্যের অনুশীলন গৌরব-চিহ্ন মনে করিতে কেহই ইতস্ততঃ করেন নাই; যখন মুসলমানদিগের ইজার, চাপকান প্রভৃতি পরিধান করিতেও কেহ দুঃখিত মনে করেন নাই; তখন হিন্দুশাস্ত্রের মস্তকে পদাঘাত করিয়া মুসলমানের আদরের সামগ্রী তাম্রকূট সেবনে কেহ যে পশ্চাৎপদ হইবেন না, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

কেহ হয়তো বলিবেন,—"যখন খিঁচুড়ি, পক্কান্ন প্রভৃতি বহুবিধ খাদ্য যাবনিক প্রণালীতে প্রস্তুত করিয়া তৃপ্তির সহিত উদর পূরণ করিতে আমরা দোষাবহ মনে করিতেছি না, তখন তামাক এমন কি অপরাধ করিল যে, আমরা তাহা ব্যবহার করিয়া হিন্দু-শাস্ত্রের মস্তকে পদাঘাত করিলাম! বিশেষতঃ তামাক মাদক পদার্থও তো নহে!" যাঁহারা এই আপত্তি উত্থাপন করেন, তাঁহাদিগের মত ভ্রান্ত দ্বিতীয় নাই! কে বলিল,—তামাক মাদক পদার্থ নহে? বর্ত্তমান সময়ের রাসায়নিক পণ্ডিতগণ অভ্রান্ত পরীক্ষা দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, মদ, গাঁজা ভাঙ, চরস, চণ্ডু, অহিফেন প্রভৃতি পদার্থে যে পদার্থ বিদ্যমান থাকায় মানুষের বুদ্ধি-বিভ্রম বা শারীরিক বৈকল্য উপস্থিত করে, তামাকেও ঠিক সেই একই পদার্থ বিদ্যমান আছে। তবে কম, আর বেশী! মানুষের যাহা স্বাভাবিক খাদ্য (অর্থাৎ অন্নজল প্রভৃতি) তাহা শিশু, বালক যুবক বা বৃদ্ধ যাহার ইচ্ছা তাহাকে সেবা করিতে দাও, কাহারও পীড়াদায়ক হইবে না। কিন্তু যাহাদিগের ইন্দ্রিয় সকল তাম্রকূট সেবন করিয়া বিকৃত হইয়া যায় নাই, তাহার নাকের নিকট তাম্রকূটের ধূম ছাড়িয়া দেও, সে নিশ্চয়ই অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিবে; এবং শিশু ও কোমল ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট লোক-সকল হয়তো বমি করিয়া ফেলিবে! তবেই দেখ, তামাক মাদক পদার্থ কি না! তামাক যদি মাদক পদার্থ হয়, তবে কে অস্বীকার করিতে অগ্রসর হইবেন যে, মুসলমানদিগের ধূমপানের অনুকরণ করিতে যাইয়া হিন্দুসন্তান শত-সহস্রবার হিন্দুশাস্ত্রের মস্তকে পদাঘাত করিতেছেন।

কি আশ্চর্য্য! বর্ত্তমান সময়ে দেশীয় সমাজ-সকলের কি ঘোরতর অধঃপতন যে, যে মাদকতা-পূর্ণ তামাকের ব্যবহার হিন্দুর শাস্ত্র-বিরুদ্ধ; যাহার ব্যবহারে শরীর ও মন বিকৃত হয়, বুদ্ধি-ভ্রংশ হয়, ইন্দ্রিয় সকল শিথিল হইয়া যায়, পরমায়ুর হ্রাস হয়, এবং ক্ষয়কাশ যক্ষ্মাকাশ, যকৃত, প্লীহা প্রভৃতি রোগসকলের শরীরে প্রবেশের জন্য প্রশস্ত পথ সত্বর প্রস্তুত হয়; সেই তামাকই এক্ষণে আমাদিগের দেশের ভদ্রতা-রক্ষার উপায় এবং সেই তামাকের আদান-প্রদানই ভদ্রতা! যে ধুরন্ধর সমাজ-সংস্কারকগণ নগণ্য খুঁটিনাটী লইয়া বিকট চীৎকার করিয়া কি এক মহা প্রলয়ের সৃজন করিতে চাহিতেছেন, তাঁহাদিগের দৃষ্টি যে এদিকে পতিত হইতেছে না, ইহাই আশ্চর্য্য! অথবা আত্মছিদ্রে কাহারও দৃষ্টি পতিত হয় না; পরছিদ্রেই সকলের চক্ষু উন্মিলিত!

এতক্ষণ আমরা দুইএকটী মাদক পদার্থের বিষয় অতি সংক্ষেপে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিলাম। যত প্রকার মাদক পদার্থ প্রচলিত আছে, সকলগুলির ইতিবৃত্ত প্রদান করিয়া অবতারণা করিতে গেলে, প্রস্তাব অতন্ত সুদীর্ঘ হইয়া পড়িবে; এবং সময়েরও অসদ্ভাব হইবে। অতএব ইহাদিগের আর অধিক ভূমিকা না করিয়া, এক্ষণে মাদক-সেবনে মানুষের কি কি মহদনিষ্ট সাধিত হইতেছে, একে একে তাহারই সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যা'ক।

মাদক পদার্থ সেবনে আমাদিগের দুই প্রকার অনিষ্ট সাধিত হয়। ১ম, মানসিক; ২য়, শারীরিক।

আমরা প্রথমতঃ মানসিক অনিষ্টের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই। মানুষের সমুদায় কার্য্যের জন্যই মনের স্থিরতা সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। মানুষের মন যখন অস্থির হইয়া যায় বা বুদ্ধি যখন বিকল হয়, তখন মানুষ কোন কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে না। সামান্য রোগাদিতে মনের স্থিরতা নষ্ট হইলে সমুদায় কার্য্য কেমন বিরক্তিকর ও বিশৃঙ্খলা-পূর্ণ হয়, তাহা সকলেই অবগত আছেন। মাদক পদার্থও বুদ্ধির এইপ্রকার চাঞ্চল্য উপস্থিত করে। তবে বিভিন্নতা এই যে, রোগাদিতে যে বুদ্ধিভ্রংশ হয় তাহা আমরা বুঝিতে পারি; কিন্তু মাদকে যে বুদ্ধিভ্রংশ হয়, তাহা আমাদিগের বুঝিবার ক্ষমতা থাকে না। ডাম্পায়ার নামক একপ্রকার অতি বৃহৎ বাদুড় আছে। তাহারা অনেক জীবের প্রাণনাশ করিয়া থাকে, অথচ জীবগণ তাহাদিগের মৃত্যুর বিষয় কিছুই বুঝিতে পারে না। উক্ত বাদুড়েরা কোন প্রাণীকে নিদ্রিত দেখিলে, প্রথমতঃ নিঃশব্দে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া পক্ষ বিস্তৃত করিয়া, মৃদু মৃদু বায়ু সঞ্চালন করিতে থাকে। তাহাতে ঐ প্রাণী আরও নিদ্রিত হইয়া পড়ে। তখন ডাম্পায়ার অল্প অল্প বাতাস করিতে করিতে শিকারের নাভিতে তাহার ঠোঁট বসাইয়া দিয়া আস্তে আস্তে রক্ত চুসিতে থাকে। কিন্তু ইহা এত ধীরে ধীরে সম্পন্ন হয় যে, নিদ্রিত জীব তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারে না। অবশেষে শরীর নিরক্ত হইয়া পড়িলে মৃত্যু আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে। মাদক পদার্থের প্রকৃতিও এইরূপ। ইহা সুখের প্রলোভন দেখাইয়া মানুষকে এত বিহ্বল করিয়া তুলে যে, মানুষ কিছুতেই ইহা সেবন না করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারে না। অবশেষে মাদকের বিষে শরীর অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলে, নানা-প্রকার ব্যাধি আসিয়া শরীর আক্রমণ করে। প্রত্যক্ষই দেখিতে পাওয়া যায়, মাদক সেবনে মাতালদিগের প্রতিদিন কি দুর্গতি না হইয়া থাকে; অথচ তাহার পরদিন উহারা মাদক সেবন না করিয়া স্থির থাকিতে পারে না! মৌতাতের সময় উপস্থিত হইলে আফিমখোর ও গুলিখোরেরা কিরূপ ছটফট করিয়া থাকে, তাহা বোধ হয়, সকলেই অবগত আছেন; এবং আফিম্ ও গুলি প্রভৃতির অভাবে কত মাতাল ছটফট করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তাহাও বোধ হয়, কাহার অজ্ঞাত নাই। তদ্ভিন্ন এই সকল মাদক সেবনে মানুষ যেরূপ লঘুচিত্ত হইয়া আত্মজ্ঞান হারাইয়া বসে, তাহাও বর্ণনাতীত। আমি স্বকর্ণে অনেক ব্রাহ্মণবংশীয় উচ্চশ্রেণীর ভদ্র-সন্তানের মুখে শুনিয়াছি যে, পথিমধ্যে তাঁহাদিগকে নগণ্য নীচ কৃষকের নিকট যাইয়া এক ছিলিম তামাক ভিক্ষা করিতে হইয়াছে; এবং সেই কৃষকদিগের উচ্ছিষ্ট ধূম শরীরস্থ করিয়া তাঁহাদিগের হৃদয় ও মনকে প্রকৃতস্থ করিতে হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা মনুষ্যত্বের অবমাননা আর কি হইতে পারে? ইহা অপেক্ষাও কি মনুষ্যের অধঃপতন সম্ভবে?

তাম্রকূটের ক্ষমতা মানুষের মন ও শরীরের উপর কিরূপে কার্য্য করে, আমরা তাহার আর একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত হইব। আমাদিগের বর্ণনার বিষয় একটী যথার্থ ঘটনা। তবে ভদ্রতার অনুরোধে বর্ত্তমান-সময়ে আমরা কাহারও নামধামাদি প্রকাশ করিলাম না। ঢাকা-জেলার কোন শিক্ষিত জমিদারের সন্তান পূর্ব্ব-অঞ্চলে বিবাহ করেন। বিবাহের পর

কন্যা শ্বশুরালয়ে আসিলে ২।১দিন পরেই তাহার কি এক রোগ হইয়া উঠিল। কন্যা আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না; তাহার পেট ক্রমেই ফুলিয়া উঠিল। অনেক কবিরাজ, অনেক আসিডাণ্ট সার্জ্জন, অনেক সিবিল সার্জ্জন দিয়া দেখান হইল; কিন্তু কেহই রোগ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। অবশেষে এক বুদ্ধিমান ডাক্তার শ্বশুরকে কহিলেন,—"আপনি যদি আমাকে কোন নির্জ্জন স্থানে আপনার পুত্রবধূকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে দেন, তাহা হইলে আমি উহার রোগ সারাইতে পারিব।" শ্বশুর মহাশয়কে অগত্যা তাহাই স্বীকার করিতে হইল। ডাক্তার মহাশয় এক নির্জ্জন দ্বিতল গৃহে যাইয়া ভৃত্যকে খুব ভাল এক ছিলিম তামাক সাজিয়া দিতে বলিলেন। পরে ভৃত্যকে বিদায় করিয়া দিয়া কন্যাকে ঐ স্থানে ডাকাইলেন। কন্যার স্বামী সন্দেহ-প্রযুক্ত পূর্ব্বেই ঐ স্থানে লুকাইয়া ছিলেন। কথা উপস্থিত হইলে, সুগন্ধি তামাকের আঘ্রাণ তাহার নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইল, এবং তাহাতে তাহার চাঞ্চল্য আরও বৃদ্ধি পাইল। ডাক্তার বাবু তখন কন্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"মা, আমাকে সত্য করিয়া বল. পূর্ব্বে তুমি তামাক খাইতে কি না! যদি খাইয়া থাক, তবে এই এখানে তামাক প্রস্তুত আছে। আমি এ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গৃহান্তরে যাইতেছি। তুমি ইচ্ছামত সেবন কর। পরে তোমার ধূমপান শেষ হইলে আমি ফিরিয়া আসিয়া যাহাতে তুমি প্রত্যহ গোপনে তামাক খাইতে পার, তাহার ব্যবস্থা করিয়া যাইব।" এই বলিয়া ডাক্তার বাবু বাহিরে চলিয়া গেলেন। কন্যা ২।৩ দিন পর আপনার অভীপ্সিত পদার্থ পাইয়া ইচ্ছামত ধূমপান করিলেন। তাহার রোগ সারিয়া গেল। অতঃপর ডাক্তার বাবু ফিরিয়া আসিয়া সমুদায়ই বুঝিতে পারিলেন। তখন তিনি তাহার স্বামীকে ডাকাইয়া বলিয়া দিলেন যে,—"তোমার স্ত্রী পূর্ব্বে তামাক খাইতেন, তাহাতেই এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। তুমি শয্যাগৃহে তাঁহাকে একটু একটু তামাক খাইতে দিও। পরে অভ্যাস কমিয়া আসিলে ছাড়া সহজ হইবে।" অবশেষে ডাক্তার বাবু নীচে নামিয়া বলিয়া গেলেন,—"রোগ সারিয়াছে।" এই কন্যা এখনও জীবিতা আছে। সে এক্ষণে তামাক ছাড়িতে পারিয়াছে; এবং তাহার কয়েকটী পুত্রকন্যাও জন্মিয়াছে।

তবেই দেখুন, তামাক কি ভয়ানক পদার্থ। ইহা না পাইলে স্ত্রী স্বামীসেবা করিতে ভুলিয়া যায়; পুত্র পিতৃসেবা ছাড়িয়া চঞ্চল-চিত্ত হয়; এবং মাননীয় ও গণনীয় সম্ভ্রান্তগণ কৃষকের নিকট ভিক্ষার্থী হইয়া দাঁড়ান। আর ইহাও দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে, ভক্ত তাহার উপাস্য দেবতাকে ভুলিয়া সময়ে সময়ে এই ছার জঘন্য পদার্থের জন্য অন্যমনস্ক হইয়া থাকেন। পূর্ব্বে ঋষিগণ সংসারের কোলাহলের মধ্যে থাকিয়া মনের স্থিরতা সাধিত হইত না বলিয়া, সংসার ছাড়িয়া,অরণ্যের আশ্রয় লইতেন; এবং মন সহজে আয়ত্ত হইত না বলিয়া প্রাণায়াম যোগ প্রভৃতি নানা উপায়ে চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদনে যত্ন করিতেন। আর, এই বর্ত্তমান সময়ের সাধকগণ সাধনার বলিয়া এমন সকল পদার্থ সেবন করিতেছেন যে, যাহা চিত্তের স্থৈর্য্য-সম্পাদন করা দূরে থাকুক, যাহা একমুহূর্ত্ত সেবন না করিলে মন অস্থির ও চঞ্চল হইয়া উঠে।

বোধ হয়, মনের উপর মাদক পদার্থের আধিপত্য-সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত লিখিলেই যথেষ্ট হইবে। এক্ষণে মদ্য-দ্বারা শরীরের কি কি অপচয় সাধিত হয়, বারান্তরে তাহারই অবতারণা করা যাইবে।

বিশ্বাসঘাতকের ষড়যন্ত্র।

(৪)

এমন সময় মন্ত্রী ডাকিলেন—"আব্‌দুল!" "মহারাজ" বলিয়া উত্তর দিয়া আব্‌দুল দুই এক পদ অগ্রসর হইল।

হুসেন তাহাকে তাড়াতাড়ি এই কয়টি কথা বলিয়া ছাড়িয়া দিল,—"হঠাৎ কোন কাজে রাজি হস্‌নে!"

আব্‌দুল ঘাড় নাড়িয়া চলিয়া গেল। কক্ষ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইবা-মাত্র, মন্ত্রী অত্যন্ত ব্যগ্র-ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি পারবে আবদুল! তুমি কি আমায় চিন্তাহীন করতে পারবে?"

আব্‌দুল কি উত্তর দিবে তাহা ঠিক করিতে পারিল না। নীরবে মন্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মন্ত্রী আবার মদ্যপান করিয়া কহিলেন,—"আবদুল! তুমি খুন করতে পার?"

আব্‌দুল বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে জিজ্ঞাসা করিল,—"কাহাকে মহারাজ!"

আব্‌দুলের বিশ্বাস ছিল, মন্ত্রীবর খুব ন্যায়-পরায়ণ। সুতরাং তাঁহার মুখ হইতে—"আব্‌দুল্ তুমি খুন করতে পার?"—এই কথা শুনিয়া সে চমকিত হইল।

মন্ত্রী আশীবিষের জ্বালায় জ্বলিতেছিলেন। আব্‌দুলকে নীরব থাকিতে দেখিয়া অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দেখো আব্‌দুল্, রাজসিংহাসনের বিরোধী একজন শত্রু আছে; আমি তাহাকে গুপ্ত হত্যা করিতে চাই। তুমি তাহাকে বধ করিতে পারিবে?"

এবার আব্‌দুল্ ভবিষ্যৎ না ভাবিয়াই উত্তর দিল,—"কি! মহারাজের পরম শত্রু!—রাজ্যের শত্রু!—রাজসিংহাসনের বিরোধী!—তাহাকে বধ করিতে আবার অন্য কথা? মহারাজ! আমি আপনার দাসানুদাস। অনুমতি করিলে, প্রধান অমাত্যকে পর্য্যন্ত এই শাণিত ছুরিকায় শমন-সদনে প্রেরণ করিতে পারি। যে সিংহাসনের শত্রু, সে রাজ্যের সমস্ত প্রজার শত্রু। মহারাজ! একবার অনুমতি করুণ, অর্দ্ধঘণ্টা অতীত হইতে না হইতেই, তাহার ছিন্ন মস্তক আপনার পদতলে আনিয়া উপহার দিব।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করতঃ আব্‌দুল্ আপনার তীক্ষ্ণ শাণিত ছুরিকা বাহির করিল।

এতক্ষণে মন্ত্রী কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইলেন। আবার একবার মস্তিষ্ক-তেজোহীনকারিণী সুরা পান করিয়া বজ্র-গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি পারবে?"

আব্‌দুল্ স্থির দৃঢ়প্রতিজ্ঞের ন্যায় উত্তর দিল,—"নিশ্চয়ই মহারাজ!"

মন্ত্রী।—আমি রাজকুমারকে গুপ্ত-হত্যা করিতে চাই—তুমি তাহাকে বধ করিতে পারিবে?

যে আব্‌দুল্ 'সিংহাসনের' শত্রু এই কথা শুনিয়া তাহার বধসাধনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল; কোষমধ্য হইতে অসি নিষ্কাসিত করিয়া যে আব্‌দুল্ কতক্ষণে শত্রুর শোনিতে আপনার অসি রক্তবর্ণে রঞ্জিত করিবে, তাহাই ভাবিতেছিল; সেই আব্‌দুল মন্ত্রীর কথায় সহসা ভাবান্তর প্রাপ্ত হইল। তাহার সর্ব্ব-শরীর কণ্টকিত, আপাদমস্তক কম্পিত, চক্ষু দীপ্তিহীন হইল—শাণিত ছুরিকা ভূমে পড়িয়া গেল।

বজ্র-গম্ভীর-স্বরে মন্ত্রী তখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি! তুমি পারবে না? বিশ্বাসঘাতক! নেমকহারাম! রাজকার্য্যে এত অবহেলা!"

চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ ও দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া আব্‌দুল কহিল,—"একি রাজকার্য্য? ভূতপূর্ব্ব মহারাজের শিশুপুত্রকে বধ করা কি রাজকার্য্য? তাঁহার বংশলোপ করা কি রাজকার্য্য? এ গুপ্তহত্যা করিয়া রাজকার্য্যের কি বিঘ্ন ঘুচাইবেন, মহারাজ! আমি বিশ্বাস-ঘাতক, আমি নেমক-হারাম? আর আপনি তবে কি মহারাজ! যদি আমি বিশ্বাসঘাতক হইতাম, তাহাহইলে হয়তো এতক্ষণ ভূতপূর্ব্ব মহারাজের একমাত্র বংশধরের নাম ইহসংসার হইতে বিলুপ্ত হইত!"

ক্রোধে কম্পান্বিত কলেবরে মন্ত্রী তখন

আপনার অসি নিষ্কাসিত করিয়া আব্‌দুলের দিকে ধাবিত হইলেন। যদি আব্‌দুল্ আপনার জীবনরক্ষার জন্য অসির আঘাত প্রতিরোধ না করিত, তাহাহইলে তৎক্ষণাৎ তাহার ছিন্ন-মস্তক মন্ত্রীর পদতলে লুণ্ঠিত হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু আব্‌দুল আপনার অসির দ্বারা আপনাকে রক্ষা করিয়া বজ্রনিনাদী স্বরে কহিল,—"মহারাজ? বৃথা চেষ্টা! আমি বিশ্বাসঘাতক কি—কি, তাহা এখনই দেখাইতে পারি, যদি ভূতপূর্ব্ব মহারাজের শিশুপুত্র একবার বলেন যে, মন্ত্রীর ছিন্নমস্তক আমি দেখিতে চাহি! শিশু-পুত্রকে বধ করিয়া আপনি নিষ্কণ্টকে অপ্রতিহত-ভাবে রাজত্ব করিতে চাহেন; কিন্তু—কিন্তু মহারাজ, উপরে একজন আছেন, তাহা কি মনে আছে? অধর্ম্মের রাজ্য কতদিন থাকিবে, মহারাজ?"

মন্ত্রী উন্মত্তের ন্যায় উত্তর দিলেন,—"তুমি আমার সম্মুখ হইতে দূর হও।"

যথারীতি অভিবাদন করিয়া আব্‌দুল প্রস্থান করিল। মন্ত্রী ক্রোধে কম্পান্বিত-কলেবরে ভূমিতে পদাঘাত করতঃ আপনা-আপনি বলিতে লাগিলেন,—"আজ হইতে রাজ্যে বিষাঙ্কুর রোপিত হইল। আমার সিংহাসনের একজন শত্রু ছিল; আজ হইতে শত সহস্র শত্রু অভ্যুত্থান করিবে, সন্দেহ নাই। কি করি, কোথায় যাই? না—যখন এতদূর অগ্রসর হইয়াছি, তখন পশ্চাদ্‌পদ হইব না।"

এই বলিয়া মন্ত্রী তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

(৫)

এদিকে কুলগুরু এবং ধাত্রীর বুদ্ধিমত্তায় রাজকুমার স্থানান্তরিত হইয়াছেন। মন্ত্রী ভাবিয়া আকুল! তাঁহার এতদিনের আশা বুঝি নির্ম্মূল হইল! আব্‌দুল্ ব্যতীত তাঁহার মনোভাব আর কেহই জানিত না—কাহারও নিকট তিনি প্রকাশ করেন নাই। সুতরাং গুপ্তচর লাগাইয়া আব্‌দুলকে হত্যা করাই তাঁহার প্রথম উদ্দেশ্য হইল। কাজেও ঘটিল তাই। তারপর প্রাতঃকালে যখন তিনি শুনিলেন যে, ধাত্রী রাজকুমারকে লইয়া অদৃশ্য হইয়াছে; তখন তিনি ভাবনায় আরও অস্থির হইয়া পড়িলেন—ভবিষ্যৎ সুখ-আশায় একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িলেন।

রাজ্যমধ্যে ঘোষণা প্রচার করিলেন যে,—"ধাত্রী রাজকুমারকে চুরি করিয়া কোথায় পালাইয়া গিয়াছে। যে তাহার কোন সন্ধান বলিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে কোটি স্বর্ণ-মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিব। রাজকুমারের জন্য আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে।"

আর এই সময় মন্ত্রী মহাশয় গুপ্তভাবে বহু অর্থব্যয় করিয়া, গুপ্তচর এবং ঘাতুক নিযুক্ত করিয়া, তাহাদিগকে দেশ-বিদেশে পাঠাইয়া দিলেন। তাহাদিগকে বলিলেন যে,—"তোমরা যেখানে তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে, সেই খানেই তাহাদিগকে হত্যা করিয়া চলিয়া আসিবে। কার্য্য সফল হইলে আমি যথেষ্ট পারিতোষিক প্রদান করিব।"

কুলগুরু জানিতেন, এ সকলই নিশ্চয় ঘটিবে। সুতরাং তিনি আপনার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে সে বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

দশ বৎসর অতীত হইল। তথাপি রাজকুমারের সন্ধান হইল না। কুলগুরুর সুকৌশলে রাজকুমার কাশ্মীর-রাজ্যে পালিত হইতে লাগিলেন।

মন্ত্রী রাজকার্য্য সমস্তই করেন। রাজার ন্যায় তাঁহার পূর্ণ-অধিকার! সকলেই তাঁহাকে 'রাজা' সম্বোধন করিয়া থাকেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার অবোধ মন প্রবোধ মানিল না। তিনি এই দশ বৎসর ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া চারিদিক পরিষ্কার রাখিয়া একদিন বিরাট সভা আহ্বান-পূর্ব্বক আপনার অদ্বিতীয় বাগ্মীতাবলে প্রজা-বর্গকে বুঝাইয়া দিলেন যে,—রাজ্যে রাজা ভিন্ন

কেহ সুশৃঙ্খলে সুচারুরূপে রাজ্য চালাইতে পারে না। কারণ, তাঁহার সকল বিষয়ে স্বাধীনতা থাকে না, রাজার ন্যায় তিনি আপনার মতে কোন কার্য্য করিতে পারেন না। সুতরাং তাহাতে অনেক সময়ে সুফল না ফলিয়া কুফল প্রসব করে। প্রজাগণ, অমাত্যবর্গ সকলেই ইহা বুঝিলেন, সকলেই সম্মতি দিলেন, সকলেই একমত হইলেন। সুতরাং আর বাধা দিবার কেহ রহিল না—নির্ব্বিবাদে মন্ত্রী রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। কেবল প্রধান সেনাপতি সর্ব্বসমক্ষে মন্ত্রীকে ইহা স্বীকার করাইয়া লইলেন যে,—"নিরুদ্দেশ রাজকুমার যদি ফিরিয়া আসেন, তবে তাঁহার রাজ্য তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে হইবে।" মন্ত্রী তাহাতে কাল্পনিক আগ্রহের সহিত সম্মতি প্রদান করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। বহুকালের আশা এতদিনে সফল হইল।

মন্ত্রীর একটিমাত্র কন্যা। সন্তানাদি তদ্ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। কুলগুরু একদিন মন্ত্রীকে কহিলেন,—"মহারাজ! আপনার একটিমাত্র কন্যা; বিদ্যা-শিক্ষা করা তাহার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। রাজকুমারের আর আসিবার সম্ভাবনাও নাই। কারণ, তাহা হইলে এ দশবৎসরের মধ্যে অন্ততঃ তাঁহার কোন সংবাদও পাওয়া যাইত! হয়তো তিনি জীবিতই নাই। যাহাহউক, যদি তিনি কখনও আর ফিরিয়া না আসেন, তাহাহইলে আপনার কন্যাই একপ্রকার সিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হইবেন, সন্দেহ নাই। সুতরাং তাঁহাকে সুশিক্ষিতা করা একান্ত আবশ্যক।"

মন্ত্রী কুলগুরুর মনোগত অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া কহিলেন,—"আচ্ছা, আপনি আমার একমাত্র কন্যাকে আপনার ভবনে লইয়া যাউন। এ বাটীতে থাকিলে বিদ্যাশিক্ষা-সম্বন্ধে তাহার শিথিলতা জন্মিতে পারে।"

গুরুদেবও তাহাই চাহেন; তাঁহার উদ্দেশ্যও তাই! তথাপি তিনি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া, যেন অনিচ্ছা-সত্ত্বেও, উত্তর দিলেন,—"আচ্ছা তবে তাই হবে।"

গুরুদেব মন্ত্রী-কন্যাকে আপন বাটীতে লইয়া গেলেন। সরমা নাম্নী তাঁহার একটি কন্যা ছিল। মন্ত্রীকন্যা দুই এক দিনের মধ্যেই তাহার সহিত বেশ মিশিয়া গেল।

ভয়ানক খুন।

পঞ্চম দৃশ্য।

ধর্ম্মের বিচার।

"উহু-হু! মাগো!—গেলেম!"

"বল্ শালা, এখনও কবুল যা'! নইলে এমনি করেই তোকে মেরে ফেল্‌বো, জানিস্।"

"ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি, তোমরা আমায় আর মেরো-না! মার খেয়ে যে আমি মরে গেলাম!"

"কেন ব্যাটা, তুই একরার করছিস্-নে? স্বীকার পেলেই তো সব চুকে যায়! বড়-কর্ত্তা তো বলেছেনই, তা'হলে তোকে তিনি বাঁচাবেন। দেখ, এখনও যদি ভাল চাস, তবে বল। নইলে প্রমাণ তো হয়েছেই;—বেশীর ভাগ আমাদের হাতেই তোর পনের আনা প্রাণটা যাবে!"

"আমি খুন করি-নি; তবু আমি কি ক'রে বল্‌বো, আমি খুন করেছি!"

"তবেরে শালা!—এখনও বদ্‌মায়েসী গেল না!"—এই বলিয়া আবার সজোরে এক কুলের গুঁতা!

রামচন্দ্রকে এবার কিন্তু 'হুমকি' খাইয়া বসিয়া পড়িতে হইল। এবারের গুঁতাটায় একটু কাবু হইয়া তিনি "উহু-হু—বাবা গো!" বলিতে বলিতে বসিয়া পড়িলেন। কিন্তু তখনও অব্যাহতি নাই!—তাহার উপরও এক লাথি! সঙ্গে সঙ্গে অপর একজন সহকারী বলিলেন,—

"কেন বাপু, অত কষ্ট পাও; সেই বল্‌তেই যখন হ'বে, তখন আর অত কষ্ট পেয়ে বলা কেন? বিশেষ, যদি প্রমাণ নাও হত, তা'হলেও একদিন ও চেষ্টা গেলেও সম্ভব হত। কিন্তু এখন তুমি সম্পূর্ণ আমাদের হাতে, সেটা জেনো; বরং আমরা মনে কর্‌লে তোমার প্রাণটা বাঁচতেও পারে! নইলে ফাঁসি তো নিশ্চিত!"

"তবে কি আপনারা আমায় মিথ্যা করিয়াই স্বীকার করিতে বলেন? যদি তাই বলিলেই আপনারা সন্তুষ্ট হন, তাই না-হয় বলিতেছি।" —এই বলিয়া রামচন্দ্র কাঁদিতে লাগিলেন।

"আবারও শালা সেই বদ্‌মায়েসী!"—এই বলিয়া তখন আবারও রামচন্দ্রের উপর গুঁতাটা-আস্‌টা, লাথিটা-কিলটা চলিতে লাগিল; এবং প্রাণের দায়ে রামচন্দ্রও তখনকার মত বলিতে লাগিল,—"আমায় আর মারিবেন না—আর মারিবেন না; দোহাই আপনাদের, আমি একবার করিব,—আমিই খুন করিয়াছি।"

* * * *

ইহার পরই আর কি পুলিসে মকর্দ্দমা উঠিল! বিচার চলিতে লাগিল। সাক্ষী-সাবুদ গৃহীত হইতে আরম্ভ হইল। সৌদামিনীর মা বলিল,—সে স্বচক্ষে রামচন্দ্রকে খুন করিয়া পলাইতে দেখিয়াছে। পাহারওয়ালারা বলিল,—খুন করিয়া পলাইবার সময় কাতারি শুদ্ধ ধরা পড়িয়াছে। পাড়া-প্রতিবেশী দুই একজনও সেই কথাই বলিল। অধিকন্তু কোথা হইতে কাতারি আনা হইয়াছিল, তখন উহার মতলব কিরূপ ছিল, কিরূপ অছিলা করিয়া ও সেদিন সৌদামিনীর ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল,—এ সকলও প্রমাণ হইয়া গেল। কোন কথার নড়চড় নাই—সকলই যেন হু-বহু! যাইহোক, মাজিষ্ট্রেট কিন্তু মকর্দ্দমার রায় দিলেন না; দুই তিন দিন উল্ট্য-পাল্টা করিয়া সাক্ষীদের জবানবন্দী প্রভৃতি লইয়া, মকর্দ্দমাটা শেষে তিনি সেসনে অর্পণ করিলেন। কিন্তু তখনও প্রায় মাসাধিক সেসন বসিবার বাকী! সুতরাং ততদিন পর্য্যন্ত রামচন্দ্রকে সেইরূপ হাজতেই থাকিতে হইল।

তাহার বাড়ীতে কান্নাহাটি উঠিল; পাড়া-প্রতিবেশী সকলেই বুঝিলেন,—এবার আর রামচন্দ্রের রক্ষা নাই; এ সেসানে নিশ্চতই তাহার ফাঁসী হইবে!

ষষ্ঠ দৃশ্য।

অনুসরণ-চিহ্ন।

সাড়ে-দু'পুরের ট্রেণেই রওনা হইতে হইবে! সুতরাং আর রাত্রি না করিয়া তাড়া-তাড়ি তাঁহারা গাড়িতে উঠিলেন। গাড়ি হাবড়ার ষ্টেসন-অভিমুখে চলিতে লাগিল। গোকুল বাবু গাড়োয়ানকে বলিয়া দিলেন,—"দেখো, যেন ট্রেণ মিস্ না করি! যদি টেণ পাওয়াইতে পার, তা'হলে কিন্তু তোমায় বেশ পুরস্কার দিব।" গাড়োয়ানও কাজেই মহোল্লাসে গাড়ি চালাইতে লাগিল। তাহার বড়ই আশা, বাবু তাহাকে বক্‌সিস্ দিবেন। সুতরাং পুরা দমেই গাড়ি চলিতে লাগিল।

হাবড়ার পুল-পর্য্যন্ত গাড়িখানি পৌঁছিয়াছে; হাবড়ার দিকে না যাইয়া রেলওয়ে-ষ্টেসনে যাইবার অভিপ্রায়ে গাড়ি মোড় ফিরাইয়াছে; এমন সময়, একটা জমাদার ও একটা পাহারওয়ালা গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতে ছুটিতে বলিতে লাগিল,—"এ গাড়িমে কোন হ্যায়! গাড়ি কাঁহাসে অ্যাতা হ্যায়?" কিন্তু প্রথম দুই এক ডাকে গাড়ির মধ্যস্থিত কেহই কোন উত্তর দিলেন না; যেন উপেক্ষা করিয়া উড়াইয়া দিলেন। তবে গায়োয়ান বেটা বলিল,—"গাড়ি হোগোলকুঁড়িয়া-সে অ্যাতা হ্যায়—রেল্‌মে যায়েগা।" কিন্তু তাহারা তাহাতে কর্ণপাতও করিল না; গাড়ির বাবুর কোন উত্তর না পাইয়া, তাহারা গাড়ি দাঁড় করাইতে বলিল।

গোকুল বাবু তখন একটু চটিয়া গাড়ির

বাহির হইয়া পড়িলেন; বলিলেন,—"কেন তোমরা দেরী করাইতেছ! ট্রেণের সময় হয়ে এলো; দেরী করালে ট্রেণ যদি না পাই, তা'হলে তোমাদের তা'র দায়ী হ'তে হ'বে।"

"তা' হয় হবে! আপনি এখন কোথায় যাবেন? আপনার গাড়িতে উনি কে?"—এই বলিয়া জমাদার সাহেব গাড়োয়ানকে গাড়ি থামাইয়া রাখিতে আদেশ করিলেন। গোকুল বাবু বারবার গাড়ি চালাইতে বলিলেও গাড়োয়ান ভয়ে আর গাড়ি চালাইতে পারিল না। অধিকন্তু গোকুল বাবুকে তখন কৈফিয়ৎ দিতে হইল। তিনি বলিলেন,—"আমরা কাশী যাইব। সেখানে আমি কাজ করি; তাই এবার পরিবার লইয়া যাইতেছি। গাড়িতে আমার পরিবারই আছেন; আর কেহই নাই। খবরদার তুমি গাড়ির দরজা খুলিওনা।"

জমাদার সাহেব তখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার নাম কি? আর আপনি কলিকাতায় থাকেন কোথায়?"

গোকুল বাবুকে এইবার, কি জানি কেন, নাম ভাঁড়াইতে হইল; তিনি বলিলেন,—"আমার নাম রমেশচন্দ্র বসু; আমি থাকি, হাটখোলায়। তুমি আমাদের ছাড়িয়া দেও। ট্রেণের সময় বহিয়া যায়!'

জমাদার সাহেব এইমাত্র গাড়োয়ানের মুখে হোগোলকুঁড়িয়ার গাড়ি শুনিয়াছিলেন; আর বাবুর মুখে এখন শুনিলেন,—তাঁহারা হাটখোলায় থাকেন। সুতরাং মনে মনে বড়ই সন্দেহ হইল। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হোগোলকুঁড়িয়া হইতে আসিতেছেন কেন? সেখানে আপনার তবে কি?"

গোকুল বাবু একটু চমকাইয়া গেলেন। তাঁহার মস্তিষ্কের ভিতরটা যেন একবার আলোড়িত হইয়া উঠিল। তিনি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া উত্তর দিলেন,—"হাঁ-হাঁ, সেখানে আমার শ্বশুর-বাড়ী! আমরা এই শ্বশুর-বাড়ী হইতেই আসিতেছি।"

জমাদার।—"তবে হাটখোলা হইতে আসিতেছেন, বলিলেন কেন?"

গোকুলবাবু।—"না-না, সেখানে আমার বাড়ী বলিলাম!"

জমাদার।—"আপনার শ্বশুরের নাম কি? আপনি কাশীতে কি কাজ করেন? কাশীতে আপনি পূর্ব্বে যে থাকিতেন, তাহার কোন চিহ্ন দেখাতে পারেন?"

গোকুলবাবুকে এবার আরও একটু 'বাঁশজলে' পড়িতে হইল। তিনি কাহাকে শ্বশুর বলেন, অথবা কি কাজ করেন, বলেন;—ভাবিয়াই তো অস্থির! যাইহোক, ক্ষণেক পরে নিজের পিতার নামটাকেই শ্বশুর বলিয়া পরিচয় দিলেন; কি বিধি-নিগ্রহ যে, তাঁহার মুখ হইতে আপনা-আপনিই বাহির হইল,—"হোগোলকুঁড়িয়ার রামসেবক চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ই আমার শ্বশুর। আমি কাশীতে দেওয়ানী-আদালতের বেলিফ্।" এইরূপ পরিচয় দিয়াই—অর্থাৎ নিজে একজন আইনজ্ঞ পুলিস-সম্পর্কীয় লোক, এটা বলিয়াই—সদম্ভে আবার বলিলেন,—"কেন আপনারা আমায় দেরী করাইতেছেন? ট্রেণ ফেল হইলে আমার বড়ই অনিষ্ট হইবে, জানিবেন। আর সেরূপ কোন অনিষ্ট হইলে, আপনাদিগকেও সমুচিত শিক্ষা পাইতে হইবে!"

গোকুল বাবু এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময় জমাদার সাহেব একটু মুচকি হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র গোকুলচন্দ্র আজকাল কোথায় থাকে? সেটা ভারি বদমায়েস্ নয়? সেটা আবার শুন্‌ছি, আজ ঐ পাড়ারই রমেশ বাবুদের বউটাকে বা'র ক'রে নিয়ে এয়েছে! আপনি সে বিষয় কিছু শুনেছেন কি? সেটাকে একবার ধর্‌তে পার্লে বেশ শিক্ষা দেওয়া যা'বে। আপনি তার কিছু জানেন?"

"সে সব গুজোব—সে সব গুজোব!" বলিয়া, অপ্রতিভ-ভাবে গোকুল বাবু আর যেন তাঁহাদের সম্মুখে থাকাই কষ্টকর বিবেচনা করিলেন; আবার সেই গাড়োয়ানকে গাড়ী চালাইতে বলিলেন। কিন্তু তখন আর গাড়ী চালায় সাধ্য কার? পাহারাওয়ালা ও জমাদার সাহেব দু'জনেই তখন বলিলেন যে,—"না মহাশয়,—একবার পুলিশ দিয়া হইয়া যাইতে হইবে! এই নিকটেই আমাদের পুলিশ-ফাঁড়ী; আপনি একবার এইটুকু পর্য্যন্ত হইয়া আসিবেন চলুন! আজ আমাদের উপর বড়ই কড়া হুকুম আছে যে, বেশীরাত্রে ট্রেণে মেয়ে-ছেলে লইয়া যাইতে হইলে থানায় লিখাইয়া যাইতে হইবে। এইরূপ আরও দুই-একজন বাবুকে এই একটু আগেই নিয়ে যাওয়া হ'য়ে-ছিল; আর, তাঁরা তখনই ফিরিয়া আসিয়া-ছেন! আপনাদেরও দেরী করাব না—যত শীঘ্র রিপোর্ট লওয়া হয় লইয়াই ছাড়িয়া দিব"। এই বলিয়া তাড়াতাড়ি জমাদার সাহেব সেই গাড়ীর কোচ্‌বাক্সে উঠিয়া বসিলেন; এবং পাহারাওয়ালাটা গাড়ীর পাছুতে দাঁড়াইয়া রহিল। তাঁহারা দুইজনেই গাড়ী মোড় ফিরাইতে বলিলেন।

"এ ভারি অন্যায়—এ বড় অন্যায়!" বলিয়া গোকুল বাবু তাহাতে বাধা দিতে যাই-লেও, কেহই তাঁহার সে কথা শুনিলেন না। কাজেই গাড়োয়ানকে গাড়ী থানার দিকেই চালাইতে হইল। এত তাড়াতাড়ি করিয়াও, বিধির বিপাকে গোকুল বাবুকে সে ট্রেণ মিস করিতে হইল।

ছায়া *।

(সমালোচনা।)

'ছায়া' ছায়াই বটে! লক্ষণ যেমন, নামটিও সেরূপই হইয়াছে। দিবারাত্রি যাহা দেখি-তেছি; শুধু দেখিতেছি কেন, যাহাতে ডুবিয়া-মজিয়া রহিয়াছি; যাহাতে জ্বলিয়া-পুড়িয়া অস্থি-কঙ্কাল-সার হইতেছি;—বাস্তবিকই এ 'ছায়া' সেই-ই ছায়া! সেই-ই বটে,—পুরাতন—অতি পুরাতন, নিত্য-দৃষ্ট—প্রতি মুহূর্ত্তের দৃশ্য, হৃদয়ের স্তরে স্তরে বিদ্ধ—চক্ষের পলকে পলকে অবস্থিত, সত্য;—কিন্তু তবুও নূতন! কি জানি কেন, কেহ দেখাইলে অথবা দেখাইতে পারিলে, পুরাতনও এইরূপ নূতন হয়!

এ 'ছায়ায়ও' সেরূপ নূতনত্ব অনেকটা আছে। আপনার সংসারে—আপনার ঘরের ভিতর, যাহা দেখিয়াছি, নিত্য দেখিতেছি, এবং যত-দিন বাঁচিব, ততদিনও দেখিব; এ 'ছায়াও' সেই তারই ছায়া! তবে সাজাইয়া-গুজাইয়া—আমার ঘরের পাশে তোমার ঘর বানাইয়া অথবা তোমার পাশে আমাকে দাঁড় করা-ইয়া, তার কিরূপ 'ছায়া' পড়ে, এ 'ছায়া' সেই-ই ছায়া!

সে ছায়া এ 'ছায়ায়' ফুটিয়াছেও, ভাল। তোমাতে-আমাতে ঠিক যেমনটি, অথবা তাহাতে-তোমাতে ঠিক যে ভাবটি, এ 'ছায়ারও' ছায়ায় মিলিতেছে তাই! আমি যেমন আমার প্রাণের সহোদরকে পৃথক করিয়া দিয়া—অন্নের কাঙ্গালী করিয়া, নিজে সুখৈশ্বর্য্যের উচ্চাসনে বসিতে সমুৎসুক; তুমি যেমন তোমার নব-বধূর পরামর্শে জন্মদাতা পিতা ও জঠরধারিণী জননীকেও পর করিতে পারিতেছ; এ ছায়া ঠিক সেই তারই ছায়া! আমার কাঙ্গালিনী পত্নী যেমন নিজে অনাহারী থাকিয়া—ছিন্নবস্ত্রে লজ্জা-নিবারণ করিয়া, কিসে আমরা সুখী হই—কি উপায়ে আমাদের ভাঙা-ঘর যোড়া লাগে, সদাই সেই চেষ্টায় রত; আর তোমার গৃহিণী যেমন কেবল নিজের সুখেচ্ছার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া—কেবলমাত্র 'আপনারটিকে' বুঝিয়া, আত্মীয়-স্বজনকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিতেছে; এ 'ছায়া' তারই ছায়া।

*গার্হস্থ উপন্যাস। শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত এবং শ্রীযুক্ত বাবু রাধানাথ মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

এ 'ছায়ায়' পরম ঐশ্বর্য্যবান খেলারাম অনায়াসে প্রাণের সহোদর আত্মারামকে পথের ভিখারী করিয়া দিয়া সংসারের ব্যয় কমাইতে পারেন; এ 'ছায়ায়' বিলাসিনী পত্নীর বিলাসিতা পূর্ণ করিতে না পারিয়া দেবস্বভাব কৃষ্ণকান্তকে উদাসীন হইতে হয়; এ ছায়ায় কামময়ীর কামনা পূর্ণ করিতে গিয়া দুলালের সোনার সংসার ছারখারে যায়! আবার এ ছায়ায় রমার রমণীয়তায় আত্মারামের সন্তপ্ত আত্মা স্নিগ্ধতা পায়; সুশীলার শীলতার উচ্ছৃঙ্খল রতিকান্ত প্রকৃতিস্থ হয়—তাঁহাদের বিচ্ছিন্ন সংসার-পরমাণু সংযোগ-শিক্ষার আদর্শ হয়! আরও এ ছায়ার সংসারের কল্যাণবিধায়িনী কল্যাণী-রত্নকে তুচ্ছ কাচভ্রমে লোকে অবহেলে ফেলিয়া দিয়া, বিষকুম্ভপয়োমুখী কামময়ীকে তৎস্থান অধিকার করিতে দেয়; প্রকৃত শিক্ষা, প্রকৃত দীক্ষা ত্যাগ করিয়া লোকে কুশিক্ষা-কদাচারের আশ্রয় লয়! এইরূপ আমাদের আছে যেটি, থাকে যেটি—হয় যেটি, যায় যেটি—এ 'ছায়া' তারই ছায়া!

'ছায়ায় যখন দেখিতে পাই, একদিকে কল্যাণদায়িনী কল্যাণী বৃদ্ধ পিতাকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া মানবলীলা সম্বরণ করিতে-ছেন, আর অন্যদিকে তাঁহার শ্বশুর খেলারাম সেই কন্যাশোকগ্রস্থ বৃদ্ধের নিকট পুত্রবধূর গায়ের গহনাগুলি চাহিতেছেন; তখনকার সে ছায়া দেখিয়া কি আর অশ্রু সম্বরণ করা যায়? আবার যখন দেখি, পিতা আত্মারামের ক্রোড়ে শান্ত অন্তিমশায়ী, আর ডাক্তার মহাশয় দর্শনীর দুটিটাকা পকেটে পুরিয়া বাকী দুটি টাকার জন্য ঔষধের ব্যবস্থা-পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিতেছেন; তখনও কি আর অশ্রু সম্বরণ করা যায়? এই-রূপ ছায়ার অপরদিকে আবার যখন দেখি, কোথাকার কে একজন অপরিচিত কৃষ্ণকান্ত অনাথ আশ্রয়হীন আত্মারামকে ডাকিয়া আশ্রয় দিতেছেন; স্নেহা একটা অপরিচিতা বালিকা—খাইতে পাইতেছে না দেখিয়া সে সুশী-লাকে ডাকিয়া খাইতে দিতেছে; তখনও কি আর হৃদয়ে আনন্দের পরিসীমা থাকে? এইরূপ ডাক্তারের জাতি ডাক্তারের হৃদয়েও দয়াদাক্ষিণ্য, কোমল-প্রাণ অবলার হৃদয়েও সহিষ্ণুতা, সহস্র বিপৎপাতেও ধার্ম্মিকের ধর্ম্মে আস্থা—এ সকল দেখিয়াই বা কে আনন্দে উদ্বেলিত না হয়! ফলতঃ 'ছায়ায়' ছায়ার কোমল-কঠিন—পাপ-পুণ্যের দু'দিকই দেখান হইয়াছে। এক-দিক দেখিয়া যেমন কাঁদিয়াছি; অপর দিকে তেমনই মনে আশা-ভরসার সঞ্চার হইয়াছে।

এরূপই তো চাই! 'ছায়া'-কারের এ কৌশল না থাকিলে, সকল দিকের সকল ছায়া ফুটিবে কেন? পাপীর পার্শ্বে পুণ্যবান, নরকের সম্মুখেই স্বর্গ—এ দৃশ্য না ধরিলে লোকের ভেদাভেদ-জ্ঞান সম্যক জন্মিবে কেন? আর, বাস্তবিকই এই জন্যই এ 'ছায়া' ফুটিয়াছে ভাল। ছায়াকার এ 'ছায়া' দেখাইয়া প্রকৃতই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

এ 'ছায়ার' আরও একটি চিত্র বড়ই সুন্দর! "বর্ত্তমান শিক্ষায় প্রণয়িণী কোন্‌রূপে যোড়া ঘর ভাঙ্গেন, আর পূর্ব্বতন শিক্ষায় গৃহিণী কোন্‌-রূপে ভাঙ্গা-ঘর যোড়া দিতেন;" অথবা "সংসা-রের কোন্ বলে বলী হইয়া সংসার পাতিলে পাশ্চাত্য-শিক্ষা অপনোদনে হিন্দুর পরম শিক্ষায় সুন্দর হয়;"—এইরূপ যে কয়টি দৃশ্য, এ 'ছায়ায়' কিন্তু বেশ সুস্পষ্ট দেখা গেল। তাহাতে অনেক দেখিবার ও শিখিবার বিষয় আছে। এরূপ গার্হস্থ 'ছায়া' ঠিক সময়োচিতই হইয়াছে। এ 'ছায়া' আমরা সকলকেই উপভোগ করিতে বলিতে পারি।

'ছায়ার' সবই ভাল; তবু কিন্তু নিখুঁত নহে। 'ছায়া' দেখিয়া কিন্তু অনেকস্থলের মর্ম্মও আবার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। কেবল উপরের দৃশ্য-আবরণে—ভাষায় নহে; ভাবেও বটে! আমাদের বুঝিবার শক্তি কম, অথবা

ছায়াকারেরই তাহাতে ত্রুটী, বলিতে পারি না। তবে যে 'ছায়া' স্ত্রীপুরুষ সকলেই দেখিবে বলিয়া—যাহা দেখিয়া সকলেই শিখিবে এই আশা, ওরূপ ভাব তাহা হইতে পরিত্যক্ত হইলেই ভাল হইত। বিশেষতঃ কতকগুলি শাস্ত্রের সমস্যাপূর্ণ উপদেশ উহার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া অংশবিশেষ আরও দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে। সে সকল অংশ বুঝিতে বা বুঝাইতে বড় অল্প সাহসের আবশ্যক করে না! পরিচয়-স্থলে তাহার একটী 'ছায়া' পাঠকগণ দেখুন, এই,—

"শান্তরূপে যে আসিয়া, আমায় দেখা দিয়াছিল, তাহারই বলে দেহখানা পৃথিবীর বস্তু-সংগ্রহে, মনরূপী অন্তঃসারগত সত্বা লইয়া, আমার হইয়াছিল।"

তা'রপর 'ছায়া'-কারের ভাষা-চিত্র! ইহাও সকল স্থলে সমান সহজ-বোধ্য নহে। যথা,—

"তখন কমলিনী জানু পাতিয়া নিত্য চিন্তিত সেই মানস-চক্ষে দেদীপ্যমান মনকল্পিত নানাভাবে বিভূষিত সেই বহুদিনের দেখা আত্মপতি, মুদিতচক্ষে জাজ্বল্যমান দেখিয়াও, আশায় যোড়-হস্তে ভূমি আসন গ্রহণ করিলেন।

"খেলারাম বাবুর স্বর্গীয় স্ত্রী তিন পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া, স্বামী-সহবাসে পরিতৃপ্ত হইয়া, মানবজীবনে ধিকার দিতে দিতে, সত্বরেই খেলারাম বাবুকে বিক্রীত দেহ ত্যাগ-করেন।"

এইরূপ স্থান আরও অনেক আছে। 'ছায়া'-কার সকল স্থলে যদি সমান সরলতা বজায় রাখিতে পারিতেন,তাহাহইলে সোনায় সোহাগা হইত। 'গার্হস্থ উপন্যাস'—এ আখ্যাটিও তাহা হইলে খাটিত ভাল! সকলে পড়িবে—সকলে বুঝিতে পারিবে, এই তো বাহাদুরী! যাইহোক, আমরা ভরসা করি, অতঃপর 'ছায়া'কারের এদিকে একটু দৃষ্টি থাকিবে! আর এইটুকু তাঁহার নিকট হইতে পাইলেই, আমরা সর্ব্বাঙ্গীন সফলতা পাইব ভরসা করি।

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

'দীপিকা'

নাম্নী মাসিক পত্র চালাইব বলিয়া, মলঙ্গা লেন, বৌবাজারের বাবু প্যারীমোহন হালদার অনেকের নিকট হইতে অগ্রিম মূল্য লন। কিন্তু এখন কেহই তাহা পাইতেছেন না। হালদার মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিলেও উত্তর নাই। শুধু 'দীপিকাও' নহে; 'উপন্যাস-সন্দর্ভ প্রভৃতি আরও নানা কাজে তাঁহার অপযশ হইতেছে। পশ্চাৎ না ভাবিয়া কোন কাজ করিতে যাওয়ারই এই ফল। যাইহোক, কোনরূপ সদিচ্ছা থাকিলে, হালদার মহাশয় এখনও গ্রাহকদের তুষ্ট করিবেন, এই বাসনা।

আর একজন জুয়াচোর

ধরা পড়িয়াছেন। নাম অমৃতলাল দে। পাঠকগণের বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে যে, মধ্যে মধ্যে 'অনুসন্ধানে' আমরা ৭১নং বেণ্টিঙ্ক-ষ্ট্রীটের 'মনি এণ্ড কোং' প্রভৃতির নানা জুয়াচুরীর বিবরণ লিখিয়াছিলাম। এ অমৃতলাল সেই সকলেরই সর্দ্দার! কথায় বলে,—'দশ দিন চোরের, একদিন সাধুর!' বাপাজীর ভাগ্যে কিন্তু এতদিনে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। বাপাজী এপর্য্যন্ত প্রায় ২০টি নামে ২০ রকমের কারবারের বিজ্ঞাপন জাহির করিয়া সাধারণকে প্রতারিত করিতেছিলেন; কখনও সাহেব, কখনও ফিরিঙ্গী, কখনও বা বাঙ্গালী সাজিয়াই—যখন যেরূপ সুবিধা যুটিত, সেই ভাবেই—তিনি এতদিন কাটাইতে ছিলেন! ২০টার মধ্যে গুটিকএক ফার্ম্ম ও তাহার কীর্ত্তির বিষয় দেখুন, এইরূপ,—

(1) Money & Co. (2) Lewes & Co. (3) Father Gill & Co. (4) Dey & Co. (5) Dey Palmer & Co.—London, Liverpole and India. (6) Publisher of the Nobility of India. (7) Secretary to the Lansdowne Royal Scientific college. এইরূপ কীর্ত্তিই বিস্তর! কিন্তু সকলগুলি প্রকাশের স্থানাভাব। যাইহোক, এই শেষ ব্যাপারেই বাপাজী কিন্তু ধরা পড়িয়াছেন। ঐ 'ল্যান্সডাউন রয়েল সায়েণ্টিফিক্ কলেজ' খুলিবার জন্য ছোটনাগপুরের মহারাজার নিকট হইতে টাকা সংগ্রহ করার অপরাধেই এবার দে মহাশয়কে ফাঁদে পড়িতে হয়। তলে তলে ডিটেক্‌টিভ্ লাগিয়া, এই ব্যাপারে আসামীশ্রেণীতে ভুক্ত করিয়া, তাঁহাকে লোহাগারায় চালান দেওয়া হয়। সেখানকার বিচারে—পুলিসের তদ্বির-তল্লাসে দোষ প্রমাণ হইয়াছে। অমৃতলাল এখন দুইমাসের জন্য কারাদণ্ড ভুগিতেছেন। যাঁহারা তাঁহার ঐ সকল কীর্ত্তি-কলাপের ফাঁদে পড়িয়া প্রতারিত হইয়া আমাদিগকে পত্রাদি লিখিয়াছিলেন, তাঁহারা বোধ হয়, এখন অমৃতের এ দণ্ডে আনন্দিত হইবেন! যেরূপে হউক, জুয়াচোর জব্দ হয়, এই বাসনা।

Express কাগজের

প্রতিনিধি সাজিয়া দুইটা সাহেব 'চিত্রশিল্পী কোম্পানীকে' যেরূপে ঠকাইয়া গিয়াছিল, এখন আবার সংবাদ পাইতেছি—মৃজাপুর ষ্ট্রীটের 'রায় চৌধুরী কোম্পানীকেও' ঠিক সেই-ই কুহকে ঠকাইয়া গিয়াছে। 'অনুসন্ধান' যেদিন কলিকাতায় বাহির হয়, ঠিক তারই পূর্ব্বের দিন সাহেব তাঁহাদের নিকট হইতে টাকা লইয়া গিয়াছে। 'অনুসন্ধানে' সাহেবের বিবরণ পড়িয়া তাঁহারা পরে সাহেবের তল্লাস লইয়াছিলেন; কিন্তু কোনই সন্ধান পান নাই। ইহাঁদের নিকট সাহেবটা আবার বলিয়াছিল যে, 'ষ্টেটস্‌ম্যান' আপিসেই এখন তাহাদের আপিস; সুতরাং তাহার হাত দিয়া 'ষ্টেটস্‌ম্যানে' বিজ্ঞাপন দিলেও সুবিধা দরে পাওয়া যায়। কাজেই কোম্পানীও তাহাই করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন মূলেই হাবাত! যাইহোক, এখনও সকলে সাবধান হউন।

মূল্য-ফেরত দিবার লোভানী,

বিশেষতঃ ঔষধের বিজ্ঞাপনে, যাঁহারাই দেখান, তাঁহারাই প্রায় ফাঁকি দেন। এ-সম্বন্ধে আমরা প্রায় অনেক বিজ্ঞাপনদাতার নামেই অভিযোগ পাই। এক এক করিয়া নাম প্রকাশ করিতে যাইলে, অনেকেরই নাম প্রকাশ করিতে হয়। সুতরাং এবার আর কাহারও নাম প্রকাশ করিতেছি না। তবে নিতান্ত যাহাদের নাম না প্রকাশ করিলে-নয়, বারান্তরে তাহাদের নাম প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল। ফলতঃ গ্রাহকগণ মোটামুটি এইটুকু মনে রাখিবেন যে,—ঔষধের বিজ্ঞাপনে রোগ আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরত প্রায়ই পাওয়া যায় না; নানা ওজর-আপত্তি তুলিয়াই তাহারা ফাকি দেয়।

সংবাদ।

—খবরের কাগজেই লোকে বিজ্ঞাপন দেয়; কিন্তু আকাশ-আসমানে বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কেহ শুনিয়াছেন কি? সম্প্রতি আমেরিকার এক সাহেব মেঘের গায়ে বিজ্ঞাপন লাগাইবার এক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, সংবাদ পাওয়া যায়। আকাশে যখন মেঘ হয়, তখন ম্যাজিক লণ্ঠনের যোগে তিনি মেঘের গায়ে নাকি বিজ্ঞাপন ধরেন; আর তাহাতে মেঘের গায়ে সাদা সাদা অক্ষর ফুটিয়া উঠে! কালে কতই শুনিব?

—বিবাহের পর বাসর-ঘরে! পোলাণ্ডের এক নবপরিণীত যুবক নববধূর সহিত শয়ন করিয়া আছেন! সমস্ত রাত্রি এইভাবেই কাটিয়া গেল। প্রাতঃকালেও কিন্তু তাঁহারা দুয়ার খুলিলেন না। লোকে ভাবিল,—"নূতন বিবাহ—আমোদ-আহ্লাদে রাত্রি জাগিয়াছে; সুতরাং উঠিতে বেলা হইতেছে!" কিন্তু ক্রমেই বেলা বাড়িতে লাগিল; তথাপিও তাঁহারা উঠিলেন না! তখন আহারাদির জন্যও অন্ততঃ তাঁহাদিগকে ডাকিতে হইল! কিন্তু কি কি আশ্চর্য্য, ডাকিয়া সাড়া-শব্দ নাই যে! ক্রমে ব্যাপার গড়াইলও অনেকদূর; সাড়াশব্দ না পাইয়া কাজেই দুয়ার ভাঙ্গিয়া সকলকে ঘরে প্রবেশ করিতে হইল। দুয়ার ভাঙ্গিতেই একি বিভ্রাট উপস্থিত! সকলেই দেখিল, নববধূ ছিন্ন-বিছিন্ন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন; আর যুবকেরও অঙ্গ দিয়া রক্তধারা পড়িতেছে!

যুবক যেন সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া, তখন কুকুরের ন্যায় ডাকিতে ডাকিতে অপর সকলকে কামড়াইতে আসিল! সকলে তো বিব্রত! অগত্যা যুবককে বন্ধন করা হইল। কিন্তু তখনও তাহার সেই ডাক; এবং নিজের গাত্র সে নিজেই কামড়াইতেছে! আর এই-রূপেই সেইদিনই যুবকেরও মৃত্যু হইল। যাইহোক, কারণ অনুসন্ধানে পরে জানা গিয়াছে যে,—বিবাহের অল্প দিন পূর্ব্বে তাহাকে কুকুরে কামড়াইয়াছিল, এবং তখন সে তাহা গ্রাহ্য করে নাই। পরে বিবাহের দিন উত্তে-জনা-বশতঃ তাহার এই জলাতঙ্ক রোগ জন্মিয়াছিল।

—স্ত্রীলোকের গাড়িতে স্ত্রীলোক সাজিয়া দুইটা পুরুষ উঠিয়াছিল। অযোধ্যা হইতে রোহিলখণ্ডে যখন তাহা-দের গাড়ি পৌঁছিল, তখন রাত্রি প্রায় মাঝামাঝি। সেই সময়, অবসর বুঝিয়া, তাহারা গাড়ীর অপর স্ত্রীলোকদের দ্রব্য-সামগ্রী লইয়া নামিয়া পড়ে! এমন সময়ই ট্রেণ ছাড়িয়া দেয়। মেয়েরাও আর চেঁচাইতে পারে না।

—হাবড়ায় একটা চোর একটি ঘুমন্ত স্ত্রীলোকের ঘরে চুরী করিতে ঢুকিয়াছিল। চোরটা অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে স্ত্রীলোকটির হাতের উপর গিয়া পড়ে। স্ত্রীলোকটি জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলে। হুঁকা-হুঁকি ডাকাডাকিতে লোকজন জড় হইল; পুলিশ গিয়া চোর ধরিল। বিচারে চোরটার তিনমাস মেয়াদ হইয়াছে।

—বলদেব দাস বড়বাজারের একজন জহুরী। একদিন দুইটী ভদ্রবেশী বাবু আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—"সেয়ালদহের এক মহাজনের কাছে আমাদের কতকগুলি গহনা বন্ধক আছে; আপনি যদি ক্রয় করেন, তবে আমা-দেরও ঋণশোধ যায়, এবং আপনাকেও কিছু লাভ দিতে পারি।" লাভ পাইবেন, কাজেই জহুরী মহাশয় স্বীকৃত হইলেন। তখন তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বাবু দুইটি শেয়ালদহে মহাজনের নিকট লইয়া গেলেন। শ্যামা নামক একব্যক্তি আপনাকে মহাজন বলিয়া পরিচয় দিল; এবং গহনার একটা বাক্স তাঁহাদের দেখাইয়া বলিল,—"কই, টাকা দেন!" কাজেই জহুরী মহাশয়কে মায় সুদ ২৭৫ টি টাকা দিতে হইল। শ্যামা তখন যেন গহনা বাহির করিতে বসিল। এমন সময়ই এ কি বিভ্রাট! দু'টো পুলিসের লোক একখানা গ্রেপ্তারী-পারো-য়ানা সহিত আসিয়া শ্যামাকে বামাল-সহ গ্রেপ্তার করিল; শ্যামা পুলিসে প্রেরিত হইল। জহুরী মহা-শয় তো অবাক! বিশেষতঃ তাঁহার সঙ্গী দালাল বাবুরাও ইত্যবসরে সম্পট দিয়াছেন! যাইহোক এখন কিন্তু সন্ধানে তাহাদের সকল চাতুরীই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে; পুলিস সাজিয়া গ্রেপ্তারী-পরোয়ানা লইয়া আসাটাও জাল বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে! কি ভয়ানক কাণ্ড!

—জুয়াচুরীর নূতন ফন্দিই বটে! কচ্ছ হইতে একজন জাল জৈন বোম্বাই আসিয়া দেখেন, সেখানে একটীও জৈন-মন্দির নাই। অমনি তিনি এক চাঁদার খাতা খুলিয়া বসিলেন! স্বয়ং ১০ হাজার টাকা চাঁদা দিলেন; এবং এদিক-ওদিক হইতেও হাজার আষ্টেক টাকা উঠিল! তখন সেই ২০ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে রাখিবার কথাহইল। কিন্তু জৈনজী তাহাতে বলিলেন,—"ব্যাঙ্কে কম সুদ—আমার কাছেই থাক, আমি বেশী সুদ দিব।" কাজেই সেইরূপই বন্দোবস্ত হইল। কিন্তু তাহার পরই জৈনজী নিরুদ্দেশ! যাইহোক, চাঁদাদাতারা এখন জৈনজীর নামে ওয়ারিণ বাহির করিয়াছেন। ফল কি হয় এখন ভগবানই জানেন।

—বরিশাল জেলায় নরোত্তমপুর গ্রামবাসী.....চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় নামক এক কুলীন ব্রাহ্মণ আপনার দুই সহোদরা ভগ্নী এবং দুটী কন্যাকে একই রাত্রে একই বরে সম্প্রদান করিয়াছেন। আরও গাঙ্গুলী মহাশয় এবং তাঁহার এক পুত্র দুইটী সহোদরা ভগ্নীকে বিবাহ করিয়াছিলেন! ইহাতে 'সহযোগী' বলেন,—এই সময় বেতাল থাকিলে বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিতেন, মহারাজ ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কি সম্বন্ধ হইবে? কথাটা ঠিকই বটে!

—সাতক্ষীরার সোনাই-গ্রামে জয়চাঁদের বাস। তাহার স্ত্রীর বয়স ১৪ বৎসর মাত্র। সে এক দিন গ্রামের ভিতর কার্য্যান্তরে গিয়াছে; ঘরে তাহার অভিভাবক কেহই নাই। এমন সময়ে গ্রামের কালী গোলদার, মহাদেব সরকার, ও মধু বেঁশে নামক তিনটা গুণ্ডা আসিয়া তাহার স্ত্রীকে আক্রমণ করিল; জোর করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। অভাগিনীর সাধ্য কি যে, তাহাদের সে গতি রোধ করে? অবশেষে দুরাত্মারা নাকি অভাগিনীকে বলাৎকার পর্য্যন্তও করিয়াছিল। যাইহোক, দুরাত্মারা এখন গ্রেপ্তার হইয়াছে, বিচার চলিতেছে। ভরসা, এইরূপ পাপের সমুচিত শাস্তিই পাইবে।

—পানীয় বা খাবারের সহিত ধুতুরা প্রভৃতি বিষাক্তদ্রব্য মিশাইয়া, কতকগুলা বদমাইস আজকাল রেলযাত্রী-দিগকে অজ্ঞান করিয়া তাহাদের দ্রব্যাদি কাড়িয়া লইতেছে। সাধারণে সাবধান!

অনুসন্ধান।

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

৩য় খণ্ড] ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৭ সাল। [২০শ সংখ্যা।

তবে শরীরের মাঝে আমি কোন্ জন?

কথায় কথায় বলি, আমি করি সব।
জানি না কে করে দেহে আমি আমি রব॥
আমি খাই, আমি শুই, আমি নিদ্রা যাই।
কে করে সে আমি আমি, আমি চিনি নাই।
এটী হাত, ওটী পদ, আরটী নয়ন।
তবে শরীরের মাঝে আমি কোন্ জন?

শিরা, অস্থি, বশা, ত্বক, রুধীর-আধার।
মস্তিষ্ক, করোট, মাংস, মাংসপেশী আর॥
রুধীর, ধমনী যত শোণিতের রস।
প্রণালী অশেষবিধ ইন্দ্রিয় সে দশ॥
যে যার স্বকীয় নামে বিখ্যাত ভুবন।
তবে শরীরের মাঝে আমি কোন্ জন?

মন কি হইবে আমি, তা কেমনে হয়!
আমি নিদ্রা গেলে মন জাগুরুক রয়॥
আমি করি এক কাজ, মন ভাবে আর।
আমার অগম্যপথে গমন তাহার॥
আমাতে মনেতে ভাব ভিন্ন অনুক্ষণ।
তবে শরীরের মাঝে আমি কোন্ জন?

প্রাণ-বায়ু অন্তরস্থ আকারবহিত।
ক্ষণেক সংযোগমাত্র দেহের সহিত॥
দেখিতে দেখিতে যায় দেহ তেয়াগিয়া।
তারেই বা আমি বলি কেমন করিয়া॥
প্রাণ যদি আমি নয়, আমি নয় মন।
তবে শরীরের মাঝে আমি কোন্ জন?

আছে এক লিঙ্গদেহ শরীরে নিশ্চয়।
সূক্ষ্মরূপে শরীরেতে সর্ব্বদাই রয়॥
জন্ম তার জঠরেতে কর্ম্মফলভোগী।
এদেহের সঙ্গে নয় সে দেহ সংযোগী॥
প্রাণান্ত-সময়ে হয় তাহার গমন।
তবে শরীরের মাঝে আমি কোন্ জন?

রয়েছে জীবাত্মা সেই চৈতন্যের কায়া।
কোন কোন ঋষি কন, পরমাত্মা-ছায়া॥
কেহ কহে দেহীমাত্র, কেহ কহে আর।
দেহ ছাড়া হৈলে হয় আত্মার সমান॥
মরিলে কোথায় রয় জীবাত্মা তখন।
তবে শরীরের মাঝে আমি কোন্ জন?

আর কতগুলি আছে তন্ত্রমতে কয়।
সুষুম্না-নাড়ীতে সপ্ত পদ্ম গাঁথা রয়॥
মূলাধার স্বাধিষ্ঠান আদি আর আর।
সে সব কমলে শক্তি মুক্তির আধার॥
ভাবিলে একাধি সব সমাধি-কারণ।
তবে শরীরের মাঝে আমি কোন্ জন?

বিশুদ্ধ কমলে হয় আকাশমণ্ডল।
অনাহতে বায়ু মণিপুরেতে অনল॥
স্বাধিষ্ঠানে সলিলমণ্ডল অবস্থিত।
মূলে বসুমতি এই বুঝিবে নিশ্চিত॥
সে সব মণ্ডলে নাই আমি নিরূপণ।
তবে শরীরের মাঝে আমি কোন্ জন?

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস।*

(২)

বিদ্যাপতিও লিখিলেন বেশ। বিরহের দিন বুঝি আর কাটে না। বুকের ব্যথা বুকে লুকাইয়া, আশায় বুক বাঁধিয়া, এমন করিয়া আর কত দিন প্রাণ বাঁচিবে! বসন্ত আসিয়াছে—গাছে-গাছে কুসুম ফুটিয়াছে—শারদ চন্দ্রমার শুভ্র জ্যোৎস্নায় জগত হাসিতেছে; কিন্তু এ সুখে—এ আনন্দে রাধিকার প্রাণে একতিলও সুখ নাই। বিরহে রাধিকার প্রাণ যে উদাস, হৃদয় যে শ্মশান; তাহাতে আর সুখ কি? রাই এখন পাগলিনী। কুসুম-কানন দেখিয়া প্রেম-ময়ী দু'নয়ন বুজিয়া আছেন—চোখ মেলিয়া চাহিতে আর সাহস হয় না! কোকিলের মধুর কুহুস্বর শুনিয়া দুই কর দিয়া কান চাপিয়া থাকেন। কেন না, অতীতের কথা, গত সুখের কথা তাঁহার মনে পড়ে! কারণ, সে সকল যে স্মৃতির বৃশ্চিক-দংশন! রাধার এখন আর কিছুই ভাল লাগে না। তাই বিরহিনী সজল নয়নে পিয়ার পথপানে চাহিয়া চাহিয়া বসিয়া থাকিতেই কেবল ভালবাসেন; আর একতিল যেন চারিযুগের ন্যায় বোধ হই-তেছে। রাধার এ মলিন মুখচ্ছবি, বিরহিণীর এ বিষাদিনী মূর্ত্তি কি সুন্দর নহে? কিন্তু এ সৌন্দর্য্য—এ বিষাদ অপেক্ষা চণ্ডীদাসের হাতে এ ছবি ফুটিয়াছে ভাল। চণ্ডীদাস কিছু ভাবের কবি। তাঁহার জীবনে যেন দুঃখই অধিক। তাঁহার কবিতা পড়িলে বোঝা যায়, যেন তাঁহার কপালে সুখ বড় বেশী ঘটে নাই! চণ্ডীদাস রাধারূপে কৃষ্ণকে দেখিয়াছেন, আর বিদ্যাপতি সখীভাবে। চণ্ডীদাসের কবিতা অন্তরের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি—হৃদয়ের সরল উচ্ছ্বাস। চণ্ডীদাসের ভাবের দিকেই লক্ষ্য অধিক। তিনি যাহা লিখিয়াছেন, প্রাণ হইতে—ভাবের সহিত; আর বিদ্যাপতি যাহা লিখিয়াছেন, কল্প-নার বলে। চণ্ডীদাস ভাবের উৎকর্ষ দেখাইয়া-ছেন। চণ্ডীদাস ভাবে বিভোর, বিদ্যাপতি কল্পনায় বিভোর। চণ্ডীদাস প্রেমে মাতোয়ারা, আর বিদ্যাপতি সৌন্দর্য্যে আত্মহারা। কাহার দিকে চাহিব? একজন ভাবের মধ্যে নিমগ্ন হইয়াছেন, আর একজন কল্পনার মধ্যে আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছেন। বিরহে চণ্ডীদাস রাধিকার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন,—

"কাল জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে।
নিরবধি দেখি কালা শয়নে স্বপনে॥
কাল কেশ এলাইয়া বেশ নাহি করি।
কাল অঞ্জন আমি নয়ানে না পরি॥
আলো সই মুঞি শুনিলাম নিদান।
বিনোদ বঁধুয়া বিনে না রহে পরাণ।
মনের দুঃখের কথা মনে সে রহিল।
ফুটিল সে শ্যাম-শেল বাহির নহিল॥
চণ্ডীদাস কহে রূপ শেলের সমান।
নাহি বাহিরায় শেল দগধে পরাণ॥"

এই তো গেল ভাবের কবিতা। ভাষার ছন্দ নাই, লেখার বাঁধুনি নাই—কেবল ভাবের উপর দিয়াই কবিতা; অথচ কেমন সুন্দর! উপমা, বর্ণনা ও সৌন্দর্য্য তেমন কিছুই নাই; তবুও কেমন দুঃখপূর্ণ। এইটি ভাবের গুণ। কিন্তু এ সকল ভাবের কথা দূরে রাখিয়া, চণ্ডী-দাস নায়িকার পূর্ব্বরাগে যে চিত্র দেখাইয়া-ছেন—যে ছবি আঁকিয়াছেন, তেমন ভাবময়, সৌন্দর্য্য-পরিপূর্ণ, সরস ও সরল কবিতা তাঁহার আর কোনস্থলে দেখা যায় না। এমন আকু-লতার ভাব বিদ্যাপতিতেও দেখিতে পাইবে না। যথা,—

"সই, কেবা শুনাইলে শ্যাম-নাম?
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু
শ্যাম-নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পা'রে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে?
নাম-পরতাপে যার,
ঐছন করিল গো,
অঙ্গের পরশে কিবা হয়?
যেখানে বসতি তার, নয়নে দেখিয়া গো,
যুবতী ধরম কৈছে রয়?
পাসরিতে করি মনে, পাসরা না যায় গো,
কি করিব? কি হবে উপায়?
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে, কুলবতী কুলনাশে,
আপনার যৌবন যাচায়।"

চণ্ডীদাসের এ সঙ্গীত বড়ই সুন্দর। কবিতার এ সৌন্দর্য্যে চণ্ডীদাস ফুটিয়াছেন কিছু অধিক। বড় মধুর প্রাণ-প্রীতিকর আকুলতার ভাব—বড় চমৎকার অতৃপ্ত সৌন্দর্য্যের স্বতঃ-উচ্ছ্বাস! চণ্ডীদাসের এ সঙ্গীত প্রাণস্পর্শী; প্রাণের মধ্যে গিয়া, অন্তরে অন্তরে মিশিয়া, হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে বিঁধিয়াছে। এ সঙ্গীত শ্রবণে সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়; অন্তরে আপনা-আপনি কেমন একটা বিষাদের ভাব আসিয়া আমাদিগকে ছাইয়া ফেলে। চণ্ডীদাসের এ গানে যেন গতস্মৃতি প্রাণের মধ্যে জাগিয়া উঠে—যেন বহুদিনের পুরাতন কথা সকল কে আমাদিগের কাণের কাছে বলিয়া দেয়। এ গানে যেমন সৌন্দর্য্য আছে, আবার তেম্নি কবিত্বও আছে। এ দুঃখের কবিতা পড়িতে পড়িতে, বিরহাবস্থায় রাধিকার সেই শ্যামল মেঘমালাসদৃশ বিগলিত ঘন-কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ-পরিবেষ্টিত মলিন সজল মুখচ্ছবি—সেই নীমিলিত অশ্রুপূর্ণ হরিণনয়ন—বিরহে সেই শুষ্ক কনক-বরণ মৃণাল-বাহু—কখন অচেতন কখন সচেতন সেই বিষাদময়ী মূর্ত্তি—যেন আমরা চক্ষের সমক্ষে দেখিতে পাই। চণ্ডীদাসের প্রাণ কিছু খোলা, ভাব কিছু উদার, কল্পনা করিয়া ভাবিয়া-চিন্তিয়া তাঁহাকে কিছুই লিখিতে হয় না। ভাষার তত বাঁধাবাঁধি নাই, ভাবেরও তত আঁটা-আঁটি নাই; যাহা দেখেন, তাহাতেই প্রাণ ভরিয়া যায়। মোদ্দা কথাটা হইতেছে এই যে, চণ্ডীদাস আপনার ভাবে মজিয়াই আপনি লিখিতে বসিয়াছেন; এদিক-ওদিক তাকাইবার কিম্বা কোন এক বিশেষ সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করিয়া লিখিবার তাঁহার অবসর থাকে নাই। যেখানে ভাবের কথা, সেইখানেই চণ্ডীদাসের বেশ ক্ষমতা-বিকাশ; কিন্তু কল্পনায় বিদ্যাপতি বড় চমৎকার। তবে তা' বলিয়া যে চণ্ডীদাসের কবিতা একেবারে কল্পনা-রহিত, তাহা নহে। চণ্ডীদাসের ভাবই অধিক; আর কল্পনাও কিছু কিছু আছে। কিন্তু ইহা বলিতে হইবে যে, চণ্ডীদাসের কল্পনা ও কবিত্ব বিদ্যাপতির ধার দিয়া যাইতে পারেন নাই। নিম্নোদ্ধৃত অংশে চণ্ডীদাস রাধিকার বিরহ বর্ণনা করিতে বসিয়াছেন। এইস্থানে দেখা যাউক, তাঁহার কল্পনা ও কবিত্ব কতদূর! চণ্ডীদাস লিখিতেছেন, এইরূপ,—

"সুখের লাগিয়া, এ ঘর বাঁধিনু,
আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে, সিনান করিতে,
সকলি গরল ভেল॥
সখি! কি মোর কপালে লেখি,
শীতল বলিয়া, চাঁদ সেবিনু,
ভানুর কিরণ দেখি॥
উচল বলিয়া, অচলে চড়িনু,
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে, দারিদ্র্য বেঢ়ল,
মাণিক হারানু হেলে॥
নগর বসালেম, সাগর বাঁধিলাম,
মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুখাল, মাণিক লুকাল,
অভাগীর করম দোষে॥
পিয়াস লাগিয়া, জলদ সেবিনু,
বজর পড়িয়া গেল।
কহে চণ্ডীদাস, শ্যামের পিরীত,
মরমে রহল শেল।"

* ১৯ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের শেষ।

চণ্ডীদাসের এই কবিতাও মন্দ নহে। এখানে ভাবও আছে, আর কল্পনাও আছে। এই বিপরীত তুলনায় চণ্ডীদাস বেশ এক প্রকার নূতনতর কবিত্ব-শক্তি দেখাইয়াছেন। অন্য অন্য কবিতায় তাঁহার ভাবই অধিক; অন্য কোন সামগ্রীর তত কিছু বিশেষ পারিপাট্য নাই। কিন্তু এখানে ভাব, কল্পনা, কবিত্ব, সৌন্দর্য্য সকলই কিছু কিছু আছে। চণ্ডীদাসের অন্য অন্য কবিতা-সকল যেমন একই ধরণের লেখা, এটি সে সকল হইতে কিন্তু কিছু নূতন। তা' বলিয়া বিদ্যাপতির কি তাহা নাই? আছে। সে কবিতা আরো সুন্দর। তাহাতে কল্পনার আভাষও যেমন, ভাবের বিকাশও তেমনি যথেষ্ট আছে। যেটিতে বিদ্যাপতি নায়িকার রূপ-বর্ণনা করিতেছেন; সেইস্থানে বেশ দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিদ্যাপতির ক্ষমতা কতদূর বিস্তৃত, কবিত্ব কতদূর উচ্চদরের! দেবকবি বিদ্যাপতি লিখিতেছেন, শ্রীরাধার রূপ এইরূপ,—

"কবরী-ভয়ে চামর গিরিকন্দরে
মুখ-ভয়ে চাঁদ আকাশ।
হরিণী নয়ন-ভয়ে, স্বর-ভয়ে কোকিল,
গতি-ভয়ে গজ বনবাস॥
সুন্দরী কাহে মোহে সম্ভাষি না যাসি,
তুয়া-ডরে ইহ সব, দূরহি পলায়ল,
তুহুঁ পুন কাহে ডরাসি॥
কুচ-ভয়ে কমল-কোরক জলে মুদি রহুঁ,
ঘট পরবেশে হুতাশে।
দাড়িম শ্রীফল গগণে বাস করু,
শম্ভু গরল করু গ্রাসে॥
ভুজ-ভয়ে কনক মৃণাল পঙ্কে রহুঁ,
কর-ভয়ে কিশলয় কাঁপে।
বিদ্যাপতি কহ কত কত ঐছন
কহব মদন-প্রতাপে॥"

ভাব ও কল্পনা এই দুই সামগ্রীতেই কবিতা। যে কবিতায় ভাবও আছে, আর কল্পনাও আছে, সেই কবিতাই কবিতা। কারণ তাহা সম্পূর্ণ। যেখানে ভাব আছে, কিন্তু কল্পনা নাই; কিম্বা কল্পনা আছে, অথচ ভাব নাই; সে কবিতায় অভাব রহিয়া গেল। কবিতা লিখিতে হইলে ভাবও যেমন চাই, কল্পনাও তেমি চাই। লোকে কথায় বলে 'কবির কল্পনা'। তাই বলিতেছি, কল্পনা না থাকিলে কি আর কবিতা! চণ্ডীদাসের কবিতায় ভাব অধিক, আর বিদ্যাপতির কবিতায় কল্পনা অধিক। বিদ্যাপতির কবিতায় কল্পনা কেন অধিক, এ কথার একটা উত্তরও আছে। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভাব-সম্মিলনেও অল্পদিনের বিচ্ছেদে তেমন পরিপূর্ণ কবিতা ফুটে না। বাঙ্গালায় বিরহে যেমন কবিতা ফুটে, এমন আর কিছুতেই নয়। বিরহেই কবিতার পূর্ণ পরিমাণ। বিদ্যাপতির অধিকাংশ কবিতাই সখীর উক্তি; কিন্তু চণ্ডিদাসের তাহা নহে। কাজেই এ সকলে বিদ্যাপতির কিছু ভাবে অভাব পড়িয়াছে। চণ্ডীদাস স্বয়ং রাধা হইয়া মনোভাব ও বিরহ বর্ণনা করিতেছেন; তাহাতেই চণ্ডীদাসের বিরহ অত ভাল হইয়াছে। বিদ্যাপতি সেরূপ করিলে কতদূর কৃতকার্য্য হইতেন, তাহা বলা যায় না। তাই বিদ্যাপতি বিরহ-ব্যতীত 'প্রেম-বৈচিত্র' 'বয়ঃসন্ধি', 'অভিসার' ও 'মিলন' এই সকলেই ফুটিয়াছেন অধিক। কারণ, এ সকলই কল্পনার রাজ্যে। চণ্ডীদাসের বিরহই ভাল; আর কিছু তত ভাল নহে। তা' বলিয়া বিদ্যাপতির কবিতার মধ্যে বিরহ যে একবারে ভাল নাই, এরূপ নহে। বিরহের মধ্যে বিদ্যাপতির "এ ভরা বাদর" "লোচন লোর তটিনী নিরমাণ" প্রভৃতি যে দু'একটি কবিতা আছে, তাহা বেশ সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী। এই পর্য্যন্ত গেল বিরহের কথা। এইবার নায়কের পূর্ব্বরাগের কথা কিছু বলিব। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস দুই জনেই রাধার বাহ্য-সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট। দুইজনেই রাধাকে কি চক্ষে দেখিয়া, কি ভাবে বর্ণনা

করিতেছেন, দেখা যাউক। সেই ঘন চিকুর-জাল, সেই সুন্দর মুখ-কমল, সেই নয়নের চাহনি, দেখি, এখন কাহার হাতে কি ভাবে দাঁড়াইয়াছে! চণ্ডীদাস বলিতেছেন,—

"নবীন কিশোরী, মেঘের বিজুরি,
চমকি চলিয়া গেল।
সঙ্গের সঙ্গিনী, সকল কামিনী,
ততহি উদয় ভেল।
সই! জনমিয়া দেখি নাই হেন নারী।
ভঙ্গিম রঙ্গিম, ঘন যে চাহনি,
গলে যে মোতিম হারি।
মনের সহিতে, মরম কৌতুকে,
সখীর কান্দেতে বাহু।
হাসির চাহনি, দেখাল কামিনী,
পরাণ হারানু তহু॥
চলন ভঙ্গী, অতি সুরঙ্গী
চাপটিলে জীবন মোর।
অঙ্গুলির আগে, চাঁদ যে ঝলকে,
পড়িছে উজলি জোর॥
চাহে যাহা পানে, বধয়ে পরাণে,
দারুণ চাহনি তার॥"

আর বিদ্যাপতি কি বলিতেছেন, এখন দেখিতে হইবে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন,—

"অপরূপ পেখনু রামা।
কনকলতা অবলম্বনে উয়ল
হরিণী হীন হিমধামা॥
নয়ন-নলিনী দউ অঞ্জনে রঞ্জিত
ভাঙবি ভঙ্গি-বিলাস।
চকিত চকোর জোরি বিধি বান্ধল
কেবল কাজর পাশ॥
গিরিবর গরুয়া, পয়োধর পরশিত,
গীম গজমতি হারা।
কাম কম্বু-ভরি কনয়া শম্ভুপরি
ঢারত সুরধনী ধারা॥
পয়সি পয়াগে, যাগ-শত জাগই,
পায়য়ে বহু ভাগি।
বিদ্যাপতি কহ, গোকুল-নায়ক'
গোপীজন-অনুরাগী॥"

আরো দেখুন,—

"সজনি, ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘ-মালা সঞে তড়িত লতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল॥"

আরো একস্থলে বলিতেছেন,—

"গেলি কামিনী গজবর-গামিনী
বিহসি পালটি নেহারি।
ইন্দ্রজালক কুসুম-সায়ক
কুহকী ভেলি বরনারী॥
জোরি ভুজযুগ মোরি বেড়ল
ততহি বয়ান সুছন্দ।
দাম চম্পকে কাম পূজল
যৈছে শারদ চন্দ॥
উরহি অঞ্চল কাঁপি চঞ্চল
আধ পয়োধর হেরু।
পবন পরাভবে শরদ ঘন জনু
বেকত করল সুমেরু॥
পুনহি দরশনে জীবন জুড়ায়ব
টুটব বিরহ কত্তর।
চরণে যাবক হৃদয়-পাবক
দহই সব অঙ্গ মোর॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতী
চিত থির নাহি হোয়।
সে যে রমণী পরম গুণমণি
পুন কি মিলব মোয়॥"

এ কবিতার ছন্দে ছন্দে অমৃত, ভাষার বর্ণে বর্ণে মধুরতা। বর্ণনা উচ্চ দরের—কল্পনা স্বর্গের! চণ্ডীদাস এ কল্পনা—এ সৌন্দর্য্যের ধার দিয়াও যাইতে পারেন নাই।

চণ্ডীদাস কেবল উপরে ভাসিয়া বেড়াইয়াছেন—ভাবটি ছুঁইয়া গেছেন মাত্র, আর বিদ্যাপতি প্রাণের মধ্যে—মর্ম্মস্থলে গিয়া প্রবেশ করিয়াছেন। তাই বলিতেছি, বিদ্যাপতির সৌন্দর্য্যের বিনাশন নাই। বিদ্যাপতি কল্পনার

উচ্চ শৃঙ্গে উঠিয়াছেন, আর চণ্ডীদাস নিম্নে। নায়কের পূর্ব্বরাগে বিদ্যাপতি যেমন খুলিয়াছেন, চণ্ডীদাস তেমন নয়। কারণ, এ সকল কল্পনার কথা। তাই পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চণ্ডীদাস ভাবের কবি। বিদ্যাপতির বর্ণনা সরল, আর ভাষা প্রাঞ্জল। চণ্ডীদাস আমাদিগের সাদা-সিদা—অতশতের ভিতরে যান নাই। শুধু ভাব লইয়াই নাড়াচাড়া করিয়াছেন। চণ্ডীদাস প্রেমিক, আর বিদ্যাপতি কাল্পনিক। বিদ্যাপতি কবি, বিদ্যাপতি পণ্ডিত, বিদ্যাপতি অলঙ্কারপ্রিয়। সকল সামগ্রীতেই চণ্ডীদাসের অপেক্ষা ক্ষমতাও তাই কিছু কিছু বেশী। কিন্তু চণ্ডীদাসের গুণের কথা আর একটু বলিবার আছে। চণ্ডীদাস প্রেমিক; বিদ্যাপতি তেমন নন। চণ্ডীদাস বড় পিরীতি ভালবাসেন, তাই তাঁহার সকল কবিতাই পিরীতি-মাখা। বিদ্যাপতি একেবারে যে অপ্রেমিক, পিরীতি ভাল বাসেন না, তাহাও বলিতেছি না। তবে চণ্ডীদাসের অপেক্ষা কিছু কম। চণ্ডীদাসের প্রাণ পিরীতিতে একেবারে পরিপূর্ণ। এই দেখুন, চণ্ডীদাস কি বলিতেছেন। চণ্ডীদাস বলিতেছেন, —

"পিরীতি নগরে, বসতি করিব,
পিরীতে বাঁধিব ঘর।
পিরীতি দেখিয়া, পড়শী করিব,
তা বিনু সকল পর॥"

আরো এইরূপ বলেন যে,—

"পিরীতি অন্তরে পিরীতি মন্তরে
পিরীতি সাধিল যে।
পিরীতি রতন লভিল যে জন
বড় ভাগ্যবান সে॥
চণ্ডীদাস কয়, কলঙ্কে কি ভয়,
যে জন পিরীতি করে।
পিরিতি লাগিয়া, মরে যে ঘুরিয়া,
কি তার আপন-পরে॥"

যথার্থ পিরীতে কি আর ভালমন্দ আছে, না আত্মপর আছে? কবিও তাই বলিতেছেন,—

"ভালমন্দ যে করে বিচার,
প্রেম কোথা তার!
প্রেম বিমল গগণ-বারি,
সুস্থান কুস্থান নাহি জান,
সমভাবে হয় বরিষণ।"

এই তো প্রেমের রীতি। আর এক কথা, চণ্ডীদাস পিরীতির কথাও যেমন বলিলেন, তেমনি শ্যামের বাঁশীর কথাও বেশ বলিয়াছেন। শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীকে উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন,—

"হারে সই শুনি যবে বাঁশীর নিশান।
গৃহ-কাজ ভুলি প্রাণ করে আনচান॥
সতী ভুলে নিজ পতি, মুনি ভুলে মৌন।
শুনি পুলকিত হয় তরুলতাগণ॥
কি হবে অবলা-জাতি সহজে সরলা।
চণ্ডীদাস কহে সব নাটের গুরু কালা॥"

আরো এক স্থলে রাধিকার বেশ সরল উক্তি আছে। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর রব শুনিয়া শ্রীমতী বলিতেছেন,—

"বাঁশী কেন বলে 'রাধা রাধা!'
আমরাও বলি, সে যে 'রাধা' নামে সাধা,
তা নৈলে 'রাধা' বলবে কেন?"

চণ্ডীদাসের এ সৌন্দর্য্যটি বেশ খুলিয়াছে। 'বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা'—এই এক কথায় শুধু সহজে অন্তরের ভাব বেশ প্রকাশ হইয়াছে। বিদ্যাপতিতে কিন্তু তেমনটি নাই।

পাঠক! এত কথা তো বলিলাম, এত গান তো গাহিলাম! কিন্তু যে গানে প্রাণ ভাসিয়া যায়, হৃদয় ভরিয়া যায়, দুঃখস্বপ্ন ছুটিয়া যায়; যে গানে পাষাণ দ্রবীভূত হয়, যে গানে অশ্রু বিগলিত হয়, যে সঙ্গীতে বঙ্গের মুখ উজ্জ্বল, যে সঙ্গীতে বিদ্যাপতির মুখ উজ্জ্বল, যে সঙ্গীতে প্রাণ আছে, যে সঙ্গীতে ভারতের বৈষ্ণব কবিগণ পরাস্থ মানিয়াছে, যে সঙ্গীতের সৌন্দর্য্য অবিনাশী, যে সঙ্গীতে কল্পনা অসীম, যে সঙ্গীতে কবিত্ব পরিপূর্ণ; সে সঙ্গীত কি শুনিয়াছেন? সে সঙ্গীতে একাধারে ভাব—একাধারে ভাষা। সে সঙ্গীত প্রেমে চূড়ান্ত—সে সঙ্গীত ভাবে অনন্ত। পাঠক! এমন অতৃপ্তি-পরিপূর্ণ—এত প্রেমপরিপূর্ণ সঙ্গীত কি কোথাও শুনিয়াছেন? সে সঙ্গীত এই,—

"সখিরে কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহিঁ শুননু
শ্রুতি-পথে পরশ না গেল॥
কত মধু-যামিনী রভসে গোঁয়াইনু
না বুঝনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তুবু হিয়ে জুড়ন না গেল॥
যত যত রসিক জন রস অনুগমন
অনুভব কহে, না পেখে।
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল একে॥"

এ সঙ্গীতে প্রেম ভোরপুর। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমময়ী রাধিকার মুখ-সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া উদ্বেলিত হৃদয়ে বলিতেছেন,—"জন্ম-জন্মান্তর আমি ও-মুখ দেখিলাম, কিন্তু নয়নের তবু তৃপ্তি হইল না।" "লাখ লাখ নয়ন বিহি কাহে না দিল হামারে!" "হে বিধাতঃ! লক্ষ নয়ন তুমি আমারে কেন দিলে না? তা'হলে ওমুখের সৌন্দর্য্য আমি যে ভাল করিয়া দেখিতাম—দুই চোখে দেখিয়া আমার নয়নের তৃপ্তি হইল না!' এই তো প্রেমের পরাকাষ্ঠা—এই তো অতৃপ্তির সৌন্দর্য্য! এ না হলে আর প্রেম? যে মুখ দেখিবার জন্য তুমি পাগল—যাহাকে হৃদয়ে ধরিয়া তুমি উন্মাদ, সে মুখের সৌন্দর্য্য কি ক্ষণিক দেখিয়া পিপাসা মিটে? সে যে চিরজীবনের সাধ—সে যে ইহকাল-পরকালের সাধ—সে সাধ তো পুরিবার নহে! সে সৌন্দর্য্য যে অবিনাশী—সে সৌন্দর্য্যের কি আর পুরাতন আছে—সে যে নিতুই নব! আজীবন, যুগযুগান্তর দেখিয়াও সে সাধ মিটিবার নহে।

এইবার শেষ মিলনের কথা। এ মিলন উত্তপ্ত বিরহের পর স্নিগ্ধ শীতল ছায়া। এই স্থানে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম কলঙ্কহীন—উপসংহারে এ প্রেম উজ্জ্বলে-মধুরে মিশিয়াছে। এ প্রেম সংসারের মলিনতায় ক্লিষ্ট নহে—ইহা উজ্জ্বল ও দিব্য জ্যোতিতে প্রদীপ্ত। এই স্থানে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস দুই জনেরই ক্ষমতার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। দুই জনেই এবার এ মায়াময় সংসার হইতে দূরে।

দুই জনেই রাধাকৃষ্ণের প্রেমে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছেন। দুই জনেই সে ভাবে তন্ময়—দুই জনেই সে সৌন্দর্য্যে বিলীন। এইস্থানে চণ্ডীদাস প্রায় বিদ্যাপতির সমকক্ষ। চণ্ডীদাস লিখিতেছেন যে, বহুদিন পরে রাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া এইরূপ মনোভাব জানাইতেছেন,—

"বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি, তোমারে সঁপেছি,
কুল শীল জাতি মান॥
অখিলের নাথ, তুমি হে কালিয়া,
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপগোয়ালিনী, হাম অতি হীনা,
না জানি ভজন-পূজন॥
পিরীতি-রসেতে ঢালি তনু মন,
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি, তুমি মোর গতি,
মন নাহি আন ভায়॥
কলঙ্কী বলিয়া, ডাকে সব লোকে,
তাহাতে নাহিক দুঃখ।
তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার,
গলায় পরিতে সুখ॥

সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত,
ভালমন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস, পাপপুণ্য সম,
তোমারি চরণখানি॥"

আর অন্যদিকে বিদ্যাপতিও বলিতেছেন তাই। যথা,—

"যতনে যতেক ধন পাপে বাঁটায়নু
মেলি পরিজনে খায়।
মরণক বেরি হেরি, কোই না পুছত,
করম সঙ্গে চলি যায়॥
হে হরি বন্ধা তুয়া পদ-নায়।
তুয়াপদ পরিহরি, পাপ-পয়োনিধি,
পার হব কোন উপায়॥
যাবত জনম হাম, তুয়া পদ না সেবিনু,
যুবতী মতিময় মেলি।
অমৃত তেজি কিয়ে, হলাহল পীয়নু,
সম্পদে বিপদহি ভেলি॥
কিয়ে মানুষ, পশু, পাখী যে জনমিয়ে,
অথবা কীট, পতঙ্গ।
করম বিপাকে, গতাগতি পুনঃপুনঃ
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ॥"

আর এক স্থলে বলিতেছেন, এইরূপ,—

"মাধব মঝু পরিণাম নিরাশা।
তুহু জগতারণ, দীন দয়াময়,
অভয়ে তোহারি বিশোয়াসা॥
আধ জনম হাম, নিদে গোঁঙাইনু,
জরা শিশু কত দিন গেলা।
নিধুবনে রমনী, রস-রঙ্গে মাতনু,
তোহে ভজব কোন্ বেলা॥
কত চতুরানন, মরি মরি যাওত,
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুনঃ, তোহে সমাওত,
সাগর-লহরী সমানা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শেষ শমন ভয়ে
তুয়া বিনু গতি নাহি আর।
আদি অনাদিক, নাথ কৃপায়সি,
ভব-তারণ ভার তোহারা॥"

আমরাও বলি, তোমা বিনা আর গতি নাই। বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস-সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইল। তবু যেন আর বলা ফুরায় না। বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের এগুণের কথা বলিয়া তো ফুরাইবার নহে। বিদ্যাপতির কবিতার মাধুর্য্য কিছু অধিক। তাঁহার লেখা হিন্দিভাবাপন্ন। আরও এক কথা, মাঝে মাঝে সংস্কৃতের ছায়া পড়িয়া বেশ সরল ও সুন্দর হইয়াছে।

চণ্ডীদাস আমাদের সাদা বাঙ্গালী—তাঁহার তো কোন কথাই নাই। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস আমাদের বাঙ্গালা-সাহিত্যের একমাত্র গৌরব। তাঁহাদের এ মাহাত্ম্য কখনও মুছিবার নহে। বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে ভূপতিনাথ, সিংহ ভূপতি, চম্পতিপতি, গোবিন্দদাস প্রভৃতি অনেক কবি আছেন। কিন্তু বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের মতন কেহই নন। গীতিকাব্যে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস যেমন ফুটিয়াছেন, এমন আর কাহাকেও দেখা যায় না।

মাদক-সেবন। *

ডাক্তারেরা বহুবিধ অনুসন্ধান দ্বারা স্থিরীকৃত করিয়াছেন যে, মাদক পদার্থে শারীরিক পূর্ণতা-লাভের বিলক্ষণ প্রতিবন্ধক জন্মায়। অর্থাৎ মাদক সেবন না করিলে মানুষ যতদূর দীর্ঘ-কায় ও সবল-শরীর হইতে পারিত, মাদক পদার্থ তাহার অন্তরায়। মানবজাতি যে ক্রমে খর্ব্বকায় হইতেছেন, মাদক সেবন তাহারও এক-মাত্র কারণ।

দ্বিতীয়তঃ, মাদক দ্রব্য মানুষের কিডনি অর্থাৎ মূত্রনালীর উপর অত্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করে। মাদক সেবনে মূত্রনালী ক্রমে সংকীর্ণ হইয়া যায়। সুতরাং পুরুষত্বের বিশেষ হানি উপস্থিত হয়। পরীক্ষা-দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে

* গত সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর।

যে, যাহারা ঘোর মাদক-সেবনে আসক্ত, তাহা-দিগের আদৌ সন্তান-সন্ততি জন্মে নাই। তবেই দেখ, মাদক পদার্থ মানুষের কি এক ভয়ানক শত্রু! ইহা একদিকে যেমন মানবজাতিকে ক্রমে খর্ব্বকায় করিয়া ধীরে ধীরে ধ্বংশের পথে আন-য়ন করিতেছে, অপরদিকে পুরুষত্বহীন করিয়া মানুষের সন্তানদিগকেও তেমনই কৃশ ও দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতেছে।

তৃতীয়তঃ, চেষ্ট্ অর্থাৎ বুকের উপরও ইহার আধিপত্য কম নহে। ধূমপায়ীদিগের প্রায়ই বৃদ্ধাবস্থায় ক্ষয়কাশ-যক্ষ্মাকাশ প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া থাকে। তামাকের ধূমে ফুস্‌ফুস্ প্রায়ই দূষিত ও বিকৃত হইয়া যায়। এইজন্যই অতিরিক্ত ধূমপানে বা দোক্তা-ভোজনে হাঁপানি-রোগ উপস্থিত হয়।

চতুর্থতঃ, কণ্ঠনালীও মাদক-সেবনে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়ে। ডাক্তারেরা শবচ্ছেদ-পরীক্ষা দ্বারা ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, ধূমপায়ীদিগের কণ্ঠনালী দীর্ঘকাল তাম্রকূট সেবনে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়। হুকার নলের মধ্যে যেমন কাই পড়িয়া ক্রমে তাহার ছিদ্র বন্ধ করিয়া তুলে, মাদক পদার্থ কণ্ঠ-নালীর ভিতরও ঠিক সেইরূপ কার্য্য করে। যাহারা অতিরিক্ত মদ পান করে, তাহা-দিগের কণ্ঠনালীতে প্রায়ই ঘা হইতে দেখা যায়।

পঞ্চমতঃ, মস্তিষ্কের উপর মাদকদ্রব্য কি বিষময় ক্ষমতা বিস্তার করে, তাহা সকলেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। তামাকে অতিরিক্ত দম লাগাইলেই মাথা ঘুরিতে থাকে। তখন কি দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়, বোধ হয়, তামাকখোরদিগের প্রত্যেকেই কিছু না কিছু পরিমাণে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এই এক দিনে যে বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, বহু দিনে সেই ফল সঞ্চিত হইয়া অবশেষে শিরোঘূর্ণন প্রভৃতি উৎকট ও দুশ্চিকিৎস্য রোগ আনয়ন করে। তখন অনুতাপ ভিন্ন আর কোনই ঔষধ বিদ্যমান থাকে না।

ষষ্ঠতঃ, লিভার অর্থাৎ যকৃতের উপরও ইহার প্রাদুর্ভাব সামান্য নয়। ইহাতে যকৃ-তের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হয়; এবং তদনুসঙ্গিক নানা-প্রকার ব্যাধি উপস্থিত হইয়া শরীর নিস্তেজ ও দুর্ব্বল করিয়া ফেলে।

সংক্ষেপে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মাদক পদার্থে শরীর এমন বিকৃত ও অস্বাভাবিক করিয়া তুলে যে, কোন ঔষধই তাহাতে উপযুক্ত ফল উৎপাদন করিতে পারে না। ডাক্তারগণ স্পষ্টই বলিয়াছেন,—হোমিওপ্যাথিক ঔষধ নেশাখোরদিগের শরীরে প্রচুর ফল উৎপাদন করে না। অধিক কথায় প্রয়োজন কি, আফিম্-খোরেরা অনেকে স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়া থাকে; সাপে আমাদের কি করিতে পারে—আমরা সাপের বিষ হজম করিয়া ফেলিতে পারি!

মাদক সেবনে আমাদের মানসিক ও শারী-রিক যে সকল অনিষ্ট হয়, তাহা সংক্ষেপে প্রদ-র্শন করিলাম। এতদ্ভিন্ন মাদক সেবনের আরও একটী অনিষ্ট—অর্থধ্বংশ। অধুনা বিলাতি ও দেশী মদে কিরূপ সর্ব্বনাশ করিতেছে—কত দুঃখী পরিবার মদের দোকানে যথা-সর্ব্বস্ব প্রণামী দিয়া একমুষ্টি ভিক্ষান্নের জন্য কিরূপ হায় হায় করিয়া বেড়াইতেছে, তাহা আপনারা বিলক্ষণ অবগত আছেন। আফিম্-গাঁজা প্রভৃতিতে আবকারী-বিভাগে গবর্ণমেণ্টের বাৎ-সরিক প্রায় শত কোটী টাকা আয় হইতেছে। ইহার পর মদ্য-বিক্রেতাদিগের লাভ যোগ করিয়া দেখ, কত শত কোটী টাকা হইবে! আবার মদ, গাঁজা প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া এক তামাকের খরচ হিসাব করিয়া দেখ, অবাক হইয়া যাইবে। আমাদিগের ভারতবর্ষে ২৭ কোটী লোকের বাস। এই ২৭ কোটি হইতে স্ত্রীলোক বালক এবং যাহারা তামাক খায় না, তাহাদিগকে বাদ দেও, তথাপিও

দশ কোটী লোক অবশিষ্ট থাকিবে। মনে কর, এই দশ কোটী লোকের প্রত্যেকে সপ্তাহে ৫ পয়সার তামাক খাইয়া থাকে। এক্ষণে হিসাব করিয়া দেখ, সমস্ত ভারতবর্ষে এক তামাকের নিমিত্তই সপ্তাহে ১৫ লক্ষ ৬২ হাজার ৫০০ টাকা, মাসে ৬২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, এবং বৎসরে ৮ কোটী ১১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা খরচ হইতেছে। বৎসরে এই ৮ কোটী টাকা থাকিলে কিনা করা যাইতে পারে? কাপড়ের কল বল, সূতার কল, বল, বা অন্য যে কোন বৃহৎ কারখানা বল ইহাতে সকলই খোলা যাইতে পারে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য—কি ভয়ানক কথা যে, যে দেশে কোন সৎকার্য্যের জন্য চাঁদা তুলিতে গেলে ৮০০টাকা তোলা ভার, সেই দরিদ্র দেশের ৮ কোটী ১১লক্ষ ৫০ হাজার করিয়া টাকা প্রতি বৎসর নিরর্থক কেবল কতকগুলি ব্যধি ও অশান্তি-সংগ্রহের জন্য ভস্মীভূত হইয়া যাইতেছে।

আবার তামাকখোরের গৃহের দিকে চাহিয়া দেখ, চারিদিক কি অপরিষ্কার! এখানে ছাই, ওখানে গুল, ওখানে কালী—যেন একটী পৈশাচিক আলয়! গৃহিণী ৩ বেলা সম্মার্জ্জনী লইয়া রোয়াক পরিষ্কৃত করিতেছেন, আবার তাহাতে ছাইভস্ম জমিতেছে।

মাদক-সেবনের আর একটী মহদনিষ্ট, সময়ের সর্ব্বনাশ। একেই দেশের লোক অলস ও কর্ম্মভীরু; তাহার উপর হুঁকা বা আলবোলার নল হাতে ঘটিকা-যন্ত্রের সেকেণ্ড বাজিবার শব্দের ন্যায় ফুটুর ফুটুর করিতেছে। লোকে বুঝিতেছে যে সময় চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু ঘটিকা-যন্ত্রের ন্যায় ধূমপায়ীর নিজের সে সময় বোধ নাই—অবিশ্রান্ত ফুটুর ফুটুর শব্দ হইতেছে।

মদ্য দ্বারা শরীরের কি কি অপচয় সাধিত হয়, সংক্ষেপে তাহা বলিলাম। এক্ষণে যাঁহারা ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ বা স্বেচ্ছা-প্রবৃত্ত হইয়া মাদক সেবনে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া দুই একটি কথা বলিতেছি। যাহা ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ, যাহা শরীর ও মনের বিষম অন্তরায়, এবং যাহা অর্থ ও সময় ধ্বংশ করিয়া দিন দিন মানুষের দুর্গতি আনয়ন করিতেছে, সেই জলন্ত কালকূট আমরা সুধাভ্রমে স্বহস্তে তুলিয়া ভোজন করিতেছি। কি ভ্রম, কি অন্ধতা! আমরা পরম মিত্র বলিয়া মারাত্মক শত্রুকে আপনার গৃহে ডাকিয়া আনিতেছি, খাল কাটিয়া কুম্ভীর আনিতেছি! মাদক পদার্থ আমাদিগের গৃহে আসিয়া আমাদের সন্তানসন্ততিদিগকে নির্ব্বীর্য্য করিয়া তাহাদিগের পরমায়ু হরণ করিতেছে! দিন দিন মানবজাতিকে খর্ব্বকায় করিয়া 'বেগুণতলায় হাট বসাইবার' চেষ্টা করিতেছে; এবং আমাদিগের মনকে ধর্ম্মপথ হইতে নগণ্য জঘন্য কুৎসিৎ পদার্থে আশক্ত করিয়া দিতেছে। আমরা সারাদিনের মধ্যে একটু অবসর করিয়া আমাদিগের মনকে পরম দেবতার দিকে নিয়োজিত করিতে পারি না, তাঁহাকে ধ্যান বা তাঁহাকে চিন্তা করিবার আমাদিগের অবসর ঘটিয়া উঠে না; অথচ এই জঘন্য আয়ুঃহর, ধর্ম্মনাশক, কর্ম্মনাশক পদার্থের দিকে কি আসক্তি! এক দণ্ড না পাইলে ছটফট করিয়া উঠি! ঈশ্বরের জন্য যে ব্যাকুলতা হয় তো আমাদিগের জীবনেও উপস্থিত হয় না, কি লজ্জা কি দুঃখের কথা, এই মহাসামান্য সর্ব্বনাশকর পদার্থের জন্য সেই ব্যাকুলতা আমরা দেখাইয়া থাকি। মাদকের ন্যায় সামান্য পদার্থ যদি আমাদিগের মনের উপর, আমাদিগের শরীরের উপর, আমাদিগের ধর্ম্মের উপর, আমাদিগের সাংসারিক সুখ-স্বচ্ছন্দতার উপর এইরূপ আধিপত্য করে—আমাদিগের মনকে উদাস করিয়া ফেলে; তবে মানুষের মানুষত্ব কোথায় রহিল? তাহাহইলে মানুষের পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা কোথায় রহিল? তাহাহইলে মানুষের বিবেকের গৌরব কোথায় রহিল? সেই জন্য বলি, যাঁহারা অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহারা আজ লইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া ছাড়িয়া দিউন। তাঁহারা আজ হইতে প্রতিজ্ঞা করুন,—যাহাতে ধর্ম্ম নষ্ট হয়, যাহাতে শরীর নষ্ট হয়, যাহাতে মন বিকল হইয়া যায়, আমরা এমন পদার্থ স্পর্শ করিব না।

কে বলিল, আমরা এই জঘন্য পদার্থ ছাড়িতে পারি না? মানুষ যখন কর্ত্তব্যের অনুরোধে পিতা-মাতা, ভাই-বন্ধু, স্ত্রী-পুত্র ও সংসার ছাড়িতে পারে—আমাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষেরা কর্ত্তব্যপালন-জন্য সংসার ছাড়িয়া অরণ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন—তখন আমরা বুঝিয়া সুঝিয়া এই অকিঞ্চিৎকর জঘন্য পদার্থ ছাড়িতে পারিব না? কি লজ্জার কথা, কি ঘৃণার কথা, কি কাপুরুষের কথা! সকলে যদি প্রতিজ্ঞা করেন, আমরা এই মুহূর্ত্ত হইতে মাদক পদার্থ ছাড়িলাম—তখন কাহার সাধ্য তাহাতে প্রতিবন্ধক জন্মায়? স্বয়ং দেবতারা তখন সে কার্য্য-সাধনে সহায়তা করেন; এবং জড়তা ও অকৃতকার্য্যতা তাহার সম্মুখ ছাড়িয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া যায়।

ভয়ানক জুয়াচুরি-ফন্দি!

(প্রেরিত পত্র।)

মান্যবর শ্রীযুক্ত 'অনুসন্ধান'-সম্পাদক মহাশয়
মান্যবরেষু।

মহাশয়, সম্প্রতি আমাদের এই মহানগরী কলিকাতার ৫২ নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট হইতে এক ভয়ানক জুয়াচুরি-কার্য্য ঘটিয়াছে। তদ্-বিবরণ আপনাদের প্রশংসিত কাগজের জন্য লিখিয়া পাঠাই—প্রকাশ করিবেন। যদি কেহ উক্ত জুয়াচুরি-কার্য্যে-লিপ্ত ব্যক্তিগণের অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারেন, তাহাহইলে আমাদের ষ্টেটের মালিকের নিকট সম্ভবমত পুরস্কার পাইতে পারেন। সে জুয়াচুরী-বিবরণ এই ঃ—

সহর কলিকাতা ৬০নং কলুটোলা ষ্ট্রীট-নিবাসী জমিদার বাবু গোপাললাল শীলের জমিদারি জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত লাট চাঞ্চীপাঠ। তথায় গোপীনাথ ঘোষ নামক জনৈক নায়েব নিযুক্ত আছেন। কয়েকজন জুয়াচোর মিলিয়া উক্ত নায়েবকে বাবু গোপাললাল শীলের জাল ইংরাজি-দস্তখতে এক পত্র লেখে যে,—"আমার বিশেষ প্রয়োজন; তুমি পত্রপাঠ মাত্র ১০০০৲ টাকা নিজে ডাকঘরে গিয়া ৫২নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীটে আমার বিশ্বাসী আমলা মুরারিমোহন মিত্রের বাসায় পাঠাইবে। কোন সন্দেহ করিবে না। আর এ কথা আমার ম্যানেজার সাহেব প্রভৃতি কোন কর্ম্মচারীকেও জানাইবে না। গত ২৫এ বৈশাখ তারিখে তোমার যে টাকা পাঠাইবার করার আছে, সেই টাকা হইতে অগ্রে আমার প্রয়োজনীয় উক্ত টাকা বে-ওজোর পাঠাইবে। সদর-ডিহি বরাবর টাকা না পাঠানর বিশেষ কোন সন্দেহ করিবে না। আর এ কথা আপাততঃ তুমি কাহাকেও প্রকাশ করিবে না। তাহারও নানা-বিধ কারণ আছে।" মধ্যে উক্ত বাবুর দস্তখতি এক পত্র বারাকপুর হইতে রেজেষ্টেরি করিয়া নায়েবের ঠিকানায় যায়। নায়েব ঐ চিঠি পাইয়া প্রথমতঃ আশ্চর্য্যান্বিত হয়েন। কিন্তু টাকা পাঠানয় বিলম্ব হওয়ায়, ৫২ নং পাথুরিয়া-ঘাটা ষ্ট্রীট হইতে উপর্য্যুপরি আরও দুইখানি চিঠি বৈশাখ-মাহার শেষ তারিখে যায়। শেষের পত্রে আরও লিখিত থাকে যে,—"যদি তুমি এবারের এই পত্র-অনুসারে আমার নিকট টাকা না পাঠাও, তবে তোমাকে বরতরফ করিয়া নিকাশ লওয়ার জন্য কাগজপত্র সহ উঠাইয়া আনা যাইবে। আর, যদি হাজার টাকা নাও পাঠাইতে পার, তবে যতদূর সংগ্রহ করিতে পার পত্র-পাঠমাত্র তুমি স্বয়ং ডাকঘরে গিয়া তাহাই মণি-অর্ডার করিবে; যেন কেহ জানিতে না পারে আর তুমি টাকা

পাঠাইয়া দিন কয়েক পরে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবে। অগ্রেই আমার নিজ-বাগানে গিয়া সাক্ষাৎ করিবে।"

এইরূপ নানাপ্রকার ভয়-প্রলোভন ও আশ্বাস-বাক্য থাকায় এবং নায়েব মহাশয় নূতন নিয়োজিত লোক বলিয়া বাবুর হস্তাক্ষর না চেনায়, উক্ত পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীটস্থ ৫২নং বাটীতে বাবুর নাম বরাবর ৩০০৲ টাকার মণি-অর্ডার ইন্‌সিওর করিয়া পাঠান। নায়েব ঠিক ঠিকানার স্থলে এইরূপ ভাবে লিখিয়াছিলেন,—"বাবু গোপাললাল শীল, জমিদার। ঠিকানা সহর কলিকাতা ৫২নং পাথুরিয়াঘাটাষ্ট্রীট শ্রীযুক্ত মুরারিমোহন মিত্রের বাসাবাটিতে পৌঁহুছিলে উক্ত বাবু পাইবেন।" এইরূপ লেখা থাকায় পোষ্ট-পিয়ন উক্ত বাটীতে গিয়া দেখে, একটা ভগ্নাবস্থার বাটী, তাহাও বেশ্যালয়। তথায় গিয়া পিওন বাবু গোপাললাল শীল জমিদার বাবু কোথায় থাকেন, জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু তৎসময়ে জুয়াচোরদের মধ্যে কেহই উপস্থিত ছিল না। সুতরাং বেশ্যাগণ বলে যে,—"এই বাটীর মধ্যে একটা ঘর দুই মাসের জন্য ভাড়া লইয়া কয়েক জন বাবু আছেন। তাঁহারা মধ্যে মধ্যে আসেন; আর ডাকে টাকা আসিবে বলেন। ঐ অছিলায় বাটী-ভাড়াও দেন নাই।" পোষ্ট-পিওন ৩। ৪ দিন টাকা দিতে আসিয়াছিল। কিন্তু ইন্‌শিওর মণি-অর্ডারের টাকা দেওয়া-সম্বন্ধে পোষ্টাফিশের, বিশেষতঃ পিওনের, বিশেষ ঝুঁকি অর্থাৎ সতর্কতা থাকা বিবেচনায়, তথায় টাকা না দিয়া পোষ্ট-পিওন পোষ্টাফিসে টাকা ফেরত-জমা দিয়া বলে যে,—"গোপাললাল শীলকে পোষ্ট-আফিস হইতে টাকা লইতে হইবেক।" এই কথা জুয়াচোরের দল শুনিয়া হতাশ হইয়া উক্ত টাকা বাহিরের চেষ্টায় থাকে। কিন্তু বাবু গোপাললাল শীল জমিদার কলিকাতার মধ্যে একজন প্রধান মান্য-গণ্য ব্যক্তি—সাধারণে সকলেই তাঁহার নাম অবগত আছেন। রাজকর্ম্মচারিগণের মধ্যে তাঁহাকে না চেনেন বা না জানেন, এমত লোকও বিরল। সুতরাং জাল গোপাললাল শীল বাবু সাজিয়া পোষ্ট-আফিস হইতে টাকা বাহির করিয়া লওয়া তাহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। ইতিমধ্যে অর্থাৎ টাকা পাঠাইয়া মণি-অর্ডারের রসিদ পাইতে বিলম্ব দেখিয়া, নায়েব গোপীনাথ ঘোষের মনে মনে—"নানা প্রকার সন্দেহ হয়; এবং তিনি একাএক চাঞ্চীপাঠ হইতে গত কল্য ৯ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। জুয়াচুরি-পত্রের সঙ্কেত-মতে, বাবু গোপাললাল শীলের প্রসিদ্ধ 'মনোহারী গার্ডেন' নামক বাগানে গিয়া তিনি সাক্ষাৎ করেন। গোপাল বাবুকে বলেন,—"আমি হুজুরের চাঞ্চীপাঠ ডিহির নায়েব। আমাকে এক হাজার টাকা প্রাইভেট পাঠানর আদেশ ছিল। তদনুসারে আমি ৩০০৲ টাকার মণি-অর্ডার করিয়াছি। সেই টাকা হুজুর পাইয়াছেন কি না, জানিবার জন্য, এবং বাগানে আমাকে অগ্রে সাক্ষাৎ করিবার বিষয় পত্রে অনুমতি থাকায়, আমি সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।"

বাবু নায়েবের মুখে এই কথা শুনিয়াই চমকিত হইলেন; এবং বলিলেন,—"তুমি কলুটোলার কাছারিতে হাজির হইয়া সকল প্রকাশ করিবে। আমি তোমাকে কোন চিঠি লিখি নাই।" বাবুর মুখে এই কথা শুনিয়াই, নায়েবের পূর্ব্ব-সন্দেহ আরও দৃঢ় হইল; এবং টাকাগুলি অনর্থক জুয়াচোরে লইল—এই ভাবিয়া, গত-কল্য বেলা ১টা-২টার সময় আমাদের বাবুর সদর কাছারিতে আসিয়া তিনি আনুপূর্ব্বিক প্রকাশ করেন; এবং জুয়াচোরগণ বাবুর সহিযুক্ত যে তিনখানি পত্র লিখিয়াছিল, তাহাও দৃষ্ট করাইলেন। আমরা সেই সকল পত্র দেখিয়া অবাক হইলাম; এবং এরূপ ভয়ানক জুয়াচুরি কাহার দ্বারা কি প্রকারে হইল, তাহার বিশেষ তথ্য জানিবার জন্য

শশব্যস্ত হইলাম। প্রথমতঃ টাকাটা আছে কিনা, পোষ্ট-আফিসে গিয়া উপরের লিখিত বৃত্তান্ত-সকল জানানয় জানাগেল যে,—টাকাটা কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। তখন প্রেরকের দ্বারা এক দরখাস্ত দাখিল করিয়া দেওয়া হইল। তদুপরে গূঢ় রহস্য ভেদ করিবার জন্য আমাদের ষ্টেটের কয়েকজন আমলা ও উক্ত নায়েব গোপীনাথ ঘোষ ৫২ নং পাথুরিয়াঘাটার বাটীতে গিয়া দেখিলেন যে,—সেখানে খেমি, বামি ও শ্যামী প্রভৃতি কয়েক-জন বেশ্যার শ্রীমন্দির। যাইহোক, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা উপরের লিখিত বর্ণনা-সকল প্রকাশ করিল; অধিকন্তু বলিল যে,—"মুরারিমোহন মিত্র নামক যে ব্যক্তি আমাদের একটী কুঠারি ভাড়া করিয়াছিল, তাহাকে দেখিলে আমরা চিনিতে পারি।"

এই কথা তাহারা বলায় প্রকৃত মুরারি-মোহন মিত্র—যিনি বহুদিন অত্র ষ্টেটে বিশ্বাসের সহিত কার্য্য করিতেছেন, তাঁহার প্রতি সন্দেহ হওয়ায়—তিনিই তাহাদের চিনিত মুরারী কি না সনাক্ত-জন্য গত কল্য বেলা ৫টার সময় উপরোক্ত বেশ্যা চারি জনকে এখানে আনা হয়। তাহারা আসিলে পর আমাদের সমস্ত আমলা-দের দেখাইয়া তাহাদের বলা হইল,—"ইহাদের মধ্যে তোমাদের বাটী-ভাড়া-লওয়া মুরারী আছে কি না!" বেশ্যারা তখন এক এক করিয়া সকলকে দেখিয়া বলিল যে,—"যে ব্যক্তি মুরারিমোহন বলিয়া বাটী ভাড়া লইয়াছিল, সে ইহাঁদের মধ্যের কেহই নহে।" মহাশয়গো, তখন আমাদের গায়ে ঘাম দিয়া জ্বর ত্যাগ হইল। অনেকে মনে মনে কালী-ঘাটের পাঁঠা দিলেন। যেরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল, বোধ করি, যদি অলক্ষ্মীরা সত্যমিথ্যা করিয়া যাহাকে হউক সনাক্ত করিত, তখনি সে পুলিসে এ্যারেষ্ট হইয়া যাইত। কিন্তু 'ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মাৎ গতি!' তাই মহাশয়দিগের আশীর্ব্বাদে ষ্টেটের ভদ্রাভদ্র বহুতর কর্ম্মচারী মুক্তি লাভ করিয়াছে। এক্ষণে মহাশয়দিগকে এরূপ ভয়ানক জুয়াচুরী-ব্যাপার না জানাইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। এক নায়েবের ভ্রান্তিতে বহু ভদ্র-সন্তানের বিপদের কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল। যিনি বাবু গোপাললাল শীল জমিদার, তিনি স্বয়ংই ষ্টেটের সর্ব্বময় কর্ত্তা—ক্রোড় টাকার অধিপতি। তাঁহার ক্যাসে লক্ষাধিক টাকা সর্ব্বদা মজুত থাকে। তিনি একজন নায়েবকে যে সামান্য টাকার জন্য চিঠি লিখিলেন, নায়েবের তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য ছিল। সে যাহাহউক, মহাশয়েরা এরূপ ষড়যন্ত্রকারী জুয়াচোরগণের অনুসন্ধান করিয়া যদি দিতে পারেন, বাবু অনুসন্ধানকারীকে ১০০৲ টাকা পুরস্কার-স্বরূপ দিবেন। ইতি ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৭।

শ্রীবিপিনবিহারী বসু, আমলা,
শ্রীযুক্ত বাবু গোপাললাল শীল মহাশয়ের ষ্টেট।
৬০ নং কলুটোলা, কলিকাতা।

মতামত।

পুস্তক-সম্বন্ধে।

আনন্দ-লহরী।*—*A social sketch.*—'আনন্দলহরী' নামটি দেখিয়া বড়ই আগ্রহ হইল; ভাবিলাম,—এ দুঃখ-দারিদ্র্য-পূর্ণ জীবনে যদি একদণ্ডের জন্যও 'আনন্দ-লহরী' দেখিতে পাই, সেই ভাল। তাই বড়ই আগ্রহে লহরীতে মিশিতে গেলেম। কিন্তু কি দুরদৃষ্ট!—এ তো আনন্দ-লহরী নয়—এ যে অশ্রুর লহরী!—এতে যে কেবল বিষেরই ঢেউ! এ লহরী যদি আনন্দের লহরী হয়, তবে নিরানন্দের—বিষাদের লহরী কি? এ লহরী দেখিয়া যিনি আনন্দ অনুভব করেন, তিনি কি আর মানুষ!—না, মানুষ-নামের যোগ্য!

* সামাজিক নক্সা।—৭৮ নং বলরাম দের ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযুক্ত এ, সি, লাহা কর্তৃক প্রকাশিত।

ইহা অপেক্ষা মর্ম্মভেদী-শোক-দৃশ্য আর কি হইতে পারে?

স্বর্গীয় রায় দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একদশী', ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের 'হুতুমের নক্সা', ইন্দ্রনাথ বাবুর 'কল্পতরু'-'ভারত-উদ্ধার'—এসকল পড়িয়া কি আর হাসিতে পারা যায়? যাঁহার শরীরে কণা-মাত্র মনুষ্যত্ব আছে, যাঁহার ধমনীতে বিন্দুমাত্র মনুষ্যের রক্ত প্রবাহিত হয়, তিনি কখনই এ সকল পড়িয়া বা দেখিয়া হাসিতে পারিবেন না —হাসিতে গিয়া অশ্রু যেন তাঁহার অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে! ভাবিতে গেলে,—দেখিতে গেলে,—এ সকল দৃশ্য অপেক্ষা অধঃপতনের দৃশ্য—শোকের প্রতিমূর্ত্তি, কি আর কিছু আছে? উপস্থিত 'আনন্দ-লহরীও' কিন্তু তাই! হাসিব কি, ইহার প্রতি ছত্রেই কাঁদিয়াছি; প্রতি লহরীতেই ইহার অন্তর্নিহিত বিষের জ্বালায় শরীর জ্বলিয়াছে!

স্বর্গীয় পিতৃদেবের কত কষ্টের উপার্জ্জিত বিষয়ে 'কাপ্তেন বাবু' হওয়া; সঙ্গে সঙ্গে মোসাহেব জুটিয়া ভিটামাটি উৎসন্ন দেওয়া; কুলের কুলনারীর অবাধে পরপুরুষের হাত ধরিয়া বাহির হইয়া যাওয়া; সভা, সভ্য, সভ্যতা লইয়া ঘরের বউ-ঝিকে হাটে হাজির করিয়া শেষে সাহেব-গোরার হস্তে সমর্পণ; —এসকল কি আনন্দের দৃশ্য? এ সকল দেখিয়া কি চোখে জল আসে না? আর, এই উদ্দেশ্যেই তো আনন্দলহরী! অধঃপতনের এ দৃশ্য দেখিয়াও—নরকের এ ভীষণ কীট-দংশন প্রত্যক্ষ করিয়াও তোমাদের চৈতন্য হয়, এই জন্যই তো আনন্দলহরী!

এ উদ্দেশ্য বুঝিয়া—এ কান্না কাঁদিয়া যিনি 'আনন্দলহরী' পড়িতে পারেন, তিনিই পড়ুন; নহিলে অবুঝ-অজ্ঞান পাঠকের মত শুধু হাসিবার জন্য আনন্দ-লহরী বঙ্গ-গৃহে যেন পঠিত না হয়! যদিও লেখকের লিপি-চাতুর্য্যে পত্রে-পত্রে ছত্রে-ছত্রে ইহাতে হাসির লহরী রহিয়া গিয়াছে; কিন্তু ভাবিয়া পড়িলে তাহা হাসির লহরী নহে —অশ্রুজল! হে জগদীশ! সমাজের এ অধঃপতন—এ দুর্দ্দশা যেন আমাদিকে আর না দেখিতে হয়! 'আনন্দলহরীর' ন্যায় গ্রন্থ পড়িয়া লোকে যেন না হাসে—লোকের যেন প্রাণ বিদীর্ণ হয়!

তাপস-তনয়া।—শ্রীব্রজনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রণীত। পুস্তকখানি সমালোচনা করিব কি, আজ অবধি ধৈর্য্যধারণ করিয়া সমস্ত পুস্তকখানির পাঠ শেষ করিতে পারিলাম না। দীর্ঘে-প্রস্থে লম্বা-চওড়া যে সকল সমাসযুক্ত পদ পণ্ডিত মহাশয় রচনা করিয়াছেন, উপন্যাস পাঠ করিতে গিয়া তাহাতে ধৈর্য্য থাকে কি না, বলিতে পারি না—আমাদের তো রহিল না। দুই-একটা উদাহরণ দেওয়া বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। গ্রন্থকার একটি বালিকার সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিতেছেন; যথা,—

"এই বালিকা ঈশ্বরের সুনিপুণ সৃষ্টি; কন্দর্পের শাণিত শায়ক; মরি! মরি! রূপের তুলনা নাই। যেমন নিবিড়-জলদ-কান্তি-অরাল-কেশদাম, তেমনিই না গোল না-সঙ্কোচ সুপ্রশস্ত কপালফলক; যেমন টানা-আবক্র-ঘোড়া-ভুরু, তেমনি ইন্দীবর-নিন্দি বড় বড় ভাসা-ভাসা আকর্ণ বিশ্রান্ত উজ্জ্বল নয়ন। যেমন টিকল সুগঠিত উন্নত নাসিকা তেমনই সুসঙ্গত রূপে সংস্থাপিত আছে; যেমন আরক্ত গোলাপী রসাল অধরোষ্ঠ; তেমনই কুন্দকলি-বিনিন্দি-দন্তপংক্তি; যেমন নব-নলিনীর ন্যায় মুখ-কান্তি; তেমনই আরক্ত রসপূর্ণ কপোল যুগল; চিবুক অতিরমণীয়; কম্বুকণ্ঠীর কণ্ঠ দর্শন করিলে বিস্ময়ার্ণবে নিমগ্ন হইতে হয়। গ্রীবাসনে স্থাপিত রমণীর সুনির্ম্মিত-সুবদন দর্শনে কে না বলিবে, যে ইহা মৃণালোপবিষ্ট কমল নহে। সুগোল সুকোমল মৃণালতুল্য ভুজযুগল যেন লাবণ্য-লীলাজলে ভাসিতেছে। করতল রক্ত-পদ্ম-বিনিন্দি; অঙ্গুলির তুলনা নাই! হৃদয় প্রদেশ সর্ব্বাপেক্ষা শোভার আধার, লোভনীয়, নেত্র তৃপ্তিকর এবং মদনানল জন্ম হেতু; দর্শনে মনে মনে কতশত অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হয়। যেমন বয়স তদনুরূপ কনক-কমল-কোরক দুটী কেমন হৃদয়-সরোবর আলো করিয়া দর্শকের মনঃ প্রাণ বিচলিত করিতেছে। কটীদেশ ক্ষীণতর; নিতম্বপ্রদেশ বয়সোচিত প্রশস্ত, মাংসল, ঘুরাণও কুলানও; এ তীর্থে তপঃসাধন, যুবজনের পুণ্যফলের পরিচয়; সুন্দরীর জঘন প্রদেশ-অতিরমণীয়; চরণদুটী বৃত্তানুপূর্ব্ব; চরণ তল অরক্ত, দেখিলে বিশেষ প্রীতি জন্মে;—" *

পণ্ডিত মহাশয় রসিক কি না, তাই এত আদিরসের ছড়াছড়ি! আর এক স্থলে,—

"সুতরাং সতীপতিব্রতা, মাধুর্য্যময়ী, সরলতাময়ী, প্রেম-পুত্তলি, হৃদয়েরআলো, গৃহের লক্ষ্মী, মানসের হেম-নলিনী, সোহাগের প্রতিমা, ভালবাসার তরঙ্গিণী, রহস্যের সঙ্গিনী, রাজ্যের মন্ত্রিণী বসন্তবালাকে বিস্মৃত হইলেন।" ইত্যাদি—ইত্যাদি!

উপন্যাস পড়িতে পড়িতে যদি সকল স্থানেই এইরূপ বাগাড়ম্বর (সহজ কথায় যাহাকে "বচন" বলে) দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাহইলে তাহা পাঠ করিতে কখনই ধৈর্য্য থাকে না। বলা বাহুল্য, এই দুই তিন পরিচ্ছেদের (যাহা অতি কষ্টে পাঠ করিয়াছি) প্রায় সকল স্থানই এইরূপ 'বচনে' পূর্ণ।

ইহার উপর আবার গ্রন্থকারের রুচি। তাহার আরও একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বোধ করি। এইস্থলে ইহাও বলিয়া রাখা উচিত যে যদি দুই তিন পরিচ্ছেদ পাঠ করিয়াই এইরূপ রুচির পরিচয় পাওয়া যায়, না-জানি সমস্ত পুস্তকখানিতে তাহাহইলে আরও কত কি আছে। উদাহরণ,—

"একদিন বসন্ত নিজ শয়ন-ভবনে বসিয়া বিমলার সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত আছেন, অরিন্দম আপন মনে খেলা করিতেছেন; (রাজপুত্রের নাম অরিন্দম,) এমন সময়ে মহারাজ তথায় উপস্থিত হইলেন। বিমলা মহারাজকে দেখিয়া পলায়ন করিল। বসন্তবালা কহিলেন আজি যে অসময়ে দাসীর গৃহে পদার্পণ? কি ভাগ্য; আসুন এই পার্শ্বে উপবেশন করুন। রণ-কেশরী পার্শ্বে বসিয়া কহিলেন ভাগ্য তোমার না আমার; রত্ন কাহারও অনুসন্ধান করেনা, লোকেই তাহার অনুসন্ধান করে। বিকশিত কুসুম পাতায় পাতায় ভ্রমরের অন্বেষণ করেনা, ভ্রমর তাহার অন্বেষণে সর্ব্বদাই ব্যাকুল; এই সময় অরিন্দম মাতৃসন্নিধানে যাইয়া কহিলেন মা! বাবা-এই; কোলে যাবো। রণ-কেশরী কোলে তুলিয়া লইয়া কহিলেন বাবা—এ-কেই অরিন্দম করিল মা!—রাজা কহিলেন তাহা নহে, বল মামী; বসন্তবালা কহিলেন তাহা-হইলে দাদার সহিত আপনার কি সম্বন্ধ হইল? এই সময় অরিন্দম কহিল মা মামী হবে না, মা-মী হতে নাই। কেন তোমার মামী না হয়, তোমার মা হবে? বসন্ত কহিলেন, আমাকেই সামলাতে পারেন না আবার দুটো!! ইঃ এত সাধ কেন? আমি কি কখন সেবায় কসুর করিয়াছি? তবে বলা যায় না পুরুষ ভোমরার জাতি. নানা ফুলের বঁধু; বশে থাকবার ধন নহেন; যতদিন মধু ততদিন সম্বন্ধ; মধু ফুরালেই সব ফাঁক। ঠিক নিগড় বদ্ধ শুক পাখী; সর্ব্বদাই শিকলি কাটতে ব্যস্ত;' ইত্যাদি—ইত্যাদি

বাহবা কি বাহবা! বলিহারি পণ্ডিতজীর রসিকতা! যেমন ভাষা, তেমনি ভাব, তেমনিই ব্যাকরণ-জ্ঞান! ভাষা-ভাবের পরিচয় দিবার জন্যই আমাদিগকে সমস্ত কথোপকথন তুলিতে হইল। নচেৎ রুচির পরিচয় যাহা কিছু, তাহা এই শেষ কয়েক ছত্রেই আছে। যাই-হোক, পাঠক মহাশয়েরা এই পরিচয়েই পণ্ডিত মহাশয়েরও পরিচয় বুঝিয়া লউন। হা অদৃষ্ট! ইহাঁরাই আবার আমাদের বালক-গণের শিক্ষা-গুরু!

গাধাবলী। (পদ্যনীতি)।—শ্রীহরিমোহন রায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত। গ্রন্থকার বলেন, গাধা-বলীতে "কেবল দেশের কতকগুলি জঘন্য রীতি সংশোধন করাই গ্রন্থকারের প্রধান উদ্দেশ্য।" আর, তাই তিনি কতকগুলি সহজ পদ্যে কি কি লক্ষণাক্রান্ত হইলে মানুষ গাধার মধ্যে পরিগণিত হয়, তাহাই দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এইরূপের ৮০ রকমের গাধার পরিচয় তাঁহার এ পুস্তকে আছে। সকলগুলি না হইলেও, গাধার কতকগুলি লক্ষণ তিনি বেশ চিনিয়াছেন বটে! একটী যথা,—

"ঢাল-তরবাল নাই আঁশ-বটী সার।
তাতেই করিতে চায় ভারত-উদ্ধার॥

* উদ্ধৃত অংশের কমা-সেমিকোলনটী পর্য্যন্ত ঠিক রাখা গেল। ইহাতেও পণ্ডিতজীর বিদ্যার দৌড়টা দেখিবেন।

একটী কলম তাও দৈবদোষে বোঁচা।
স্বাধীন হইতে চায় দিয়ে তার খোঁচা॥
যাদের এমন আশা মনে অনিবার।
তাঁদের সমান গাধা নাহি দেখি আর॥"

এইরূপ এক-একটী ক্ষুদ্র কবিতাতে গ্রন্থকার এক এক রকমের গাধার পরিচয় দিয়াছেন। সবগুলি না হউক, অনেকগুলি সুন্দর বটে।

ভারত ইতিহাস-সার।—শ্রীদৈবচরণ ঘোষ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। নামেই পুস্তকের পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গালা-স্কুলের ছেলেদের ইহা উপকারে আসিতে পারে।

চোরের চক্ষুদান।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রাধানাথ বেদান্তবাগীস্ হিন্দুমাত্রেরই পরিচিত। যে স্থানে দশজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সমাবেশ হয়, সেইস্থানেই বেদান্তবাগাস্ মহাশয়ের পদধূলি পড়িয়া থাকে। যে সভায় পণ্ডিতে-পণ্ডিতে তর্ক উপস্থিত হইয়া মীমাংসার পরিবর্ত্তে পরিশেষে হাতা-হাতির লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়, সেই সভায়—সকলের সম্মুখেই আমাদের বেদান্তবাগীস্ মহাশয়ের আসন পড়িয়া থাকে। সুতরাং সকলের নিকটই তিনি পরিচিত বলিয়া, বিশেষ পরিচয়ে আর আবশ্যক নাই। বেদান্তবাগীস্ মহাশয়ের পুত্রাদি কিছু হইয়াছিল কি না, তাহা অবগত নহি। কিন্তু তাঁহার বাড়ীতে কেবল তাঁহার বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীকে ভিন্ন আর কাহাকেও কেহ কখনও দেখে নাই।

ব্রাহ্মণী বয়সেও যেমন প্রবীণ, বুদ্ধিতেও তাহা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না। তাঁহারই বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া—তাঁহারই বন্দোবস্তের উপর ভারার্পণ করিয়া, বেদান্তবাগীস্ মহাশয় দিনপাত করিতেন। সেই নিমিত্তই আজ ব্রাহ্মণীর হস্তে প্রায় পাঁচ শত টাকা সংগ্রহ হইয়াছে। মৃত্তিকানির্ম্মিত দক্ষিণদ্বারী ঘরখানির মধ্যস্থিত একটি বড় কাষ্ঠের বাক্সের ভিতর এই পাঁচ শত টাকা তিনি বিশেষ যত্নের সহিত রাখিয়া দিয়াছিলেন। ঐ টাকাগুলি সেইস্থানে রক্ষিত আছে বলিয়াই, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীও সেই ঘরে শয়ন করিয়া থাকেন।

একে বৈশাখ মাসের আমাবস্যা রাত্রি; তাহাতে অল্প অল্প বৃষ্টি হওয়ায় গাঢ় অন্ধকার আরও গাঢ়তর বোধ হইল। সন্ধ্যার সময় বেদান্তবাগীস্ মহাশয় পাড়ার হরিদাদার বাড়ীতে একবার গমন করিতেন। সেইস্থানে পাড়ার পাঁচজন একত্র হইয়া অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত নানাপ্রকার গল্প-গুজব, পরনিন্দা, পরকুৎসা প্রভৃতি পল্লীগ্রামের নিত্য-আবশ্যকীয় বিষয়গুলি সমাপন করিয়া, অধিক রাত্রিতে স্ব স্ব বাড়ীতে গিয়া শয়ন করিতেন। দেবতার গতিকে বেদান্তবাগীস্ মহাশয়ের আজ তাহা ঘটিল না; কাজেই তাঁহাকে সন্ধ্যার পরই শয়ন করিতে হইল। ব্রাহ্মণীও সেই ঘরে শয়ন করিলেন। সমস্ত দিবসের সাংসারিক পরিশ্রম-জনিত ক্লান্ত ছিলেন বলিয়া, ব্রাহ্মণী শীঘ্রই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। বেদান্তবাগীস্ মহাশয়ের কিন্তু নিদ্রা আসিল না; বৈশাখ-মাসের ভিতর কোন্ কোন্ যজমানের বাড়ীতে কি কি ব্রত উদ্‌যাপন, কাহার কাহার পিতৃমাতৃ-শ্রাদ্ধ প্রভৃতি আছে ভাবিতে ভাবিতে, এবং তাহার কোথায় কিরূপ প্রাপ্ত হইবেন মনে মনে তাহারই হিসাব করিতে করিতে, রাত্রি অধিক হইয়া গেল।

বেদান্তবাগীস্ মহাশয় যখন চুপ করিয়া শুইয়া আছেন ও ঐরূপ ভাবিতেছেন, সেই সময় তাঁহার ঘরের পশ্চাৎদিক হইতে একরূপ শব্দ শুনিতে পাইলেন। বিশেষ মনোযোগের সহিত সেই শব্দে লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে,—তাঁহার ঘরের পশ্চাতে চোরে সিঁদ কাটিতেছে। যখন ইহা বুঝিলেন, তখন ভয়ে তাঁহার বুদ্ধি লোপ পাইল; এবং কি করিবেন

তাহার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ব্রাহ্মণীকে উঠাইলেন; ও আস্তে আস্তে তাঁহাকে কহিলেন,—"ঐ দেখ, চোরে সিঁদ কাটিতেছে। এখনই আমাদিগের এতদিনের উপার্জ্জিত টাকাগুলি লইয়া প্রস্থান করিবে, আর আমরা চিরদিনের মত দরিদ্র হইয়া পড়িব।"—এই বলিয়া, বৃদ্ধ আস্তে আস্তে কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া তাঁহার সেই সিন্দুক হইতে টাকাগুলি বাহির করিলেন; এবং সম্মুখের দরজা দিয়া পলায়ন করিবার অভিপ্রায়ে দরজা খুলিতে গিয়া দেখেন যে, সে উপায়ও নাই—বাহির হইতে দরজায় শিকল-বন্ধ। ইহা দেখিয়া বেদান্তবাগীস্ মহাশয় থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন,—"ব্রাহ্মণী, আজ সর্ব্বনাশ হইল; আর উপায় নাই।"

ব্রাহ্মণের এই অবস্থা দেখিয়া ব্রাহ্মণী আস্তে আস্তে কহিলেন,—"এই সামান্য বিপদে তোমার এত ভয়! আচ্ছা, তুমি চুপ করিয়া এই স্থানে শয়ন করিয়া থাক। যাহা করিতে হয়, তাহা আমি করিতেছি। কোন ভয় নাই।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণী আস্তে আস্তে উঠিলেন; উঠিয়া, সেই অন্ধকারে যে কি করিলেন, তাহা কেহই দেখিতে পাইল না। যাইহোক, কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি শীঘ্র একটী প্রদীপ জ্বালিয়া একটি হাঁড়ির দ্বারা তাহা ঢাকিয়া রাখিলেন। এবং সেই স্থানে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনেক পরিশ্রমের পর, চোর সিঁদ কাটিয়া প্রবেশের পথ পরিষ্কার-পূর্ব্বক, সেই ঘরের ভিতর আস্তে আস্তে প্রবেশ করিল। যেমন সে সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল, অমনি ব্রাহ্মণী সেই প্রজ্জ্বলিত প্রদীপের আবরণ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। ঘর আলোকে পূর্ণ হইয়া গেল। ঘরের অবস্থা দেখিয়া চোর তো অবাক্! সে দেখিল,—সেই ঘরের ভিতর একখানি কুশাসন বিস্তৃত রহিয়াছে; এবং তাহার সম্মুখে নানাবিধ সুখাদ্য ফলমূল ও মিষ্টান্ন দ্রব্যের দ্বারা পরিপূর্ণ একখানি বৃহৎ থালা সুসজ্জিত রহিয়াছে। আর, তাহার পার্শ্বে তালবৃন্ত-হস্তে ব্রাহ্মণী দণ্ডায়মানা। বিশেষতঃ দুর্ভাগ্যবশতঃ চোর আবার চেনা হইয়া পড়িল—সেই পাড়ার গোপাল বাগ্‌দীই আজ ব্রাহ্মণের ঘরে সিঁদ কাটিয়া প্রবেশ করিয়াছে!

চোরকে দেখিয়াই ব্রাহ্মণী চিনিলেন; এবং তাঁহার হস্তস্থিত তালবৃন্তের দ্বারা ব্যজন করিতে করিতে কহিলেন,—"গোপাল, সিঁদ কাটিতে তবে তোমার বড়ই পরিশ্রম হইয়াছে! ঘর্ম্মে দেখিতেছি তোমার গা ভিজিয়া গিয়াছে! তুমি চুরি করিতে আসিয়াছ, ভালই; আচ্ছা, পরে এখনি চুরি করিও। আগে একটু বিশ্রাম কর। সিঁদ কাটিতে তোমার বড়ই পরিশ্রম হইয়াছে বলিয়া, তোমারই নিমিত্ত আমি এই জলযোগের সংস্থান করিয়া রাখিয়াছি। প্রথমে আহার করিয়া একটু সুস্থ হও, আমি তোমাকে ব্যজন করিতেছি। তোমার ক্লান্তি দূর হইলে পরিশেষে তোমার ইচ্ছানুযায়ী দ্রব্যাদি চুরি করিয়া লইয়া যাইও; তাহাতে আমাদিগের কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু এই পুণ্যাহ বৈশাখ-মাসের দিন তুমি যখন আমার বাড়ীতে আসিয়াছ, তখন আহার না করিলে আমি কোন প্রকারেই যাইতে দিব না।"

ঘরের অবস্থা দেখিয়া ও ব্রাহ্মণীর কথা শুনিয়া, চোর চুরি করিবে কি, একেবারে অবাক হইয়া পড়িল। এবং কোন প্রকারেই ব্রাহ্মণীর হাত এড়াইতে না পারিয়া, সেইস্থানে বসিয়া তাহাকে আহারই করিতে হইল। এইরূপে আহার-কার্য্য সমাপন হইলে, গোপাল তখন ব্রাহ্মণীর পদযুগল ধারণ-পূর্ব্বক বিশেষ লজ্জিতভাবে বলিতে লাগিল,—"মা, আমার যেমন কর্ম্ম তাহার উপযুক্ত ফল পাইয়াছি। আজি হইতে আপনি আমার মা হইলেন। আজ হইতে যতদিন আমি জীবিত থাকিব, ততদিন আপনার বাড়ীতে আর কোন চোর চুরী করিতে আসিবে না। আজ আপনি আমায় মাপ করুন। আর মা, একথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না, এই আপনার নিকট আমার নিবেদন।"

এই বলিয়া গোপাল সেই সিঁদ দিয়াই পুনরায় বাহির হইয়া গেল। চোর বাহির হইয়া গিয়াছে শুনিয়া, তখন বিদ্যাবাগীস্

মহাশয়ের ভয় দূর হইল—তিনি উঠিয়া বসিলেন। আর, পরদিবস প্রত্যূষে ব্রাহ্মণী উঠিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার ঘরে সিঁদের চিহ্নমাত্রও নাই—রাত্রের মধ্যেই কে ঐ সিঁদ বুজাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় করিয়া দিয়া গিয়াছে।

সিপাহী-যুদ্ধে

ইংরাজ-সেনার অপূর্ব্ব দৌত্য।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী-যুদ্ধের প্রবল বহ্নি দিগন্তব্যাপী হইয়াছে। ইংরাজ-রাজপ্রতিনিধি ভয়ত্রস্ত, চকিত—না জানি কখন কি সর্ব্বনাশ ঘটে! কানপুর, লক্ষ্ণৌ, ঝান্সি—চারিদিকই ইংরাজ-শোনিতে আর্দ্র। প্রাণ লইয়া, এখন অনেক ইংরাজ-পরিবার ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। যে নগরে—যে গ্রামে দুইজন ইংরাজও বসতি করেন, সেইস্থানেই উন্মত্ত সিপাহীগণের প্রবল অত্যাচার-স্রোত প্রবাহিত—জাতিমান-প্রাণ বুঝি বা আর কাহারও সিপাহী-হস্ত হইতে রক্ষা হয় না! যেখানে যে যুদ্ধের সংঘটন হইতেছে, সেই যুদ্ধেই ইংরাজকে কিছু না কিছু বলক্ষয় ও মনস্তাপ সহিতে হইতেছে। সকলেরই বিশ্বাস,—ইংরাজ-রাজত্বের এই-ই বুঝি উচ্ছেদের সময়!

একদিন সাগ্রা-নদীর তীরে এই বিদ্রোহের সূচনা! একদিকে স্যার হিউগ রোজ ইংরাজ-সেনাপতিত্বে নিযুক্ত, আর অন্যদিকে ঝান্সীর সেই চিরস্মরণীয়া মহারাণী লক্ষ্মীবাই ও তাঁহার প্রধান সহকারী তান্তিয়া তোপী। উভয় পক্ষেরই আয়োজন-উদ্যোগের ত্রুটী ছিল না; উভয় পক্ষই সমান দর্পের সহিত প্রথমে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে সিপাহীদিগের প্রবল প্রতাপে ইংরাজ-পক্ষকেই বিব্রত হইয়া পড়িতে হইল। সিপাহীদিগের সৈন্য-সমষ্টির সুকৌশল-পরিচালনায় ইংরাজের সে যুদ্ধে পরাজয় একপ্রকার অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল। সেনাপতি স্যার হিউগ রোজ তখন একপ্রকার হতাশ্বাস হইয়া পড়িলেন। 'এই ইংরাজের পরাজয় হয়, এই ইংরাজের উচ্ছেদ সাধিত হয়'—এইরূপ এক কোলাহল উপস্থিত হইল।

এমন সময় সহসা সেই রণস্থলে এক মহাত্মার আবির্ভাব হইল। হিন্দুর বেশ পরিয়া—ছদ্মবেশ ধরিয়া, এমন সময় কর্ণেল স্কট নামক একজন গৌরাঙ্গপুরুষ সেনাপতি স্যার হিউগ রোজের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই সেনাপতি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"উপায় কি কিছু করিতে পারিয়াছ? এদিকে তো বিষম বিভ্রাট উপস্থিত! আর তো আমাদের মান রক্ষা হয় না! যেরূপ সিপাহীদিগের আয়োজন দেখিতেছি, তাহাতে আমাদের পরাজয়ের আর বিলম্ব নাই। হয় পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইতে হইবে, নয় তো এখনই দাঁড়াইয়া সিপাহী-হস্তে প্রাণ সমর্পণ করিতে হইবে।"

মহাত্মা কর্ণেল স্কট তখন অভয় প্রদান করিয়া উত্তর করিলেন,—"ভয় নাই। আমিই সমস্ত ঠিক করিয়াছি। সেমতে চলিলে এযুদ্ধে নিশ্চিতই সিপাহীদিগের পরাজয়, আর আমাদিগের জয় হইবেই। আপনারা নদীর বাম-পার্শ্ব অথবা দক্ষিণ-পার্শ্ব হইতে আক্রমণ না করিয়া, মধ্যস্থলে আক্রমণ করুন। তাহাতে নিশ্চিতই জয়লাভ হইবে।"

সেনাপতি তাহাতে শশব্যস্তে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা, সে কথা তুমি কি করিয়া জানিলে?"

"আমি ঠিকই জানিয়াছি। আপনি অগ্রে একদল সৈন্য আমার কথামত মধ্যস্থলে পরিচালিত করিতে আদেশ করুন। তার পর সব বলিতেছি। ফলতঃ আপনার কোন ভাবনা নাই—মধ্যস্থলে গিয়া উপস্থিত হইতে পারিলে যদিও বিপদের আশঙ্কা মনে হইতেছে, কিন্তু তাহাতে কোন ভয় নাই। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, তাহাতেই জয় হইবে।"—এই বলিয়া কর্ণেল স্কট বারবার সেনাপতিকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

উপায়ান্তর না দেখিয়া, অগত্যা সেনাপতি সেইরূপ আদেশ প্রদান করিলেন। এ সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া দিয়া আবার তিনি কর্ণেলকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখন তো বল, কি উপায়ে জয়লাভ করিতে পারিব, তুমি জানিয়াছ?"

মহাত্মা স্কট তখন বলিতে আরম্ভ করিলেন —"এবার আমি স্বয়ংই দৌত্য-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম। এবারের এ গুরুতর দায়িত্ব আর অধীনস্থ আর কাহারও উপর প্রদান করিতে সাহস করি নাই। যদিও একার্য্য সাধন করিতে আমার প্রাণের আশা অতি অল্পই ছিল; কি

কি করিব, কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমি সে আশাতেও জলাঞ্জলী দিয়াছিলাম। যখন দেখিলাম, আপনাদের জয়ের আর কোন আশাই নাই, সেই সময় নদীর উজানের দিক হইতে আমি এই ছদ্মবেশে গা-ভাসান দিলাম। আমার হস্তে তখন একটা 'ঝাঁজরা হাঁড়ি' বই আর কিছুই না। ক্রমে উজান হইতে ভাটার টানে গা-ভাসান দিয়া সাঁতরাইতে সাঁতরাইতে আমি যেমন সিপাহী-সেনাগণের নিকটস্থ হইতে লাগিলাম, অমনি আমার মাথার উপর হাতের সেই হাঁড়িটি চড়াইয়া দিলাম। 'ঝাঁজরা হাঁড়ির' সেই ছিদ্র দিয়া আমার চোখ দু'টি বাহির হইয়া রহিল। আমি সেই ছিদ্র দিয়া দেখিতে লাগিলাম,—নদীর কোথায় কিরূপ আয়োজন-উদ্যোগ চলিতেছে! আর, সাধারণ লোকে ভাবিল, স্রোতে একটা হাঁড়ি ভাসিয়া যাইতেছে।

"এইরূপে ক্রমে ক্রমে আমি সিপাহী-সৈন্যের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলাম। সেখানে দেখিলাম,—আমার মাথার পার্শ্বেই মহারাণী লক্ষ্মীবাই ও তান্তিয়া তোপীর নৌকা। আর, তৎপার্শ্বে অতি অল্পমাত্রই সিপাহী-সেনার সমাবেশ আছে। সুতরাং আমার এত পরিশ্রমের ফল তখন ফলিতে পারে বলিয়া আশা হইল—আমি একটু চেষ্টা করিয়া সেই স্থানেই এদিক-ওদিক করিয়া ভাসিতে লাগিলাম। ভাসিতে ভাসিতে একটু পরেই শুনিলাম,—মহারাণী সেনাপতি তান্তিয়া তোপীকে যেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—'সকল দিকে সমান বল রাখা হইয়াছে তো! কোন দিকে সৈন্য-সমাবেশের তো ত্রুটী হয় নাই!' সেনাপতি তান্তিয়া তোপী তাহাতে উত্তর করিলেন,—'বামপার্শ্বদক্ষিণপার্শ্ব সকল দিকই ঠিক আছে। কেবল ঠিক নাই, এই মধ্যস্থলে! তা' তাহারা কি আর নদী বাহিয়া এই মধ্যস্থলে আসিতে সাহসী হইবে?' মহারাণী তাহাতে যেন বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন,—'সে কি কথা! ইংরাজ-সেনারা যদি এদিকেই আসিয়া আক্রমণ করে, তবে উপায় কি হইবে? এ কি অন্যায় কাজ করিয়াছ? দেখ-দেখ, যদি এখনও উপায় থাকে, তবে মধ্যস্থল রক্ষার উপায় কর। আমার কিন্তু স্পষ্টই মনে লইতেছে যে, সুকৌশলী ইংরাজ-সেনাগণ কখনই এ সুযোগ পরিত্যাগ করিবে না।' সেনাপতি তাহাতে আবার কহিলেন,—'কিন্তু এখন তো আর সে উপায় কিছুই নাই! আর তো সৈন্য ফিরাইয়া আনিয়া এখানে রাখিবার কোন সুযোগই দেখি না! যদি মধ্যস্থলে কোনরূপে আসিয়া আক্রমণ করে, তাহা হইলে আমাদের নিশ্চিতই পরাজয় হইবে। তবে এতটা সন্ধান তাহারা কোথা হইতে পাইবে?,

"মহারাণী ও সেনাপতির এইরূপ কথোপকথন হইতেছে শুনিয়া, আর আমি অপেক্ষা করিতে পারিলাম না। কালবিলম্ব না করিয়া আমাকে সত্বর ফিরিয়া আসিতে হইল। আমি তা'র পর আবার ভাটায় গা-ভাসান দিয়া নদীর স্রোত-মুখে চলিতে লাগিলাম। অনেক দূর সেইরূপ-ভাবে আসিয়া শেষে যেখানে আর সিপাহিদিগের কোন চিহ্নই দেখিতে পাইলাম না, সেই ঘাট হইতে উপরে উঠিয়া এই এখানে আসিতেছি। এ যুদ্ধে কি আর আমাদের জয়লাভের সংশয় আছে? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন; আমরা এযুদ্ধে নিশ্চিতই জয়লাভ করিয়াছি।"

কর্ণেল স্কটের মুখে এইরূপ পরিচয় পাইয়া সেনাপতির আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। তিনি তখন কর্ণেলের প্রশংসা করিতে করিতে আহ্লাদ-সহকারে বলিলেন,—"ধন্য তুমি! তোমার কৌশলেই আজ আমরা এযুদ্ধে জয়ী হইলাম। সার্থক তোমাকে দৌত্য-কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল!"

এই পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ই যুদ্ধক্ষেত্র "জয় ইংরাজের জয়—জয় ইংরাজের জয়" এই ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল; নদীর মধ্যস্থলে ইংরাজের বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইল। সিপাহী-সৈন্য বিপর্য্যস্ত ও বিধ্বস্ত হইয়া গেল। ইংরাজের আনন্দ তখন আর দেখে কে? ক্ষণপূর্ব্বে যাঁহারা প্রাণের দায়ে অস্থির হইয়াছিলেন, এখন তাঁহাদের অপার আনন্দ! এইরূপে সিপাহীযুদ্ধের একদিন ইংরাজ-পক্ষের জয়লাভ হইয়াছিল—এই উপায়ে একজন সেনার অপূর্ব্ব দৌত্য-কার্য্যে ভারত হইতে ইংরাজ-রাজত্বের উচ্ছেদ রক্ষিত হইয়াছিল।

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

পরেশনাথ মিত্রের

রত্নগৃহের জুয়াচুরী-কাণ্ড।

হাইকোর্টের বিচার।

জুয়াচোর পরেশনাথ মিত্রের 'রত্নগৃহের' জুয়াচুরী-কাণ্ড 'অনুসন্ধানের' পাঠকগণের মধ্যে কাহারও অবিদিত নাই। পরেশনাথ জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ একশত পুস্তক ৫৲ পাঁচ টাকায় প্রদান করিবে বলিয়া যে বিজ্ঞাপন বাহির করিয়াছিল; এবং সে বিজ্ঞাপন-কুহকে ভুলিয়া সরল মফঃস্বলবাসী অনেকেই যে প্রতারিত হইয়াছিলেন; সে বিবরণও সকলেই পরিজ্ঞাত আছেন। তারপর, 'অনুসন্ধান-সমিতির' অশেষ উদ্যোগ, চেষ্টা ও বিপুল অর্থব্যয়ে আসাম-ধুবড়ীর ফৌজদারী-আদালতে পরেশনাথের যে ছয়-মাস সপরিশ্রম কারাদণ্ড হয়, তাহাও সকলেই জানেন। আরও বোধ হয়, সকলেরই স্মরণ আছে যে, ধুবড়ীর মকর্দ্দমায় দণ্ড পাওয়ার পরও পরেশনাথ কামরূপ গৌহাটীর মাননীয় জজ বাহাদুরের নিকট যে আপীল করিয়াছিল, তাহাও না-মঞ্জুর হইয়াছে।

'রত্নগৃহ'-কাণ্ডের এই পর্য্যন্তই পাঠকগণ পরিজ্ঞাত আছেন। কিন্তু, পাঠকগণ শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, জুয়াচোর পরেশনাথের পক্ষীয়গণ ইহাতেও ক্ষান্ত ছিলেন না। ধুবড়ী ও গৌহাটীর বিচারের পরও, তাঁহারা আবার কলিকাতার হাইকোর্টে আপীল করিয়াছিলেন—যদি তাহাতেও দণ্ডের কতক লাঘব হয়! আজ প্রায় দুইমাস অতীত হইল, কলিকাতার হাই-কোর্টে পরেশনাথের ঐ আপিল রুজু হয়। আপিল রুজু হওয়ার পর ফরিয়াদীর প্রতি হাইকোর্ট হইতে এক 'রুল' জারি হইয়াছিল; এবং তাহাতে ফরিয়াদীকে অথবা ধুবড়ীর ম্যাজিষ্ট্রেটকে পরেশের এ গুরু দণ্ড কেন হইবে, তাহার কারণ দর্শাইতে আদেশ করা হইয়াছিল। তদনুযায়ী প্রায় পক্ষাধিক পূর্ব্বে বিচারের একটী দিনও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। বিচারের ধার্য্য দিনে ফরিয়াদীর পক্ষ হইতে আমরা আর কোনরূপ তদ্বিরই করি নাই—কেবল ধুবড়ীর ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরই দণ্ডের কারণ হাইকোর্টে লিখিয়া পাঠাইয়া ছিলেন। যাইহোক, পরেশনাথের পক্ষ হইতে অনেকরূপ তদ্বির-তল্লাশ ও আপত্তির পর, পরে রায় প্রকাশ হইবে বলিয়া, ধার্য্য-দিনে মকর্দ্দমায় শুনানী পর্য্যন্তই হইয়া থাকে।

এক্ষণে অদ্য হাইকোর্ট এই মকর্দ্দমার রায় প্রদান করিয়াছেন। সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহার বিবরণ (Report) উদ্ধৃত করা গেল। সে বিবরণ এই :—

"HIGH COURT CRIMINAL APPEALS.

BOOK-CANVASSING CHEAT.

To-day before the Criminal Revisional Bench, presided over by Messrs. Justices Macpherson and Hill, the case of Poresh Nath Mitter, who appealed against a sentence of six months imprisonment inflicted on him by the additional Judge of Goalpara, was disposed of. The facts of the case, which were reported about a month ago, were briefly, that the petitioner circulated a handbill in which he promised subscribers a copy of a work he had then ready, containing a hundred extracts from choice works. One of these subscribers from Dhubri remitted a small sum and asked him to send down a copy of the book. No such book being forthcoming a complaint was laid, and enquires disclosed that no such book was printed. After hearing Counsel on both sides, Mr. Justice Macpherson delivered the following judgement:—This rule must be discharged. The questions which the Magistrate had to determine were practically a question of fact, namely, whether at the time when this circular was issued the complainant was induced to order these books, and whether the petitioner had any intention to supply them; that is to say, whether the complainant was deceived into ordering the books and parting with money in consideration for them, the prisoner having a dishonest intent never to supply them. There can be no question that the Rs 1-12 which the complainant paid nominally for the first instalment was really paid as consideration for the book. Upon that point we have no doubt. The Magistrate has found that the petitioner's intention was dishonest, and that he had no intention to supply these books. The point which we have really to consider is whether there was any reasonable ground upon which the Magistrate could come to that conclusion, and we have very little. The evidence shows that on the 24th November, that is, a considerable time after the circulars had been issued, and when enquiries were made of the petitioner, he was unable to show that any preparations, I might almost say, had been made for the publication of the book which he had undertaken to deliver; and that evidence which has been believed by the Magistrate is inconsistent with the evidence given for the defence, that some time prior to that a considerable portion of the book was actually ready. Taking all the circumstances of the case into consideration, we think there were grounds upon which the Magistrate might reasonably have come to the conclusion which he did, and that therefore the conviction was one which must be affirmed. The rule must be discharged and the prisoner surrendering must undergo the remainder of the sentence, which we see no reason to reduce."

* * * *

ইহার ভাবার্থ এই ঃ—"গোয়ালপাড়ার অতিরিক্ত জজ বাহাদুরের বিচারে পরেশনাথ মিত্রের ছয় মাস কারাদণ্ডের আদেশ হওয়ায় হাই-কোর্টে তাহার যে আপিল হইয়াছিল, অদ্য বিচারপতি ম্যাকফারসান ও হিল বাহাদুরের নিকট তাহার শেষ মীমাংসা হইল। এই মকর্দ্দমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে,—আবেদনকারী এই মর্ম্মের হ্যাণ্ডবিল জারি করিয়াছিল যে, সে গ্রাহকগণকে এমন একখানি পুস্তক প্রদান করিবে, যাহাতে একশত প্রধান প্রধান

পুস্তকের সার সঙ্কলিত হইয়াছে; এবং যে পুস্তক তাহার নিকট প্রস্তুত আছে। তদনুযায়ী ধুবড়ী হইতে একজন গ্রাহক ঐ পুস্তকের মূল্য তাহার নিকট পাঠাইয়া দেন; এবং তাহাকে পুস্তক পাঠাইতে বলেন। কিন্তু কোন পুস্তকই না পাঠানয় তিনি আদালতে তাহার নামে নালিশ উপস্থিত করেন; এবং সন্ধানে জানা যায় যে, সেরূপ কোন পুস্তক সে ছাপায়ই নাই। উভয় পক্ষের বাদ-প্রতিবাদ শুনার পর, মিঃ জষ্টিস্ ম্যাকফার্সান্ বাহাদুর নিম্নলিখিত-মত রায় প্রকাশ করিলেন। যথা,—এই রুল অবশ্য না-মঞ্জুর হইবে। ইহাতে প্রধানতঃ এই কয়েকটী প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যে সময় এই বিজ্ঞাপনটী বিলি হইয়াছিল, বাদী তখন ঐ সকল পুস্তকের জন্য অর্ডার দিতে প্রলোভিত হইয়াছিলেন কি না, এবং আসামীর উহা দিবার অভিপ্রায় ছিল কি না; অর্থাৎ পুস্তকের জন্য আংশিক টাকা পাঠাইয়া পুস্তক পাঠাইতে বলিয়া বাদী প্রতারিত হইয়াছেন কি না, এবং আসামীর পুস্তক না-দিবার কু-অভিপ্রায় ছিল কি না! বাদী প্রকৃতই যে পুস্তক পাইবার আশায় প্রথম দফায় ১৲০ একটাকা বার আনা প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়েও আর কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহই নাই। আসামীর অসদ্ অভিপ্রায় এবং পুস্তক প্রদান করিবার ইচ্ছা না থাকার বিষয়ই, ম্যাজিষ্ট্রেট বুঝিয়াছিলেন। এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের এরূপ না বুঝিবার কোন কারণও দেখিতে পাই না। প্রমাণে দেখাযায় যে, গত ২৪এ নবেম্বর অর্থাৎ বিজ্ঞাপন বিলি হওয়ায় বহুদিন পরে—যখন সন্ধান লওয়া হইয়াছিল, তখনও,—আসামী পুস্তক-প্রকাশের কোন আয়োজনই দেখাইতে পারে নাই; যদিও সমগ্র পুস্তক তখন প্রদান করিবার সর্ত্ত তাহার বিজ্ঞাপনে ছিল। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া, আমাদের মনে হয়, ম্যাজিষ্ট্রেট ঠিক ন্যায্য বিচারই করিয়াছেন; এবং তজ্জন্য তাঁহার প্রদত্ত আজ্ঞাই বাহাল থাকিবে। কাজেই রুল না-মঞ্জুর হইল; এবং আসামীকে অবশিষ্ট সময়ও কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। এ দণ্ড কমিবার আর কোন কারণই দেখা যায় না।"

এ কথা আমরাও তো পূর্ব্ব হইতেই বলিয়

আসিতেছি! পরেশের পক্ষ হইতে আপিল প্রভৃতি করিয়া, বেচারার কষ্টের যে বৃদ্ধিই হইবে, এ সকল আমরা অগ্রেই বুঝিয়াছিলাম! আপিল না করিলে পরেশের দণ্ডের কাল প্রায় উত্তীর্ণ হইবার সময় হইয়াছিল। কিন্তু আপিল করিতে গিয়া—এই কিছুদিন জামিনে খালাস থাকিয়া, হতভাগ্যকে আবার নূতন করিয়া জেলে যাইতে হইল! বেচারার ছয়-মাস মেয়াদ, বিধি-চক্রে এখন দেখিতেছি, নয়-মাসে দাঁড়াইতে চলিল! মকর্দ্দমার আপিল রুজু করিয়া, ধুবড়ীরই একটী ভদ্রলোককে পরেশ জামিন-স্বরূপ দাঁড় করাইয়াছিলেন। জামিনদার কিন্তু বিশ্বাস করিয়া পরেশকে ধুবড়ী হইতে এতদিন বাড়ী আসিতে দেন নাই। অর্থাৎ বলিতে গেলে, গভর্ণমেণ্টের জেলখানা ছাড়িয়া, এতদিন পর্য্যন্ত পরেশনাথকে জমিন্দারের জেলখানাতেই থাকিতে হইয়াছিল। এখন আবার সুতরাং জামিন্দারের জেলখানা ছাড়িয়া অবশিষ্ট মেয়াদ-ভোগের জন্য পরেশকে কোম্পানীর জেলে যাইতে হইল। আপিল করিতে গিয়া হতভাগ্যের এই লাঞ্ছনা!

ইহাতেও কি অপরাপর জুয়াচোরদের শিক্ষা হইবে না? পরেশনাথের এ গুরু-দণ্ডেও কি অপর-সকলের চৈতন্য হইবে না? অনেকের চৈতন্য হইবে বলিয়া আমাদের তো বিশ্বাস! আর, বাস্তবিকই পরেশের মকর্দ্দমা দেখিয়া, অনেক জুয়াচোর আর তত বেগে জুয়াচুরী চালাইতে আজকাল সক্ষম হইতেছে না। পরেশের মকর্দ্দমার পর হইতে আমাদের সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, পুস্তকাদির জুয়াচুরী আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা তুলনায় অল্পই দেখিতে পাইতেছি। জুয়াচোরদের প্রাণে অনেকটা ভয় হইয়াছে—'অনুসন্ধান-সমিতি' কখন কাহাকে আবার পরেশের মত বিপাকে ফেলেন, সদাই এখন তাহাদের ঐ দুশ্চিন্তা।

এটি অবশ্যই দেশের শুভলক্ষণ বলিতে হইবে; এবং 'অনুসন্ধান-সমিতিরও' ইহা অপেক্ষা আর গৌরবের বিষয় কি হইতে পারে? ভগবান করুন, আমরা এইরূপেই যেন জুয়াচুরীর হস্ত হইতে সরল সাধু লোকদিগকে রক্ষা করিতে পারি! পরেশের কঠোর শাস্তি দেখিয়া জুয়াচোরদের যেন সুমতি হয়। পরেশের ন্যায় অপর কাহাকেও যেন দণ্ড দেওয়ার জন্য আমাদের আর চেষ্টা পাইতে না হয়।

সংবাদ।

—কি ভয়ানক জুয়াচুরী! ময়মনসিংহ-অঞ্চলের এক দল স্ত্রীলোক কয়েক জন পাণ্ডা এবং আপনাদের কয়েক জন পুরুষের সঙ্গে জগন্নাথ যাইবার জন্য কলিকাতায় আসে। কলিকাতার "কুইন" কোম্পানি না কি নাম বলিয়া কতকগুলি লোক পাণ্ডাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে জগন্নাথের ভাড়া তিন টাকা করিয়া লইয়া একটা ছোট ষ্টীমলঞ্চে দুইটা ছোট বার্জ্জ বাঁধিয়া কদমতলা-ঘাট হইতে ছাড়িয়া দেয়। ষ্টীম লঞ্চখানি সাগর দিয়া যাত্রীদিগকে লইয়া জগন্নাথে পৌঁছিয়া দিবার জন্য ছাড়া হয়। কিন্তু লঞ্চখানি এমনি মজবুত যে একদিন প্রায় সমস্ত দিনে উলুবেড়িয়ার নিকট কালসাপা পর্য্যন্ত আসিয়াই অচল হইয়া পড়ে, এবং কল খারাপ হইয়াছে বলিয়া সেইখানেই নঙ্গর করে। যাত্রীরা গোলমাল করাতে ষ্টিমারের পরিচালকগণ তাহাদিগকে, পরদিন সাহেবের আগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলে। এবং বাস্তবিক পরদিন প্রাতে একজন সাহেব আসিয়া কি গোলমাল করিয়া প্রায় এক শত লোককে সেইখানে চড়াতেই নামাইয়া দিয়া বার্জ্জসহ ষ্টীমার কোথায় লইয়া চলিয়া গিয়াছে। যাত্রীরা সেই অবস্থায় উলুবেড়িয়াতে পড়িয়া থাকিয়া হোরমিলার কোম্পানীর ষ্টিমারে পুনরায় টিকিট লইয়া মেদিনীপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে। তাহারা স্থানীয় পুলীশেও খবর দিয়াছিল পুলিষ অনুসন্ধান করিতেছে না!

—একজন যুবক ইংরাজ দেশ ভ্রমণ করিবার সময় চেক দিয়া জিনিস পত্র ক্রয় করেন। কিন্তু সেই সব চেকে টাকা পায় নাই বলিয়া, তিনি ম্যাজেষ্ট্রের কাছে বিচারার্থ অর্পিত হইয়াছেন। উক্ত যুবক নানা প্রকার নাম ধারণ করিয়া বেড়াইতেন। গ্রিফিন লেফ্‌টন্যাণ্ট কিংহার ম্যান, ক্যাপটেন রাসেল, আর, এ, লেফ্‌টন্যাণ্ট বিডন ফিলড্‌ এই গুলি নাম ভাঁড়াইয়াছেন। এর মধ্যে একটীও আসল নাম নহে।

—হাবড়ার অন্তঃপাতী ঝিকরা-গ্রামে, অমৃতলাল সরকারের বাটীতে, বিগত শনিবার রাত্রে, ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। শুনিতেছি, ১৬ জন দস্যু-লুণ্ঠনে গিয়াছিল! এক জনের হাতে তরবারি ছিল, আর সকলের হাতে ছিল, লাঠী। অমৃতলালের মুখে কাপড় বাঁধিয়াছিল। চেঁচাইলে কাটিয়া ফেলিবার ভয় দেখাইয়াছিল। ফলকথা সে কালে ডাকাইতির কাজে যাহা যাহা হইত, এখানেও তাহা তাহা হইয়াছিল। ৭৩০ টাকার সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। পুলিষ সন্ধান করিতে পারেন নাই।

বি এল পরীক্ষার ফল।

প্রথম শ্রেণী।

শ্যামাপ্রশন্ন মজুমদার, রিপণ কলেজ। বিপিনবিহারী সেন, ঐ। অমূল্যচন্দ্র মিত্র, ঐ। মহেন্দ্রচন্দ্র সেন, মেট্র। সারদাচরণ সেন, রিপণ। প্রমথনাথ দত্ত, সিটি কলেজ। নগেন্দ্রনাথ মিত্র ১নং, রিপণ। গোপালজী, পাটনা। সতীশচন্দ্র মুখো, সিটি। ললিতকুমার বন্দ্যো, রিপণ। তারকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বহরমপুর কঃ। অধরচন্দ্র মিত্র, রিপণ। নীলকান্ত চট্টো ১নং, ঐ। বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত, রেভেন্‌সা। শশিভূষণ বন্দ্যো, মেট্র। বিধুভূষণ চট্টো, ঐ। রজনীকান্ত চৌধুরী, রিপণ। রাজকিশোর দাস, রেভেন্‌সা। ভুবনমোহন মুখো, মেট্র। নীলকান্ত চট্টো ২নং, রিপণ। রহিমজাহিদ জাহাকর, ঐ। যোগীন্দ্রলাল সাহা, মেট। জগদীশচন্দ্র গোস্বামী, রিপণ। গিরিশচন্দ্র নাগ, ঐ। যোগীন্দ্রনাথ সিংহ, মেট। গঙ্গাধর সাহা, সিটি। গঙ্গাপ্রসাদ মুখো, হুগলি কঃ। ওয়ালিয়র রহমণ, ঢাকা কঃ। শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, রিপণ। রজনীকান্ত সরকার, রাজসাহী কঃ। হরপ্রসাদ চট্টো, রিপণ। হরিদাস বসু, মেট। ধীরেন্দ্রলাল খাস্তগির, রিপণ।

দ্বিতীয় শ্রেণী।

সতীশচন্দ্র সেন, মেট। উপেন্দ্রনাথ বসু, রিপণ। রাসবিহারী দাস, ঐ। শিবনাথ সিংহ, পাটনা। কৈলাসচন্দ্র দাস, মেট। তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, ঐ। নারায়ণচন্দ্র বসু, ঐ। সত্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আগ্রা কলেজ। রাধাকৃষ্ণ দত্ত, মেট। ব্রজেন্দ্রচন্দ্র রায়, ঐ। মহিমচন্দ্র ঘোষ, ঐ। অন্নদাচরণ ধর, ঐ। বসন্তকুমার বসু, সিটি। কেদারনাথ চৌধুরী, রিপণ বামনদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সিটি। নৃত্যগোপাল মিত্র, ঐ। বেণীমাধব চক্রবর্ত্তী, বহরমপুর চারুচন্দ্র গুপ্ত, মেট। পূর্ণচন্দ্র চট্টো, সিটি। যজ্ঞেশ্বর ভৌমিক, রিপণ। গুরুদাস ঘোষ, ঐ। শশিভূষণ গোস্বামী, রাজসাহী। শরচ্চন্দ্র দত্ত, মেট। ব্রজরাজ চৌধুরী, ঐ। রাজেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ঐ। তারকেশ্বর গুপ্ত, রাজসাহী। আবদুল আজিজ খাঁ, রিপণ। নগেন্দ্রচন্দ্র সেন, মেট। নারায়ণদাস বন্দ্যো, রিপণ। শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য, রেভেন্সা। যতিকুমার ঘোষাল, সিটি। কালিদাস রায় চৌধুরী, রিপণ। ভূষণচন্দ্র মুখো, ঐ। সতীশচন্দ্র সেন, ঐ। শশিকুমার সেন, জগন্নাথ ঢাকা। দীননাথ সেন, রিপণ। আনন্দচন্দ্র মিত্র, রেভেন্সা। জ্ঞানরঞ্জন চট্টো, রিপণ। যোগেশচন্দ্র দাসগুপ্ত, সিটি। কুমুদবন্ধু মুখো, ঢাক কঃ। কার্ত্তিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মেট। বিনোদলাল বন্দ্যো ঐ। হরিদাস মণ্ডল, রিপণ। রামহৃদয় শীল, ঐ। ধর্ম্মদাস বন্দ্যো, মেট্র। সর্ব্বেশ্বর পাল, ঐ। যোগীন্দ্রনাথ মিত্র, রিপণ। বলরাম বন্দ্যো, ঐ। সতীশচন্দ্র বন্দ্যো, সিটি। ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য, রিপণ। সরচ্চন্দ্র মুখো ২নং, ঐ। কালীপ্রসন্ন সেন, ঐ। অমুল্যচন্দ্র বন্দ্যো, মেট্র। শরচ্চন্দ্র সেন, ঐ। চারুচন্দ্র চট্টো রিপণ। বামাচরণ দে, ঐ। রসিকলাল ঘোষ, ঐ। রাখালদাস বন্দ্যো, রাজসাহি। সারদাপ্রসন্ন পাল, মেট্র। প্রতাপচন্দ্র দত্ত, সিটি। সারদাপ্রসাদ মুখো, রিপণ। মথুরানাথ দাসগুপ্ত, পাটনা। ধীরাজচন্দ্র কুমার, মেট্র। অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যো, রিপণ। ক্ষেত্রমোহন দত্ত, ঐ। কৃপানাথ ঘোষ ঐ। আত্মরাম, পাটনা। কাশীশ্বর সেন, মেট্র। যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, রিপণ। কালীপ্রসন্ন মিত্র, ঢাকা। মণীন্দ্রচন্দ্র রায়, মেট্র। ললিতমোহন সেন, সিটি। বনবিহারী পালিত, রেভেনসা। রসিকলাল মিত্র, মেট্র। রামকৃষ্ণ বন্দ্যো, সিটি। মহেন্দ্রনাথ মুখো, ঐ। চন্দ্রশেখর বসু, রিপণ। বামাচরণ মুখো, মেট। প্রসন্নকুমার বসু, সিটি। দ্বিজেন্দ্রনাথ বল, রিপণ। মহানন্দ সহায়, ঐ। উমাচরণ দত্ত, মেট। ব্রজনাথ দাস, জগন্নাথ। রজনীনাথ নন্দী, সিটি কলেজ। নগেন্দ্রনাথ মিত্র নং ২, রিপণ। রাখালচন্দ্র

মুখো, মেট। ফেলারাম চট্টো, সিটি। মামুদ, রিপণ। প্রিয়নাথ গঙ্গো, বহরমপুর। যোগীন্দ্র লাল দত্ত, মেট। জগদীশচন্দ্র রায়, রিপণ। শৈলজাপ্রসাদ, পাটনা। ধনকৃষ্ণ বিশ্বাস, মেট। বনমালী ঘোষ, ঐ। শ্রীকান্ত চৌধুরী, সিটি। লংফর রহমণ, পাটনা। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মেট। কৈলাশচন্দ্র বিশ্বাস ১নং, ঐ। নগেন্দ্রনাথ মুখো, সিটি। যতীন্দ্রনাথ বসু, রিপণ। প্রভাতচন্দ্র চট্টো, ঐ। গুরুদাস দত্ত, জগান্নথ। যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যো, মেট। ক্ষেত্রচন্দ্র মুখো, সিটি। রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১নং, রিপণ কঃ। পঞ্চানন আচার্য্য, কৃষ্ণনগর কঃ। মীর্জা বেদার বক্‌ৎ, হুগলি। ঝড়খণ্ডি প্রসাদ, পাটনা। সন্তোষকুমার রায়, মেট। তেজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, রিপণ। অমৃতলাল মারিক, মেট। শশিভূষণ চট্টো, ঐ। উমেশচন্দ্র চট্টো, ঐ। রাখালচন্দ্র চট্টো, ঐ। গুরুদাস বিশ্বাস, জগন্নাথ। নির্ম্মলচন্দ্র মিত্র, মেট। জানকীনাথ গুহ, সিটি। হরকুমার মিত্র, রিপণ। জে, আর, পার্শিভ্যাল। অতুলেশ্বর বসু, পাটনা। আশুতোষ ঘোষ মেট। অন্নদাচরণ চৌধুরী, ঐ। গোপালগণেশ নন্দী, মরিস কলেজ, নাগপুর। লক্ষ্মীনারায়ন, বন্দ্যো। উমেশচন্দ্র ঘোষ, মেট্। যোগীন্দ্রচন্দ্র ঐ। যদুনাথ রায়, রিপণ। রজনীকান্ত সান্যাল সিটি। চন্দ্রশেখর রায়, মেট্। রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, ঐ। কামিনীমোহন গুপ্ত, ঐ। কামিনী মোহন বন্দ্যো, রিপণ। দুর্গাদাস চক্র, ঐ। দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, ঐ। দেবেন্দ্রনাথ চক্র, ঐ। রাধিকান্ত দত্ত, পাটনা। গোবিন্দকিশোর দত্ত সিটি। বিদ্যাপ্রসাদ সিংহ, পাটনা। চিন্তামণি চট্টো, রিপণ। হরিদাস মিত্র, রিপণ। মধুসূদন দত্ত, সিটি। রমেশচন্দ্র বসু, রিপণ। মহেন্দ্রলাল রায়, ঐ। অবিনাশচন্দ্র, মেট। দেবেন্দ্রচন্দ্র মুখো, সিটি। গোপালচন্দ্র সোম, হুগলি। ক্ষেত্র নাথ বর্ম্মা, মেট্। বরদাকান্ত বন্দ্যো, রিপণ। যোগীন্দ্রমোহন দাস, মেট্। কুমুদনাথ দে, ঐ। জহরল হক্, ঢাকা। মন্মথলাল দাস, মেট্। বাণীচন্দ্র সান্যাল, ঐ। নৃত্যগোপাল বন্দ্যো, ঐ। বনমালী মজুমদার, ঐ। জগচ্চন্দ্র ভাদুড়ী, রিপণ। সারদাচরণ খাস্তগির, মেট্। নয়নাঞ্জন ভট্টা, সিটি। বিষ্ণুচন্দ্র ভট্টা, কৃষ্ণনগর। ইন্দ্রভূষণ মজুমদার, রিপণ। অক্ষয়কুমার রায় চৌধুরী, ঐ। অঘোরনাথ বন্দ্যো, ঐ। অনন্ত কুমার দাস গুপ্ত, জগন্নাথ। কেদারনাথ ভট্টা, মেট্। এককড়ি সেন, ঐ। সুরেশচন্দ্র মুখো, ঐ। চন্দ্রকুমার বসু, ঐ। শ্রীশচন্দ্র ভঞ্জ, রিপণ। অক্ষয়কুমার ঘোষ, মেট্। রসিকলাল গুপ্ত, ঢাকা। কৈলাসচন্দ্র দে, মেট। যোগেশ্বর প্রসাদ সিংহ, পাটনা। যোগেন্দ্রনাথ সরকার, মেট শ্যামাচরণ রায়, ঐ। বিহারিলাল চক্র, কৃষ্ণনগর। দুর্গাকান্ত রায়, রিপণ। কামিনীকমল সেন, মেট। যাদবকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, প্রেসিডেন্সি। মহেন্দ্রনারায়ণ চক্র, রিপণ। বিজয়কেশব মিত্র, মেট। কৈলাসচন্দ্র বিশ্বাস ২নং, ঐ। দেবেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার রিপণ। রামদুল্লভ নজুমদার, ঢাকা। কার্ত্তিকচন্দ্র ভট্টা, রিপণ। কালাচরণ মিত্র, সিটি। প্রসন্নকুমার গুহ, রিপণ। বঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী, কৃষ্ণনগর। মথুরানাথ সিংহ, মেট। গৌরপদ রায়, ঐ। শরচ্চন্দ্র সান্যাল, ঐ। আশুতোষ মুখো, রিপণ। উপেন্দ্রনাথ সেন, ক্যাণিংকলেজ। নিবারণচন্দ্র সাহা, মেট। নতিলাল দাস, ঐ। প্রাণহরি সেন, সিটি। ক্ষেত্রপ্রসাদ রায়, মেট। চারুচন্দ্র মজুমদার, রিপণ। প্রসন্নকুমার মজুমদার, ঐ। প্রবোধচন্দ্র মিত্র, মেট। হরিকৃষ্ণ রায়, সিটি। মধুসূদন রায়, রাজসাহি। দেবেন্দ্রচন্দ্র নল্লিক, মেট। শ্রীশচন্দ্র দত্ত, রিপণ। হেমচন্দ্র সান্যাল, ঐ। দেবেন্দ্রনাথ চক্র, মেট। সতীশচন্দ্র মুখো, রিপণ। ভবানী সহায়, ঐ। বিপিনবিহারী বসু মেট। নবীনচন্দ্র কর, রিপণ। দুর্গাদাস বন্দ্যে ঐ। কালীপ্রসন্ন মুখো, মেট। যদুনাথ রায় চৌধুরী, ঐ। শশিকুমার বন্দ্যো, সিটি। কৃষ্ণনাথ ভট্টা, রাজসাহি। শরচ্চন্দ্র দত্ত, রিপণ। প্রিয়নাথ ভট্টা, সিটি। অটলবিহারী ঘোষ, রিপণ। পূর্ণচন্দ্র শালিত, রেভেন্‌সা। শ্রীহর্ষ মুখো, রিপণ। অবিনাশচন্দ্র নন্দী, ঐ। পরেশণাথ সরকার, মেট। মতিলাল মুখো, রিপণ। চন্দ্র কান্ত ভট্টা, সিটি। পরমানন্দ বিশ্বাস ঢাকা।

অনুসন্ধান।

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

৩য় খণ্ড] ৩১এ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৭ সাল। [২১শ সংখ্যা।

আত্ম-উপদেশ।

(বাউলের গান।)

(১)

মুখে 'হরি' বল্লেই, 'হরি' বলা হ'ল না।
চিতাভস্ম মাখ্‌লেই, সাধু-সন্ন্যাসী হয় না॥
বনে বনে যোগীবেশে, ফলমূল খেয়ে ক্লেশে,
কাটাতে পার্লেই কিছুদিন।
হরিপূজা-হরিধ্যান, হয় না তো সমাধান,
পায়-না হরিকে পুণ্যহীন॥
হরি—পাপহারী তাহে সদয় হন না।
জীবের দুর্গতি তায় কখনো তো যায় না॥

(২)

যদি হরি পেতে চাও, মন প্রাণ সঁপ তাঁয়,
ডাক তাঁরে মনের সহিতে।
মনে ভুলে ডেকে মুখে, দেখিতে পাবেনা হরি,
হরি আসিবে না দেখা দিতে॥
ভক্তি-ডোরে বাঁধ তাঁরে, নৈলে হরি পাবে না।
মন-প্রাণ না সঁপিলে, হরি কভু মিলে না॥

(৩)

মনের ডাকা ডাক্‌লে পরেই, হরি হন সদয়।
জীবের গতি, পাপীর মুক্তি হাতে-হাতেই হয়॥
তাই বলি মন—ও ভোলা মন, মুখের হরি বলোনা।
মনে মনে হরিরে ডাক, মুখের ডাকা ডেকো না॥

পুণ্যবানের পরীক্ষা।

এ জগতে প্রকৃত পুণ্যাত্মা কে? ঐ যে সন্ন্যাসী—যাঁহার পাদোদক-পানে অন্যে আপনাকে কৃতার্থ-জ্ঞান করিতেছে—নিয়তই যাঁহার মুখে "ব্যোম ব্যোম হরে হরে" শব্দ—উনিই কি তবে প্রকৃত পুণ্যাত্মা! অঙ্গে হরিনাম-লেখা, গাত্রে হরিনামাবলী, পরিধানে জীর্ণ কৌপিন, মুখে সদাই 'হরি হরি'—তবে এই সকলই কি পুণ্যাত্মার লক্ষণ? অথবা নৈয়ায়িক, পণ্ডিত, শাস্ত্রপাঠী, ধনবান কিম্বা কুলগুরু আচার্য্য হইলেই কি পুণ্যাত্মা হওয়া যায়? আর ঐ চিরদরিদ্র—অন্নের কাঙ্গালী, দিনান্তে একবার আহার করিয়া যাহার স্ত্রীপুত্র জীবন ধারণ করে, তবে তাহারাই কি কেবল একমাত্র পাপী? মূর্খ হইলেই, অজ্ঞান থাকিলেই, শাস্ত্রপাঠে ঈশ্বর-তত্ত্ব না-জানিতে পারিলেই, তবে বুঝি আর পুণ্যাত্মা হওয়া যায় না! জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোক না পাইলে, বড়লোক—মহৎব্যক্তি বলিয়া নাম কিনিতে না পারিলে, পাঁচ জনে আমার 'পুণ্যাত্মা ব্যক্তি' বলিয়া সম্ভাষণ না করিলে, তবে বুঝি আর উদ্ধারের উপায়ই নাই! পুণ্যক্ষেত্রে মরিতে পারিলেই, তীর্থস্থানে

পরিভ্রমণ করিলেই, দেবদেবীর কৃত্রিম মূর্ত্তি দেখিয়া আসিলেই, অথবা গঙ্গা-যমুনা-ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিলেই, বুঝি আর মোক্ষের ভাবনা থাকে না! যে-না তা' করিতে পারে—যাহার সময়, অবস্থা বা অনাটনে তাহার সকলগুলি না কুলায়, সেই তবে নরকস্থ হইবার পাত্র? হায়-হায়! কলির পৃথিবী এতই অপদার্থ হইয়া পড়িয়াছে!

কিন্তু বাস্তবিকই কি তাই? কলির লোকের বিশ্বাস-ধারণা এরূপ হউক; কিন্তু তাই বলিয়া প্রকৃতই কি ঈশ্বরের রাজ্যের এই বিচার? কখনই না। ধারণা লোকের যাহা থাকে, থাকুক; যে ভাবনা ভাবিয়া লোকে কার্য্য করে, করুক; কিন্তু সেই পরমপিতা পরমেশ্বরের কার্য্য চিরদিনই একরূপ আছে! তাঁহার কার্য্যের কখনই ব্যতিক্রম ঘটিতেছে না! লোকের অন্ধ-বিশ্বাসের উপর কি সেই সর্ব্ব-নিয়ন্তার বিধি-বিধান নির্ভর করে? তাঁহার বিধান যেরূপ চলিয়া যাইতেছে, সেরূপই আছে; চিরদিন থাকিবেও সেরূপ। তবে বৃথা আমাদের ভাবনা—অনর্থক আমরা পাপপুণ্যের ভেদাভেদ স্থির করিয়া লই। তাঁহার সে বিধান কিরূপ, সেই উপলক্ষে কোন সাধক একদিন একটী গল্প করিয়াছিলেন। সে গল্পটী বড়ই মনোরম, বড়ই উপদেশক—তাহার সত্য বড়ই সুন্দর প্রস্ফুটিত! পাঠক দেখুন, এ প্রবন্ধ-সূচনায় সে গল্পটিই খাটিতেছে বেশ। যথা;——

শ্রীশ্রী৺কাশীধাম। মণিকর্ণিকার ঘাট। দশহারার স্নান-উপলক্ষ। পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তীরে লোক আর ধরে না। একে দশহারা, তা'য় আবার কি এক মহাযোগ উপস্থিত! দেশ-দেশান্তর হইতে, নগর-গ্রামান্তর হইতে, মণিকর্ণিকা লোকে লোকারণ্য! বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী, সাধু-উদাসী, ফকির-মহাজন, স্ত্রী-পুরুষ—সকলেই স্নান-পূজায় নিমগ্ন। সকলেরই মুখে—"মাতর্গঙ্গে"; সকলেই বলিতেছে,—"পতিতুদ্ধারিণী মা!" দান, ধ্যান, তপ, জপ, পূজা, মন্ত্রপাঠ, আচমন, আবাহনে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ; দশহারায় দশজন্মের পাপক্ষয় হইতেছে,—এই আহ্লাদেই সকলে আটখানা!

এই সময় পতি-ক্রোড়ে বসিয়া, পার্ব্বতী মহাযোগী মহেশ্বরকে জিজ্ঞাসিলেন,—"প্রভো! আজ আমার মনে একটী বড়ই সংশয়-প্রশ্ন উপস্থিত। যখন যাহা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, আপনি তখনই আমার সস্নেহে তাহা বুঝাইয়াছেন। কিন্তু আজ দেব! আমার একটী গুরু-প্রশ্নের মীমাংসা আপনাকে করিয়া দিতে হইবে।" যোগীশ্বর দেবদেব মহাদেব তাহাতে সাদর-সম্ভাষণে উত্তর করিলেন,—"প্রিয়ে, বল-বল, তোমার কি প্রশ্ন আছে? এমন কি গুরু-প্রশ্ন যে, সে প্রশ্নের তুমি নিজে মীমাংসা করিতে না পারিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিতেছ? যাইহোক, আমায় বল তুমি, যথাসাধ্য আমি তাহা বুঝাইয়া দিব।"

জগত্তারিণী দীনদয়াময়ী মহেশ্বরী তখন সাগ্রহে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"প্রভো! আপনার নিকটই একদিন শুনিয়াছিলাম যে,—যে কোন দিনে একবার গঙ্গাস্নান করিলেই পাপীর উদ্ধার হয়; আর যদি কেহ দশহারার দিনে একবার গঙ্গাস্নান করিতে পারে, তবে তাহার দশজন্মের পাপ ক্ষয় হয়। কিন্তু স্বামীন্, অদ্য একে দশহারা, তা'য় আবার এক মহাযোগ উপস্থিত। দেখিতেছি, এমন কেহই রহিল না যে, যে অদ্য গঙ্গা-স্নান না করিয়া নিশ্চিন্ত আছে! বিশেষতঃ ঐ যে মণিকর্ণিকার ঘাট—ওখানে তো লোক ধরিতেছেই না! তবে কি দেব, আজ হইতে ভারতে আর কেহই পাপী রহিল না? সকলেই তবে কি আজ হইতে উদ্ধার পাইল?"

ভবানীপতি হাসিতে হাসিতে তাহাতে উত্তর করিলেন,—"প্রিয়ে, এখন বুঝিতেছি, প্রশ্ন গুরুতর বটে! আচ্ছা, আমি তোমায় এখন আর কথায় ইহার কোন উত্তর না দিয়া একবার কাজে দেখাইতে চাহি, এ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর কি? তুমি এক কাজ কর—এক দরিদ্রা ব্রাহ্মণীর বেশে কাঁদিতে কাঁদিতে আমায় ক্রোড়ে করিয়া মণিকর্ণিকার ঘাটের এক-পার্শ্বে যাইয়া বইস। আমিও এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে মৃতপ্রায় তোমার ক্রোড়ে পড়িয়া থাকি। আমাকে এইরূপে ক্রোড়ে করিয়া তুমি গঙ্গাস্নানার্থী ঘাটের সমস্ত লোককে ডাকিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বল যে,—'আমার আর কেহই নাই—একমাত্র বৃদ্ধ স্বামী ছিলেন, ইনিও ইহলোক ত্যাগ করিলেন। এক্ষণে কেহ যদি দয়া করিয়া ইহাঁর সৎকারে আমায় সহায়তা করেন, তাহাহইলে আমি বড়ই উপকৃত হই। নহিলে আমার জাতি-ধর্ম্ম সকলই নষ্ট হয়!'

"এই বলিয়া তুমি যখন কাঁদিতে কাঁদিতে সকলকে ডাকিবে, তখন নিশ্চিতই তোমার নিকট অনেকেই উপস্থিত হইবেন। আর, নিকটে কেহ আসিলেই, সেই সময় তুমি বলিবে,—'আপনারা আমার উপকার করিতে আসিতেছেন, ভালই। কিন্তু আমার একটী কথা আছে; সেটী শুনিয়া তবে আপনারা আমার উপকার করিতে অগ্রসর হইবেন। নহিলে আমার জন্য অকারণ আপনারা কোনরূপে বিপদস্থ হন, এরূপ বাসনা আমার নাই।' এই বলিয়া, তুমি বলিবে যে,—'আমার প্রতি এরূপ এক অভিসাপ আছে যে, যে কেহ আমার স্বামীর সৎকার করিতে পারিবেন না। পুণ্যাত্মা না হইলে—নিষ্পাপ শরীর না থাকিলে, কেহই আমার স্বামীর সৎকারে অধিকারী হইবেন না। যদি কেহ গাত্র-যোরে সেরূপ করিতে অগ্রসর হন, তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হইবে। আর, একথা বড় অলীকও নহে। যিনি আমায় এরূপ অভিসাপ দিয়াছিলেন, তাঁহার অভিসাপেই আজ আমি পতিহারা! সুতরাং আপনাদের মধ্যে যদি কেহ নিষ্পাপ শরীর—পুণ্যাত্মা থাকেন, তবে তিনিই আসুন—আমার উপকারে অগ্রসর হউন। নচেৎ অনর্থক আমার উপকারও হইবে না, অথচ আত্মীয়-স্বজনকে কাঁদাইয়া প্রাণে মরিবেন;—এরূপ কার্য্যে কেহ যেন অগ্রসর না হন।'

"এরূপ করিলেই, দেখিবে প্রিয়ে, কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়! তাহাহইলেই তোমার প্রশ্নের মীমাংসাও হাতে-হাতে পাইবে। এখন, তবে চল, আর বিলম্বে কাজ নাই। দেখা যাউক, কিসে কি হয়!"

এই বলিয়া মহাদেব ও পার্ব্বতী দুইজনেই বাহির হইলেন। একবার দেখিতে চলিলেন,—জীবের উদ্ধার-অনুদ্ধার কিসে নির্ভর করে?

* * * *

মহামায়া এখন মায়াবিনী ব্রাহ্মণী। আর মহাযোগী এখন ব্রাহ্মণবেশে মহাযোগে নিমগ্ন। প্রাতঃকাল হইতেই জগজ্জননী সেই জগৎপিতাকে ক্রোড়ে করিয়া, ঘাটের ধারে বসিয়া আছেন; আর স্নানার্থী সকলকেই ডাকিয়া বলিতেছেন,—"ব্রাহ্মণ হউন অথবা শূদ্র হউন, স্ত্রীলোকই হউন অথবা পুরুষই হউন, যে কেহ আমার পতির সৎকার-কার্য্যে সহায়তা করুন। আমার আর আত্মীয়-স্বজন কেহই নাই। সৎকার-অভাবে আমার মৃতপতির সদ্গতি হইতেছে না।" ঘাটের লোকে অনেকেই সে কাতরুক্তি শুনিয়া অগ্রসর হইতেছেন বটে; কিন্তু শেষ কথা শুনিয়াই—পুণ্যাত্মা ভিন্ন পাপীর সে দেহ সৎকারে অধিকার নাই জানিয়াই—কাহারও আর তাহাতে সাহসে কুলাইতেছে না। সকলেই সে দেহ সৎকার করিতে গিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন।

এইরূপে প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বেলা তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেল। এক এক করিয়া দেখিতে দেখিতে লক্ষ লক্ষ যাত্রী সেই ঘাটে স্নান করিয়া গেল; স্ত্রী-পুরুষ সকলেই

দয়াপরবশ হইয়া রমণীর উদ্ধার করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু কেহই শেষ কথা শুনিয়া আর সেখানে দাঁড়াইতে সাহসী হইলেন না। "নিষ্পাপ শরীর নহিলে এ দেহ সংকার করিতে যাইলে প্রাণ দিতে হইবে"—এ যে বড় ভয়ানক কথা! মনে মনে সকলেরই তো আপনাপন কীর্ত্তি-কাহিনী জানা আছে—মনের অগোচর পাপ তো কাহারও নাই? কাজেই এক্ষেত্রে—এই অসংখ্য নরনারীর কাহারও অগ্রসর হইবার ক্ষমতা হইল না। দীর্ঘ জটাজুট-সমন্বিত ভস্ম-বিলেপিত-অঙ্গ সন্ন্যাসী—তাঁহারও এক্ষেত্রে সাহস হইল না। হরি-নামাঙ্কিত-তনু, সর্ব্বথা হরি-জপরত সেই বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ—তিনিও রমণীর শেষ বাক্য শুনিয়া পশ্চাৎপদ হইলেন। সংসারী, উদাসী, ভিক্ষুক, বৈরাগী—কাহারও সে সাহস হইল না; কেহই আপনাকে নিষ্পাপী বলিয়া শবদেহের সংকারে অগ্রসর হইতে পারিলেন না।

এইরূপে প্রায় দিবা অবসান। ঘাটের প্রায় লোক সকলেই স্নান করিয়া প্রত্যাগমন করিয়াছে। ব্যাপার দেখিয়া পার্ব্বতী চমকিত হইলেন। মহাদেব তাহাতে বলিলেন,—"আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণই নাই। জগতের গতিকই এইরূপ! ইহা হইতেই বুঝিয়া লও, কাহার উদ্ধার হইবে; অথবা কে নরকস্থ হইবে।"

তাঁহাদের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় একটী নিরক্ষর, কৃষ্ণকায়, জীর্ণদেহ, কৌপিন-পরিহিত কৃষক, মাঠের নিত্যকর্ম্ম সারিয়া, সেই ঘাটে স্নান করিতে আসিল। সে ক্রমে ধাপে ধাপে ঘাটে নামিতেছে, এমন সময় পূর্ব্ববৎ পার্ব্বতী তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"ওগো, তুমি যদি আমার উপকার কর, তবেই হয়। মৃত-পতি ক্রোড়ে করিয়া, প্রাতঃকাল হইতে আমি এই ঘাটে বসিয়া আছি। কিন্তু কেহই আমার স্বামীর সংকার-কার্য্যে সহায়তা করিতে সাহসী হয় নাই। এখন, তুমি যদি আমার উপায় কর, তবেই হয়। নহিলে আমার আর উপায়ান্তর নাই।" ইহার পরই পার্ব্বতী আবার বলিলেন,—"কিন্তু এক কথা এই যে,—নিষ্পাপ শরীর না হইলে কেহই ইহাঁকে স্পর্শ করিতে সক্ষম হইবে না। তাহাহইলে তাঁহারও প্রাণ যাইবে। যদি তুমি নিষ্পাপী হও, তবেই আমার উপকার করিতে আইস। নহিলে অনর্থক চেষ্টায় প্রয়োজন নাই।"

কৃষক স্থিরচিত্তে রমণীর সমস্ত কথা শুনিল। শুনিয়াই, কিছুক্ষণ সে যেন থমকিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরক্ষণেই আপনা-আপনি ভাবিতে লাগিল,—"গুরুদেবের নিকট শুনিয়াছিলাম, দশহারার দিন গঙ্গাস্নান করিলে দশ-জন্মের পাপক্ষয় হয়। সুতরাং আমি যতই কেন পাপী হই না, গঙ্গাস্নান করিলে, আজ তো আমি নিশ্চয়ই নিষ্পাপী হইব! আর, সেরূপ হইলে, আমি কেনই বা এ রমণীর উপকার করিতে পারিব না? আমি যদি আজ 'মাতর্গঙ্গে' বলিয়া একবার ডুব দিয়া আসিয়া, এই দেহের সংকার-কার্য্যে অগ্রসর হই, তবে কে আমায় তাহাতে বাধা দিতে পারে? বিশেষতঃ এই পরোপকার-কার্য্যে! পরের উপকার করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম জগতে আর কি আছে? সে উপকারের জন্য এ অবস্থায় আমার প্রাণই যদি যায়, তবে তাহাতেই বা হানি কি? যাইহোক, আমাকে এ রমণীর সাহায্য করিতেই হইবে!" এইরূপ ভাবিয়াই, কৃষক সেই ব্রাহ্মণী-বেশী জগজ্জননীকে বলিল,—"মা, আমিই আপনার একার্য্য করিব। এখনও যদিও আমি পূর্ণ পাপী, কিন্তু জননী, গঙ্গা-স্নান করিয়া আসিলেই আমি তো নিষ্পাপী হইব? তবে আর আমার ভাবনা কি? আপনি নিশ্চিন্ত হউন; আমি এখনই—ডুব দিয়া আসিয়াই, আপনার সহায়তা করিতেছি।"

এই বলিয়াই, কৃষক ছুটিতে ছুটিতে 'মাতর্গঙ্গে' বলিয়া সেই পতিতুদ্ধারিণী গাঙ্গিনীর ক্রোড়ে ঝাঁপ দিল। দেখিতে দেখিতে অবগাহন করিয়া, প্রত্যাবৃত্ত হইয়াই, বলিল;—"মা, আমি আসিয়াছি। এখন আমি নিষ্পাপ শরীর। সুতরাং, ভরসা করি, এখন আমার দ্বারাই আপনার কার্য্য শেষ হইবে।"

ইহার পরই কৃষক সেই মৃত ব্রাহ্মণবেশী মহাদেবের শরীর ধারণ করিয়া নিম্নতর সোপানে অবতরণ করিতে উদ্যোগী হইল। রমণী শবের মস্তক ধারণ করিলেন; এবং কৃষক তাঁহার পদদ্বয় ধরিয়া চলিতে চেষ্টিত হইল।

এমন সময়ই একি অলৌকিক কাণ্ড!—একি অদ্ভুত পট-পরিবর্ত্তন! দেখিতে দেখিতে, নিমেষের মধ্যে, তীরদেশ অত্যুজ্জ্বল প্রভায় প্রভাসিত হইল। আকাশ হইতে ঘন ঘন পুষ্প-বৃষ্টি হইতে লাগিল; নভোস্থল হইতে যেন শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি বাজিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে আরও এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! সেই যুগল ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে হর-পার্ব্বতী মূর্ত্তিতে পরিণত হইলেন; এক সুদিব্য রথোপরি সে মূর্ত্তিদ্বয় স্থাপিত হইয়া এক রমণীয় শোভার আধার হইল। আর, সেই কৃষক!—সেও তখন সেই রথে! তখন কি তাহার সুবিদ্য কান্তি—কি তাহার রমণীয় মাধুর্য্য! সে তখন যোড়করে হর-পার্ব্বতীর স্তব-স্তুতি গাহিতে গাহিতে একই রথে বৈকুণ্ঠে চলিয়াছে!

এরূপই পুণ্যাত্মার পরীক্ষা! এরূপেই সাধু-সৎ পরিচিত হন! এরূপ দেখাইয়াই, মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতে লাগিলেন,—"দেখিলে পার্ব্বতি! লোকের উদ্ধার-অনুদ্ধার কিসে হয়? প্রকৃত ভক্তি—আন্তরিক বিশ্বাস এ-জগতে কি আছে যে, জীবের সদ্গতি হইবে? সে বিশ্বাস—সে ভক্তি যদি থাকিত, তাহাহইলে কি আর ভাবনা থাকিত?"

তারাচাঁদ।

(নয়টি পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ ক্ষুদ্র উপন্যাস।)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

হরিহর বাবুর দিন দিন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই পরিবারবর্গের বৃদ্ধি হইতেছে; পৌত্র-দৌহিত্রের কোলাহলে তাঁহার বাটী ক্ষণে ক্ষণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। হরিহর বাবু উন্নতির সোপানে পদার্পণ করিয়া সুরম্য সুদীর্ঘ একখানি বাটী প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। এতদিন তাহা যেন নিরালয় হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে আর সে ভাব নাই। অসংখ্য দাস-দাসী, পাচক ব্রাহ্মণ, খানসামা, সরকার, বরকন্দাজ ইত্যাদি কর্ম্মচারী ব্যতীত তাঁহার পরিবার-সংখ্যা দিন্ দিন বৃদ্ধি হইতেছে। যে বাড়ীতে পূর্ব্বে বালক-বালিকার নামগন্ধ ছিল না, এক্ষণে তথায় সমবয়স্ক চারি-পাঁচটী বালক-বালিকা জুটিয়াছে। হরিহর বাবুর আনন্দের আর পরিসীমা নাই।

রামদয়ালের গৃহিণী স্বামীর মত নিজের অবস্থা বুঝিয়াই চলিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র-কন্যার দরুণ, কার্য্যে তাহা পরিণত হয় না। তারাচাঁদ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইলে, কিছুকাল আর কোন গোল-যোগ হয় নাই। সুখ-স্বচ্ছন্দে, হাসি-খুসিতে দিন কাটিতেছিল। শ্যামচাঁদ বড় ভাল মানুষ। সে পিতার নয়নানন্দ হইয়া পরের সংসারে সকলকে সন্তুষ্ট করিয়াই চলিতেছে। যদিও বয়সে অল্প, তথাচ তাহার ভালমন্দ বিবেচনা-শক্তি জন্মিয়াছে। পিতামাতা যে কার্য্য করিতে নিষেধ করেন, শ্যামচাঁদ কদাচ সে কার্য্যে অনুরাগী হয় না। কিন্তু কনিষ্ঠা কন্যা তরঙ্গিনী পিতামাতার অবস্থা বুঝে না। হরিহর বাবুর দৌহিত্রী-পৌত্রীরা যেরূপ আমোদ-প্রমোদে কাল কাটায়, তরঙ্গিনীরও সেই ভাবে থাকিতে ইচ্ছা। তরঙ্গি-

নীর মা কন্যার মনস্তুষ্টির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন সত্য, কিন্তু সময়ে সময়ে বালিকার বিলাস ভোগের অভিলাষ তাঁহার অবস্থা ছাপিয়া উঠে! কাজেই সকল সময় তাহার সকল মনোসাধ মিটে না। তরঙ্গিনীর বেশভূষা দেখিয়া হরিহর বাবুর দৌহিত্রী-পৌত্রীরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, তরঙ্গিনীর সে পরিহাস সহ্য হয় না। সময়ে সময়ে সামান্য কারণেও বিবাদ-কলহ হয়। মেয়ের দোষে মাতা লাঞ্ছনা সহ্য করেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রামদয়াল ক্রমে উল্টাডিঙ্গিতে একখানি বাড়ী করিয়াছেন। পরিবারবর্গ লইয়া তথায় সুখ-স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিতেছেন। তারাচাঁদ পিতামাতার আশ্রয় পাইয়াছে। শ্যামচাঁদ সম-উৎসাহে লেখাপড়া করিতেছে—এ বৎসর তাহার এণ্ট্রেন্স-পরীক্ষা। জ্যেষ্ঠা কন্যা মাতঙ্গিনী নবকুমার লইয়া মাতা-পিতার নূতন বাড়ীতে দেখা করিতে আসিয়াছে। রামদয়ালের গৃহিণীর অন্তর্জ্জ্বালা অনেকটা নিবৃত্তি হইয়াছে। হরিহর বাবুর অনুগ্রহেই রামদয়াল আজ সংসার-সুখ সম্ভোগ করিতেছেন। রামদয়াল বাবু এখনও হরিহর বাবুর সহিত প্রতিদিন সাক্ষাৎ করিয়া আসেন। ফলতঃ দেখিতে শুনিতে রামদয়ালের সংসার এখন বেশ পারিপাট্যমান।

তারাচাঁদ এবার একদিনের জন্যও পিতার প্রতি অবৈধ আচরণ করে নাই। তারাচাঁদের স্বভাব-চরিত্রের বিশেষ বৈলক্ষণ্য হইয়াছে। তারাচাঁদ যেন ঠেকিয়া শিখিয়াছে; দুঃখের জীবন কতই কষ্টকর, তাহা বুঝিয়াছে। বোধ হয় আর সে বিপথগামী হইবে না—তারাচাঁদের পিতামাতা এইরূপই মনে মনে যুক্তি করিয়া থাকেন।

প্রকৃতই তারাচাঁদের প্রতি এখন চাহিয়া দেখিলে, সময়ে যে সে নিকৃষ্ট ভাবাপন্ন হইয়াছিল, মনে অনুমানও হয় না। তবে তারাচাঁদ লেখাপড়া শিখে নাই! কিন্তু রামদয়ালও তো লেখাপড়া না শিখিয়াই সৌজন্যতা ও বিনয়ে হরিহর বাবুর অনুরাগ-ভাজন হইয়াছিলেন। সুতরাং তারাচাঁদের অদৃষ্টে কি সে সুবিধা জুটিবে না—ভগবান কি তারাচাঁদকে চিরকালই কাঁদাইবেন? এত সংসারের নীতি নহে! কাঁদিলে হাসিতে হয়, হাসিলে কাঁদিতে হয়—এই নিয়মেই তো সংসারের কার্য্য চলিয়া আসিতেছে!

তারাচাঁদের সহায়-সম্পত্তি কিছুই নাই। হরিহর বাবুর পুত্রেরা কলিকাতার গণ্যমান্য লোক। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? তাঁহারা তারাচাঁদের নামে চটা। তাহাতে উপস্থিতের পৃথক-বাসে সে সম্বন্ধ ছিন্নভিন্নই হইয়া গিয়াছে। যদিও তারাচাঁদের ভদ্রসমাজে গতিবিধি আছে, কিন্তু তারাচাঁদকে যে শ্রেণীর লোকের সহিত কায-কর্ম্ম করিতে হয়, একত্র বসিতে-দাঁড়াইতে হয়, তাহারা ভদ্র-সমাজের নগণ্য। অগত্যা তারাচাঁদ ভদ্র-সন্তান হইয়াও ভদ্র-সমাজের পার্শ্বে পার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়ায়; ঘেঁসিয়া বসিতে চেষ্টা পায় বটে, কিন্তু তাহার সে সাহস হইয়া উঠে না। তারাচাঁদের সাহস-বল, একমাত্র বেহালা। গান-বাজনার আসরে তাহার বিশেষ সম্মান বটে; আর, সেই খাতিরে পড়িয়াই কখনও কখনও ভদ্রলোকেও তাহার সহিত করমর্দ্দনাদি করিয়া সভ্যতা দেখাইয়া থাকেন। তারাচাঁদ তাহাতেই আপ্যায়িত, মনে মনে আপনাকে কতই ধন্যবাদ প্রদান করিয়া থাকে।

যখন নানাস্থানে ঘুরিয়া তারাচাঁদের কোথাও কোন কায়কর্ম্ম জুটিল না, তখন তারাচাঁদ শূন্যমনে বাড়ীতে বসিয়া হস্তাক্ষরের উন্নতির জন্য মন দিল। কিছুদিনের মধ্যেই ইংরাজী-বাঙ্গালা উভয় লেখাতেই তারাচাঁদ দক্ষ হইয়া উঠিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

তরঙ্গিনী এক্ষণে ভাগ্যক্রমে সোণাপুরের জমীদার সীতানাথ রায়ের অঙ্ক-শোভিনী হইয়াছে। তরঙ্গিনীর বালিকা বয়স হইতেই বিলাসের প্রতি দৃষ্টি ছিল—ভগবান তাহার সে প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়াছেন। সৌভাগ্য-বশতঃ বিলাসিনী এখন সোণাপুরের অধীশ্বরী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রেমিক সীতানাথ তরঙ্গিনীর হাবভাবে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন; তরঙ্গিনীর মুখের কথা ব্যক্ত হইতে হইতেই সীতানাথ তাহা পূরাইতেছেন। দুই প্রাণ এক প্রাণে মিশিয়া গিয়াছে। এইরূপ স্থলে, তরঙ্গিনীর অনুরোধ, ভ্রাতা তারাচাঁদ তাঁহার সংসারে এক মুষ্টি অন্ন পান। সীতানাথ বাবুরও প্রিয়তমার কথা শিরোধার্য্য। প্রেয়সীর মুখের কথা মুখে থাকিতে থাকিতেই, তারাচাঁদ সীতানাথ বাবুর সংসারে এক জন গণ্যমান্য কর্ম্মচারী হইলেন। তিনি ভূম্যধিকারীর শ্যালক। যে ভূস্বামী প্রিয়ার কথায় জীবন বিসর্জ্জনেও তুচ্ছ জ্ঞান করেন, তাঁহার পক্ষে শ্যালককে বিশ্বাস-ভাজন করা গুরুতর কার্য্য কি?

দিনে দিনে তারাচাঁদ পূর্ণিমার শশী-কলার ন্যায় শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, তারাচাঁদের হাত-টান অভ্যাসটা বরাবরই ছিল। কিন্তু এজন্য একবার সীতানাথ বাবুর কর্ম্মচারীগণ তারাচাঁদের কথা লইয়া আন্দোলনও করিয়াছিলেন। কিন্তু তবে প্রণয়-মহত্ত্বে তাহা নিস্ফল হইয়াছিল।

শ্যামচাঁদ ইহসংসারে আর নাই। পিতার দুঃখের দশায় জনকজননীকে শ্যামচাঁদ যথা-সাধ্য সন্তুষ্ট করিয়াছিল; দিনে দিনে তাহার লেখাপড়ায় অনুরাগ-সঞ্চার হইতেছিল। তাহা দেখিয়া তাহার গুরুজনের মনে কতই আনন্দের সঞ্চার হইতেছিল। কিন্তু কালের কি ভীষণ গতি! অভাগা শ্যামচাঁদ আজ কাল-কবলে! শ্যামচাঁদের মৃত্যুতে বৃদ্ধা মাতার শরীর ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। যদি এখন তারাচাঁদ ভগ্নীপতির সংসারে থাকিয়া বেশ দুই দশ টাকা উপার্জ্জন করিতেছে, কিন্তু তাহার প্রতি তাঁহাদের বিশ্বাস নাই। তাঁহাদের মনে মনে এখনও সংস্কার আছে যে, তারাচাঁদের জন্য আবার কাঁদিতে হইবে। যে ব্যক্তির প্রাণে মায়া-দয়া নাই, মাতা-পিতার দুঃখ দেখিয়া যাহার হৃদয় আর্দ্র হয় না—সে হৃদয়ে ভালবাসা ঠাঁই পায় না।

তরঙ্গিনীর বিবাহের পূর্ব্বেই রামদয়াল তারাচাঁদের বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু বধূমাতা লইয়া তিনি সুখী হন নাই। তারাচাঁদকে লইয়া যেরূপ জ্বলিতে হইয়াছিল, বধূঠাকুরাণীও সেইরূপ শ্বশুর-শাশুড়ীকে জ্বালাইত। তারাচাঁদের কথামত বধূঠাকুরাণী এরূপ করিত কি না, তাহা জানি না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, তারাচাঁদ স্ত্রীকে বাপের বাড়ী রাখিতেই ভালবাসিত।

তারাচাঁদ এখন সোণাপুরেই থাকে। তরঙ্গিনীর বিবাহের পর একবারমাত্র পিতৃগৃহে আসিয়াছিল। কিন্তু তৎপরেই যে স্বামীগৃহে গিয়াছে, আর আসে নাই। মধ্যে মধ্যে দাদাকে ডাকাইয়া পিতামাতা ও ভগ্নীর সংবাদ লয়।

মাতঙ্গিনীর অবস্থা বড়ই শোচনীয়। অভাগিনীর শ্বশুর-শাশুড়ী ইহলীলা পরিত্যাগ করিয়াছেন। স্বামী কায়কর্ম্ম কিছুই করে না,—আমোদ-প্রমোদ লইয়াই ব্যস্ত। এদিকে অন্নাভাবে সপরিবার উপবাসী, তাহাতে তাহার লক্ষ্য নাই। যে কোন প্রকারে হউক, হতভাগ্য আপনার আমোদ হইলেই কৃতার্থ-জ্ঞান করে। স্বামীর ব্যবহারে মাতঙ্গিনী মনের দুঃখে দিনক্ষেপ করিতেছে। এদিকে স্বামী আপনার আমোদ-প্রমোদে মাতিয়া ভদ্রাসন বাড়ীখানিও বন্ধক দিয়াছেন।

দিনে দিনে মহাজনের সুদ বাড়িতেছে; সময়-মত টাকা দিতে না পারিলেই তিনি বাড়ী বিক্রয় করিয়া লইবেন! ওদিকে উপযুক্ত শ্যামচাঁদ মরিয়াছে; মাতা-পিতা দিনদিন অক্ষম হইয়া পড়িতেছেন। নিজের তিনটী পুত্র সন্তান, একটী কন্যা। কাজেই কি করিয়া দিনাতিপাত হয়, এই ভাবিয়াই ব্যস্ত।

তারাচাঁদ সোণাপুরে কাযকর্ম্ম করিতেছে। অবশ্য স্বামীর কোন কাযকর্ম্মের জন্য ভগ্নীপতির নিকট অনুরোধ করিলে, তাহার কথা রক্ষা হইতে পারে—মনে মনে এইরূপ যুক্তি করিয়া, মাতঙ্গিনী সীতানাথ বাবুর শিরোনামায় একখানি পত্র লেখাইয়াছে; এবং অপর একখানি পত্র সহোদরা তরঙ্গিনীর নিকটও পাঠাইয়াছে। কিন্তু সে সকলই বৃথা! সময় মন্দ হইলে কেহই কাহারও নয়।

রামদয়ালের সংসারে সুখের হাসি দেখা দিয়াই দুঃখে পরিণত হইল। একে পুত্র শোকে তিনি জর্জ্জরিত, তাহাতে কন্যার সংসারের কথা ভাবিয়া রামদয়াল ও তাঁহার পত্নী নিস্তব্ধ হইয়া পড়িলেন। তারাচাঁদের স্ত্রী এখানে নাই যে, এ বার্দ্ধক্য বয়সে শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা-সুশ্রুষা করিবে! তারাচাঁদ মাসে মাসে স্ত্রীর জন্য নূতন নূতন গহনা গড়াইয়া শ্বশুরের নামে রেজেষ্টারী করিয়া পাঠাইয়া দেয়, আর পিতা-মাতা পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়াও উত্তর পান না,—দুই চারি মাস অন্তর পিতামাতার খোরাকীভাবে যৎসামান্য টাকা মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইয়া দেয়। এরূপ পাঠানও বোধ হয়, তাহার অভিপ্রেত নহে। তবে ভগ্নীর সুপারিশে চাকরী করিতেছে, সুতরাং পিতামাতার প্রতি দয়াভাব না দেখাইলে কার্য্যের পক্ষে অনিষ্ট হইতে পারে, মনে মনে এই ভয়!

নবম পরিচ্ছেদ।

তারাচাঁদ ভগ্নীপতির সংসারে থাকিয়া বেশ দশ টাকার সংস্থান করিয়াছে। সমাজে গণ্যমান্য না হইলেও, ভগ্নীপতির মর্য্যাদায় গৌরবিত। সীতানাথ বাবুও তাহাকে যথেষ্ট খাতির-যত্ন করেন। যাহাদের নিকট সীতানাথ বাবু প্রণম্য, তাহারাই তারাচাঁদকে যথেষ্ট মানসম্ভ্রম দেখাইয়া থাকে।

বাল্যকাল হইতেই তারাচাঁদ পিতার অনুষ্ঠানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছিল। বয়স-দোষে অসৎ সংসর্গে যদিও কিছুকাল বিপথগামী হইয়াছিল বটে, তথাচ পয়সা-সংস্থান এবং যাহাতে দুইদশ টাকা উপার্জ্জন হইতে পারে, এ বিষয়ে তারাচাঁদ বিশেষ মনোযোগী ছিল। তারাচাঁদ ভগ্নীপতির সংসারে কাযকর্ম্ম করিয়াই নিশ্চিন্ত হয় নাই, সময়ে সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যেও দুই টাকার সংস্থান-ইচ্ছা তাহার হৃদয়ে বলবতী ছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে তারাচাঁদ কত টাকা হস্তগত করিয়াছে তাহা ঠিক অনুমিত না হইলেও, বাহ্যভাবে প্রকাশ যে, তাহার কিছু বিষয়-সম্পত্তি হইয়াছে। যেহেতু, যে তারাচাঁদ সামান্য বেশভূষায় কাল কাটাইত, দেড়টাকা-সাত সিকার অধিক মূল্যের জুতা যে কখনও পায়ে দেয় নাই; এখন তাহার ফিটফাট পোষাক দেখিলেই কেমন কেমন ঠেকে! অবশ্যই যখন তারাচাঁদ ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেছে, জমিদারী সেরাস্তার গণ্যমান্য কর্ম্মচারী, তখন কোন্ না দশবিশ হাজার টাকা জমাইয়াছে! কিন্তু তারাচাঁদের আর পূর্ব্বের মত মেজাজ নাই! এখন লোকের নিকট সোণাপুরের ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত সীতানাথ চৌধুরী মহাশয় তাহার ভগ্নীপতি—এই বলিয়াই পরিচয় দিয়া থাকে। অবশ্য সাধারণ লোকেও তাহাকে সম্ভ্রান্ত লোকের শ্যালক বলিয়া, যথেষ্ট খাতির ও যত্ন করে এবং সে মহলে তাহার যথেষ্ট প্রতিপত্তিও আছে।

কিন্তু ভগবানের কি সূক্ষ্ম গতি! এই লোভ

আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ দেখিতেছে, আবার পরক্ষণেই সে পূর্ব্বাবস্থায় পরিণত হইতেছে! যে সহোদরার মান-মর্য্যাদায় তারাচাঁদ আজ লোকের নিকট যশস্বী বলিয়া প্রতীয়মান রহিয়াছে, ভাগ্যদোষে ক্রমে সেই তরঙ্গিনী আর নাই। তরঙ্গিনী প্রেমিক-হৃদয়ে ব্যথা দিয়া, সীতানাথ বাবুকে শোকসাগরে ভাসাইয়া, সোণাপুর অন্ধকার করিয়া ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে! এ সময়ে তারাচাঁদ, সাবধান! ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য কর—ভগবান অবশ্যই মঙ্গল করিবেন! তুমি যে বলে সীতানাথ বাবুর সংসারে বলীয়ান ছিলে, আজ সে বল আর নাই; শক্তি-বিহনে মুক্তি কোথায়? এবার দায় ঠেকিলে কে তোমায় রক্ষা করিবে? তুমি ভাবিতেছ, সীতানাথ বাবু তোমাকে ভালবাসেন—তিনি কখনই তোমাকে কর্ম্মচ্যুত করিবেন না। সে সকলই সত্য। কিন্তু একবার বিপদে ঠেকিয়া যে উদ্ধার পাইয়াছ, নিশ্চয় জানিও, তাহার সহায় তরঙ্গিনী। তরঙ্গিনী জীবিত থাকিলে তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পারিতে। কিন্তু মনে জানিও, সে দিন—সে সুদিন আর নাই।

সীতানাথ বাবু প্রিয়ার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তারাচাঁদকে কর্ম্মচ্যুত করেন নাই। প্রিয়া ইহসংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে; তথাচ তাহার সহোদরকে দেখিয়াই তিনি যেন কত আনন্দিত!

কিন্তু এক দিবস কোন একটী গুরুতর অপরাধে তারাচাঁদ সীতানাথ বাবুর নিকট দোষী বলিয়া সাব্যস্থ হইলেন। তিনি মৃত প্রিয়ার মুখচ্ছবি স্মরণ করিয়া তাহাকে ক্ষমা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। পরক্ষণেই কে যেন তাঁহার মতি ফিরাইয়া দিল—তিনি তারাচাঁদকে সম্মুখ হইতে স্থানান্তরিত হইতে আদেশ করিলেন।

এবার সীতানাথ বাবু সমস্ত মায়াবন্ধন এককালে ছেদ করিলেন। তারাচাঁদের অপরাধের কথা সবিশেষ পুলিশে সংবাদ দিলেন। পুলিশ-প্রহরী তৎক্ষণাৎ আসিয়া তারাচাঁদের হাত ধরিল; তারাচাঁদ 'রক্ষা করুন' 'রক্ষা করুন' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই সীতানাথ বাবু তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

বলা বাহুল্য, এই অপরাধেই তারাচাঁদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হইল। তারাচাঁদের বৃদ্ধ পিতামাতা ও ভগ্নী-স্ত্রী সকলেই মনের দুঃখে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

ভয়ানক খুন।

সপ্তম দৃশ্য।

অপূর্ব্ব অনুসন্ধান।

বীরেশ্বর বাবু গোয়েন্দা-পুলিসের একজন নিয়তর কর্ম্মচারী। আজ তিনি বড়ই ব্যস্ততার সহিত দৌড়িতে দৌড়িতে থানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং সটান একেবারে তাঁহার উপরওয়ালা ইন্‌স্পেক্টার বাবুর নিকট উপরের ঘরে উপস্থিত হইলেন। বীরেশ্বরকে দেখিয়াই বাবু জিজ্ঞাসিলেন,—"কি বীর, (বলা কর্ত্তব্য, বীরেশ্বরকে 'বীর' বলিয়াই থানার সকলে ডাকিত) খবর কি? কয়দিনে কতদূর কি করিয়াছ, শুনি!"

বীরেশ্বর বাবুও আগ্রহের সহিত অমনি বলিতে লাগিলেন,—"এখন, আপনারা দলবল লইয়া যাইলেই হয়! আমি গাঁথিয়াছি ঠিক; এখন আপনারা তুলিয়া লইতে পারিলেই সব হয়।"

"সে কি রকম!"—বলিয়া বাবু আনুপূর্ব্বিক সমস্ত শুনিতে চাহিলেন।

বীরেশ্বর তখন প্রথম হইতে আরম্ভ করিলেন,—"মহাশয়, আমি যাহা বলিয়াছিলাম, ঠিকই তাই। রেমোটা বাস্তবিকই দোষী নয়।

একজনেও একাজ হয় নাই—একটী দলে এই কাজ করিয়াছে। রেমোটা যে নির্দ্দোষী, সে সম্বন্ধে আমি এই পর্য্যন্ত জানিয়াছি যে,—মাঝের পাড়ার শশী বেওয়ার বাড়ী হইতে সে ঐ কাতারিখানি আনিতেছিল। পিতৃমির বাড়ীর ভাড়াটে সেই বিধু ছুঁড়িটে এবার একখানা কালীপূজো করেছিল। সেই পূজোয় একটা পাঁঠা বলি দেওয়ার বন্দোবস্ত হয়। কিন্তু কামার বেটা সময়ে আসে নাই। সেই জন্য, শশীর বাড়ী হইতে কাতারি আনিয়া উহারা নিজেই পাঁঠা কাটিবে, এইরূপ স্থির করিয়াছিল। তাই রেমো কাতারি আনিতে যায়। আর, কাতারি লইয়া ফিরিবার সময়ই, পুলিস সন্দেহ করিয়া অমনই তাহাকে খুনী আসামী বলিয়া ধরিয়া ফেলে। তাহাকে ধরিবার পুলিসের যে কোন কারণও ছিল না, এমন নহে। কতকগুলো লোক সেই সময় চেঁচাইতেছিল যে,—'ঐ খুনি পালায়—ঐ খুন করিয়া পালায়।' বিশেষতঃ তাড়াতাড়ি কাতারি লইয়া যাইয়া পাঁঠা কাটিতে হইবে বলিয়া রেমোটাও সজোরে ছুটিতেছিল। কাজেই সেই উপলক্ষে রেমোকেই খুনী আসামী ঠাওরাইবার পুলিসেরও আর কোন সংশয় থাকে নাই। পাঁঠার রক্তমাখা কাতারি পুলিস সৌদামিনীর কাটা রক্ত বলিয়াই কাজেই স্থির করিয়া লইয়াছিল। এইরূপেই একাণ্ডে রেমো জড়াইয়া পড়িয়াছে। তারপর, প্রমাণ-প্রয়োগের কথা!—সে সব আপনাকে কি আর নূতন করিয়া কিছু বলিতে হইবে? সে সব পুলিসে যেমন করিয়া থাকে, এক্ষেত্রেও সেইরকমই হইয়াছিল।"

এ সংবাদ শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টার বাবু একটু চমকাইলেন। তাঁহার মনও তখন সংশয়-দোলায় দোলায়মান হইল। তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বীরেশ্বরকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বীর, রেমোটার সংবাদ এরূপ হয়, হউক। কিন্তু তুমি তারপর খুনী বলিয়া কাহাদের স্থির করিয়াছ? আর, সেরূপ স্থির করিবার কারণই বা কি? রেমোর সম্বন্ধে তুমি এ যা' এজাহার দিলে, এ তো রেমোর কতকটা সাফাই-ই হইতে পারে? কিন্তু প্রকৃত দোষী কাহারা, তাহাদের না পাইলে তো রেমোর মুক্তির জন্যও কোন উপায় লওয়া যায় না!"

"আচ্ছা, আমি সকলই বলিতেছি।"—এই বলিয়া বীরেশ্বর আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"প্রথমতঃ আপনি শুনুন যে, এ ব্যাপার অনুসন্ধানের সূত্র আমি কোথা হইতে পাই? তাহাহইলেই আপনি কতকটা আমার অনুসন্ধানের ফল জানিতে পারিবেন। এই, যেদিন রাত্রে সৌদামিনীর খুন হয়, তা'র পরদিন—অর্থাৎ দেওয়ালীর দিন প্রাতঃকালে—আমি একটা হীন হিন্দুস্থানী-মাড়োয়ারীর বেশে মেছুয়াবাজারের চৌরাস্তায় হরিহর পোদ্দারের দোকানের সম্মুখস্থ ফুটপাথ দিয়া পায়চারী করিয়া বেড়াইতেছিলাম। এমন সময়, একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়াটীয়া গাড়ি পোদ্দার মহাশয়ের দোকানে আসিয়া লাগিল। আমি তাকাইয়া দেখিলাম, তাহার মধ্যে একটি স্ত্রীলোক; এবং একটী পুরুষ। স্ত্রীলোকটীর হাতে একটী 'ডবল-টিনের' বাক্স। গাড়ি হইতে তাঁহারা নামিয়াই ক্রমে পোদ্দার মহাশয়ের দোকানে বসিলেন। কাজেই অবসর বুঝিয়া, আমিও সেই সময় 'বাবু সাব, ইষ্টাম্পকা কাগজ হিঁয়া মিল্‌তা হ্যায়' বলিয়া, তাঁহাদের কাছ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইলাম। পোদ্দার মহাশয় তখন আগন্তুকদের লইয়াই ব্যস্ত। কাজেই আমাকে উত্তর দিয়া বিদায় করিতে তাঁহার আর অবসর হইল না। আমি সেইখানে দাঁড়াইয়া অতঃপর সমস্ত ব্যাপারই দেখিতে লাগিলাম। ক্রমে দেখিলাম, স্ত্রীলোকটি ও বাবুটি কতকগুলি গহনা বন্ধক রাখিয়া, পোদ্দার মহাশয়ের নিকট

হইতে শ-চারেক টাকা লইলেন। এই সময়, আমিও গহনাগুলিকে বেশ করিয়া দেখিয়া লইলাম; এবং বাবুটি ও স্ত্রীলোকটীর ঠিকানার বিষয় পোদ্দার মহাশয় কিরূপ লিখিয়া লইলেন, তাহাও বুঝিলাম। ইহার পরও তাঁহারা পুনরায় আবার যখন গাড়িতে চড়িয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে লাগিলেন, আমিও তখন লুক্কায়িত-ভাবে তাঁহাদের গাড়ির পশ্চাতের দিকে চড়িয়াছিলাম: এবং সেই সময়ে তাঁহাদের প্রতি নানারূপের সন্দেহ হইবার কারণও পাইয়াছিলাম। আরও তখন বুঝিয়াছিলাম যে, তাঁহারা যেন কোন গুরুতর বিপদ হইতে লুক্কায়িত থাকিতে পারিলেই বলিয়াই, ৺কালীঘাটে সেইদিন পূজা দিতে যাইবেন।

"কাজেই আমিও আর সে সুযোগ ছাড়িতে পারিলাম না। তাঁহাদের অগ্রেই, আমিও কালীঘাটে গিয়া আড্ডা লইলাম। সেখানকার হরেকৃষ্ণ ময়রাকে হাত করিয়া, আমি তাহার দোকানের খানসামা-চাকর সাজিয়া রহিলাম। তা'র পর আর কি!—বাবুদেরও পাইতে বাকী রহিল না। আমার চেষ্টা ও সুকৌশল-বন্দোবস্তে বাবুরা যথাসময়ে আমাদের বাসাতেই বাসা লইলেন। সে সুযোগেও, বিশেষতঃ বাবুরা যখন মাতাল হইয়া পড়িয়াছিলেন তখন, আমি তাঁহাদের অনেকটা গূঢ়তত্ত্ব জানিয়াছিলাম। তারপর, বাবুদের আড্ডা-বাড়িতে একটা চাকরী জুটাইয়া এই কয়দিন তথায় ছিলাম; এবং তাহাতেও বুঝিয়াছি যে, কোথাকার জল কোথায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে!"

"তারপর—তারপর?"

"তারপর আর কি?—আপনি এখন শশীভূষণ পাল, গোকুলচন্দ্র রায়, রমানাথ সাহা, পঞ্চানন দাস ও হরিচরণ বসুর নামে ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়া গ্রেপ্তার করান। তার পর যা' হয়, সকলই জানিতে পারিবেন। যদি আর গোলাপী—এ দু'টা বেশ্যাকেও গ্রেপ্তার করাতে পারেন। পোদ্দারের দোকানে সৌদামিনীর গায়ের গহনাগুলোও দেখাইতে পারিব। তা' ছাড়া, আরও একটা সুবিধা হয়েছে এই যে, গোকুল রায় কাল রাত্রে তা'দের পাড়ার একটা ভদ্রলোকের বৌকে বাহির করিয়া পশ্চিম পালাইবার সময় হাবড়ায় গ্রেপ্তার হইয়া আছে। আমার বিশ্বাস, সেই বৌটার গায়ের গহনাও দু'একখানা সৌদামিনীর গহনাই হইবে। তার মা-বেটীকে নিয়ে গেলে বোধ হয় সেটাও সনাক্ত হ'তে পারে। যে বাবুর বৌকে লইয়া গোকুল রায় পলাইতেছিল, সে বাবুও আজ প্রাতে হাবড়ার পুলিসে যাইবেন, কথা আছে। এই সময় আমরাও যদি সেখানে যাই, তবে তারও কতকটা কিছু সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। ফলতঃ আর দেরী করিলে চলিতেছে না। বেটারা একেই সাবধান আছে, তার উপর গোকুলের সংবাদ পাইলে আরও সতর্ক হইবে। সুতরাং আপনি এখনই ইহার কোন উপায় করুন।"

পুলিসের উপরকার একটী নির্জ্জন ঘরে বসিয়া কর্ম্মচারীগণের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে। এমন সময়, পরমেশ্বর প্রসাদ নামক আর একজন গোয়েন্দা-পুলিসের কর্ম্মচারী আসিয়া সেই ঘরে উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই, তিনি বলিলেন,—"হাঁ, ঠিকই বটে! আসামীর বিরুদ্ধের প্রমাণ—রাত্রের সেই রক্তমাখা চাদরখানার চারিধারে লেখা আছে বটে,—'শ্রীশশীভূষণ পাল, সাং সিমলা, ডফ্ ষ্ট্রীট।' সুতরাং ও-চাদর উহাদের না-হইয়াই যায় না!"

অষ্টম দৃশ্য।

শশাঙ্কিতে!

"তুই পশ্চিমের দিকে সরে পড়—আজই পালা! আর, আমিও দেশে চলে যাই। তার পর যা' হয় হবে।"

"এখন যাই-ই বা কি করে? চারিদিকেই

তো পুলিসের লোকজন আমাদের সন্ধানে ফির্‌ছে! পালাবার সময়ই যদি ধরা পড়ি!"

"ধরা আবার পড়্‌বি কেন? আমি তোকে যে মত্‌লোব্ বলে দিই, তুই সেইমত কর দেখি! তা'তে কোন ভয় নেই!"

"কি কর্‌বো, বলুন; আমি তাই-ই করছি!"

"নে—তুই এই জটাটা মাথায় আঁট; এই গেরুয়া কাপড়খানা পর, আর এই গেরুয়া চাদরখানা গায়ে দে! তা'র পর, হাতে চিম্‌টে আর ভিক্ষের ঝুলিটে নে! তা'হলে তোকে আর ধরে কে?"

"তা যেন বটে, কিন্তু ভাগের টাকাগুলো তো বাড়ীতে দেওয়া হ'লো না! যা'র জন্যে যা', সেগুলো বাড়ীতে না দিয়ে আর কি ক'রে যাই? আর, কিছুদিনের জন্য নিরুদ্দেশ হ'বার আগে, বাড়ীর পরিবার-পুত্রকেই বা না-দেখে যাই কি ক'রে!"

"তবেই তুই বেঁচেছিস্! জানিস্, তুই-ই হাতে ক'রে খুন করেছিস্—দোষটা সব তোরই উপর আস্‌বে! আমাদের আর কি, আমরা এখনও ফাকে-ফাকেই আছি! শেষটায় জোর আমাদের সাক্ষী-শ্রেণীতে দাঁড়াতে হবে! তাই, তোর ভালোর জন্যেই বলি,—তুই এখনই পালা!"

"পালাবো বটে! কিন্তু আপনি ও-সব কি কথা বল্‌চেন? আমার উপরেই খুনের সব চার্জ্জটা আস্‌বে, এ কেমন কথা! আমি আপনাদের কথা-মতই, গলায় পোঁচটা বসানতেই, যত দোষ আমার হইল? আপনারা সকল যোগার-যন্ত্র করেছিলেন; আপনারা হাত-পা-মুখ চেপে ধরেছিলেন; আপনারা গহনার বাক্স সরিয়েছিলেন; আপনারা সাফাই গাহিয়া—'ঐ খুন করিয়া পালায়—ঐ খুনী পালায়' বলিয়া চেঁচাইয়াছিলেন; আর সব দোষটা হল কি-না আমার? এ ভয় যদি দেখান, তা'হলে আমি কিছুতেই যাচ্চিনে—যা' হয় সকলের, আমারও না-হয় তাই-ই হবে!"

"তুই চট্‌স্ কেন? আগে বুঝে দেখ, আমি কি বলি; তা'রপর ওসব আবোল-তাবোল বকিস্!"

"কি বলেন আপনি? আপনাদের কথা-মত কাজ কর্‌তে গিয়ে শেষে আমার অদৃষ্টে এই হ'ল। আপনি এরূপ চাতুরি খেলিবেন—এ জানিলে, আমি কখনই আপনাদের দলে মিশিতাম না। হা অদৃষ্ট!"

সোণাগাছির সেই গোলাপীর বাড়ীরই একটী ঘরে বসিয়া, দুইটী বাবুতে এইরূপ কথা-বার্ত্তা হইতেছে। প্রবীণ বাবুটি বুঝাইতেছেন, তুই পালা; কিন্তু যুবক তাহাতে নারাজ-ভাব প্রকাশ করিতেছেন।

পাঠক! এই দু'টি বাবুকে আপনারা চিনিয়াছেন কি? এ দু'টি বাবুই সেই কালীপূজার দিন শেষ রাত্রে এই-ই ঘরে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন! এ দু'টি বাবুর প্রবীণ বাবুটীর বয়স আন্দাজ চল্লিস-বিয়াল্লিশ; চেহারা ছিপ্‌ছিপে;—রংটায় কালীগোলা মুখের গোঁপ-যোড়াটার কিন্তু খুব জমজমা—মদাই সিংহীর গোঁপের ন্যায় খাড়া হইয়াই আছে! বাবুর পরিধানে এক অতি ফিন্‌ফিনে সিমলার কালা-পেড়ে ধুতি—গায়েও একটী সেই সাটের পিরিহান। অর্থাৎ পিরিহান-কাপড় ফুটিয়াও, বাবুর চেহারাখানা যেন জলজল জ্বলিতেছে! বাবুকে দেখিলেই যেন 'ধড়িবাজ-ধড়িবাজ' বলিয়া বোধ হয়। আর যুবকটি!—যুবকটীর পরিচয় এককথায় সেই 'ষণ্ডাকৃতি।' অর্থাৎ যুবকটীর গড়ন-পেঠন খুব বলিষ্ঠেরই ন্যায়। যুবক দেখিতে খর্ব্বাকৃতি। রঙে সেই কৃষ্ণবর্ণই। এক কথায় আজকালকার ডব্‌কা ছোকরা আর কি! যুবকের বয়স এই পঁচিশ-ত্রিশের মধ্যেই। পাঠক! ইহাঁদের আরও একটু পরিচয় লউন এই যে, যুবকের নাম হরিচরণ বসু এবং প্রবীণ-

বাবুটির নাম রমানাথ সাহা। অর্থাৎ গোয়েন্দা-পুলিসের কর্ম্মচারী সেই বীরেশ্বর বাবু যাঁহাদের নামে গ্রেপ্তারী-ওয়ারেণ্ট বাহিরের চেষ্টায় ছিলেন, ইহাঁরা তাহারই দুইজন। একজন সর্দ্দার; অপর, তাঁহার প্রধান সহকারী খুনী।

যাইহোক, বাবুদের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে; এমন সময়ই হঠাৎ তাঁহাদের কর্ণে একটা শব্দ প্রবেশ করিল,—"আছে—আছে!" অমনি তাঁহারা চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, তাঁহাদের সম্মুখেই তাঁহাদের সেই কালীঘাটের ভৃত্য দাঁড়াইয়া! কিন্তু আজ আর তা'র সে বেশ নাই। আজ তাহার পরিচ্ছদ—হাট-কোট-প্যাণ্টুল্যান! টুপিতে লেখা,—C. P. অর্থাৎ কলিকাতা-পুলিস। তাহাকে দেখিয়াই তো বাবুদের চক্ষুস্থির! কোন কথা কহিবেন কি, তাঁহারা একেবারে হতজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

ক্রমে চারিদিক হইতে পিঁপড়ার সারির ন্যায় পিল পিল করিয়া পুলিশ-প্রহরী সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিল। স্ত্রীপুরুষ বাড়ি হইতে কেহই আর বাহির হইতে পারিল না।

ঠগী-কাহিনী।

(ঠগের নিজের মুখে শুনিয়া)

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

"It appeared so cold-blooded, so unprovoked a deed, that I could not reconcile myself in any way to have become even a silent spectator of it."— C. M. Taylor.

"এইরূপে সেই নিরীহ বৃদ্ধ ও তাঁহার পুত্রের বিনাশ-সাধন হইলে, পিতা মৃদুস্বরে বলিলেন,—'তোমাদের কেহ কেহ এখন শীঘ্রই বৃদ্ধের ভৃত্য প্রভৃতির জন্য যাও। কিন্তু সাবধান, যেন নিঃশব্দেই কার্য্য-সমাধা হয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, গাড়োয়ানকে এবং উহাদের অপর সকলকে সহজেই হত্যা করিতে পারিবে।'

"পিতার আজ্ঞা-প্রাপ্তেই আমাদের দলস্থ কয়েকজন অমনি সেইদিকে ছুটিল। বৃদ্ধের শকটচালক ও অন্যান্য ভৃত্যগণ এই সময় নিঃসন্দিগ্ধ-চিত্তে একটী বৃক্ষমূলে বসিয়া রন্ধন-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। সুতরাং সহজেই ঠগগণের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। আমি দূর হইতে এই সময় অল্পই একটু গণ্ডগোল শুনিতে পাইয়াছিলাম, এবং তাহাদের আত্মরক্ষার সামান্য চেষ্টাও দেখিতে পাইয়াছিলাম। কিন্তু সে সকলই বৃথা! অধিক কি, চীৎকার করিয়া কিছু বলিবার অগ্রেই, সেই হতভাগ্যগণের জীবন-বায়ু শেষ হইয়াছিল।

"এখন, পিতা ও হোসেন আমায় বলিলেন,—'এস, দেখিবে এস, কিরূপে ইহাদের অন্তিম-কার্য্য শেষ হয়।'—এই বলিয়া, আমার হাত ধরিয়া, তাঁহারা আমায় একরূপ টানিয়া লইয়াই চলিলেন।

"কাজেই আমি যাইলাম; অথবা তাঁহারা আমায় টানিয়া লইয়া যাইলেন। গিয়া দেখিলাম, আমাদেরই 'তাম্বুর' একপার্শ্বে একটী গর্ত্ত খনন করা হইয়াছে; এবং সেই গর্ত্তের পার্শ্বে আটটি মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। দেখিয়া জানিলাম, সেই শবদেহের একটী সেই বৃদ্ধ, একটী তাঁহার সেই পুত্র, দুইটী তাঁহার স্ত্রী, একটী এক বৃদ্ধা, একজন তাঁহার শকটবান, দুইজন তাঁহার কর্ম্মচারী এবং অপর একটি তাঁহার বাড়ীর চাকর। এই সকল শবদেহ এই সময় প্রায় উলঙ্গ অবস্থাতেই পতিত ছিল; এবং সম্পূর্ণ অব্যবস্থিতরূপে পড়িয়া থাকায় দেখিতেও বড়ই অদ্ভুত দেখাইতেছিল। যাইহোক, আমার পিতা ঠগগণকে এই সময় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'সবগুলিই তো এখানে আছে?' 'হাঁ খোদাবন্দ!'—বলিয়া গর্ত্তখননকারীদিগের একজন উত্তর প্রদান করিল। উহাকেও আমি পূর্ব্ব হইতেই চিনিতাম।

"পিতা তখন বলিলেন,—'আচ্ছা, তবে সকল-

গুলিকেই একত্রে পুঁতিয়া ফেল।' অতঃপর সত্বর সেই দেহগুলিকে সেই কবরমধ্যে একত্রীকৃত করিয়া সাজান হইল। একটীর মাথা ও অপরটির পা—এইরূপে অল্পস্থানের মধ্যেই শব-কয়টিকে সাজাইয়া, পরে তদুপরি মাটি দেওয়া হইতে লাগিল। পাছে মৃতদেহের পেট ফাঁপিয়া উপরের মাটি ফাটিয়া উঠে, এই আশঙ্কায় সকলগুলিরই পেট ফুটা করিয়া দেওয়া হইল। আরও, এইজন্যই উপরের মাটিও খুব জোরে ঠাসিয়া, উপরটাও সমান করিয়া রাখা হইল। আটটি মৃতদেহ এইরূপে একটী গর্ত্তের মধ্যে লুক্কাইত রহিল যে, কেহ আর তাহার সন্ধান পায়, সাধ্য কি?

"ইহার পরই আমরা সেই গোরস্থান ত্যাগ করিয়া আসিলাম; এবং সকলেই বিশ্রাম-জন্য নিদ্রাদেবীর আরাধনায় ব্যাপৃত হইলাম। কিন্তু সে রাত্রে আমার আর নিদ্রা কোথায়? ক্ষণে ক্ষণেই আমি দেখি,—যেন সেই বৃদ্ধ ও তাঁহার পুত্র আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া! তাঁহার কথা যেন আমার কানে বাজিতেছে, তাঁহার পুত্রের সলোল-দৃষ্টি যেন আমার চক্ষের উপর পড়িতেছে! আমার বোধ হইতে লাগিল, যেন সহস্র সহস্র শয়তান আমার বক্ষের উপর বসিয়া—নিদ্রা যেন আমার চক্ষে আর আসিবেই না! ফলতঃ আতঙ্কে, বিষাদে, বিভীষিকায় আমি এতদূর ক্লিষ্ট হইয়া পড়িলাম যে, আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলাম না! আমার এ ভাব দেখিয়া পিতা ও হোসেন আমায় নানারূপে অভয় প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই তো আমি শান্তি পাইলাম না! আমি তখন উন্মত্তের ন্যায় একবার 'তাম্বুর' বাহিরে বাতাসে আসিয়া বসিলাম। ক্ষণেক চন্দ্রের প্রতি তাকাইয়া, ক্ষণেক বা মেঘের দৃশ্য দেখিয়া, মনে মনে রাত্রি কাটাইবার সঙ্কল্প করিলাম। কিন্তু এমন সময় আবার একি বিভ্রাট! গভীর গর্জ্জনে আকাশ কাঁপাইয়া এই সময় আবার বৃষ্টি আসিল—মাতঃ বসুন্ধরাও যেন রাত্রির এই শোক-দৃশ্য দেখিয়া কাঁদিলেন। কাজেই আমাকে আবার তাম্বুর ভিতর আসিয়া পূর্ব্ববৎ শুইতে হইল। এবার আমি আমার পিতাকে জাপ্টাইয়া ধরিয়া পিতার পার্শ্বেই শুইলাম। ক্রমে, কি জানি ঈশ্বরের কি অনুগ্রহ, আমার নিদ্রা আসিল।

"প্রাতঃকালে প্রার্থনার সময় আমার এই নিদ্রা ভঙ্গ হয়। এই সময় আবার আমাদের গালিচাখানিকে পাতা হয়; এবং আমরা সকলে প্রার্থনা আবৃত্তি করিতে থাকি। প্রার্থনা আবৃত্তি করিবার সময়ও কিন্তু গত-রাত্রের সেই বৃদ্ধ ও তাঁহার পুত্রের কথাই আমার মনে হইতে লাগিল।

"প্রার্থনা শেষ হইলেই, আবার আমাদের ঘোটক সজ্জিত হইল; এবং আমরা আর এক দূর-স্থানে গমনের জন্য প্রস্তুত হইলাম। পাছে আমাদের প্রতি এই হত্যাকাণ্ডের কোন সন্দেহ হইতে পারে—এই জন্যই, গণেশপুর হইতে কোন দূর স্থানে যাওয়াই এখন আমাদের আবশ্যক হইয়াছিল।

"যথা সময়ে আমরা এক গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন একজনকে পাঁচ সিকার 'গুড়' কিনিবার জন্য গ্রামের ভিতর পাঠাইয়া দেওয়া হইল। পিতাকে আমি 'গুড়' কিনিতে দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন,—'উহা আমাদের 'তুপ্পনি'-পূজায় লাগিবে। বিশেষ গাম্ভীর্য্যের সহিত এ পূজা করিতে হয়; এবং কোন মতে এবিধি লঙ্ঘন করা উচিত নহে। অনুষ্ঠানে, কল্য রাত্রের কার্য্যের ন্যায় অন্যান্য কার্য্যেও, আমাদের সকলের একতা থাকবে।

"যাইহোক, ক্রমে 'গুড়' আনা হইল এবং নানারূপ বিধি-বিধানক্রমে সেখানে পূজার আয়োজন হইল। অন্যান্য ক্রিয়া

সমাপনান্তে পিতা তখন হস্ত উত্তোলন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—'হে শক্তিময়ী দেবী! এযাবৎকাল আপনি আমাদের ঠগধর্ম্ম যেরূপে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, এবং আপনি জুরানায়েক ও খুদিক-বুনারীকে যেরূপে এক লক্ষ ষষ্টি সহস্র টাকা প্রদান করিয়াছিলেন, আমাদের প্রার্থনা, আমাদিগকেও সেইরূপে রক্ষা করুন; এবং আমাদের কামনা পূর্ণ হউক।' এইরূপভাবে দলস্থ সকলেই সমস্বরে দেবীর নিকট প্রার্থনা করিলেন। তখন, পিতা সকলের হাতে সেই 'গুড়' একটু একটু বণ্টন করিয়া দিলেন; এবং সকলেই বিশেষ ভক্তির সহিত তাহা খাইলেন। অবশেষে, পিতা আমার হস্তে একটু 'গুড়' প্রদান করিয়া আমায় খাইতে বলিলেন। আমার তাহা খাওয়া হইলে, পিতা আমায় বলিলেন,—'এই গুড়' যখন তুমি খাইয়াছ, তখন তোমারও অন্তঃকরণ ঠগের ন্যায়ই হইল। ইহার এমনই গুণ যে, তুমি ইচ্ছা করিলেও, এখন আর ইহার প্রাধান্য তোমার অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইবে না। যে কোন ব্যক্তি যদি ইহার এক বিন্দু খাইতে পায়, তবে তাহাকেই এই ধর্ম্মে অভিষিক্ত হইতে হইবে। ইহার অপূর্ব্ব ক্ষমতা সকল সময়ই অপরিহার্য্য।'

"আমি তাহাতে বলিলাম,—'সত্যই কি?' পিতা উত্তর দিলেন,—'ইহার শতশত দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারি। হোসেন কিম্বা অপর যাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, সে-ই ইহার প্রমাণ তোমায় দিতে পারিবে।'

"ইহার পরই আমার রাত্রের কথা উঠিল। গত রাত্রে নানারূপ ভয় পাওয়ার কথায়, পিতা ও হোসেন আমায় নানারূপে অপ্রতিভ করিতে লাগিলেন। আরও তাঁহারা আমায় নানারূপে সাহস দিয়া ঠগী-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও নির্ব্বিঘ্নতার বিষয় জানাইলেন। এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া কাজেই আমায় বলিতে হইল,—'আচ্ছা, এবার হইতে আমি আর কখনও আমার কর্ত্তব্যে পশ্চাৎপদ হইব না। আপনাদের কথায় অদ্য আমার অনেকটা সাহস হইল। আপনারা যেদিন আমায় উপযুক্ত জ্ঞান করিবেন, সেইদিনই আমি 'রুমাল' লইয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইব।' এইরূপে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইয়াই, আমি তখন অন্য কথা পাড়িয়া বলিলাম,—'গতকল্য যে লোকটাকে হত্যা করা হইয়াছে, মহম্মদ তাহার পরিচয় আজ আমাকে দিবে, বলিয়াছিল। এখন, সেটা শুনিলে হয় না?' আমার এই কথা শুনিয়া, দলেরও প্রায় দশ-বার জন লোক সকলেই মহম্মদকে ঐ অনুরোধ করিলেন।

"পান ও তামাক খাইয়া লইয়া, মহম্মদ তখন সাগ্রহে আমার পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল,—'নাগপুরের অন্তর্গত বোরি নামক একটী গ্রামে আমার জন্ম হয়। আমার পিতা এবং পূর্ব্ব-পুরুষগণ সকলেই 'ঠগ' ছিলেন। তাঁহাদেরও অনেক কীর্ত্তি-কাহিনীর বিষয় আমাদের সংসারে শুনিতে পাওয়া যায়। এই ঠগ-বৃত্তিতে তাঁহারা এত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা গ্রামের মধ্যে 'পেটেল' বা প্রধান জমীদার ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। এজন্য তাঁহারা নাগপুরের রাজ-সরকারে রাজস্বও দিতেন। এত বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও কিন্তু তাঁহারা আপনাদের ঠগীবৃত্তি ত্যাগ করেন নাই। আমার পিতামহ কাশিম—সম্প্রতি যাঁহার মৃত্যু হইয়াছে এবং যাহার নাম, বোধ হয়, আপনাদেরও অবিদিত নাই—তিনি একজন প্রধান ঠগ-সর্দ্দার ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর পিতাই সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হন; এবং অনেকদিন পর্য্যন্ত পিতার সে অধিকারে কেহই প্রতিবাদী হয় নাই।

'কিন্তু সৌভাগ্য চিরদিন সমান থাকে না।

একদিন, আমার খুব স্মরণ হয়, এক দল সৈন্য আসিয়া আমাদের গ্রামে উপস্থিত হইল; এবং আমার পিতাকে রাজ-সরকারে—পেস্কারের নিকট লইয়া যাইতে চাহিল। পিতা তাহার কোন কারণই জানিতে পারিলেন না; এবং তাহাদিগকে ঘুস দিতে যাইলেও তাহারা তাহা গ্রাহ্য করিল না। পিতাকে ধরিয়া লইয়াই চলিল। আমিও পিতার সহিত যাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায়, পিতা আমাকেও সঙ্গে লইলেন। এ-সময় আমার বয়সও অতি অল্প ছিল। এইরূপে আমরা নাগপুরে পৌঁছিলে, আমাদিগকে অতি নীচলোকের ন্যায় কয়েদ করিয়া রাখিল। আমাদের পায়ে লোহার শিকল বাঁধা হইল, এবং আমাদিগকে সামান্য রকমেরও সুখসম্ভোগ করিতে দেওয়া হইল না। পান, তামাক কিম্বা পরিস্কার কাপড়—কিছুই আমরা পাইলাম না। অতি অপদার্থ খাদ্য আমাদিগকে খাইতে দেওয়া হইল। এইরূপে অসহনীয় কষ্টে সেই কারাগৃহে তিনটি মাস কাটিয়া গেল। আমরা দিন দিন ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। তথাচ কিছুতেই জানিতে পারিলাম না যে, কি জন্য আমাদিগকে অকারণ এরূপভাবে কয়েদ করিয়া রাখা হইয়াছে।

'এইরূপ বিষাদেই আমাদের দিন কাটে। এমন সময় এক দিন, যে হতভাগ্য গতকল্য রাত্রে আমার হস্তেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে—এই ব্রজলাল, কতকগুলি সৈন্যের সহিত আমাদের কারাগৃহে প্রবেশ করিল। তাহাদের দেখিয়াই পিতার বড়ই আতঙ্ক উপস্থিত হইল; এবং তিনি ভাবিলেন, তবে বুঝি মৃত্যু সন্নিকট! পরক্ষণেই কিন্তু ব্রজলালকে চিনিতে পারিয়া, পিতা কিছু ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন; এবং উাহাকে নানারূপ ভৎসনা করিতে লাগিলেন।

'পিতার কথা শুনিয়াই ব্রজলালের চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ লইয়া উঠিল। এবং সে বলিতে লাগিল,—'পেটেলজি, এখন বোধ হয়, তোমাদের গ্রামের সেই সওদাগর জয়সুখদার বিষয় গভর্ণমেণ্টকে জানাইতে তুমি স্বীকৃত আছ? আরও, এখন বোধ হয়, তোমার স্মরণ হইতে পারে যে, কিরূপ অভ্যর্থনা ও কিরূপ সদ্ব্যবহার তখন তুমি আমার সহিত করিয়াছিলে! যাইহোক, ঈশ্বরানুগ্রহে এখন আমিও একবার দেখিব যে, আমি তোমায় সেরূপ ব্যবহারের কোন প্রতিদান দিতে পারি কি না!' পিতা তাহাতে ক্রোধে কম্পান্বিত কলেবরে উত্তর করিলেন,—'মিথ্যাবাদী, অপদার্থ, নীচজন্মা! তুই এরূপ কখনও মনে করিস্ না যে আমার মুখ হইতে তুই তাহার একটীও কথা পাইবি? যদি তোদের মধ্যে তেমন উপযুক্ত লোক কেহ থাকে, তবে সে গিয়া কাশিম পেটেলকে তাহা জিজ্ঞাসা করুক এবং তাঁহার নিকটই তাহার উপযুক্ত উত্তর পাইবে। নাহিলে কুকুর-পুত্র কুকুর তুই, তুই আমার নিকট হইতে একটীও কথা পাইবিনা!'

'আচ্ছা, আমি তোকে দেখিব!'—এই বলিয়া তখন সেই পাপীষ্ঠ তাহার সেই সহকারী সৈন্যদিগকে কি এক ইঙ্গিত করিল। সৈন্যগণ তখন একটা চটের থলিতে কতকগুলা গরম ছাই পুরিয়া আনিল; এবং ঘোড়ার মুখে মুখোস দেওয়ার ন্যায়, আমার পিতার মুখে সেই থলিটা বাঁধিয়া দিল। পিতার মুখ হইতে তাহা খুলিবার জন্য অনেকরূপ চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সে দুরন্তদের অত্যাচারে তাহা আর খোলা হইল না। নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত গরম ছাই ক্রমে মুখে প্রবেশ করায়, পিতা একরূপ মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। এরূপ একবার নহে—পিতার নিকট হইতে কথাটা বাহির করিবার জন্য ব্রজলাল বারবার পিতার প্রতি এইরূপ কঠোর ব্যবহার করিতে লাগিল। এমন কি, সে ব্যবহারে অবশেষে পিতা এরূপ কাতর হইয়া পড়িলেন যে, তিনি আর দাঁড়াইতে পারিলেন না। তাঁহাকে একরূপ মৃতপ্রায় বসিয়া পড়িতে হইল। পাপীষ্ঠ তখন, পিতাকে আর জল পর্য্যন্তও যেন না দেওয়া হয়—রক্ষকগণকে এরূপ আদেশ করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, তখন প্রাতের জল কিঞ্চিৎ আমাদের গৃহে ছিল। সুতরাং দুষ্টেরা প্রস্থান করিলে, আমি আমার পিতার মুখ ধুইয়া দিলাম; তাঁহাকে একটু জল খাইতেও দিলাম। এইরূপে ক্রমে পিতা একটু সুস্থ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বাঁচিবার আশা তখন আমার প্রাণে সঞ্চার হইল। আমি তখনকার মত জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলাম।

প্রেম-ধর্ম্ম।

নীল আকাশ রাত্রিতে দেখিতে বসিলাম। তারা সব,তোরা ভাসিয়া ভাসিয়া কোথায় যাস? বিপুল মহিমান্বিত আকাশ নীলে গড়াগড়ি যাইতেছে কেন? আমি কে? আমি উহাদিগকে চিনি কেন? আমাকে উহারা হর্ষ দেয় কেন? উহারা পরিচিত না হইলে, ঐ তারাপংক্তি দেখিয়া—ঐ নীল বিস্তৃত আকাশ দেখিয়া, আনন্দোচ্ছ্বাসে হৃদয় ভরিবে কেন? উহারা আমার কে? উহাদের মধ্যে আমার প্রভু আছেন! তাই নক্ষত্রের রূপ ভাল লাগে; নীল আকাশের তরঙ্গে তরঙ্গে চিরবাঞ্ছিতের রাঙ্গা চরণ বিরাজ করিতেছে, নীল আকাশ-মুক্ত দেবোদ্যানে কুসুম-পংক্তির ন্যায় প্রতীয়মান নক্ষত্রে তিনি বিরাজ করিতেছেন, তাই আমি তাহাদিগকে চিনি চিনি বলিয়া মনে হয়। উহারা এবং আমি এক-ধর্ম্মাবলম্বী। দেখ, ধর্ম্মের পরিচয় বড় পরিচয়, ধর্ম্মের সহানুভূতি বড় সহানুভূতি। তুমি বঙ্গদেশের একটী তুচ্ছ মুসলমানকে অপমান করিয়া দেখ,—টার্কি পর্য্যন্ত তাহাতে কাঁপিয়া উঠিবে,আরব্য-মিসর তাহাতে কাঁপিবে। ক্ষুদ্র এক হিন্দু-মন্দিরের উপর উৎপাত করাতে একতা-বিরহিত হিন্দু-জাতিও এক-বন্ধনে দাঁড়াইয়াছিল। তাই নক্ষত্রকে ভালবাসি, তাই চন্দ্রসূর্য্যকে ভালবাসি, তাই বনের ফুল ভালবাসি, তাই প্রকৃতির ছয় ঋতুর ভিন্ন ভিন্ন শোভা দেখিয়া কবি হইয়া দাঁড়াই। আমরা এক ধর্ম্মাবলম্বী। নক্ষত্র যাহাকে চায়, আকাশ যাহার পদে পড়িয়া নীলক্ষেত্রে গড়াগড়ি যায়, ফুল যাহার প্রেম লইয়া হাসে—আর প্রেম হারাইলে বাসী হয়,ছয় ঋতু যাহার নিদেশে আসে, দিগঙ্গনা যাহার রূপ দেখিয়া হাসে, মনুষ্যেরও সেই ধর্ম্ম অন্তর্নিহিত। সাংসারিক কোলাহল বিস্মৃত হও, দুশ্চিন্তা দূর কর, অন্তর দিব্য পরিষ্কার তড়াগবৎ নির্ম্মল কর; তখন মুগ্ধ হইয়া শ্রবণ করিও—শুনিও, হৃদয় হইতে সংগীত--ঈশ্বরাভিলাষী বাসনা-সংগীত আপনিই উঠিতেছে। প্রকৃতিতে তাহার মধুর লয় হইতেছে। বৃক্ষও গাহিতেছে তাই, ফুলও শিখিতেছে তাই। সেরূপ মিষ্ট জগতে কিছু নাই। তাই প্রকৃতি, মন সে সংগীতে একত্রে সুর বাঁধিলে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সুফল হয়।

ক্রমে ইন্দ্রিয় শান্ত হয়, ক্রমে গভীর ভাব মনে উদয় হয়, ক্রমে সমস্ত ইন্দ্রিয় তাহাতে লীন হয়, ক্রমে সমস্ত জ্ঞান লুপ্ত হয়। একমাত্র সাধকের থাকে তখন—চৈতন্য। ঈশ্বরের মহাসত্ত্বার সম্মুখীন হইয়া, ঈশ্বরের মহাসত্ত্বার গৌরব উপলব্ধি করিয়া বিস্ময়াভিভূত হইয়া থাকে কেবল—চৈতন্য। যোগী তাহা কিরূপে উপলব্ধি করেন,তাহা জানি না। কিন্তু শুনিয়াছি নাকি,তখন গভীর প্রশান্ত আকাশের ন্যায় তাঁহার মন স্থির হইয়া আসে—তখন অন্তশ্চর-মরুতের নিরোধ-হেতু মন নিষ্কম্প প্রদীপ-শিখাবৎ স্থির হয়, তখন আকাঙ্ক্ষা প্রশ-

মিত হয়, আত্মাস্থিত পরমাত্মকে দর্শণ করিয়া হৃদপদ্ম তাঁহাকে অন্তরে পূরিয়া মুদিত হয়। সরোবরে, অন্তরবর্ত্তী ভ্রমরসহ মুদিত কমল-কোড়কবৎ প্রতীয়মান কমল বাহ্য আলো-দৃশ্য চাহে না, উষার মধুর আলো চাহে না, সমীরণ-স্পর্শে দল খুলিতে চাহে না—লজ্জা-হেতু নহে, কেবল অন্তরবর্ত্তী ভ্রমর-সঙ্গম-সুখে তাঁহার অন্য সমস্ত প্রবৃত্তি লুপ্ত হইয়া যায় বলিয়া। তখন বিভোর হইয়া পদ্ম মুদিত থাকে,—সন্ধ্যার সমীরণ স্পর্শে, উষার আলো স্পর্শে তাহা খোলে না—পদ্ম আর উষা চাহে না, আলো চাহে না! সেই রূপ যোগী বাহির দৃশ্য—বাহ্য রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-স্বাদ চাহেন না। চাহেন, যাহা, তাহা পাইয়া তাঁহার মন পুলকিত হইয়াছে; তাই তাঁহার মুদিতনেত্র খোলে না, কর্ণপথে সংগীত পশে না, ত্বকে অনুভব-শক্তি থাকে না—তিনি তখন চিত্রপটের ন্যায়। সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সুখ ভগবৎ-সম্মিলন হইলে—স্বর্গবাস লাভ হইলে, সিঁড়ির শোভা দেখিতে কে ফিরিয়া চাহে!

আমি এ মুহূর্ত্তে ভগবান ভিন্ন কিছু দেখি না। কি এক দ্রব্য—যাদু দ্রব্যগুণে আমার নেত্র মুগ্ধ হইয়াছে যে, তাঁহার রূপ ভিন্ন আর কিছুই দেখি না। নীল-বর্ণ, লাল-বর্ণ, সবুজ-বর্ণ শুক্ল-বর্ণ—পৃথিবীময় যে দিকে চাই, সেই দিকেই এই বর্ণের খেলা। নীলবর্ণে ত্রিদলবিশিষ্ট নীল-পঙ্কজ-তুল্য তিনটী অক্ষর দেখি—ঈশ্বর। রক্তবর্ণে সুন্দর লাল অক্ষরে ফুটিয়া উঠিয়াছে, একই নাম 'ঈশ্বর'। শুভ্রবর্ণে পবিত্র তিন অক্ষরে সেই একই ঈশ্বর নামের গৌরব উপলব্ধি করিয়া সুখী হই। এই বিশ্ব কি এক আশ্চর্য্য মহিরুহ তুল্য! তাহার নীল, লাল, শ্যামল পত্রে এক বিশ্বস্রষ্টার নামই উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। দর্শনশাস্ত্র মন্থন করিয়া—জ্ঞানের এভারেষ্ট শৃঙ্গে উঠিয়া, অহঙ্কারী প্রকৃতির দ্বারদেশে সদর্পে করাঘাত করিল। প্রকৃতিনাথকে দেখিতে চাহিল। যিনি বিশ্ব-মন্দিরে বিশ্ব-সেব্যরূপে বিরাজমান, তিনি অহঙ্কারীকে দেখা দিলেন না, প্রকৃতি দ্বার খুলিল না। কত দিন ফিরিয়া আসিল। কিন্তু ভক্তির মৃদুসবিনয় করাঘাতে প্রকৃতির দ্বার খুলিল; ভক্তির চিরারাধ্য দিব্যোজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখাইল! প্রতি তরু অহঙ্কারীর আহ্বানে চুপ করিয়াছিল, প্রতি রঞ্জিত কুসুমদল তাহাকে কতকটী শুষ্ক নিয়ম বুঝাইয়া চুপ করিয়াছিল। কিন্তু ভক্তির মৃদুমধুর আহ্বানে পুষ্প-কলিকার প্রাণ খুলিয়া স্ব-সুরভিযুক্ত বক্ষে-অঙ্কিত রাঙ্গা চরণ দেখাইল। তরু তাহার সঙ্গে মনের কথা কহিল। কোকিল সুমধুর কূজনে, ভ্রমর সুমধুর গুঞ্জনে তাহাকে মনের কথা ভাঙ্গিয়া বলিল। ঈশ্বর ভক্তিমানের নিকট ধরা দিলেন। সাবধান মানুষ! সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিতে সৃষ্টির পবিত্র দেব-মন্দিরে সম্ভ্রমে প্রবেশ করিও। জুতা জোড়া পায়ে দিয়া মস্ মস্ শব্দে তুমি সাহেব-দরবারে যাইতে সাহসী হও না, সেলাম ঠুকিতে ঠুকিতে তোমার হাতে ব্যথা হয়; আর যিনি সাহেবের উপরে সাহেব, কুইন ভিক্টোরিয়ার উপরে রাজা, তাঁহার মন্দিরে তুমি কয়েকখানা বহির কয়েক ছত্র মস্তিষ্কে করিয়া সাহঙ্কারে যাইয়া তোমার দরোয়ানের মত তাঁহাকে ডাকিয়া কান পাতিয়া থাকিবে,—শুনিতে ইচ্ছা, 'হুজুর' বলিয়া বেটা হাজির হয় কি না! কিন্তু এ-বেশে রাজরাজেশ্বরের দর্শন হয় না; এ তীর্থ তোমার জন্য নহে। এ তীর্থে যাইতে হইলে তোমার জুতা-জোড়া রাখিয়া যাইতে হইবে, তোমার অভিমান-ভূষণ ত্যাগ করিতে হইবে। সে যে ফকিরের দেশ, সংসারত্যাগী জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ-দিগের দেশ! সেখানে অহংজ্ঞান থাকিলে সব নষ্ট হয়। তোমার বিলাসভাবগুলি ত্যাগ করিয়া শান্ত-সমাহিত চিত্তে শুধু ডাকিতে হইবে, বিনয়ের সহিত ডাকিতে হইবে। তারপর যদি তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, তবে

দেখা হইবে। যে পর্য্যন্ত তাঁহাকে না দেখ, সে পর্য্যন্ত সুধু পৃথিবীর অস্থি-পঞ্জর দেখিতে-ছিলে, শুষ্ক নিয়ম দেখিতেছিলে, শোনিতের সূত্র দিয়া সৃষ্টির প্রহেলিকা বুঝিতেছিলে; তখন হয়ত জ্ঞান তুষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু অন্তরে একটা অভাব রহিয়া গিয়াছিল। কি যেন পাও নাই, তজ্জন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মণিহারা সর্পের ন্যায় তোমার নিকট অশান্তির চিহ্ন বলিয়া বোধ হইতেছিল! কিন্তু যখন তুমি তাঁহাকে দেখিবে, তোমার আত্মার মুকুরে তাঁহার উজ্জ্বল তেজরশ্মির প্রভা ফুটিবে, তখন বিশ্ব এক মহিয়সী পট্ট-বস্ত্রে পরিহিত হইয়া বরবধূ-বেশে তোমার নিকট অতুল্যরূপে কান্তি প্রকাশ করিবে,—তখন তুমি প্রেমধর্ম্ম শিখিবে! সকল ধর্ম্মের সার প্রেমধর্ম্ম শিখিবে! যাহা আছে বলিয়া বিশ্ব আনন্দপূর্ণ, যাহা ফুরাইলে জীবনের উৎস ফুরাইবে—শুষ্ক নিয়মাধীন ঘটিকা-যন্ত্রের ন্যায় ক্রীড়াশীল বিশ্বে তখন আর সে আকর্ষণী-শক্তি থাকিবে না। যাহা আছে বলিয়া তুমি জলদ-রঞ্জিত আকাশ দেখিয়া, জ্যোতিপুঞ্জ নীলক্ষেত্রে ভাসিতে দেখিয়া উর্দ্ধমুখে বিস্ময়ে তাহা দেখ—যাহা আছে বলিয়া যন্ত্র সুন্দর, সূর্য্য উজ্জ্বল, নক্ষত্র আশাদায়ী—যাহা আছে এই জন্য অন্ধ-কার পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দানবের ন্যায় গ্রাস করিতে চাহিতেছে, পৃথিবীকে ধরিবে বলিয়া বদন ব্যাদান করিয়া আছে কিন্তু ধরিতে পারিতেছে না—যে প্রেম আছে বলিয়া রেণু রেণুর সহিত বাঁধা, গ্রহ গ্রহের সহিত বাঁধা, সৌরমণ্ডলে কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকে না (শুধু যদি আকর্ষণী শক্তি দ্বারা প্রমাণ করিয়া থাক, তবে বুঝিয়াছ ছাই) সেই প্রেমধর্ম্ম শিখাইবেন ঈশ্বর।

সংসারসাগরে প্রাণপণ করিয়া সেই রত্নলাভের জন্য ডুব দিয়া দেখ, যদি পাও, তবে উর্দ্ধ-করে তাহা জগতবাসীদিগকে দেখাইও—প্রেম-ধর্ম্ম শিখাইও। বাসনা-তাড়িত মানুষ সেই রত্ন দেখিয়া তোমার পাছে পাছে ছুটিবে, বিশ্ববাসী জীবগণ একত্র শতকোটী চক্ষু তোমার দিকে ফিরাইয়া সেই রত্ন দেখিতে চাহিবে। জগতের মহাত্মাগণ তাহাই দেখাইয়াছিলেন; আর, তাহা দেখিয়া মানুষ জাতি তাহা ভুলে নাই। কত শত বৎসর অতীত হইতেছে, তাই এখনও নরজাতি সেই সকল মহাত্মাদের অনুসরণ করিয়া প্রেমধর্ম্মের সম্মান দেখায়।

মতামত।

পুস্তক-সম্বন্ধে।

শ্রীমদ্ভাগবত।—বঙ্গানুবাদ।—শ্রীযুক্ত বাবু গোষ্ঠবিহারী আঢ্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। আজকাল স্রোত যেন কতকটা ফিরিয়াছে; হিন্দুর ছেলের হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনার দিকে মন যেন অনেকটা টানিতেছে। গোষ্ঠবিহারী বাবুও সেই উপযুক্ত সময় বুঝিয়াই, 'ভাগবতের' এই 'নূতন সংস্করণ' বাহির করিয়াছেন। এজন্য অবশ্যই তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র— এ নবেল-নাটক-প্লাবিত দেশে শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচারে অগ্রসর হইয়া তিনি যে লোকের ধর্ম্মকর্ম্মের দিকেই সহায়তা করিয়াছেন, এ তাঁহার পক্ষে অবশ্যই সুখ্যাতির কথা। বিশে-ষতঃ, তায় আবার তাঁহার এ সংস্করণ হইয়াছেও, ভাল। তাঁহার এ সংস্করণের ছাপা-কাগজও যেরূপ পরিষ্কার, অনুবাদও সেইরূপ মূলানু-সারী হইয়াছে। আমরা আরও দুই এক-খানি অনুবাদের সহিত মিলাইয়া দেখিলাম,—এ অনুবাদও তদপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। বরং ইহার দুই এক স্থলের ভাব প্রস্ফুটিতই বটে। তার পর, ৪৲ চারি টাকা দামও বেশী হয় নাই। অধিকন্তু এ সংস্করণের ছবিগুলিও সুন্দর হইয়াছে। আমরা এ সংস্করণের প্রচার-কামনা করি।

বিলাতী গুপ্তকথা।—অর্থাৎ রেণল্ড সাহেবের 'জোসেফ উইল্মট' পুস্তকের [illegible]

বাদ।—শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনুবাদিত। দুইখানি প্রকাণ্ড খণ্ডে প্রায় দেড় সহস্র পৃষ্ঠায় এ অনুবাদখানি সমাপ্ত। মূল গ্রন্থের ন্যায় ইহাতেও মধ্যে মধ্যে চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, অনেকটা অর্থব্যয় এবং যত্ন ও পরিশ্রমেই এই পুস্তক-খানির পরিসমাপ্তি হইয়াছে। যাঁহারা বুঝিয়া পড়িতে পারেন, তাঁহাদিগের নিকট ইহা তেমন সুন্দর না হইলেও, এ অনুবাদ মোটের উপর কিন্তু সহজ-বোধ্যই হইয়াছে। আর, ৩৲ তিন টাকা দামে এ দুই খণ্ড পুস্তক পাইলে, ঠকাও যে নহে, তাহাও মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। তবে লিখনপ্রণালী বা অনুবাদ-সম্বন্ধে বিভিন্ন মত হয়, সে স্বতন্ত্র।

দক্ষযজ্ঞ।—একখানিও সচিত্র, কিন্তু নাটক। ষ্টার-থিয়েটারের বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ই ইহার প্রণেতা। সুতরাং এ পুস্তকের আর কিছু নূতন পরিচয় দেওয়া বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন। অর্থাৎ ইহারও ভাষা সেই ভাঙা থিয়েটারী-ছন্দে, লিখন-প্রণালীও থিয়েটারের উপযোগী করিয়া। গিরীশ বাবুর কোন নাটক যিনি পড়িয়াছেন, সুতরাং এই পরিচয়েই ইহার পরিচয় পাই-বেন, এই ভরসা। দামটা বার আনা—বড়ই বেশী বলিয়া বোধ হয়।

বরযাত্রীয় প্রশ্ন।—Compiled by Ashutosh Mukherjee. নামেই বোধ হয়, পাঠক, ইহার পরিচয় পাইলেন। অর্থাৎ বিবাহে-ক্ষেত্রে একপক্ষ অপরকে নানারূপের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ঠকাইতে পারিবে—এই উদ্দেশ্য-সাধনেই এই পুস্তকখানি রচিত। এরূপ পুস্তকের আমরা কিন্তু কোনই আবশ্যকতা বোধ করি না। বিশেষতঃ অনেকস্থল আবার বড়ই ভ্রমপূর্ণ; যে উদ্দেশ্য-সাধনে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে, অর্থ ধরিলে, তাহার কিছুই সিদ্ধ হয় নাই। যথা, সংস্কৃতের একটী প্রশ্নের অনুবাদে,—

"উণিষে রমণী যায় স্নান করিবারে।
তাহাদের একটীকে গ্রাসিল কুম্ভীরে॥
তথাপি ফিরি আইল বিংশতি রমণী।
কেমনে হইল ইহা স্থির কর জ্ঞানী॥"

এটি সম্পূর্ণ ভুল। সংস্কৃতের অর্থই হয় নাই। এইরূপের ও অন্যান্য আরও নানা-রকমের বিস্তর ভুল আছে। সুতরাং এ পুস্তক সর্ব্ব-প্রকারেই অযোগ্য। কিন্তু আশ্চর্য্য, ইহার মলাটে আবার লেখা,—'দ্বিতীয় সংস্করণ।' হা অদৃষ্ট!

কন্যাযাত্রীয় প্রশ্ন।—Compiled by G. C. Mukerjee. এও ঐ একই শ্রেণীর পুস্তক। সুতরাং ইহারও আমরা কোন উপকারিতা জ্ঞান করি না। এসকল ছেলেদের ছেলে-খেলা আর কি? কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সংবাদপত্রে সমলোচনার জন্যও আবার প্রদত্ত হইয়াছে।

কালাচাঁদ।—তৃতীয় ও চতুর্থ পর্ব্ব।—কালাচাঁদে ক্রমেই জমজমা—ক্রমেই রসো-চ্ছ্বাস দেখা যাইতেছে। লেখকের বর্ণনাশক্তি প্রশংসনীয়। তিনি একটু একটু করিয়া সূত্র বাহির করিয়া ক্রমেই তাহাতে রঙ ফলাইতেছেন। কালাচাঁদ সত্বর সম্পূর্ণ হইলেই আমরা আনন্দিত হইব।

বাগবাজার রিডিং-রুমের বিবরণী।—এ বিবরণী দেখিয়া এবার আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। বাগবাজার রিডিং-রুমের অধ্যক্ষ-গণের চেষ্টায় পাঠালয়টির দিন দিন যে উন্নতি হইতেছে, ইহা বড়ই আহ্লাদের বিষয়। এ পাঠালয়ের অনুসরণে আরও অনেকগুলি পাঠালয় স্থাপিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এই-টিই সর্ব্বাপেক্ষা সুশৃঙ্খলায় চলিতেছে।

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

জুয়াচোরের বিজ্ঞাপন

এখনও মফঃস্বলের নানাস্থানে নানা নামে বিলি হইতেছে। সে সকল বিজ্ঞাপনগুলির সকলগুলিই সমান চিত্তহর—সমান প্রলোভন-পূর্ণ। তাহার কোন্‌খানি রাখিয়া কোন্‌খানির কথা আগে পাড়িব, তাহাতেই তো বিষম সমস্যা! যাইহোক, জুয়াচোরদের প্রচারিত ঐ সকল বিজ্ঞাপনগুলির মধ্যে পাঠক আজ 'ভোজবিদ্যা' নামক পুস্তকের এক অপূর্ব্ব হ্যাণ্ড-বিল-বিজ্ঞাপন দেখুন, এইরূপ;——

"অনুগ্রহ করিয়া পাঠান্তে বন্ধু-হস্তে সমর্পণ করিবেন।
সত্য বিজ্ঞাপন! সত্য বিজ্ঞাপন! সত্য বিজ্ঞাপন!
কেবল এক মাসের জন্য সুলভ-মূল্যে প্রদত্ত হইবে।

ভোজবিদ্যা।

ইংরাজী ম্যাজিক সম্বন্ধীয় ক্রীড়া।

পূর্ণ বাঁধাই ডাকমাসুল সমেত ৷৵০ আনা।

অনেক পরিশ্রম স্বীকার করতঃ ভোজবিদ্যা নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছি। জন-সাধারণের যাহাতে উন্নতি হয়, এই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। সচরাচর বেদেরা যে সমস্ত ক্রীড়া-কৌতুক দেখাইয়া থাকে, তদ্ভিন্ন প্রধান প্রধান ইংরাজি পুস্তক সংগ্রহ করিয়া এবং বড় বড় মেজিসিয়ানের সাহায্য লইয়া এই ভোজবিদ্যা পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়াছি। কেনার, ডেভিন-পোর্ট ব্রাদার্স, ডিমোলা, হিনার, ভ্যানিক, উইলিয়াম প্রভৃতি বড় বড় ইংরাজ যাহা করিয়া গিয়াছেন, এই পুস্তকে সেই সমস্ত কৌশল লিখিত হইয়াছে। মনুষ্যের মুণ্ডচ্ছেদন, শূন্য-মার্গে চলন ও কথোপকথন, নিমেষ মধ্যে সমস্ত জিনিস উড়াইয়া দেওন, অত্যাশ্চর্য্য তাসের ক্রীড়া, একখানি সুতীক্ষ্ণ তরবারির উপর দণ্ডায়-মান, যষ্টিতে ভর দিয়া শূন্যভাবে থাকা ইংরাজি টুপির মধ্যে হংস ডিম্বের বড়া ভাজা ও কেনব বল বহির্গত করা, মুখ হইতে অনবরত গোলা বহির্গত করা, শূন্যমার্গে পুতুলের নৃত্য ও অত্যাশ্চর্য্য মিসমেরিজম যাহা কখন কেহ দেখে নাই, কেবল ডেভিনপোর্ট ব্রাদার্স দেখা-ইয়া গিয়াছেন। ইহাপেক্ষা আরও আমাদের নূতন নূতন আশ্চর্য্য! অদ্ভুত!! তামাসা লিখিত হইয়া এই ভোজবিদ্যা নামক পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে সর্ব্বজন-সমীপে আমার বিশেষ অনুরোধ এই যে, যাঁহারা ভোজবিদ্যা বা ম্যাজিক শিক্ষা ও জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি যেন আমার নামে নিম্নলিখিত স্থানে মূল্য প্রেরণ করেন। কারণ আজিকাল আমার দেখাদেখি অনেকে ভোজবিদ্যার নাম পরি-বর্ত্তন করিয়া অন্য নাম দিয়া ছাপাইতেছে। সাধারণে যেন টাকা দিয়া না ঠকেন এই আমার উদ্দেশ্য। আর ম্যাজিক সম্বন্ধীয় যে সকল দ্রব্যের আবশ্যক হয়, তাহা আমি এক সপ্তা-হের মধ্যে সরবরাহ করিয়া থাকি।"

* * * *

বিজ্ঞাপনের তো বোলচাল দেখিলেন! এখন শুনিতে চান কি, এই বিজ্ঞাপনদাতা কে? এই বৎসরের ১০ম সংখ্যক অনুসন্ধানে কুমার দেবেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এবং উপেন্দ্রকৃষ্ণ দাস ঘোষ প্রভৃতির যে সকল কীর্ত্তির কথা প্রকাশ হইয়াছে, পাঠকগণের বোধ হয় তাহা স্মরণ থাকিতে পারে। এই পুস্তকের বিজ্ঞাপন-দাতাও সেই তাহারাই। এ বিজ্ঞাপনও তাহাদের দুইনামে—দুই ঠিকানা দিয়া বিলি হইতেছে। দুইনামে দুই ঠিকানা দিয়া এ বিজ্ঞাপন বিলি হইতেছে সত্য, লোকেও বুঝিবে দুইজন আলাহিদা লোক, কিন্তু বিজ্ঞাপনের কথা-বার্ত্তা দু'খানিরই এক। কেবল নাম ও ঠিকানার যা' প্রভেদ। পুস্তক-আয়োজন উভ-য়েরই এক—ফন্দি দুই নামেরই সমান—জুয়া-চোর বলিয়া বদনাম দুইনামেই যথেষ্ট আছে। সুতরাং পাঠকগণ বুঝিয়া-সুঝিয়া উহাদের কুহকে পা দেন, এই বাসনা।

রঙ্-তামাসা।

চোরের উচিত শাস্তি।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় এইমাত্র নিমন্ত্রন হইতে আসিয়া শুইয়াছেন। আফিংএর ঝোঁকে ঝোঁকে নিদ্রাটা এখনও সম্পূর্ণ আসে নাই। এ অবসরে, এক চোর সিঁদ কাটিয়া তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও চক্ষু মেলিয়া চোরকে দেখিলেন। কিন্তু কিছুই বলিলেন না। চোর তখন ঘরের চারিধার খুঁজিয়া পাতিয়া দেখিতে লাগিল। কিন্তু অপর কোন জিনিসই সে দেখিতে পাইল না—দেখিল, কেবল এক জালা চাল রহিয়াছে। কাজেই "চাল চালই!" এই ভাবিয়া, অবশেষে চোর তাহার গাত্রের চাদরখানিকেই ভূমে পাতিয়া, সেই জালা হইতে দুই হাতে চাল তুলিয়া সেই চাদরে ঢালিতে লাগিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরও কাজেই তখন আর নেশার ঝোঁক নাই! তিনি তখন মনে মনে ভাবিলেন, —"বেটা যেমন পাজি, তেমনিই মজা হবে!" এই ভাবিয়াই, আস্তে আস্তে অন্ধকারে হাত বাড়াইয়া দিয়া, তিনি চোরের সেই চাদরখানিকে মেজে হইতে তুলিয়া লইলেন। চোর কিন্তু তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না। অবশেষে সে জালা হইতে চালগুলি তুলিয়াই চাদরে বাঁধিতে গেল। কিন্তু কি দুর্দ্দৈব! —চাদর কই? চোরের তো চক্ষুস্থির! চোর তখন সকলই বুঝিল। এবং লাভে হইতে চাদরখানাই যায় দেখিয়া, সেই ভট্টাচার্য্যের পায়ে ধরিয়া বলিতে লাগিল,—"ঠাকুর! আর কোন্ শালা আপনার ঘরে চুরী কর্‌তে আস্‌বে? এখন দয়া ক'রে চাদরখানা দেন। আমার নাকে-কানে খৎ!" ভট্টাচার্য্য মহাশয় তখন যেন সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উঠিলেন—যেন কিছুই জানেন না! উঠিয়াই, সম্মুখে চোরকে দেখিয়া—"চোর-চোর" বলিয়া চেঁচাইতে লাগিলেন। চাদর চাহিবে কি, চোর তখন পলাইতে পারিলেই বাঁচে।

জিত কার!

জাপান হইতে এক বণিক আসিয়া এক গলির মধ্যে নানাবিধ দ্রব্যে সজ্জিত করিয়া, খুব আড়ম্বরের সহিত এক দোকান খুলিলেন। দোকানের উপরে সাইনবোর্ড দিলেন,—Best shop in England." ব্যবসা খুব জোর চলিল। তাহা দেখিয়া, একজন ফরাসী বণিক আসিয়া, তাহার ঠিক পার্শ্বের ঘরেই, সেইরূপ জাঁকাইয়াই, আর এক দোকান খুলিলেন। তিনি উপরে লিখিলেন,—"Best shop in the world." বিজ্ঞাপন ও সাইনবোর্ডের চটকে তাঁহারও দোকান বেশ চলিতে লাগিল। একজন ইংরাজ এইরূপ সাইনবোর্ডের চটক দেখিয়া, হিংসায় জ্বলিয়া,ফরাসী বণিকের দোকানের পার্শ্বেই তাঁহাদিগের অপেক্ষাও অধিক দ্রব্য-সামগ্রীতে সুসজ্জিত করিয়া, এক দোকান খুলিলেন। আর, উপরের সাইনবোর্ডে লিখিলেন,—"Best shop in this lane।" সাইনবোর্ডের চটক করিতে কেহই পশ্চাৎপদ হইলেন না। কিন্তু জিজ্ঞাস্য, জিত কার।

খুড়োর * প্রার্থনা।

খুড়ো সদাই চতুরং। নটবর সেই খুড়োর উপযুক্ত ভাই-পো। খুড়োকে সে তাই তাড়া তাড়ি সংবাদ দিল,—"ভাল মনে করে দিয়েছ খুড়ো, আমাদের একটা garden party জোগাড় হয়েছে; বলার যে ছেলে হয়েছে?"

"মাইরি?—স্বর্গভ্রজাত?"—বলিয়া খুড়ো অমনি গম্ভীরভাব ধারণ করিলেন; এবং তার পরই চক্ষু বুজিয়া উপাসনা আরম্ভ করিলেন,— "আহা আজ আমাদের কি আনন্দের দিন সেই একমেবাদ্বিতীয়ং, নিরাকার পরমব্রহ্মের কৃপায় আজ আমাদিগের ভ্রাতার ঔরসে ভগিনীর গর্ভে একটী নূতন ভ্রাতা জন্মগ্রহ

* 'আনন্দলহরী' হইতে গৃহীত।

করিয়াছে। ঠাকুর! তোমার দয়ার কি অপার মহিমা!—কি অনন্তলীলা! ঠাকুর! আমি অতি অকর্ম্মণ্য, নরাধম, ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম। তোমার অনন্তব্যাপী বিশ্বসমুদ্রের এক তটে দাঁড়াইয়া কেবলমাত্র ঢেউ গণনা করিতেছি; সাঁতার জানি না—সাধ্য নাই পরপারে যাই! তাই বলি ঠাকুর! এ কাঙ্গালের প্রতি কি দয়া হইবে না? শান্তি! শান্তি!! শান্তি!"

বিষম সমস্যা—কিন্তু Solve হইল।

গুরুজী শিষ্যবাড়ী আসিয়াছেন। তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য তাই সুযোগ বুঝিয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন,—"আচ্ছা বল দেখি বাবা গুরু! পবন পুত্র হনুমান; পবনের ল্যাজ নাই, কিন্তু হনুমানের ল্যাজ কেন? গুরু! এ question যদ্যপি তুমি answer ক'রে দিতে পার, তা'হলে আমি এখনি তোমার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিব। বিশেষতঃ এ বড় ফ্যালাসাটী question নয়; এটা শাস্ত্রসঙ্গত প্রশ্ন—তোমার পুরাণেরই কথা!"

গুরু তো বিষম শঙ্কটে পড়িলেন। মনে মনে কতই দুর্গানাম জপিতে লাগিলেন—এখন মানে মানে এ শিষ্যবাড়ী হইতে পলাইতে পারিলে বাঁচি! এমন সময়, গুরুদেবের জন্মান্তরের পুণ্য বলিতে হইবে যে, খুড়ো আসিয়া হাজির! খুড়োই সমস্যা ভাঙ্গিয়া দিলেন,— "কি জান বাবা, হনুমান হচ্ছে এখনও বাচ্ছা কিনা—আর পবন হলো গিয়ে ধাড়ি। অর্থাৎ হনুমান হচ্ছে গিয়ে ব্যাঙ্গাচি, আর পবন হচ্ছেন গিয়ে ব্যাং,—হনুমানও যখন পবনের মত কোলা ব্যাং হয়ে দাঁড়াবে, তখন ব্যাঙ্গাচিরও ল্যাজ খসে যাবে—বুল ফ্রগ হয়ে দাঁড়াবে!" তখন, কাজেই চারিদিক হইতে করতালি পড়িল, কোলাহল ধ্বনি উঠিল ও স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হইল। গুরুও বাঁচিলেন।

সংবাদ।

—পোষ্টাফিসের এক গুণধর পোষ্টমাষ্টার রঙ্গপুরের অন্তর্গত বাগমারী পোষ্ট-আফিস হইতে জুয়েলার এস কে দাস এণ্ড কোম্পানীর দোকানে ৫০০৲ শত টাকা আন্দাজের অলঙ্কার ভ্যালুপেয়েবেল-ডাকে পাঠাইতে অর্ডার দেয়। জিনিসও যথাসময়েই গিয়া ডাকঘরে পৌঁছে। পোষ্টমাষ্টার মহাশয়, তখন লোভ সম্বরণ না করিতে পারিয়া, পার্শেল হইতে সেই অলঙ্কারগুলি খুলিয়া লইয়া—তৎস্থলে অন্য রাবিস জিনিস পুরিয়া—পার্শেলটী পূর্ব্ববৎ আঁটিয়া রাখে। ইহার দিনকতক পরেই পার্শেলটী 'রিফিউজ' হইয়া ফেরত আসিল। জুয়েলার-কোম্পানীর কাজেই তখন সন্দেহ হওয়ায়, তাঁহারা ডাকঘরের সম্মুখেই সকলকে দেখাইয়া সে পার্শেল খুলিলেন। কিন্তু খুলিয়াই চক্ষুস্থির! তারপরেই আর কি, আদালতে টানাটানি—পোষ্টমাষ্টারের সাত বৎসর মেয়াদ।

—সেদিন হুলস্থুল উঠিল,—দস্যু-সর্দ্দার ঝুন্দা মরিয়াছে। কিন্তু আজ আবার একি শুনি? সম্প্রতি মিরাটের একটা নীচ-শ্রেণীর স্ত্রীলোক নাকি তত্রত্য ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আবার এই বলিয়া দরখাস্ত করিয়াছে যে,—"ঝুন্দা বলিয়া সেদিন পুলিশ যাহাকে গুলি করিয়া মারিয়াছেন, সে প্রকৃত ঝুন্দা নহে—সে আমার স্বামী। আসল ঝুন্দা এখনও বাঁচিয়া আছে।" রমণীর এ এজাহার ছাড়া, আরও কেহ কেহ—"ঝুন্দাকে এই অমুক স্থানে ডাকাইতি করিতে দেখিলাম"—বলিয়া, ঝুন্দার সংবাদ পুলিশকে দিতেছে। তান্তিয়ার ন্যায় ঝুন্দাও তবে যাদু জানে নাকি?

—আগামী ১৭ই জুন সূর্য্যগ্রহণ হইবে। এই গ্রহণে সূর্য্যের মধ্যভাগটা আচ্ছাদিত হইয়া গিয়া, চতুর্দ্দিকে সরু চক্রাকার অংশ থাকিবে। এরূপ গ্রহণ অতি বিরল। ৭।৮বৎসর পরে ইহা হইতেছে। ভাগলপুর ও মুঙ্গের অঞ্চল হইতে এ গ্রহণ পূর্ণরূপে দেখা যাইবে; কলিকাতা হইতেও আংশিক চোঁদ্দকলা গ্রাস দেখিতে পাওয়া যাইবে।

—এক লণ্ডণ-সহরেই প্রত্যহ ২২,৮৭০০০খানা খবরের কাগজ বাহির হয়। তাছাড়া,স্কটল্যাণ্ড, আয়রল্যাণ্ড এবং ইংল্যাণ্ডের অন্যান্য স্থানেও ১৯,২২০ সংবাদপত্র প্রকাশ হয়। ভারতবর্ষে কিন্তু একথা স্বপ্নবৎ।

—আশুতোষ সরকার ঢাকার একজন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট। গত ১২ই মে রাত্রি ৮ ঘটিকার সময়, এক গাড়িতে চড়িয়া তিনি এক চীনের বাড়ীর দরজায় গিয়া হাজির, তাঁহার কোচম্যান দরজা ঠেলিতে লাগিল। চীনে তখন বাহিরে আসিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায়, বাবু বলিলেন,—"তোমার স্ত্রী কোথায়?" চীনা তাহাতে বলিল,—"আপনি বোধ হয় ভুলিয়াছেন—এটা বেশ্যা বাড়ী নহে।" ডেপুটি বাবু তখন জোর করিয়াই বাড়ীতে প্রবেশ করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। বলিলেন,—"এই বাড়ীই ঠিক, তোর স্ত্রীর কাছেই যাইব।" কাজেই চীনার আর সহ্য হইল না। বাবুরা বাড়ীতে প্রবেশ করিতে যাওয়াতেই, শেষে হাতাহাতি চলিল। কাজেই বাবুরা, দুইজনে পড়িয়া, অতঃপর চীনেকেই ঘা'কতক উত্তম-মধ্যম প্রহার দিয়া, প্রস্থান করিলেন। এই কেলেঙ্কারী এখন আদালতে উপস্থিত! জানিনা, কোথাকার ঢেউ কোথায় মিটে!

—২৪ পরগণা বহড়ু হইতে একব্যক্তি লিখিয়াছেন যে, "আজ কয়েকদিন হইল, এখানে কর্দ্দম বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। গাছের গায়ে কাদা, পাতায় কাদা ঘরের, চালে কাদা, ছাতার মাথায় কাদা!" পত্রপ্রেরক বলেন,—'অনেকেই এ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।' সংবাদদাতার আরও একটি সংবাদ এই যে,—তাঁহাদের এণ্ট্রান্স স্কুলটির ফল এবার বড়ই ভাল। হেডমাষ্টার মহাশয়ের যত্নেই স্কুলটির দিনদিন উন্নতি হইতেছে! এজন্য হেডমাষ্টার মহাশয়কে পত্রপ্রেরক ধন্যবাদও দিয়াছেন।

—এ এক নূতন জুয়াচুরী বটে! উত্তর-পশ্চিমের জনৈক স্কুল-ইনস্পেক্টর স্ত্রী-বিদ্যালয় দেখিতে যান। কিন্তু পুরুষ-ইন্স্পেক্টর কিরূপে বর্ষিয়সী রমণী ছাত্রীদিগকে পরীক্ষা করিবেন? অগত্যা পর্দ্দার বন্দোবস্ত হইল। রমণী ছাত্রেরা সেই পর্দ্দার অন্তরালে থাকিয়া পরীক্ষা দিতে লাগিলেন। ইন্স্পেক্টার ছাত্রীদিগকে পরীক্ষা করিয়া পরম সন্তোষলাভ করেন। তিনি মনে করিলেন,—বাসায় যাইয়া আহারাদি করিবার পর স্ত্রী-বিদ্যালয়টী-সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসাপূর্ণ একখানি রিপোর্ট প্রেরণ করিবেন! কিন্তু আহারাদির পর বৈকালে তিনি বায়ু-সেবনার্থ ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন, এরূপ সময়ে একস্থানে শুনিলেন, দুইটী স্ত্রীলোক কথা কহিতেছে; একটী অপরকে বলিতেছে,—'তাহার কন্যা স্কুল-ইন্স্পেক্টরকে বড়ই ফাঁকি দিয়েছে। কন্যাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি ধারী তাহার ভ্রাতা সমস্ত উত্তর যেরূপ বলিয়া দিয়াছিল কন্যা ঠিক তদ্রূপ উত্তর দিয়াছে। পর্দ্দার অন্তরালে এই ব্যাপার হইয়াছে, প্রসংশাপূর্ণ রিপোর্ট দিবেন কি, ইন্স্পেক্টার তো এই কথা শুনিয়া অবাক্।

—আগ্রার তাজমহল বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত করাই সাব্যস্ত হইয়াছে। খরচ পড়িবে বার হাজার টাকা।

—পত্রান্তরে প্রকাশ যে, এক জন ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-প্রচারক মজঃফরপুরের হিন্দু-অধিবাসীদিগের হাতে বড়ই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়াছেন। হিন্দুরা তাঁহাকে একটী বাটীর মধ্যে লইয়া গিয়া গালে আলকাতরা এবং গলায় জুতার মালা পরাইয়া দেয় এবং আরও নানা রকম অপমান করে। কারণটা বুঝি, হিন্দুধর্ম্মের গ্লানি করা।

—ফিলিসপং নগর সুইডেনে। সেখানে একটী নূতন ধরণের কামান প্রস্তুত হইয়াছে। এই কামানে নাকি পঁচিশ সেকেণ্ডে দশ বার গোলা ছোড়া যাইবে।

—মানুষ না খাইয়া কত দিন বাঁচিতে পারে, ইহার পরীক্ষা ডাক্তার ট্যানার প্রথমে করেন। তিনি চল্লিশ দিন উপবাসী ছিলেন। তাঁহার দেখাদেখি অনেকেই উপবাস করিয়াছিল। সম্প্রতি মার্কিনের একটী লোক চল্লিশ দিবস উপবাস দিবার চেষ্টা করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে একুশ দিনের দিন ক্ষেপিয়া যায়। এখন সে পাগলা-গারদে।

—পাকা চোর। যদুনাথ সাহার বাস ঢাকা অঞ্চলে। সে এক জন পাকা চোর ও বদমায়েস। চৌর্য্য অপরাধে ছয় বৎসর হরিণবাড়ীর জেলে ছিল। গত ১৪ই মে খালাস পায়। খালাস হইয়াই আবার চুরি করিয়াছে। সে চুরির বিবরণ এইরূপ; যদুনাথ জেল হইতে বাহির হইয়া পূর্ব্ব বঙ্গরেলে নিজ বাটী ঢাকা অঞ্চলে যাত্রা করে। রাত্রে নারায়নগঞ্জ ষ্টেষণে ষ্টীমার হইতে নামিয়া দেখিল, এক জন মুটে একটা বাক্স মাথায় করিয়া তাহার পিছু পিছু আসিতেছে। যদুনাথ মুটেকে কিছু বলিল না; মুটেরও যদুনাথকে সেই বাক্সের মালিক বলিয়া ভ্রম হইল। যদুনাথ একটু সরায়ে গেল, মুটেও সঙ্গে সঙ্গে গেল, এবং বাক্স দিয়া আপন পয়সা লইয়া চলিয়া গেল।

অনুসন্ধান।

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

৩য় খণ্ড] ১৫ই আষাঢ় ১২৯৭ সাল। [২২শ সংখ্যা।

ভক্তের গান।

"রাগিণী পুরবী গৌরী—তাল খেমটা।"

(ডোবেরে) আয়ুরবির মোহন ছবি কালসাগরে।
মন আমার মুদ্‌লে কমল, কি হবে বল,
এই বেলা পথ চিনে নেরে॥
আত্মারাম ডাকে পাখী, কল্পশাখীই, যাবে ফিরে;
বুদ্ধি বিষয়-চরায়, পথ সে হারায়, মোহের ফেরে॥
হয়ে মনপাখীর আঁখি, মায়ায় ঠেকি,
ভুল্‌লে কিরে:
তুমি ত দেখাও সব, কি দোষ দিব, জীবাত্মারে॥
দাঁড়ায়ে কি দেখ ঠাম, বিষয়-গ্রাম ছাড়ালিনে রে;
কখন হবে বিশ্রাম, শান্তিধাম, অনেক দূরে॥
এই বেলা কর চিন্তা, সেই চিন্তামণিরে;
এ নিশ্বাস-পবন, যতক্ষণ (বহেরে)
যতক্ষণ ধীরে ধীরে॥"

চোরের মেসো হওয়া।

প্রায় ২৫ বৎসরের কথা। বাঙ্গালার তখনও এত অধঃপতন হয় নাই; বাঙ্গালী তখনও এত ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হন নাই। তখনও বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণের সম্মান আছে; তখনও বঙ্গে ব্রাহ্মণ-শূদ্রের ভেদাভেদ সম্পূর্ণ বিদ্যমান। আংশিক বিকৃত ভাবাপন্ন হইলেও, তখনও কুলের গৌরব আছে—কুলীনের মর্য্যাদা আছে; শূদ্র ব্রাহ্মণকে দেখিয়া প্রণাম করে—ব্রাহ্মণের দাস বলিয়া পরিচয় দেয়; আর, ব্রাহ্মণও তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ-বচনে তুষ্ট রাখেন।

আমাদের শ্রীরাম মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই-ই সময়ের লোক। সুতরাং তাঁহারও এখন জাতি-কুল-মান পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। কুলের গৌরব—কুলীনত্বের মর্য্যাদায় গ্রামের মধ্যে তিনিই এখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান; কুলের মুখুটি; ত'ায় আবার, পৈত্রিক শিষ্য-যজমানও তাঁহার দু'দশ ঘর আছে। সুতরাং এসংসারে তাঁহার আর প্রতিপত্তি দেখে কে? এই সুযোগে মুখোপাধ্যায় মহাশয় অর্থও উপার্জ্জন করিয়াছেন, বেস। শুধু শিষ্য-যজমানে বা মান-মর্য্যাদায় উপায় নহে তো!—কুলীন বলিয়া তাঁহার আরও কয়েকটা উপরিলাভেই তিনি আজকাল একরূপ 'শাঁসাল' লোক! যদিও আজকাল বয়স তাঁহার পঞ্চাশ উত্তরাইয়াছে, তথাপি বৎসর-শালিয়ানা এখনও তাঁহার পাঁচ-সাতটা বিবাহ জুটিয়া থাকে। তা'ছাড়া, তাঁহার নিজের মুখেরই শুনা কথা, তাঁহার প্রত্যেক শ্বশুর-বাড়ীর বিদায় (যখনই যাইবেন, তখনই) অন্ততঃ [illegible] এক

মোহরের কম নয়! এই সকল নানা উপায়েই মুখোপাধ্যায় মহাশয় বেস সুখ-স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করেন। বিশেষতঃ তাঁহার সংসারের খরচও তো বেশী নয়!—যদিও স্ত্রীভাগ্য তাঁহার শতাবধিরও উপর, কিন্তু তাহার মধ্যের বাছাই-করা একটীর অধিককে তো কখনও অন্ন দিতে হয় না!

শুভ আশ্বিন-মাসের প্রারম্ভ। শ্রীশ্রী৺ শারদীয়া পূজা সন্নিকট। শ্বশুর-বাড়ীর বার্ষিক বৃত্তি আদায়ের জন্য ইতিপূর্ব্বেই—ভাদ্রমাসের প্রথমেই, মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাড়ী হইতে রওনা হইয়াছিলেন। অনেক গ্রাম ঘুরিয়া—অনেক শ্বশুরবাড়ীর দর্শনী আদায় করিয়া, এখন তিনি বলাগড়ের বাঁড়ুয্যেদের বাড়ী তাঁহার সেই নববিবাহিতা স্ত্রীকে দেখিতে যাইবেন, স্থির করিলেন। বাঁড়ুয্যেরা খুব বর্দ্ধিষ্ঠ লোক—তাঁহাদের বাড়ীর দুর্গোৎসবেও খুব জাক-জমক হয়। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তথায় গমনের সেও এক উপলক্ষ বটে; কিন্তু বেশী উপলক্ষ,—সেই স্ত্রীটীকে দেখিয়া-শুনিয়া পছন্দ করিয়া, একরূপ পাওনা-গণ্ডা দান-পাণ কিছু না লইয়াই, বিবাহ করিয়াছিলেন! আর, লোকেও বলে,—সেই স্ত্রীকেই তিনি বেশী ভাল বাসিতেন; এমন কি, পূজার সময় অন্য পাঁচ যায়গা হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়া, অনেকটা এদানী সেই স্ত্রীরই চরণে পুষ্পাঞ্জলী-স্বরূপ প্রদান করিতেন। যাইহোক, সে সব আমাদের শুনা কথা! সুতরাং সে সব কথার ততটা আলোচনার প্রয়োজনও নাই। তবে কথাটা এই, যে বৎসরের কথা আমরা বলিতেছি, সেবার তিনি ঐ শ্বশুর-বাড়ীই যাইতেছেন।

নবদ্বীপ হইতে আস্‌পাশের কয়েকখানা গ্রাম ঘুরিয়া, কালনা পর্য্যন্ত তিনি হাঁটিয়াই যাইবেন, স্থির করিয়াছিলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে দিবা আন্দাজ দ্বিপ্রহরের সময়—এখন তিনি পারের নৌকায় মুজাপুরের খাল পার হইলেন। পার হইবার সময়ই, তাঁহার সঙ্গে একটী ভদ্রবেশী বাবুর পরিচয় হইল। বাবুটির সঙ্গে একজন মুটে একটা ব্যাগ লইয়া যাইতেছে; আর মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিজের ব্যাগটী নিজেই হাতে করিয়া চলিয়াছেন। এইরূপে কিছুদূর চলিতে চলিতে, বাবুটিতে ও মুখোপাধ্যায় মহাশয়ে—দুজনে বড়ই আপ্যায়িত হইতে লাগিল। অধিক কি, বাবুটির সাদর-সম্ভাষণে মুখোপাধ্যায় মহাশয় বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন এবং ক্রমে জিজ্ঞাসা করায়, তাঁহার আত্ম-পরিচয় দিয়াই, বলিলেন,—"এই আষাঢ়ে বলাগড়ের শ্বশুরবাড়ী যাইব। হরগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যাকেই আমি বিবাহ করিয়াছি।"

"ও আপনি—আপনি! মেসো মহাশয়—মেসো মশা'য়!"—এই বলিতে বলিতে বাবু অমনি মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে যাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন; এবং পরক্ষণেই আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"মেসো মহাশয়, আ আজ আপনাকে দেখিয়া বড়ই খুসী হইলাম আপনার সহিত যে আমার আর সাক্ষাৎ হইবে এ আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। যাইহো ঈশ্বরের অনুগ্রহ বলিতে হইবে যে, আজ আ নার দর্শন পাইলাম। আপনাকে সঙ্গে ল আজ বাড়ী যাইতে পারিলে, মা ও দাদা মহা যে কত সন্তুষ্ট হইবেন, তাহা আর বলিব কি

মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহাতে আরও একটু গলিয়া গেলেন। বাবুটিকে পরিচয় আর জিজ্ঞাসা করিবেন কি, একেবা তাঁহাকে বলিতে হইল,—"তুমিই রামম পুত্র! ভাল—ভাল! যা'হোক বাছা, এ সকল সংবাদ মঙ্গল তো! কাজকর্ম্ম চলিতে তো ভাল!"

"হাঁ সব ভাল—কাজকর্ম্মও আজ চলিতেছে ভাল!"—এই বলিয়াই, ব

অমনি আবার আপ্যায়িত আরম্ভ করিলেন; লিলেন,—"তবে ভালই হইল। কালনা র্য্যন্ত গিয়া আর নৌকা করার কোন য়োজন নাই। আমি এইখান হইতেই নৌকা রিতেছি। আপনাকে এতদূর হাঁটাইয়া ইয়া যাইলে, দাদামহাশয় ও মা বড়ই ইবেন। সুতরাং এইখানেই নৌকা করা টিক"—এই বলিয়া তাড়াতাড়ি তিনি নৌকা করিতে ঘাটের ধারে নামিলেন। খোপাধ্যায় মহাশয় ভাবিলেন,—ভালই ইল। এতটা রাস্তা আর হাঁটিয়া যাওয়াও কর। বিশেষতঃ 'যা' শত্রু পরে পরে' য়াতেই, তাঁহার আনন্দটা কিছু অধিক ইল। কালনায় যাইয়া তাঁহার নিজেকেই া ভাড়া দিয়া নৌকা করিতে হইত; ট বিনা পয়সায় কালনার ছয়-সাত ক্রোশ র্ত্ত হইতেই তিনি নৌকা পাইতেছেন। রাং এ কি অল্প লাভ! অধিকন্তু এ একজন বার সঙ্গী পাইলেন।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় মনে মনে এইরূপ আনন্দভাব প্রকাশ করিতেছেন, এমন ই বাবুটি সত্বর ৩৲ চারি টাকা ভাড়ায় খানি নৌকা স্থির করিয়া আনিলেন। নৌকা করিয়াই ডাকিলেন,—"মেসো মশায়, ার মুটেটাকে সঙ্গে ক'রে আপনি আসুন।" ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় যাইলেন। বাবুটিও র হাত হইতে ব্যাগটাকে নৌকার উপরে য়া লইলেন। দুই আনার পয়সা পাইয়া বিদায় হইল।

নৌকাতে উহাঁদের আলাপটা আরও তে লাগিল। এ-কথা সে-কথায় নানা গুজব আরম্ভ হইল। নানা দেশ-বিদেশের নানা রাজা-রাজ্যের বিবরণ, কত যুদ্ধ-মার বর্ণনা—এই সকল কহিয়া, বাবুটি মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে আশ্চর্য্যান্বিত লাগিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও একাগ্রমনে সকল শুনিতে লাগিলেন; আর কেবল তামাকু ফুঁকিতে ফুঁকিতে মধ্যে-মাঝে একটা-আদটা সায় দিয়া চলিলেন।

এইরূপে সন্ধ্যার সম-সম-কালে নৌকা কালনার ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন, তাঁহাদের কিছু জলপানের আবশ্যক! কিন্তু কালনায় নৌকা পৌঁছিবার একটু পূর্ব্বে হইতেই, বাবুটি "গা কেমন করিতেছে—গা বমি বমি করিতেছে" এইরূপ বলিয়া, শুইবার যোগাড় করিতেছিলেন। এখন, কালনায় নৌকা আসিয়া থামিবার পূর্ব্বেই, তাঁহার কাতরতা-ভাবটা যেন একটু বেশী বেশীই দেখাইয়া, শুইয়া পড়িলেন। আর, মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন,—"মেসো ম'শায়, আমি তো এখন আর উঠিতে পারিতেছি না। উঠিলেই বমি হইবে। আর খাবারও তেমন কিছু ইচ্ছা নাই। তবে আপনি যদি অনুগ্রহ ক'রে উপর থেকে আপনার মত খাবার-টাবারটা কিনে আনেন, তবে বড়ই ভাল হয়! আমি নৌকা আগলাইয়া একটু শুইয়া থাকি।"—এই বলিয়াই, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তে একটী টাকা প্রদান করিলেন। টাকাটি পাইয়াই মুখোপাধ্যায় মহাশয় পরম সন্তুষ্ট হইলেন; এবং বলিলেন,—"আচ্ছা বাপু, তবে তাই হোক! আমিই খাবার লইয়া আসিতেছি। তুমি কি খাবে, বল!"

"আমার আর কিছুই খেতে ইচ্ছে নেই! আপনার মত যা দরকার হয়, তাই আনিবেন। তবে নিতান্তই যদি আনিতে পারেন, তাহা হইলে আমার জন্য একটা 'ডাব' আনিবেন। না পারেন, তাহাতেও ক্ষতি নাই। আমার কিছুই খাইতে ইচ্ছা নাই।"—বাবুটি এই বলিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে বিদায় দিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তখনও আর কিছুই ভাবিবার অবসর হইল না। পরের পয়সায় আহার-আগমন সকলই চলিতেছে, ইহাতেই

তিনি আনন্দে আটখানা! তিনি আপন মনেই বাজার করিতে চলিয়াছেন!

এদিকে তিনিও তীর হইতে উপরে উঠিয়াছেন, বাবুও ব্যাগ-দু'টাকে একত্র করিয়া বাঁধিলেন। ব্যাগ-দু'টা একখানা মোটা চাদরে জড়াইয়াই, তিনি নৌকার মাঝিকে বলিলেন,—"নাহে বাপু, আমার শরীরটা দেখিতেছি, ক্রমেই খারাপ হইতেছে। আজ আর আমাদের বলাগড়ে তবে যাওয়া হয় না! তা' তোমাদের যখন ভাড়া করেছি, তখন পুরো ভাড়াই তোমাদের দিতেছি। তোমরা আমায় নামাইয়া দিয়া চলিয়া যাও। অসুখ-বিসুখ হইলে এখানে তবু ডাক্তার-বৈদ্য পাওয়া যাইবে? নহিলে কোন্ মাঠে পড়িয়া এখন মারা যাইব? বিশেষ এই রাত্রিকালে! যাইহোক, তোমরা এই তোমাদের ভাড়ার টাকা কটা নেও—আমি উপরে একটা বাসা নিইগে। তারপর মেসো ম'শায় বাজার ক'রে এলে, সেইখানেই আজ থাক্‌বো। কাল আবার, ভাল থাক্‌লে, যা'হয় হবে; অপর নৌকা দেখেই যাওয়া যাবে।" এই বলিয়াই বাবুটি মাঝিদের হাতে পুরা পুরি চারিটি টাকা প্রদান করিলেন।

মাঝিরা তো পরম আপ্যায়িত! তাহাদের একটা রোজ বাঁচিয়া গেল, অথচ পুরা ভাড়া পাইল, এ অপেক্ষা আর কি হইতে পারে? বিশেষতঃ সেই রাত্রেই তাহারা বাড়ী ফিরিতে পারে! কাজেই তাহারাও আর দ্বিরুক্তিটি না করিয়া, বাবুর ব্যাগ দু'টিকে তীরে উঠাইয়া দিয়া নৌকা ছাড়িল। যা'বার সময় কেবল বলিয়া গেল,—"দাদা ঠাউর, তবে পরণাম। আমরা চল্‌লাম।" বাবুও আর কোন উত্তর দিলেন না। মাঝিদের নৌকা কালনার ঘাট ছাড়িয়া আবার মৃজাপুরের দিকে চলিল। সুবাতাস পাইয়া তাহারা নৌকায় পাল তুলিয়া দিল। নৌকা সবেগে উত্তর-মুখে চলিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে বাবুও সটান অন্তর্ধ্যান! আর তাঁহাকে কে পায়? আস্তে আস্তে তীরে উঠিয়াই, তিনি সেই ব্যাগের মোটটিকে লইয়া গ্রামের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। যথাসময়ে নির্দ্দিষ্ট বাসায় গিয়া পৌঁছিতেও তাঁহার আর আটকাইল না।

* * * *

ক্রমে মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঘাটে ফিরিলেন। তাঁহার এক হাতে এক ভাঁড় দধি, অপর হাতে একটা ডাব!—গলায় কাপড়ে-বাঁধা চিড়া মুড়কি-সন্দেশ! দ্রব্যাদি লইয়া তিনি কতকটা বিব্রত অবস্থাতেই ঘাটে আসিয়া উপস্থিত। কিন্তু কি আশ্চর্য্য!—ঘাটে তাঁহাদের সে নৌকই? তিনি দেখিলেন, যেখানে তাঁহাদের নৌকাখানা বাঁধা ছিল, সেখানে বড় বড় খান দশেক মহাজনী নৌকা পাশাপাশি করি ভিড়িয়াছে। সুতরাং ভাবিলেন, তাঁহাদে নৌকাখানা তবে সে ঘাটের ধারে স্থান পাইয়া একটু অন্তরালে গিয়া পড়িয়াছে কাজেই তিনি প্রথমে—"ও আমাদের নৌক মাঝি—ও আমাদের নৌকার মাঝি!"—এই রূপ চীৎকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহা কে সাড়া দিবে? সেখানকার সে মহাজ নৌকার মাঝি-মাল্লারা তো সে ডাক কানে লইল না! আরও ঘাটে তখন কএকখা নৌকার সেই টিমটিমে আলোক ভিন্ন তে আলোকও না থাকায়, চারিদিকে সমানভা তাঁহার দৃষ্টিও চলিল না। কাজেই অবশে নিরুপায় হইয়া, তিনি সেই ঘাটের ধারে বলিয়া চেঁচাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন, "ওহে, আমি কার মেসো ম'শায়—আমি মেসো ম'শায়!"

কিন্তু সে কথায় তখন আর কে দিবে? বরং তিনি যতই "আমি কার ম ম'শায়—আমি কার মেসো ম'শায়" বলি চেঁচাইতে লাগিলেন, ঘাটের লোকে তাঁহা ততই পাগল বলিয়া স্থির করিয়া লইল।

কেহবা বিদ্রূপ করিয়া, তাঁহার পাছু পাছু হাততালি দিয়া হাসিতে লাগিল।

আর, বাস্তবিকও মুখোপাধ্যায় মহাশয় তদবধি পাগল। আজকাল প্রায় পঁচাত্ত বৎসর তাঁহার বয়স হইতে চলিল; কিন্তু এখনও তাঁহার মুখে সদাই সেই রব,—"আমি কার মেসো ম'শায়—আমি কার মেসো ম'শায়!"

ঠগী-কাহিনী।

(ঠগের নিজের মুখে শুনিয়া)

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

"অবশেষে পিতা আমায় বলিলেন,—'পুত্র, পাপীষ্ঠ ব্রজলাল আমার সহিত যেরূপ দুর্ব্ব্যবহার করিতেছে, তাহাতে আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। কিন্তু আমার অভিশাপে ঈশ্বরের নিকট উহাকেও সত্বর ইহার প্রতিফল পাইতে হইবে।'

"আমি তখন পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'পিত, আপনার সহিত ব্রজলালের কিসের বিবাদ? সে আপনাকে কি জন্য এত কষ্ট দিতেছে?'

"পিতা বলিতে আরম্ভ করিলেন,—'পুত্র, তবে বলিতেছি, শুন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, তোমার যখন অতি শৈশব অবস্থা, সেই সময়, জয়সুকদা নামক আমাদের গ্রামের একজন সওদাগরের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার পরিবারবর্গকে আমার হস্তে অর্পণ করিয়া অনুরোধ করিয়া যান যে,—আমি যেন তাঁহাদিগকে ব্রজলালের অত্যাচারের হস্ত হইতে রক্ষা করি। কারণ, তাঁহার মানহানির অভিপ্রায়ে ব্রজলাল তাঁহাকে কি গালি দেওয়ায়, তিনি প্রকাশ্য দরবারে ব্রজলালকে জুতা মারিয়াছিলেন; এবং সেই অপমানের প্রতিশোধ-বাসনা ব্রজলালের মনে মনে গাঁথা ছিল। সেজন্য, ব্রজলাল মধ্যে মধ্যে তাঁহার সর্ব্বনাশের চেষ্টা পাইত; রাজদরবারে তাঁহার শত্রুতা করিত; এবং সর্ব্বদা তাঁহাকে ভয় দেখাইত যে, তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া তাঁহাকে কারাবদ্ধ করিবে। যাইহোক, অবশেষে সওদাগরের মৃত্যু হইল; এবং তিনি তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে আমাকে বলিয়া গেলেন যে, আমি যেন তাঁহার স্ত্রীপরিবারবর্গকে সমস্ত ধনসম্পত্তির সহিত 'মারবারে' পাঠাইয়া দিই। তাঁহার মৃত্যুর পর, যত সত্বর সম্ভব, আমিও তাহাই করিলাম।

'এই ঘটনার সপ্তাহ অতীত হয় নাই, এমন সময় একদিন ব্রজলাল ও তাহার একজন সহকারী আমাদের গ্রাম আসিয়া উপস্থিত হইল; এবং প্রকাশ করিল যে,—তাহাদের উপরিতন কর্ম্মচারী পেস্কার নারায়ণ পণ্ডিতের নিকট হইতে তাহারা আদিষ্ট হইয়া জয়সুকের সমস্ত সম্পত্তি ও তাঁহার পরিবারবর্গকে দরবারে ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছে। কিন্তু পেস্কারের লিখিত কোন আদেশ তাহারা দেখাইতে পারিল না। কাজেই আইনসঙ্গত কোন কারণ দেখিতে না পাইয়া, আমিও জয়সুকের পরিবারবর্গের বা তাঁহার মৃত্যুর কোন সংবাদই তাহাদিগকে প্রদান করিতে অস্বীকৃত হইলাম। ব্রজলাল আমাকে তখন ভয় দেখাইতে লাগিল; এবং এরূপ অকথ্যভাবে গালি দিতে লাগিল যে, আমিও আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। সে গালাগালিতে আমিও তখন ব্রজলালকে জুতা মারিতে মারিতে গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলাম। গ্রামের নিষ্কর্ম্মা বালকগণও কাদা ও ঢিল ছুড়িয়া তাহার প্রতি পাগলের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিল।

'ইহার পর ব্রজলালের আর কোন কথাই শুনি নাই। তবে আমি এইমাত্র জানিয়াছিলাম যে, ব্রজলাল রাজ-দরবারে আমার বিষম শত্রু

করিতেছে। কারণ, ইহার পর হইতে আমার প্রতিবেশীগণের নানা অত্যাচার ও দুর্ব্ব্যবহারের বিষয় জানাইয়া—তাহারা বলপূর্ব্বক আমার জমি কাড়িয়া লইতেছে ও মাঠ হইতে আমার শস্যাদি লুণ্ঠন করিয়া লইতেছে বলিয়া—আমি রাজ-দরবারে যতই অভিযোগ করিয়াছিলাম, তাহার সকলগুলিই বৃথা হইয়াছিল। অবশেষে অত্যাচার এতদূর বিরক্তিকর হইয়াছিল যে, আমি রাজদরবারে প্রতিনিধি পাঠাইয়া সকল কথা জানাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। কিন্তু সে সকলই বৃথা!—সকল কাজেই ব্রজ-লাল আমার লোকদিগকে বাধা দিতে লাগিল। আমি পেটেল-পদের অপব্যবহা-কারী বলিয়া রাজ-দরবারে প্রতিপন্ন হইলাম; ব্রজলাল আমার পরিবর্ত্তে আর একজনকে প্রকৃত পেটেল বলিয়া স্থির করাইল; এবং তাহাকে এতদূর পর্য্যন্ত সাহস-প্রদান ও সহায়তা করিতে লাগিল যে, আমার লোকজন অবশেষে ভীত ও হতাশ্বাস হইয়া ফিরিয়া আসিল।

'এই সময় হইতে, প্রায় এই পাঁচ বৎসর কাল, প্রতিনিয়তই নাগপুরস্থ আমার কোন বন্ধুর নিকট হইতে আমি নানা আশঙ্কার সংবাদ পাইতেছিলাম। বন্ধু আমাকে সর্ব্বদাই সাবধান থাকিতে বলিতেন; গ্রামে কোন অপরিচিত লোককে প্রবেশ করিতে দিতে নিষেধ করিতেন; এবং বিশিষ্টরূপ লোকজন না লইয়া কোথাও যাইতে বারণ করিতেন। আমিও এতদিন পর্য্যন্ত এই সকল বিষয়েই লক্ষ্য রাখিয়া চলিতেছিলাম। কিন্তু এত সতর্কতা-সত্ত্বেও, আমরা এখন আবার দুরন্তের গ্রাসে পতিত হইয়াছি। ভগবান আমাদিগকে এ বিপদ হইতে কি আর উদ্ধার করিবেন না?'

"পিতার নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ শুনার পর, কএক দিন আর দুরন্তের সাক্ষাৎ পাইলাম না। ভাবিলাম, এই পর্য্যন্তই বা আমাদের দুর্দ্দশার চরম! কিন্তু কি বিধিনিগ্রহ!—অবশেষে একদিন দুরন্তেরা আবার সেই কারাগৃহে আসিল; আবার আমার পিতাকে নানারূপে কষ্ট দিতে লাগিল। পিতা কিন্তু তখনও কোন সংবাদ তাহাকে প্রদান করিলেন না। বরং বলিলেন,—'কাফের তুই, আমাকে হত্যা করিবি, তোর এমন সামর্থ্য কি? কিন্তু আমি যদি কখনও কারামুক্ত হই, তবে দেখিস, তোর কি করি! তোকে এখনও বলিতেছি, তুই সাবধান!'

"পিতার এ ভয়-প্রদর্শনে ব্রজলাল একটু হাসিল; এবং পরক্ষণেই আবার আমাদিগের নিকট হইতে প্রস্থান করিল।

"প্রায় তিন মাস কাল আমাদিগকে সেই কারাগৃহে বাস করিতে হয়। এই সময় এক জন সহৃদয় সৈনিক প্রহরী আমাদিগের এই অবিচারে ব্যথিত হইয়া আমার পিতার লিখিত একখানি আবেদন-পত্র নাগপুরের একটী প্রসিদ্ধ সওদাগরের নিকট প্রদান করিয়া আসেন। পূর্ব্ব হইতেই ঐ সওদাগরের সহিত আমার পিতার পরিচয় ছিল; এবং পিতার এই কারাবাসের পর হইতে তিনিই আমাদের গ্রামের রাজস্বাদি সংগ্রহ করিতেছিলেন। সুতরাং সে আবেদন-পত্রে স্বতঃই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষিত হইল। আমাদের এই দুরবস্থার বিষয় শুনিয়া তিনি বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; এবং সত্বরই আমাদের উদ্ধারের উপায় অবলম্বন করিলেন। কিন্তু তখন কি আর আমাদের উদ্ধার সহজ? কাজেই সে কার্য্যে তাঁহাকেও বড়ই বেগ পাইতে হইল। অবশেষে তিনি নাগপুরের প্রধান সওদাগরের সহায়তায় স্বয়ং রাজ-প্রতিনিধির নিকট আমাদের প্রার্থনা জ্ঞাপন করাইলেন। * * * * এই প্রার্থনায়, ব্রজলালের সহিত অনেক তর্ক-বিতর্কের পর, বিচারে আমরা অব্যাহতি পাইলাম। পিতা তখন সেই সওদাগরদিগকে অন্তরের ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন; এবং আমিও তদবধি তাঁহাদের নিকট চির-কৃতজ্ঞ রহিলাম। যাইহোক, তাঁহারা কিন্তু তদবধি পিতাকে সাবধানে থাকিতে বলিলেন। আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া ক্রমে স্ব-গ্রামে প্রত্যাগত হইলাম।

"আমাদের প্রত্যাগমনের পর হইতেই, পূর্ব্ব-কথিতমত বাস্তবিকই আমাদের গ্রামে নানা নূতন নূতন লোকের আগমন আরম্ভ হইল। সে সকল দেখিয়া, আমরাও পিতাকে নানারূপে সতর্ক রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পিতা আমাদের কোন অনুরোধই গ্রাহ্য করিতেন না। তিনি যখন-তখন মাঠে যাইতেন; সন্ধ্যার পরও বাহিরে থাকিতেন। অপরিচিত লোক দেখিলে তিনি আবার ডাকিয়া কথা কহিতেন; এবং রাত্রি-পর্য্যন্তও নিঃশঙ্কচিত্তে তাহাদের সহিত বেড়াইতেন। আমার জননী কিন্তু ইহাতে বড়ই ব্যগ্র ও ভীত হইয়াছিলেন; এবং কোনরূপে পিতাকে নিরস্ত রাখিতে না পারিয়া, অবশেষে আমাকেই সর্ব্বদা পিতার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে বলিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় মাঠ হইতে পিতাকে আমি বাড়ীতে না আনিয়া আর নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম না। এইরূপেই অনেক দিন কাটিয়া যায়। কিন্তু এক দিন রাত্রিতে, এক সর্ব্বনাশী রজনীতে—হায় হায়! কেন সে রাত্রির আর প্রভাত হইল—কার্য্যগতিকে মাঠ হইতে আমাদিগের ফিরিতে বিলম্ব হইল।

"ফিরিবার সময়, কতক পথ পার্শ্বস্থ কএকখানি গ্রামের লোককে আমাদের সঙ্গী পাইয়াছিলাম। কিন্তু খানিক দূর আসিয়াই, বাড়ী হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তরে, তাঁহারা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব গন্তব্য পথে চলিয়া গেলেন। পিতাকে তখন আমি সদর রাস্তা দিয়া প্রত্যাগমন করিতে অনুরোধ করিলাম। কিন্তু সে রাস্তায় চলিলে যাইতে বিলম্ব হইবে বলিয়া, তিনি সে পথে চলিতে স্বীকৃত হইলেন না। কাজেই তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সেই অন্ধকারাবৃত সঙ্কীর্ণ পথ দিয়াই আমাদিগকে চলিতে হইল। এখন, নিয়তি কে লঙ্ঘন করিতে পারে? ভগবান যাহাকে মারিবেন, মানুষের সাধ্য কি যে তাহাকে সাবধান করে? যাইহোক, এইরূপে আমরা সেই অপরিস্কৃত বন্য পথ দিয়া যাইতেছি, এমন সময় বনের এক পার্শ্ব হইতে বন্দুকের 'ম্যাচের' ন্যায় কি এক পদার্থ আমার দৃষ্টিপথে চমকিতে দেখিলাম। দেখিয়াই, শশঙ্কিত অবস্থায় পিতকে বলিলাম,—'দেখুন, আমরা নিশ্চয়ই বিপথে আসিয়াছি। ঐ দেখুন, বন্দুকের 'ম্যাচের' ন্যায় তিনটা আলো দেখা যাইতেছে।' পিতা একটু বিরক্ত হইয়া তাহাতে বলিলেন,—'নির্ব্বোধ! ওটা জোনাকি। এতেই তোর ভয়? আমার পুত্র হইয়া তুই এত ভীরু?'

"পিতা এই পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, এমন সময়ই আমাদের নিকট 'গুম' 'গুম' 'গুম' করিয়া তিনটা শব্দ হইল। পিতার মুখে আর কোন কথাই বাহির হইল না—তিনি সেই শব্দমাত্রেই হতচৈতন্য হইয়া ভূমিশায়ী হইলেন। আমিও আমার পৃষ্ঠদেশ এবং পদদ্বয়ে বিষম বেদনা পাইয়া উত্থান-শক্তি-বিরহিত অবস্থায় শুইয়া পড়িলাম। তবে আমার কিন্তু তখনও সংজ্ঞা থাকিল। আমি ক্রমে দেখিলাম, তিনটা লোক তিনখানা তরবারি হস্তে করিয়া তখন সেই বন হইতে বহির্গত হইল। একজন প্রথমেই আমার নিকট আসিয়া আমার মুখ ও পৃষ্ঠদেশ বেস করিয়া দেখিল; এবং আমি যে পিতা নহি তাহা বুঝিয়া, আমায় ফেলিয়া, পিতার দেহের দিকে ছুটিল।, বিশেষতঃ আমি এই সময় ইচ্ছা করিয়া চক্ষু

বুজিয়া থাকাতেই, তাহারা আমায় মৃত বলিয়াই মনে করিয়াছিল। অবশেষে তাহাদের একজন পিতার নিকট যাইয়াই, বোধ হয় তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিয়াই, চীৎকার করিয়া বলিল,—'আহমুদুল্লা, আজ ঠিকই কৃতকার্য্য হইয়াছি। প্রভু এ সংবাদে এবার আমাদের বড়ই খুসা করিবেন।' ইহার পরই তাহারা বলিল,—"তবে আর বিলম্ব করায় প্রয়োজন নাই। এখন যত সত্বর নাগপুর পৌঁছিতে পারি, ততই মঙ্গল। ঘোটকও সজ্জিত হইয়াছে।'

"আমি আর অধিক কিছুই শুনিতে পাইলাম না। ক্রমেই আমি পীড়িত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলাম; এবং আমাকে অচৈতন্য হইতে হইল। ক্ষত-স্থানের যাতনা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইল; আমি ক্রমেই কাতর হইতে লাগিলাম; রাত্রির শীতলতায় ক্রমেই আমার চলৎশক্তি রহিত হইল। আমি একবার আমার পিতার পতিত দেহের নিকট গমন করিয়া তাঁহার অবস্থা দেখিব মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু আমার ক্ষমতায় তাহা কুলাইল না। আমি সেইখানে পড়িয়াই যাতনায় ছটফট করিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ পরে কতকগুলি মনুষ্যের পদশব্দ আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। তাহারা বন্দুকের আওয়াজ করিয়া যেন আমাদের সাড়া লইতে লাগিল। আমি বুঝিলাম; কিন্তু চীৎকার করিয়া ডাকিবার সামর্থ্য আমার নাই। পদদলিত সর্পের মত শুইয়া পড়িয়া আমি আর করিব কি? আমি ক্ষণে ক্ষণে জ্ঞানহারা হই, এবং ক্ষণপরেই আবার একটু চৈতন্য হয়—যেন একবার মরিতেছি, আর একবার বাঁচিতেছি! ফলতঃ সে সময় আমি যে কিরূপ কষ্টে কালাতিপাত করিতে লাগিলাম, তাহা বর্ণনাতীত। যাইহোক, অবশেষে সেই সকল লোক মসাল হস্তে করিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে আমাদের নিকটই উপস্থিত হইল। নিকটে আসিলেই আমিও তাহাদিগকে আমাদিগের প্রতিবেশী বলিয়া চিনিলাম। তাহারা সন্ধ্যা হইতে আমাদের অন্বেষণ করিতেছিল; এবং অবশেষে খুঁজিতে খুঁজিতে আমাদের পাইয়াছে। পিতাকে দেখিয়া তাহারা তো চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে আমারও অশ্রু অনিবার্য্য হইল। অতঃপর তাহারা একখানা তক্তার উপর আমাকে শুয়াইয়া বাড়ীর দিকে লইয়া চলিল।

"বাড়ীতে পৌঁছিয়াই যে শোক-দৃশ্য দেখিলাম, বুঝি মরিলেও তাহা আর ভুলিব না! দেখিলাম, আমার স্নেহময়ী জননী বক্ষে করাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছেন; আমার অভাগিনী ভগিনী পিতাকে ডাকিতেছে, আর হা-হুতাসে কাঁদিতেছে। তাঁহাদের ক্রন্দন দেখিয়া—তাঁহাদের সে শোক-স্বর শুনিয়া, আমার বক্ষঃস্থল যেন আরও বিদীর্ণ হইতে লাগিল। জননী যখন জ্ঞানহারা উন্মাদিনীর মত "সর্ব্বনাশ হইল—সর্ব্বনাশ হইল" বলিতে বলিতে পিতার চরণপার্শ্বে লুণ্ঠিতা হইয়া পড়িলেন, তখনকার সে দৃশ্য কি আর চক্ষে দেখা যায়? ভগিনীর ক্রন্দন, জননীর হাহাকার, প্রতিবেশীগণের আক্ষেপ—এ সকলে ক্রমে আমি আরও কাতর হইয়া পড়িলাম।

"অবশেষে সকলের দৃষ্টি তখন আমার উপর পড়িল। কিরূপ সুশ্রূষায় আমার তখন জীবন-রক্ষা হয়, তাহারই আয়োজন হইতে হইতে লাগিল। হাকিম আসিল; আমার চিকিৎসা চলিতে লাগিল। নানা লোকে নানা কথা কহিয়া, হত্যাকারীদিগকে স্থির করিতে লাগিল। আর, সেই সঙ্গে সঙ্গে পিতার মৃত দেহের সমাধি-কার্য্যেরও আয়োজন হইতে লাগিল। সে শোক-দৃশ্য কিছুদিনের

জন্য, নিয়তির নিয়মে, সকলকেই বিস্মৃত হইতে হইল।

"এইরূপেই দিন যায়। আমিও ক্রমে সারিয়া উঠিলাম। হত্যা-সন্দেহ নানা লোকের প্রতি হইয়াছিল। কিন্তু অবশেষে ব্রজলালকেই এ ব্যাপারের সর্দ্দার বলিয়া সকলের স্থির-ধারণা হইল। আর, তাহার নানা প্রমাণও পাওয়া গেল। আমাদের মনের যাতনা মনেই রহিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, পাপীষ্ঠ ইহাতেও নিশ্চিন্ত হইল না। অতঃপর সে একজন নূতন লোককে গ্রামের পেটেল-পদে অভিষিক্ত করিয়া গ্রাম হইতে আমাদিগের উচ্ছেদের জন্য চেষ্টা পাইল। দিন দিন আমাদের উপর দিয়া নানা অত্যাচার-অবিচার চলিতে লাগিল। গ্রামের লোকজনও তাহাতে বাধা দিয়া কিছুই করিতে পারিলেন না। অধিক কি, অবশেষে অত্যাচার এতই বৃদ্ধি পাইল যে, আমাদিগকে গ্রাম ত্যাগ করিতে হইল। মনের দুঃখ মনে চাপিয়া, আমি তখন আমার ভগিনীকে তাহার শ্বশুর-বাড়ী পাঠাইয়া দিলাম; এবং জননীও তাহার অনুগামিনী হইলেন। আর আমি!—আমি তাহার পর আমাদের পৈত্রিক সম্পত্তি উদ্ধারের বৃথা চেষ্টা দিন-কএক পাইয়া ও অবশেষে তাহাতে হতাশ্বাস হইয়া, এই ঠগীদলে আসিয়া যোগ দিলাম। এখন আর আমার জননী ইহলোকে নাই; অনেক দিন হইল, তিনি আমার পিতার পার্শ্বে স্বর্গে গমন করিয়াছেন। তবে ভগিনী এখন স্বামীপুত্রাদি লইয়া সুখে কালাতিপাত করিতেছে। ঈশ্বর তাহাকে সেইরূপ সুখেই চিরদিন রাখুন। ভগিনীকে আমি মধ্যে মধ্যে দেখিয়া আসি। সে জানে, আমি হোলকার-রাজ্যে সৈন্যের পদে অভিষিক্ত আছি।

"এখন, ধন্য ভগবানের লীলা—আমাদের এতদিনের প্রতিহিংসা কল্য রাত্রিতে নিবৃত্ত হইয়াছে। কল্য রাত্রে আমার ঠগধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার সার্থকতা হইয়াছে—কল্য আমি পূর্ণমনস্কাম হইয়াছি। সেই আমার পিতৃ-হন্তা দুরন্ত ব্রজলালই কাল সপরিবারে আমারই হস্তে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে। কাল যাহাকে সপরিবারে হত্যা করিয়াছি, সেই-ই আমাদের চির-শত্রু, সেই আমাদের সর্ব্বনাশকারী, সেই আমাদের সোণার সংসার ধ্বংশ করিয়াছে। আমি এতদিনে তৃপ্ত হইলাম; এতদিনে আমার জন্ম সার্থক—এতদিনে আমার কর্ম্ম সফল। জীবনের কর্ত্তব্য আমার আর কিছুই নাই; যাহা ছিল, আজ তাহার শেষ হইল। মৃত্যু-শয্যায় শুইয়া আমি যে প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়াছিলাম, আজ আমার তাহা পালন হইল।"

এই বলিয়া মহম্মদ চুপ করিলে, আমাদের দলস্থ সকলেই চমকিত হইলেন; এবং সকলেই মহম্মদের পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত শুনিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

বিশ্বাসে মিলায় হরি তর্কে বহুদূর।

একদা এক পণ্ডিতের মনে উদয় হইল,—ঈশ্বর আছেন কি না এবং তাঁহার স্বরূপ কি, ইহা আমাকে জানিতে হইবেই হইবে। সাধু উক্তি এবং শাস্ত্র-বাক্যের উপরে বিশ্বাস করিয়া অন্ধের মতন ঈশ্বর ঈশ্বর করা, মহা অজ্ঞানের কার্য্য। ইহা আমি কখনই করিব না। যদি ঈশ্বরকে কখন প্রত্যক্ষ করিতে পারি, তবেই তাঁহাকে বিশ্বাস করিব। নচেৎ এ জীবনে উপাসনা আরাধনা কখনই করিব না।

এইরূপ দৃঢ় পণ করিয়া, পণ্ডিত ঈশ্বর-অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, অকাতরে কাটিয়া যাইতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই ঈশ্বরের স্বরূপ নিরূপণ হইল না। নানা

তর্কে, নানা বিচারে, নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া, পণ্ডিত দিন দিন পরিশ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার আহার-নিদ্রায় কিছুতেই সুখ নাই। তিনি দিবারাত্রি কেবল চিন্তায় নিমগ্ন আছেন।

তাঁহার এরূপ দশা দেখিয়া, তাঁহার সমভিব্যাহারে যে পাচক ব্রাহ্মণ ছিল, সে একদিন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল,—"মহাশয়! আপনি কেন এত চিন্তা করিতেছেন? আমি যখন আপনার নিকট আসি, তখনি আপনাকে মৌন দেখিতে পাই; আর কি জন্যেই বা আপনি এত দুর্ব্বল ও মলিন হইয়া পড়িতেছেন!"

পণ্ডিত এমনি ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছেন যে, তিনি কখনও হাসিতেছেন, কখনও কাঁদিতেছেন। পাচকের কথায় তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর করিলেন,—"তুমি কি বলিতে পার, সেই অজানিত ঈশ্বরের স্বরূপ কি, এবং তিনি আছেন কি না!"

পাচক ব্রাহ্মণ তখন কহিল,—"এ চক্ষু দিয়া তাঁহাকে দেখা যায় না, বিশ্বাস চক্ষে তাঁহাকে দেখা যায়; এবং তিনি না থাকিলে, জগৎ কোথা হইতে আসিল।"

পণ্ডিত তখন হাসিয়া পাচক ব্রাহ্মণকে কহিল। তোমার মতন মূর্খমি কথায় জগৎ নষ্ট হইয়াছে। আমি ওরূপ কথায় বিশ্বাস করি না। যদি কখনও এই চক্ষে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি, তবেই বিশ্বাস করিব। নচেৎ কল্পনার ঈশ্বরকে কখনই বিশ্বাস করিব না।"

পণ্ডিত ও পাচকে যখন কথোপকথন হইতেছিল, সেই সময়ে রাজপথ দিয়া একজন কফি-বিক্রেতা 'চাই বাঁধা কফি, চাই বাঁধা কফি' ইত্যাদি শব্দে ফিরি করিতেছিল। পণ্ডিত সেই ফিরিওয়ালাকে ডাকিয়া একটী কফি ক্রয় করিলেন, এবং তাহা পাচক ব্রাহ্মণের হস্তে দিয়া শীঘ্র শীঘ্র রন্ধন করিতে বলিলেন। পাচক ব্রাহ্মণ কফিটি হস্তে লইয়া রন্ধনশালায় গিয়া তাহার পাতা ছাড়াইতে বসিল। ইতিপূর্ব্বে পাচক ব্রাহ্মণ বাঁধাকফি কখন দেখে নাই। সে যত পাতা ছাড়ায়, ততই পাতা দেখিতে পায়। ক্রমে কফি সব ছাড়াইয়া ফেলিল, পাতা ভিন্ন অন্য কিছু দেখিতে পাইল না; তখন সে ঝুড়িতে করিয়া তাহা ফেলিয়া দিল। এবং মনে মনে কহিল,—"আজ পণ্ডিতকে ভারি ঠকান ঠকাইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে কিছুই সার নাই—কেবল পাতা।' ব্রাহ্মণ তখন অন্য অন্য ব্যঞ্জন রাঁধিয়া পণ্ডিতকে খাইতে ডাকিল। পণ্ডিত খাইতে বসিয়া যখন কফির ব্যঞ্জন দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি পাচক ব্রাহ্মণকে কহিলেন,—"ওহে, কই কফির ব্যঞ্জন আমাকে দিলে না!

পাচক ব্রাহ্মণ তখন হাসিয়া কহিল,—"কফিওয়ালা আজ আপনাকে বড় ঠকাইয়া গিয়াছে; গালে চড়টি মারিয়া পয়সাগুলি লইয়াছে।

পণ্ডিত অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন, কি হইয়াছে?"

পাচকব্রাহ্মণ কহিল,—"আর কি হবে মশাই, যত ছাড়াই, ততই পাতা। সারাংশ কিছুই দেখিতে পাইলাম না, সুতরাং ফেলিয়া দিলাম।

পণ্ডিত তখন বিরক্ত হইয়া কহিলেন,—"তুমি ত বড় আহাম্মক হে! আমার পয়সাগুলি নষ্ট করিলে! বাঁধা কফি তুমি কি কখন দেখ নাই? যাহা দেখ নাই, তাহা কেন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে না? তাহাহইলে তো নষ্ট হইত না!" এইরূপ নানা কথায় পণ্ডিত পাচক ব্রাহ্মণকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন।

পাচক ব্রাহ্মণ কহিল,—"হে মহাশয়, আপনা হইতে আমি বোধ হয় অধিক আহাম্মক নহি। কারণ, আমি না হয় সামান্য কফির পাতাকে অসার বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু আপনি জগতের সার বস্তু শাস্ত্র এবং সাধু উক্তিকে অসারবলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। আর, আমি কখন বাঁধা কফি কেমন দেখি নাই ও জানি না। অদ্য আপনার কথায় তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম, এ জীবনে আর কখন ভুলিব না। কিন্তু আপনি ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে অনেকের নিকট একই কথা শুনিয়াছেন, তথাপি এ পর্য্যন্ত বিশ্বাস করেন নাই। এক্ষণে বিবেচনা করুন, আপনা হইতেই আমি কি অধিক আহাম্মক হইলাম!"

পাচকের কথায় পণ্ডিতের চৈতন্য হইল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—সত্যই বলিয়াছ, তোমা হইতে আমি অধিক মূর্খ। কারণ জগতের সার বস্তু, সকল ধর্ম্ম পুস্তক এবং সাধু উক্তিকে অসার বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি। সকলেই আমাকে বলিয়াছেন,—বিশ্বাস কর, এবং বিশ্বাস চক্ষে দর্শন কর। কিন্তু আমি কাহারও কোন কথাই শুনি নাই। এক্ষণে আমি বুঝিয়াছি, আমি তোমা হইতে অধিক অজ্ঞান। কারণ, তুমি এক কথায় বাঁধাকফির বিষয় বিশ্বাস করিলে; কিন্তু আমি লক্ষ কথা শুনিয়াও ঈশ্বরের স্বরূপ বিশ্বাস করি নাই। আমা হইতে অজ্ঞান আর কে আছে? এক্ষণে আমি বুঝিলাম, অনন্তস্বরূপ ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গেলে, বাঁধাকফির পাতার ন্যায়, বড়র পর ছোট, ক্রমান্বয়ে কেবল পাতাই মাত্র সার হইবে। যদি ঈশ্বরের স্বরূপ জানিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে জগতের সকল বস্তুকেই তাঁহার স্বরূপ বলিয়া জানিতে হইবে। আর তিনি নিরাকার, তিনি সাকার, তিনি স্বগুণ, তিনি নির্গুণ, এটা নয়, ওটা নয়, বলিলে হইবে না।"—স্বর্গেরচাবি।

চোরের ব্রাহ্মণ-ভক্তি।

দেবীপুরের রামশঙ্কর মুখোপাধ্যায় একটু সঙ্গতিপন্ন লোক। লোকে বলে,—তাঁহার ১০।১২ হাজার টাকার তেজারতি; চাহিলে নগদও নাকি বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা দিতে পারেন। আবার কাহারও কাহারও মুখে এমনও শুনিয়াছি যে, ১৫ হাজার টাকার পর্য্যন্ত সিকি, দু-আনি, আদুলি—যা' চাও, একরূপই দিতে পারেন। গ্রামের প্রায় অনেকেই রামশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের দু-দশ টাকা ধারে; প্রতিবেশী ভগবান পরামাণিকও তাঁহার কিছু টাকা ধারিত। সুদের টাকা দিতে বিলম্ব হওয়ায় একদিন মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভগবানচন্দ্রকে কিছু কড়া-কথা শুনাইয়াছিলেন; তাহাতে ভগবান মনে মনে একটু চটিয়াছিল। এ চটাটা কিন্তু মুখোপাধ্যায়ের উপর নহে, তাঁহার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী প্রমোদাসুন্দরীর উপর। ভগবানের বিশ্বাস, তৃতীয় পক্ষের বিবাহের পর হইতেই রামশঙ্করের মেজাজ কিছু বিগ্‌ড়াইয়াছে; প্রমোদাসুন্দরীর প্ররোচনায় তিনি লোককে কটু-কর্কশ বলিয়া থাকেন। প্রমোদা নাকি তাঁর স্বামীকে বলেন যে, ভাল কথায় লোকের নিকট টাকা আদায় হয় না। আর এ কথা নাকি ভগবান নিজে তাঁহাদের বাটীর ভিতর হইতে যেদিন শুনিয়া আসে, সেই দিনই মুখুয্যে মহাশয় তাহাকে কড়া-কথা শুনাইয়াছিলেন। সুতরাং তাহার রাগটা প্রমোদার উয়রেই পড়িল, ইহার প্রতিশোধ লইবার একটু ইচ্ছাও হইল। কিন্তু কি প্রকারে লইতে হইবে, তাহার উপায় নিজের বুদ্ধিতে খুজিয়া পাইল না। গ্রামের রামহরি চৌকিদারকে সকলে বুদ্ধিমান বলিয়া প্রশংসা করিত। ভগবানের সহিত যদিও তাহার বিশেষ আত্মীয়তা ছিল না, তথাপি সে তাহার নিকট হইতে প্রমোদার অপরাধের শাস্তি—অপমানের প্রতিশোধের উপায়টা জিজ্ঞাসা করিতে মনস্থ করিল; এবং সেই দিনই রাত্রিতে রামহরি যখন গ্রামের লোককে সজাগ করিবার জন্য চৌকিদারী-হাঁকে গ্রাম তোলপাড় করিল, সেই সময়ে ভগবান, আগুণের মালসা, তামাক ও হুঁকা-কল্‌কে লইয়া সদর দরজার সম্মুখে গিয়া বসিল। অতঃপর রামহরি আসিলে, তাহাকে

ডাকিয়া সযত্নে বসাইয়া, তামাক সাজিতে আরম্ভ করিল। তামাকু সাজা হইলে, কলিকাটি রামহরির হাতে দিয়া, ভগবান গল্প আরম্ভ করিল। এ কথা সে কথার পরে মুখুয্যেদের কথা পড়িল; পূর্ব্বে তাঁহাদের সংসার কেমন ছিল, তাঁহাদের সংসারে তাহার কেমন পসার-প্রতিপত্তি, ছিল, রামশঙ্করের পিতা তাহাকে কেমন খাতিরযত্ন করিতেন —প্রভৃতি সকল কথা বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিয়া শেষে রামশঙ্করের, ও পরে তাঁহার স্ত্রীর কথা আরম্ভ করিল। প্রথমে তাঁহার বয়স, রূপ, পরে গুণের কথা; সে ছোটলোকের মেয়ে, গুমোরে পথ দেখিতে পায় না, দিনরাত্রি সাজ-গোজ পরিয়া বসিয়া থাকে; মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে না। এইবার রামহরি জিজ্ঞাসা করিল,—"আচ্ছা, খুড়ো, রামশঙ্কর মুখুয্যে কত টাকার সংস্থান করিয়াছে?" ভগবান উত্তর করিল,—"শুনিতে পাই নাকি ধারে-নগতে পঞ্চাশ হাজার টাকার সংস্থান করিয়াছে!"

রামহরি।—আচ্ছা, এই যে তুমি বল্‌ছিলে যে, তার স্ত্রী সর্ব্বদা সেজে-গুজে বসে থাকে; তা' তা'র গায়ে যে গয়না আছে, তা' কত টাকার হ'বে?

ভগবান।—আন্দাজ হাজার বার শ।

রাম।—সে গয়না কি তার গায়ে রাত্রিতেও থাকে?

ভগ।—হাঁ, থাকে বৈ কি!

এইবার চৌকিদার খুড়ো গৃহস্থের ধন-প্রাণ সুখ-শান্তি কেমন করিয়া বজায় রাখিতে হয়, তাহার কল্পনা মনে মনে স্থির করিয়া ভগবানকে বলিল,—"যদি তুমি একটু সাহায্য করিতে পার, তবে উহাদের দুইজনকেই বেশ জব্দ করিয়া দিতে পারি। প্রতিশোধ রীতিমত তো হইবেই, তাহার উপর আবার কিছু লাভও আছে।" ভগবান ব্যগ্রতা সহকারে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি উপায়, খুড়ো? বল, আমাকে যাহা করিতে বলিবে, তাহাতেই রাজি আছি।"

রামহরি।—কেবল তুমি আমাদের সঙ্গে গিয়া তাহারা রাত্রিতে যে ঘরে শয়ন করে, সেই ঘরটা দেখাইয়া দিবে। তারপর তাহারা যেরূপ জব্দ হইবে, তাহার উপায় করিব।

ভগবান সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল,—"তবে কি তাহাদের খুন করিবে নাকি?"

চৌকিদার খুড়ো হাসিয়া বলিল যে,—"খুড়ো, তুমি-ই নাপিতের নাম ডুবিয়েছ! লোকে কথায় বলে,—'নরের মধ্যে নাপিত ধুত্তু, পাখীর ধুত্তু কাক!' কিন্তু আমি দেখিতেছি, তুমি তা'ছাড়া!" ভগবান মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল,—"তা বাপু, আমি অত শত বুঝি না; একটু স্পষ্ট করিয়া বল।" রামহরি তখন স্পষ্ট করিয়া বলিল,—"রামশঙ্কর মুখোপাধ্যায় স্ত্রী লইয়া যে ঘরে শোয়, কাল রাত্রিতে সেই ঘরে ঢুকিয়া যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারি বাহির করিয়া আনিব। আর যাহা কিছু লইয়া আসিব, তাহাতে তোমার দুই আনা অংশ রহিল।" ভগবান খুড়ো রামহরির প্রস্তাব শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। মনে ভয় হইল। ভাবিল,—"কেমন করিয়া ব্রাহ্মণের ব্রহ্মস্ব হরণ করিব! ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ শূদ্রের দেবতা। যাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম না করিলে পাপ স্পর্শে, তাঁহার ঘরে কেমন করিয়া চুরী করিব? এ কথাটা ভগবানকে বলিয়া ভাল কাজ করি নাই। আরও ব্রাহ্মণ যদি যদি অন্যায়পূর্ব্বক দুটা কড়া কথাই বলিয়া থাকেন, তাহাতেই বা কি আসে যায়! তবে মুখুয্যে মহাশয়ের স্ত্রীর অহঙ্কারটা কিছু বেশী!" রামহরিকে নিরুত্তর দেখিয়া ভগবান বলিল,—"কি খুড়ো, চুরির নামে ভয় পেলে না কি?" ভগবান বলিল,—"তা' বাপু, ভয়ের কথাই বটে; ব্রাহ্মণের ব্রহ্মস্ব-হরণ! রামহরি মনে মনে হাসিয়া বলিল,—"যদি তোমার মত লোককে এ কাযের গোয়েন্দা করিতে না পারিব, তবে বৃথা চুরী করিতে শিখিয়াছি।" পরে ভগবানকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"বলি খুড়ো, আমাদের কি ধর্ম্মজ্ঞান নেই, না পরকালের ভয় নেই! আমরা চুরী করি বটে, কিন্তু যেখানে সেখানে যার তার ঘরে চুরী করিনে। আমরা তিন প্রকার লোকের ঘরে চুরী করিয়া থাকি,—যে স্বার্থপর; মা বাপ, ভাই বোন্, প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনকে বঞ্চিত করিয়া যে নিজেরই সুখ-শান্তি খুজিয়া থাকে; যে কৃপণ, যথেষ্ট ধন-দৌলত আছে, কিন্তু নিজেও ব্যবহার করে না, আর কাহাকেও ব্যবহার করিতে দেয় না; আর যে ক্ষমতা-সত্ত্বেও দানাদি ক্রিয়া-কর্ম্ম-রহিত। এরূপ চুরীতে পাপ নাই। ঐরূপে যে ধন সঞ্চিত হয়, তাহাতে চোরের অধিকার আছে। তোমার রামশঙ্কর মুখুয্যের ঐ তিনটী গুণই আছে।" ভগবান একটু গোলে পড়িল। কথাটা রামহরি মন্দ বলে নাই। এ চুরীতে পাপ নাই—পাপ নাই অথচ কিছু লাভ আছে। শেষে ভগবান সম্মত হইল। পরদিন রামহরি চৌকিদার আর দুইজন সঙ্গী লইয়া যথাসময়ে ভগবানকে সমভিব্যাহারে লইয়া মুখোপাধ্যায়ের গৃহে সিঁদ দিল। দুইজন ভিতরে প্রবেশ করিল; আর একজন বাহিরে চৌকি দিতে লাগিল। ভগবান বাটীর ভিতরে পাহারায় নিযুক্ত হইল। এই সময় মুখোপাধ্যায়ের নিদ্রাভঙ্গ হয়; তিনি বাহিরে আসিয়া প্রস্রাব-ক্রিয়া সমাপন-পূর্ব্বক গাড়ুটী নামাইয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া আলস্য ত্যাগ করতঃ 'দুর্গা কালী' উচ্চারণ করিলেন। ভগবান বরাবরই ব্রাহ্মণ-ভক্ত; ব্রাহ্মণকে দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিল না। অগ্রসর হইয়াই

বলিল—'দাদা ঠাকুর, প্রণাম গো!" এই বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

মুখুয্যে মহাশয় অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেও?"

উত্তর।—আজ্ঞে, আমি ভগবান!

প্রশ্ন।—ভগবান এত রাত্রিতে কেন?

উত্তর।—আজ্ঞে, আপনার ঘরে সিঁদ দেওয়া গিয়েছে।

প্রশ্ন।—ঘরে সিঁদ দেওয়া গিয়েছে কি?

উত্তর।—আজ্ঞে হাঁ, ঐ দেখুন না; ওতে আমারও দুই আনা হিস্যা আছে!

মুখোপাধ্যায় মহাশয় তখন ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, সত্য সত্যই ঘরে সিঁদ দিয়াছে; সিঁদ-মোহানা দিয়া ঘরের ভিতর যথেষ্ট আলোক আসিতেছে। ইত্যবসরে বাহির হইতে চীৎকার শব্দ শুনিতে পাইলেন। ভগবান যখন মুখুয্যে মহাশয়কে হিস্যার পরিচয় দিতেছিল, তখন রামহরি সঙ্গাদ্বয়ের সহিত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে প্রবেশের অবকাশ খুঁজিতেছিল। এক্ষণে তিনি গৃহে প্রবেশ করিলেই, তিনজন তিন দিক হইতে দ্রুতপদে আসিয়া উপস্থিত-কার্য্যে ভগবানের প্রাপ্য হিস্যা বুঝাইয়া দিতে আরম্ভ করিল। আর ভগবান তাহাদের প্রদত্ত সে হিস্যার ভার বহনে অসমর্থ হইয়া পরিত্রাহি চীৎকার করিতেছে। মুখুয্যে মহাশয় বাহিরে আসিয়া চীৎকার করাতে রামহরি সঙ্গীসহ প্রস্থান করিল; এবং যাইবার সময় ভগবানকে শাসাইয়া গেল, তাহারা অবকাশমতে তাহার ভিটায় ঘুঘু চরাইবার ব্যবস্থা করিবে। ভগবান হিস্যাভারাক্রান্ত হইয়া অতি কষ্টে বাড়ী পৌঁছিয়াছিল। তাহার পর আমরা শুনিয়াছি, কিছুদিনের মধ্যে ঘরে আগুণ লাগিয়া ভগবানকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছিল।—শ্রীঃ

মথুরামোহন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।*

তরুণী ভার্য্যা।

এত করিয়াও বৃদ্ধ মথুরামোহন তরুণী ভার্য্যার মন যোগাইতে পারিলেন না। শাশুড়ী, শ্যালক প্রভৃতি শ্বশুরালয়ের সম্বন্ধীয় যে যেখানে আছে সকলকে অন্নবস্ত্র দিয়াও, যুবতী স্ত্রীর মন পাইলেন না। যা বলেন, তাই শুনেন; যা করেন, তাহাই সহ্য করেন—তথাপি তাঁহার মনস্তুষ্টি-সাধন করিতে পারেন না।

মথুরামোহন জমীদার। বাৎসরিক আয় প্রায় ২৩ হাজার টাকা। রাজার সংসার! সকলেই সুখী, দুঃখের কোন কারণ নাই। একমাত্র পুত্র বসন্তকুমার—রূপে-গুণে, দয়া-দাক্ষিণ্যে, মায়া-মমতায়, স্নেহ-সরলতায় সকলেরই প্রিয়। বয়স বিংশতি বৎসর। তা' সেও আলাহিদা মহলে বাস করে।

কর্ত্তা মথুরামোহনও আলাহিদা মহলে বাস করেন।

প্রসিদ্ধ জমিদার! শত বিঘা ভদ্রাসন। ভদ্রাসনের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত উদ্যান। এই ভদ্রাসনের দুই পার্শ্বে দুইটি স্বতন্ত্র বাটী নির্ম্মিত। তাহার একটিতে বসন্তকুমার থাকে, আর একটিতে জমীদার মহাশয় এবং তাঁহার তরুণী ভার্য্যা অবস্থান করেন। অন্যান্য সকলেই আদ্‌বাটীতে থাকেন।

তরুণী ভার্য্যার মনস্তুষ্টির জন্য মথুরামোহন অলঙ্কার এবং নগতমুদ্রায় প্রায় লক্ষটাকা দান করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাহাতেও সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহার আশা ভয়ানক—মনের অবস্থা রাক্ষসীর ন্যায়। তিনি চাহেন, সপত্নী-পুত্র বাটী হইতে বিদূরিত হউক—বিষয় হইতে বঞ্চিত হউক; আর তাঁহার ভ্রাতা আসিয়া সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা হইয়া বসুন। কিন্তু একথা বলা কিছু শক্ত! কেমন করিয়াই বা বলিবেন? যে বসন্তকুমারের নামে প্রজারা গলিয়া যায়; পাঁচবৎসর বয়স্ক শিশু হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ যাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে—প্রশংসা করে—প্রতিদিন প্রাতঃকালে সূর্য্যদেবকে সাক্ষী করিয়া যাহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করে; দাসদাসী যাহার কথায় প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারে; যাহাকে বৃদ্ধ জমীদার প্রাণের অধিক ভালবাসেন; যাহার চরিত্র নির্ম্মল—মিষ্টভাষী; সকলের সহিত যাহার সরল ব্যবহার; যে মিতব্যয়ী, সদাচারী; কিরূপে তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন! সুতরাং কোন কথাই বলেন না—বলিবার সুবিধাও পান না। তাঁহার মাতা প্রতিদিন তাঁহাকে কত রকম কথা শিখাইয়া দেন, কিন্তু তিনি কিছুই বলিতে সাহস করেন না বা গুছাইয়া বলিতে পারেন না। আক্রোশ বসন্তের উপর—কিন্তু সে নিরপরাধী।

মথুরামোহন একটি দরিদ্র-কন্যা প্রতিপালন করিয়াছিলেন, তাহার নাম সরলা। সরলার সহিত বসন্তকুমারের বিবাহের কথা স্থির হইয়াছিল—মথুরামোহনেরও তাহাতে সম্পূর্ণ সম্মতি ছিল—বসন্তের ত কথাই নাই! 'বিবাহ হইবে' জানিয়া যে ভাবে ভালবাসা সম্ভব, সেইভাবেই বসন্তকুমার সরলাকে ভালবাসিত। সরলাও মন-প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিল। সকলেই এ সম্বন্ধে সম্মত, সকলেই এ মিলনে সুখী। কিন্তু কেন বিবাহ হইতেছে না?—সরলার বয়ঃক্রমও যে চতুর্দ্দশ উত্তীর্ণপ্রায়! এ বিবাহে অসুখী কেবল মথুরামোহনের দ্বিতীয়া ভার্য্যা—সেই সম্পর্কীয় যে যেখানে আছে—আর দায়ে পড়িয়া মথুরামোহনও তাহাতেই জড়িভূত। প্রতিদিনই নানাছলে নানাকথা মথুরামোহনের কাছে বলা হয়—মানুষের মন, কতদিন ঠিক থাকে? মথুরামোহনেরও মনের গতি ফিরিল; বসন্তের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল—তাঁহার সর্ব্ব

* পাঁচটি পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ ক্ষুদ্র কাহিনী।

নাশের পথ উন্মুক্ত হইল। জঘন্য, ঘৃণিত, চামার বংশ-সম্ভূতা, পূর্ণচন্দ্রের বিমাতা, যেমন বিনাপরাধে পূর্ণচন্দ্রের উপর দোষারোপ করিয়াছিল, সেইরূপ বসন্তের বিমাতাও বসন্তের নামে অকথ্য, অশ্রাব্য দোষারোপ করিল। মথুরামোহন মোহে মুগ্ধ—তিনি দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া বসন্তকে একদিন কহিলেন,—"কুলাঙ্গার! তোর কলঙ্কের কথা শুনিয়া আমার উচ্চ-শির নত হইয়াছে। আমি অজ্ঞাতে এতদিন কাল-সর্প প্রতিপোষণ করিয়াছি; কিন্তু আজ হইতে যেন আর তোর ও পাপমুখ আমায় দেখিতে না হয়।"

বসন্তকুমার জ্ঞানী, বুদ্ধিমান—এ কৌশল বুঝিতে তাহার অধিকক্ষণ সময় লাগিল না। সেও প্রতিজ্ঞা করিল, বাটী পরিত্যাগ করিবে। কার্য্যেও সে করিল, তাই; কেবল যাইবার সময় প্রাণের সরলাকে রজনীতে নিদ্রিতাবস্থায় একবার দেখিয়া গেল—আর তাহার অঞ্চলে একখানি পত্র বাঁধিয়া রাখিয়া গেল। সে পত্রে লিখা ছিল এই ঃ—

"প্রাণের সরলা! বিমাতার কৌশলচক্রে পিতা আমার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিলেন—আমি তাঁহার কথামত এ বাটী পরিত্যাগ করিলাম। বিমাতা আমার নামে কি দোষারোপ করিয়াছেন, জানি না। কিন্তু বোধ হয়, সে অপরাধ গুরুতর—নহিলে এ অক্ষয় বন্ধন ছিন্ন হইবে কেন? পিতা বলিয়াছেন,—'আমি তোর মত কুলাঙ্গারের মুখদর্শন করিতে চাহি না।' ভাল, আমি রামচন্দ্রের পথানুসরণ করিব; দেখি, ভগবান আমায় কত পরীক্ষা করেন!' তুমি অবলা, কি করিবে বলিতে পারি না। কিন্তু সরলা যদি বিধাতা আমাদের দুইজনের মিলন নির্দ্ধারিত করিয়া থাকেন, তবে নিশ্চয়ই আমাদের সুখের দিন আসিবে। বিমাতার ইচ্ছা—যতদূর আমি জানি—তিনি তাঁহার ভ্রাতা হরিচরণের হস্তে তোমায় অর্পণ করেন, আর হরিচরণ আমার পিতার সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হয়। তাই বোধ হয় এই কৌশলজালের সৃষ্টি—তাই বোধ হয় আমি বিতাড়িত হইলাম। উপরে ভগবান আছেন, তিনিই তোমার সহায়। তাঁহাকে ডাকিও—সকল বিপদ হইতে মুক্ত হইবে। যদি মাতাল হরিচরণের সহিত তোমার বিবাহ স্থিরীকৃত হয়, তাহাহইলে খিড়কির পুষ্করিণীতে ডুবিয়া মরিও। ভগবানের পদতলে আবার আমাদের মিলন হইবে।—তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীবসন্তকুমার।"

বসন্তকুমার গৃহ পরিত্যাগ করিলে নানা-লোকে নানা কথা বলিল। বন্ধুবান্ধব সকলেই ঘৃণায় মথুরামোহনকে পরিত্যাগ করিলেন—প্রজাগণ নির্ভয় হৃদয়ে সর্ব্বসমক্ষে জমীদারকে গালি পাড়িতে লাগিল—দাওয়ান হইতে সামান্য দাসদাসী পর্য্যন্ত সকলেই অন্নদাতা মনিবের বিপক্ষ হইয়া উঠিল—চারিদিকেই লক্ষ্মীশ্রী অন্তর্হিত হইতে লাগিল। কর্ত্তা কি করিবেন? দ্বিতীয়া ভার্য্যার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না—নীরবে সকলই সহ্য করিতে লাগিলেন।

তাঁহার দ্বিতীয়া ভার্য্যার সকল কুমন্ত্রণার প্রতিপোষক ও পরামর্শদাতৃ 'বিনোর মা' নাম্নী জনৈকা প্রতিবাসিনীই এই ষড়যন্ত্রের মূল। তাহারই পরামর্শে—তাহারই চতুরতায় এতটা কাণ্ড-কারখানা ঘটিয়াছিল।

'বিনোর মা' গিন্নীর আশায় আশ্বাসিত হইয়াছিল—ভাবিয়াছিল, আর তাহাকে কষ্টে-স্বষ্টে দিনযাপন করিতে হইবে না। কিন্তু যখন সে দেখিল, সমস্ত কাজ শেষ হইলে গিন্নী আর তাহাকে গ্রাহ্য করেন না—যে সকল 'দিব' বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, আর সে সকল কথার উল্লেখ করেন না। তখন সে বাস্তবিকই মর্ম্মাহত হইল। এক দিন সে গিন্নীকে বলিল,—"কইগা! আমায় যে দশহাজার টাকা

দেবার কথা ছিল, সে কথা যে আর মুখেই আননা! নিজের কাজের সময় কত খাতির যত্ন করিতে, এখন আমায় দেখিলেই বিরক্ত হও। কারণ কি বল দিকিন?"

গিন্নী বলিলেন,—"যা'—যা', আর লম্বা লম্বা কথা কস্‌নে। দশহাজার টাকা! আ-মলো মাগীর আশা দেখ্‌না? রাতারাতি বড় মানুষ হতে চায়! আমার সাম্‌নে অমন ক'রে কথা কইবি তো তোকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবো।"

বিনোর মা।—ওমা! বলো কি গো! তোমার জন্যে এত বড় 'যোগাড়-যন্তোর'—এত বড় পাপ কাযট্টা করলেম, আর এখন তুমি আমায় আশা দিয়ে নিরাশ কর্‌তে চাও? বেশী দিনের কথা নয়, তুমি যে আমায় বলেছিলে—মনে করে দেখো দিকিন যে,—'বিনোর মা! তুমি বড় বুদ্ধিমতী ও চতুরা; তুমি যদি কল-কৌশলে ঐ বসন্ত ছোঁড়াটাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে পার, তাহলে আমি তোমার দশ হাজার টাকা আর তোমার বিনোর একটা বড় চাকরী করে দেবো! ওমা! সে সব কথা এখন ভেসে গেলো! এখন সকল দিক ফর্সা করে তোমায় রাজ-রাজেশ্বরী করে দিলেম, আর তুমি এখন আমায় পায়ে ঠেল্‌তে চাও? তখন পায়ে ধরে সেধেছিলে, আর এখন একেবারে সব ভুল! তোমার জন্যে আমি স্বর্গের পথে কাঁটা দিলেম—আর তুমিই আমায় এখন বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে চাও?

গিন্নী!—দেখ্‌ 'বিনোর মা!' বাড়াবাড়ি করিস্‌ না বল্‌চি—এখুনি দরোয়ান দিয়ে বাড়ীর বার করে দেবো।

'বিনোর মা' বড়ই মর্ম্মাহত হইল, তাহার সকল আশা-ভরসা ভাসিয়া গেল। সে বলিল,—"তাড়িয়ে দিতে হবে না, আমি আপনিই যাচ্চি। কিন্তু ভগবান তোমায় মার্‌বেন। তোমার সর্ব্বনাশ হবেই হবে। এ সুখ-ঐশ্বর্য্য কখনই ভোগ কর্‌তে পার্‌বে না। আমার 'যেমন কর্ম্ম তেমনিই ফল' হয়েছে; আর আমি এ বাড়ীতে আস্‌ছি না। যদি কর্ত্তা, দাওয়ানজী কিম্বা বসন্ত বাবু ফিরে এসে কখনও ডেকে পাঠান, তবেই আস্‌বো; নইলে এই পর্য্যন্ত! কিন্তু আমি শাপ দিচ্চি—তোমার ভাল হবে না—হবে না—হবে না।'

বিনোর মা চলিয়া গেল। মনে মনে স্থির করিল,—'দু'এক দিনের মধ্যেই আমি তোমার সর্ব্বনাশ করিব। তোমার কল্‌কাটি আমারই হাতে। আমি তো সব জানি! কর্ত্তাকে একখানা বেনামী চিঠি লিখ্‌লেই তোমার সুখের অবস্থা ঘুচে যাবে।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সর্ব্বনাশ।

'বিনোর মা' মনে মনে যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, কাযেও তাহাই করিল।

একদিন রজনীযোগে কর্ত্তা বৈঠকখানায় একেলা বসিয়া নানারূপ চিন্তায় নিমগ্ন। তিনি কি ছিলেন, কি হইয়াছেন; দেশের মধ্যে মান্য-গণ্য সকলের নিকট প্রধান ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ছিলেন—এখন সকলেই ঘৃণা করে। রাস্তায় বাহির হইলে পরিচিত লোকমাত্রেই মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়—কেহ তাঁহার মুখ-দর্শন করিতে ইচ্ছা করে না। মনে করে, 'পাপীষ্ঠের মুখ দেখিলে অন্ন জুটবে না।' 'জঘন্য, ঘৃণ্য, স্ত্রৈন' বলিয়া সকলেই তাঁহার নিন্দা করিয়া বেড়ায়। এক বসন্তকুমারের জন্য সকলেই আকুল। এক রামচন্দ্রের শোকে অযোধ্যা শ্মশান হইয়াছিল; এখন এক বসন্তকুমারের অদর্শনে সকলেই মন-ক্লেশে ক্লিষ্ট। কোন প্রজাই জমীদারের উপর সন্তুষ্ট নয়। সকলেই তাঁহার মৃত্যু কামনা করে।

কর্ত্তা ভাবিতেছেন,—"আমি বসন্তকে যাহা

বলিয়াছিলাম, তাহাতে গৃহ পরিত্যাগ করা ভিন্ন তাহার আর কোন উপায়ই ছিল না। আমি কি করিব!—সত্যের অবমাননা তো করিতে পারি না! তাহার চিঠিপত্র যাহা ধরা পড়িয়াছে, তাহাতে তাহার ন্যায় কালসর্প গৃহে রাখা কদাচই উচিত নয়। আচ্ছা, চিঠিগুলি কি জাল! যদি তাই-ই হয়, তাহাহইলে কি সর্ব্বনাশই করিয়াছি! কিন্তু গিন্নীকে আমার কিছুতেই অবিশ্বাস হয় না। সে মুখরা হউক বা আর যাহাই হউক, আমার নিকট সে দিনেকের তরেও অবিশ্বাসের কায করে নাই। তাহার সরল মুখখানি দেখিলে, অসতী বলিয়া জগতের কেহই বিশ্বাস করিবে না। সেদিন রজনীতে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, বসন্ত গিন্নীর মহলের দিকে গিয়াছিল—তাহাও কি ছায়াবাজী! গিন্নী আমায় একখানি পত্র দেখাইলেন; তাহাতে বসন্ত লিখিয়াছে,—'বাবা আর কত দিন। তোমার এ ভরাযৌবন কেন বৃদ্ধের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছ? আর দিন কয়েক পরে আমিই তাঁহার মৃত্যু হইলে সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা হইব। তখন তুমি অনুতাপানলে দগ্ধ হইবে।' এ সকল দেখিয়া-শুনিয়া আমি কেমন করিয়া সেই কালসর্পকে গৃহে স্থান দিই! সকলে তাহার অসচ্চরিত্রের কথা জানে না—আমিও তাহা জানাইতে ইচ্ছা করি না। কেন না, নানালোকে নানা কথা কহিবে।"

আবার কিয়ৎক্ষণ পরে ভাবিতে লাগিলেন,—"যদি এ সমস্ত মিথ্যাই হয়। বিমাতা, সপত্নী-পুত্রের উপর কিনা করিতে পারে? অনেক ঘটনা এমন ঘটিয়াছে, যাহাতে বিমাতারই ষড়যন্ত্র শেষে প্রকাশ পাইয়াছে। যদি ইহাও তাহাই হয়, তাহাহইলে বাস্তবিকই আমি কি ঘৃণিত কাজই করিয়াছি? লোকের নিকট মুখ দেখান লজ্জার কথা।' আর ভাবিতে পারিলেন না। মস্তিষ্ক বড়ই দুর্ব্বল হইয়া আসিল। এদিক-ওদিক চাহিতে শয্যার উপরে একখানি পত্র পতিত দেখিয়া উহা কুড়াইয়া লইলেন। পত্রখানি দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলেন। মনে মনে কহিতে লাগিলেন,—"এ কি! এ আবার কার পত্র? শিরোনাম তো আমারই নামে দেখিতেছি! আমার এ পত্র কোথা হইতে আসিল?"

পত্র উন্মোচন করিয়া পাঠান্তর আবার কহিলেন,—"অবিশ্বাস-যোগ্য। এ কথাক খনও বিশ্বাস করা যায়? আমার স্ত্রী কলঙ্কিনী! না—না—তাও কখনো হতে পারে? (পত্র দূরে নিক্ষেপ করণ) নিশ্চয় এ কাহারো ষড়যন্ত্র। হয় তো এ দাওয়ানজীরই কৌশল। তিনি বরাবরই বসন্তের পক্ষপাতী; এবং আমার দ্বিতীয়া ভার্য্যার নিন্দাকারী। না—দাওয়ানজী বৃদ্ধ, ধর্ম্মভীরু লোক; সে কখনও একজন অবলার উপর এ প্রকার দোষারোপ কর্‌বেনা। (কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর) তবে কি এ মজুমদারের খেলা? বসন্ত বিরাগী হ'বার দিন অবধি আজ দুই মাস সে আমার বাটীতে পদার্পণ করে নাই। হয় তো বা সেই এই খেলা খেলিয়াছে?" এই বলিয়া পত্রখানি ফেলিয়া দিলেন। কিন্তু তাহাতেও তো মন সুস্থির হইল না! পুনরায় উহা কুড়াইয়া পাঠ করিলেন; আবার কহিলেন,—"না, একি! এত সাহসভরে যে পত্র লিখে, 'ষড়যন্ত্র' বলিয়া কেমন করিয়া তাহা অগ্রাহ্য করি? পত্রলেখক লিখ্‌ছেন,—'আপনি যার কথায় রাম-সম পুত্রকে বনবাস দিয়াছেন, পর কথায় কসায়ের ন্যায় সরলা সরলার মস্তকচ্ছেদন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, সেই পত্নী আপনার কলঙ্কিনী! পুরোহিত-পুত্রের সহিত তাহার সংঘটন। আর লিখিতে লজ্জা করে; এ কথা লিখিয়া লেখনী কলঙ্কিত করিতে আপনা-আপনিই ঘৃণা হয়। আপনাকে অধিক আর

কি বলিব! বিবাহের উৎসবে আপনি এ কয় দিন যাবৎ অন্তঃপুরে আসেন না; সুতরাং জানিতেও পারেন না যে, আপনার স্ত্রীর কিরূপ আচরণ। একবার প্রচ্ছন্নভাবে রজনী দ্বিপ্রহরের সময় অন্তঃপুরে পদার্পণ করিলেই, স্বচক্ষে ব্যভিচারিণীর ব্যভিচার দর্শন করিবেন। কিমধিকমিতি।' তবে সত্যসত্যই কি আমার স্ত্রী ব্যভিচারিণী; না—তাহার কোন শত্রু এরূপভাবে পত্র লিখিয়াছে! ওহেণ! বড় গিন্নী, তুমি এখন কোথায়? তোমা-বিহনে তোমার বসন্তের দশা কি করিয়াছি, একবার দেখ! আজি তুমি থাকিলে আমার এমন সর্ব্বনাশ ঘটিত না।"

কর্ত্তার এই সকরুণ অথচ দারুণ চীৎকারে দপ্তরখানায় দাওয়ানজী চমকিয়া উঠিলেন। তিনি মনে করিলেন,—কর্ত্তার কোন ব্যাধি উপস্থিত। দ্রুতবেগে তাই অমনি কর্ত্তার বৈঠকখানায় আসিয়া পশ্চাৎ হইতে কহিলেন "বাবু! বাবু! আপনার কি কোনরূপ অসুখ "——

কথঞ্চিত চকিতাবস্থায় কর্ত্তা পশ্চাৎ ফিরিয়া উত্তর করিলেন,—" কে ও, দাওয়ান! কেন—কিজন্য—তুমি—তুমি আমায় এ অসময়ে কি জিজ্ঞাসা কর্‌তে এসেছো?

দা।—আজ্ঞে, আপনি হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন—কোন অসুখ——

কর্ত্তা।—না—না—ও কিছু নয়। বসন্তের কোন পত্র এসেছে? মজুমদার আমার বাড়ী আর আসে না—কেন আসে না—আমি কি অপরাধ করেছি?

দা।—আজ্ঞে বসন্তবাবুর একখানা পত্র—

কর্ত্তা।—পত্র?—পেয়েছে? কই, আমায় তো বলোনি! বসন্ত কি লিখেছে?

দা।—আজ্ঞে, তিন্‌টি মাত্র কথা—'আমি ভাল আছি, বাবা যাতে ভাল থাকেন, তাই করিবেন।'

কর্ত্তা।—আমি? আমার কথা লিখেছে? এ পাপীষ্ঠের শুভকামনা এখনও সে করে? বা!—বা! এমন ছেলেকে আমি বনবাস দিয়েছি? দশরথের চেয়েও আমার পুণ্যসঞ্চয় হয়েছে! আর কি লিখেছে?

দা। আজ্ঞে!

কর্ত্তা।—আজ্ঞে কি, বলো?

দা।—বল্‌তে সাহস হচ্চে না।

কর্ত্তা।—এমন কি কথা লিখেছে যে, বল্‌তে সাহস হচ্চে না!—সরলা-সম্বন্ধীয়?

দা।—আজ্ঞে না। তাঁর বিমাতার কথা।

কর্ত্তা।—(অতিশয় ব্যগ্রভাবে) কি কথা! বসন্ত বিমাতার বিষয় কি লিখিয়াছে? বল, চুপ করে রইলে যে!

দা।—আজ্ঞে, তিনি লিখেছেন—'আমার জন্য আমি ভাবি না। বিমাতা কালসাপিনীর হস্ত হইতে পিতাকে সযতনে রক্ষা করিবেন। রায়গড়ে যে অগ্নি জ্বলিয়াছে, তাহা দাবাগ্নিতে পরিণত হইবে।'

কর্ত্তা।—যদি তোমার কোন বাধা না থাকে, সে পত্রখানি আমায় এনে দেও। আর এখনি, যত খরচ লাগে, বসন্তকে আন্‌তে পাঠাও।

দা।—আপনার কি অসুখ?

কর্ত্তা।—না—না— না, আমার কোন অসুখ হয়নি। আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, আপনার সর্ব্বনাশ আপনি করেছি—আপনার মৃত্যু আপনি ডেকে এনেছি। যাও, শীঘ্র যাও।

"একি! হঠাৎ এভাব কেন?"—এইকথা ভাবিতে ভাবিতে দাওয়ানজী প্রস্থান করিলেন। কর্ত্তা অনুচ্চস্বরে কহিলেন,—" আর অবিশ্বাস করিতে পারি না! যাই, রজনী দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে; এই সময়ে একবার যাই—একবার দেখে আসি, কলঙ্কিনীর সাহসের সীমা কতদূর!"

সবেমাত্র দুই একপদ অগ্রসর হইয়াছেন

এমন সময় দাওয়ানজী পুনঃপ্রবেশ করিলেন। তাঁহার হস্তে একখানি পত্র—তিনি সেইখানি দেখাইয়া বলিলেন,—"এইপত্র।"

কর্ত্তা।—আচ্ছা! ঐখানে রাখ। তুমি শয়ন করগে।

ভাবিতে ভাবিতে দাওয়ানজী অন্তরালে গিয়া লুক্কাইত হইলেন।

কর্ত্তা। তখন আপনা-আপনি কহিলেন,—"এইতো সময়—তবে আর অপেক্ষা করি কেন?" এইপর্য্যন্ত বলিয়াই, দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন। দাওয়ানজী লুক্কায়িত ছিলেন। কর্ত্তা প্রস্থান করিলে পর, পুনরায় সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন; এবং আপন মনে কহিতে লাগিলেন,—আজ কর্ত্তার একি ভাব! "আজ ২৬ বৎসর আমি ইহাঁর সরকারে কর্ম্ম করিতেছি; কিন্তু কই, একদিনও তো কটু কথা বলিতে শুনি নাই। হঠাৎ আজ এভাব কেন? ইনি গেলেন কোথায়? অন্তপুরের দিকেই তো গিয়েছেন দেখ্‌চি। (কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর) না—ব্যাপার ভাল বলে বোধ হচ্চে না—আমায় সঙ্গ নিতে হলো।"

এই বলিয়া তিনিও কর্ত্তার অনুধাবন করিলেন।

——

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

ননীলাল দাস ঘোষ,
২৭ নং মুরাদপুর রোড, পোষ্ট আফিস বেহালা,
কলিকাতা।—এই নাম ও ঠিকানা হইতে

"রুদ্রযামলাদি তন্ত্র"

এই নামের এক বড়ই মনোমুগ্ধকর বিজ্ঞাপন আজকাল মফঃস্বলের নানা স্থানে বিলি হইতেছে। বিজ্ঞাপনখানির মোহমন্ত্র এতদূর প্রলোভনময় যে, আমাদের ইচ্ছা ছিল, বিজ্ঞাপনখানির আদ্যোপান্ত সমস্তই 'অনুসন্ধানে' উদ্ধৃত করিয়া সকলকে চমকিত করি। কিন্তু স্থানাভাবে আমাদের সে বাসনা সম্যক মিটিল না। তবে তাহার একটু-আদট আভাস না দিয়াও থাকা যায় না। তাই দেখুন পাঠক, সে বিজ্ঞাপনের প্রথম পরিচয় এই,—

"৺ কাশীধামের পরমহংস ৺ তৈলঙ্গ স্বামীজী আমার পরম গুরু ছিলেন। এই মহাত্মার নিকট শিক্ষা-লাভ করিয়া নিম্নলিখিত কয়খানি আসল রত্নময় পুঁথি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। এক্ষণে জন-সমাজে যামলাদি তন্ত্র নামে প্রচার করিলাম।"

এইরূপ ভূমিকায় বিজ্ঞাপনটী আরম্ভ করিয়া তারপর ক্রমে ক্রমে ঐ গ্রন্থে কি কি বিষয় আছে, তাহার বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে। সংক্ষেপে সে বর্ণনারও একটু পরিচয় এই,—

"বিঘ্ন শান্তি, জ্বর শান্তি, রাজা, বন্ধু, ভৃত্য, দাসী, অর্থাৎ ত্রিজগৎ ও পশু বশীভূত করা। স্তম্ভনং—নিদ্রাস্তম্ভনং, অগ্নিস্তম্ভনং, শত্রু জলস্তম্ভনং, আসন স্তম্ভনং। বিদ্বেষণ, উচ্চাটন, শত্রু-উচ্চাটন, সর্পবিদ্যা, পেত্নী-ছাড়ান, ভূত-ছাড়ান, ডাইন ও ভূতের দৃষ্টি ছাড়ান, রাক্ষস, ডাকিনাদি দমন, প্রসবমন্ত্র, বৃষ্টিকরণং, সুরাসুর-দর্শনং, কণ্টকময় বৃক্ষ ও কীট চর্ব্বণ করণং, বাত ঝাড়া, আমশায় যোগের জলপড়া, চোরভয়-নিবারণ, সর্ব্ববিধ রোগ চিকিৎসা, প্রাণায়াম, কিরূপে অকস্মাৎ রাজা হওয়া যায়, সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধির উপায়, ভূত ভবিষ্যৎ সমস্ত বার্ত্তা জ্ঞাত হওয়া, দিবাভাগে নক্ষত্র দর্শনং, হস্তে মস্তকে বা বক্ষের উপর অগ্নিজ্বালন, ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয় এই পুস্তকে আছে।"

পাঠক মহাশয়, মাপ করিবেন; স্থানাভাব, সুতরাং সকল বিষয়গুলি উদ্ধৃত হইল না। উদ্ধৃত করিলে যে যে বিষয় ঐ পুস্তকে আছে, তাহার তালিকার প্রায় "অনুসন্ধানের" চারিটি স্তম্ভ ব্যয়িত হইত। অথচ এ হেন

পুস্তকের দাম মফঃস্বলে মায়-মাশুল ১৵০ আনা মাত্র। তাছাড়া আবার বিজ্ঞাপনের শেষে লেখা আছে,—

"এই গ্রন্থ-সম্বন্ধে আমি দায়ী রহিলাম। যদি কেহ গ্রন্থ পাঠ করিয়া তদনুযায়ীক কার্য্য দ্বারা ফল না দর্শে তাহা হইলে গ্রন্থের মূল্য ফেরত দিব।"

এই তো বিজ্ঞাপনের ব্যাপার! এইরূপ রাশি রাশি বিজ্ঞাপন মফঃস্বলে বিলি হইতেছে। সরল লোভী গ্রাহকগণও মজিতেছেন। কিন্তু পাঠক, এই বিজ্ঞাপনের ও বিজ্ঞাপন-দাতার নিগূঢ় তত্ত্ব শুনিবেন কি? এই দেখুন, বিজ্ঞাপনদাতার প্রতিবেশী একজন স্কুলের শিক্ষক মহাশয় এই বিজ্ঞাপন-সম্বন্ধে আমাদিগকে এইপত্র লিখিয়াছেন,—

"শ্রীযুক্ত 'অনুসন্ধান'-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়, গত বৎসর পৌষ মাসে ননীলাল ঘোষের কীর্ত্তির কথা ('অনুসন্ধানের' ১১শ সংখ্যায় যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল) প্রকাশ করিয়াছিলাম। ইহাঁর অসংখ্য নাম ধাম;—ইনি কখন কাশীবাসী, কখন বেহালা-বাসী, কখন কাশীপুর-বাসী, কখন কলিকাতা ১৬১ নং অপার সারকুলার রোড বাসী। ইহাঁর সহস্র নামের কথা কি বলিব! ইনি আজ ননীলাল, কাল কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ, পরশ্ব গোবিন্দলাল বা পূর্ণানন্দস্বামী; আজকাল আবার কাশীর ৺তৈলঙ্গ স্বামী পরমহংসের চেলা। প্রথমে 'ইন্দ্রজাল' ছাপাইলেন; সেই 'ইন্দ্রজালে' কত-লোকে পড়িল। পরে সাধারণে সাবধান হওয়ায় 'ইন্দ্রজাল' আর খাটিল না। শর্ম্মারাম তাহার পর ঐ পুস্তকের টাইটেল পেজটি মাত্র পরিবর্ত্তন করিয়া নাম রাখিলেন,—'উড্ডিশ রত্নভাণ্ডার।' আবার যখন তাহারও রত্ন ফুরাইল, তখন আবার তৃতীয়বার ঐ পুস্তকেরই টাইটেল-পেজ পরিবর্ত্তন করিয়া নাম জাহির করিয়াছেন,—'রুদ্র-যামলাদি তন্ত্র।' ননী বাবাজীর একচক্ষু কানা। লোকে কথায় বলে, 'কানা-খোঁড়ার একগুণ বাড়া।' কিন্তু সেই একচক্ষুর এতদূর দৃষ্টি যে, আমরা দুই চক্ষু-বিশিষ্ট হইয়াও কিছুই করিতে পারি না। আমার নিবাস ননীবাবুর বাটীর নিকট। তাহার সমুদয় তন্ত্রমন্ত্রই আমার জানা আছে। বাবুর 'ক' অক্ষর প্রায় গোমাংস-স্বরূপ। কিন্তু এত তন্ত্রমন্ত্রই বা কোথায় পান, তিনিই জানেন। তাঁহার বয়স ২০।২২ বৎসর; কিন্তু এত অল্প বয়সেই যে এমন ধরিয়াছেন, ইহাই আশ্চর্য্য। বঙ্গবাসী মহলে ভাল বহি দাও, খরিদদার নাই। কিন্তু এক 'ইন্দ্রজাল' তিন বার ত্রিমূর্ত্তি ধারণ করিল, এখনও খরিদদার অনেক। লোকে বারবার প্রতারিত হইতেছে, তবুও তো চৈতন্য নাই! যাহা হউক, আপনার পত্রিকার এই বিষয় জানিতে পারিয়াও যদি সাধারণে সাবধান হন, তবেই মঙ্গল।

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ রায়,

শিক্ষক, বেহালা ইংরাজি-বিদ্যালয়।"

এপত্রের উপর আর এ বিজ্ঞাপন-দাতা-সম্বন্ধে কিছু না বলাই কর্ত্তব্য। তবে আর একটী-আদটী কথা না বলিলেও ক্ষোভ মিটে না, অথবা লোকে সকল পরিচয়ও সমান পান না। সে কথা এই যে,—'জগৎবাসী' প্রভৃতি কাগজ বাহির করিয়া যে রাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ সাধারণকে ঠকাইতেছিল, এই ব্যক্তি তাহারই কনিষ্ঠ। উহাদের প্রায় সকল ভাই-কটাই এইরূপে অধঃপাতে গিয়াছে; এবং নানারূপে সাধারণকে ঠকাইবার চেষ্টায় ফিরিতেছে। ঈশ্বর, উহাদের কি কিছুতেই সুমতি হইবে না?

স্ত্রীলোকের লজ্জা।

সলজ্জা গণিকা নষ্টা নির্ল্লজ্জা চ কুলস্ত্রীয়া।

যে লজ্জা স্ত্রী-জাতির স্বাভাবিক, যাহা প্রকৃতি-দত্তা, যাহার অভাবে কুল-স্ত্রী নষ্টারূপে বাচ্যা, তাহার বিনাশ কিরূপে হয়? সে লজ্জা কিরূপে ছিন্ন হয়? তাহার দুইটি কারণ আমরা দেখাইব।

একদিকে বাহ্য-প্রকৃতি, অন্যদিকে মানব-প্রকৃতি। বাহ্য-প্রকৃতি আমার, তোমার, দশ-জনের—সকলের উপর সমানভাবে দৃষ্টি রাখিয়া নাচিতে নাচিতে গন্তব্য-পথে ছুটিতেছে। বাহ্য-প্রকৃতি সকলের; মানব-প্রকৃতি আমার আমার প্রকৃতি আমার কার্য্য করিতেছে; আর বাহ্য-প্রকৃতি অপক্ষপাতী হইয়া সাধারণের কার্য্য করিতে করিতে চলিয়াছে। আমার প্রকৃতি আমার আয়ত্তাধীন; বাহ্য-প্রকৃতির উপর আমার জোর খাটে না। যখন আমার প্রকৃতিকে আমি সুপথে চালাইতে চেষ্টা করি, বাহ্য-প্রকৃতি আমার সহায় হয়। যখন আমার প্রকৃতি আমি কুপথে লইয়া যাই, বাহ্য-প্রকৃতি তখনও আমার সহায় হইয়া কুপথে অধিক অগ্রসর করিয়া দেয়—বাহ্য-প্রকৃতি পক্ষপাত জানে না। বাহ্য-প্রকৃতি সু এবং কু উভয়ই। ব্যাকুল হইয়া তুমি সাধুসঙ্গ অনুসন্ধান কর, বাহ্য-প্রকৃতি তোমায় মিলাইয়া দিবে; আবার কুসঙ্গ চাও, তাহাও মিলাইবে। একজনের সু, অন্যের কু,—'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।'

বাহ্য-প্রকৃতি অপক্ষপাতিনী। বাহ্যপ্রকৃতি ও ঘটনা-চক্র কাহারও ইষ্টও করে না, অনিষ্টও করে না। তুমি অবহেলা করিয়া আপন প্রকৃতিকে যাহা ইচ্ছা করাইতে পার; সু বা কু কার্য্য তোমার নিজের উপরই নির্ভর করে। নিজের প্রকৃতি সু হইলে বাহ্য-প্রকৃতি সু হয়: আর নিজের প্রকৃতি কু হইলে বাহ্য-প্রকৃতি কু হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি ষড়রিপু জীবনের প্রারম্ভে সুপ্ত; ব্যাঘ্র, ভল্লুক, শৃগাল, বরাহ, মহিশ, বিড়াল প্রভৃতি যেন হৃদয়-কন্দরে নিদ্রা যাইতেছে। সকলে এক রজ্জুতে আবদ্ধ; আর সে রজ্জু জীবনারম্ভ হইতেই বালক-বালিকার হস্তে ন্যস্ত। পিতামাতা সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। পিতামাতা আহার দিতেছেন, আর সমাজ ব্যবহারাদি শিক্ষা দিতেছেন। একটী একটী করিয়া রিপুগুলিও জাগ্রত হইতেছে। রথ চলিতে আরম্ভ করিতেছে। বালক-বালিকা সারথি। দেখিতে দেখিতে তাহারা চঞ্চল হইল।

পশু জগৎ আলোচনা কর। যে যত ক্ষুদ্র, সে তত চঞ্চল। বলশালী পশু সর্ব্বদা ভ্রমণ করে না; কিন্তু ক্ষুধার উদ্রেক হইলেই দুর্দ্দান্ত।

বালিকা-হৃদয়ে দুর্দ্দান্ত রিপু সর্ব্বশেষে জাগ্রত হয়। কিন্তু রজ্জু এক। জাগ্রত বা সুপ্ত যাহাই থাক না, একটার গতি হইলে অন্যান্যগুলিও সুপ্তাবস্থায় ভ্রমণ করে। দুর্দ্দান্ত রিপু সুপ্তাবস্থায় উক্রান্ত হইলে, জাগ্রতাবস্থায় আবার সেইপথেই যাইতে চায়।

প্রথম-বয়সে বালিকার হস্তে রজ্জু থাকে বটে, কিন্তু পিতামাতা নিকটে বসিয়া থাকেন। পিতা মাতা যদি ঘুমাইয়া পড়েন, যদি অমনযোগী হন, যদি কর্ত্তব্য-পরাঙ্মুখ হন, তবে বালক-বালিকা যদৃচ্ছা শকট চালিত করে। ক্রমে রজ্জুর তাদৃশ শক্তি থাকে না। অধিক ব্যবহৃত হইলে তাহার পাক খুলিয়া যায়। সে অবস্থায় তখন সকল রিপু জাগিয়া উঠে; আর ঐ রজ্জুতে তাহাদিগকে দমন করা যায় না। শেষে রজ্জু ছিঁড়িয়া যাইবারই সম্ভাবনা। পিতামাতার শৈথিল্যই লজ্জা-রজ্জু শ্লথ করিবার প্রথম কারণ।

বালিকা-কাল কৈশোরে মিশিল। কৈশোর অতিবাহিত হইতেছে। অদূরে যৌবন কাল। কৈশোর তাহার আগমনের সূচনা। শীতের অবসান-সময়ে বসন্ত না আসিয়াও যেমন মধ্যে মধ্যে দেখা দিয়া থাকে, সেইরূপ কৈশোরেও যৌবন দুইএকবার দেখা দিয়া আগমন-সূচনা করিয়া দেয়। কৈশোর চলিতেছে। অকস্মাৎ বালিকা একটু সলজ্জ ভাব ধরিল; তাহার চঞ্চল গতি মন্থর হইল, নিজের অবয়বে দৃষ্টি পড়িল, মনের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইল। সে দিন কৈশোর ও যৌবন মিলিত হইল। দেখিতে দেখিতে

যৌবন আবার অদৃশ্য হইল। আবার দেখা দিল, আবার অবিবাহিত হইল। পিতামাতা বুঝিলেন,—বালিকা যৌবনে পদার্পণ করিতেছে; কৈশোর যাইতেছে, যৌবন আসিতেছে। এই সময়ে বিবাহ। পিতামাতা অবহেলা করিয়া, কর্ত্তব্য-পরাঙ্মুখ হইয়া যে রজ্জু একটু শ্লথ করিয়া দিয়াছিলেন, সমাজ সেই রজ্জু দৃঢ় করিতে বসিল।

সমাজ দেবতা। আমি হিন্দু, হিন্দুসমাজের বিষয় অবগত আছি। হিন্দুসমাজ হিন্দুর নিকট দেবতা। সমাজ পিতামাতাকে কর্ত্তব্য দেখাইয়া দিল, সৎপাত্রে কন্যা অর্পণ করিতে হইবে। সমাজ ভবিষ্যদ্দর্শী। রিপুনমূহ জাগ্রত হইলে যদি দৃঢ় বল্‌গা না থাকে, তবে রথ উল্টাইয়া যাইবে। সমাজ ইহা দেখিল; এবং রজ্জু দৃঢ় করিতে পরামর্শ দিল,—'সৎপাত্রের সহিত কন্যা মিলাইয়া দাও।' অনুজ্ঞা করিল, বলিল,—'ইহাই কর্ত্তব্য।' যে কর্ত্তব্য দেখাইয়া দেয়, সেই তো দেবতা!

পাত্র মিলিল। সমাজ, লৌকিক আচার সম্মুখে আনিয়া দিল। প্রতি লৌকিক আচারে কন্যার হৃদয়ে কি এক অলৌকিক ভাব উদিত হইতে লাগিল। সেই দিন হইতে কুমারী-হৃদয়ে দেবভাব জাগ্রত হইতে লাগিল। যে রশ্মি তাহার হস্তে ছিল, তাহার আর এক নূতন তন্তু বাড়িল। বল অধিক হইল। বল্‌গা দৃঢ় হইল।

রিপুর সহিত স্বর্গীয় ভাব একসূত্রে আবদ্ধ। একের ক্রিয়া হইলে সঙ্গে সঙ্গে সকলের ক্রিয়া হইতে লাগিল। বিবাহ প্রাক্কালে সমাজ হৃদয়ে যে দেবভাব আনিয়া দিয়াছে, তাহার ক্রিয়া হইতে লাগিল। লজ্জা বাড়িল। সমস্ত রিপু অধিক-অল্প কার্য্য করিতেছে। কিন্তু লজ্জা-রশ্মি অতি দৃঢ়। রিপুগুলি সুপথে ধীরভাবে চলিতে লাগিল।

হৃদয় স্বর্গীয় আমোদে পরিপূর্ণ। পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতে লাগিল। বালিকা নূতন সৌন্দর্য্য, নূতন শ্রী লাভ করিতে লাগিল। সমাজাদিষ্ট প্রতি লৌকিক আচারে ঐশীশক্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বালিকা চঞ্চলতা পরিত্যাগ করিয়া শান্তভাব ধারণ করিল। সমস্ত প্রবৃত্তিগুলি সমাজ-প্রদত্ত নূতন শক্তির অধীন হইয়া চলিতে লাগিল। নূতন জীবন আসিল। বালিকা-হৃদয়ে যে মনোহর ভাবের ক্রিয়া হইতে লাগিল, তাহা অবর্ণনীয়। দেখিতে দেখিতে বধূ-বর একত্র হইল; বিবাহ, বাসর, কুশণ্ডিকা সুপথে চালাইয়া দিয়া গেল। সমাজ এই নূতন গন্তব্য পথে নামাইয়া, পথ দেখাইয়া দিয়া গেল।

বালিকার নিকট হইতে পিতামাতা এখন উঠিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের পরিবর্ত্তে তাঁহাদের চিহ্নিত আর এক ব্যক্তি, আর এক পরিবার। নূতন ব্যক্তি দেবতা। সমাজ তাহাকে দেবতা করিয়া হৃদয়ে বসাইয়া দিয়া গিয়াছে। রথ নূতন পথে দাঁড়াইয়া। সুপ্তোত্থিত, বরাহ ব্যাঘ্রাদি ষড়রিপু গমনোদ্যত। রথ মুহু মুহু কম্পিত হইতেছে। ক্ষীণ হস্তে বল্‌গা ধরিয়া রমণীও ঈষৎ কাঁপিতেছে। পার্শ্বে স্বামী, নিকটে শ্বশ্রূ পরিবারবর্গ। বালিকার কৈশোরের প্রকৃতি, তাহার উপর বিবাহ-সময়ে সমাজ-প্রদত্ত দেবশক্তি, ইহার উপর স্বামী ও তাঁহার পরিবার, এই সমস্ত ঘটনা বাহ্য-প্রকৃতি এক স্থানে মিলাইয়াছে। রথ সসজ্জ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গন্তব্য-পথ ক্ষুরধার। ইহাই নারী-জীবনের সন্ধিস্থল।

মানবজাতি অভিশপ্ত। বাহ্য-প্রকৃতি নিজে নিরন্তর চলিতেছে। মানবের বিশ্রাম করিবার শক্তি নাই। চলিতে হইবে, পৃথিবী দাঁড়াইবার স্থান নহে। রিপুগণ রথ লইয়া ছুটিল।

লজ্জা-রশ্মির উপর স্বামীর হস্ত পড়িল। যদি স্বামী কুপাত্র হন, যদি পিতামাতা প্রতারিত হইয়া থাকেন, যদি পিতামাতা দায়-উদ্ধার করিয়া প্রতারণা করিয়া থাকেন; তখন রমণীর উপায় কি? ষড়রিপুর সহিত আর ষড়রিপু মিশ্রিত হইল। ব্যাঘ্রাদির বল দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। সমস্ত প্রবৃত্তি প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিল। বিবাহের সময় সমাজ যে রশ্মি দৃঢ় করিয়া দিয়াছিল, যদি স্বামী তাহা অধিক দৃঢ় করিতে না পারেন, স্বামী যদি নিজে কর্ত্তব্য-জ্ঞান শূন্য হন, তবে রথ যথেচ্ছা চলিবে। এখন রমণীর সম্পত্তি,—সেই সমাজ-দত্ত উপদেশ,—স্বামী দেবতা।

অনন্তকাল এই উন্মত্ত ষড়রিপু প্রবলবেগে ছুটাইবে; শেষে উন্মত্ত হইয়া রথ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া জীবন সংহার করিবে। যাহারা আমার সহিত সংশ্লিষ্ট, তাহাদিগকেও বিনাশ করিয়া যাইবে। সমাজ এই শিক্ষা দিয়াছে। রমণীর এইমাত্র বল। আর সমস্ত বিপক্ষ। ইহার অভাবই রমণীর লজ্জা বিনাশ করিবার দ্বিতীয় কারণ।

বিবাহের প্রথম অবস্থায় স্ত্রী অসৎ স্বামীর সংসর্গ-দোষ বুঝিল না। পশুর সহিত পশুর সখ্যতা হইতেছিল। বিবাহ মধুর লাগিল কিন্তু পশুর সদ্ভাব কত দিন থাকে? স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ বাধিল। উভয়ের প্রবৃত্তি, উভয়ের রিপুই পরিপুষ্ট—দুর্দ্দান্ত। সে স্ত্রীকে উত্তেজিত করিয়া, মস্তকে তুলিয়া, তাহার সমস্ত বৃত্তি সম্পূর্ণ উন্মত্ত করিয়া দিয়াছে; স্ত্রীর লজ্জা-রশ্মি শ্লথ করিয়া দিয়াছে, তাহাকে যদৃচ্ছা কার্য্য করিতে দিয়াছে। স্ত্রী স্বেচ্ছাচার করিতে লাগিল। লজ্জা গিয়াছে; এখন রিপু-জল-তরঙ্গ নানামুখী হইল। স্বামী রোধ করিতে চেষ্টা করিল, আবার রশ্মি দৃঢ় করিবার চেষ্টা হইল। রমণী সে রোধ মানিল না। ক্রমে বিবাদ গুরুতর হইতে লাগিল। ক্রমে লজ্জা পরিবার অতিক্রম করিয়া বহির্মুখে ছুটিল।

হৃদয় অস্থির, রিপু প্রমত্ত। এ জল-তরঙ্গ রোধ করিবার সম্বল সমাজদত্ত শক্তি। এই সতীত্ব অদ্যাপি সুপথে রাখিতেছে; এখনও অন্তরে অন্য পাপ স্পর্শ করিতে পারে নাই।

বাহ্য প্রকৃতির উদ্ধত নৃত্য কি ভয়ঙ্কর! যখন রমণীহৃদয়ে সকল প্রবৃত্তি প্রবলবেগে ছুটিতেছে, যখন শুদ্ধ সমাজ ও সতীত্ব হৃদয়ের গতি নিবারণ করিতে পারিতেছে না, যে সময়ে লজ্জারশ্মি শিথিল হইয়া গিয়াছে; তখনও প্রকৃতি সমান ভাবে সেই শান্ত হৃদয়ের উপর নাচিয়া চলিল। অপক্ষপাতিনী প্রকৃতি প্রকৃত্তিকে আরও মাতাইয়া দিল।

প্রকৃতি পাষাণী। কাহারও সুখদুঃখের কারণ নহে। তোমার মনের উপর দিয়া পাষাণী নাচিয়া নাচিয়া চলিয়া যাইবে। তোমার সতীত্ব ও তোমার প্রবৃত্তি সমান ভাবে উত্তেজিত করিয়া চলিবে।

লজ্জা কমিয়া গিয়াছে; রথ যদৃচ্ছা ছুটিবে। আবার সেই বিবাহের শিক্ষা দেখা দিল। যে সে শিক্ষা হৃদয়ে অনুভব করিয়াছে; বিবাহকালীন প্রতিজ্ঞা,—"স্বামীকুলেধ্রুবোহং" এ কথা যে ভুলিতে পারে নাই, সে দেব-দেবী সমক্ষের শপথ অগ্রাহ্য করিতে পারিল না; পরকালের ভয় তাহার প্রবৃত্তি ফিরাইতে লাগিল। প্রকৃতির উচ্ছৃঙ্খল ভাব তাহাকে ভাসাইতে পারিলনা। যে ঐ সমস্ত গ্রহণ করিবার সুবিধা পায় নাই, পাষাণী প্রকৃতি তাহাকেই মজাইল।

চঞ্চল মনে বাহ্য-প্রকৃতির ক্রিয়া অনুভূত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে কতবার কুলবালা সঙ্গীত শুনিয়াছে, কতবার কত লোক দেখিয়াছে; কিন্তু কুলবালা তখন সতী। এক্ষণে মনের বিকার জন্মিয়াছে; স্বামী, স্বামীর গৃহ কিছুতেই সুখ দিতেছে না। প্রবৃত্তি সুখ খুঁজিল; পাষাণময়ী প্রকৃতি চক্ষের সম্মুখে সুখ আনিয়া ধরিল। পথে পথিকের গান কতবার শুনিয়াছে, গ্রামে প্রতিবেশীদিগের সুখ-সম্পদের কথা কতবার কর্ণে গিয়াছে, প্রতিবেশীদিগের স্বামীর কথা কতলোকে শুনাইয়াছে; তখন তাহাতে মন বিলড়িত হইত না। কিন্তু এক্ষণে মনে নানা প্রকার আশা উঠিতে লাগিল। "যদি ঐ স্ত্রীলোকটীর মত স্বামী পাইতাম"—ইত্যাদি চিন্তা হৃদয়ে আসিল। চিন্তায় প্রবৃত্তি আরো পুষ্ট হইতে লাগিল। পাপের অঙ্কুর হৃদয়ে উপ্ত হইল।

এ অবস্থায় রমণীর আর কে সহায়? সতীত্বের শক্তি ক্ষীণ হইতে লাগিল। কেবল একটু ক্ষীণ লজ্জা—পরিবারের অন্য সকলে নিন্দা করিবে এই ভয় মাত্র, এখন থাকিল। কিন্তু ক্রমে পারিবারিক যন্ত্রণাও অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। তথাপি পাপ একবারে হৃদয় অধিকার করিতে পারিল না।

এখন কোথাও সুখ নাই। সুখের আশায় রমণী বিব্রত! বাহ্য প্রকৃতি আবার অন্য পুরুষের চিন্তা আনিয়া দিল।

কুপ্রবৃত্তিতে বাহ্য প্রবৃত্তি সহায়তা করিতে লাগিল। মন যেমন খুঁজিবে, সেইরূপ পাইবে। অকস্মাৎ হয়ত অন্য পুরুষ দেখিয়া হৃদয় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। দিবারাত্রি তাহার চিন্তায় ব্যাপৃত হইল। যখন সমাজের সেই শিক্ষা অন্য চিন্তার দোষ দিল, তিরস্কার করিল, তখন রিপু উত্তর দিল,—চিন্তার দোষ কি? অন্য পুরুষের নাম করিতেও যে লজ্জা রমণীকে মৃতপ্রায় করিত, সে লজ্জা এখন ছাড়িয়া গিয়াছে। রমণী বিপথে চলিল। ঐ চিন্তা রমণীর বিনাশ সাধনের পথ খুলিয়া দিল।

———

সংবাদ।

—শ্যামাচরণ সেন চাটার্ড ব্যাঙ্কের কেশিয়ার। সুযোগমত ব্যাঙ্ক হইতে অন্যূন ১৪লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করিয়া তিনি পলাতক হন। তাঁহার পুত্র অবিনাশ সে ব্যাপারে নাকি পিতাকে সহায়তা করিয়াছিল; তাই, কর্ত্তা পলাতক হইলেও, সে পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হয়। পুত্রের বিচার চলিতে থাকে; পিতারও চারিদিকে সন্ধান লইতে আরম্ভ হয়। মাসাবধি সন্ধানে—নানারূপে হয়রাণ হইয়া, অনেক সুকৌশলে, ডিটেক্‌টিভ-পুলিসের বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এখন শ্যামাচরণকে ধরিয়াছেন। শ্যামাচরণ মুর্শিদাবাদ-জেলায় জারুল গ্রামে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় জমীদার উমেশচন্দ্র রায়ের বাটীতে তাঁহার বাসা ছিল। ব্রজেন্দ্র বাবু এবং তাঁহার সহকারী বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়—ইহাঁরা দুইজনে, তলে তলে নিগূঢ় সন্ধান পাইয়া, পুলিসের আরও লোকজন লইয়া, রাত্রি ৪টার সময় জমীদারের বাড়ী ঘেরোয়া করেন। শ্যামাচরণ তখন বৈঠকখানায় নিদ্রিত ছিলেন। বাড়ী ঘেরোয়া করিয়াই, অমনি তাঁহারা, সকলের অজ্ঞাতেই, সেই বৈঠকখানা-ঘরে গিয়া শ্যামাচরণকে ডাকিলেন। তাঁহাদের দেখিয়াই তো বাবুর চক্ষুস্থির! যাইহোক, অবশেষে কলিকাতায় শ্যামাচরণকে ধরিয়া আনা হইয়াছে। এখন বিচার চলিতেছে।

—ঢাকায় সেই গুণধর ডেপুটি, যিনি সেই চীনের ষ্ট্রীটাকে বাহির করিবার মতলবে গিয়াছিলেন, বিচারে তাঁহার একশত টাকা দণ্ড হইয়াছে।

—কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয় সকল জিনিসেরই সস্তার চূড়ান্ত দেখাইয়া গেলেন। পুস্তক-পত্রিকার ব্যাপারের তো কথাই নাই; এখন আবার তিনি থিয়েটার-দেখানর বাজারেও সেই চাল চালিয়াছেন। ১০ এক আনায় ৵০ দু'আনার থিয়েটার দেখান ভারতবর্ষে আর হয় নাই। রাজকৃষ্ণ বাবুর এই সস্তার বাজারে গরিব দুঃখী সকলেরই থিয়েটার দেখার সখ মিটিতেছে। রাজকৃষ্ণ বাবু প্রকৃতই বাহাদুর বটেন। একে ঐ দর্শনী, তা'য় নিত্য নিত্য অভিনয়—নূতন নূতন জিনিস—মন্দ কি?

—নিউ-গ্রেণেডাতে একরূপ লতা পাওয়া গিয়াছে, তাহার রসে কালীর কাজ হয়। সেই রস দিয়া লিখিলে প্রথমত অক্ষর লাল হয়, কিন্তু অল্পক্ষণ পরে কাল রঙ্গ ধারণ করে। সেই দেশীয় লোকেরা এই লতা-গাছকে 'কালী লতা' বলিয়া থাকে।

—ডেনমার্ক দেশে জাট্‌ল্যাণ্ডের উপকূলে আলো-গৃহে যে তাড়িত আলোক দেওয়া হয়, পৃথিবীর মধ্যে আর কোথাও এরূপ প্রবল আলো নাই। ২ কোটি চর্ব্বির বাতির আলো একত্রিত করিলে যেরূপ প্রখর আলো নিস্থত হয়, সেই আলোতে তদ্রূপ জ্যোতি' প্রকাশ পাইয়া থাকে।

—রুষিয়াতে খবরের কাগজ চালান এক ঝকমারি কাণ্ড। যে সংখ্যাতে যা'কিছু বাহির হইবে, পত্রিকা-সম্পাদকদিগকে পূর্ব্বে তাহা গভর্ণমেণ্টের নিয়োজিত একজন কর্ম্মচারীকে দেখাইতে হয়। তিনি তাঁহার অভিমতানুযায়ী প্রবন্ধাদি পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করিয়া দেন; তারপর ছাপা হয়। আবার বিদেশ হইতে যত খবরের কাগজ রুষিয়াতে যায়, সেই গবর্ণমেণ্ট-কর্ম্মচারী তৎসমুদায়ও একবার পড়িয়া দেখেন; এবং তাহাতে যে সকল স্থান তাঁহার নিকট আপত্তিজনক বলিয়া মনে হয়, তাহা ছাটিয়া দেওয়া হইয়া থাকে!

—বার্লিন-নগরে বিবাহের উপযুক্ত বয়স্ক স্ত্রীলোকদের এক সভা গঠিত হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরা যাহাতে বিবাহ করিয়া দারিদ্র্যে পতিত ও অসুখী না হন, এই সভা তাহার উপায় অবলম্বন করিবেন। যে সকল পুরুষ বিবাহার্থী হইবেন, এই সভা তাঁহাদের সামাজিক, নৈতিক ও আর্থিক অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া পাত্রের প্রার্থনা গ্রাহ্য করা উচিত কি না, তাহা ঠিক করিবেন। বিবাহাদি পারিবারিক ব্যাপারেও সভাসমিতি! আজকাল সভাসমিতিরই কাল বটে।

—বান্দা জেলার কোন একটী ব্রাহ্মণ রমণী তাঁহার স্বামীর জিনিষ পত্র এবং অলঙ্কারাদিতে দুই হাজার টাকা চুরী করিয়া পলায়ন করিয়াছে। ব্রাহ্মণ বেচারী ফাঁপরে পড়িয়া বিজ্ঞাপন দ্বারা জানাইয়াছেন যে, যে তাহার স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করিয়া দিবে তাহাকে তিনি পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার দিবেন!

—বঙ্গ-নাগপুর রেলপথে পর্ব্বতের তলদেশ দিয়া দুইটী সুরঙ্গ পথ আছে। একটী গেন্দ্রাড়া ঘাটের কুটনী বিলাসপুরে। অপরটির নাম সারন্দা সুরঙ্গ। এটীর নির্ম্মাণ-কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই। লম্বে দুইটাই প্রায় সমান।

অনুসন্ধান।

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

৩য় খণ্ড] ৩২এ আষাঢ়, ১২৯৭ সাল। [২৩শ সংখ্যা।

হর-পার্ব্বতী-স্তব।

জয় জয় উমা—হর-মনোরমা,
জয় ব্যোম ভোলা—পাপী-জন-ভেলা,
ত্বংহি পরমেশ্বরী—ত্বংহি পরমেশ্বর।
প্রকৃতি পুরুখ, দুঁহুরূপ এক,
প্রেম-বাসনায় ভেদরূপ ধর।
ত্বংহি প্রাণ, ত্বংহি জ্ঞান, স্মৃতি বুদ্ধি বিদ্যা মান,
প্রীতি মন, প্রীতি প্রেম, ত্বংহি বিশ্ব-চরাচর।
নিত্য সত্য, শুদ্ধ বুদ্ধ, তুঁহু আদি বাক্য শব্দ
নাশ তমঃ, অহং-জ্ঞান, তুঁহু এক গুণাকর।
নমঃ নমঃ নমঃ পরাৎপর॥

বিশ্বব্যাপী সমুত্থান

বা

নবযুগাবর্ত্তন।

এই পরিদৃশ্যমান বিরাট বিশ্ব একটি প্রকাণ্ড যন্ত্রের স্বরূপ। মাধ্যাকর্ষণ ইহার মূল শক্তি; মহা-জ্যোতিষ্মান মরীচিমালী সূর্য্য ইহার মূল কীলক; পৃথিব্যাদি অগণন গ্রহসমূহ ইহার চক্র-নিচয়; চন্দ্র এবং উপগ্রহগণ পরিরক্ষণী (safety valves); নক্ষত্রপুঞ্জ ইহার নিয়ামক বন্ধন-গ্রন্থি। এই যন্ত্র নিজে চৈতন্য-বিশিষ্ট না হইলেও, অসংখ্য প্রাণীসঙ্ঘের আবাসস্থল। এই প্রাণীকুল প্রতিনিয়ত অবিরাম ক্রিয়াকর্ম্ম-যোগে অনন্তকাল, অনন্ত উন্নতির পথে, অনাদিনাথ আদিকারণ সেই অনন্তদেবের উদ্দেশে ধাবমান হইতেছে। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত-প্রবর মহাত্মা ডার-উইন প্রমাণ-সহযোগে প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে,—জীব ক্রমশঃ "ক্রমবিকাশ"-পদ্ধতিতে উন্নতি-সোপানে আরোহণ করিতেছে। তিনি বলেন,—এই আশ্চর্য্য ইন্দ্রিয়সৌষ্ঠব-সম্পন্ন মনুষ্যজাতি, বহুকাল পূর্ব্বে অস্ফুট-ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট অতি হেয় ক্ষুদ্র কীটানুকীট মাত্র ছিল। এই কথা অতি প্রাচীনকালে বিপুল বিভূতিসম্পন্ন ভারতীয় যোগীগণও যোগপ্রয়োগে জানিতে পারিয়া শাস্ত্রমধ্যে জীবের দেহ-পরিবর্ত্তন, পুনরাবর্ত্তন এবং চতুরশীতিলক্ষ যোনী ভ্রমণের কথা ভূয়োভূয়ো উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যথা,—

"স্থাবরাস্ত্রিংশল্লক্ষশ্চ জলজোনবলক্ষকঃ।
কৃমিজাদশলক্ষশ্চ রুদ্রলক্ষশ্চপক্ষিণঃ॥
পশবো বিংশলক্ষশ্চ চতুর্লক্ষশ্চ মানবাঃ।
এতেষু ভ্রমণং কৃত্বা দ্বিজত্বমুপজায়তে॥"

ইতি কর্ম্মবিপাকঃ।

"সর্ব্বযোনিং পরিত্যজ্য ব্রহ্মযোনিং
ততোঽভ্যগাৎ।"
ইতি বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণম্।
"সর্ব্বষামেব জন্তুনাং মানুষত্বং সুদুর্লভং।"
ইতি গরুড়পুরাণম্।

এই উপরোক্ত শ্লোকগুলির প্রতি একটু অনুধাবন করিলেই, আর্য্য ঋষিগণের অভিপ্রায় এবং গভীর গবেষণার অত্যদ্ভুত প্রমাণ পাওয়া যায়।

আজকাল পাশ্চাত্য প্রধান প্রধান পণ্ডিতমণ্ডলী বিশ্বসংসারের এই ক্রমবিকাশ-প্রণালীর মর্ম্মোদ্ভেদ এবং তাহার ক্রম-ক্রিয়া-নিরূপণ করিবার জন্য অশেষবিধ প্রয়োগপরীক্ষা অবলম্বন করিতেছেন। আমরা এই দৃশ্যমান বিশ্বরাজ্যের সামান্য সামান্য বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলি বিলোকন করিয়া বিপুল জাগতিক নিয়ম নিরূপণে সমর্থ হই। মহাত্মা সার্ আইজাক্ নিউটন, বৃক্ষচ্যুত ফলের অধঃপতন দর্শন করিয়া, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অস্তিত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; এবং ক্রমশঃ অনুসন্ধানে ও পরীক্ষা-যোগে, প্রমাণ-পরম্পরায়, ব্রহ্মাণ্ডের অতি দূরবর্ত্তী গ্রহনিকরেও ঐ শক্তির সত্তা অনুভব করিয়া, এককালে জগতের তাবৎ পরমাণুমধ্যে ঐ অমোঘশক্তির অস্তিত্ব এবং ক্রিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যদিচ বহুকাল পূর্ব্বে ভারতীয় জ্যোতিষ-গ্রন্থ "সিদ্ধান্ত-শিরোমণী"-মধ্যে ঐ তত্ত্ব—"আকৃষ্টশক্তিশ্চ মহী, তয়াযৎ খস্থং গুরুং স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা আকৃষ্যতে তৎ পততীব ভাতি, সমে সমন্তাৎ ক্ব পততীয়ং খে"—এইরূপ বিশদবাক্যে বিবৃত হইয়াছিল; তথাপি আর্য্য-জ্যোতিষের চর্চ্চার অভাবে, উহাই আজ নূতন আকারে—অভিনব তত্ত্ব বলিয়া, সাদরে সমাদৃত হইতেছে।

গ্রহ-নক্ষত্রের উদয়াস্ত, ঐতিহাসিক ঘটনাপুঞ্জ এবং সামাজিক পরিবর্ত্তনের প্রতি দৃষ্টি করিলেও, ঐরূপ বহুবিধ ব্যাপক নিয়মনিচয় নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ বিশাল ব্যোমস্থিত প্রোজ্জ্বলতম পদার্থ সূর্য্যের উদয়াস্ত ধরিয়া জাগতিক ক্রমবিকাশ-তত্ত্বের একাংশের একটু আলোচনা করা যাউক। পাঠকগণ মানচিত্রপটে দেখিয়াছেন যে,—'চীনরাজ্য' প্রাচীন মহাদ্বীপের সর্ব্ব-পূর্ব্বসীমায় অবস্থিত। বোধ করি, এই অবস্থানের বিশেষত্ব-হেতু ঐ দেশের নাম ঐরূপ হইয়া থাকিবে। 'চিৎ" 'চিত্ত,' 'চিত্র,' 'চিক্কণ,' 'চিহ্ন,' 'চীন' এবং ইংরাজী 'sheen' এবং 'shine' এই সমস্ত পদগুলি ভাষাতত্ত্বের নিয়মানুসারে বিশ্লেষ করিলে একমাত্র প্রকৃতি 'চিৎ'-পদে সমানীত হইতে পারে। 'চিৎ' শব্দের অর্থ 'বোধ', 'জ্ঞান' বা 'প্রকাশ'। যেখানে জ্ঞান বা প্রকাশ, সেইখানেই আলোকের সম্বন্ধ। সুতরাং সূর্য্যের সহিত 'চীন'-দেশের নিকট সম্বন্ধ হওয়াতেই ঐ দেশের নাম 'চীন' হইয়াছে। 'চীনের' আর একটি আভিধানিক অর্থ 'পতাকা' বা 'নিশান'; অর্থাৎ যে ঊর্দ্ধে গমন করিয়া শোভিত ও প্রকাশিত হয়।

পাঠক! মনে করুন, যেদিন জগতে প্রথম সূর্য্যোদয় হইল, সে দিবস অবশ্য ভাগ্যবান চীনদেশবাসীগণ সর্ব্বপ্রথমে তরুণারুণ-তপন সন্দর্শনে নয়নদ্বয়ের সার্থকতা ও নিরতিশয় আনন্দ উপভোগ করিয়াছিল! সেইদিন যখন প্রভাতের প্রশান্ত সময়ে প্রশান্তসাগরের অগাধ বিপুল সলিলাভ্যন্তর হইতে অপূর্ব্ব-কান্তি ধ্বান্তহারী প্রোজ্জ্বল জগল্লোচন নলিনীকান্ত ক্রমশঃ ক্রমশঃ বালারুণ-মধুর-কিরণ-নিকরে চীনদেশের উপকূল-পুলিন চিহ্নিত করিয়াছিলেন, সেই চিক্কণ চাকচিক্যময় প্রথম প্রভাপুঞ্জে রঞ্জিত হইয়াই ঐ দেশ 'চীন' অর্থাৎ 'উজ্জ্বলালোকময়' এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। সূর্য্যই জগৎকে প্রকাশিত করে; সূর্য্যই সংসারকে জাগরিত করে; সূর্য্যই প্রাণবহ্নি প্রস্ফুরণ পুরঃসর প্রাণীকে কর্ম্মে প্রয়োগ করে; সূর্য্যই জগৎ-যন্ত্রের অধিনায়ক হইয়া বিশ্বকে চলমান করেন; সূর্য্য হইতেই কালারম্ভ এবং ক্রিয়া-প্রবাহ প্রোৎসারিত হইয়া থাকে। যখন জানা গেল,-'চীনদেশে' সর্ব্বপ্রথমে সূর্য্যোদয় হইয়াছে, তখন অবশ্যই তদ্দেশবাসীগণ সর্ব্বপ্রথমে জাগরিত হইয়া জগতের বিষয়-ব্যাপারের জ্ঞানলাভ করিয়া প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ হইয়াছে; এবং ইতিহাসেও দেখা যায়, যত কেন প্রগাঢ়তর প্রাচীন-কালের ঘটনা-সমুদ্রে নিমগ্ন হও না, চীনদেশের সভ্যতার চিহ্ন সর্ব্বস্থানেই সুপ্রকাশিত রহিয়াছে। প্রাচীনতায় এবং পুরাণ-তত্ত্বে কোন্ দেশ চীনকে পরাস্ত করিতে সমর্থ?

পুরাণে সুমেরু-পর্ব্বতের আশ্চর্য্য বর্ণনা ও প্রশংসা আছে। ঐ সুমেরু সুবর্ণ-নির্ম্মিত বলিয়া কিম্বদন্তি আছে; এবং তথায় প্রধান প্রধান দেবতাগণের আবাস ছিল বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। এমন কি, সুমেরু-পর্ব্বতই, পৃথিবীর মধ্যে সুন্দর, শ্রেষ্ঠ এবং উৎকৃষ্ট স্থান বলিয়া অসংখ্য শ্লোকে উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা,—

" সতু মেরুঃ পরিবৃতো ভুবনৈর্ভূতভাবনৈঃ।
যস্যে মে চতুরো দেশা নানা-পার্শ্বেষু সংস্থিতা॥
ভদ্রাশ্ব ভারতশ্চৈব কেতুমালশ্চ পশ্চিমে।
উত্তরাশ্চৈব কুরবঃ কৃতপুণ্য প্রতিশ্রয়াঃ॥
ইতি মৎস্যপুরাণম্।

"শৃঙ্গঞ্চ পশ্চিমং যস্য ব্রহ্মাতত্রস্থিতঃ স্বয়ম্।
পূর্ব্বশৃঙ্গে স্বয়ং বিষ্ণু মধ্যে চৈব শিবস্থিতঃ॥"
নারসিংহ পুরাণ ৩০ অধ্যায়॥

অর্থাৎ পূর্ব্বে ভদ্রাশ্ব (চীন); দক্ষিণে ভারতবর্ষ; পশ্চিমে কেতুমাল; এবং উত্তরে উত্তর-কুরু বর্ষ (এসিয়িক রুষিয়া)—এই চারিদেশের মধ্যস্থলে সুমেরু-পর্ব্বত ছিল। এই পর্ব্বতের তিনটি প্রধান শৃঙ্গ ছিল। তন্মধ্যে, পশ্চিমশৃঙ্গে ব্রহ্মা অবস্থান করিতেন, পূর্ব্বশৃঙ্গে বিষ্ণু অবস্থান করিতেন, এবং মধ্যশৃঙ্গে মহাদেব শিব বিরাজ করিতেন। এক্ষণে বেস বুঝা যাইতেছে যে,—সুমেরু চীনের পশ্চিমভাগে চীন-তাতারের মধ্যে ছিল। সুমেরু বিশ্বের তাবৎ পর্ব্বত অপেক্ষা উচ্চ ছিল। সুতরাং সুমেরু যদি চীনের কিয়দংশ পশ্চিমদিকে অবস্থিত ছিল, সূর্য্যোদয়-কালে অবশ্যই সর্ব্বাগ্রে ঐ উচ্চতম সুমেরু-শৃঙ্গাগ্রেই তপনের কনককান্তি স্পর্শ করিত। যিনি যাহাই বলুন, মনুষ্যজাতির আদি-সভ্যতা ঠিক কোন্ নির্দ্দিষ্ট স্থলে হইয়াছিল, তাহা কেহই নিঃসংশয়রূপে নিরূপণ করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, পূর্ব্ব-মহাদ্বীপের পূর্ব্বভাগ হইতে যে সভ্যতা-স্রোত উৎসারিত হইয়াছিল, তাহা উপরোক্ত পৌরাণিক শ্লোকমালার দ্বারা এক-প্রকার সাব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার তিন ব্যাপারের কর্ত্তা, তিন প্রধান দেবতাই যখন চীন-সান্নিধ্যে অবস্থিতি করিতেন; তখন ঐ স্থানই যে সুন্দরতম, পবিত্রতম ও সভ্যতম ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। চিরদিনই স্বয়ং রাজা বা সম্রাট যে স্থানে বাস করেন, সেই স্থানই রাজধানী-রূপে সুন্দরতম ও সভ্যতম হইয়া থাকে। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেও চীন বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থান হইতেই সভ্যতার সূত্রপাত হইবারই কথা। আর ইতিহাসেও এই স্বাভাবিকী ক্রিয়ার পরিপোষক প্রমাণ-পুঞ্জ পাওয়া যাইতেছে। এক্ষণকার ভাষাতত্ত্ববিদ্, পুরাণবিদ্ ও বৈজ্ঞানিক ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরাও মধ্য-এসিয়া হইতে ক্রমশঃ সভ্যতা-প্রবাহ পশ্চিমাভিমুখে গিয়াছে, এই কথা একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন। পুরাণ ও ইতিহাস-পাঠে স্পষ্টই প্রমাণ পাইবেন, ঐ সুমেরু হইতে ভারত, ভারত হইতে ইরাণ, ইরাণ হইতে আসুরিয়া (Assyria বা Turkey) তথা হইতে মিশর, মিশর হইতে গ্রীস, গ্রীস হইতে ইটালী, ইটালী হইতে স্পেন, স্পেন হইতে ফ্রান্স, ফ্রান্স হইতে ইংলণ্ড, ইংলণ্ড হইতে আমেরিকা। আজ আবার এই ঊনবিংশ শতাব্দির শেষভাগে, প্রকৃতির ক্রমবিকাশ-প্রণালীর

মধ্য দিয়া সভ্যতাস্রোত পৃথিবীর পরিধি-বৃত্ত পরিভ্রমণ করিয়া, পূর্ব্ব-মহাদ্বীপের পূর্ব্ব-দেশস্থিত প্রাচীন ভারতে সমাগত হইয়াছে। আজ ভারতের শব্দ-বিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যার ব্যোমব্যাপক বিপুল বিভায় বিশ্ব চমৎকৃত হইয়াছে! কোথাও এমন বিশুদ্ধ বিপুল ভাষা নাই, কোথাও এমন পবিত্রোন্নত ভাব নাই! ধন্য ভারত! ভগবান যথার্থই তোমাকে নিপট পর্ব্বত-বেষ্টন ও সমুদ্র-পরিখা দ্বারা নির্ব্বাচিত রত্নরূপে, যত্নের সহিত ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডারের কোষগৃহরূপে সুরক্ষিত রাখিয়াছেন। আজ ইউরোপ ও আমেরিকার তাবৎ মনিষীগণ মুক্তকণ্ঠে তোমার অগণন গুণ-গাথা গান করিতেছে! তোমার বেদ, তোমার স্মৃতি, তোমার পুরাণ, তোমার দর্শন, তোমার জ্যোতিষ, তোমার সঙ্গীত-শাস্ত্র, তোমার বাল্মীকি, তোমার ব্যাস, তেমার কালিদাস, তোমার কপিল, তোমার কনাদ, তোমার অত্রি, তেমার গৌতম, তোমার বুদ্ধ, তোমার শঙ্কর, তোমার চৈতন্য, তোমার শাণ্ডিল্য, তোমার ধ্রুব, তোমার প্রহ্লাদ, তোমার সতী, তোমার সাবিত্রী, তোমার অভিমুন্য, তোমার কর্ম্মদেবী, তোমার রাম, তোমার লক্ষণ—জগতের যাবতীয় জ্ঞানীগণের কৌতূহল উদ্দীপিত করিয়াছে। আজ কোলব্রুক, সার উইলিয়ম জোন্স, ল্যাসেন, ওয়েবার, ষ্ট্রেঞ্জ, বর্ণফ, হার্ডি, জ্যাকোলিয়ট, মোক্ষমূলর, গেটে, টেলর, উইলসন, ম্যাডাম ব্লাভাট্স্কী, কর্ণেল অলকট প্রভৃতি তাবৎ পণ্ডিতমণ্ডলী ভারত-বৈজয়ন্তি প্রোড্ডিন করিয়া ভৈরব ভেরীনাদ-সহ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া প্রচণ্ড ডিণ্ডিম প্রচার করিতেছেন। আজ কপিলের সাংখ্য, পাতঞ্জলের যোগ, শঙ্করাচার্য্যের জ্ঞান, বুদ্ধদেবের বৈরাগ্য লইয়া জ্ঞানীকুল সমাকুল; কেহ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, কেহ খৃষ্টিয়ান-সম্প্রদায় সংশোধন করিতেছেন, কেহ বা থিওসফি-স্থাপনের জন্য আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন! আজ পুণ্য-ভূমি ভারতের দুঃখনিশা অপগত হইবার উপক্রম হইয়াছে। আজ ধর্ম্মসূর্য্য অভিনব প্রভায় ভারতাকাশে প্রকাশিত হইয়া, অজ্ঞানান্ধকার ও কলুষ-কলঙ্ক বিদূরিত করিতেছেন। স্থানে স্থানে ধর্ম্মসভা, পল্লীতে পল্লীতে বিদ্যালয়; বঙ্গের চিরদূষিত নাট্যরঙ্গালয়ে ধ্রুবচরিত্র, প্রহ্লাদচরিত্র ও চৈতন্যলীলা প্রভৃতি পবিত্র পুণ্যকর নাটকাদি অভিনীত হইতেছে। অধিক কি, পাপের সর্ব্বনিম্ন-স্তরে অবস্থিত বারাঙ্গনারাও গলিতে গলিতে "হরি-সঙ্কীর্ত্তনসভা" প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। আজ ভারতে নবযুগের আবির্ভাব! প্রবিলুপ্ত আর্য্য-ধর্ম্মাগ্নি পুনরায় প্রধুমিত হইয়া প্রাচীন পুণ্য ভারতের গুণগরিমা উত্তেজিত করিতেছে।*

আজ শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণও প্রাচীন ভারতের ন্যায় বিদ্যাশিক্ষার সহিত ধর্ম্ম ও নীতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে পারিতেছেন। আজ মাংসভোজী ইউরোপে হিন্দুর "অহিংসা পরমোধর্ম্মের" প্রকৃষ্টতা উপলব্ধি করিয়া স্থানে স্থানে নিরামিষভোজী সভার-সম্প্রতিষ্ঠা হইতেছে। আজ ভারতীয় বৌদ্ধগণের ন্যায় খৃষ্টিয়ানেরাও পৃথিবীর প্রত্যেক স্থানে ধর্ম্ম-মর্ম্ম প্রচারিত করিতেছেন। আজ ইউরোপ ভারতকে সভ্যতার জন্মদাত্রী, ধর্ম্মের জননী এবং কর্ম্মের বিশাল প্রাঙ্গনভূমি বলিয়া স্বীকার করিতেছে। ধন্য আমরা যে এই প্রাচীনতম পবিত্রতম ভারতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছি! কঠোর কৃচ্ছ্র-পরায়ণ, পর্ণাহারী, ঊর্দ্ধরেতা, অগ্নিহোত্রী, আর্য্য ঋষিপুঞ্জ-সঞ্চিত সেই ধর্ম্ম-ভাবাগ্নি প্রোজ্জ্বলিত প্রভায় দিগ্‌দিগান্তে প্রধাবিত হইতেছে; এবং নিশ্চয় আগামী বিংশ শতাব্দির মধ্যে আর্য্যধর্ম্ম বিশ্বের বিপুল কলুষরাশি বিধ্বংশ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডে বিচিত্র পবিত্র পুণ্য পরম্পরা প্রতিষ্ঠিত করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

* এতৎসম্বন্ধে আমাদের মত স্বতন্ত্র। আমরা দিন দিন ধর্ম্মের অবনতি বই যে উন্নতি হইতেছে, তাহা বিশ্বাস করি না। এ সম্বন্ধে সুবিধা-মত আমাদের মন্তব্য প্রকাশের বাসনা রহিল।— সম্পাদক।

শ্রীঃ—

মথুরামোহন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ব্যভিচারিণী-সন্দর্শনে।

বৈঠকখানা হইতে বাহির হইয়াই, কর্ত্তা বরাবর গিন্নীর মহলে গমন করিলেন। রজনী দ্বিপ্রহর অতীত-প্রায়; সকলেই নিদ্রিত—জগৎ নিস্তব্ধ। কর্ত্তা ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া গিন্নীর শয়ন-কক্ষের উন্মুক্ত বাতায়ন-পথ দিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মস্তকে বজ্রাঘাত পড়িল—বুকে শেল বিঁধিল। তিনি কহিলেন,—"ওইতো কুলকলঙ্কিনী সুখে উপপতির অঙ্কে শায়িত! ওইতো পাপীয়সী সুখনিদ্রায় অচেতন! ওঃ কাহার কি পরিণাম! হায়, ইহারই কথায় আমি আমার সোণার সংসার ছারে,-খারে দিয়াছি! ইহারই কথায় বসন্তকে হারাইয়াছি! ইহারই কথায় মাতাল হরিচরণের হস্তে সোণার প্রতিমা সরলাকে অর্পণ করিতেছি! পৃথিবী বিদ্ধ হও, মাতঃ! আমি তোমার গর্ভে প্রবেশ করি। বজ্র! তুমি আমার শিরে পড়িয়া আমায় সংসার-যাতনা হইতে মুক্ত কর—আর সহ্য করিতে পারি না। (কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর) কি! আমার অন্নে প্রতিপালিত হইয়া আমার প্রতি এই অত্যাচার! নরহত্যা—স্ত্রীহত্যা—ব্রহ্মহত্যা—কিছুতেই আজ আর পাপ নাই।"

এই বলিয়া কর্ত্তা বেগে প্রস্থান করিলেন। তিনি যেরূপ চীৎকার করিয়াছিলেন, তাহাতে এক জনের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। পাপাষ্ঠ পুরোহিত-পুত্র ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, ব্রাহ্মণ-কুলে কালী দিয়া, ব্যভিচারিণীর উপপতি হইয়াছিল। যেদিন কর্ত্তা বহির্বাটীতে শয়ন করিতেন, সেই দিনই সে রজনী-যোগে লুক্কাইত-ভাবে খিড়কী-দ্বার দিয়া এই বাটীতে প্রবেশ করিত। আজও তাহাই ঘটিয়াছিল। কর্ত্তার ভীষণ চীৎকারে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সে এদিক ওদিক চারিদিক দেখিয়া,—"কই? এইমাত্র কর্ত্তার গলার আওয়াজ শুন্‌লেম্ নয়? 'নরহত্যা—স্ত্রীহত্যা—ব্রহ্মহত্যা' এইমাত্র তাঁহার কণ্ঠে উচ্চারিত হইল না? বোধ হয়, সব কথা প্রকাশ হয়েছে। কাজ নাই, আমি পলায়ন করি।"—এই ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান করিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই উন্মুক্ত অসি-হস্তে, ভীষণ মূর্ত্তিতে কর্ত্তা সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন; এবং "কই সে পাষণ্ড, বিশ্বাসঘাতক কই? নেই—পালিয়েছে! আচ্ছা যাক, কালশাপিনী, এখনও নিদ্রায় অচেতন—এই নিদ্রাই তোর শেষ নিদ্রা হবে।"—এই বলিয়া তিনি পত্নীর গলদেশ লক্ষ করিয়া সজোরে সেই আসর আঘাত করিলেন। এমন সময় নেপথ্যে—"কর্ত্তা—কর্ত্তা"—বলিয়া সকরুণ স্বরে কে ডাকিল।

পরিচিত স্বর শুনিয়া দ্রুতবেগে রক্তাক্ত কলেবরে কর্ত্তাও সেই দিকে গমন করিলেন।

দেখিলেন, সম্মুখে দাওয়ানজী। দাওয়ানজী কহিলেন,—"কর্ত্তা—কর্ত্তা! কর্‌লেন্ কি?"

কর্ত্তা!—কি করেছি? খুন!—খুন!—তোমার ভয় হয়েছে? সরে যাও—সরে যাও—আমায় দেখোনা। আমার মত পাপীষ্ঠের মুখদর্শন করোনা? দেখ, আমি নিজ-হস্তে এই বৃদ্ধ-বয়সে স্ত্রীহত্যা করেছি; ব্রহ্মহত্যাও হয় তো করিতাম। কিন্তু দুরাচার পালিয়েছে।"

কর্ত্তা এই পর্য্যন্ত বলিতেছেন, এমন সময় স্ত্রী-কণ্ঠে অত্যন্ত চীৎকার করিয়া নেপথ্যে কে বলিল,—"ওগো, তোমরা কেউ এসোগো! সরলা পুকুরে ডুবেছে।"

চমকিত হইয়া কর্ত্তা উচ্চকণ্ঠে কহিলেন,—"কে, সরলা! পুকুরে ডুবেছে? কেন? মাতাল হরিচরণের সঙ্গে কাল যে তার বিবাহ! চল দাওয়ান—এখনই চল।"

দা।—না, আপনার যাওয়া হবে না। আপনি শীঘ্র এই রক্তাক্ত কাপড় ছেড়ে ফেলুন—এখনও রক্ষার উপায় আছে। গিন্নীর ঘর আমি চারিদিকে বন্দ করে এসেছি। সে খুন কাহারও নজরে পড়িবে না।

এই বলিয়া তিনি বেগে প্রস্থান করিলেন।

কর্ত্তা।—এখনও রক্ষার উপায় আছে! পৃথিবীতে না হয় এড়ালেম; শাসন-চক্ষুর অন্তরালে, না হয়, নানাবিধ দুষ্কার্য্য করেও নিষ্কৃতি পেলেম; কিন্তু উপরে তো ভগবান আছেন!

আর কর্ত্তা সেস্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না। ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

* * * *

দাওয়ানজীর বুদ্ধিমত্তায় ও কার্য্য-তৎপরতায় সরলাকে জল হইতে উত্তোলন করা হইল; তাহাকে তাহার শয়ন-কক্ষে শায়িত করান হইল। ডাক্তার-কবিরাজ উপস্থিত হইলেন। সুশ্রুষা চলিতে লাগিল।

তখন দাওয়ানজী একজন চাকরকে ডাকিয়া কহিলেন,—"ওরে দীনে! ওপাড়া থেকে বিনোর মাকে ডেকে নিয়ে আয় তো।'

"যে আজ্ঞে"—বলিয়া দিনে বেগে প্রস্থান করিল।

দাওয়ানজী তখন দাসীকে দিয়া গিন্নীর মাকে বলিয়া পাঠাইলেন—"বল্‌গে, তাঁর মেয়ে পুরুত-পুত্রের সঙ্গে যে পথে গিয়েছে, সেই পথে তাঁকে আর হরিচরণকেও যেতে হবে। কাল সকালে মাথা ন্যাড়া করে, ঘোল ঢেলে, কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয় করে দেবো।"

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে দাসী হাসিয়া কহিল,—"ওমা! বলো কি গো?"

"গিন্নীর মহলে চাবি পড়েছে, গিয়ে দেখ্‌গা!"—এ কয়েকটি কথা বলিয়া ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে তিনি প্রস্থান করিলেন। তিনি যাইতেছেন, এমন সময় দীনে ও বিনোর মা আসিল।

বিনোর মা কহিল—"আহা! সোণার বাছা আমার নেতিয়ে পড়েছে গা! ওমা, কেন এমন কাজ করলি মা? পোড়ারমুখী মাগি সব সর্ব্বনাশ কর্‌লে গা!"—এই বলিয়া সে সরলার শিয়রে উপবেশন করিল।

দা।—যাগ্‌ বাছা, আবার সব ভাল হবে। তুমি এখন যত্ন করে, সেবা-সুশ্রুষা করে মেয়েটিকে বাঁচাও দিকি মা! কর্ত্তাকে বলে আমি তোমার বিনোর ভাল চাকরি করে দেবো। এখন আমি চল্লুম। তুমি এইখানে থাক। কিছু দরকার হ'লেই, আমাদের ডেকে পাঠিও।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া একদিক দিয়া দীনে ও অপর দিক দিয়া দাওয়ানজী প্রস্থান করিলেন। বিনোর মা প্রফুল্লচিত্তে অনুচ্চস্বরে কহিল,—"এই যে ফল ধরেছে, বোধ হচ্চে! যাগ্‌ আবাগীর বেটা উচ্ছন্ন যাগ! আমার বোধ হচ্চে, কর্ত্তা নিশ্চয়ই বাড়ীর ভেতর এসে কাণ্ড-কারখানা দেখে গিয়েছেন। যদি কর্ত্তা টের পেয়ে থাকেন, তা'হলে আমি এক ঢিলে তিন পাখি মেরেছি। গিন্নীকে ত্যাগ, গিন্নীর মার এবাড়ি থেকে অন্ন-ওঠা, আবার বসন্ত-সরলার মিলন! আহা! বিধাতা এমন দিন কি করবেন? (সরলার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া) মা! সরলা! ওঠ মা! আর তোমার ভাবনা কি মা! তোমার সর্ব্বনাশ আমি করেছিলেম; আমিই আবার তোমার সুখের দিনের আয়োজন করেছি। আহা! বসন্তবাবু যদি এসময় থাকতেন!

সরলা।—আ—মা—(বমন)

বিনোর মা।—আ! বাঁচ্‌বে—বাঁচ্‌বে! মা রক্ষাকালী রক্ষা কর মা! এত বড় সোণার

সংসার ছারেখারে দিওনা মা! (কিয়ৎক্ষণ পরে) ঝি—ঝি—এখানে কেউ আছিস্‌ গা?

এই সময় অপর একজন দাসী প্রবেশ করিল। বিনোর মা তাহাকে দেখিয়াই অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে কহিল,—"একবার যাতো মা! ডাক্তার বাবুকে ডেকে নিয়ে আয়তো! মিনিটে মিনিটে এত জল বমি কর্‌চে কেন?—(অনুচ্চস্বরে) আর দেখ! একবার আসবার সময় গিন্নীর মহলের দিকে হয়ে আসিস্‌ তো!"

দাসী।—ওমা। তা' বুঝি তুমি জান না? আমি এতক্ষণ সেই দিকেই তো ছিলেম! আমায় মেরে তাড়িয়ে দিলে গো—আমায় মেরে তাড়িয়ে দিলে! দাওয়ানজীর হুকুমে আজ তার চারিদিকে বড় বড় লেঠেল-পাইক লাঠি-সড়কি খেলে যেন বেহ্মদত্তির মত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে গো—বেহ্মদত্তির মত ধুরে বেড়াচ্চে। কর্ত্তার সাধের গিন্নী—তার জন্যে আলাদা বাড়ী, তার চারদিকে বাগান। বাড়ীর ভেতর দিয়ে পথ থাক্‌তো তো যেতে পার্‌তুম। কে বাপু, এখন সেখানে মাথা দিতে যাবে।

বিনোর মা।—কেন বল্‌ দেখি? ব্যাপার কি?

দাসী।—কিজানি বাপু! তবে দেখেছি বটে, বুড়ো দাওয়ানজী ম'শায় যেন যুবো ছোক্‌রার মত ছুটোছুটি করে বেড়াচ্চে। আরও লুকিয়ে লুকিয়ে শুন্‌লুম, দাওয়ানজী মশায় প্রায় ২৬।২৭টা পাক আর সড়কিওয়ালা ডেকে হুকুম দিলেন,—'আমি এই গিন্নীর মহলে সদর দরজায় চাবি দিয়ে গেলুম। যতক্ষণ না আমি ফিরে আসি, তোরা ততক্ষণ কারুকে এর ত্রি-সীমানায় আস্‌তে দিবি না।'

বিনোর মা।—যাক্‌ বাছা! তবে ওকথায় আর কাজ নেই। তুই একবার বারবাড়ীর দিকে গিয়ে ডাক্তার ম'শাইকে শীগ্‌গীর ডেকে দিতে বল্‌গে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ফলাফল।

দাওয়ানজীর কথায় গিন্নীর মাতা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। নারাণী দাসী সত্য-সত্যই গিয়া দেখিয়া আসিল যে, গিন্নীর মহলে চাবি পড়িয়াছে। তখন তাহারও যাহা কিছু সংস্থান ছিল, লইয়া পলায়নের চেষ্টা দেখিতে লাগিল।

নারাণী বলিল,—"আর কি করবে বল মা! এবাড়িতে আমাদের অন্ন উঠেছে।"

গিন্নীর মা।—আবাগী মেয়ে কর্‌লে কি গা! তাই যাবি যা', আমায় নিয়ে যা!

নারাণী।—ওগো সে কথা পরে হবে গো, পরে হবে। আপাততঃ যা' কিছু পার, সরিয়ে নেও। নিয়ে, চলো, আমরাও পথ দেখি। দাওয়ানজী বল্‌লে কি, শুনেছো তো!

গিন্নীর মা।—যদি ধরা পড়ি?

নারাণী।—ধরা পড়বে কেন? তুমি এই খিড়কীর পথ দিয়ে বেরিয়ে, পুকুর ঘুরে কলা-বাগানের ভেতর দিয়ে সেই শিবের মন্দিরে গিয়ে বসে থাকগে, আমি যাচ্চি।

গিন্নীর মা।—ওলো, আজ দেখ্‌লি তো ও-মহলের চারিদিকে পাক-সড়কিওয়ালা ছুটো-ছুটি করে বেড়াচ্চে। যদি একটা ছুটে এসে ধরে ফেলে, তা'হলেই সর্ব্বনাশ হবে!

নারাণী।—সে জন্যে তোমার ভাবনা নেই। এই ছোট বাক্সটা বই আর তো কিছু নেবে না?

গিন্নীর মা।—আর ছাই, পাঁস্‌ নিয়ে কি কর্‌বো! এতেই প্রায় ৩০ হাজার্‌ টাকার নোট আছে।

নারাণী।—(স্বগতঃ) ওটাকা আমার কপালেই আছে। (প্রকাশ্যে) ওগো! কে আসেগো; তুমি পালাও, পালাও। অমি টাকার বাক্স নিয়ে গেলে, কেউ সন্দেহও কর্‌তে পার-

বেনা—ধরাও পড়েবেনা। যাও—যাও—শীগ্‌গীর যাও, আর দেরী করো না।

গিন্নীর মা।—(কিয়ৎ দূর গিয়া) ওলো, আমার হরিচরণকে শিবের মন্দিরের কাছে পালিয়ে যেতে বলে আসিস্।

নারাণী।—ওগো! আমি সব করবো গো—সব করবো! তুমি আগে শীগ্‌গীর পালাও।

দেখিয়া-শুনিয়া, কতক বুঝিয়া, গিন্নীর মা প্রস্থান করিলেন।

নারাণী।—নারাণী কি তেমনি মেয়ে যে, তোমার মুখে এই রাজার ভোগ তুলে দেবে—এখন, শিবের মন্দিরে গিয়ে মাথা খুঁড়ে মর-গে। নারাণী এই সদর দিয়ে বেরিয়ে সটান দেশ-মুখো হলো।

নারাণী প্রস্থান করিল।

* * * *

এদিকে দাওয়ানজী অনেক বুদ্ধি খাটাইয়া, অনেক চাপাচুপা করিয়া, গিন্নীর মৃতদেহ জালাইবার আয়োজন করিতেছিলেন। মজুমদার মহাশয় এ বিষয়ে তাঁহাকে সম্পূর্ণ সহায়তা করিতেছিলেন।

নারাণী দাসী হরিচরণকে লইয়া পলাইতেছিল। পথে ধরা পড়িল। দাওয়ানজীর কড়া হুকুম—কেহ বাটী হইতে বাহির হইতে পারিবে না। পাইক চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। চোরের ন্যায় পলায়ন করিতে দেখিয়া তাহাদিগকে ধরিল।

এই সময় দাওয়ানজী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোলমাল দেখিয়াতিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিরে! গোলমাল কিসের রে?"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অন্তিমে।

কি ছিলেন, আর কি হইলেন? যে স্ত্রীর কথায় কর্ত্তা বসন্তকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন, আজ স্বহস্তে তাহাকে বধ করিলেন। এই সকল ঘটনার দুই চারিদিন পরে, একদিন নিভৃত কক্ষে বসিয়া ভাবিতেছেন,—"আমি খুন কর্‌লেম? এই বৃদ্ধ বয়সে কর্‌লেম কি? বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেই তো পার্‌তেম্! দাওয়ানজীর সুকৌশলে আমি জগতের কাছে নির্দ্দোষী হয়েছি; তাঁহার বুদ্ধিমত্তায় পুলিষের হাত থেকেও নিস্কৃতি লাভ করেছি; কিন্তু উপরে আমায় কে রক্ষা কর্‌বে? সেখানে তো কৌশল চল্‌বে না—সেখানে তো ঘুষ চলবে না—সে নরক থেকে আমায় কে রক্ষা কর্‌বে? ওঃ জীবনের এই শেষভাগে আমি কি ভয়ানক পাপই কর্‌লেম্?"

দাওয়ানজী আর মজুমদার মহাশয় আজকাল আর বড়-কর্ত্তার কাছ-ছাড়া হয়েন না। তবে অল্পক্ষণের জন্য কোথাও গিয়াছিলেন। তাঁহারা আসিয়া কর্ত্তাকে ঐরূপে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া দাওয়ানজী কহিলেন,—"ঐ দেখুন ম'শায়, উনি দিবারাত্রি ব'সে ব'সে খালি ঐ ভাবনাই ভাবচেন! মানুষ আর পাগল হয় কি করে? দিবারাত্রি এক ভাবনা ভাব্‌লেই মস্তিষ্ক বিগ্‌ড়ে যায়! বল্‌লেম, বিষয়-আশয় দেখুন; যেমন জমীদার, তেমনি জমীদার হয়ে বসুন। তা না ভেবে ভেবে এই কয়দিনের মধ্যে শরীরখানা কি করে ফেলেছেন, দেখুন না!

কর্ত্তা।—দাওয়ানজী! তুমি যা' আমায় বল্‌চো সব আমি বুঝ্‌তে পারচি—এখনও আমার জ্ঞান আছে। কিন্তু কি বল্‌বো, বোধ হয়, আর দুই চারি দিনের মধ্যেই আমি পাগল হয়ে যাবো।

দা।—ও ছাই ভাবনা ছেড়ে দিন না!

কর্ত্তা।—পারি কই? আমার সম্মুখে যেন নরকদ্বার উন্মুক্ত! আমার পিছনে-সাম্‌নে যমদূতগুলো যেন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে! আমার শেষ দিন যেন এগিয়ে আস্‌ছে! দাওয়ানজী! বসন্তকে কি আর একবার দেখ্‌তে পাব না?

এইপর্য্যন্ত বলিয়া, তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। দাওয়ানজী তাঁহার এ প্রকার ভাব সন্দর্শনে কহিলেন,—"সে কি কথা! তিনি এলেন বলে! তিনি হয়তো আজই এসে পড়্‌বেন্।"

কর্ত্তা সে কথায় মনোযোগ না দিয়া কহিলেন,—"দেখ, মজুমদার! তুমি দেখ্‌তে পাচ্চ কি? দেখ, দেখ, ঐ রক্তাক্ত কলেবরে ভীষণ মূর্ত্তিতে আমার কুলকলঙ্কিনী ক্রোধ-কষায়িত লোচনে, বিকট মুখব্যাদন করতঃ আমায় গ্রাস করিতে আস্‌ছে! আর বসন্তের মা জ্যোতির্ম্ময়ী শান্তিময়ী মূর্ত্তিতে মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে তাকে আস্‌তে দিচ্চেন না। দেখ, দেখ কি ভয়ানক আকৃতি! ঐ এলো—ঐ এলো—আমায় ধরো! তোমরা আমার কাছে এসো! লেপ-কাঁথা দিয়ে আমায় মুড়ে ফেলো——"

ম।—আপনি একটু স্থির হন। ওসব অলীক ভাবনা মন থেকে একেবারে তাড়িয়ে দিন।

কর্ত্তা।—দাও—দাও—দরজা দাও! ঐ এলো—ঐ এলো! ওঃ—কি ভীষণ মূর্ত্তি!

ম।—যান—যান—আপনি কবিরাজ মহাশয়কে খবর দিন।

দাওয়ানজী দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন। কর্ত্তা যে ছায়া দেখিয়া ভীত হইতেছিলেন, তাহাও বুঝি এই সময় অন্তর্হিত হইল।

ম।—কর্ত্তা! কর্ত্তা!!

কর্ত্তা।—কেও মজুমদার! কেন ডাক্‌চো? কেন এসেছো? দেখ, এই বৃদ্ধ বয়সে খুন করেছি, স্ত্রীহত্যা-পাতক করেছি। আমায় স্পর্শ কর্‌তে তোমার ঘৃণা হচ্চে না?

ম।—চলুন, একটু বাগানে বেড়াবেন?

কর্ত্তা।—আমি কি উঠতে পারি, আমার গায়ে কি আর রক্ত আছে। ঐ দেখো! দেখো! আমায় ধর—ধর—এলো—এলো।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া কর্ত্তা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মজুমদার মহাশয় সেবা-সুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

* * * *

বসন্ত বাবুকে টেলিগ্রাফ করা হইয়াছিল। তিনি যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া গ্রামের যত লোক আবার সেই বাটীতে প্রবেশ করিল। কেহ জানিতে পারিল না, কি হইয়াছে; কিন্তু সকলেই সিদ্ধান্ত করিল,—"ব্যাপার কিছু গুরুতর!"

দাওয়ানজী নীচে ছিলেন, বসন্ত বাবুকে দেখিয়াই লাফাইয়া উঠিলেন। বসন্ত দাওয়ানজীকে নমস্কার করিয়াই জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হয়েছে! আপনার মুখ এত মলিন কেন? বাবা কেমন আছেন?"

দাওয়ান।—বড় বাবু! আর কথা কহিবার সময় নাই। শীঘ্র উপরে আসুন। এখন না আসিয়া পড়িলে হয়তো কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ হইত না।

তাঁহার সমস্ত কথা শেষ না করিয়া তিনি দ্রুতবেগে কর্ত্তার গৃহের দিকে ধাবিত হইলেন। বসন্তকুমার তাঁহার অনুসরণ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অ্যাঁ, কি হয়েছে? পিতার কি হয়েছে?"

দাওয়ান সে কথার কোন জবাব না দিয়া ইঙ্গিতের দ্বারা কর্ত্তার গৃহের দিকে দেখাইয়া কহিলেন,—"ঐ শুনুন!"

বসন্তকুমার শুনিলেন, কর্ত্তা ভগ্নকণ্ঠে কহিতেছেন,—"বসন্ত, বাবা! আমি যাই, আমায় ক্ষমা কর, মৃত্যুকালে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হলোনা!"

"বাবা! বাবা! কেন বাবা! এই যে আমি—এইযে আমি এসেছি!"—সকরুণ স্বরে এই কয়টী কথা বলিয়া বেগে সেই কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। পঞ্চম বর্ষ বয়স্ক শিশুর ন্যায় একেবারে বৃদ্ধ পিতার গলা জড়াইয়া ধরিলেন।

বসন্তকুমারকে দেখিয়া মথুরামোহন কথ

কহিতে পারিলেন না। তাঁহার দম আটকাইয়া যাইবার উপক্রম হইল। অশ্রুজলের দরদরিত ধারায় শয্যা, উপাধান সমস্তই ভিজিয়া গেল।

পিতার এই অবস্থা দেখিয়া বসন্তকুমার কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এমন কেন হলো বাবা? বাবা—বাবা—আমার সঙ্গে একটা কথা কও বাবা!"

বৃদ্ধের আয়ুশেষ হইয়াছিল। কেবল বসন্তকে দেখিবার সাধ ছিল; তাহাও হইল। অতি কষ্টে সেই নিশ্বাস-প্রশ্বাস চাপিয়া কহিলেন,—"আমায় ক্ষমা ক'রো—তোমার বিমাতা গিয়েছে—সরলাকে বিবাহ করিও—" আর কথা বাহির হইল না। জীবন-প্রদীপ নিভিয়া গেল।

এই স্থানে আমরাও আমাদের যবনিকা পতন করিলাম।

অপূর্ব্ব নারী।

(প্রকৃত ঘটনামূলক উপাখ্যান।)

পূর্ব্ব-বঙ্গ ঢাকা-বিভাগের একজন সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত লোক ইতিপূর্ব্বে মেদিনীপুরে প্রথম-শ্রেণীর পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন; এবং এই-ক্ষণ ডেপুটী-মাজিষ্ট্রেট। তিনি নিয়োক্ত প্রকৃত ঘটনামূলক আখ্যানটী যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে অবিকল তাহাই ব্যক্ত করিব। সে আখ্যান-গল্পটি এইঃ—

ঢাকা-বিভাগের কোন পল্লী-গ্রামে আমার বাসস্থান। আমি বাল্যকালে ঢাকা-কলেজেই অধ্যয়ন করিতাম। কলেজ-বিভাগে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করিবার পরে, আর পড়িবার সুবিধা হইল না। আমি এমন সাংসারিক বিশৃঙ্খলায় পতিত হইলাম যে, চাকুরী না করিলে আর কোনমতে জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় থাকিল না। চাকুরীর জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু কোথায় যাই, কি করি? কোথায় যাইলে চাকুরী হইবে? অনুক্ষণ ইহাই আমার চিন্তার বিষয় হইল। আমি যখন কলেজে অধ্যয়ন করিতাম, একজন সাহেব-প্রফেসার তৎকালে আমাকে অত্যন্ত ভাল-বাসিতেন। কিন্তু এইক্ষণ তিনি কলিকাতায় বদলি হইয়া গিয়াছিলেন। আমি একদিন তাঁহাকে আমার দুরবস্থা জ্ঞাপন করিয়া একখানি পত্র লিখিলাম। চাকুরীর কোন সুবিধা করিয়া দিতে পারেন কি না,—এই বিষয়টী বিশেষরূপে জানাইয়াছিলাম। ৫।৭ দিন পরে অধ্যাপক মহাশয় আমাকে প্রত্যুত্তর দিলেন,—"মুরশিদাবাদ জেলার একজন নীল-কুঠির সাহেব, আমার বিশেষ বন্ধু; যদি তুমি তাঁহার অধীনে কোন কর্ম্ম পাইতে ইচ্ছুক হও, আমি সেজন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে পারি। ভরসা করি, তোমার অভীষ্ট সুসিদ্ধ হইবে।" অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট হইতে এইরূপ উত্তর পাইয়া, অগত্যা আমি এই কার্য্যের প্রত্যাশাতেই কলিকাতায় আসিলাম। অধ্যাপক মহাশয় অনুরোধ-পত্র দিলেন। আমি জল-পথে মুরশিদাবাদ যাত্রা করিলাম। আমার সঙ্গে তখন একজন ভৃত্য-মাত্র রহিল। ক্রমে আমাদিগের নৌকা ভাগীরথী-বক্ষঃ ভেদ করিয়া তীরবেগে চলিল; কয়েকদিন অবিশ্রান্ত গতিতে দিবারাত্রি নৌকা চলিতে লাগিল। আমরা ক্রমশঃ কাল্‌না, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, কাটোয়া প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া, কতক দিন পরে মুরশিদাবাদে উপস্থিত হইলাম। দুইএকদিন তথায় অবস্থিতি করিয়া জানিতে পারিলাম,—আমি যে কুঠিতে যাইব, উক্ত স্থান তথা হইতেও ১০।১২ ক্রোশ।

একদিন প্রাতঃকালে আমরা কুঠিতে গমনজন্য রওনা হইলাম। ৫।৬ ক্রোশ পথ চলিতেই বেলা প্রায় দুইপ্রহর অতীত হইল। মধ্যাহ্নকালে চটিতে অবস্থিতি করিয়া আহারাদি সম্পন্ন করিলাম। ২।৩ ঘণ্টা বিশ্রামের পরেই আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। এখন বেলা প্রায় শেষ; সন্ধ্যা হইতে একটু বিলম্ব আছে। এমন সময়ে আমার সেই চাকরটা বলিল,—"বাবু! দু'পর বেলা আমরা যে দোকানে ছিলাম, সেই দোকানদার বলিয়াছিল,—'এই রাস্তায় বড় ডাকাতের ভয়।' সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কোন স্থানে আমাদের থাকিবার বন্দোবস্ত করিলে ভাল হয় না?"

বড় বড় মাঠের উপর দিয়া রাস্তা। রাস্তায় জন-প্রাণী নাই। সুতরাং কথাটাও নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল না। আমি কিছু চিন্তিত হইলাম; ভৃত্যকে বলিলাম,—"তুমি আগে বলিলে না কেন? পূর্ব্বে বলিলে সেই দোকানেই রাত্রিযাপন করিতাম।"

সন্ধ্যা হইতে আর বিলম্ব নাই। আমি আশ্রয়-চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। গন্তব্য-পথ পরিত্যাগ করিয়া অদূরে একটী গ্রাম দেখা যাইতেছিল, তথায় চলিলাম। আমরা যে গ্রামে উপস্থিত হইলাম, উহার নাম গোবিন্দপুর। গ্রামে প্রবিষ্ট হইয়া একটা বড় মেটে-বাড়ী আমাদের নয়নগোচর হইল। এই বাড়ীতে ৪।৫ খানি বড় বড় মেটে-ঘর। ঘরগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, উলুখড়ের দ্বারা ছাওয়া। বাহিরে বসিবারও একখানি ঘর আছে। সেই ঘরের সম্মুখে বিস্তৃত প্রাঙ্গন; প্রাঙ্গনের এক-পার্শ্বে গো-শালা। আমরা সেই বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম,—একজন প্রাচীন খর্ব্বকায় লোক, ডাবা-হুঁকা হস্তে করিয়া, তাম্রকূট সেবন করিতেছে। আমাদিগকে দেখিয়া বৃদ্ধ কর্কশ রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"কে তোমরা, এখানে কেন?"

আমি বিনয়-নম্র-স্বরে বলিলাম,—"আমি ব্রাহ্মণ, বিদেশীয়, অতিথি! এখানকার পথ-ঘাট ভাল জানি না; সন্ধ্যা হইয়াছে; অদ্য তাই আপনার আশ্রয়ে রাত্রিযাপন করিব, এই ইচ্ছা।"

বৃদ্ধ তাহাতে অধিকতর রুক্ষস্বরে বলিল,—"এখানে স্থান হ'বে না। কে তোরা? অন্য স্থানে যাও। আরে আমার অতিথিরে!"

যে স্থানে বৃদ্ধের সহিত আমার কথোপ-কথন হইতেছিল, উহার অনতিদূরে একটি যুবতী স্ত্রীলোক উঠান ঝাঁট দিতেছিল। স্ত্রী-লোকটী ২।৩ বার ব্যস্ততার সহিত সস্পৃহ নয়নে আমার দিকে চাহিতে লাগিল। আমি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম,—"একি বিপদ! আমি একে বিদেশীয় লোক; আলাপ-পরিচয় জানা-শুনা কিছুই নাই। আমার দিকে এ মেয়েটা লজ্জাহীনার ন্যায় কেন চাহিতেছে?" যাহা হউক, ইহাতে এই যুবতীর চরিত্রের প্রতিও আমার যেন সন্দেহ উপস্থিত হইল।

বৃদ্ধ পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তখন সেই রমণী আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কি বামুন?" আমি বলিলাম,—"হাঁ!" কথাটী শুনিবামাত্রই রমণী বিদ্যুৎবেগে বাটী প্রবিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ আবার বাহিরে আসিল। অতি ব্যস্ত ও সভয়-চিত্তে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া বলিল,—"ঠাকুর, সর্ব্বনাশ করিলে! বড়ই খারাপ জায়গায় আশ্রয় লইয়াছ; যমের মুখে আসিয়া পড়িয়াছ! আর উদ্ধারের উপায় নাই। এখন কেবল আমার কএকটী কথা যদি মনে রাখিতে পার! আমার কথাগুলি ভুলোনা। আমার নাম বামা। আমার পিত্রালয় ৫।৬ ক্রোশ দূরে গোপীনাথপুরে। পিতার নাম + + পাল; জাতিতে বারুই। আমার ভাই নাই, চারিটী ভগিনী। বড় ও মধ্যমা ভগ্নী বিধবা; আমার কনিষ্ঠা ভগ্নীর শশুরালয় উক্ত গোপীনাথ-পুরেই। ভগ্নীর পতির নাম + + দে। যাহা হউক, এক্ষণে সকলকে তুমি বলিবে যে, তুমি আমার পিতার গুরু-ঠাকুর। কথাগুলি মনে

রেখো; নচেৎ কিছুতেই জীবন-রক্ষা করিতে পারিবে না। ভয়ঙ্কর বিপদ! সাবধান! সাবধান! মনে থাকে যেন, আমার নাম বামা!" এই কথাগুলি বলিয়াই যুবতী দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

কথা শুনিয়াই আমার অন্তরাত্মা তো শুখাইয়া গেল,; বুক কাঁপিতে লাগিল; চক্ষে অন্ধকার দেখিলাম। কিন্তু জীবনদায়িনী বামার কথা তখন মনে পড়িল,—"ঠাকুর, ভয় পাইলে কিছুতেই জীবন-রক্ষা করিতে পারিবে না!"

এমন সময়ই, সেই বৃদ্ধ তথায় উপস্থিত হইল; এবং আমায় বলিল,—"কেন তোমরা এখানে বসে আছ? যাও, এখান হইতে চলিয়া যাও।"

আমি বলিলাম,—"যদি আপনি স্থান নাই দেন, তবে একটী সন্ধান বলিয়া দিবেন কি? এই গ্রামের নাম কি গোবিন্দপুর? অপনি বলুন দেখি, আমাদের গোপীনাথপুরের একটা মেয়ের বিবাহ এই গ্রামে কোন্ বাড়ীতে হইয়াছে? মেয়েটীর নাম বামা। তাহার পিতা + + পাল, আমার মন্ত্র-শিষ্য। তাহারা জাতিতে বারুই।"

বৃদ্ধ একটু স্থিরভাবে থাকিয়া বলিল,—"বামা! বামা যে আমার মোজা বসুমাতার নাম! আপনি তবে আমার বেহায়ের অভীষ্ট দেবতা? প্রণাম, ঠাকুর মহাশয়, বসুন। আমরা অপরিচিত লোককে বাটীতে স্থান দেই না, তাই আপনাকে ওরূপ বলিয়াছিলাম।" কাজেই আমি বসিলাম। বুক দপ্‌দপ্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। এখন, চারিদিক শূন্য দেখিতেছি; ভয়ে আত্মা শুখাইয়া যাইতেছে। ইহার মধ্যে বৃদ্ধ উহার পুত্রবধূকে বলিল,—"মা, তোমার পিতার ইষ্ট-দেবতা আসিয়াছেন। যাও, পা ধুইয়া দেওগে।'

বামা আমার নিকটে আসিল। আমার পদপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া বলিল,—"ঠাকুর মহাশয়, ভয় করিবেন না। আহারাদি করিতে বলিলে, আমরা যে বিষয় বলিব, তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিবেন। আপনার মনে যে কোনপ্রকার সন্দেহ কিম্বা ভয় উপস্থিত হইয়াছে, উহারা যেন কদাচ জানিতে না পারে। উহারা বড় শঠ, বড় ধূর্ত্ত। সাবধান! সাবধান! বড়ই ভয়ানক স্থান। ঐ যে ঘরখানি দেখিতেছেন, উহার মধ্যে শত-সহস্র লোকের প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে।"

এই সকল কথাবার্ত্তা হইবার পরই, সাত মোট পান মস্তকে করিয়া সাত জন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। যেন সাতটা মহিষাসুর আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাকে দেখিয়া একজন বলিল,—"কে তুমি?" পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধ তখন আমার পরিচয় দিলেন। মধ্যম পুত্রকে বলিলেন,—"বিশ্বনাথ! ইনি তোমার শ্বশুরের গুরু-ঠাকুর। প্রণাম কর!" সাতটা যমদূত ভূমিষ্ঠ হইয়া তখন আমায় প্রণাম করিল। তাহাদের হস্তে পাকা বাঁশের লাঠি, আবলুসের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ দেহ; মস্তকে এক এক গোচ্ছা লম্বা কেশ! মালকোচ্ছা কাপড় পরিধান তাহাদের দেখিয়া আমার তো আত্মা শুখাইয়া গেল! কিন্তু আমার উপকারিণী জীবনদায়িনী বামা মধ্যে মধ্যে আমায় সাহস দিতেছে,—"ঠাকুর, আমি থাকিতে আপনার কোন চিন্তা নাই।" যাহা হউক, রাত্রিতে কোন-প্রকারে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া শয়ন করিলাম।

সমস্ত রাত্রির মধ্যে একটীবার আমার চক্ষের পাতা মুদিত হইল না। প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যু যেন চক্ষের সম্মুখে ক্রীড়া করিতে লাগিল। ভয়ে বিস্ময়ে আমার প্রাণ যেন শুকাইয়া গিয়াছে; এক রাত্রি যেন এক বৎসরের ন্যায় বোধ হইতেছে।

প্রভাত হইতে আর বিলম্ব নাই। বামা আসিয়া ডাকিল,—"ঠাকুর মহাশয়, জাগিয়াছেন কি?" আমি বলিলাম—"বামা! মা! রাত্রি কি প্রভাত হইয়াছে?" বামা আমার

গৃহে প্রবিষ্ট হইল। আমি বলিলাম,—"মা! অদ্য তোমার বুদ্ধি-কৌশলে আমার জীবন রক্ষা হইল। তোমার স্নেহ-দয়া আমি কখনই ভুলিতে পারিব না। আমি বামাকে বলিলাম,—"মা! আমি তো এখনই প্রস্থান করিব! কিন্তু আমার নিকটে কয়েকটী টাকা আছে। আমার ইচ্ছা, তুমি উক্ত টাকার কিয়দংশ গ্রহণ কর।"

বামা করজোড়ে বলিল,—"ঠাকুর মহাশয়, আমার টাকা-কড়ি যথেষ্ট আছে; ধন-ধান্য অলঙ্কার-পত্র কোন দ্রব্যেরই অভাব নাই। এখন, কেবল আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, আমার স্বামীর সুমতি হউক। যখন আমার মনে হয়,—আমার স্বামী দস্যু, আমার স্বামী নরহত্যাকারী; তখন ঠাকুর, আমার বুক কাঁপিয়া উঠে। আমি স্বামীকে সুপথে আনিবার জন্য অনেক যত্ন—অনেক চেষ্টা করিয়াছি; আমার স্বামীর মন-প্রবৃত্তির অনেক পরিবর্ত্তনও তাহাতে হইয়াছে। কিন্তু এখানে থাকিয়া, পূর্ব্বোক্ত পাপ-ব্যবসায় পরিত্যাগ করিবার তো উপায় নাই! আমার স্বামীর উক্ত পাপ-বৃত্তি পরিত্যাগ করিবারই সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে। কিন্তু পাপাত্মা ভ্রাতৃগণের অনুরোধে এই কার্য্য তাঁহাকে করিতে হইতেছে। এই পাপে লিপ্ত না হইলে, উহারা বিপক্ষ হইবে; আর, উহারা সকলে বিপক্ষ হইলে—সকলেই শত্রু-জ্ঞান করিলে, এমন কি জীবন-নষ্টও করিতে পারে। আমি অনেক টাকা সংগ্রহ করিয়াছি; ইচ্ছা আছে, একদিন স্বামীসহ এই পাপ-সংসার পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিব। এমন দেশে যাইব, যাহাতে এই দুরাত্মাগণ কোন ক্রমেই অনুসন্ধান না পায়! আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, আমার স্বামীর সুমতি হউক! আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, আমার মনোরথ পূর্ণ হউক।"

আমার প্রাণদায়িনী বামাকে তখন আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলাম,—"মা! তুমি এই বিষতরুর অমৃত ফল। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, জগদীশ্বর অবশ্যই তোমার মঙ্গল করিবেন। তোমার মনোরথ অবশ্যই পরিপূর্ণ হইবে।"

প্রাতঃকালে বৃদ্ধ এবং তাহার পুত্রগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। বৃদ্ধ ৫টী টাকা প্রণামী দিল। সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। এতক্ষণ পরে আমি যমালয় হইতে বহির্গত হইলাম।

প্রায় ৩০ বৎসর গত হইল, এই ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। এখনও স্মরণ হইলে আমার হৃদয় কম্পিত হয়। বামার বুদ্ধি-কৌশলে সে যাত্রা জীবন রক্ষা হইয়াছিল; নচেৎ উদ্ধারের কোন আশাই ছিল না। দস্যু-হস্তে সেই রাত্রিতে যে জীবন নষ্ট হইত, এই বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। সেই জীবন-দায়িনী উপকারিণী বামার কথা মনে হইলে এখন আমার চক্ষে জল আইসে। একজন পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকের মনে কি চমৎকার ধর্ম্ম-বুদ্ধি! বামা! তুমি এই বিষময় সংসারারণ্যে অমৃতময়ী লতিকা-স্বরূপিণী! বামা এতদিন জীবিত আছে কিনা, জানি না; তাহার কোন অনুসন্ধান করিবার আর সুবিধাও পাই নাই। আর যে কখও তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব, এমনও আশা নাই। কিন্তু আমি কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদাই তাহার মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া থাকি। জগদীশ্বর উক্ত মহিলার অন্তঃকরণে যে শুভকরী বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন, সেই বুদ্ধি-বলে অবশ্যই তাহার ইহ-পরলোকে মঙ্গল হইবে।

তুচ্ছ বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা।

একদিন আমি ও আমার একটি বন্ধু জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। নানারূপ মিষ্ট আলাপে তুষ্ট হইয়া আমরা উভয়ে বিদায় লইলাম। পথিমধ্যে নির্দ্দিষ্ট স্থানে 'ট্রামকার' অবস্থিত; বন্ধুটি

বিনা-বাক্যব্যয়ে তাহাতে আহোরণ করিলেন। আমার নিকটে পয়সা ছিল না—উঠিতে বিশেষ ইচ্ছাও ছিল না—যেহেতু আমার বাসস্থান বেশী দূর নয়। সুতরাং হাঁটিয়া আসিতেই মনস্থ করিলাম। তবে কি জানি কেন, পথে আসিতে আসিতে 'এক যাত্রায় পৃথক ফল' মনে এই 'কিন্তু' ভাবটুকু স্থান পাইল। কেন পাইল, জানি না। তবে এইটুকু জানি, আমি নিজে হইলে ঠিক এমনটি করিতে পারিতাম না। এখানে বলিয়া রাখা ভাল, বন্ধুটির সহিত আমার 'দাদা-ভাই' সম্বন্ধ; পরস্পরের ঘনিষ্ঠতাও খুব বেশী। আর, তিনি এমন হাঁটিয়া থাকেনও অনেক সময়।

কিছু দিন গেল। আর এক দিন, কার্য্যোপলক্ষে, আমার অন্য একটি সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বন্ধুর সহিত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে আসিতেছিলাম। গন্তব্য স্থান অতি নিকট—বড় জোর দশ মিনিটের রাস্তা। আমি অনায়াসেই হাঁটিয়া আসিতে পারি—আসিতামও তাই। কিন্তু তিনি ইঙ্গিত করিলেন,—ট্রামগাড়ী আসিতেছে। সুতরাং উভয়েই তাহাতে উঠিলাম। উঠিয়াই তিনি দুইখানি টিকিট কিনিয়া একখানি আমার হাতে দিলেন। এ কথা সে কথার প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল—আমাকে তাঁহার উদারতার বিষয় ভাবিতেও আর অবসর দিলেন না।

পথিমধ্যে আমাকে গাড়ী বদলাইতে হইবে। সুতরাং নির্দ্দিষ্ট স্থানে আমি নামিলাম—তিনিও আমার পাছুপাছু নামিলেন। নামিয়া বলিলেন,—"এটুকু আমিও হাঁটিয়া যাইতেছি। চল, তোমার সহিত ততক্ষণ কথা কহিতে কহিতে যাই।" আমি মহৎলোকের মহত্ত্ব দেখিয়া মোহিত হইলাম—আপনাকে ভাগ্যবান মনে করিয়া ধন্যবাদও দিলাম। এস্থলে বলিয়া রাখি, আমারই কোন দরকারে তিনি শ্রমস্বীকার করিয়া ঐ স্থানে গিয়াছিলেন। যে লোকটির সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার প্রয়োজন, দুর্ভাগ্যবশতঃ ২।৩ ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়াও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না—তিনিও সেদিন কোন কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। আর এক কথা, পথিমধ্যে আমার এই সম্ভ্রান্ত বন্ধুটি বলিয়াছিলেন,—"দেখ, আজ আমি আর দেশে যাব না। কিন্তু একখানি বড় দরকারী চিঠি আছে, কার দ্বারা পাঠিয়ে দিই? আজই—কিন্তু পৌঁছান চাই।" এখন, তুচ্ছ বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা' কি, তাহাই দেখাইতেছি।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, যখন আমি পথিমধ্যে ট্রাম বদলাইবার জন্য নামিয়া পড়ি, আমার সেই সম্ভ্রান্ত বন্ধুটিও গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। শুভ-ইচ্ছায়-মাহেন্দ্র-যোগ,—প্রেমে ও কার্য্যে অপূর্ব্ব সম্মিলন! তৎক্ষণাৎ তাঁহার দুইটী অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। কোন সম্ভাবনা ছিল না,—অথচ আমরা গাড়ী হইতে নামিবামাত্র একেবারে আমাদের দরকারী দুইটী লোককেই সম্মুখে দেখিতে পাইলাম। মনে বড় আনন্দ হইল। আমি মনের আবেগে আমার পূজনীয় বন্ধুকে বলিয়া ফেলিলাম,—"আহা! মহৎ ইচ্ছার কি সরল ও সাধু পরিণাম! আপনার উদার হৃদয়কে শত ধন্যবাদ দিই!" তিনিও একটু হর্ষভরে বলিলেন,—"হাঁ, তাই ত হে, তোমার সহিত না মিলে আমার দুইটা কাজই অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইত! এখন বাটীতে পত্রও পাঠাইতে পারিলাম, তোমার দরকারও শেষ করিতে পারিব।" তৃতীয় ব্যক্তিটিও সমস্ত কথাগুলি শুনিয়া বলিলেন,—"হাঁ, ঘটনাটি বড় মন্দ নয়!"

বস্তুতঃই আমরা এই 'তুচ্ছ বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা' লাভ করিয়াছি। আর তুচ্ছই বা বলি কেন? জগতে তুচ্ছ ও মহৎ জিনিসগুলি কি, তাহাই বা জানিব কেমন করিয়া? অনেক ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ঘটনা হইতেই ত সংসারে অনেক বৃহৎ ব্যাপারের অনুষ্ঠান হইয়াছে ও হইতেছে। ইহা ত

প্রতিনিয়তই চক্ষের উপর দেখিতেছি। তবে তুচ্ছ ও মহতের বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যা করিবেই বা কে? বরং অনেক সময়ে, অতি তুচ্ছ বস্তু হইতেই, দুর্ব্বোদ্ধ মানব-চরিত্র বুঝিতে পারা যায়; মনের মানুষ, দূরের মানুষকে চিনিয়া লওয়া যায়। তুমি সূক্ষ্মদৃষ্টি বৈজ্ঞানিক,—তুমি মনোবিজ্ঞান-সাহায্যে নিক্তিতে ওজন করিয়া সময় ও ঘটনার সামঞ্জস্য করিবে; অতঃপর জোর অনুগ্রহ করিয়া বলিবে,—"ও অমন হয়! এর আর শুভাশুভ-ইচ্ছা কি? ওগুলো সময় ও ঘটনার শৃঙ্খল-সমাবেশ মাত্র।" কিন্তু আমার অত সূক্ষ্ম দৃষ্টি নয়, আমি অত বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যা করিতে জানি না। তাই আমি বলিব—সরলবিশ্বাসী ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি বলিবেন,—"ইহা মহৎ ইচ্ছার মহৎ পরিণাম। ঘটনাটি সামান্য হইলেও, আমি ইহাতে একটি মহৎ শিক্ষা পাইয়াছি। বিশেষতঃ আমার প্রথম বন্ধুটির 'এক যাত্রায় পৃথক ফল' কথাটা ইহার করিয়া 'মৌখিক' ও 'আন্তরিক' সহিত তুলনা ভালবাসা জিনিসটায় কত প্রভেদ, তাহা বুঝিয়াছি।

সাহিত্য ও ধর্ম্ম।

মহাত্মা 'কারলাইল' বলিয়াছেন,—'Lrterature is but a bianch of Religion.' অর্থাৎ সাহিত্য ধর্ম্মের একটী শাখামাত্র। আজকালকার নবীন লেখকদিগের মধ্যে কেহ কেহ এই কথাটী ধরিয়া ধর্ম্মকথায় সাহিত্য শিখাইতে প্রয়াসী। যাঁহারা ধর্ম্মকথায় সাহিত্য শিখাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কারলাইলের উদ্ধৃত বাক্যটীর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। সাহিত্য ধর্ম্মের একটী শাখামাত্র, ধর্ম্মশিক্ষায় সাহিত্যের প্রয়োজন, সত্য; কিন্তু সাহিত্য শিক্ষার জন্য ধর্ম্ম প্রয়োজন, একথা কারলাইল বলিয়া দেন নাই; অথবা কারলাইলের উদ্ধৃত বাক্যটীতেও তাহা বুঝায় না। আধুনিক লেখকমণ্ডলীর মধ্যে কিছুরই অসদ্ভাব নাই; ভিন্ন ভিন্ন লেখক ভিন্ন ভিন্ন রুচির প্ররোচনায় প্রকৃত হেতু উল্লঙ্ঘন করিয়া অসার কথায় স্বকীয় প্রাধান্য-স্থাপনে প্রয়াসী। ইহাতে সাহিত্যের মঙ্গল সাধিত না হইয়া বরং অনিষ্টই সাধিত হয়। কারলাইল কোন একটী কথা বলিয়াছেন, সেই কথার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তি থাক্ আর না থাক্, অথচ একটা স্বাধীন মত প্রকাশ করিলে, বিজ্ঞতা অথবা পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক হয় না। কিন্তু যদি তাঁহার উক্তির প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া, কারণ-প্রদর্শন-পূর্ব্বক কোন এক পথ অবলম্বন করিতে পারা যায়, তাহাই বিজ্ঞতার পরিচায়ক হয়।

সাহিত্য ধর্ম্মের একটী শাখা হইলেও ধর্ম্মোপদেশে সাহিত্য শিক্ষা হয় না। ভারতবর্ষে ত ইহা একান্তই অসম্ভব কথা। কারণ, সমগ্র ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকের বসতি; এই বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগের ভাষাও বিভিন্ন। প্রত্যেক জাতিরই ধর্ম্ম-পুস্তকাদি আপন আপন জাতীয় ভাষায় রচিত। সাহিত্য শিক্ষা দিতে হইলে, জাতি-নির্ব্বিশেষে শিক্ষা দিবার পথ প্রশস্ত করিতে না পারিলে, কখনও রীতিমত সাহিত্য-শিক্ষা হইবে না; অথবা সাহিত্যের উন্নতিও হইবে না। সমস্ত ভারতের সমস্ত জাতি ছাড়িয়া দিয়া, শুদ্ধ হিন্দুদিগের মধ্যেই দেখ, ধর্ম্মগত পার্থক্য জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। এক বাঙ্গালার হিন্দুদিগের মধ্যেই ত ধর্ম্মের ঝগড়াদলির অভাব নাই। আদি, সাধারণ, নববিধান, কর্ত্তাভজা, নবহুল্লোর প্রভৃতি কতশত উপধর্ম্ম হিন্দু-সমাজ হইতে বাহির হইয়াছে, অথবা এই কয়টী বিভিন্ন মত ভিন্ন ভিন্ন দিকে যাইয়া হিন্দুধর্ম্মকে বিড়ম্বিত করিয়া তুলিয়াছে।

এতদ্ভিন্ন আরও একটী বিশেষ কথা আছে।

এই হিন্দুধর্ম্ম হইতে যে কয়টী উপধর্ম্মের অবতারণা হইয়াছে, ইহাদের প্রবর্ত্তক মহাশয়েরা সকলেই স্বকীয় ধর্ম্মের সারবত্তা ও প্রাধান্য স্থাপন করিতে বদ্ধপরিকর। ইহাঁদের সকলেই বলেন,—"আমাদের ধর্ম্মই সারধর্ম্ম। আমাদেরই আদি ও মূল, এবং অন্যের কিছুই নহে।" নিতান্ত ক্ষোভের বিষয় এই যে, হিন্দুধর্ম্মের প্রতিই ইহাঁদের আক্রমণটা কিছু বেশী। এই আক্রমণ ন্যায় কি অন্যায়, তাহা প্রতিপাদন করা আমাদের এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে আমাদের ধর্ম্মজীবনে যে-এই প্রকার পরিবর্ত্তন ও মতভেদ ঘটিয়াছে, তাহা দেখানই উদ্দেশ্য। আমাদের দেশে ধর্ম্মের একতা নাই; ইহা হইবার সম্ভাবনাও নাই। যে দেশের অধিবাসী ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত, এবং যাহাদের মধ্যে একের ধর্ম্মের সহিত অন্যের সহানুভূতি নাই, তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মগত একতা স্থাপনের আশা করাই ভ্রান্তিমূলক। বোধ হয়, কোন মহাত্মাই একথা অস্বীকার করিতে সক্ষম নহেন।

মহাত্মা কারলাইল যে দেশের অধিবাসী, সে দেশে ধর্ম্মগত স্বাতন্ত্র্য এত কম যে, নাই বলিলেও হয়। সুতরাং তদ্দেশের পক্ষে,—"Leterature is but a bronch of Religion" বাক্যটী খাটে। কিন্তু আমাদের দেশে খাটে না। বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় যে, ইহা যে কতদিনে আমাদের দেশে হইতে পারিবে তাহাও ঠিক বলা দুষ্কর। অধুনা আমাদের দেশে যে ধর্ম্মান্দোলন চলিতেছে, তাহাতে ধর্ম্মগত উন্নতির কোনও আভাস পাওয়া যায় না; আর তাহাও যে প্রকৃত কার্য্যকরি আন্দোলন—তাহাও বোধ হয় না, শুদ্ধ দোকানদারী মাত্র। ভারতে ধর্ম্মের বাঁধুনী, এক মুসলমান-ব্যতীত প্রায় সকল জাতিরই শিথিল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষ হিন্দুদেরই কিছু বেশী। সমগ্র ভারতে হিন্দুর সংখ্যাই অধিক; কিন্তু ইহাদের সংখ্যাও যত অধিক সামাজিক ধর্ম্মগত বন্ধনও তাদৃশ শিথিল।

এতদ্ভিন্ন আরও একটী কথা আছে। ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে,—যখন যে জাতির প্রাধান্য সমধিক বিস্তৃত থাকে, তখন সেই জাতীয় ভাষারই প্রচলন ও উন্নতি হয়। মুসলমান-রাজত্বের সময় আরবি, পার্সি ও উর্দ্দু ভাষার সমধিক আদর ছিল, উন্নতিও হিল। এখন ইংরেজের রাজত্বে, ইংরেজের প্রাধান্য বেশী। সুতরাং দেশে দেশে, পল্লীতে পল্লীতে, ঘরে ঘরে ইংরেজী ভাষা প্রবেশ করিয়াছে, ও করিতেছে। ইংরেজী শিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া নিশ্চয়ই প্রতীয়মান হইতেছে যে, এ শিক্ষাস্রোত যদি আর বিংশতিবর্ষ অপ্রতিহত থাকে, তাহাহইলে আমাদের দেশ হইতে অন্য ভাষার মূল একেবারে উচ্ছেদ হইবে।

যে ভাষার প্রতি সর্ব্বসাধারণের আনুরক্তি না থাকে, অথবা যে ভাষাতে সাধারণের আনুরক্তি আকর্ষণ করিতে না পারা যায়, সে ভাষার উন্নতির আশা করা বিষম ভুল। যাহারা ধর্ম্মকথা বলিয়া—ধর্ম্মোপদেশ দিয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি করিতে চান, তাঁহারা ভ্রান্ত। বাঙ্গালা ভাষা হিন্দুর ভাষা। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম এখন হিন্দুর নহে। অতএব যাহাদের স্বীয় ধর্ম্মের প্রতিই আস্থা নাই, যাহারা স্বীয় ধর্ম্মকেই রসাতলে দিতে কুণ্ঠিত নয়, তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া সাহিত্য অথবা ভাষাশিক্ষা দিবার প্রয়াসী হওয়া বাতুলতা-মাত্র।

ফুলরেণু।

স্বপ্ন-ছায়া।

কি এক অস্ফুট আলো-রেখা যেন,
স্বপন-আবেশ প্রায়;
পরশিছে মোর হৃদয়-মন,
অবশ করিছে তায়!
কোথায় কি যেন ফেলেছি এ ঠাঁই
মনেতে পড়ে না ভালো;
কি যেন কি ছিল, কি যেন কি নাই,
বুঝিতে পারি না ভালো!
ভাবিতাম মনে,—ওই নীলাকাশ
নামিয়ে পড়েছে যেথা;
হবে সে বাঞ্ছিত স্বরগ-নিবাস,
ইচ্ছায় পশিব সেথা।
যত যাই, তত পাইনা কিনারা,
আকাশ সরিয়ে যায়;
স্বরগ হইতে কতদূরে মোরা
আসিয়ে পড়েছি হায়!
হাত দিয়ে দেখি, সে হৃদয় নেই,
সে আমি মরিয়ে গেছি!
এ জীবন, আশা-ভালবাসা এই,
সব সে স্বপন বুঝি!

যুগলরূপ।

(দয়া, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও শান্তির উক্তি।)

রাগমালা।

[ইমন।]

অতুল মাধুরী যুগলরূপে,
নেহার সজনী পরাণ ভরি'।

[কেদারা।]

কনক আসন শোভিছে কেমন,
উজলে মধুর মিশেছে যেন।

[হাম্বির।]

সুমধুর রোলে বাজিছে নূপুর,
শিখি-চূড়া শিরে, মরি কি সুন্দর!

[ছায়ানট।]

আধ বাঁকা ঠাম আহা কি সুঠাম,
মাণিক-কাঞ্চন মিলেছে যেন।

[বাহার।]

ভাবিছে আননে মৃদু-মধু হাসি,
নয়নে নয়নে কিবা মিশামিশি!

[বাগেশ্রী।]

প্রেমের তুফান বহে অবিরাম,
কে প্রেম-ভিখারী আয় রে হেথা।

[কানড়া।]

মোহ-অন্ধ-জীব মেল রে নয়ন,
কতদিন আর রবে অচেতন।

[বেহাগ।]

আয় ওরে সবে এ চরণ পাবে,
ভবের বন্ধন ঘুচিবে জেন'।

* * * *

[ধানশ্রী—একতালা।]

আমা চারিজনে কর রে আশ্রয়,
না রবে ধরায় কোন কিছু ভয়;
রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমে মজ জীবগণে
যা'বে সমভাবে ইহ-পরলোকে।
নাহি শোক-তাপ মরণের ভয়,
শ্রান্তিহারা জীব আর রে হেথায়;
বিশ্বাস-দুরগে লওরে আশ্রয়,—
এ যুগল-প্রেমে সঁপিয়ে প্রাণ॥

রুচি।

বর্ত্তমান-সময়ে বাঙ্গালার লেখকদের মধ্যে রুচি লইয়া বড় লেখনী-যুদ্ধ চলিতেছে। এই সময়ে রুচি-সম্বন্ধে কিছু বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না! সকল বিষয়েরই দুইটী দিক আছে। এসংসার ভাল-মন্দয় মিশ্রিত। একের অস্তিত্বে অপরের গুণ প্রকাশ পায় না। ভাল জিনিস আছে বলিয়াই আমরা মন্দ জিনিস বাছিয়া বাহির করিতে পারি। আবার মন্দ জিনিস আছে বলিয়াই, ভাল জিনিস চিনিয়া লওয়া যায়। সংসারে আলোক অন্ধকার উভয়ই আছে। অন্ধকার আছে বলিয়াই, আমরা আলোক এত ভালবাসি। নিরবচ্ছিন্ন আলোক থাকিলে, বোধ হয়, আমরা আলোকের গুণ উপলব্ধি করিতে পারিতাম না। রুচি-সম্বন্ধেও এ অলঙ্ঘ্য নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে না। এই রুচিতেও দুইটি ভাগ আছে,—সুরুচি ও কুরুচি। রুচির একটা সর্ব্ববাদী-সম্মত বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যা করা অতীব কঠিন। তবে কুরুচি ও সুরুচি বলিলে, আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি, তাহাই এস্থলে উল্লিখিত হইতেছে।

কোন বিশেষ বিষয়ে ঐকান্তিক অনুরাগ বা স্পৃহা থাকাই রুচি। সাধারণতঃ যে কার্য্য বা বাক্য দ্বারা হৃদয়ে প্রীতি

হয়, তাহা সুরুচি ; এবং যে কার্য্য বা বাক্য-পরম্পরায় হৃদয়ে কুভাব ও ঘৃণার উদ্রেক হয়, তাহাই কুরুচি। এক্ষণে এই কথাটা আরও একট পরিস্কার রকমে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি।

রুচি মনের ধর্ম্ম। বাক্যে ও কার্য্যে তাহা প্রকাশিত হয়। এমন অনেকগুলি কার্য্য, বাক্য ও লিপি আছে, যাহা দর্শন, শ্রবণ ও পাঠ করিলে মনে ঘৃণা ও কুভাব সঞ্চারিত হয়। ঐ সকল বিষয় দর্শন, শ্রবণ ও পাঠ করা কদাচ সঙ্গত নহে। কুরুচি কুষ্ঠব্যাধির ন্যায় বড় ভয়ানক। একবার ইহার সংস্পর্শে আসিলে সহজে ইহার আক্রমণ হইতে মুক্তিলাভ করা যায় না। অনেক পুস্তক আছে, যাহা আদ্যন্ত কুরুচি-পূর্ণ। ঐরূপ পুস্তক বালকদিগের হস্তে পতিত হইলে তাহারা সহজে পাঠ-প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারে না। এইরূপ জঘন্য পুস্তক পাঠ করিতে করিতে ক্রমে বালকদিগের মন বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়া উঠে। আবাল্য অভ্যস্ত দোষ সহজে পরিত্যাগ করা যায় না। অনেকে ভালরূপ লেখা-পড়া শিক্ষা করিয়াও কুরুচি-দোষে আপন-আপন স্বভাবে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিয়াছেন। বালকবৃন্দের মন স্বভাবতঃই অতি কোমল ও অনুকরণপ্রিয়। বঙ্গভাষায় রচিত অধিকাংশ নাটক ও উপন্যাস কুরুচি-দোষে দূষিত। কোমলমতি বালকগণ এইরূপ পুস্তক-পাঠের অনিষ্টকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। এ শ্রেণীর কুরুচিপূর্ণ কদর্য্য গ্রন্থগুলির যতই লোপ হয়, ততই দেশের মঙ্গল।

সুশিক্ষা দ্বারা মন গঠিত হইলে ঈদৃশ পুস্তক-পাঠে অত্যল্প লোকেরই প্রবৃত্তি জন্মে। কুরুচি মহা দোষ। ইহার পরিণাম এরূপ শোচনীয় যে, লোকে কোন উৎকৃষ্ট বিষয়ের অবতারণা করিয়াও অভ্যাস-দোষে তদ্বিষয়ক প্রসঙ্গ-মধ্যে ঐরূপ দুই একটী বাক্য-বিন্যাস করিয়া বসেন, যাহাতে আলোচ্য বিষয়ের উৎকৃষ্টতা ও গাম্ভীর্য্য ধ্বংস হইয়া যায়, তাহার কোন মূল্যই থাকে না। কুরুচিগ্রস্ত লোকের ধারণা, অশ্লীল বিষয়ের অবতারণা না করিলে প্রকৃত রহস্য হয় না। তাহারা ভাবে, অশ্লীলতাই রহস্যের প্রাণ। তাহাদের এইরূপ সংস্কার যে, শ্রোতৃবর্গের মনে আনন্দ-প্রদান করিতে হইলে কোন কুৎসিত রহস্যের সৃষ্টি অত্যন্তই আবশ্যক। তাহারা জানে না যে, এরূপ নীরস রসিকতায় সকলের পরিবর্ত্তে সকলেই বিরক্ত হয়। আবার অনেকে আজগুবি গল্প দ্বারা শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করিবার অভিপ্রায়ে কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির সম্বন্ধে অযথা মিথ্যা ঘটনা আরোপ করেন। ইহা নিতান্তই মনুষ্যত্ব-হীনের পরিচয়। ইহারই নাম প্রকৃত কুরুচি।

তবে কুরুচিটা আজকাল সাধারণ বুলির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। এমন অনেক অন্তঃসারহীন লোক আছে যে, তাহাদের আদৌ রুচি বলিয়া জিনিসটাই নাই ; অথচ মুখে 'সুরুচি'-'কুরুচি' করিয়া জ্বালাতন করে।

মূর্খতা-বশতঃ এই রুচি-রোগাক্রান্ত জীবগণ 'ভ্রমরের গুঞ্জন, কোকিলের কূজন, মলয় মারুতের মৃদুস্বনন, কদম্ব ও তমাল শাখার মৃদু দোলন '—এইরূপ বাক্য শ্রবণ বা পাঠ-মাত্রেই 'রাম রাম' শব্দ উচ্চারণ করিয়া কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া আপনাদের রুচি অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করে। যাঁহাদের সুরুচি ভ্রমরের গুঞ্জনে কলুষিত হয়, তাঁহাদের রুচি তাহাতেই থাক—এ ভণ্ডামীর আমরা পোষকতা করিতে পারিলাম না। বিধাতার এই অদ্ভুত, জীব সমাজের ঘোর শত্রু ইহারা লোকের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করিয়া সাদরে লোক-সমাজে গৃহীত হয় ; এবং অবসর বুঝিয়া ধীরে ধীরে লোকের অন্তরে বিষ প্রক্ষেপ করিতে থাকে। প্রথম প্রথম ইহার অনিষ্টকারিতা কেহ উপলব্ধি করিতে পারে না, কিন্তু যখন প্রক্ষিপ্ত বিষের মাত্রা বাড়িয়া উঠে, তখন সেই বিষ লোকের অন্তরে কার্য্য করিতে আরম্ভ করে, স্বপ্ন ঘুচিয়া যায়। কিন্তু ধাঁধাঁ রহিয়া যায়। তখন আর উপায়ান্তর থাকে না; উদরস্থ বিষ উদ্গীরণ করাও সহজ কঠিন-সাধ্য হইয়া পড়ে। সেই অবস্থায় দীক্ষিত লোকের অন্তর হইতে সুরুচি পলায়ন করে, কুরুচির এ াধিপত্য সংস্থাপিত হয়। এরূপ লোকের সংসর্গ কদাচ প্রার্থনীয় নহে।

নিম্ন-শ্রেণী লোকদের মধ্যে একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, সর্পদংষ্ট্র ব্যক্তি যদি জানিতে পারে তাহাকে সর্পে দংশন করিয়াছে, তবেই তাহার শরীরে বিষের ক্রিয়া চলিতে আরম্ভ করে। আর যদি দংশন-সম্বন্ধে এইরূপ প্রতীতি জন্মে যে, বাস্তবিক সর্পে দংশন করে নাই, তাহাহইলে সর্পবিষ উড়িয়া যায়, দংষ্ট্র ব্যক্তির কোন অনিষ্ট হয় না। কুরুচির অনিষ্টকারিতা-সম্বন্ধেও অনেকটা এইরূপ বলিয়া আমরা বিবেচনা করি। এইরূপ অনেক কার্য্য আছে, যদ্দৃষ্টে লোকের মনে সহসা কুরুচির ভাব সঞ্চারিত হয় না, সুতরাং অনিষ্টের আশঙ্কাও জন্মে না। যখন কেহ বাক্-চাতুর্য্য দ্বারা ঐরূপ কার্য্যের কুরুচিত্ব প্রতিপন্ন করিয়া দেয়, তখন হইতে মনে নানা কুভাব আন্দোলিত হইতে থাকে; এবং কুভাব চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে মন কলুষিত হইয়া উঠে। দুর্গন্ধ যত মাটি চাপা থাকে ততই ভাল। মাটি ঘাঁটিয়া দুর্গন্ধ বাহির করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। বাস্তবিকই কুরুচি নিতান্ত অন্ধ না হইলে, সহজ দৃষ্টিতেই কুরুচি বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সকল বিষয়েরই একটা নির্দ্ধারিত সীমা আছে। সীমা লঙ্ঘিত হইলেই কোন কোন বিষয় দূষণীয় হইয়া উঠে। দেহ-মধ্যে বায়ুর গতিবিধি না থাকিলে মনুষ্য-জীবন বাঁচিতে পারে না। মানব-শরীরে অনুক্ষণ বায়ু প্রবহমান হইতেছে। কিন্তু শরীরস্থ বায়ু দূষিত হইয়া অতিরিক্ত মাত্রায় উগ্রভাব ধারণ করিলেই মানুষ বাতুল হয়। তখন সাধারণে তাহাকে বায়ুরোগগ্রস্ত বলে। সেইরূপ সুরুচি যখন সীমা লঙ্ঘন করিয়া অতিরিক্ত মাত্রায় উঠে, তখন ইহাকে রুচি-রোগ বলা যায়। প্রকৃত 'যা' রয়-সয়' এরূপ সুরুচি রক্ষা করিয়া চলাই শিক্ষিত ও সভ্য-জনোচিত কার্য্য। বিদ্যার সহিত সুরুচির সম্মিলন অতি শুভপ্রদ। শিক্ষা, সুরুচি-অলঙ্কারে ভূষিত হইলে অধিকতর উজ্জ্বল ভাব ধারণ করে। তবে পূর্ব্বে বলিয়াছি—এখনও বলিতেছি, রুচি 'সু'হউক, আর 'কু'হউক, তাহার সীমা অতিক্রম করাটা কিছু নহে।

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারনা-প্রবঞ্চনা।

'পুষ্পহার'

এই নামে বৃন্দাবন বসাকের লেন ঠিকানা হইতে এক 'মাসিকপত্রের' বিজ্ঞাপন বাহির হয়। বিজ্ঞাপনদাতার নাম, ঘোষ এণ্ড কোং। এ বিজ্ঞাপনেও নানা উপহারের প্রলোভন থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এ বিজ্ঞাপনে মোহিত হইয়া অনেকেই ঠকিতেছেন। বড়িষা-বেহালা হইতে বাবু সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এ-সম্বন্ধে এক পত্র লিখিয়াছেন যে,—"ইহাও সেই রাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষের ভ্রাতা-উপেন্দ্রকৃষ্ণ বা ননিলালের খেলা।" এ-সম্বন্ধে তিনি প্রমাণও অনেকগুলি আমাদিগকে দিয়াছেন। যাহাহউক, এসকল উপহার-সম্বন্ধে সাধারণে এখনও সাবধান হন, এই বাসনা।

কেমিকেল সোণার

গহনার আজকাল নানা বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছে। অনেক সরল মফঃস্বলবাসী ঐ সকল অলঙ্কারের বিজ্ঞাপন দেখিয়া প্রকৃতই "সোণার গহনা" সুলভমূল্যে পাইবেন,—এই আশায় আশান্বিত হন; এবং সেই ভাবিয়া সত্বর অর্ডার দেন! আর, শেষে তাহার যে ফল, কাজেই তাহা ভোগ করিতে হয়। এ বিষয়ে মফঃস্বলবাসীগণের এ ভ্রম বড়ই দুঃখের বিষয়। সোণার গহনা পিতলের দরে পাইবেন, এ বড়ই দুর্দ্ধুদ্ধির কথা। যাহাহউক, সাধারণের জানিয়া রাখা উচিত যে, আসল জিনিসের দাম কখনও কমে না; এবং যদিও কখনও কমে, তবে সেও অল্প। আরও সকলের জানা উচিত, ঐ সকল "কেমিকেল সোণার" গহনাগুলি আর কিছুই নহে—কেবল পিতলের গহনা গিল্টি করা। তবে হইতে পারে, উহাদের গিল্টি একটু ভাল; এবং উহাদের গড়নটাও একটু পছন্দ-সই। কিন্তু তাই বলিয়া "সোণার গহনা" বলিয়া উহা কেনা কেবল বিড়ম্বনা-মাত্র।

সংবাদ।

—বৎসর বৎসরই দামোদরের বন্যায় লোকের সর্ব্বনাশ হয়। এবারও তাহাই হইয়াছে। গ্রামকে গ্রাম ভাসিয়া যাইতেছে; গোরু-বাছুর-প্রাণ লইয়া সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। দুর্ভিক্ষের বড়ই প্রকোপ। অন্নাভাবেও অনেকে মারা যাইতেছে। এসময় সকলের সাহায্য বড়ই আবশ্যক।

—হাওড়ার একটা ছোকরা একছড়া কলা চুরী করিয়াছিল বলিয়া বিচারে তাহার প্রতি পাঁচ বৎসর সংশোধনাগারে থাকিবার আদেশ হইয়াছে। তবে শোধনাগারে যদি স্থান না পায়, তাহাহইলে একমাস কারাদণ্ড হইবে। কিন্তু কলাছড়াটার দাম জোর দু'পয়সা!

—যাহাদিগের নাম গেজেটে প্রকাশিত হয় নাই, এরূপ দুই- একটী ছাত্র এলে পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া সার্টিফিকেট পাইয়াছেন। ইহাঁরা অন্যত্র ভর্ত্তি হইবার পর সার্টিফিকেট পাইয়াছেন। গলদ মন্দ নয়!

—এক ইংরাজ পাদরী সস্ত্রীক দক্ষিণ সাগরের এক দ্বীপে গিয়া উপস্থিত হন। জাহাজ বিপন্ন, তথায় নামিতেই হইবে! কিন্তু পাদরী সাহেবের ধ্রুব বিশ্বাস, দ্বীপবাসীরা নরভূক। সুতরাং সাহেব স্ত্রীর জন্য ব্যাকুলিত হইয়া একখানি ক্ষুদ্র নৌকায় তাহাকে ভাসাইয়া দিয়া নিজে তীরে অবতীর্ণ হন। কিন্তু পৌঁছিয়া দেখেন, তাহারা তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিল। সাহেব তখন নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া "হায় হায়" করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে স্ত্রীর শব দ্বীপে আসিয়া লাগিল। সাহেবের কষ্টের আর অবধি নাই!

—মস্কট সহরের উপর দিয়া ছয় হাত উচ্চ সাগরের তরঙ্গ চলিয়া গিয়াছে। নগরবাসীরা তাহাতে বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন।

—কলিকাতার কেল্লার একজন গোরা একজন দেশীয়ের মুখে এরূপ সযোরে ঘুসি মারিয়াছিল যে, তাহাতে তাহার দন্ত ভাঙ্গিয়া যায়। বিচারে গোরার দুই সপ্তাহ জেল হইয়াছে।

—আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের ২৬এ তারিখ রাত্রিতে সমগ্র ভারতবর্ষে জনসংখ্যা গৃহীত হইবে। পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদের নাম কিম্বা স্ত্রীলোকের স্বামীর নাম কেহ ইচ্ছা না করিলে না বলিতে পারেন।

—নদীয়ার রাজবাড়ীতে একটা বাঘ আছে। তাহাকে প্রতিদিন একটা জীবন্ত ছাগল খাইতে দেওয়া হয়। ছাগলটা দিলেই সে তাহাকে খানখান করিয়া উদরস্থ করে। কিন্তু একদিন একটা ছাগল দেওয়া হইলে, সেদিন আর ছাগলটাকে সে স্পর্শও করিল না। পরদিন প্রাতে উঠিয়া দেখা গেল যে, খাঁচাতে ছাগল আর বাঘে পাশাপাশি শুইয়া আছে। তদবধি তাহারা নাকি বন্ধুভাবে বাস করিতেছে। তামাসা দেখার জন্য অনেক লোক জড় হইয়া থাকে।

—১৮৮৯-৯০ সালে কলিকাতা নগরীতে ৫ লক্ষ টাকারও উপর দেশলাই আমদানি হইয়াছে।

—মার্কিনে কেলেডোনিয়ার এক হ্রদে একপ্রকার "নক্ষত্র-মৎস্য" আছে। সেই মাছ সময় সময় জলের উপর ভাসে, এবং বহুসংখ্যক নক্ষত্র যেন একত্র জমিয়া রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যদি কেহ তাহাদের কোন প্রত্যঙ্গ ধরিয়া টানে, তবে তাহারা সমুদয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একেবারে ছাড়িয়া দেয়। তখন তাহাদের সেই নক্ষত্রখচিত সৌন্দর্য্য লোপ পায়। আর, বিচ্ছিন্ন এক এক খণ্ড ছটফট করিয়া প্রাণত্যাগ করে।

—মার্কিনে ফনোগ্রাফিতে এক বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বর আর পুরোহিতের মধ্যে এক ফনোগ্রাফিক তার স্থাপিত হইল। পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। সেই মন্ত্র আবার এক শত মাইল দূরে এক পল্লীগ্রামে পাত্রী ও তাহার পুরোহিতের নিকট প্রেরিত হইতে লাগিল। পাত্রীর পুরোহিত তাঁহার মন্ত্র পাত্রীকে পড়াইলেন। অবশেষে তিনি বরকন্যাকে স্বামী-স্ত্রী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কতই শুনি?

—রুষে জর্ম্মণে এত রেষারিষি, এমন শত্রুভাব। কিন্তু জর্ম্মণীর কামানওয়ালা ক্রূপের কারখানা হইতে, রুষের জন্য, একটা প্রকাণ্ড অদৃষ্টপূর্ব্ব কামান প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। এই কামানটা ওজন প্রায় ৬৬৪০ মন। চোঙ্গটা লম্বে ৪০ ফুট। চোঙ্গের ফাঁদ ১৩৷৷০ ইঞ্চি। মিনিটে গোলা ছুটে ২ টা। প্রত্যেক আওয়াজে ৩০০০ টাকা খরচ হয়। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, এই কামানের গোলায় ১৯ ইঞ্চি পুরু ইস্পাতের চাদর ফুটা হইয়া যায়। গোলা এত পুরু চাদর ফুটা করিয়া, ১৪০০ গজ চলিয়া যায়। এমন ভয়ঙ্কর যমযন্ত্র আর কখনও দেখা যায় নাই।

—রাণীগঞ্জের কাছে সেতু হইতেছে। নির্ব্বোধ সাঁওতাল প্রভৃতির বিশ্বাস, পুল বানাইতে হইলেই মনুষ্য-শোণিতের প্রয়োজন। একটী অজ্ঞাত কুলশীল ব্রাহ্মণকে দেখিয়া উহারা মনে করিয়াছিল, সে নরমুণ্ডের সন্ধানে আসিয়াছে। তাই উহাকে—মারিয়া ফেলিয়াছে।

... একটা বাক্য-বিন্যাস করিয়া বসেন, ।।